আহিরী সুমতী

ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতির আনুগত্যের শপথ গ্রহণ

৪৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ • 18th May, 1967 * Vol. 71, No.

...কিন্তু, এক বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত—

বোরোলীন

—কাটা-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শুকনো, খস্‌খসে কিংবা বর্ণহীন ত্বকে যে কোন বিভ্রাটে—বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

বিষয়	লেখক					
সম্পাদকীয়						
আজকের মানুষ						
[illegible]র্শন						
[illegible]ক						
[illegible]পেয়েছি (স্মৃতিচারণ)	— সুধীরঞ্জন দাস					
	— চন্দ্রগুপ্ত					
[illegible]ু	— এস কে শক্তি					
	— ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক					৩০৯[illegible]
[illegible]ন্ধ)	— কল্পতরু সেনগুপ্ত					৩০৯৪
[illegible]তা)	— সুনন্দা দাশগুপ্ত					৩০৯৫
						৩০৯৬
[illegible]লিকা (গল্প)	— তারাপদ পাল					৩১০১

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের

—নবতম অর্ঘ্য—

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর;

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য!
মানুষ আমরা নহি তো মেষ!
দেবী আমার! সাধনা আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ!"

মাতৃমন্ত্রের ঋত্বিক, অপরাজেয় মানবমাহাত্ম্যের স্বপ্নদর্শী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ডে আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক সাজাহান, তৎসঙ্গে সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব রুস্তম ও পরপারে। মুদ্রণ পারিপাট্যে ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুদৃশ্য আর্ট পেপারের জ্যেকেটের প্রচ্ছদ; কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য ঃ ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২

	লেখক	পৃষ্ঠা
...গর একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	০১০৫
...উলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
...পরেখা	— প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	
	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	
...বিতা)	— মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	
...শাখে (কবিতা)	— শান্তনু দাস	
...ও বাংলার যাত্রাসাহিত্য	— শ্রীমন্তকুমার জানা	
...মস্ত ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	
গ্রন্থমেলা	—	
রঙ্গজগৎ		
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন ম...
সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে ঃ—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৪·৫০

তৃতীয় ভাগে ঃ—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৬·৫০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—

রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, ধেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী' নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কল-১২

৭১ বর্ষ ঃ ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 NP
Thursday, 18th May, 1967

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার দিকে দৃষ্টি দিন

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া—এই দুটি জেলা আজ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। বাঁকুড়ার ঊনিশটি থানার মধ্যে ছটি থানার (মোজিয়া, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, কোতুলপুর) ছয় লক্ষ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পুরুলিয়া জেলার পনের লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা আশিজনের অবস্থাও অবর্ণনীয়। একদিকে নিদারুণ খরা, আর একদিকে অন্নাভাব। দারুণ রৌদ্রে দাঁড়াবার গাছের ছায়াটুকুও তাদের কপালে নেই। কারণ, ঐ সব অঞ্চলে যে সব গাছ একদা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেগুলিও বিগত সরকারের বন-সংরক্ষণ বিভাগের মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট চিন্তার কুঠারাঘাতে শূন্য!

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার এই অবর্ণনীয় দুর্দশা হৃদয়বিদারক! পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার অবস্থাও ভাল নয়। তবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে এমন দুরবস্থায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি দু-একদিনের নয়। পুরুলিয়া জেলাটি হস্তান্তরের পর যখন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আসে তার আগে কোন্ অবস্থার মধ্যে এই জেলাটিকে তদানীন্তন বিহার সরকার রেখেছিলেন, তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন লক্ষ্যই করেন নি। এই জেলাটিতে আন্দোলন সক্রিয় থাকায় তদানীন্তন বিহার সরকার কোনো সাহায্য দেন নি। বাঁকুড় জেলার অবস্থা সে রকম নয়। তবু বৃটিশ আমলে যেমন, তেমনি স্বাধীনতা লাভের পরও বাঁকুড়া জেলার অনগ্রসরতা, দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা, কুসংস্কার—[illegible] প্রবাদে পরিণত, তার কোনোটাই দূর [illegible] চেষ্টা হয় নি। অবশ্য বড় বড় [illegible] দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় [illegible]র প্রাক্কালে বৃহৎ শিল্প ও কুটির-[illegible]স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। [illegible]ঙ্গে ছিল নদী পরিকল্পনার তথাকথিত সাফল্যের স্তোকবাক্য। কিন্তু দামোদর নদের পরিকল্পনার কোনরকম সুবিধা বাঁকুড়া জেলার উত্তরাঞ্চলের লোক লাভ করতে পারে নি। বরং বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীতে চড়া পড়েছে। নদীর জল আগে তীরগুলির মাঠ-ঘাট প্লাবিত করায় পলিমাটির দ্বারা ঐ সব অঞ্চল নিয়মিত উর্বর থাকত। এখন না আছে জল, না আছে পূর্বে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক অন্যান্য সুবিধাগুলি। সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে নদী পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার জন্যে বাঁকুড়ার দুঃখকষ্ট আজ চরম পর্যায়ে। এই অবস্থার জন্যে পূর্বতন সরকারই দায়ী। সেইসঙ্গে যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনাগুলির পরিচালনা করেছেন, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। অথচ আজ তারা নির্বিকার!

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা দুটিতে জনগণের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বিগত কংগ্রেস সরকার চরম ছেলেখেলা করেছেন। নির্বাচন উপলক্ষে রাস্তাঘাট তৈরির নামে মাটির ওপর পিচ ঢালার ঢালাও ব্যবস্থা করা হলেও খরা ও অন্নকষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। বরং আর্তত্রাণের নামে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা ক্ষুধাতুর লোকের চোখের সামনেই চুরি হয়েছে। জনসাধারণ সত্যিকারের কোনো রিলিফ পায় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজে নেমেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণও পাচ্ছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা কর্তৃপক্ষ এই সব কাণ্ড চোখে দেখেও বিগত সরকারের স্নেহাঞ্চলে নির্বিকার থেকেছেন এবং এই সব জেলায় খাদ্য উদ্বৃত্ত—এই ধারণার সৃষ্টি করে সংগৃহীত খাদ্য অন্য জেলায় বিতরণ করেছেন।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে বাঁচাবার ভার আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারের। এই দুই জেলা অন্নকষ্ট ও অশিক্ষার মধ্যে থেকেও বিগত সাধারণ নির্বাচনে উচিত শিক্ষা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নৈতিক বল অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র মানুষের দৃষ্টি আজ আমরা এই দুই জেলার ক্ষুধাতুর মানুষগুলির দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি মতো চাল-গম এখনও পশ্চিমবঙ্গকে দেন নি। জোতদার ও চাল-কল মালিকরাও সরল ও সহজ কথায় বশীভূত হবার নয়। কেন্দ্রের কাছ থেকে গম পেলে উড়িষ্যা এক লক্ষ টন চাল দিতে রাজী—এই প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রক নাকচ করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও যুক্ত-যুক্তফ্রন্ট সরকার খরাকবলিত অঞ্চলে জল সরবরাহের অস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন, রিলিফের কাজও প্রয়োজনীয় স্থানে শুরু হয়েছে। গ্রামের লোকগুলিকেও আজ পূর্বতন মনোভাব ত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে—যাতে সরকারী সাহায্য ব্যর্থ না হয় এবং যে অস্থায়ী সাহায্যের দ্বারা কাজ শুরু হয়েছে, তদ্দ্বারা স্থায়ী কাজ হিসেবে গভীর পুকুর খনন, বৃহৎ বৃহৎ জলাধার স্থাপন, যথাসময়ে বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা এবং অবিরাম প্রবাহিত ছোট ছোট স্রোতধারার উঁচুনিচু পথে বাঁধ তৈরি করতে হবে। বর্তমান অবস্থাকে এক হাতে যেমন রুখতে হবে, তেমনি আর এক হাতে প্রমাণ করতে হবে, এ অঞ্চলের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট চিরকালের নয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

অবক্ষয় যদি আসে, ধ্বংস যদি নামে তো সে-দুর্ঘটনা হাল-আমলের। বাংলা সাহিত্য কখনো দারিদ্র্য জানে নি, নানান সম্পদে, নানান রঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে সাহিত্য-ভাণ্ডারটি। রত্নাকরের তো অভাব ঘটে নি। রত্নেরই বা হবে কেন? সাহিত্য-রত্নাকরদের সে-সারিতে চোখ বুলোলে তারাশংকরের নাম প্রথম পলকেই নজরে পড়বে।

সেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে নতুন সম্মান আজ যুক্ত হলো, তাঁর সাহিত্যকীর্তি স্বীকৃতি পেলো ১৯৬৬ সনের সর্বোত্তম ভারতীয় সাহিত্য হিসাবে। ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্যে এ-বছর নির্বাচিত হয়েছে তারাশংকরের অমর সৃষ্টি, নিপীড়িত মানবতার জয়গাথা 'গণদেবতা'। এ-পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক লক্ষ টাকা, কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে যে-সম্মান আজ তারাশংকর এনে দিলেন, টাকার অংকে কি তার মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব?

সত্যি বটে, সম্মানলাভ তারাশংকরের জীবনে এই প্রথম ঘটে নি, তাঁর দীর্ঘ ৪০ বছরের সাহিত্যিক-জীবনে প্রচুর সম্মান, প্রচুর খ্যাতি তিনি কুড়িয়েছেন। আপনা থেকে শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মতো আসে নি যদিও সে-যশ, তাঁকে সাধনা করতে হয়েছে, সেবা করতে হয়েছে সাহিত্য-সরস্বতীর। কলম ধরেছিলেন প্রথম ১৯২৮ সালে, সংগ্রামী বাংলার মুখপত্র "কল্লোল"-এর জন্যে। সেই থেকে চলছে কলম, থামে নি এক মুহূর্তের জন্যেও, শতেক সংকট সত্ত্বেও না। ছোট গল্প দিয়ে সুরু, কিছু কবিতাও তরুণ বয়সে লিখেছিলেন, শেষে উপন্যাসে উত্তরণ করে বাংলা সাহিত্য-জগতে তারাশংকর এক উজ্জ্বল নাম হয়ে উঠেছেন।

এত নাম, এত খ্যাতি তারাশংকর অর্জন করলেন কি করে—অনেকের কাছেই এটা একটা বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর রচনা—সে ছোট গল্পই হোক, আর উপন্যাসই হোক—পাঠ করলেই নিমেষে সে-বিস্ময়ের ঘোর যাবে কেটে। তারাশংকর কল্পনাজগতে বিচরণ করেন নি কখনো, তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সকলেই এই মাটির সন্তান, বঞ্চিত সর্বহারাদের জন্যেই তারাশংকর লেখনী ধারণ করেছেন, জয়গান গেয়েছেন অত্যাচারী শাসক-জমিদারের বিরুদ্ধে শোষিত বঞ্চিত প্রজাপুঞ্জেরই।

মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে তারাশংকরের টান ও বন্ধন নিবিড় ও অচ্ছেদ্য। বীরভূমের লাভপুরে তাঁর জন্ম, আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে। জীবনের বেশির ভাগ সময় এখানকার সাধারণ মানুষ, আদিবাসীদের সঙ্গেই কাটিয়েছেন। গ্রামবাংলার দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী তাঁর কলমে ঝরবে না তো কার কলম প্রকাশ করবে? তারাশংকর স্বচক্ষে গ্রামবাসীর জীবনসংগ্রামের চেহারা দেখেছেন, সংগ্রাম করেছেন নিজেও, প্রাণ ঢেলে তাই ভাষাও দিতে পেরেছেন ওই সংগ্রামকে, যদিও

তারাশংকর

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জমিদার বংশোদ্ভূত তত্রাচ জমিদারীপ্রথার বিরুদ্ধেই তাঁর রোষ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

বীরভূম স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তে এসেছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে পড়তে দিলে কৈ? বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর গ্রাম থেকেই, কলকাতা এসে সে-যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হলো। কিন্তু স্বরাজওলাদের বৃটিশ শাসক বরদাস্ত করবে কেন, তারাশংকরকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুললো গোয়েন্দা পুলিশ। বাধ্য হয়ে কলেজ ছাড়তে হলো তাঁকে, গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ হলেন তিনি। পড়া ছাড়লেন বটে তারাশংকর. কিন্তু সে [illegible] বাড়িতে তিনি ভায়েদের সঙ্গে মি[illegible] জমিদারী দেখতেন, আর কবিতা নাটক লিখতেন। থিয়েটার যাত্রা করে বেড়াতেন। নিজের লেখা নাটক অভিনয় করাতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি, সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান করে। অবশ্যি বিদেশী সরকার থিয়েটার কিম্বা গ্রামসেবাকেও সন্দেহের চোখে দেখেছিলো, আর তাই তারাশংকরকে কারাভোগ করতে হয়েছিলো।

কিন্তু ওই কবিতা-নাটক তারাশংকরের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিলো, তাই তিনি সাহিত্যসেবার মধ্য দিয়ে জীবিকার সন্ধান করলেন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা চৈতালী ঘূর্ণি থেকে তারাশংকর এ-পর্যন্ত শায় শ' খানেকের বেশি বই লিখেছেন, তার মধ্যে গোটা পনেরো 'বেস্ট সেলার' উপন্যাস। তারাশংকরের ধাত্রী দেবতা, দুই পুরুষ কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন, সপ্তপদী, রাধা, বিচারক, কান্না ইত্যাদি উপন্যাস নাটক পড়েন নি, বাঙালী পাঠক এমন ক'জন আছেন? তাঁর কয়েকটি উপন্যাস চিত্রায়িতও হয়েছে। বাস্তবিক অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পর সাহিত্যক্ষেত্রে এত সুনাম আর কেউ অর্জন করতে পারেন নি।

সম্মানও এসেছে স্রোতের বেগে। ১৯৪৭ সালে 'হাঁসুলি বাঁক' এনে দিলো তাঁকে শরৎস্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার আনলো 'আরোগ্য নিকেতন' '৫৫-এ। পরের বছর ওই একই উপন্যাস আকাদমি পুরস্কার পেলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ সালে তাঁকে জগত্তারিণী পুরস্কারে ভূষিত করেন।

বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে তারাশংকর জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, রেঙ্গুন ইত্যাদি বিদেশযাত্রাও ঘটেছে। কয়েকটি নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার গৌরবও তাঁর হয়েছে।

তারাশংকর বরাবরই সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের একজন নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯৫২—১৯৬০ সাল পর্যন্ত তারাশংকর রাজ্য বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে তিনি ৬ বছর রাজ্য পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে তারাশংকর যে-সম্মানীয় পুরস্কার পেলে[illegible] তা' আজকের হতাশাপীড়িত [illegible] সাহিত্যিকদের অবশ্যই উৎসাহ যো[illegible] বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে বান আ[illegible] আবার।

ভারতদর্শন

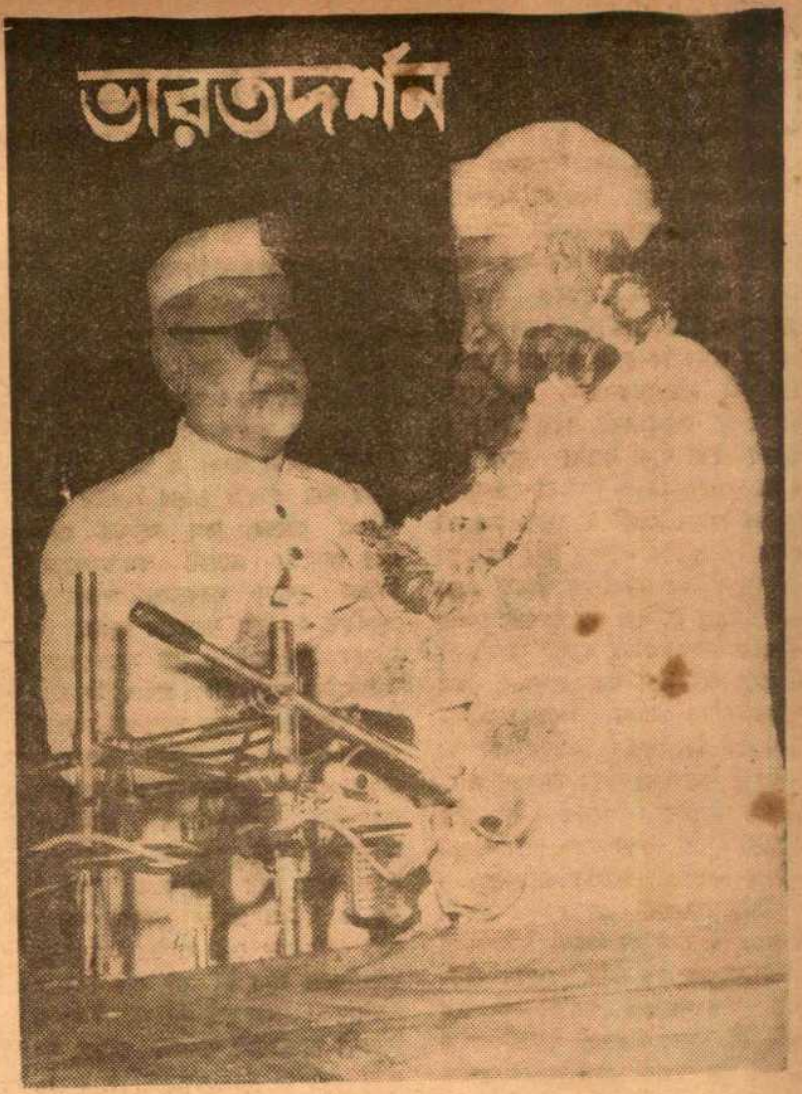

বিদায় সম্বর্ধনা

উপরাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী ভি ভি গিরির জয়লাভের সংবাদ রাষ্ট্রপতি পদে ডঃ জাকির হুসেনের জয়লাভকে এক রকম প্রত্যাশিত বলে পূর্বাহ্ণেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ফলাফল যখন সত্যিই বার হ'ল তখন প্রথম ধাক্কায় কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব যতদূর আঘাত পাওয়া উচিত, সুতরাং ততদূর আহত হয় নি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীপক্ষে একটা অতি-উৎসাহের সুর অবশ্যই বেজেছিল, এমন কি কেন্দ্রে ইন্দিরা মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন বলেও জল্পনা-কল্পনা চলছিল। অর্থাৎ একটা দেশজোড়া অনিশ্চিত মানুষের মনকে থির থির করে কাঁপিয়ে তুলেছিল। কিন্তু তাতে অবিশ্বাসের পর্শই ছিল বেশি।

একে তো ডঃ হুসেন, না কি শ্রীকোকা সুব্বা রাও, এ প্রশ্নে বিরোধী দলগুলির মধ্যে এবং একই দলের সদস্যবৃন্দের মধ্যেও যথেষ্ট মতৈক্য প্রতিষ্ঠা পায় নি, তার ওপর রাজ্যসভায় সংখ্যাগুরু কংগ্রেসী ভোটের বাধাও বিরোধীপক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনাকে ম্লান করে রেখেছিল। উপরন্তু ঘাড়ে চেপেছিল সাম্প্রদায়িকতার ভূত। এই ভূতাবিষ্ট অবস্থায় তাই ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে সর্বপ্রথম একটা সংশয়িত শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেল। ডঃ হুসেন জয়লাভ করলেন, যদিচ একেবারে অতি উল্লেখযোগ্য ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের জয়-জয়কার ঘোষণা তার দ্বারা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ডঃ হুসেনের জয়লাভকে স্বাভাবিক সন্তোষের সঙ্গেই সকলে গ্রহণ করেছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে এহেন স্পোর্টস-ম্যান স্পিরিট বস্তুত অপ্রত্যাশিত হলেও তার অস্তিত্বই খাঁটি।

ভারতবর্ষ তার স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনে বারম্বার প্রমাণ করছে, গণতান্ত্রিক মেজাজকে টিকিয়ে রাখার সব ক'টি গুণই এদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বর্তমান। যতই কোন কোন অংশে ভারতীয় গণতন্ত্রের আয়ুষ্কাল সমাপ্তির দিকে বলে আওয়াজ উঠুক, তা শুধু বিশেষ আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রকাশ মাত্র। তার দ্বারা ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সঠিক ব্যক্ত হয় না।

ডঃ হুসেনকে সুতরাং দলমত সম্প্রদায় বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বস্তর থেকে ঐকান্তিক স্বাগত অভিনন্দন জানানো হয়েছে; যার সঙ্গে আমরাও সানন্দে আমাদের কণ্ঠস্বরকে বিমিশ্র করার সৌভাগ্য গ্রহণ করছি।

ডঃ জাকির হুসেনের জয়লাভে ...র জয় যত না সূচিত হয়েছে তার ...ঢের বেশি প্রকাশ পেয়েছে বিরোধী ...লির দুর্বলতা। কংগ্রেস রাজ্যসভা-...র সংখ্যাধিক্য জনিত যে সুযোগ ভোগ করেছে, বিরোধীপক্ষ অবশ্যই তার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু বিরোধীরা যে যত গর্জান কার্যকালে তত বর্ষান না এ সত্য রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছে। এই দুর্বলতার অন্যতম কারণ, বিরোধীপক্ষ বিষম নীতির ধ্বজাধারীদের নিয়ে একটা কংগ্রেস-বিরোধী জোট মাত্র। একের সংগে অপরের বিসম্বাদ ছাড়া সম্ভাব নেই, থাকতেও পারে না। কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অদ্বিতীয় শক্তির অধিকারী কংগ্রেসকে ভারতের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ থেকে অপসারণের জন্যই বিরোধী আঁতাত। সুতরাং এ আঁতাত মূলত দুর্বল। এ আঁতাত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এ আঁতাত তেল-জলের বিচিত্র সহাবস্থানের পরীক্ষা মাত্র।

কংগ্রেসকে ভারতের মানচিত্রে কোণঠাসা করতে পারলেও যে নয়া শক্তি দ্বন্দ্বে বিরোধীপক্ষ তখন দ্বিধাবিভক্ত হবে, তাও খণ্ডাংশে বিষম নীতিদ্বন্দ্বে জর্জরিতই থাকবে। প্রগতিশীল নামধেয় যে কতিপয় দল উপদল প্রগতিবিরোধীদের সঙ্গে সেদিন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবেন, তাঁরা কী ভীষণ পরস্পরবিরোধী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন তাও কারও অপরিজ্ঞাত নয়। অথচ পরীক্ষামূলক নির্বাচনী আঁতাতের নামে এই বিষম নীতিধ্বজদের একটি জগাখিচুড়ি স্বীকার করে নিতেই হয়েছে অনিবার্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। ফলত তাতে প্রকৃত প্রগতিশীল শক্তিরই হাত জোরদার হয়েছে, না কি অশক্ত হয়েছে, ভবিষ্যতে তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে। গণস্বার্থের খাতিরে সে বিশ্লেষণে প্রবেশ না করাই শ্রেয়।

তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নে দ্বিধা সংশয় এবং কংগ্রেস-বিরোধী নির্বাচনী সংগ্রামে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি প্রকাশের দ্বারা কতিপয় তথাকথিত উপদল তাঁদের বিচিত্র নীতিকে উপস্থাপিত করে প্রমাণ

করেছেন, নীতিবাগিশতার কেতন উড়িয়ে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী সিদ্ধান্তের নাকের ডগায় অনায়াসেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে দিতে পারেন।

প্রসঙ্গত এটুকু বলার প্রয়োজন বোধ করি যে, নির্বাচনে বিরোধী আঁতাতের সদ্ব্যবহার করে এবং অধিকতর শক্তিশালী দলের স্কন্ধে ভর করে এই সমস্ত ক্ষুদ্র চক্রই আবার সুবিধাজনক অবস্থায় আপনাপন শক্তি কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু যে কংগ্রেস-বিরোধিতায় সেই আঁতাতের জন্ম, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কালে সেই কংগ্রেস-বিরোধিতাকেই এঁরা মুখ্য কর্তব্য রূপে গণ্য করতে পারেন নি। বিরোধী চ্যালেঞ্জকে চ্যালেঞ্জ করার এহেন মনোভাব বিরোধী শক্তির শিকড়টিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে।

অনেক দল মতিস্থির করতে এতো সময় নিয়েছে যে তার দ্বারাও প্রকারান্তরে সংশয়ের বিষবৃক্ষটির মূলেই সঞ্জীবনী সিঞ্চনের আয়োজন করা হয়েছে। দলের মধ্যেও ব্যক্তির প্রাধান্য বিরোধী আশার মুখে ছাই ছিটিয়েছে। আর এই সব মিলিয়েই কংগ্রেসের জয়। ভারতের পরিবর্তমান মানচিত্রে পুনশ্চ কংগ্রেসকে একটি মর্যাদার আসন হাতে তুলে এগিয়ে দিয়েছে তথাকথিত কংগ্রেস-বিরোধীরাই।

ব্যক্তি হিসেবে ডঃ জাকির হুসেন শ্রদ্ধেয়। তাঁর নেতৃত্বে যথার্থ নিরপেক্ষতা যদিও আশাতিরিক্ত দাবি, তথাপি রাষ্ট্রপতি পদের সমুচিত মর্যাদা রক্ষা করে তিনি যে সংকটমুহূর্তে দলনিরপেক্ষ নেতৃত্বই দান করবেন এমন আশাই আমরা রাখব। ইতিপূর্বে ভারতের যে পরিস্থিতি ছিল তাতে দলনিরপেক্ষতার প্রশ্নটা খুব বড় করে দেখা দেয় নি। ভারতবর্ষ তখন কংগ্রেসী যথা-ইচ্ছার সুতোয় বাঁধা। আজ পরিস্থিতির পরিবর্তনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ঢের বেশি অনুভূত হচ্ছে। তাই ডঃ হুসেনকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপনের সময় সমগ্র জাতির তাঁর কাছে একমাত্র আবেদন এবং দাবিও : তিনি যেন যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দলের ঊর্ধ্বে জাতির স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দান করেন। তাঁর কর্তব্য তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে অনেক বেশি কঠিন। কেন না, তাঁকেই সর্বপ্রথম বিভিন্ন মতাদর্শের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে। এই সুকঠিন ও গুরুভার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন সর্বতোভাবে সফল হ'ন, তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপনের মুহূর্তে সেটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সি আই এ

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পুনরায় মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর বা সি আই এ-র কীর্তিকলাপের কিছু পরিচয় দান করে নতুন করে চমকিত করেছে আমাদের। সেই সঙ্গে পি টি আই প্রদত্ত সংবাদও যুক্ত হয়েছে। প্রকাশ, বিশ্বব্যাপী, বিশেষত এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার সমাজজীবনের সর্বস্তরেই সি আই এ-র অদৃশ্য রোমশ হাত সক্রিয় আছে। কম্যুনিজম রোখার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই এই সংস্থার কার্যকলাপ ক্রমশ বিভিন্ন জাতির স্বাধীন চিন্তা ও ভাবনাকে গ্রাস করার জন্য আর্থিক প্রভাব বিস্তার এবং বিভিন্ন ধরণের চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছে। এদেরই কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন স্থানে সরকারের পতন ও অবাঞ্ছিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে ও ঘটছে। সি আই এ নয়া সাম্রাজ্যবাদের অত্যাধুনিক সংস্করণ। প্রকাশ, সি আই এ-র কালোছায়া দ্রুত তৎপতায় কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা নেপথ্য সংযোগের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করছে। ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক জীবনে সি আই এ-র অর্থ শ্রমসংস্থা থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল মন্ত্রীর দপ্তরকে পর্যন্ত প্রলুব্ধ করতে সক্ষম। কেউ অর্থলোভে, কেউ বা উগ্র কম্যুনিজম বিরোধিতার জন্য সি আই এ-র শিকারে পর্যবসিত। এরা তাই স্বদেশবাসী হয়েও বিদেশী গুপ্তচরেরই দালাল। দেশের সব ক'টি রাজপথ জনপথের চাবিকাঠি সি আই এ-র কাছে সমর্পণ করে বিনিময়ে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ঘৃণিত দুর্ভাগ্য এঁরা অনায়াসেই আলিঙ্গন করে নিচ্ছেন। এঁদের কেউ জেনে কেউ না জেনেই মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। যাঁরা ততদূরও উঠতে পারেন নি, তাঁদেরও অনেকে আট টাকায় বিক্রিত ক্লাইভ সায়েবের দেখা অদ্ভুত হ্যাংলা ভারতের গর্ভস্রাবে পরিণত হচ্ছে।

প্রকাশ, কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের কম্যুনিস্ট বিরোধী দলের ভারতীয় সভাপতি শ্রীমিনু মাসানী স্বীকার পেয়েছেন যে, কংগ্রেস সি আই এ-র অর্থে গতর বৃদ্ধি করে গেছে অবাধে। এই সংস্থাই সি আই এ অর্থপুষ্ট কম্যুনিস্ট বিরোধী সাময়িক পত্রিকা 'এনকাউন্টার' প্রকাশ করতেন এদেশে।

দু' কলম লিখতে জানলে কিম্বা অপরের লেখা ভাষান্তরিত করে চালিয়ে নিতে শিখলে কিম্বা একটা ছোটখাটো সংস্থা গড়ে একত্রে কয়েকটি যুবক-যুবতী জোটাতে পারলেও সি আই এ-র নেপথ্য হাত নোটের তোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে। এই ভয়ংকর অসুস্থতার হাত থেকে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করার নৈতিক সামাজিক এবং বিশেষভাবে রাজনৈতিক দায়িত্ব আজ আর অস্বীকার করা যায় না।

এজন্য অবিলম্বে একটি পাল্টা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর দেশে দেশে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে, যে দপ্তরের কাজ হবে সি আই এ-র এই সুচতুর কূটনৈতিক খেলা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে ওয়াকিবহাল থাকা। ভারতে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র এবং কবি সাহিত্যিক রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠছেন। এঁদের কার্যকলাপ, লেখার বিষয়বস্তু, প্রচারের ধরণ ধারণ, মেলামেশার ক্ষেত্র ইত্যাদির প্রতি কড়া নজর রাখা ও গোপনে তদন্ত করার মতো সময়ও এসেছে। মার্কিন মুলুকে ভ্রমণবিলাসী অত্যুৎসাহী সংস্কৃতিবানদের মানসিক দুর্বলতা কখন কোন্ পর্যায়ে উত্থান-পতনের নাগরদোলায় অবস্থান করছে, মনে হয়, সেদিক দিয়ে এগোলেও অনেক আকাঙ্ক্ষায় উদ্বাহু মানুষের সন্ধান মিলবে।

আমরা ঘুষের টাকাকে বড় আদর করে ঘরে তুলতে শিখেছি। তা সে টাকা পুরস্কারের আকারেই আসুক অথবা খিড়কী পথে চুপি চুপি প্রবেশ করুক। অপরের থেকে ভালো থাকার নেশায় কুকুরের মতো আমাদের জিহ্বাগ্রভাগ সর্বদাই লালাসিক্ত হয়ে আছে। সি আই এ, শোনা যায়, এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মহা দাপটশালী। বিভিন্ন দেশের রাজ্য ভাঙা-গড়ায় তো বটেই, অতি নগণ্য বা স্বল্প উল্লেখ্য পারিতোষিক-বিতরণী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নাকি সি আই এ-র নেপথ্য প্রভাব পুরস্কারাদিকেও কলুষিত করছে।

এ সমস্তই অত্যন্ত আশংকার কথা। অকস্মাৎ কেরিয়ার গড়ার প্রচণ্ড আগ্রহে উত্তরস্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষ বহু ক্ষেত্রে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। ভয়টা তাই এদেশেই অধিকতর। কেন না, বলতে লজ্জা হলেও কঠিন সত্যি কথা এই যে, এ দেশে শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই সর্বাধিক কাঙাল; আর তাই সন্দেহজনকও বটে। অবশ্যই এই মন্তব্যে আপামর শিক্ষিত জনসাধারণকে উদ্দিষ্ট করা হচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জাতির জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসে ওপরতলার মানুষের এবং উঠতি প্রতিভার লালসার অন্ধ উন্মত্ততায়। আমাদের সেই দুর্বল স্থান থেকে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে। সি আই এ-র কার্যকলাপের উত্তরোত্তর শিকড় সঞ্চালনের সংবাদে কথা স্বতই মনে জাগে। আমাদের নির্মমতা ও কঠোরতার প্রয়োজন। প্রকার মীরজাফরকেই আঙুলের হাঁক দি

সরে যেতে দেওয়া হবে না। তাকে নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট করতেই হবে; তা সে ব্যক্তি বা সংস্থার এলেম যত দূর ক্ষমতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।

অবশ্যই 'ঘেরাও' একটি জংলী ব্যবস্থা

সন্দেহ কি 'ঘেরাও' নিশ্চয়ই একটি জংলী ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ঘেরাও'-এর এই জংলীপনা বন্ড দৌরিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারক মালিকপক্ষ এবং তাঁদের বশংবদ রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংস্থাগুলি।

এতাবৎকাল অবস্থাটা কী ছিল? ঘেরাও করতেন মালিকরাই। শ্রমিকশ্রেণী তার ন্যায়সঙ্গত দাবি জানাতে গেলে পুলিশ বেস্টনীর দ্বারা 'ঘেরাও' হয়ে লাঞ্ছনা কত নির্মম হতে পারে তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসতেন। তখন যেহেতু মালিকপক্ষই ছিলেন জঙ্গলাধিপ, 'ঘেরাও' ব্যবস্থা জংলী বলে মনে হয় নি তাঁদের।

আপোষ মীমাংসা। সালিশী এমন কি ট্রাইবুনালের আদেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে জঙ্গলাধিপরা অবাধে জংলা কানুন চালিয়ে এসেছেন। পেছনে ছিল মদৎদার কংগ্রেসী সরকারের পুলিশবাহিনী সর্বতোভাবে সেই জংলা কানুনকে রক্ষা করার জন্য হুকুমে হাজির।

জমানা পাল্টে গেল চতুর্থ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে। যুক্তফ্রন্ট সরকার বললেন, কেউ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগকালে যতক্ষণ অসংগত আচরণ না করছেন, সরকার ততক্ষণ পুলিশ দিয়ে অত্যাচারের জংলী শাসন প্রয়োগ করবেন না। মহা অপরাধ হল যুক্তফ্রন্ট সরকারের এহেন নীতি গ্রহণে। একেবারেই বাঘের ল্যাজে পা পড়ল। চতুর্দিকে হায় হায় রব উঠল। এ যে নামান্তরে বিপ্লব গো! হেঁকে উঠলেন মালিকগোষ্ঠীর নেপথ্য দালালরা। গেল, দেশ গেল, বাণিজ্য গেল, দেশের অর্থনীতি বেসামাল হয়ে উঠল। আর্তনাদে আদিগন্ত ফেটে পড়লেন মালিকপক্ষের জংলা কানুন সংরক্ষকবৃন্দ। দু' একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে জংলা আইনের কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছে দেখে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমমন্ত্রী তেমন দুটি রাজ্যকে (প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আসছে যারা) স্পষ্টতই চিহ্নিত করে বললেন, মহীশূর এবং [illegible]র কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মালিককুলকে কার্যত উস্কে

[illegible] মালিকগোষ্ঠী অপেক্ষা কংগ্রেসী প্রভুদের গাত্রদাহটাই যেন সমধিক। নির্জিত শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কংগ্রেসী জনসেবীদেরই যেন স্বার্থের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কী সাংঘাতিক জনসেবীদের হাতেই জনসাধারণ তাঁদের ভূত ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন এবং এখনো সমর্পিত প্রাণ হয়ে আছেন! এঁদের চেহারাটা এই জংলা ব্যবস্থা হস্তান্তরে আরও আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

জনসেবীদের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনসেবীদের গণস্বার্থ বিরোধী চেহারাটা নির্লজ্জের মতো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমিকদরদী শ্রমনীতিকে তাঁরা "জংলী আইনের জঘন্য ওকালতি" বলে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন। অথচ একই সময় লজ্জার মাথা খেয়ে একবার ভেবে দেখবার সুযোগ পান নি যে, জনসেবীর কলমে প্রকৃতপক্ষে কার জন্য নির্লজ্জ ওকালতির বয়ান ঝরছে।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা লিখেছেন, "আমরা শ্রীব্যানার্জিকে সত্যই একটু সুবোধ হইতে অনুরোধ করিতেছি। বলিতেছি অতি আস্ফালন দেখাইবেন না। অতি শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন।"

জনসেবীদের এই সদুপদেশ বর্ষিত হতে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের গণদরদী নীতিতে যে হেরফের হবে না, শ্রমমন্ত্রী দিল্লী বৈঠকেই তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে এসেছেন।

তিনি বলেন, ছাঁটাই, লে-অফ, বরখাস্ত প্রভৃতি অন্যায় ও বে-আইনী আচরণের অনিবার্য ফলশ্রুতিই হল ঘেরাও।

ধীরভাবে ও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করতে মালিকপক্ষও নিশ্চয় শ্রমমন্ত্রীর সুচিন্তিত বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবেন। বস্তুত মালিকানী যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা শ্রমিকপক্ষকে ঘেরাও করে রাখলে তা যদি জংলী ব্যবস্থা বলে পরিগণিত না হয়ে থাকে, তবে ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে অন্য সব উপায় ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখে শ্রমিকরা যদি পাল্টা 'ঘেরাও' নীতি অনুসরণ করেন, তবে তাকেই বা জংলী ব্যবস্থা কেমন করে বলা যায়।

পক্ষান্তরে মূলধন সরিয়ে নেওয়ার হুমকী দিয়ে মালিকপক্ষ কত দূর শিষ্টাচার রক্ষা করছেন। দেশ ও জনসাধারণের কাছে তাঁদেরও যে কিছু দেয় ও দায়িত্ব আছে একথা অর্থদণ্ডে তাঁরাই বা বিস্মৃত হন কেমন করে। দেশের সম্পদ দেশের অগণিত জনসাধারণেরই সম্পদ। মালিকপক্ষ বিশেষ সুবিধাজনক পরিস্থিতির সুযোগে সে সম্পদকে কাজে লাগিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সুবাদেই (ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত বলেই) গণভাগ্য নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে তাঁদেরই আছে এমন কথাই বা আজ কে স্বীকার করবেন। মালিকগোষ্ঠীর একথা বোঝা উচিত যে সমগ্র দুনিয়ায় অতি দ্রুততার সঙ্গে ইতিহাসের চাকা ঘুরছে। এই বিঘূর্ণিত পরিস্থিতিতে তাঁদের মালিকানা মনোভাবেও কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ভারতের মানচিত্রে সবে ধন নীলমণি একটি টিমটিমে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে দেখে (কেরালায় 'ঘেরাও' অস্বীকৃত) মালিকগোষ্ঠী তথা প্রতিক্রিয়াশীল জনসেবীরা হয়ত বুকে প্রচুর ভরসা রাখেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা তাই বলেই গায়ের জোরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত স্বয়ং বিড়লাজীর সুচিন্তিত সতর্কীকরণ বাণীটিও তাঁদের স্মরণে রাখতে হবে। তিনি জমানা বদল সম্পর্কে শিল্পপতিগণকে সচেতন হতে বলেছেন, অন্যথা, তাঁর বিশ্বাস, জনগণ কংগ্রেসকে যেভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে শিল্পপতিগোষ্ঠীর দশাও তার থেকে সুখকর কিছু হবে না।

কিন্তু এই সত্য বুঝতে চান নি, শিল্পপতি শ্রীযুত নওয়াল টাটা। তিনি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রমিকদের সা[illegible] ঘেরাও আন্দোলনে হাত মিলিয়েছেন অথচ পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী বারম্বার একথাই বলতে চেয়েছেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার শুধু পুলিশবাহিনীকে মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহারে অস্বীকৃত। 'ঘেরাও' একটা অনিবার্য পরিণতি। ন্যায়নীতি মালিকপক্ষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেই 'ঘেরাও'-এর বালাই অদৃশ্য হবে। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার সমদৃষ্টির সঙ্গেই শ্রমিকমালিক বিরোধকে দেখতে চান।

এ আই টি ইউ সি'র তরফে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে চেয়েছেন, উভয় পক্ষের ন্যায়-অন্যায় বিচার। কিন্তু স্ট্যাণ্ডিং শ্রম কমিটির সভায় কেন্দ্রীয়

শ্রমমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জির উপস্থিতিতে শ্রীডাঙ্গে প্রতিবাদ সভা পরিত্যাগ করেন। 'ঘেরাও'-কে অসংগত বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ভারত সরকারের আইন বিশেষজ্ঞগণ ঘেরাওকে বে-আইনী এবং আদালত-গ্রাহ্য অপরাধ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আইন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা বলেন, ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনে 'ঘেরাও'-এর কোন স্বীকৃতি নেই।

এ সম্পর্কে শ্রীডাঙ্গে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন ঃ সময় আসছে, যখন ধর্মঘট এবং পিকেটিং-এর ন্যায় 'ঘেরাও'-ও শ্রমিকদের দাবি আদায়ের বৈধ ব্যবস্থা-রূপে গৃহীত হবে।

তিনি বলেন যে, স্ট্যাণ্ডিং লেবার কমিটিতে গৃহীত বিবৃতি গণতান্ত্রিক অকংগ্রেসী সরকার বিশেষত পশ্চিম-বঙ্গের সরকারকে অপদস্থ করার জন্য মালিক ও কংগ্রেস সরকারের একটি রাজ-নৈতিক কৌশল ছাড়া কিছুই নয়।

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও হিন্দ মজদুর সভা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই বিবৃতি সমর্থন করায় ডাঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেন।

ডাঙ্গে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংগীহীন নয়, অপর রাজ্যের সকল ট্রেড ইউনিয়ন তাদের সমর্থন করবে।

শ্রীডাঙ্গে আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বিভিন্ন রাজ্যেই ঘেরাও-এর প্রসার বৃদ্ধি পাবে। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, যদিও কয়েকটি রাজ্যের মালিকগোষ্ঠী বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করেছেন, পশ্চিম-বঙ্গের মালিকরাই শুধু পরিবর্তিত পরি-স্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি।

অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন নেতার কণ্ঠে ভারতের বুকে একটা যে চরম শিল্পসংকট ঘনিয়ে আসছে তারই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় কোন পক্ষের জিদ বজায় করে চলা মানেই একটি সংঘর্ষে তাড়াতাড়ি লিপ্ত হয়ে পড়া।

মালিকপক্ষ যদি শ্রমিকদের ন্যায়সংগত দাবিগুলি মেনে নিতেন, যদি ট্রাইবুনালের রায়কে যথোচিত মর্যাদা দানের ব্যবস্থা থাকত, যদি শ্রমিকস্বার্থকে কেবলই পদ-দলিত করাই মালিকদের একমাত্র অহমিকা না হত, যদি ন্যায় বিচার লাভের জন্য শ্রমিকদের অনন্তকাল অপেক্ষায় থাকতে না হত তবে হয়ত ঘেরাও-এর জংলা ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমজীবীসমাজ বাধ্য হতেন না।

বস্তুত ঘেরাও-এর দ্বারা স্বয়ং মালিক প্রকৃতপক্ষে দুর্ভোগ ভোগেন না, দুর্ভোগ ভুগতে হয় মালিকের মোটা মাইনের কর্ম-চারীদের। মালিক মূলধন নিয়োগ এবং মুনাফা উত্তোলন করেন শিল্পসংস্থা থেকে বহুদূরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদে অবসর যাপন করতে করতে। শ্রমিকরা যাঁদের কাছে পান তাঁরাও বেতনভুক বিশেষ সুবিধাভোগী আর এক শ্রেণীর কর্মচারী মাত্র।

ঘেরাও-এর দ্বারা যে শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে তাও অস্বীকার করা যায় না। রাজ্য শ্রমমন্ত্রী শ্রীব্যানার্জী এই ব্যাহত উৎপাদনকে নিতান্ত নগণ্য বলেছেন। বাংলা কংগ্রেস নেতা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শ্রীসুশীল ধাড়া মশায় এই অপচয়ের পরি-মাণকে হিসেব করে জানিয়েছেন ঃ শতকরা পাঁচ ভাগ।

শোনা যাচ্ছে ঘেরাও আতঙ্কে শিল্প-পতিরা অনেকক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনায়

শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাত দিতে গররাজি হয়েছেন। অন্যদিকে আবার কতিপয় ক্ষেত্রে শিল্পসংস্থায় অত্যন্ত মোটা মাইনের অফিসার আমদানি করা হচ্ছে, যাঁদের প্রকৃত কোন কাজ নেই। সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে লে-অফ।

এই সমুদয় পরস্পর বিরোধী কার্য-কলাপ শিল্প সংকটকে ত্বরান্বিত করছে যে দিকে শ্রমিক সংস্থাগুলির নজর দেওয়া প্রয়োজন, সরকারেরও অবহিত হওয়ার দরকার।

'ঘেরাও' ছাড়াও মালিকদের সঙ্গে অন্যতর মীমাংসার পথও একই কালে আবিষ্কার করার প্রয়োজন। যেখানে লে-অফ করা হচ্ছে অথচ অন্যতর পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা গৃহীত হচ্ছে না এবং অর্থানুকূল্যের অভাব দেখানো হচ্ছে যখন মোটা মাইনের অফিসর আসছে দিল্লী বোম্বে থেকে, তখন শ্রমিক সংস্থা অন্যতর প্রকল্প উদ্ঘাটন করার ও অপচয় নিবারণ করার আওয়াজ তুলে মালিকগোষ্ঠীর অসহযোগী মনোভাবকে চিহ্নিত করতে পারেন ও ন্যায়সংগত পথে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

ঘেরাও আন্দোলনকে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করার অসংগতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার অন্যতম কারণ আছে। ছোট শিল্পসংস্থার ক্ষেত্রে ঘেরাও-এর চাপ বহু-ক্ষেত্রে মালিকের সাধ্যাতিরিক্তের ওপরও দাবি চাপাতে পারে, সেখানে ছোট শিল্পের অসুবিধাকে বিবেচনার আওতায় রাখাই সমীচীন। বিশেষ বাঙালীর শিল্প-উদ্যোগকে ঘেরাও-এর দ্বারা যাতে রুদ্ধ করা না হয় তার জন্য বিশেষ আবেদন রাখার আবশ্যক অনুভব করি। একে তো বাঙালীর উদ্যোগ শিল্পক্ষেত্রে ক্রমশই হটে যাচ্ছে, ঘেরাও-এর চাপে সেগুলির ফটক যাতে বন্ধ না হয় সেদিকে শ্রমসংস্থাগুলি দৃষ্টি রাখলে রাজ্য স্বার্থের প্রতি নজর রাখা হবে বলে মনে করি।

শিল্প সংকট কারুরই বাঞ্ছিত বস্তু নয়। মালিকপক্ষের অভিযোগ সারবত্তাহীন এইজন্যই যে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন সরকারই শ্রমিক লেলিয়ে শিল্পে সংকট সৃষ্টির মতো দুর্বোধ নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু মালিকগোষ্ঠী এতো কাল যে ধারণা পোষণ করে এসেছেন তা হল, দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকবেন তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে মালিকস্বার্থ রক্ষার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে জনস্বার্থ রক্ষার শপথ নিয়ে সম্মিলিত রাজনৈতিক দল-গুলিও যে চিরাচরিত কংগ্রেসী প্রথায় কেবলমাত্র মালিকস্বার্থেরই পরিপোষণ করে যাবেন এমন বে-আক্কেল ধারণা বরং তাঁদের পাল্টে ফেলাই উচিত। হুমকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে গেলে মালিক-স্বার্থের ওপরই যে সর্বাধিক আঘাত এসে পড়বে না এমন ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারেন না। সুতরাং মালিকস্বার্থ যদি তাঁদের বিশবছরী জংলী কানুন ত্যাগ করে শ্রমিকস্বার্থকেও গণনা করতে অসুখী বোধ না করেন তবে শ্রমিক সম্প্রদায়ই বা শুধু কেন ঘেরাও-এর ঝামেলায় নিজেদের জড়াবেন।

জংলা কানুন উভয়পক্ষেই অনুসৃত হবে যদি না উভয়পক্ষে সে কানুন প্রত্যাহারের শুভেচ্ছা দেখা দেয়। মালিক চিরকাল সুবিধাভোগ করে এসেছেন। কিন্তু অবাধ সুবিধাভোগ থেকে এবার তাঁদের নিবৃত্ত হওয়ারও সময় উপস্থিত হয়েছে, এই সত্য উপলব্ধিটি জাগলে শিল্প সংকট অনেকাংশে ক বলে বিশ্বাস।

(১৩

আন্তর্জাতিক

উ থাণ্ট ও জনসন

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি তবে সুরু হয়ে গিয়েছে, অথচ আমরা জানতে পারি নি? জানতে যদি না পেরে থাকি, অনুভব না করে থাকি আঘাতের বেদনা তো সে কেবল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের "নিরাপদ" দূরত্বের কারণে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, তার বিভীষিকা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে না বলে। আসলে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক স্তর বেয়ে চলেছি, বিবদমান সমস্ত পক্ষই এর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চালাচ্ছে।- কথাগুলি যে-সে ব্যক্তির উক্তি নয়, রাষ্ট্র-সংঘের স্বয়ং সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্টের কথা। রাষ্ট্রসংঘের সংগে যুক্ত সাংবাদিকদের কাছে তিনি এক মধ্যাহ্ন-ভোজে এই কথাগুলি বলছিলেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে কার্যত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তা প্রমাণ করার জন্যে সেক্রেটারী-জেনারেল কয়েকটা যুক্তি হাজির করেছেন যা খণ্ডন করা সহজসাধ্য নয়। ভিয়েতনাম নিয়েই যে এই যুদ্ধ বেধে যাবে বলে উ থাণ্ট আশঙ্কা করছেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ স্পেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছিল, তেমনি ভিয়েত-নামে হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। উ থাণ্ট বলেছেন যে, গত ১৪ই মার্চ তিনি যে শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর ভিয়েতনামের কথাই উ থাণ্ট বোঝাতে চাইছেন) কোন পক্ষই তা বিনা শর্তে পুরোপুরি মেনে নিতে রাজী হয় নি। সে প্রস্তাবের এখন মৃত্যু হয়েছে, তাই তিনি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শান্তি ফিরিয়ে আনার কোন কার্যকর প্রচেষ্টাই অন্য কোন পক্ষ করেন নি। বরং ইতিমধ্যে যুদ্ধের এলাকা বিস্তৃত হচ্ছে, হ্যানয়ে অবাধে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে।

উ থাণ্ট আবার বলেছেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ হলেই আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, এই মুহূর্তে, বর্তমান পরি-স্থিতিতে অন্য কোন উপায়ে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভিয়েত-নাম যুদ্ধ যদি আরো কিছুদিন চালিয়ে যাওয়া হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে বলে উ থাণ্ট মনে করেন। এর অর্থ অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যেভাবে নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিল, আজো যেন দুই পক্ষের মধ্যে সেই প্রস্তুতি চলেছে।

সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট আরো বলেছেন যে, সোভিয়েট ও মার্কিন জাহাজের মধ্যে সম্প্রতি যে সংঘর্ষ বেধেছিলো তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে। অর্থাৎ ভিয়েতনাম প্রশ্ন নিয়ে আমেরিকা শুধু চীনকেই চটায় নি, সোভিয়েট রাশিয়াকেও রুষ্ট করেছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী মিঃ ব্রেজনেভ সম্প্রতি বুলগেরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ভিয়েতনামে আমেরিকা যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়া তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না; আমেরিকা যদি এখানে যুদ্ধপ্রস্তুতি বাড়িয়ে যায়, তবে সোভিয়েট রাশিয়াও সমানভাবে তার জবাব দেবে। মিঃ উ থাণ্টও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হ্যানয়ের ওপর যেভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা যদি উত্তর ভিয়েতনামের সহ্যের বাইরে চলে যায়, তবে সে নিশ্চয়ই সোভিয়েট রাশিয়া, চীন ইত্যাদি থেকে তার সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে নেবে; সেক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া বা চীনের সংগে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আশঙ্কা তো রয়েছেই। সেক্রেটারী-জেনারেল তাঁর ভাষণের মাধ্যমে সাংবাদিকদের একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে চীনের মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও একটা মৈত্রীসূত্র রয়েছে এবং সে-সূত্র সামরিক। অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে 'পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি' এখনো অব্যাহত রয়েছে।

মিঃ উ থাণ্ট আবার বিনা শর্তে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের আবেদন করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে সাড়া দেয় নি। আগামী ২৩শে মে বুদ্ধের জন্মদিবস উপলক্ষে যুদ্ধবিরতির জন্যে উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে। কিন্তু তার সময়সীমা বাড়িয়ে শান্তি আলোচনার ক্ষেত্র রচনার পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল হয়েছে বলা চলে না। মিঃ উ থাণ্ট সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন রাষ্ট্র-সংঘের মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ গোল্ডবার্গ ৭৫ মিনিটের মধ্যে তার জবাব দিয়েছেন (যদিও এত অল্প সময়ের মধ্যে এই "নিষিদ্ধ" সম্মেলনের সংবাদ স্বাভাবিক-ভাবে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের পাবার কথা নয়)। মিঃ গোল্ডবার্গ বলেছেন ভিয়েত-নামের যে-মূল্যায়ন সেক্রেটারী-জেনারেল করেছেন তার সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমত নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার উ থাণ্টের ১৪ই মার্চের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব মেনে নেন নি বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা ঠিক নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন আরো তীব্রতা লাভ করছে। নিগ্রোরা এবার জনসনের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে,

নিগ্রো নেতা নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মার্টিন লুথার কিং সরাসরি প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েতনাম নীতিকে আক্রমণ করেছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব খুইয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে-ও বলেছেন যে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে কখনই

মার্টিন লুথার কিং

যাবেন না। নিগ্রোদের ওপর এঁদের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার ভিয়েতনাম নীতি পাল্টাবে বলে মনে হয় না, অন্তত মিঃ জনসন যতদিন গদিতে আছেন। তবে কি জনসনকেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার ঝুঁকি নিতে হবে?

গ্রীস ঃ

সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে, এবং এ-অবস্থা কতদিন স্থায়ী হয়, সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তবে ক্ষমতা আজ যাঁদের দখলে তাঁদেরই একজন বলেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরেই এ-রাজত্ব চলবে।

সামরিক শাসনের জন্যে অবশ্য ব্যবস্থা সবই গ্রহণ করা হচ্ছে। শুধু ৬ হাজার লোককে বন্দী করেই শাসন কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারেন নি, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল বলতে শুধু কমিউনিস্ট বা বামপন্থী দল নয়, বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সমস্ত দলই এখানে বে-আইনী ঘোষিত। রাজনৈতিক দলগুলি যে যুব সংগঠন রয়েছে সে-গুলিকেও বে-আইনী করে দেওয়া হয়েছে। নতুন গ্রীক সরকার ২৮০টি শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নও ভেঙে দিয়েছেন। এমন কি গোপন চক্রান্তের ভয়ে এখানে ফুটবল ম্যাচ, খেলা-ধুলো বা ঘোড়দৌড়ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের ৫২টি আঞ্চলিক সংগঠন নিষিদ্ধ, অন্তত ১২ জন মেয়র বরখাস্তের নোটিশ পেয়েছেন।

মজা এখানে যে, এ সমস্তই নাকি নতুন সরকার গণতন্ত্রকে রক্ষা করার তাগিদে করছেন। আভ্যন্তরমন্ত্রী ব্রিগে-ডিয়ার জেনারেল স্টিলিয়ানাস পাটাকস সদর্পে বলেছেন যে, যদি এখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো না হতো, তবে দেশে অরাজকতা দেখা দিত। নতুন সংবিধান রচনার জন্য ২০ জনের এক উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু তার আগে সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাত থেকে সামরিক পরিষদের হাতে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পাটাকসের মতে অভ্যুত্থানই বিপ্লব, যা নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। রাজনৈতিক দল বা সংগঠন কিম্বা বর্তমান সরকার-বিরোধীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, বর্তমান সরকারকে যাঁরা চ্যালেঞ্জ করবেন না তাঁদেরকে অবশ্যই রক্ষা করা হবে। তবে যে ষড়যন্ত্র এখানকার রাজতন্ত্র বা সরকারের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল তা সফল হলে গ্রীক জন-সাধারণের দুর্গতির অন্ত থাকতো না! অর্থাৎ সামরিক অভ্যুত্থানটি যে নির্ধারিত দিনে সাধারণ নির্বাচনকে ভণ্ডুল করে দেবার জন্যেই করা হয়েছিল তা সামরিক কর্তৃপক্ষ আর গোপন করছেন না। সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে নাকি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের যথেষ্ট দলিল আছে যা একত্র করলে ৬৬ খানা ৩ টনের লরী বোঝাই হয়ে যাবে!

রাজা কনস্টানটাইনের সঙ্গে সম্প্রতি একজন মার্কিন সাংবাদিকের এক সাক্ষাৎ-কারে জানা গিয়েছে যে, সামরিক অভ্যু-খানের কথা তিনি আগে কিছুই জানতেন না। অভ্যুত্থানের পর, অসামরিক সরকারকে গদিচ্যুত এবং প্রধানমন্ত্রী কানেলোপৌলস, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ প্যাপাণ্ড্রু, তাঁর ছেলে আন্দ্রিয়াস প্যাপাণ্ড্রু ইত্যাদিকে গ্রেপ্তার করার পরই রাজাকে ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। তা নয় হলো। কিন্তু রাজা কনস্টানটাইন এখন তো সেই সামরিক শাসনকেই আশীর্বাদ করছেন, সমর্থন করছেন। না করে তাঁর উপায়ও ছিলো না।' তরুণ রাজা কনস্টানটাইন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং কূটনীতি-সচেতন। কিন্তু তাই বলে তিনি কোন বিপ্লবী নন। তিনি জানতেন তাঁর রাজসিংহাসনই যদি না থাকলো তো রাজনীত-কূটনীতি দিয়ে কী হবে? তাই গদি হারাবার ভয়ে সামরিক অভ্যুত্থান বা নতুন সরকারকে সমর্থন তাঁ জানাতেই হলো।

অসুস্থ জর্জ প্যাপাণ্ড্রুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু চরম রাষ্ট্রদ্রোহি-তার অপরাধে আন্দ্রিয়াস প্যাপাণ্ড্রু এখন বিচারের সম্মুখীন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সামরিক অফিসারদের নিয়ে একটা গোপন সংগঠন 'আসপিডা' গড়ে তুলেছিলেন যার লক্ষ্য ছিলো রাজ-তন্ত্রের উচ্ছেদ।

সামরিক সরকার কতদিন স্থায়ী হয় বলা কঠিন, তবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। স্রেফ জবরদস্তি করে শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা যাবে না বিশেষ করে গণতন্ত্রের জন্ম-ভূমিতে। এ-শাসনের স্থায়িত্ব স্বল্প-কালীনই হতো, যদি রাজা নিরপেক্ষ থাকতেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার কাছে সাহায্যের জন্য নতুন সরকার আবেদন জানিয়েছেন, কায়দাটা অবশ্যি পুরনো ঃ যদি সাহায্য না দাও, তবে সোভিয়েট খপ্পরে চলে যাবে দেশ! কিন্তু গণ-তন্ত্রকে নির্বাসন দিয়ে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করে নতুন গ্রীক সরকার কি অন্যান্য দেশের সাহায্য, সমর্থন বা সহানু-ভূতি অর্জন করতে পারবে? সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে ন্যাটো (গ্রীস ন্যাটো-ভুক্ত দেশ), সি-আই-এ ইত্যাদির

কনস্টানটাইন

হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাইরের ঘরের বিরোধিতা যখন সমানে চলছে তখন গ্রীক সরকার তার মোকাবিলা করতে যে আরো নিপীড়ন নির্যাতনের আশ্রয় নেবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমার জন্ম

জোড়াসাঁকোর ভুবনমোহনের বৃহৎ সংসার জমায় কর্দমাক্ত পথে একঘেয়ে চালে চলতে লাগল যেমন করে চলে অত্যধিক বোঝাই করা গরুর গাড়ি গ্রামের কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। আমাদের বাপ-মায়েরও দিনগুলি কাটতে লাগল যেন শর-শয্যায়। দেখতে পাচ্ছিলেন যে জ্যেঠা-মশায়ের ও জ্যেঠিমার কষ্ট হচ্ছিল সংসার চালাতে কিন্তু টাকা রোজগার করে এনে তাঁদের সাহায্য করার ক্ষমতা আমাদের বাবার ছিল না। এটর্নীশিপ পরীক্ষা পাশ করে রোজগার সুরু করতে অনেক বছর লাগে। সুতরাং গতর খাটিয়ে দাদাকে সাহায্য করা ছাড়া বাবার আর গত্যন্তর ছিল না। মায়ের দশাও তা-ই।

এদিকে আমার ঠাকুমারও বৃদ্ধবয়সে নাতি না হওয়ার মন খারাপ যে তাঁর কর্তার বংশটা বুঝি লোপাই পায়। মায়েরও তখন বয়স বিশে পৌঁছে গেছে। ঠাকুমা বিড়বিড় করে ভাগ্যদেবতার উপর দোষারোপ করতেন যে সোনা বৌয়ের আর সন্তান হবে না। মাঝে মাঝে দিদিদের কাছে যাবার আর একটা বিয়ে দেবার ইঙ্গিতও নাকি দিয়েছেন। কথাটা মায়ের কানে না এসে যায় না। মনে মনে যে মা প্রমাদ গুণতেন না তা-ই বা কে বলবে। সমস্ত সংসারের সারা দিনের খাটুনীর পর শরীর যখন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ত তখনও এই দুর্ভাবনা যে মায়ের নিশীথ শয়নকে বিনিদ্রায় ভরে তুলত তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া দরসংবাদ গোপন থাকে না। এই রকমের ঘটনার সম্ভাবনার ইঙ্গিত আমাদের মামাবাড়িতেও পৌঁছল। দাদা-মশায় কৈলাসচন্দ্র তখন বেঁচে। আমাদের বাড়ির কর্তারা খবর পেলেন এইরকম একটা কিছু অঘটন ঘটলে তাঁরা, আমার মামা-বাড়ির কর্তারাও, পাল্টে জবাব দেবেন। অর্থাৎ আজকালকার রাজনৈতিক ভাষায় বলা চলে যে এঁরা এঁদের ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে যদি তাঁদের মেয়ের অমঙ্গল করেন তবে তাঁরাও প্রতিশোধ (রিপ্রাইজেল) হিসেবে তাঁদের ছেলেকে আবার বিয়ে দিয়ে এঁদের মেয়েকেও ফ্যাসাদে ফেলবেন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার।

আগেই বলেছি, মধ্যের বাড়ির কালী-মোহন ও দুর্গামোহনের বিমাতার গর্ভে কাশীশ্বরের একটি কন্যা হয় যার নাম রাখা হয়েছিল শ্যামাসুন্দরী। তারপরই কাশীশ্বর মারা গেলে সেই বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ হয় দুর্গামোহনের নির্বন্ধাতিশয্যে। সেই শ্যামাসুন্দরীর বিবাহ হয়ে তাঁর গর্ভে অনেক সন্তান-সন্ততি হয়—যেমন ছেলে ললিত, যতীন ও টুকু এবং কন্যা প্রমদা, টেঁপী এবং মন্টু। এই কটি ছেলেমেয়ের মামা-বাড়ি বলতে ছিল, জ্যেঠামশায় ভুবন-মোহনেরই বাড়ি। এঁরা খুব আসা-যাওয়া করতেন জ্যেঠামশায়ের বাড়িতে একেবারে আপন ভাগনে-ভাগনীর মতই। ললিত-দাদা কাজে খুব উন্নতি লাভ করে আবগারী একসাইজ কমিশনার হয়েছিলেন। টেঁপী-দিদির বিয়ে হয়েছিল উকিল প্রমথ সেনের সঙ্গে এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে অমিয় (পাঁচু) কলকাতা হাইকোর্টে বেশ নামকরা এটর্নী হতে হতেই মারা গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা ছিল। প্রমদা-দিদির বিয়ে হয়েছিল বিদ্যাগাঁয়ের মহিম দাশগুপ্তের একমাত্র ছেলে যোগেন্দ্র দাশ-গুপ্তের সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার তেমন জানা-শুনা হয় নি। এখন হয়েছে কি—ঐ যোগেন্দ্র দাশের মা ছিলেন আমাদের মাতা-মহ কৈলাসচন্দ্রের আপন বড় বোন অন্নদা। অর্থাৎ আমাদের মায়ের সাক্ষাৎ পিসির একমাত্র ছেলে হলেন যোগেন্দ্র দাশ। এই যোগেন্দ্রমামাকে অনেক দেখেছি। অবন্ধা-পন্ন ঘরের একমাত্র ছেলে যোগেন্দ্রমামা দেখতে বেশ সুপুরুষই ছিলেন। রঙ গৌর-বর্ণ এবং সেকালের ফ্যাসান মতে দাড়ি-গোঁফ তাঁর ছিল। তখনও মটর গাড়ির আমদানী তেমন হয় নি এবং তার চলও ছিল কম। কলকাতার ঠিকে গাড়ি পাওয়া যেত মেলা—বন্ধগাড়ি এবং ফিটনগাড়ি। যোগেন্দ্রমামার সখ ছিল খোলা গাড়িতে বসে শহরময় এবং বিশেষ করে গঙ্গার ধারে বেড়ান। যোগেন্দ্রমামা কলকাতায় এলেই আমাদের গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং আমাদেরও তাতে খুব ভাল লাগত। এই প্রমদাদিদির সঙ্গে যোগেন্দ্রমামার বিয়ে হওয়ায় তিনি সম্পর্কে আমাদের মামী হলেন। কিন্তু আমরা বরাবরই তাঁকে প্রমদাদিদি বলেই ডাকতাম। তিনি দিদি ডাকটাই পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে ঐ ডাকে তাঁর মামাবাড়ির স্পর্শটুকু তিনি পান। এখন হয়েছে কি যে ঐ প্রমদাদিদিরও কোনো ছেলেপিলে হয় নি। আমাদের মামাবাড়ির সবাই জানতেন যে প্রমদাদিদিকে আমাদের বাড়ির সবাই খুব ভালবাসতেন আপন ভাগনীর মত। সুতরাং তাঁদের খুব সুবিধে হোলো। দাবাবড়ে খেলায় যেমন 'চেক' দেয় তেমনি যোগেন্দ্রমামাকে দিয়ে আমাদের বাড়ির চাল, বাবার আর একটা বিয়ে, পণ্ড করে বাজিমাত করবে। এই কারণেই হোক কি, যে কোনো কারণেই হোক খেলাটা অমীমাংসিত রয়ে গেল। কোন পক্ষই নিজের ছেলের দোবারা বিয়ে দিলেন না।

ওদিকে দাদাবাবু বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি ও তাঁর সতীর্থ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত উভয়েই ১৮৯২ খৃস্টাব্দে পরীক্ষায় বসলেন। কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দেবার পর দাদাবাবু সেবার অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বসলেনই না—কেন না তিনি মনে করলেন যে তেমন যুৎসই উত্তর দিতে পারেন নি। পরীক্ষাগুলি দিয়ে ফেললে হয়ত পাশই হয়ে যেতেন এবং তাঁর জীবনের গতি তাহলে অন্যপথেই ধাবিত হোতো। জ্ঞান গুপ্ত একাধিকবার তাঁকে পরীক্ষাগুলি শেষ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দাদাবাবু তৎসত্ত্বেও সেবার আর পরীক্ষায় বসলেন না। জ্ঞান গুপ্ত সাহেব পরে

পরীক্ষা দিয়ে পাশ হলেন অর্থাৎ আই সি এস চাকরীতে ঢুকে গেলেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে দাদাবাবু দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পরীক্ষাটা ভালই দিয়েছেন এবং পাশও হবেন। এই-খানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ-ফেল ফাকে বলে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এমন নিয়ম ছিল না যে অত নম্বর পেলে পাশ এবং তার কম পেলে ফেল। পরীক্ষাটা খুবই শক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক ছিল। প্রথমে প্রতিযোগীদের নাম তাদের পাওয়া নম্বর অনুসারে সাজিয়ে একটি তালিকা করা হোতো। সে বছর সরকারের যে কটি লোক চাকরীতে নেওয়া দরকার সেই তালিকার উপর হতে নিচে সেই কয়টিকেই নেওয়া হোতো। যে কয়টিকে নেওয়া হোতো—বলা হোতো যে তারা সেবার পরীক্ষায় পাশ করেছে। অন্য সকলে যারা চাকরী পেল না তারা সেবার ফেল হোলো এই ধরে নেওয়া হোতো। এমন প্রায়ই হোতো যে এবছর যত নম্বর পেয়েও একজন চাকরী পেল না অতএব ফেল হোলো আর পরের বছর তার চেয়ে কম নম্বর পেয়েও লোকে চাকরী পেল বলে সে পাশ হয়েছে বলা হোলো। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে দেখা গেল যে সেই তালিকায় দাদাবাবুর ঠিক উপর পর্যন্ত যে কটি ছেলের নাম ছিল সরকারের ঠিক তত কটি লোকই নেবার প্রয়োজন হোলো। দেখা-দ্রষ্টব্য মনে হতেই পারে যে চিত্তরঞ্জনকে বাদ দেবার জন্যেই তাঁর উপর যে কয়জন ছিল তাঁদেরই নেওয়া হোলো। ধরে নেন দাদাবাবুর উপরে পঞ্চাশ-জন ছিল এবং সেই পঞ্চাশজনকেই নেওয়া হোলো সেই পঞ্চাশজন পাশ হোলো। এবং দাদাবাবু থেকে আরম্ভ করে বাকী যাঁরা নিচে ছিলেন সবাই ফেল করলেন সেবার। দাদাবাবুর মনে সরকারের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহের কারণ হোলো যখন তিনি দেখলেন যে সেই প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে থেকে একজন মেডিক্যাল পরীক্ষায় পাশ হোলেন না এবং একজন স্বেচ্ছায় চাকরী পেয়েও নিলেন না। প্রথমেই সরকার স্বীকার করেছেন যে তাঁদের সে বছর পঞ্চাশজন লোক নেওয়া প্রয়োজন। অতএব সেই প্রথম পঞ্চাশ-জনের মধ্যে থেকে দুজন যখন কেটে গেল তখন সেই তালিকার বাকী ছেলেদের থেকে উপর থেকে দুজন নেওয়া উচিত ছিল নিয়মানুসারে। কিন্তু তা করতে গেলেই দাদাবাবুকে নিতে হয়। সেটা বোঝাই গেল সরকারের মতলব ছিল না। সুতরাং তাঁদের বলতেই হোলো যে আটচল্লিশজন নতুন লোকেই তাঁদের কাজ চলবে। সুতরাং দাদাবাবুর ধারণাটা যে ভিত্তিহীন তা কেমন করে বলব? দাঁড়াল এই যে সেবারের পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের মধ্যে দাদাবাবুই সেরা অর্থাৎ প্রথম। তিনি বাড়িতে তার পাঠালেন—'ফেইল্ড ওয়ান গ্লেস আউট জলারী'। আসল কারণটা ছিল এই। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে বিলেতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে ইণ্ডিয়ান হোম রুলের সম্বন্ধে অনেকবার বাকবিতণ্ডা হয়। বিলেতের প্রগতিশীল লিবারেল দল ভারতের হোম রুলের স্বপক্ষে এবং স্থিতিশীল কন্সারভেটিভ দল ছিল তার বিপক্ষে। দুই দলই মিটিং করে নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ প্রমাণ করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেল। দাদা-বাবু সেই রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন এবং যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের ভাগিদে ভারতের দাবি সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে এবং চড়া গলায় অনেক জায়গায় বক্তৃতা দেন লিবারেল দলের পক্ষ হয়ে। এটা রাজশক্তির কাছে যে বেয়াড়া ঠেকবে তা সহজেই অনুমেয়। ফল হোলো যে লিবারেল পার্টি সেবার ভেটে জিতল বটে কিন্তু আই সি এস পরীক্ষায় দাদাবাবু ফেল হলেন, কেন না সরকারী খাতায় তাঁর নামে ঢ্যাড়া পড়ে গিয়েছিল রাজদ্রোহী বলে। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার-পতি স্যার বিচার্ড গার্থ সাহেব কালী-মোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহনকে ভাল রকমেই জানতেন। তিনি ভুবনমোহনকে লিখলেন—

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু তোমার ছেলের ওলডহ্যামের জ্বালা-ময়ী বক্তৃতার সব ভেস্তে গেল। আমি ইণ্ডিয়া আফিসকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না"

বাড়িতে সবাইয়ের মন যে খুবই খারাপ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সেবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দাদাবাবু পাশ করলে দেশ একটি উঁচুদরের জনহিতকর হোমোশাসক এবং যদি তিনি চাকরী বজায় রাখতে পারতেন তবে এমন কি একজন ন্যায়নিষ্ঠ কমিশনারও পেত। কিন্তু দেশ একটি ঊর্দ্ধখচিত্ত, উৎসর্গিতপ্রাণ, 'দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন' হারাত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দাদাবাবু ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবার জন্যে ভর্তি হলেন ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের গোড়ায়। তারপর সেই বছর ২৬শে আশ্বিন ১৩০১ বঙ্গাব্দের (ইংরেজী ১লা অক্টোবর ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে) কলকাতার ভবানীপুরেই ১৪৭ নং বসা রোড সাউথ ভবনে যেখানে জ্যোতামশায়ের আশ্রয়ে বাবা মা তখন ছিলেন সেই বাড়ির দোতলার একটি সরু ফালি ঘরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম চোখ মেলেছিলাম এই পৃথিবীতে। মায়ের কাছে শুনেছি যে সেই দিনই নাকি দাদাবাবু প্রথম টাকা পান কি একটা মফস্বলের ফৌজদারী মামলায় এবং সবটাই তিনি দিয়েছিলেন জ্যেঠিমার হাতে। জ্যেঠিমা তারই থেকে কিছু টাকায় আমার জন্যে কোমরে না গলায় কি একটা গহনা, যা সেকালে সদ্যজাত শিশুরা পরত তাই, গড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর আশীর্বাদের নিদর্শন স্বরূপে।

এইখানে একটা ঘটনার কথা যা মনে পড়ছে তা বলে রাখি। বহু বছর পরে আমি তখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছিলাম। আমার সহধর্মিণীর এক মাসতুত বোনের কন্যা সুজাতা, ডাকনাম আপু এঁদের সঙ্গে আপন ছোট বোনেরই মত মানুষ হয়েছিলেন এঁদের মায়ের কাছে এবং তিনি এঁদের দিদি বলেই জানতেন এবং ডাকতেন। সেই আপুর প্রথম সন্তান হবার সময়ে যখন কঠিন বেদনা হয় তখন রাত দুপুরে ডাক্তার ডাকতে যেতে হয়ে-ছিল আমাকে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের বড় ডাক্তার তখন ছিলেন খ্যাতনামা সুবোধ মিত্র মশায়। তখনো ১৪৭ নং বসা রোডের বাড়ি ভেঙে গোখেল্কা রুদ্ধ হয় নি। সুবোধ মিত্র মশায় ১৪৭ নং বসা রোডের দোতলায় পরিবার নিয়ে বাস করতেন। সেই রাত দুপুরে দরজায় আঘাত করলে একজন ভৃত্য আমাকে উপরে নিয়ে রোগীদের অপেক্ষা করবার ঘরে বসিয়ে খবর দিতে গেল ডাক্তার সাহেবকে। ডাক্তার সাহেব খবর পেয়ে উচ্চগলায় বললেন—'দাস সাহেব, একটু বসুন, আমি এলাম বলে।' আমি বললাম—'ঠিক আছে।' আমি বসে অপেক্ষা করতে গিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছি। হঠাৎ যেন চোখের উপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। একি? এই ত' সে ঘর যেখানে আমি প্রথম মায়ের কোলে এসেছিলাম। কি রকম একটা আবেশ যেন পেয়ে বসল আমার মনটাকে। এমন সময় ডাক্তার হন্তদন্ত হয়ে ঢোকায় আমার ধ্যান ভঙ্গ হোলো। তাঁকে ব্যাপারটা না বলে পারলাম না। তিনিও যেন কেমন হক-চকিয়ে গেলেন। বললেন—"তাই নাকি? সত্যি? কি আশ্চর্য।" ডাক্তার নিয়ে গেলাম ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে আমার শ্বশুরবালয়ের নতুন প্রসূতি ঘরে। কিন্তু বহুক্ষণ ফুটে রইল আমার মানসপটে বহুদিন আগেকার প্রায় ভুলে যাওয়া সেই আবেকটি প্রসূতি ঘরের ছবি এবং আমার সমস্ত হৃদয়-মন ভরে উঠল আমার মুখের পানে চাওয়া আমার মায়ের চোখদুটির আনন্দোজ্জ্বল করুণার বিগলিত ধারায়।

আমার জন্মের দিন থেকেই ঘটে গেল আমার ঠাকুরমার বংশলোপের আশঙ্কা

এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর পারলৌকিক পরিত্রাণের আশা। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—'কর্তাই আইছেন।' ঠাকুর্দা গোপীমোহন মারা গিয়েছিলেন বছর দেড়েক আগে। তাঁর আশীর্বাদী সফল হোলো মায়ের জীবনে—'তর হইব, দেখিস তর হইব—আমি কইয়া গেলাম তর হইব।' আমাকে দেখতে পাবেন না বলে ঠাকুর্দার মনে কষ্ট হয়েছিল। আমি আমার অন্ধ ঠাকুর্দাকে দেখতে পাই নি জীবনে—এই আক্ষেপ আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে পীড়া দিয়েই চলেছে।

আমার জন্মের পর থেকেই আমার দেহটাকে সহনশীল ও পোক্ত করবার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন আমার ঠাকুমা। প্রথম ব্যবস্থাটাই হোলো রোদে খুব ঘষে ঘষে সরষের তেল গায়ে মাখিয়ে, মাথাটা টিপে টিপে গোলাকৃতি করবার নিত্য চেষ্টার পর একটা বেশ বড় কাঠের পিঁড়ির উপর সূর্যের দিক থেকে অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে রোদে ফেলে রাখা। কবিবর ডি এল রায় যে মজার গান বেঁধে-ছিলেন—'করে দিল কালো ছেলে রোদে ফেলে মাখিয়ে মাখিয়ে তেল'—সেটা আমার ঠাকুমার কৃপায় খেটে গেল আমারি বেলায়। তবে সুফল যে হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। আমার মাথার সুডৌল গড়নটির জন্যে মা সর্বদাই তাঁর শাশুড়ির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। গায়ের রঙটা পাকা কালো হয়ে গেল বটে কিন্তু দেহটাও যে খুবই পোক্ত হয়ে উঠল তাতেও ভুল নেই। আমি আজ যে বয়েস পেরেছি তাতেই ঠাকুমার ব্যবস্থার উৎকর্ষের প্রমাণ হয়ে যায়। আমার সহধর্মিণীর এই ব্যবস্থা-টার উপরে যে প্রগাঢ় আস্থা হয়ে গেছে তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাদের মেয়ে কাজল ও আমাদের ছোট ছেলে সুহৃদ (মাণিক)-এর দুই মেয়ের উপর তার প্রয়োগে। একদিন মাণিকের ছোট মেয়েকে এ রকম শক্ত কাঠের পিঁড়ির উপর কাঁথা চাপা দিয়ে রোদে দেখে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার বললেন—'এ ব্যবস্থা কে করেছে?' আমার স্ত্রী আমার ঠাকুমার দোহাই দিয়ে বললেন যে তাঁরই ব্যবস্থামত এ কাজ করা হয়েছে। ডাক্তারটি বললেন—'এটা সত্যি সত্যি খুব ভাল—শক্ত কাঠের উপর সদ্যজাত শিশুদের শোয়ালে তাদের শিরদাঁড়াটা শক্ত হয় এবং শরীরটাও সহন-শীল হয়।' বাগে পেয়ে আমার স্ত্রী তক্ষুণি বললেন—'ব্যবস্থাটা যদি ভালই এবং আপনারা যদি ভালই মনে করেন তবে আপনারা এই ব্যবস্থা দেন না কেন?' ডাক্তারটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'দেখুন, আজকালকার সৌখিন মায়েরা এ রকম স্পারটান ব্যবস্থা পছন্দ করেন না. প্র্যাকটিসটা ত' খোয়াতে পারিনে।' বেশ হাসাহাসির মধ্যেই আলোচনাটা শেষ হয়ে গেল।

আমাকে তেল মাখিয়ে রোদে ফেলে আমার ঠাকুমা নাকি হাপুস চোখে চেয়ে থাকতেন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন সৌকুমার্যের দিকে। ঠিক সেই সময়ে মধ্যের বাড়ির কালীমোহনের নাতনী, মনোরঞ্জনদার একমাত্র কন্যা কুসুম-কুমারীরও একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হয়েছিল ১৪৮নং রসা রোডের বাড়িতে। ছেলেটি তার বাপ সত্যেন রায়ের উজ্জ্বল রংটি পেয়েছিল। বড় হয়ে দেখেছি তার কমনীয় গৌর মূর্তি। সেই ছেলেটি আর আমি হয়েছিলাম দিন সাতেক আগে পিছে। বছর বার ছোদ্দর মধ্যেই সে মারা যায়। তখন ১৪৮নং এবং ১৪৭নং বাড়িতে ভেতরে ভেতরেই আসা-যাওয়া যেত খোলা ছাদের উপর দিয়ে। ছুটকীদিদির (ঊর্মিলা)-র মুখে শুনেছি যে আমার ঠাকুমাকে টালাবার জন্যে তাঁরা যখেরা বলতেন—'দেইখ্যা আইলাম এ বাড়িতে কুসুমের পোলারে—কি সুন্দর টুকটুইক্যা গায়ের রঙ।' বলেই একটু থামতেন এবং যখন বুঝতেন যে কথাগুলি আমার ঠাকুমার মনে খিতিয়ে বসেছে তখন যেন আচমকা আবার বলতেন—'সোনাদিদিমা গো—তোমার নাতি কিন্তু বড় কালা।' কথা দুটোই নিছক সত্য এবং অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু আমার ঠাকুমা নাকি যেন কিছুই আক্ষেপের কারণ নেই এমনি গলায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন—'সোনায় আলুটে কি ব্যাঁকা আছে।' কথাটার মধ্যে ঠাকুমার মনের অনেকখানি নিহিতার্থ হয়ত ছিল। তাঁর নাতিটি যে খাঁটি সোনা এবং সোনার আঙটি বেঁকে গেলেও যে সোনায় দাম এক রতিও কমে মা—এই সহজ কথাটা বেশ সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। আমি যখন একেবারে ছোট বড়দিদি (অমলা) আমাকে নাকি তাঁর বুকের উপর ফেলে থাবড়িয়ে থাবড়িয়ে গান করে ঘুম পাড়াতেন একথা মায়ের কাছে অনেকবার শুনেছি। বড়দিদিও পরে তাঁর জীবনের শেষদিকে আমাকে খুব কাছে ডেকে নিয়ে আমার ছোট বয়সের কথা বলতেন।

আমাদের মেয়ে কাজলের বিয়ের সময়ে ছুটকীদিদি আমাদের রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে আসতেন ও বেশ কিছুক্ষণ থাকতেন এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুরনো দিনের কত গল্পই না করতেন। বলতেন—'জানিস তোরা? খুড়িমা তখন আমাদের বাড়ি থাকতেন। খোকা হয় নি। সোনাদিদিমা ত' কাকাকে আর একটা বিয়ে দেবার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। খুড়িমা একেবারে মাথা গুঁজে কাজ করে যেতেন। মুখে নাই রা—সবার মন জুগিয়ে চলাই তখন খুড়িমার সাধনা। তারপর যখন খোকা হোলো—আর খুড়িমাকে পায় কে। একেবারে সিংহ অবতার।' আমরা ভাইবোনেরা হেসে ফেলতাম। আমাদের ছেলেপিলেরা ত' হেসে কুটি-পাটি তাদের ঠাকুমার এই হঠাৎ পরিবর্তনের কথা শুনে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। মা আমাকে কোলে নিয়ে গেলেন বাপের বাড়ি হাসাড়ায়। ছোট বয়সের বন্ধু-বান্ধবদের এবং গুরুজন স্থানীয় লোকদের ছেলে দেখাবার আকাঙ্ক্ষাটা যে একটুকুও ছিল না তা না-ও হতে পারে। তখন আমার দাদামশায় কৈলাসচন্দ্র জীবিত ছিলেন। তার অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান। সেবার দাদামশায় হাসাড়ায় ছিলেন কিনা

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। The House of the Tagores ২·০০
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী। Studies in Aesthetics ১০·০০
Tagore On Literature and Aesthetics ৮·৫০
ডঃ ননীলাল সেন। A critique of the Theories of Viparyaya ১৫·০০
ডঃ মানস রায়চৌধুরী। Studies in Artistic Creativity ১৫·০০
শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ। রবীন্দ্র-সুভাষিত। ১২·০০
'হরিশ্চন্দ্র সান্যাল। চৈতন্যোদয়। ২·৫০ জ্ঞানদর্পণ। ৩·০০
ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। ৬·০০
ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। ৫·০০

॥ বন্দস্থ ॥

শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন। Indian Classical Dances
'গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত চন্দ্রিকা
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীনির্মলকুমার বসু। গান্ধী-মানস।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, ১৩৩এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ

জানি না। কিন্তু আমার দাদামশায়কে আমার একেবারেই স্মরণ নেই। সেয়ার যখন হাসাড়ায় ছিলাম তখনকার কোন ঘটনাই আমার মনে নেই। তবে শুনেছি সেই সময়ে সেখানে তিনটি ঘটনা ঘটে ছিল। প্রথমটি আমার সোনা-মামা (অতুল) আমাকে দাঁড়িয়ে কেলে করে নাচাতে নাচাতে হঠাৎ হাত থেকে আমাকে ফেলে দিয়েছিলেন। পড়ে যাবার কারণটা খুব সম্ভবত আমারই চাঞ্চল্য। যাই হোক, পড়েছিলাম নাকি একটা চৌকাঠের উপর। রক্তপাত এবং আমার কান্নার সোনামামা বেচারী ত' অপ্রস্তুত। সেই ক্ষতচিহ্নটি আমার বাঁ চোখের বাইরের কোণার নিচে এখনো বেশ স্পষ্ট হয়েই আছে। পরে সোনামামা এ' দাগটা দেখিয়ে হেসে বলতেন—কি অপ্রস্তুতই না আমারে করছিলি তুই।' দ্বিতীয় ঘটনাটা হোলো এই যে আমার ঠাকুর মামা (যোগেশ)-এর ছোটমেয়ে ছুটকী আমার বয়সী। আমরা দুজনেই তখন হামাগুড়ি ত' দি-ই, একটু একটু হাঁটতেও শিখেছি। ছুটকীর কি কি সব খেলনা ছিল। আমি মেয়ের ঘরের প্রথম নাতি। সুতরাং আমার উপরে তখন সবাই সদয়। তাঁরা আমাকে এ' খেলনার থেকে কি একটা খেলনা দিয়েছিলেন। আমি একাগ্র মনে সেটি নিয়ে খেলছি। এমন সময় দেখি ছুটকী আমার দিকে সজোরে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। বুঝলাম খেলনাটা কেড়ে নেবার মতলব। আমিও খেলনাটা হাতে করে হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে সুরু করলাম। এই নিয়ে পরে ছুটকীর সঙ্গে কত হাসাহাসিই না হয়েছে।

তৃতীয় ঘটনা—আমার বোন খুকীর জন্ম। খুকী আমার চেয়ে এক বছর আট মাসের ছোট। খুকী জন্মাবার কিছুদিন আগেই আমাদের ঠাকুমা কলকাতায় মারা গেলেন। মরবার সময় যন্ত্রণা তাঁর দেবতার কাছে চাওয়া নাতিকে না দেখে মরতে কত না কষ্টই পেয়েছিলেন।

আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। তখন দাদাবাবু পাগলপাত করে টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছেন। তার উপর তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল জেঠামশায়ের বহু ঋণের দায়িত্ব। নতুন হাণ্ড নেটে সই করতে হোলো। কিন্তু দেবার সময় টাকার যোগাড় নেই। অবশেষে পিতা-পুত্রের দেউলিয়া আদালতের শরণ নিতে হোলো ১৬ই জুন ১৮১৬ খৃস্টাব্দে। সবে কাজ করতে সুরু করে জুনিয়ার ব্যারিস্টারের দেউলিয়া নাম যে কি রকম মারাত্মক প্র্যাকটিসের পক্ষে তা হয়ত সবাই বুঝবেন না। সেই সব দুঃখ কাটিয়ে কি করে দাদাবাবু যে মাথা উঁচু করে উঠলেন সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ভগবানের দয়া না থাকলে এমনটি হয় না। সেই সব দিনের কথা আগেই বলেছি এবং পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর দাঁড়াল এই যে জেঠামশায়ের এটর্নী আফিস বন্ধ করতে হোলো। জেঠিমাকে ও দিদিমণি—যিনি তখন বিধবা হয়েছেন—তাঁকে ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে জেঠামশায় তখন পুরুলিয়ার 'রিট্রিট' বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়ির 'রিট্রিট' নাম সার্থক হোলো। বাবার আর্টিকেল্ড ক্লার্কশিপের মেয়াদ তখন পূর্ণ হয়েছে। পরীক্ষাগুলি দিয়ে পাশ করলেই জেঠামশায়ের মক্কেলদের নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসতে পারতেন। কিন্তু বাবার মন এমন ভেঙে গিয়েছিল যে হাইকোর্ট পাড়ায় যেতে তাঁর মন আর কিছুতেই সায় দিল না। তিনি এটর্নীশিপ পরীক্ষাগুলি না দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ঠিকে গাড়ির ডিপার্টমেণ্টে একশ পঁচিশ টাকার ইন্সপেক্টরের চাকরিতে ঢুকলেন। মুখে বললেন যে তাতেই ছোট সংসার চলে যাবে। তখনকার দিনে একশ পঁচিশ টাকার দাম একশ পঁচিশই ছিল অর্থাৎ টাকায় চার আনা হয় নি। ছোট-খাট সংসার সত্যিই বেশ চলে যেত। চাকরি পেয়েই বাবা একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে উঠে গিয়ে আলাদা সংসার পাতলেন মাকে, আমাকে আর খুকীকে নিয়ে। মায়ের কাছে শুনেছি যে সেই সন্তাগণ্ডার দিনে বাবা আফিসে যাতায়াতের জন্যে একটা ছোট টমটম গাড়ি ও একটা টাট্টু ঘোড়াও কিনে ফেলেছিলেন। সন্ধ্যার সময় বাবা আফিস থেকে টমটম হাঁকিয়ে বাড়িতে এসে নামতেন মা তখন আমাকে আর খুকীকে কাপড় পরিয়ে তৈরি রাখতেন যাতে করে সহিস যখন ঘোড়াটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে খানিকটা হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে আনবে তখন আমরা দুই ভাই-বোনে একটু গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে আসতে পারি। এটা আমার মনে নেই কিন্তু বড় হয়ে যখন মা'র কাছে এই টমটম চড়ার গল্প শুনতাম তখন মনে খুব সাধ হোতো যে বড় হয়ে আমিও একটা মস্ত ঘোড়া ও টমটম গাড়ি কিনে নিজে চালিয়ে আফিসে যাব। আমি বড় হয়ে আফিসে যাবার যোগ্য যখন হলাম তখন কলকাতা ভরে গেছে মোটর গাড়িতে। তাছাড়া শুনলাম যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নাকি দেখা গিয়েছিল যে ঘোড়ার দানা অত্যন্ত দুর্মূল্য এবং এমন কি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার অনেক ধনেদী বাবুদেরও নাকি ঘোড়া উত্তর ভাবতে বেচতে হয়েছিল। সুতরাং মনের ইচ্ছে মনেই রয়ে গেল—টমটম চালান আমার ভাগ্যে আর ঘটে উঠল না।

অল্প কিছুদিন পরে বাবাকে এই ভাড়াটে বাড়ি থেকে উঠে গিয়ে কালী-মোহনের বাসগৃহে ১৪৮নং রসা রোডের একটা অংশে যেতে হোলো। সেই সময়ে কালীমোহনের মাতুলী, মনোরঞ্জন দাদার মেয়ে কুসুমের সঙ্গে ভোলাদাদার আমলা চলেছে—ভোলাদাদার কালীমোহনের দত্তক পুত্র বলে দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে। ভোলা-দাদার তরফ থেকে কালীমোহনের ঐ বসতবাড়ির দখল রাখা নাকি আইন-গতভাবে প্রয়োজন ছিল। বাবা সপরিবারে গিয়ে সেই প্রকাণ্ড বাড়ির ওপর দিকের বড় হল ঘরটাতে গিয়ে উঠলেন। তখনো সে বাড়ির সদর গাড়িবারান্দা ছিল পশ্চিম-দিকে রসা রোডের উপর এবং দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা ছিল উত্তর-পশ্চিম কোণায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই ছিল একটি প্রকাণ্ড বারান্দা। সেই বারান্দার সামনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে চলে গেলে পুবের দিকের প্রায় শেষের দিকেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় পৌঁছলেই বাঁ দিকে ছিল একটি ফালি বারান্দা যেটা গিয়ে পড়ত ঐ হল ঘরের দরজায়। বাড়িটি ছিল সেকালের রেওয়াজ মত চকমেলানো। হল ঘরটিতে এককালে শুনেছি কলকাতার বহু গণ্য-মান্য লোকের সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠত। বঙ্কিমবাবু, হেমবাবু অনেক সাহিত্যিক নাকি সেখানে পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন। ঘরখানা ছিল বেশ লম্বা—উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করে বেশ বড় বড় জানালা ছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে ভেতরের বাঁধান উঠানটি এবং উঠানের দক্ষিণ দিকের বারান্দাটা দেখা যেত। এই হল ঘরটায় তখনো পুরনো আমলের দু-একটা আসবাবপত্র ছিল। একটা ছিল মস্ত বড় পাথরের সরু টেবিল পুবের দেয়ালের গায়ে। সেই টেবিলের উপর ছিল প্রায় ছাদ পর্যন্ত পেল্লায় একটা সোনার জলের চওড়া ফ্রেমে বাঁধান আয়না। এই আয়নাটা আমার বেশ মনে পড়ে, কেন না এর সামনে দাঁড়িয়ে নাচানাচি, মুখ ভেংচি অনেক করেছি। আর একটা আসবাবের কথা বেশ মনে আছে সেটার মজার চেহারার জন্যে। সেটা বাবা মায়ের জন্যে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা একটা কাঠের মস্ত ঘর বললেই হয়। চারটে মোটা পায়ের উপরে উঁচু কাঠের দেয়াল, ছাদ ও পাটাতন দেওয়া একটা বাক্স। আমরা ঐ মস্ত হল ঘরে এবং তৎসংলগ্ন ছোট দু-একটা ঘরে বাস করতাম। মায়ের ভাঁড়ার রাখবার জন্যে এই প্রকাণ্ড বাক্স তৈরি হয়েছিল। সেটার মধ্যে উঠে মা বেশ দাঁড়াতেও পারতেন। শেষ পর্যন্ত সেটার কি গতি হোলো মনে নেই। দক্ষিণের অংশে থাকতেন কালীমোহনের বিধবা পুত্রবধূ, আমাদের বড় বৌঠান দুর্গাসুন্দরী। তাঁর মেয়ে কুসুমও মাঝে মাঝে থাকতেন। নিচের

তলায় থাকতেন কালীমোহনের বৃদ্ধ মুহুরী যাঁর নাম ভুলে গেছি। তাঁর দুই ছেলে অতুল, অনিলকে বেশ মনে আছে। অনিল খুব অল্প বয়সেই মারা যান। তেলিরবাগের লালবিহারী জ্যেঠামশায়, যিনি কবিরাজী করতেন, তিনি থাকতেন একতলার সামনের একটা ঘরে। আর ছিলেন হেমচন্দ্র সেন, যাঁকে আমরা ডাকতাম ভ্যাগাদাদা বলে, তাঁর বাবা যিনি হাই-কোর্টে কি একটা কাজ করতেন এবং তাঁর মা যাঁকে মা ডাকতেন "পিস্যাস ঠাইন" অর্থাৎ পিসি শাশুড়ি। এই "পিস্যাস-ঠাইন" তখন খুবই বৃদ্ধা কিন্তু খুব উজ্জ্বল ছিল তাঁর গায়ের রঙ। তিনি জ্যেঠামশায়দের পিসি ছিলেন এবং বিধবা হবে ছেলে নিয়ে তিনি কালীমোহনের আশ্রয়ে এসেছিলেন। বড় বৌঠান দুর্গা-সুন্দরী যে বাবা-মায়ের ঐ বাড়িতে আসাটা পছন্দ করেন নি তার ইঙ্গিত আমরা ছোট ভাই-বোনেরাও বুঝতে পারতাম। মা সারাক্ষণ আমাদের বারণ করতেন দক্ষিণের বারান্দায় কি তৎসংলগ্ন কোনো ঘরে যেতে। তাছাড়া কে ভালবাসে, কে বাসে না তা আমরা কেমন যেন মনের ইঙ্গিতেই টের পেতাম। বড় বৌঠানের কড়া মেজা-জকে আমরা ভয় করেই চলতাম। দুটো জিনিস ছাড়া বাগানের কোন ফল-মূলেতে আমরা হাত দিতাম না। একটা হচ্ছে আমাদের হল ঘরের উত্তর দিকে ছিল একটা বলে টুবু টুবু জামরুলের গাছ। উত্তর দিকের জানালা খুলে ছাতির বাঁট কিংবা আঁকশি দিয়ে টেনে জামরুল সংগ্রহ করা যেত অতি অনায়াসে। এতে কোন গণ্ড-গোল হোতো না, কেউ জানতেই পারত না। গোল বাঁধত ঐ সামনের গাড়ি-বারান্দাটার সামনে রসা রোডের দিকে যে একটা পেয়ারা গাছ ছিল তার পেয়ারা নিয়ে। সে পেয়ারাগুলোর আকৃতি ছিল ঠিক ছোট কলসীর মত। অর্থাৎ ফলটার তলার গোলটাকে গাছের বোঁটার সঙ্গে সংযুক্ত রাখবার জন্যে ছিল একটা গলার মত অংশ। সেই গলাটার মধ্যে কোন বিচিই থাকত না। এক কামড়েই সেই অংশটুকু কেটে নেওয়া যেত এবং ফলটা বেশ ডাঁসা অবস্থায় থাকলে সেই গলাটা যে কি সুস্বাদু তা' সে পেয়ারা যে না খেয়েছে সে বুঝবেই না। খুবই সন্তর্পণে এই পেয়ারা আহরণ করতে হোতো।

সামনের রসা রোড দিয়ে যেত ট্রাম গাড়ি। লাইন পাতা ছিল। তার উপর দিয়ে চলত ট্রাম গাড়ি। সে গাড়ি টানত মোটা মোটা প্রকাণ্ড দুটো পাটকিলে, বাদামী বা সাদা রঙের বিলেতী ঘোড়া। মাঝে মাঝে ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে গাড়িটাকে লাইন থেকে তুলে টেনে নিয়ে যেত রাস্তার অন্য দিকে। তখন তাদের শান্ত করে গাড়িটাকে টেনে আবার লাইনে বসান হোতো। ঘোড়ার কচুরানের হাতে থাকত মস্ত বড় চাবুক আর মুখে থাকত হুইসিল যা দিয়ে সে পথযাত্রীদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বলত। হুইসিলের দরকার হোতো না, কেন না ঘোড়ার খুরের ও গাড়ির লোহার চাকার আওয়াজ—এই দুই মিলিত আওয়াজ আগেই পৌঁছে যেত পথচারীদের কানে। আমার সেই বয়সে তখনো ইলেকট্রিক ট্রাম চলা সুরু হয় নি।

এই বাড়িতে বাসের স্মৃতি আমার মনে খুবই আবছায়ার মত আছে। তিনটি জিনিস বেশ মনে আছে। ঐ বাড়িতে একটি দাসী ছিল খুবই বৃদ্ধা। তার নিজের কি নাম ছিল তা' কখনো শুনি নি। সবাই ডাকত 'ইন্দুরের মা' বলে। সেই 'ইন্দুরের' ভাল নাম ছিল হরিচরণ ঘোষ। তিনি ছিলেন বাবার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট এবং দাদাবাবুর প্রায় সমান সমান। পরে তিনিও বোধ হয় বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু পাশ করতে না পেরে তিনি বম্বে চলে যান এবং সেখানে কাগজের ব্যবসা করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বম্বে থেকে কলকাতায় এলে বাবা, দাদাবাবুদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং ঐ বাড়িতে থাকতেনও। তিনি বিয়ে করেন নি। তাঁর টাকাগুলির কি হবে? আমরা বড় হয়েও শুনতাম যে তিনি তাঁর সব টাকা সুধাংশু (দিদি-মণির ছেলে)-কে, ভোম্বল (দাদাবাবুর ছেলে)-কে এবং আমাকে তুল্যাংশে ভাগ করে দেবেন। তিনি বোম্বাইয়ে হঠাৎ মারা যান। কেউ কেউ বলে তাঁকে দুবৃত্তরা হত্যাই করেছে। যাই হোক, তাঁর উইলের কোন খবর জানা গেল না এবং টাকাগুলো বারো ভূতেই মেরে নিল। যাক গে, সে কথা। আমরা যখন কালী-মোহনের ১৪৮নং বাড়িতে ছিলাম তখন এই ইন্দুরের মা'ও ছিলেন সেখানে। খুব যখন দরুণ গরম তখন বৃদ্ধা একদিন খুব কাল লংকা টিপে কাঁচা আমের টক ডাল খেয়ে কলেরায় আক্রান্ত হলেন। মাকেই তাঁর সেবা করতে হয়েছিল। এ রকম নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা নাকি সচরাচর দেখা যায় না। বৃদ্ধার ময়লা পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি সবই মাকে করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বাঁচলেন না শেষ পর্যন্ত। খবর পেয়ে ইন্দুর বম্বে থেকে ছুটে এসেছিলেন এবং একটু একটু মনে পড়ে তাঁর পরনের থান কাপড় ও গলায় চাবি বাঁধা উত্তরীয়। মৃত্যুর জন্যেই বোধ হয় বৃদ্ধার কথা ও তাঁর ছেলের তখনকার পরিধানের কাপড়ের কথা মনে আছে।

খুকী আর আমি পিঠোপিঠি ভাই-বোন। ভালবাসা যে ছিল না তা' না কিন্তু ঝগড়াও হোতো হামেশাই। খুকী ঐ বয়স থেকেই সুরু করেছিল আমার নামে বাবার কাছে নালিশ করা। আমি যখন অতুল, অনিলের সঙ্গে ডাং-গুলি বা মারবেল কিংবা অন্য কোন খেলা খেল-তাম খুকী চাইত সে-ও খেলবে। আমরা তাতে আপত্তি করতাম। খুকী তখনো ভাল করে কথা বলতে পারে না। বাবা আফিস থেকে ফিরলেই সে নালিশ দায়ের করত—'বাবা, দাদা খেলিস না, খেলিস না তয়।' বকুনী খেতাম খুব—প্রহারও তখনো বোধ হয় সুরু হয় নি। সেটা বেশ প্রচণ্ডভাবেই হোতো পরে খুকীর নালি-শের ঠেলায়। সেই সময়ে খুকীকে একটা পাগলা কুকুরে কামড়ায়—বাঁ হাতের উপরের দিকে যেখানে টিকে দেয়। খুকী সেই কুকুরটাকে 'যাঃ যাঃ' করে বহুবার কিন্তু কুকুরটা তার হাতের কামড়টা ছাড়লেই না। আমরা দৌড়ে গিয়ে চেঁচামেচি করতে কুকুরটা পালাল। ভাগ্যিস আমাদেরও কামড়ায় নি। তারপর পড়ে গেল হৈ-চৈ। কি হবে মেয়ের? আজকাল পাগলা কুকু-রের কামড়ের যে সহজ চিকিৎসা হয়েছে তখনকার দিনে তার কিছুই ছিল না। কসৌলী তখন বোধ হয় স্থাপিতই হয় নি। গোন্দলপাড়া বলে একটা জায়-গায় খুকীকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান হোলো। ভগবানের দয়ায় খুকী ভাল হয়ে উঠল। খুকীর বাঁ হাতের জেনাটায় এখনো সেই দাগটা চকচক করছে দেখা যায়।

তৃতীয় ঘটনা যা একটু একটু মনে আছে তা' হচ্ছে আমার দ্বিতীয়া ভগিনী সুনীতি (গুগু)-র জন্ম ঐ ১৪৮নং বাড়িতে। সে সময় জ্যেঠিমা চলে গেছেন পুরুলিয়াতে। মাকে দেখবে কে? ছুটে আস-তেন মধ্যের বাড়ির দুর্গামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী আমাদের ছনজ্যেঠিমা হেমন্তশশী। এই জ্যেঠিমাকে তখন দেখেছি। খুবই স্নেহশীলা মহিলা তিনি ছিলেন। গুগুর জন্মের কিছুদিন পরেই যখন সে একটু শক্ত হয়ে উঠল তখন মা খুকী, গুগু ও আমাকে নিয়ে তেলিরবাগে গেলেন। তখন একটানা বেশ কিছুদিন মায়ের সঙ্গে আমরা ভাই-বোনেরা স্বপ্নাম তেলিরবাগে ছিলাম।

[ক্রমশঃ]

অবজ্ঞা

চন্দ্রগুপ্ত

সাংস্কৃতিক মেলা শুনলেই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়, সংস্কৃতি সম্মেলন আমার চোখে চন্দ্রাহতদের ঐক্যবদ্ধ উপদ্রব। এই সব মেলায় মেলানে যাবার দুর্ভাগ্য কখনও হয় নি, যাঁরা গেছেন তাঁদের কাছে কিছু কিছু শোনার দুঃসহ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

প্রতি বছর প'চিশে বৈশাখকে কেন্দ্র ক'রে শহর কলকাতায় বিভিন্ন স্কোয়ারে যে-সব রাউন্ড সাংস্কৃতিক উৎসব হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ নাম মাত্র। এই সব উৎসবে আশু-লোকরঞ্জনী সমস্ত কিছুই—চলচ্চিত্র, থিয়েটার, আধুনিক গান—চালাও ব্যবস্থা থাকে ফলে এদের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। রক-এন-রোল ট্যুইস্ট নাচ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ এখনও ঘটে নি কেন সেইটাই আশ্চর্য, আমার এক বন্ধু বললেন আগামীবছরই হয়তো ওগুলি প্রত্যক্ষ করা যাবে।

'বারো-ইয়ারী পুজো'র (বানান-বৈশিষ্ট্যের জন্য হুতোম প্যাঁচার কাছে ঋণী) মতো এই মোচ্ছবগুলি রবীন্দ্রনাথ এবং প'চিশে বৈশাখকে কেন্দ্র ক'রেই অনুষ্ঠান করা কেন, উদ্যোক্তাদের কাছে আমার এই বিনীত জিজ্ঞাসা। জীবদ্দশায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে কম বিরক্ত করি নি (মনে পড়ছে কবির ক্ষুব্ধ উক্তি : 'আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়', ২০ আষাঢ় ১৩৪১ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে), মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে অসম্মানিত না-ই বা করলাম। এই সাংস্কৃতিক ব্যবসাগুলি বছরের অন্য যে-কোন সময়েই (যেমন পুজাবকাশে বা বড়দিনে) তো হ'তে পারে, এবং তাতে আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই।

*

যদি কেউ বলেন, 'কেন, সাংস্কৃতিক মেলা, সংস্কৃতি সম্মেলন ইত্যাদিতে রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদি প্রচারের তো ব্যবস্থা থাকে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সেখানে যেভাবে পরিবেশিত হয়, তাতেই আমার আপত্তি। পরিবেশনপদ্ধতির আদ্যোপান্ত ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কলুষিত, তার কোথাও আন্তরিকতার উত্তাপ নেই। এর অর্থ শিল্পীরা আন্তরিকতা-বর্জিত তা নয়, বরং অপেক্ষাকৃত নবীন শিল্পীরা স্ব স্ব অনুষ্ঠানগুলিকে সার্থক ও প্রাণবন্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু যে-ভাবে তাঁদের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়, তাতে কি তাঁরা শিল্পী হিসাবে তৃপ্ত বোধ করেন বা করতে পারেন? কিছুদিন আগে অধুনা-খ্যাতিমান একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী এই মোচ্ছবগুলির একটির উদ্যোক্তাদের অসৌজন্যের আলোচনার সূত্রে বলছিলেন, 'এরা অর্থাৎ উদ্যোক্তারা যে আমাদের প্রতি, অন্যভাবে কবির স্মৃতির প্রতি, অসৌজন্য প্রকাশের স্পর্ধা পায়, তার জন্য দায়ী আমরাই, কারণ সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ আমাদের এত বেশি আচ্ছন্ন করেছে যে, অনেক খ্যাতিমান শিল্পীকেও শ্রোতৃমনের জন্য এ সব উদ্যোক্তাকে খোসামোদ করতে দেখা যায়। এর ফলে উদ্যোক্তাদের মেজাজ নবাবী না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, এই মোচ্ছবগুলি আর্থিক কারণে অনুষ্ঠিত হয় বলে, উদ্যোক্তাদের সর্বদাই লোকরঞ্জনী অনুষ্ঠানের এবং জনপ্রিয় শিল্পীদের দিকে নজর রাখতে হয়। ফলে সেখানে বিশুদ্ধ শিল্প বিশুদ্ধতার সঙ্গে পরিবেশিত হ'তে পারে না। যথেষ্ট খ্যাতি নেই এমন কোন শিল্পী কি এই সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন? বা খ্যাতিমান শিল্পীরাও কি সব সময় ধ্রুপদী শিল্প, যেমন রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত, পরিবেশন করতে সাহসী হন?

তৃতীয়ত, লোকশিল্পের নামে এই মেলা-মেলনগুলিতে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই লোকশিল্পের ছদ্মবেশ। অর্থাৎ খাঁটি লোকসঙ্গীত-শিল্প লোকনাট্য ইত্যাদি এ-সব জায়গায় পরিবেশিত হয় না এবং হ'তে পারে না। উদাহরণত, যে সব লোকসঙ্গীতশিল্পী এখানে অংশগ্রহণ করেন, শহুরে শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা অনেক সময়েই নিজেদের গানকে বিকৃত করেন ব'লে জনৈক সঙ্গীতজ্ঞের মুখে শুনেছি। বিভিন্ন কোমসমাজের জীবনকে অবলম্বন করে রচিত যে-সমস্ত গান, নক্সা, পালা ইত্যাদি পরিবেশিত হয় এবং যে-ভাবে পরিবেশিত হয় তার মধ্যে সত্যের চাইতে মিথ্যা খাঁটির চাইতে কৃত্রিমতার ভাগ যে বেশি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ যে কোন নৃতাত্ত্বিকই তা বলবেন। 'বিদেশী টুরিস্ট-দারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে'র সাঁওতাল যুবতীর সঙ্গে প্রকৃতি-লালিত সাঁওতাল কন্যার তফাৎ যে কিস্তর।

এই সব তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কিছু কিছু আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা থাকে। চক্রের কলকে কাস কার হাতে ঘুরবে তাও নির্ধারণ করেন তাঁরা, যাঁদের কেউ কেউ হঠাৎ বলে বসেন, 'আচ্ছা এ বছর ধূর্জটিপ্রসাদকে আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়।' উত্তরে ভদ্রলোকের বন্ধু বলেন, 'স্বর্গ অবধি যেতে পারে এমন কোন গাড়ি সম্মেলনের নেই।' যাই হোক, এ সব আলোচনা-চক্রে নাম-ডাক আছে এমন লেখক ও অধ্যাপকদেরই ডাকা হয় যাঁরা (প্রধানত অধ্যাপক) কৃষি-সমস্যা থেকে কৃষ্টি-সমস্যা, চলচ্চিত্রের নব্যরীতি থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যে অতীন্দ্রিয়তা সমস্ত কিছুর উপর সমান স্বাচ্ছন্দ্যে ক্লাস-লেকচারের ভঙ্গীতে দীর্ঘ সময় বলে যেতে পারেন। জনান্তিকে উল্লেখ্য, ইন্‌সটিংক্ট-নির্ভর শ্রোতারা প্রায়শ চীৎকার ক'রে যা

'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে ছাপার ভুল

গত ১৪-৪-৬৭ তারিখের যুগান্তর সাময়িকীতে "লিপান্তর ও বানানের নানা কথা" নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছি—

"বানানের দিক থেকেও বহু অসঙ্গতি যুক্তিহীনতা দেখা যায়। নীতীন্দ্রকে সর্বদা নীতিন্দ্র লেখা হয়। নীতি+ইন্দ্র সহজ সন্ধি নীতীন্দ্র। কিন্তু যেহেতু নীতি লিখতে ত-এ হ্রস্ব-ইকার, অতএব ওর পরে "ন্দ্র" লিখলেই হল। এই যুক্তি দেখে মোলিয়রের লিখিত "বারবুরের ঈর্ষা" নাটকের পাণ্ডিত্যাভিমানী ভক্টরের একটি যুক্তি মনে পড়ে।"...যুক্তিটি আমার প্রবন্ধে ছিল। এখানে দিলাম না।

কিন্তু ১১ই মে তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার লেখা রচনা "রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পিতৃস্মৃতি" ছাপা হয়েছে। ঐ রচনায় এক স্থানে (৩০৪৮ পৃঃ, ২য় কলম দ্রষ্টব্য) 'নীতীন্দ্র' কথাটি ছিল। ছাপার পর দেখছি ওটি 'নীতিন্দ্র' হয়ে আছে! একি যুমেরাং, না ভাগ্যের পরিহাস?

ঐ রচনার শেষে (৩০৪৯ পৃঃ, ৩য় কলমে) শ্রীশচন্দ্র কুণ্ডু নামটির বিকার ঘটে "কুণ্ডু" হয়েছে। পাঠকদের কাছে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

—পরিমল গোস্বামী

হাততালি দিয়ে এই বক-বক্তাদের নিরুৎসাহ এবং নিরস্ত করেন। এমন এক নিরুৎসাহিত অধ্যাপক একবার তাঁর দুঃখের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'বাঙালীদের মধ্যে সীরিয়াসনেস যে কি সাংঘাতিক পরিমাণ কমে আসছে, সংস্কৃতি সম্মেলনে গিয়ে বুঝলাম। সংস্কৃতি মানে এখন নাচ-গান আর সিনেমা। বাংলাদেশ এখন ঘোরতর সাংস্কৃতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে।' সংকট যে ভদ্রলোকের মনোলোকে, তারই প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলাম, 'তুমি সাহিত্যের অধ্যাপক। তোমার কাজ বাংলা সাহিত্যে, তুমি কেন চলচ্চিত্রের নব্যরীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে?'

এই ধরনের গান-বাজনার মোচ্ছবে বুদ্ধিনির্ভর আলোচনা-চক্র ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। তবু শ্রোতাদের চিত্তগ্রাহী বিষয় আলোচিত হ'লে সভামণ্ডপে হৈ-চৈ যে কম হয়, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত, প্রায়শই বিষয় অনুযায়ী বক্তা নির্বাচিত হন না, যেহেতু গাইয়ে-বাজিয়েরা মতো বক্তার বাজারী খ্যাতির দিকেই উদ্যোক্তাদের নজর থাকে বেশি। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে আলোচনা-চক্রের চাইতে গান-বাজনার অনুষ্ঠানগুলির প্রতিই উদ্যোক্তারা অনেক বেশি মনোযোগসম্পন্ন। এই সব কারণে এই মোচ্ছবগুলির আলোচনা-চক্র শেষ পর্যন্ত বৃহৎ কলেবর গ্রন্থের ক্ষীণকায় পরিশিষ্টের কিংবা বদান্যপ্রার্থী লেখকের বইয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির 'ভূমিকা'র তুল্য হ'য়ে দাঁড়ায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একবার সাংস্কৃতিক সভার সভাপতিকে 'শোভাপতি' ব'লে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তাঁর এই ব্যঙ্গ যথার্থভাবেই সত্য। উদ্যোক্তারাও অস্বীকার করবেন না, সাংস্কৃতিক মেলা বা সংস্কৃতি সম্মেলন আসলে কমার্শিয়াল নাচ-গানেরই আসর, এবং সেই আসরকে জাতে তোলার চেষ্টাতেই আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান।

*

যদি আপনি সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করেন : পঁচিশে বৈশাখে আমাদের কর্তব্য কি, তবে সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমি বলব, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ পড়া, রবীন্দ্রনাথের গান শোনা এবং সম্ভব হ'লে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখা। এ কাজ একক-ভাবে কিংবা পারিবারিকভাবে করণীয়। এবং বছরের ঐ একটি দিন, জাতির বা অন্যতম পবিত্র দিন, কোন সাংস্কৃতিক সভা বারোয়ারী অনুষ্ঠান বা সিনেমা থিয়েটারে আমি যাবো না। পঁচিশে বৈশাখকে আমি উপলব্ধি করব সর্ব দেহে-মনে, 'জীবনের পঞ্চাগ্নি আলোয়' 'পূর্ণতার প্রতীক' রবীন্দ্রনাথকে চোখে রেখে তাঁরই উদ্দেশে উচ্চারণ করব সেই প্রার্থনা, যে-প্রার্থনা আবহমান বিশ্ব-মানবের :

তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীরমাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো।

শিল্পে (অ)শান্তি--

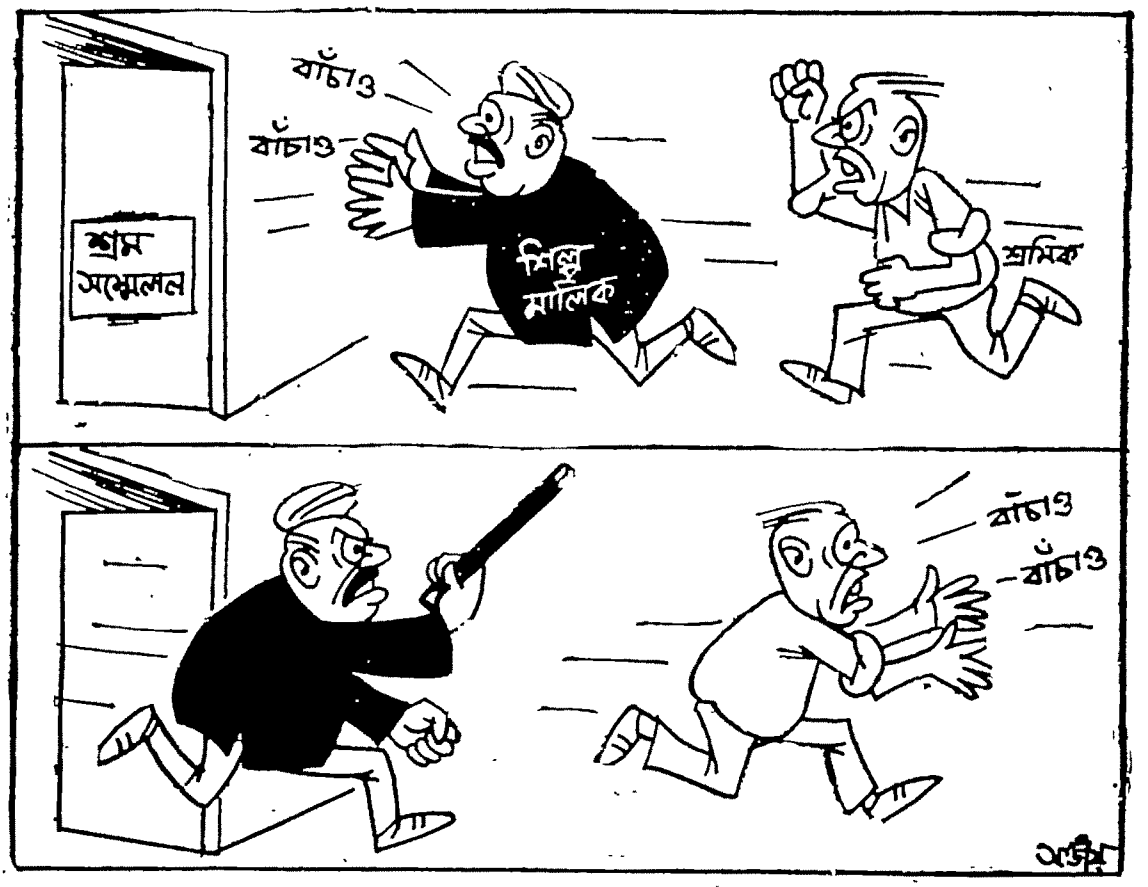

ঘেরাও-এর নিন্দা করে শ্রম সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে

নব মন্ত্রিসভা সমীক্ষা

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের ব্যক্তিগত দৃষ্টি আকর্ষণ

ইতিমধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল ডাল তেল মশলার দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। প্রতিদিন বাজারে এই খাদ্যদ্রব্যের দাম লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন মুখর হয়ে উঠছে। কেন এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার ইচ্ছা ও ধৈর্য সমস্যাপীড়িত জনসাধারণের থাকে না। বিশ বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের বিষময় প্রতিক্রিয়া যে দু'মাসে অন্তর্ধান করে না একথা জনতা বুঝতে চায় না। জনতার মনোবিজ্ঞান চিরদিনই এই ধারায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু জনতাকে অস্বীকার করা যায় না। তাদের দাবি যথার্থ। তাছাড়া অন্য ও প্রত্যহ নিয়ে রাজনীতির কারবার। তাই এই দাবি মেটাতে না পারলে জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়বে ও সরকারের বনিয়াদ ধসে যাবে, বিশেষত পার্টি সরকার পদ্ধতিতে বিরোধীপক্ষ যখন আছে এবং তাদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান।

সবে বৈশাখ মাস। কার্তিক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের নতুন ফসল আউস ধান ওঠা পর্যন্ত। এখনই চালের কে-জি ২.২০ ছাড়িয়েছে। তা হলে বাকি ছ'মাসে অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বড় উৎপাদকরা ও মজুতদাররা কৃত্রিম অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করছে। পণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহে বাধা দিয়ে বাজারের দর ঊর্ধ্বমুখী করে তুলছে। বড় বড় মজুতদাররা চাল আন্ডার গ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং তাদের এই দুঃসাহস হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভালমানুষীর জন্যে। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকার দেখে প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝে ফেলেছে যে এই সরকারকে ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু তারা নয় এ-ধরণের আলোচনা করছে দেশের আপামর জনসাধারণ বুঝে বা না বুঝে। সে জন্য সমস্যা আরও জটিলতা লাভ করছে।

জনসাধারণের ধারণা দেশের মধ্যে যথেষ্ট চাল আছে, যদিও তারা জানে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্য এবং এ বৎসরে খরার আক্রমণে উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু পেটে চান ধরলে শুকনো তথ্য ও যুক্তি বুদ্ধির শুদ্ধিতে কোন সাহায্য করে না। তাই তারা স্বকপোলকল্পিত উৎপাদকদের মত নষ্টের গোড়া মনে করে এবং তাদের উপর পীড়নকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন এই ভেবে অধৈর্য হয়ে পড়ে। কেন পুলিশ দিয়ে উৎপাদকদের ঘর থেকে টেনে বার করা হচ্ছে না? কেন চাষীদের বাড়িতে গিয়ে সব 'সিজ' করা হচ্ছে না? চালের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধিটা চোখের সামনে ক্ষতের মত দগ্‌দগে থাকায় মানুষের এই ধৈর্যহীনতা ঘটছে। এই ধৈর্যহীনতা অন্যায় ও অশোভন নয়, কিন্তু সমস্যা সমাধানকারকও নয়। এখন সব সমাধান লুকিয়ে আছে শস্য সংগ্রহের উপর এবং তারপরে বণ্টনের প্রশ্ন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা ডঃ ঘোষের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল যে, শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং সম্পূর্ণ সদিচ্ছার সহায়তায় শস্য সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় শুভেচ্ছার সদিচ্ছার উপর নির্ভরতা কার্যকরী হবে না বলে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। বড় বড় উৎপাদকের যে খাদ্যের রিটার্ন দেবার কথা ছিল, সেখানে সাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে মেলে নি। আর সংগ্রহের অবস্থা প্রায় অনুরূপ। তা হলে জাতীয় চরিত্র বলা আপত্তিকর বলা যেতে পারে। অবশ্য উৎপাদকদের চরিত্রকে জাতীয় চরিত্র বলা আপত্তিকর বলে যেতে পারে। কিন্তু কৃষিজীবীরাই ত' এখনও জনসংখ্যার ষাট ভাগ দখল করে আছে। এই বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যা যদি অসহযোগিতা করে, তা হলে কোন্ উপায়ে সংগ্রহ কার্যকরী হবে। পুরানো ফর্মুলা বা পীড়নকারী ব্যবস্থা প্রফুল্ল সেনের আমলে যথেষ্ট হয়েছিল কিন্তু তার ফলাফল উৎসাহজনক হয় নি। প্রফুল্ল সেনের সরকারের পতনকে এই পুরানো ফর্মুলা নিশ্চিত করেছিল বলেই তাকে খারিজ করতে হবে—এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচারযোগ্য নয়। সরকারের অস্তিত্বের বিপন্নতা সৃষ্টিকারী কোন বিষয় সমস্যা সমাধানের অন্যতম পূর্ব সর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তা হলে সরকার পীড়ন করবে না আর জনসাধারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে সহযোগিতাও করবে না এই যদি অবস্থা হয় তা হলে উপায় কি?

সমস্যা সমাধানের আগে সমস্যা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি দেখা উচিত। এ বৎসরে প্রতিটি জেলার উৎপাদন কত? প্রতিটি অঞ্চল ও প্রতি মৌজায় বৃহৎ চাষীদের সংখ্যা কত এবং তাদের ঘরে উদ্বৃত্ত ফসল কত? তাদের উদ্বৃত্ত ফসল কয়খানা মৌজার সাধারণ প্রয়োজন মেটাতো? ও এ বৎসর কতটা মেটাতে পারবে? দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সরকারের হাতে এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। যদিও প্রতিটি ব্লকে উৎপাদনের একটি তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের কোন তথ্য গ্রহণ করা হয় না। উৎপাদনের যে অঙ্ক দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণ মনগড়া। তাই প্রকৃত চিত্র দেখার অসুবিধা বর্তমান। যদি ঘাটতি থাকে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায় না। ফলে খাদ্য সম্বন্ধে কোন পলিসি নির্ভুল হয় না। এদিকে কলকাতায় পুরো রেশনিং চালাতে হবে ও তার জন্য প্রয়োজন কত তার একটা প্রায় নির্দিষ্ট হিসাব আছে। এই প্রয়োজনটা মেটাতে পারলে অন্যান্য দিকটা দেখা অনেক সহজ হয়। কিন্তু কলকাতায় রেশনিং থাকা সত্ত্বেও চাষীদিক থেকে বৈধ ও অবৈধ বহু উপায়ে প্রচুর চাল চালান হচ্ছে। অর্থাৎ একথা সহজেই বলা যায় যে, কলকাতার রেশনিং মানুষের ক্ষুধার আহার্য যথা পরিমাণে সরবরাহ করতে অক্ষম এবং ফলে রেশনিং-এর বাইরে তা সংগ্রহ করতে হয়। যতই চেকপোস্টের বেড়া বসান হোক তবু এই অবৈধ চালানের চোরাকারবার বন্ধ হবে না। তা ছাড়া আমাদের দেশের পুলিশ দিয়ে তা বন্ধ করার চেষ্টা না করাই ভাল। তা শুধু হয়রানি, লাঞ্ছনা ও ঘুষের দরজা প্রসারিত করবে। তা হলে অধিক ক্রয়-ক্ষমতাধিকারী শহরবাসীদের ঠেকানো যাবে কি করে? তাদের মাসাশিক বরাদ্দ বাড়িয়ে পুরা প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে এ সমস্যা আর থাকে না। কিন্তু ভাঁড়ারের অবস্থা তা দিতে সক্ষম নয়। সুতরাং রেশনিং রাখলেই মোজামিল দিয়ে চালাতে হবে এবং এই রেশনিং-এর স্বাভাবিক পরিণতি যে দুর্দশা সৃষ্টি তা সরানো যাবে না। কিন্তু যেটুকু বরাদ্দ আছে শুধু সেইটুকু বজায় রাখতে গেলে শস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত চাষীদের স্বার্থস্থ হতে হবে এই সংগ্রহের জন্য।

সত্যিকার চাষী বা উৎপাদকরা কি সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে? অনেকেই বলছেন যে, এই উৎপাদকরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সহযোগিতা করবে না। শুধু এক কালোবাজারী মুনাফার লোভে? আমার মনে হয় এই চিন্তাধারা যথার্থ নয়। এদেশে কি ব্যবসায়ী, কি শিল্পপতি বা কি ইনকামট্যাক্সধারী কেউই যথার্থ সহযোগিতা করে না, এমন কি যথার্থ হিসাব দেয় না। আসলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ছোটখাট উদ্বৃত্ত চাষীদের ঘরে প্রায় উদ্বৃত্ত মজুত থাকে না। তারা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ উদ্বৃত্ত বিক্রি করে দেয় তাদের পুরানো ঋণদেনা শোধ করতে ও নতুন বৎসরের ব্যবহারীর খরচাদির প্রয়োজন মেটাতে। একটা অলিখিত ফ্যামিলি বাজেট তারা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলে। সামান্য উদ্বৃত্ত যাদের থাকে তারা আশ্বিন মাসের শেষে ও কার্তিক মাসে বাজারে ছেড়ে দেয় যখন দেখে নতুন ফসলের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। চাষের উপর যাদের অশন-বসন তাদের এই মনোভাব যতটা না বাণিজ্য বুদ্ধিভিত্তিক তার চেয়ে বেশি নিরাপত্তাভিত্তিক। এই ধরণের উদ্বৃত্ত চাষীদের অপরাধী ধরে নিয়ে যে কোন ব্যবস্থা দ্বারা তাদের বিক্রয়ে বাধ্য করা ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করার সামিল। অবশ্য "বৃহত্তর স্বার্থ"-রূপ যুক্তির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার লজিক দেখালে আর কোন কথা থাকে না। যখনই একদল খেতে পাবে আর একদল খেতে পাবে না এ চিত্র দেখতে হয় তখন পীড়নমূলক ব্যবস্থার দ্বারা যদি সমস্যার সমাধান করা যায় তা মানবিক কারণে সমর্থন লাভ করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সাময়িক হলে ক্ষতি নেই কিন্তু চিরদিনের ব্যবস্থা হলে তা অনিবার্যভাবে জাতীয় ক্ষতি সৃষ্টি করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের একদল বড় শরিক বাধ্যতামূলক শস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী রূপে দেখতে চায়। বাস্তববোধের অভাবের সঙ্গে পুঁথিপড়া বুদ্ধির প্রভাব ও শ্রেণীসংগ্রামের ধার করা বুদ্ধির কচকচানিই পীড়নকারী ব্যবস্থা গ্রহণই সমাধান-দাওয়াই বলে মনে করে। একথা ভুললে চলবে না এদের কাছেই আবার "অধিক শস্য ফলান" আবেদন করতে হয় এবং স্বাভাবিক কারণে এ আবেদন তাদের কাছে নিষ্ফল হতে বাধ্য (পরে সবিশদ বলার চেষ্টা করব)।

এমনিতে খরার আক্রমণে ফসলহানি ঘটেছে, তার উপর বিগত কংগ্রেসী সরকার মুহুর্মুহু খাদ্যনীতির নানা অর্ডার আর নোটিফিকেশানের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ও ভয়ে কৃষকরা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া আন্তঃজেলা কর্ডন উঠে যাওয়ায় অবাধ চলাচল আরম্ভ হয়। তার ফলে বাজারের দর ২২ করে নেমে গিয়ে একটা সমতায় এসেছিল। অবশ্য নির্বাচনকালীন মাল চলাচলের বাধা না থাকায় এই সমতা লাভ শুরু করেছিল। এবারে যেই চেকপোস্টের কড়াকড়ির ঘোষণা করা হল অমনি দেখা গেল দাম চড়তে আরম্ভ করল। অবশ্য যেভাবে কলকাতার চাল চলে আসছিল তাতে গ্রামের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তা হলে চেকপোস্টের সুবিধা নিয়ে কালোবাজারের সুবিধা হল কি? এবং কারা এই সুবিধা নিতে এগিয়ে এল—উৎপাদক না ব্যবসায়ী না মজুতদার? আমি আগেই দেখিয়েছি ছোটখাট উদ্বৃত্ত উৎপাদকদের ঘরে উদ্বৃত্ত প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝারি ও বৃহৎ উৎপাদকদের অবস্থা কেমন জানা দরকার। নামে উৎপাদক হলেও বেশির ভাগই ভাগচাষী বসিয়ে চাষাবাদ করে। জমির পরিমাণে পুরো ফসল তার ঘরে আসে না। অর্ধেক ভাগচাষীদের ঘরে চলে যায়। অর্থাৎ মাঝারী উদ্বৃত্ত উৎপাদকদের গোলার অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। এখন থেকে শস্য সংগ্রহ খুব সাফল্যলাভ করবে না। একমাত্র বৃহৎ উৎপাদকদের ঘর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। আর মজুত যদি থাকে ত' তার ঘরেই সম্ভব। এদের সংখ্যা প্রতি গ্রামে নেই। এক-একটা অঞ্চলে যে ক'টা আছে তা না গুণেই বলা যায়। এখানে কি সংগ্রহ হবে? অনেকের মতে এই বৃহৎ উৎপাদকরা নিজেদের গোলায় বেশি না রেখে আশেপাশে প্রতিবেশীদের বাড়িতে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে সরকারের সংগ্রহনীতির ভয়ে। কথাটির মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও এই ধরণের চিত্র খুব ব্যাপক নয়। প্রফুল্ল সেনের আমলে এই ধরণের প্রতিবেশীদের টানাটানি হয়েছিল এবং উৎপাদক বা প্রতিবেশী কারোর এ-বিষয়টি অজানা নয়। তা হলে কি চাল একেবারেই উদ্বৃত্ত কোথাও নেই বা যদি থাকে ত' কোথায় আছে?

চাল আছে। দেশের মধ্যে যারা উৎপাদক-মজুতদার ও ব্যবসায়ী-মজুতদার তাদের কাছে। আর তাদের নিজস্ব গোলার চেয়ে অদৃশ্য মালিকের গোলার আছে। এই ব্যবসায়ীরা কালোবাজারী বন্দিতে বিশেষজ্ঞ। এরা সুযোগ পেলেই এক হাত খেলে নেয়। এদের সঙ্গে উচ্চ সরকারী অফিসারদের যোগাযোগ থাকে এবং সরকারী নীতির একটু আভাস পেলেই মুনাফা সৃষ্টির নতুন পথ আবিষ্কার করে ফেলে। দেশের রাজনীতিও এরা ভাল বোঝে। এদের নিয়ন্ত্রণের উপর যে কোন সরকারের খাদ্যনীতির সাফল্য নির্ভর করছে। আর এই শ্রেণীর মজুতদারদের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যদি সকল উৎপাদক শ্রেণীর উপর চাপ পড়ে তা হলে সফলতার চেয়ে বিফলতা বেড়ে উঠবে। তাই সবার আগে শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে। ছোট, মাঝারি, বড় উৎপাদকদের ও মজুতদারদের শ্রেণীভাগই হবে প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এ দায়িত্ব কে বহন করবে? সেই সরকারী আমলা ও পুলিশের উপর যদি এ সরকার নির্ভরশীল হয় তা হলে পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেউই বন্ধ করতে পারবে না। আবার পুরো গণ-কমিটির উপর নির্ভরশীল হলে ব্যর্থতা আসতে বাধ্য। আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র অপরিণত ও তার উপরে বিভিন্ন পার্টি রাজনীতির প্রভাব। তাই সম্পূর্ণ গণ-কমিটি নির্ভরশীলতা পক্ষপাতদুষ্ট হবে। তাই সরকারী ও বে-সরকারী দুটো ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন বাঞ্ছনীয়।

খাদ্যনীতির সার্থকতা অবশ্য খাদ্যমূল্যের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক কারণে তাই মূল্য বেঁধে দেওয়ার কথা উঠেছে। কেন না কালোবাজারী মূল্যকে কেউই সমর্থন করে না। কিন্তু অতীতে মূল্য বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও কোথাও তা রক্ষিত হয় নি আইনের সকল বাঁধনকে যতদূর সম্ভব শক্ত করেও। যদি সরকারের নির্দিষ্ট মূল্য না পালিত হয় তা হলে সেটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। শ্রদ্ধাশীলতা হারিয়ে ফেলতে সাহায্য করলে তা সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর যে সরকার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারায়, সেই সরকারের কল্যাণপ্রসূ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এমন কাজকে কোনমতেই পল্লবিত হয়ে উঠতে দিলে ফল মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাই মূল্য নির্দিষ্ট করার আগে সকল পারিপার্শ্বিক বিষয়ে, যেমন—চাহিদা ও সরবরাহ, বাজারের অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যমান ও দেশের ব্যাঙ্কিং পলিসি ও রাজস্বনীতি অতি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষত দেশে এখন পরিকল্পিত অর্থনীতি চলছে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অস্বাভাবিক অবস্থাও পাশাপাশি চলছে। এদিকে অর্থনৈতিক মন্দাভাবও বাজারে দেখা দিয়েছে। তাই নানা অস্বাভাবিক ও প্রতিকূল বিষয়কে অনুকূল করতে গিয়ে পন্থাকে স্বাভাবিকীকরণ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে যেন আরও অস্বাভাবিকতার পথে ঠেলে না দিই।

—এস কে শক্তি

ভাষাসমস্যা প্রসঙ্গে

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। নানা জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে এখানে। বিভিন্ন ফুলের সমাবেশে তৈরি একটি ফুলের তোড়া—যার নাম হিন্দু সংস্কৃতি নয়, আর্য সংস্কৃতি নয়, নাম তার ভারতীয় সংস্কৃতি। আপন আপন পরিবেশে সাধ্যমতো ফুটে উঠেছে এক-একটি ফুল। যত মত তত পথের মতো বাড়তে দেওয়া হয়েছে ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা সবকিছু। এ ধারাটি যে অবিরাম একভাবে বয়ে চলেছে, ঠিক তা নয়। মাঝে মাঝে জোর-জবরদস্তির চাপ আসে নি, এমন কথা বলা চলে না। তার সাক্ষ্য দেবে আমাদের ইতিহাস। জোর করে কোন মতবাদ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যখন, তার ফল ফলেছে অন্যভাবে। সেদিনের মানুষ-গুলো অন্যায় চাপ সহ্য করতে না পেরে তিল তিল করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। নীরবে মুখ বুজে সহ্য করেছিল অন্যায় আর অনাচার, তবে প্রকৃতি সে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল শেষ পাই চুকিয়ে। দুর্বলতার সুযোগে কখনও আঘাত হেনেছিল ধর্মে কখনও তার সংস্কৃতিতে, যার ফলে স্বাজাত্যবোধ, এমন কি স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল। অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে বহুদিন পর আবার আমরা স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। ফিরে পেয়েছি সার্বভৌম সত্তা—যদিও দেশ হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। দুটি স্বাধীন খণ্ডদেশ। যে অন্যায় জবরদস্তের কথা বলা হ'ল, মনে হয়, তার জের এখনও দেশের কোন কোন অংশের বেশ কিছু লোকের মনে দানা বেঁধে রয়েছে। তা যদি না হয়, তবে ঐক্যের নামে, ভাষার ব্যাপারে এ হেন স্বৈরাচারী মনোভাব কেউ কখনও আর কোনখানে দেখাতে পারেন! একখানা গাড়িতে একশ' ঘোড়া জুতে দিলে অশ্বশক্তি বাড়ে না; গাড়িখানা ভেঙে যায়, ঘোড়াগুলো যেদিকে খুশি ছুটতে থাকে। তেমনি বহুভাষী ভারতবর্ষকে আষ্টেপৃষ্ঠে একটি ধর্মে মুড়ে ফেলতে চাইলে আবরণ যাবে ফেটে।

আমাদের সংবিধান পনেরটি প্রধান (সিন্ধী সমেত) ভাষাকে মেনে নিয়েছে। ভারতের বর্তমান (১৯৬৫) মোট লোক-সংখ্যা হচ্ছে ৪৮ কোটি ২৭ লক্ষ, এবং এর অর্ধেকের কম হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর লোকসংখ্যা। ভারতের ভাষাগত এবং রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সোভিয়েতের জনৈক নিরপেক্ষ সমালোচকের মতে, 'হিন্দু-স্থানীকেই যাদের সত্যকার মাতৃভাষা বা ঘরের ভাষা বলা যায়, যাদের অনুপাত, ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ২৫-এরও কম—মোটেই শতকরা ৪২ নয়, যে দাবি হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর সমর্থনকারীরা করে থাকেন।'

হিন্দী আর-পাঁচটি ভাষার মতো একটি আঞ্চলিক ভাষা। একটি আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিলে সমগ্র জন-সমষ্টির ওপর একটি সংখ্যালঘু ভাষাকে কি চাপিয়ে দিয়ে অপরাপর ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয় না! হিন্দীভাষীদের এই অন্যায় আবদার বা রায়নার সদম্ভ প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। যখনই প্রতিবাদ উঠেছে, একদল গোঁড়া লোক বোঝাতে চেয়েছেন যে, অহিন্দীভাষীদের পেট্রিয়টি-জমের একান্ত অভাব। এবারকার নির্বাচনে হিন্দীবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হল মাদ্রাজে ডি এম কে-র জয়লাভে এবং ছাত্র-নেতার হাতে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের পরাজয়ে। জাতীয়তাবাদের অর্থ এই নয় যে, একটি আঞ্চলিক ভাষার তাঁবেদারী করা, অথচ মজার কথা হচ্ছে, যারা হিন্দীর ধ্বজাধারী, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে কস্মিনকালেও তাঁদের অনেকের মাতৃভাষা হিন্দী ছিল না এবং আজও মাতৃভাষা নয়। কারণ ঘরে তাঁরা যে ভাষায় কথা বলেন তা মোটেই হিন্দী নয়, তা হলো ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী, রাজস্থানী ইত্যাদি। ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী ভাষাগুলি প্রাচীন মগধন থেকে এসেছে! এদের সঙ্গে পশ্চিমের হিন্দীর মিল রয়েছে যত, তার থেকে অনেক বেশি মিল পাওয়া যায় বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদির সঙ্গে। যেহেতু এরা সকলে একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভোজপুরী, মগহী, হিন্দী ইত্যাদি ভাষাগুলির লিপি হচ্ছে নাগরী। এই লিপিগত মিলনকে ভাষার ক্ষেত্রে জোর করে চালানো হয়েছে। ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ভাষার লিপি তো এক। আর সেকারণে কি এই ভাষা-গুলিকে আমরা একটি ভাষা বলব, না, বলা যুক্তিসঙ্গত হবে? দুঃখের কথা, নাগরী লিপি-ভারতের অনেকগুলি ভাষার স্বাতন্ত্র্য ভোলাতে পেরেছে এবং তারা হিন্দীর দরবারে সেলাম ঠুকছে। এ ধরনের দুর্বলতা প্রমাণ করতে পেরেছে যে, এঁরা অর্থাৎ ভোজপুরী ইত্যাদি ভাষা-ভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষাকে কোনদিন ভালবাসেন নি। যদি তাঁদের প্রাণে এত-টুকু ভালবাসা বা চেতনাবোধ থাকতো, তবে কি তাঁরা এমনি করে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে বিসর্জন দিতে পারতেন?

ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ তথা সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে রইলেন। হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এমনতর ব্যাখ্যা যেন কেউ না করে বসেন যে, আমরা হিন্দীবিদ্বেষী। আমরা হিন্দীর রাজনীতিক অধিকারের ঘোরতর বিরোধী। প্রতিবাদের একমাত্র কারণ, আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ভালবাসি। সরকারী ভাষারূপে হিন্দীকে আমরা চাই না, কারণ আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে তুলতে চাই না, তাকে ছোট করে দেখতে চাই না। আমরা একটি আঞ্চলিক ভাষার বলি হব না।

মনে হয়, ভাষার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা তামিলনাদের থেকে অনেক কম সচেতন। দক্ষিণ ভারত পেয়েছেন তীক্ষ্ণধী রাজাজীর মত একজন নেতা, যিনি তামিল জাতিকে ভাষার জগতে সজাগ করে তুলতে পেরে-ছেন। সেজন্য শুধুমাত্র তামিলভাষী বা দ্রাবিড়ভাষীরা রাজাজীর নেতৃত্বের কাছে কৃতজ্ঞ নয়, ভারতের সমগ্র অহিন্দীভাষীরাও কৃতজ্ঞ। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ এমনতরো জীবন-মরণ একটি সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন নেতৃত্ব দেয় নি।

আশ্চর্য!

মে সংখ্যার বিস্ময়কর উপন্যাস, গল্প, চাঞ্চল্যকর ফিল্মের রহস্য, সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য ফিল্ম 'অবতার'-এর অগ্রিম খবর। দেড় টাকা।

সুখী মন

মে সংখ্যায় 'সাত বছর অন্তর আপনি বদলে যান'; 'সহজ যোগ-প্রাণায়াম'; 'মনের মতো চাকরি'; 'কি আছে আপনার ভাগ্যে'; আরো অনেক কিছু..সুখ-শান্তি-আনন্দের পথনির্দেশ। ৪০ পয়সা।

অয়েল্স-বিটা পাবলিকেশনস্
১৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪

কোন বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিক জাতির এই দুর্দিনে কেন এগিয়ে এলেন না? ভাষা-আন্দোলনে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের একজোট করা। তারপর তাকে গণ-আন্দোলনমুখী করে তোলা। ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত কোন সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারল না কেন? বাংলাদেশ আজ কি বন্ধ্যা হয়ে গেল? মনে রাখতে হবে, ভাষা সব কিছুর ঊর্ধ্বে। পার্টি, নেতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ সব কিছুর ওপরে স্থান পাওয়া উচিত মানুষের মুখের ভাষায়, মাতৃভাষার। বাঙালীর কাছে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের নিকট এখনো কেন ভারতবর্ষের এক-মাত্র সরকারী ভাষারূপে হিন্দীর আবির্ভাব যে কত ভয়াবহ তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। 'হিন্দী তাড়াও' আন্দোলনকে জোরালো করে তোলা প্রয়োজন। এখনই হলো প্রকৃষ্ট সময়। ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশের সমস্ত অহিন্দীভাষীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার একজোটে কাজ করা উচিত সংসদের ভেতরে এবং বাইরে থেকে। এখানে শৈথিল্য দেখালে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অপমৃত্যু এসে যাবে।

হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার অর্থ অন্যান্য ভাষীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পদে নামিয়ে দেওয়া। পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে এমনি করে একটি ভাষাকে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ঘাড়ে চাপানোর নজির নেই। দেশে অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান কোন কিছুর সমাধান হলো না অথচ একটি আঞ্চলিক ভাষার পিছনে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা কিসের প্রয়োজনে। কার স্বার্থে এ অপচয়? দেশের ঐক্য? গায়ের জোরে সমস্ত সমাজটাকে একটা পোষাক পরাতে চাইলে ঐক্য আনা যায় না। রবীন্দ্র-নাথের কথায়, দেউড়িতে বড় একটা আলো চাই ব'লে, তার তেল জোগাবার জন্য বাড়ির সব ঘরের আলোকে নিবিয়ে দিতে হবে?

দ্বি-ভাষা নীতি পরিত্যাগ করে কেন্দ্র জোর করে ত্রি-ভাষা চাপাতে চান দেশবাসীর মাথায়। রাজনীতিক স্বার্থপরতা শিক্ষাকে বলি দিতে কুণ্ঠিত নয়। তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে একটি ছেলে বা মেয়েকে যত সময় অপচয় করতে হবে দুটি ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা এবং ইংরেজি শিক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অনেক কম সময় দিতে হবে এবং ওই উদ্বৃত্ত সময়টুকুকে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষাবিদের এদিকটি সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রিত্ব এই প্রথম একজন শিক্ষাবিদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। সুযোগ্য শিক্ষাবিদ হিসেবে সকলদিক চিন্তা করে তিনি নিশ্চয়ই কস্মিনকালে ত্রি-ভাষা নীতির সমর্থন করবেন না। কেন্দ্রেও আজ শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন রয়েছেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন। আশা করি তাঁর নীতি হবে, ভাঙবো তবু মচকাবো না। ত্রি-ভাষার জাল কেটে দেশকে সুস্থ পথে চালিত করবেন বলে আমরা মনে করি। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ আজ ভারতবর্ষকে সংহতির নামে কোন্ দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিতে চলেছেন? ভাষাতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। ভাষার জন্য সংবিধানকে সংশোধন করা প্রয়োজন। হিন্দীর অনুপ্রবেশের ফাঁকটুকু চিরকালের জন্য বন্ধ করা চাই। মানুষ যা কিছু গ্রহণ করবে, তা' করবে প্রয়োজনের তাগিদে স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে নয়।

হিন্দীভাষীদের যদি বলি তামিল, ওড়িয়া, আসামী কি তেলুগু—এর যে কোন একটি ভারতের সরকারী ভাষা হোক—তাঁরা কি এ প্রস্তাব উত্তম বলে মনে করবেন? নিজের স্বার্থে হাত পড়ায় তাঁরা তা' যখন মানবেন না পরের স্বার্থে হাত বাড়ানোর তখন দরকার কি? দেশের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্যের প্রয়োজনে একটি কেন একাধিক ভারতীয় ভাষা শিখতে স্বেচ্ছায় সকলে রাজী আছেন। অনুবাদ সাহিত্যকে প্রেরণা দেওয়া উচিত। এক ভাষার সম্পদ অন্য ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত এবং তা' শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে গ্রহণও করবেন। প্রতিটি রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাকে শ্রদ্ধা করা একান্ত প্রয়োজন—জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি আসবে এই পথে। গান্ধীজীই তো একদা বলেছিলেন, Linguistic slavery is worst slavery. দক্ষিণী-দের কাছে ভাষাগতভাবে ইংরেজি এবং হিন্দীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ দ্রাবিড় ভাষাগুলি একটি স্বতন্ত্রগোষ্ঠীর ভাষা, যার সঙ্গে ইংরেজির বা হিন্দীর (যা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত) কোন সম্পর্ক নেই। আপাতত ইংরেজি দেশের কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর মাতৃভাষা নয়, যদিও ইংরেজির মাধ্যমে আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ ঘটেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আমাদের ঘরে ঘরে এসে পৌঁছেছে ইংরেজিকে কেন্দ্র করে। বিদেশী শাসন ছাড়া আর কোন কিছুই যদি আমরা বর্জন না করি হঠাৎ ভাষাকে এত তাড়াতাড়ি বর্জন করার দরকার কিসের জন্য। প্রাক্তন ভারত রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তো ইংরেজিতেই ভাষণ দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া ভারতের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মাতৃভাষা হচ্ছে ইংরেজি। যদি একজন ভারতবাসীর মাতৃভাষাও ইংরেজি হয় তবে তাকে কোন্ আইনে বিদেশী বলা হবে?

ভাষা বিশ্লেষ বা linguism-এর স্রষ্টা আমরা নিজেরা। আমাদের রাষ্ট্রকে এ ব্যাধি আজ ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইছে। এহেন দানবের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে মূলে ধরে টান দিতে হবে। একটি আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে যাতে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষা সমান সুযোগ-সুবিধা পায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। প্রতিটি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হোক। প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজিকে রাখা হোক। প্রতিটি রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং সরকারী কাজকর্ম চালানো হোক। কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি বহাল থাক। আর দেশের অভ্যন্তরে স্টেশনে স্টেশনে ডাক-তার বেতার সর্বত্র একটি আঞ্চলিক ভাষার প্রচার বন্ধ করা হোক। 'বিবিধ ভারতী' নাম দিয়ে হিন্দী প্রচার কতকাল চালানো হবে তা' জানবার অধিকার সকলের রয়েছে। মনি-অর্ডারের হিন্দী পড়বার জন্যে বাংলাদেশের কোন একটি গ্রামে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারি নি একজনকে—এমনতরো অপরিচিত একটি ভাষার জন্যে সংহতির নামে দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। হিন্দীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে ভাষা-আন্দোলনকে ততকাল টিকিয়ে রাখতে হবে যতদিন না বিপদ চিরকালের মতো মুছে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা বাঙালীরা সক্রিয় হলে বাঙালী জাতি, বাঙালী সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা চিরদিন আমাদের স্মরণে রাখবে।

এবার লিপি সম্পর্কে দু-চার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। নাগরী লিপি সংস্কার করে বর্তমানে বোঝাবার চেষ্টা চলছে যে, এই লিপিকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। হিন্দী-পন্থীদের এটি হচ্ছে খিড়কীর পথ ধরে অন্দরে প্রবেশের চেষ্টা। যদি নাগরী গ্রহণ করতে হয়তো রোমক লিপি কোন্ অপরাধ করলো? তাছাড়া মনে হয়, প্রতিটি ভাষার নিজস্ব লিপি কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। বাংলা ভাষার এ সম্পর্কে গুরু দায়িত্ব থেকে গেছে। ভারতবর্ষের এবং পূর্ব পাকিস্তানের দুটি দেশের (পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা) ভাষা এবং লিপি অভিন্ন। আজ যদি ভারতবর্ষের বাঙালীকে নাগরী লিপি গ্রহণ করতে হয়, আগামীকাল হয়তো পাকিস্তানের বাঙালীর ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। ফলে ভাষাগত আদান-প্রদান চিরকালের জন্য দুটি রাজ্যের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে না কি।

লোককবি রমেশ শীল

॥ কল্পতরু সেনগুপ্ত ॥

কবিয়াল রমেশ শীলের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে সারা পূর্ববঙ্গ শোকার্ত। মৃত্যুর সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন তাঁকে যেন কবর দেওয়া হয়। প্রায় দশ সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান তাঁর শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ সংস্কৃতির নায়ক রমেশ শীল মানুষের যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর এত জনপ্রিয়তার কারণ, তিনি কবিগানকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছিলেন, কবিগানের ধারা পরিবর্তন করেছেন। এক সময় কবিগানের কদর অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেশি ছিল, গানের বিষয়বস্তু ধর্মীয় ও পৌরাণিকতার সীমাবদ্ধ ছিল; তার সঙ্গে অশ্লীল খিস্তি-খেউড় যোগ হয়েছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যাত্রার পালার মাধ্যমে মুকুন্দ দাস সমাজ সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন; অর্থনীতি ও রাজনীতি তাঁর পালাতে যোগ হয়েছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে রমেশ শীল কবিগানের মাধ্যমে সমকালীন গ্রামীণ জীবনের সমস্যা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত করেন। এক এক সময় তিনি সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারা প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেশ ভাগের সমস্যা থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা, দুর্ভিক্ষ, অন্নবস্ত্রের সমস্যা ও মজুতদার, চোরাকারবার বিরোধিতা, যুদ্ধ ও শান্তি, ধনিক ও শ্রমিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি কবিগান গেয়েছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর কবিগানে তাদের মনের কথা এবং বাঁচার পথ দেখতে পেয়েছে। তাই রমেশ শীলের কবিগান শোনার জন্য সারা পূর্ববঙ্গের মানুষ আগ্রহী ছিল।

মহাযুদ্ধের কালে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গেয়েছেন:

জ্বলে পুড়ে গেল দ্যাশ অত্যাচারের একশেষ
দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান ঘুমাইও না আর
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ি পঁয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি
আবালবৃদ্ধ কত মইল হাজারে হাজারে।
তার উপর কাপড়ের জ্বালা নতসব কুলবালা
ঘরের বাহির দিনের বেলা হতে নারে আর।
কলাগাছির ডিলারের নারী শাড়ি পরে ছাড্যা লাজি
গরীব বেচারার বৌ বেচারী ছিল্লা তেনা সার।

দুর্ভিক্ষের সময় একদিকে যেমন তিনি মজুতদার চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দায়ী করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবার ডাক দিয়েছেন, সেই সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

শহীদ খুনে রাঙা তুমি জালালাবাদ
দুষমন হটাতে তব বক্ষ মাঝে
রুখিয়া দাঁড়াল বীরের দল।
হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী
টুটিল তাদের ধৈর্যের বাঁধ
সূর্য উঠিল তূর্য নিনাদি
তেজস্কমণ্ডল ভাতিল তার
অরুণ বেগে তরুণের দল,
দম কদম এগিয়ে যায়...

দেশ ভাগের পরে নির্ভীকভাবে তিনি গান গেয়েছেন। কখনও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের কাছে মাথা নোয়ান নি। এই কারণে পাকিস্তান সরকার এই যুদ্ধ কবিয়ালকে প্রায় বৎসরকাল বিনা বিচারে জেলে আটক রেখেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের জনতা তাঁর মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন করে, এবং সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তির পরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে জনতা তাঁকে বিরাটভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯৫৬ সালে ফাল্গুনী সম্মেলনে রমেশ শীলকে বাংলার শ্রেষ্ঠ লোককবির সম্মান দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকার 'বাকা' সাংস্কৃতিক সংসদ রমেশ শীলকে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ লোককবিরূপে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামে রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদ গঠিত হয়, এবং তাঁকে পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ লোককবি হিসাবে সম্বর্ধনা জানায়। এই সম্বর্ধনা এবং শ্রেষ্ঠ লোককবি হিসাবে স্বীকৃতি প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব। পাকশাসকশ্রেণী তাঁকে দুষমনরূপে বিবেচনা করলেও হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তাঁকে বন্ধুরূপেই গণ্য করেছে, এবং বন্ধুর মর্যাদা ও প্রীতি দিয়েছে।

রমেশ শীলের জন্ম ১২৮৪ সালের ২৬শে বৈশাখ চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি থানার গোমদণ্ডী গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন ক্ষৌরকার। অত্যন্ত দরিদ্র অভি ভাবকের সংসার চালাতেন। রমেশ শীলের সাত বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর বেশি পড়ার সুযোগ তাঁর হয় নি। এই বয়সেই তাঁকে নিজের অন্নের উপর বাঁচতে হয়েছে। রোজগারের জন্য অসীম সংগ্রামের মধ্যেও গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল তীব্র। যেখানে কবিগান হবে শুনতেন সেখানেই যেতেন। ধুয়া ধরতেন, তাল বাজাতেন, কবিয়ালদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সুদর্শন তরুণ রমেশ শীলকে সবাই স্নেহের চোখে দেখত। আঠার বছর বয়সে চট্টগ্রামের সদরঘাট অঞ্চলে দুই বিখ্যাত কবিয়ালের আসরে হঠাৎ একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে গান ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। এ সময় রমেশ শীল গান গাওয়ার ইচ্ছা জানায়। সেই আসরে উঠে রীতি অনুযায়ী দেবদেবীর বন্দনা করে তিনি উপস্থিত জনতার প্রতি প্রণিপাত জানান। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কারণ কোন কবিয়াল ইতিপূর্বে জনতাকে প্রণিপাত জানিয়ে গান গায় নি। সেদিনের রাত্রির গান থেকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে, তিনি কবিয়ালরূপে স্বীকৃতি পেলেন।

বছর ত্রিশেক বয়স, এবং কবিয়াল স্বীকৃতি পেয়েছেন, সে সময় তিনি মাইজভাণ্ডারের পীরের সাধনাধারায় আকৃষ্ট হন। চট্টগ্রামের দোহাজারী স্টেশনের নিকট মাইজভাণ্ডারের পীরের দরগাহ। এই পীর ছিলেন গানের মাধ্যমে মারফতী সাধনার প্রবর্তক। তাঁর কাছে কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ ছিল না—সর্বধর্ম সমন্বয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাঁর দরগায় মিলিত হয়ে উৎসব করত এবং একসঙ্গে খেত। এই দরগাহ যেন সর্বমানবের মিলনক্ষেত্র। রমেশ শীল এই পীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিক্ষা জীবনদর্শন নিয়ে অসংখ্য গান রচনা করেন। এই সব গান মাইজভাণ্ডারী গানরূপে পরিচিত। কেউ কেউ রমেশ শীলকে মারফতী সাধকরূপে গণ্য করতেন। তাঁর রচিত অসংখ্য মাইজভাণ্ডারী গানের একটি:

তার ঘরে থাকা বিষম দায়, প্রেমের বাতাস লাগল গায়
এ-জীবন মরণ সমান কথা কুলধর্ম সব হারায়।
যারে প্রেমনেশায় ধরে গৃহ-বাড়ি পুত্র নারী সকলি পাসরে।
সে ফুলের রেণু শয্যা ঘরে শুইলে অঙ্গ না জুড়ায়।
যে-জন প্রেমে মজেছে প্রেমের মরা মরে আগে অমর হয়েছে
(রমেশ বলে) শুন বন্ধুগণ আমার বাবা মাইজভাণ্ডারী প্রেমের মহাজন
ভক্তিভাবে করলে সাধন, অধরচাঁদকে ধরা যায়।

পঁচিশে বৈশাখ

শুদ্ধসত্ত্ব বসাক

নিরন্ন দিনের মাঝে বৈশাখের এ অনন্য দিন
সূর্যতপা ধরিত্রী উৎসুক।
মর্ত্যপৃথিবীর ধূলি মধুরসে হয়েছে নিষেক
জন্মের পরমলগ্নে কবি সেই নব আগন্তুক।
দুঃখ-সুখ-ভরে ঘেরা প্রেমের সীমানা
ভূতলের স্বর্গখণ্ডে সে-সন্তার পুণ্য অভিষেক।
সেই দিন পঁচিশে বৈশাখ।

দাক্ষিণ্যের মাধুর্য আর রুদ্রদেবতার অগ্নিবীর্য
এ দুই মন্থন করে
মধুতিক্ত স্বাদে পূর্ণ চরিতার্থ জীবন-অঞ্জলি
সত্যের প্রসন্নমূর্তি প্রতিষ্ঠিত মর্তভূমি পরে।
আনন্দের রূপলোক সীমাস্পর্শ—সে যে অতুলনা!
সে পথিক চিরকৌতূহলী
নব পূর্বাচলে তার যাত্রাপথে অনন্ত আহ্বান।
'আবার আসিব ফিরে'—তবু তার মর্মের কামনা।

তারপর, কেটে গেছে, কেটে যাবে কত শত পঁচিশে বৈশাখ
জীবনসমুদ্র তীরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষারত নিস্তব্ধ প্রহর।
প্রকাশের তরে তার অন্তহীন প্রার্থনা।
সুনীল আকাশ আজ সন্দেহের বিষবাষ্পে ভরা,
ক্লিষ্ট ক্লিন্ন হীনতার প্রমত্ত প্রলাপে জর্জর
এ জীবনে আলোকের আশীর্বাদ আসিবে কি ফিরে?

সুরলোকে অমরসভায়
আরবার জন্মক্ষণ দেবে না কি ডাক?
দুর্যোগের অমারাত্রিশেষে
ভাগ্যচোরা অক্ষম এ ধূলির ধরায়, কোন এক পঁচিশে বৈশাখে!

লালন শাহ্‌র মত মারফতী প্রেমের গানেও তাঁর অবাধ গতিঃ

পরাণ কাঁদে তোমারি লাগিয়া বন্ধু,
নিজের জ্বালায় নিজে মরি
কার কিবা অনিষ্ট করি,
পাড়া বৈরী হল কি লাগিয়া
মন্দ বলে জাতিগণে
সেকথা কার কানে শোনে,
প্রিয়া বিনে ফাটে মম হিয়া.....

মারফতী সাধন গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শান্তির ভাণ্ডার, অশোকমালা, নূরে দুনিয়া, সত্যদর্শন, জীবনসাথী প্রভৃতি অন্যতম।

গত মহাযুদ্ধের কালে একদিকে জাপানী বোমার ভয়ে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। মিলিটারীর প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হচ্ছে, মা-বাবা সন্তান বিক্রয় করছে, নারীরা নারীত্ব হারাচ্ছে। গৃহস্থ-বধূরা মিলিটারীর রাস্তা বাঁধার কাজে মজুরী খাটছে। ঠিকাদার মজুতদার, চোরাকারবারী দেশের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, আর সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি আগলাবার চেষ্টা করছে। দেশের সেই দুর্দিনে মাইজভাণ্ডারের সাধনাঙ্গন ছেড়ে রমেশ শীল এলেন জনতার মধ্যে। বিবেকানন্দের ভাবধারায় তিনিও বললেনঃ বহু দূরে কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, যেই জন সেবিছে মানব সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গাইলেনঃ

দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনো দেশ জাগিল না কেনে।

তিনি কবিগানের রীতি ও বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে দিলেন। চট্টগ্রাম জেলার কবিয়ালদের নিয়ে এক কবিয়াল সমিতি গঠন করলেন। গ্রামে গ্রামান্তরে মানুষকে জাগাবার, দেশের শত্রুদের মোকাবেলা করবার গানে মাতিয়ে তুললেন। রমেশ শীল কমিউনিস্ট আদর্শবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। সাধক রমেশ শীল হলেন—সংগ্রামী কবিয়াল। পাকিস্তান হবার পর অনেক ঝড়-তুফান গেছে তাঁর উপর, কিন্তু মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।

আধুনিক নগরজীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রভাব সত্ত্বেও খাঁটি লোককবির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ ঘটনাবলী ইত্যাদি নিয়েও তিনি গান রচনা করেছেন এবং গেয়েছেন। চট্টগ্রামে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল—সে সম্পর্কে তাঁর রচিত গানে নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। যেমনঃ

লিখিতে গজবের কথা প্রাণে ব্যথা
কলম নাহি চলে
কি খেলা দেখাইল প্রভু সীমান্ত
চট্টলে।
চৌদ্দ কার্তিক সোমবারে চারটার পর
ছুটিল তুফান,
আতংকিত নরনারী হিন্দু-
মুসলমান
যখন পাঁচটা বাজে দেশের মধ্যে উঠে
হাহাকার
মুসলিম কর রক্ষা কর পরোয়ারদেগার
হিন্দু বলে ভগবান রাখ মান তুমি
দয়াময়
তুমি বিনে কে রাখিবে বিপদ
সময়।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে তিনি যে গান রচনা করেন সেগুলি লোকের মুখে মুখে রণধ্বনির মত কাজ করেছে। তাঁর লেখা গানের পোস্টারে সারা পূর্ববঙ্গের প্রাচীর ভরে উঠেছিল। সেই সময় তিনি রচনা করেছিলেনঃ

উঠেছে শান্তির নিশান ছুটে আয় মজদুর কিষাণ,
যাহে মিলনের বিষাদ চিন্তা ফিরে আর।
ঐ ছুটেছে সবে দলে-শান্তির পতাকাতলে,
দুর্নীতিবাজ শোষকদলে করিতে সংহার।

এই রচনা ও ভাবধারা থেকে বোঝা যাচ্ছে রমেশ শীল সচেতন শিল্পী ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাসী নিছক ভাববাদী লোককবি তিনি ছিলেন না। তাঁর রচিত চাটগাঁয়ে পল্লীগীতি, বদলতি জমানা, দেশের গান, ভোট রহস্য, তুফানের কবিতা, গান্ধীহত্যার কবিতা ইত্যাদির সমাজ-সচেতন লোককবি হিসাবে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচারক এই লোককবি পূর্ববঙ্গের জনজীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কবিগানের নতুন ধারার প্রবর্তক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি-জগতেও তিনি সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এমন একটি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে যা এদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে ভেঙে খান খান করে দিতে চলেছে। তথাকথিত পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের গুণগানে যাঁরা প্রতিনিয়ত আকাশ বাতাস মুখরিত করেন, তাঁদের কতকগুলি আচরণ দেখে এই ধারণাটাই জনসাধারণের মনে স্পষ্ট হয়ে আসে যে নিছক ক্ষমতাসীন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যার ফলে তাঁরা চিন্তা ও কর্মে এমন কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেন না যাতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কমিউনিস্টদের তবু কিছুটা বোঝা যায় কেন না তারা তাদের মনোভাব কখনো গোপন করে না। তারা রাষ্ট্রক্ষমতা চূড়ান্তভাবে করতলগত করতে চায়, এবং তার জন্য হল বল কৌশল কোন কিছুর আশ্রয় নিতে তারা কুণ্ঠিত নয়। তাদের মতে উদ্দেশ্যই উপায়ের নগ্নযাতা বিচার করে, ফলে যুদ্ধে ও প্রেমে অন্যায় বলে কিছুই নেই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরম শত্রুকেও শয্যাসঙ্গী করতে এদের কোন আপত্তি নেই, এবং এ কথাটা খোলাখুলি স্বীকার করতেও এরা কুণ্ঠিত নয়। তাদের আদর্শ ভাল কি মন্দ সেটা এখানে বিচার্য নয়, তবে একটা কথা ঠিক যে তাদের তত্ত্ব ও আচরণের মধ্যে কোন ফাঁক ও ফাঁকি নেই। তারা যে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, সুযোগ পেলেই তারা যে এই ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে দিয়ে নিজেদের মনোমত শাসনব্যবস্থা কায়েম করবে একথা তারা জনসাধারণকে শুনিয়ে আসছে ১৯৪৮ সাল থেকে। এদের চেনা যায় এবং বোঝা যায়।

কিন্তু চেনা ও বোঝা তাদের যায় না যারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু কাজে তার বিপরীত আচরণ করে। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে এরাই সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান। এদের কার্যকলাপের মধ্যে দেখে যাঁরা সত্যই পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল, তাঁরা সেই আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রই বর্ষিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন অজুহাতসমূহ রচনা প্রস্তুতি হচ্ছে।

এবারের নির্বাচনের পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একটি অদ্ভুত চেতনার বিকাশ দেখা যাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষেরও চোখে গণতন্ত্রকে তাসাদীর মতোই করে তুলেছে। এই নতুন জনপদ্ধতিটি হচ্ছে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে বিপক্ষ দলের আইনসভার সদস্যদের ভাঙিয়ে নেওয়া। যদি এই 'কুটনীতিতন্ত্র' গণতন্ত্রের স্থান দখল করে তাহলে তা দেশের পক্ষে সত্যই বিপজ্জনক হবে। তা হলে সাধারণ নির্বাচন বাস্তবিকপক্ষেই অকেজো হয়ে যাবে, যে দলের আর্থিক সম্পত্তি বেশি সেই দলই প্রয়োজনীয় সংখ্যাপরিষ্ঠতার জন্য বিপক্ষ দলের সদস্যদের কিনে নেবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে, এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে এই কুটনীতিতন্ত্র চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এখানে কতিপয় সদস্যকে কেনার জন্য টাকার খেল শুরু হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে এখানে এই কৌশল খাটে নি, কেন না এই রাজ্যের অধিবাসীরা অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন, এবং অর্থলোভে যদি কোন সদস্য নিজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন তাহলে জনতার রোষানলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রাণটুকুই খোয়াতে হত। তবুও পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যতে এই সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, এই বিষয়ে আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অবহিত করছি।

এই দুষ্ট পদ্ধতির বিস্তার যাতে আর না ঘটতে পারে তার জন্য একটি আইন করা প্রয়োজন। এবং সেই আইনটি হবে এই যে যদি কোন আইনসভার সদস্য দলত্যাগ করেন তা হলে তাঁকে পুনরায় নির্বাচনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে হবে। যেমনা যে দলের টিকিটে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন লোকে সেই দলের আদর্শকেই নির্বাচনের দ্বারা সমর্থন জানিয়েছে। ইতিপূর্বে, অর্থাৎ বিগত নয়শুন্যে, যেসব কোন সদস্য দলত্যাগ করে নির্বাচনে পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তা নৈতিক প্রেরণায়। এ বিষয়ে কোন আইনগত নির্দেশ না থাকায় যে কোন আইনসভার সদস্যই নির্বাচকমণ্ডলীকে ব্যঙ্গ দেখিয়ে কালো ভেড়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন। এই কদাচার বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। আমাদের অনুরোধ জনসাধারণ এই বিষয়ে সক্রিয়ভাবে চিন্তা

পাইকারী ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ চাই

যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসনক্ষমতা হাতে পাবার পর যে সমস্যাটা চূড়ান্তভাবে সরকারের সামনে এসে হাজির হয়েছে তা হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা। এই সমস্যাটি অবশ্য সর্বভারতীয়, এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যখন এই সমস্যা সমাধান করতে হিমসিম খাচ্ছেন, তখন রাজ্য সরকারগুলির অবস্থাও সহজেই অনুমেয়। তথাপি এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা না হলে লোকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই দোষারোপ করবে এটাও সুনিশ্চিত।

যদিও মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্ব দুই মাস বয়স্ক যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেই, তথাপি এমন একটি অস্বস্তিকর কর্মের দায়িত্ব এই সরকারের ঘাড়ে এসে পড়েছে যা তাকে বহন করতেই হবে। সাধারণ মানুষ একথা বুঝবেন না যে বর্তমানের এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে আছে বিগত উনিশ বছরের অনুসৃত ভ্রান্ত অর্থনীতি। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলধন যোগাড় করা হয়েছে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, করভার বৃদ্ধি করে ও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে, সোজা কথায় বেপরোয়া নোট ছাপিয়ে। অথচ ঈপ্সিত উৎপাদন বর্ধনে পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে, এবং বাজারে চালু টাকার পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত চালু টাকাটা আবার জনগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় নি, তার অধিকাংশ অংশই কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যার ফলে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে অপরিসীম ক্রয়ক্ষমতা এসে গেছে, তারা মোটর গাড়ি চাপছে, এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে বাস করছে, কথায় কথায় হাওয়াই জাহাজে চেপে দিল্লী বোম্বাই লণ্ডন নিউইয়র্ক যাত্রা করছে। অপর দিকে অধিকাংশ মানুষ তাদের স্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রত্যহ দারিদ্র্য থেকে অধিকতর দারিদ্র্যে নেমে আসছে।

এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথমত এই রাজ্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী এবং এখানে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাছে তাদের লভ্যাংশে কিঞ্চিৎ ঘাটতি হয় এই আশংকায় তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই ভিন্ন রাজ্য থেকে পণ্য আমদানী করছে না। এটা লক্ষণীয় যে, যে সব পণ্য পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় না, সেইগুলির মূল্যই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত পণ্যের যোগান না থাকলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, এবং অনেকক্ষেত্রে সরকারকে এই অতিলোভী কারবারীদের নিকট আত্মসমর্পণও করতে হয় বা তা না করে উপায় থাকে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বেবী ফুডের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই জিনিসটির উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে হয় না, ফলে পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে ভিন্ন রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রাক্তন সরকার বেবী ফুডের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলে বাজার থেকে এই পণ্যটি একেবারেই প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এখানকার লোভী ব্যবসায়ীরা তা আমদানী করত না, এবং ওখানকার ব্যবসায়ীরাও তা রপ্তানী করত না। ফলে এক টিন বেবী ফুড যোগাড় করা একটা বেশ সাধনার বিষয় ছিল এবং বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়তি দাম না দিয়ে তা সংগ্রহ করার উপায় ছিল না। ফলে অবস্থা এমন চরমে উঠেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাধ্য হয়ে বেবী ফুডের নিয়ন্ত্রিত মূল্য তুলে দিলেন। এখন বাজারে অবশ্য তার অভাব নেই, কিন্তু দামও আগের তুলনায় অনেক বেশি।

তাহলে কি এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে চিরকালই অক্ষম থাকবেন এবং জনসাধারণ কতিপয় ব্যবসায়ীর দয়ার ওপর বরাবরই নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হবেন? এ রকম চিন্তাকে কোনক্রমেই মনে স্থান দেওয়া যায় না। সরকারও এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে?

মাত্র দুটি রাস্তা খোলা আছে, একটি হচ্ছে উৎপাদন বাড়িয়ে প্রতিটি পণ্যে পশ্চিমবঙ্গকে স্বনির্ভরশীল করে তুলতে হবে, যাতে ভিন্ন রাজ্য থেকে কোন পণ্য আমদানী করতে না হয়। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাইকারী ব্যবসার সার্বিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। দুটি পন্থাকেই একত্র প্রয়োগ করতে হবে।

কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের হাঁড়ি শীঘ্রই আলাদা হবে। হয় অঙ্গরাজ্যগুলি মূল রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে আসবে (যা অবশ্য বাঞ্ছনীয় নয়) না হয় প্রতিটি অঙ্গরাজ্য প্রায় সার্বভৌম সত্তায় পরিণত হবে, এবং এগুলির যোগসূত্র রক্ষাকারী হিসাবে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বিহারের দিকে তাকিয়ে এই অনুমান করাটা অসঙ্গত নয়। উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে সর্বভারতীয়ত্বের মনোভাব নিয়ে বিপন্ন বিহারের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে নি। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারও বিহারের এই নিদারুণ সঙ্কটে যে ভূমিকাটি অবলম্বন করেছেন তা মোটেই গৌরবজনক নয়। যেখানে প্রায় প্রতিটি রাজ্যই এইরূপ স্বার্থপরতার মনোভাব দ্বারা চালিত হচ্ছে, সেখানে সর্বভারতীয় সংহতি বিপন্ন হবার সম্ভাবনা পদে পদে। এই কারণেই হাঁড়ি আলাদা হবার কথা বলা হয়েছে। ঘাটতি রাজ্যগুলি অতঃপর বাধ্য হয়েই সর্ব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করবে, বিশেষ করে খাদ্যের ক্ষেত্রে।

কাজেই পশ্চিমবঙ্গকে গোড়া থেকেই এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সৌভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সকল পণ্যই কিছু না কিছু উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাতে এই রাজ্যের প্রয়োজন মেটে সেজন্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি অন্য কোন রাজ্যের ওপর পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য নির্ভর না করতে হয় তা হলে দ্রব্যমূল্য আপনিই আয়ত্তের মধ্যে আসবে। তা ছাড়া চা ও পাট মারফত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারকে যে বৈদেশিক মুদ্রা যুগিয়ে যায় তারও একটা ভাগ পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে দাবি করা উচিত, যেমন কেরল থেকে নাম্বুদ্রিপাদ দাবি করেছেন, যা দিয়ে বাইরে থেকেও প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করা যায়।

কিন্তু শুধুমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা মিটবে না, তা হলে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলিতে এই সমস্যা থাকত না। উড়িষ্যা ধান-চালের দিক থেকে উদ্বৃত্ত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও গত বছরে কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের কথা ভোলবার নয়। এই জন্য দরকার পাইকারী ব্যবসার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। বস্তুত এদেশে উৎপাদনের চেয়ে বণ্টনের সমস্যাই অধিকতর তীব্র, কেন না অধিক মূল্যে এখানে কোন বস্তুই দুর্লভ নয়। কাজেই সরকার এই মর্মে এখনই একটা আইন করুন যে উৎপাদকগণ, বিশেষ করে যাঁরা খাদ্যদ্রব্য ও অপরাপর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করেন, কি কৃষিজ কি শিল্পজাত, তা তাঁরা একমাত্র সরকারের নিকটই বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন। খুচরা বিক্রেতাগণ সরকারী গুদাম থেকে মাল কিনে নিয়ে ন্যায়সঙ্গত লাভে তা বিক্রয় করবে, কেউ বেশি দাম নিলে সরকার তখনই তার টুঁটি চিপে ধরবেন।

বস্তুত কতকগুলি পণ্যের পাইকারী ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজন এই মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছে, বিশেষ করে যেগুলি খাদ্য সম্পর্কিত। তা ছাড়া এই মুহূর্তে আরও দুটি কাজ করার আছে, একটি হচ্ছে চালকল ও অপরটি হচ্ছে কোল্ড-স্টোরেজ জাতীয়করণ। এই দুটি কাজ করলে মজুতদারীর দুটি স্তম্ভকে ধূলিসাৎ করা যাবে।

অবশ্য সরকার পরিচালিত পাইকারী ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত সার্থক হতে পারে না যতক্ষণ না ঘুঘুরা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা যাচ্ছে যা সেখানে নতুন রক্ত প্রবেশ না করানো হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত তরুণদের এই সকল ক্ষেত্রে নিযুক্ত করলে ভাল ফল হবার সম্ভাবনা আছে। যাঁরা বৃটিশ আমল থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে দখল করে বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কারো কারো কর্মদক্ষতা থাকলেও নতুন যুগের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে তাঁরা ততটা ওয়াকিবহাল নন, ফলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা

জিনগত পাপক্ষয় করতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তাঁদের মাথা থেকে হয়ত মাঝে মাঝে পরিকল্পনা গজায়, কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে যে রকম পরিশ্রম করা উচিত তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা করে উঠতে পারেন না, অধস্তন কর্মীদের মধ্যেও নতুন আদর্শ নিয়ে কাজ করার স্পিরিট তাঁরা সঞ্চার করতে পারেন না, ফলে বহুক্ষেত্রেই শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর রচিত হয়।

বস্তুত মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কট দূর করার জন্য পাইকারী ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণ ভিন্ন কোন গতি নেই। মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে আসুন, এটাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শত্রুর অভাব নেই। প্রতি মুহূর্তে তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পথে বসাবার চেষ্টা করছে। আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য খুব সহজেই জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কাজেই জনগণের এই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবীরা আবার ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করবে। এখনো জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের অল্প বয়স ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা স্মরণে রেখে নিজেদের অসুবিধা সত্ত্বেও সরকারের পিছনে আছেন। তাঁরা আশা করেন যে বর্তমান সরকার দৃঢ় পদ্ধা অবলম্বন করে মূল্যবৃদ্ধিজনিত দেশব্যাপী দুর্দশার প্রতিকার করবেন। তাদের এই আশার অন্তত কিছুটা পূরণ করাও এই মুহূর্তে কর্তব্য।

আর অনুকম্পা নয়

ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ধানচালের মজুতদারদের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করে এসেছেন। আমরা এই কথা ইতিপূর্বে বারবার বলেছি যে, মূলের পরিবর্তনের নীতি কার্যকরী হবে যে উপায়ে, সেই উপায়ে ভারতবর্ষের মজুতদারদের মেরুদণ্ড গঠিত নয়।

একটা স্থূল সত্য, যা এদের ব্যবহারে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে, তা এই যে বাস্তবিকই পশ্চিমবঙ্গে ধান-চালের অভাব নেই। এটা এই কারণেই প্রমাণিত হয়েছে কর্ডন প্রথা শিথিল হলেই খোলাবাজারে চালের দাম অনেকটা পড়ে যায় আর কর্ডনের বেড় একটু আঁট হলেই চালের দর হু হু করে চড়তে আরম্ভ করে। এটার প্রমাণ বিগত মন্ত্রিসভার আমলেও হয়েছে।

চাল আছে অথচ প্রয়োজনমত তা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ একটিই। যারা ধান-চাল মজুত করে রেখেছে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। মজুতদার স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ধান-চাল সংগ্রহে বেরিয়ে আসবে এই আশা করা বাতুলতা। তাদের ঘাড়ে ধরে বার করতে হবে। এই কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু চালকলওয়ালারা এবং মজুতদারেরা প্রকাশ্যে যেন বিদ্রোহ করেছে।

ধান-চালের সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার আশা করেছিলেন যে ভাল দাম দেবার ফলে মজুতদারেরা স্বেচ্ছায় নিজেদের মজুত করা ধান-চাল সরকারকে বিক্রয় করবে। এই কারণে সরকার লেভি আদায় ও কর্ডনের কড়াকড়িও হ্রাস করেছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাই মজুতদার মনে এতে নরম হয় নি। অগত্যা যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও বাধ্য হয়ে কঠোরতর ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে।

এখন চরমপন্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, এবং এই ব্যবস্থা যত শীঘ্র গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন প্রয়োগের মারফত চালের বাজারে রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্রিয় না পর্যন্ত কর্ডনকড়া করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় এরা এক ছটাক চাল দিয়েও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।

গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম যে, মজুত উদ্ধারের জন্য তথা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের সঙ্গে জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হবে। সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও আনা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম যে গণকমিটি নিয়ে যে এত হৈচৈ তোলা হচ্ছে, এই সব ক্ষেত্রে সেই গণকমিটির কাজের কোন নিদর্শন দেখা যাচ্ছে না। সুখের বিষয়, একটি রাজনৈতিক দল এই বিষয়ে সচেতন হয়ে একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছেন। মজুত খাদ্য উদ্ধার ও মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে পশ্চিমবঙ্গ মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি আগামী পক্ষকালের মধ্যে রাজ্যব্যাপী এক ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মজুত খাদ্য উদ্ধার করে তা তাঁরা স্থানীয় জনগণের নিকট বিক্রয় করবেন, আলু তাল তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য পাইকারদের ঘেরাও করা হবে এবং প্রয়োজন হলে জনস্বার্থবিরোধী জেলা ও মহকুমা শাসক সহ সরকারী অফিসারদের ঘেরাও করে দাবি আদায় করা হবে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হবে মজুতদার ও বৃহৎ ধান-চালীদের জনসাধারণের রায় মানতে বাধ্য করা ও জনগণের চাপে সরকারকে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করা।

উক্ত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য কেন না জনতা সক্রিয় না হলে কোন জলন্তরই সমাধান হবে না। নির্বাচনের অব্যবহিত পরে জনসাধারণের যে আবেগ উদ্দীপিত হয়েছিল মালার অবস্থার রূপে, তা আবার বহুলাংশে নির্বাপিত হয়েছে। সে সময় মজুতদারেরা ভয় পেয়েছিল। আজ যদি আবার জনতা জেগে ওঠেন তবেই বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের সমাধান হবে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির নিকটও আমাদের অনুরোধ তাঁরাও যেন গতানুগতিক জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে মজুত উদ্ধারের কাজে এগিয়ে আসুন।

এদিকে মন্ত্রিসভাও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, খাদ্যনীতি এখন শক্ত হাতে কার্যকরী হবে, এবং নীতির কাঠামোর কোন রকম অদল-বদল হবে না। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা এই বৈঠকে একমত হয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে এখনই মজুত বিরোধী অভিযান শুরু না করলে জোতদার ও অন্যান্যরা ধান-চাল গোপন করে ফেলবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বর্ধিত শক্ত হতে নির্দেশ দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সরকারী কর্মচারীরা যেন সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে খাদ্যনীতিকে রূপ দিতে প্রয়াস পান। ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে তাঁদের মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুসারেই চলতে হবে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ লক্ষ্যে পৌঁছান আদৌ অসম্ভব হবে না। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতাতেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বুঝেছেন (জনৈক মন্ত্রীর ভাষায়) কানে জল না দিলে জল বার হয় না।

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি নিবেদন—(৫)

এবারে সিলেবাসের কথা কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেন না আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে যে এখানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে কোন সঙ্গতি নেই এবং তার জন্য প্রচলিত সিলেবাস সর্বতোভাবে দায়ী।

ছাত্র-ছাত্রী কোন বিষয়ে প্রকৃতই কিছুটা শিখুক, সিলেবাস রচনার নিশ্চয়ই এই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রী নিজে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন, কাজেই ইংরাজীর সিলেবাস দিয়েই শুরু করা যাক।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আজও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যম ইংরাজী। ডক্টরেট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট স্তরের সকল গ্রন্থই ইংরাজীতে রচিত। কাজেই যারা স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে যাচ্ছে তাদের ইংরাজী বক্তৃতা শুনে বোঝার ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী পড়ে বুঝতে পারার মত জ্ঞানলাভ থাকার দরকার। কিন্তু স্কুল স্তরে ইংরাজী ভাষায় যা পড়ানো হচ্ছে তাতে তা মোটেই সম্ভব-

পর নয়। কেন নয় তা এখানে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ বছর থেকে হায়ার সেকেন্ডারীর দুইশত নম্বরের ইংরাজীর পেপারে পঞ্চাশ নম্বরের একটি টেক্সট বই দেওয়া হয়েছে। বাকি সবই বাইরের থেকে আসে যেমন্তলির মধ্যে আছে ইংরাজীতে রচনা লিখন, অধ্যোপকথন, সার সংক্ষেপ, একটি অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্নোত্তর, পত্র লিখন, অনুবাদ ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের উত্তর লিখতে কিছুটা স্বাধীনভাবে ইংরাজী লিখনের ক্ষমতার প্রয়োজন। কেন টেক্সট বই উত্তমরূপে পড়ানো হলে ইংরাজী ভাষারীতি ও বাক্য রচনার ধারণা ছাত্র-ছাত্রীর মনে ভালভাবে জন্মায়। আমাদের ম্যাট্রিকুলেশনে ভেতিত কপারফিল্ড নামক একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস পড়ানো হত যে বইটির অধিকাংশই রচনাশৈলীর সুখে আমাদের সুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো, তা ছাড়া নির্বাচিত গদ্য ও কবিতা, একটি রূপায়িত রীতির ইত্যাদি ছিল। সেগুলি থেকে প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি তৈরি করতে গিয়ে হয়ত অনেক কিছুই সুখস্থ করতে হত, কিন্তু তার একটা সুফল ছিল এই যে এতে ইংরাজী ভাষারীতি ও বাক্য রচনার কৌশল আমাদের সহজেই আয়ত্ত হত। কিন্তু বর্তমানে টেক্সট বই মনোযোগ দিয়ে পড়ার ঐতিহ্যটিকে একেবারে কোপ মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানের সিলেবাস অনুযায়ী গাদা গাদা প্রোজ ও ইডিয়ম ছেলেদের সুখস্থ করতে বাধ্য করা হয়, যেগুলির মধ্যে দু-চারটি ছাড়া বাকিগুলি কোন কাজেই আসে না।

ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার প্রতিও দুর্ভাগ্য অবহেলা বর্তমান সিলেবাসে করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি আগে শেখানো হত। এখন নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে আমালিসিস করানো হয়, কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ওই মূলসূত্রগুলি না শেখানোর জন্য ছাত্রের আশ্রয়ে তিল মারা ভিন্ন আর কোন পথ নেই। যে ছাত্রকে জীবনে কোনদিন অবজেক্টিভ কেস শেখানো হল না, তাকে এখন অ্যানালিসিস করতে গিয়ে কোন্ বাক্যাংশ ক্রিয়াপদের কর্ম আর কোন্ বাক্যাংশ ক্রিয়াপদের গুণ প্রকাশ করছে তা নিয়ে হিমসিম খেতে হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিই বা আছে? পার্টিসিপল কথাটির সঙ্গেই যে কোনদিন পরিচিত নয় তাকে যখন পার্টিসিপল সহযোগে একাধিক বাক্যকে যুক্ত করতে হয়, তারই বা অবস্থা কি রকম হয়? ভার্ব, টেন্স, মুড, কেস ইত্যাদি সম্বন্ধে যে অনেক কিছু খুঁটিয়ে জানবার প্রয়োজন আগে ছিল, কিন্তু এখন নেই। ফল ফল হয়েছে এই যে ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী লিখন ক্ষমতা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ব্যাকরণকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞা করার ফলে ছাত্রেরা না পেরেছে শুদ্ধভাবে বাক্য রচনার কৌশল শিখতে এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্যকে অস্বীকার করার তাদের না হয়েছে ভাষারীতি সম্বন্ধে জ্ঞান, না হয়েছে ভাল কোন রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচয়। অথচ ছাত্র-ছাত্রী তাদের সর্বাধিক সময় ইংরাজীর জন্যই ব্যয় করে। নবমের দুঃখের বিষয় তিরানব্বই পর্যন্ত বয়সে থাকা চোদ্দটি বছর ইংরাজীর পিছনে মেরে থেকেও ভাষাটি ছাত্র-ছাত্রীর আয়ত্তে আসে না।

অথচ আমরা দেখেছি পরিণত বয়সে একটি যে কোন বিদেশী ভাষা শিখতে দু বছরের বেশি সময় লাগে না। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কলকাতা সহরের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে খবর নিলেই সব কিছুই অবগত হবেন। তাই যদি হয় তাহলে ইংরাজীর পিছনে বারো বছর নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নিজে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত, ইংরাজী ভাষার সকল মারপ্যাঁচই তাঁর জানা আছে। কাজেই তাঁর নিকট আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ যে তিনি নিজ হস্তে একটি সার্থক ইংরাজীর সিলেবাস প্রস্তুত করুন যাতে অল্প আয়াসে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালোভাবে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। এই কাজটি করলে তিনি প্রকৃতই একটি মঙ্গলজনক কাজ করবেন যা চিরদিন প্রশ্নার সঙ্গে সকলে স্মরণ করবে।

এই প্রসঙ্গে তাঁর নিকট আরও একটি অনুরোধ আছে। তা হচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরাজী টেক্সট বই দুটি ভালভাবে পরীক্ষা করা, বিশেষ করে ওই দুটি বই-এর অনুশীলনীগুলি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ওই জাতীয় বই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী নয়, এবং ওই দুটি বই অবলম্বন করে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনদিনই ইংরাজী ভাষা শেখানো সম্ভবপর হবে না। আমাদের অনুরোধ তিনি যেন নিজে ওই দুটি বইকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন।

বামপন্থী দলগুলি ভেবে দেখুন

যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থাপিত হবার পর এটা খুবই দুঃখের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী নেতৃবর্গের মধ্যে ঐকমত হওয়া সত্ত্বেও কর্মীস্তরে এখনো তেমন কোন ঐকমত্যের সৃষ্টি হয় নি।

প্রাক-নির্বাচন পরিস্থিতি যেমন ছিল, নির্বাচনের পরেও সে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় নি। বিভিন্ন বামপন্থী দলের কর্মীরা আজও পর্যন্ত একে অন্যের উদ্দেশ্যে বিষোদ্গার করে যাচ্ছেন। এর ফলে জনসাধারণের মনে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

বিভিন্ন বামপন্থী দলসমূহের মুখপত্রগুলিতেও পরস্পরের প্রতি সেই একই বিদ্বেষমূলক আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে সমগ্র পরিবেশটাই ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে উঠছে যার অত্যন্ত প্রভাব মন্ত্রিসভারও ওপর পড়তে চলেছে।

বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক, এবং আদর্শগত বিতর্ক চলাটাও স্বাস্থ্যকর। একে অপরকে আক্রমণ করুন রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক মতবিরোধের ভিত্তিতে, তাতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি একে অপরের ওপর পূর্বের মত দোষারোপ করতে ও কুৎসা রটাতে থাকেন, সেটা কি একটু কষ্টকল্পনা বিষয় হয়ে পড়ে না?

যুক্তফ্রন্ট সরকার এখনো পায়ের তলায় শক্ত মাটি পান নি। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে কর্মীস্তরে ঐক্য গড়ে না উঠলে প্রতিক্রিয়াশীলেরাই তার যে সুযোগ নেবে সেকথা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না।

কায়েমী স্বার্থ প্রত্যক্ষ চেষ্টা করছে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার। এও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের চাকনা খুলে দিয়ে তলায় তলায় বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে। তথাকথিত জনুন্নত শ্রেণীর, বা জাতির, কতিপয় নেতা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে এই ফাঁদে পা দিয়েছেন তাও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অনেক রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে যা পাওয়া গেছে তা যদি কতিপয় রাজনৈতিক দলের অপরিণামদর্শী নীতির ফলে নষ্ট হয় তাহলে জনসাধারণ তাঁদের ক্ষমা করবেন না। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক যে সব রাজনৈতিক দলগুলি আছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে তাঁরা নিজেদের দলগুলির দিকে বেশি করে নজর রাখুন, এবং অপরাপর শরিকদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করুন।

কিস্তিবন্দী হিসাবে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৩০৲ টাকা কিস্তি হিসাবে অভঙ্গুর, প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার ক্রয় করুন। মূল্য ৩২০৲ টাকা।

আবেদন করুন :

Jagsons Agencies (WBC—88)
P.B. 1212, Delhi-6.

আকাশবাণীর স্বৈরাচার

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কার্যকলাপ দেখেশুনে মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানটি যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের অর্থে পরিচালিত। তা নইলে কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলীহেলনে সেখানে চূড়ান্ত অনাচার শুরু হয়েছে? আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিদের বেপরোয়া কাজকর্ম দু-একদিনের ব্যাপার নয়। তাদের মৌরসীপাট্টা দীর্ঘদিন ধরেই অব্যাহত গতিতে চলেছে। বেতার-শ্রোতা ও জনসাধারণের কোনো অনুরোধ, ইচ্ছা বা পরামর্শকে আকাশবাণীর স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা গ্রাহ্য করেন না, দু'-চারজন পেটোয়া ব্যক্তি ছাড়া (তার মধ্যে নায়ীর সংখ্যাই বেশি) কারও কথায় কর্ণপাত করার মতন প্রয়োজনও বোধ করেন না।

আমাদের প্রশ্ন, আকাশবাণীতে যে অনিয়ম ও অন্যায়ের রাজত্ব চলছে, তার প্রতিবিধানে কি কারও কিছু করার নেই? কেন্দ্রীয় সরকার কি তবে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতে তুলে দিয়েছেন বা তুলে দিতে চলেছেন? যদি তুলে না দিয়ে থাকেন, (বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের হাতে আকাশবাণী তুলে দেওয়া অসম্ভব) তবে শ্রোতা ও জনসাধারণের স্বার্থে অবিলম্বে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। শ্রোতা ও জনসাধারণ আর অসহায় হয়ে থাকতে পারেন না, নগদ পয়সা খরচ করে তাঁরা আর মুখ বুজে আকাশবাণীর অনাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নন।

আমরা কলকাতার কর্তৃপক্ষকে বহুবার সতর্ক করে দিয়েছি, তাঁরা যেন আকাশবাণীতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত অনাচার দূর করতে এগিয়ে আসেন। এ বিষয়ে কতগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগও আমরা তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু কোনো অভিযোগ সম্পর্কে কার্যকর কিছু করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অভিযোগের যথার্থতা চ্যালেঞ্জ করার সাহসও কারও হয় নি বলে ধরে নিয়েছি, আমাদের অভিযোগসমূহ পরিপূর্ণ সত্য।

এবং এই সত্যতা প্রমাণিত হবার পর, এটাই আশা করা গিয়েছিল যে, পুরাতন অপরাধের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবের নিকট আমাদের দাবি ছিল—কলকাতা বেতার কেন্দ্রটিকে ঘষে-মেজে সাফ করুন, পরিষ্কার করুন। বিস্মিত হয়ে আমরা দেখেছি, দিল্লীতে অকস্মাৎ পর্যায়ে তাবির-তদারকের ফলে প্রতিবিধান তো দূরে থাকুক, সব ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। একজন মহিলা কর্মচারীর সক্রিয় ভূমিকায় সব ধামাচাপা পড়ে যাওয়ায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের যথেচ্ছাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। কর্তারা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন যে, রাজ্যের প্রমমন্ত্রীর বক্তৃতার ওপর কলম চালাতেও এঁদের সামান্যতম দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এ ব্যাপারেও আকাশবাণীর সেই মহিলা কর্মচারীটির প্ররোচনা ছিল বলে আমরা খবর পেয়েছি। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে. কে. শাহ বলেছেন, 'নিজেদের নীতি প্রচার করার জন্যে প্রত্যেক রাজ্য সরকার আকাশবাণীর সাহায্য নিতে পারেন। নিজেদের কর্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারের আছে এবং সেই কাজে আকাশবাণী তাদের সহায়তা করবে।' বক্তৃতার অংশ কেটে ফেলা সম্ভব হয় নি পশ্চিমবঙ্গের প্রমমন্ত্রীর পক্ষে। তিনি যে অনধিকারচর্চা কিছু করেন নি, তাও তিনি বিবৃতির দ্বারা জানিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও একমাত্র কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ার জন্যেই প্রমমন্ত্রীর পক্ষে বেতার মারফৎ বক্তৃতা দান সম্ভব হয় নি।

এতদিন জনসাধারণকে বুড়ো আঙুল দেখাতে অভ্যস্ত কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ এখন জনসাধারণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত সরকার ও তাঁর মন্ত্রীদেরও অগ্রাহ্য করতে দ্বিধান্বিত নয় দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

প্রসঙ্গত আমরা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিই, এই পত্রিকা এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার তাঁরা চোখ দিলেই বেতার কর্তৃপক্ষের অতীত কেলেঙ্কারীর কথা অবহিত হবেন। এতদিন ধরে এই কর্তৃপক্ষ জানি না কোন্ সাহসে যা ইচ্ছে তাই চালিয়ে আসছেন। এখন তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, যা-ইচ্ছে-তাই-এর যুগ আজ আর নেই। নেই বলেই পুরাতন অপরাধের পুনরাবৃত্তি আর চলবে না। বেতার কর্তৃপক্ষ যে প্রোগ্রাম তৈরি করবেন, তা বিশেষ 'মান' অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করতে পারছে কি না তাও দেখতে হবে। ইদানীং যেসব প্রোগ্রাম হচ্ছে, তা যে কোনো নিয়মিত শ্রোতার কাছে বহুলাংশে পীড়াদায়ক ও অরুচিকর। তা ছাড়া এই কলকাতা বেতার মারফৎ কিছু ব্যক্তিকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য পোষণ করা হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ নতুন নয়। তা ছাড়া যথার্থ গুণী-ব্যক্তিরা, যাঁরা সাহিত্যিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধেয় বর্তমান কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনেককেই ছাঁটাই করেছেন। কর্তৃপক্ষের চোখে তাঁরা অপরাধী হয়েছেন এই কারণে যে, বেতার কর্তৃপক্ষের নির্লজ্জ প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন, শাণিত কলম ধরেছেন। আমরা এমন একজন প্রবীণ সাহিত্যিককে জানি, যিনি আকাশবাণীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হয়েছেন, আকাশবাণীতে তাঁর কণ্ঠস্বর আমরা আর শুনতে পাই না। বরং কর্তৃপক্ষ যাঁর সাহায্যে অপরাধ নিজেরাই করলেন, তাঁর চাকরি পাকাপোক্ত করে দেওয়া হল। অপিচ তিনি চাকরির নামে দলপোষণ করতে লাগলেন প্রীতিভাজনদের বারবার প্রোগ্রাম দিয়ে। নিজের কোনো সাহিত্যিক খ্যাতি না থাকলেও বেতার মারফৎ নিজের প্রচার নিয়মিত শুরু করলেন। এতসব কথা বলা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। একবার কলকাতা কেন্দ্রের 'আকাশবাণী' পাক্ষিক পত্রিকাটির পাতা উল্টোলেই কিছু গর্হিত নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য 'আকাশবাণী' পত্রিকাটিতে বহু নামই অলিখিত থাকে। অলিখিত নামের ঘোষণা যাঁরা আকাশবাণীতে শুনেছেন তাঁরা একই নাম বারে বারে শুনে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বিরক্তির কারণ এই যে, স্বদলীয় কয়েকজন ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিক কি নেই? খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে নিজেকে এবং বিশেষ বিশেষ লোকজনকে ডেকে এনে মনোমত প্রোগ্রাম দেবার ব্যবস্থা করার কারণ কি? যিনি নিজে আকাশবাণীতে চাকরি করেন, তিনি কিভাবে আকাশবাণীকে নিজের প্রচার মাধ্যম করে তুলতে পারেন? যাঁরা সাহিত্যের খবর কিছুটা রাখেন, তাঁরা জানেন যে, এঁর নাট্যকার হিসেবে কোনো খ্যাতিই নেই এবং বাংলাদেশে অখ্যাতরাও অপাঠ্য দু-চারটে কবিতা যেমন লেখে, ইনিও তেমনি লিখে থাকতে পারেন, তবু এমনই শ্রোতাদের দুর্ভাগ্য যে, ১৭ মে '৬৭ তারিখে তাঁর কাব্যপাঠ এবং ১৯ মে '৬৭ তারিখে তাঁর লিখিত নাটক বেতার মারফৎ শুনতেই হবে। মাত্র একদিন পর এমন প্রচার-সুযোগ বাংলাদেশের খ্যাতিমান ক'জন সাহিত্যিকই বা পেয়ে থাকেন, তা আমাদের জিজ্ঞাস্য।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর দরবারেও পেশ করলাম। প্রতিকার সম্ভব না হলে একদিন যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তদ্দ্বারা কলকাতার বর্তমান বেতার কর্তৃপক্ষের রক্ষিত ধনের সঙ্গে ঐ রক্ষককেও বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

ব্রজবালিকা

তারাপদ পাল

অপেশ্বর, শুশময় আর বারিদবরণ—তিন বন্ধুতে বেরিয়েছিল শহরের কোলাহল থেকে দূরের কোন গ্রামে—শ্যামলিমার বুকে খানিকটা মুক্তির স্বাদ উপভোগ করে আসবে। এমন অবকাশ তাদের জীবনে খুব কমই মেলে। অবশ্য শহরবাসী সকল মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনেই এই একই কথা। সাধারণত সপ্তাহে একটিমাত্র ছুটির দিন—জমিয়ে রাখা নানা কাজের ভিড়েই কেটে যায়। তার মধ্যে থেকে তবুও এই দিনটাকে তারা এমনি করে বেড়াবার জন্যে ঠিকই বার করে নিয়েছিল—বিশেষ করে অপেশ্বর। বেচারী সাংবাদিক মানুষ। তার জীবনের সবটাই বেড়ানর আর কাজের। কিন্তু কাজের বেড়ানর কি আর মন ভরে, না তৃপ্তি পাওয়া যায় বেড়ানর। বিশেষ বিশেষ কতকগুলো বাঁধা নিয়মের গণ্ডিতে—সুনির্দিষ্ট হিসেবের ছাপে ছাপে সে সব কিছুকে খতিয়ে দেখে। দেখতে হয়। আর দেখতে দেখতে তার মনের দেখাটাও যেন অমনিভাবেই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। তাই সপার্ষদ বেড়াবার এই ব্যবস্থায় মনে মনে বেশ খুশিই হয়ে উঠেছিল সে।

এমন কোন দিনক্ষণ দেখে নয়। হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল সব। কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে—পুবে। তা' প্রায় তিরিশ-বত্রিশ মাইল হবে। ভাঙা-চোরা অসমতল পথ দিয়ে 'পাবলিক বাসে'র ঝাঁকুনি খেতে খেতে তারা চলছিল ঘুলো-ওড়া পথে।

দমদম এরোড্রামের পাশ দিয়ে ঘুরে বাসটা চলে গেল। দু'পাশে ধানক্ষেত। ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে দু-চারটে বাড়ি পথের গা ঘেঁষে। কোথাও বেড়া দিয়ে ঘেরা সীমানা করা জমিতে স্বত্বাধিকারীর নাম-ধাম লটকানো নিশানা। পথটা বড়ই আঁকাবাঁকা। মাঝে মাঝে সাপের থেকেও বঙ্কিম। কখনো বা কেন্নোর মতো কুণ্ডলী পাকান মনে হয়।

গন্তেহর মুখে এসে শেষ হয়ে গেল বাসের যাত্রা-পথ। এবার হাঁটার পালা। কিছুটা এসে খেয়া পার হতে হল। তার-পরও খানিকটা গিয়ে আঁকাবাঁকা পথ

পেরিয়ে নির্দিষ্ট গৃহদ্বারে পৌঁছানো গেল। গৃহস্বামী তাদের জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলেন। সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে অতিথিদের নিয়ে গেলেন ঘরে।

হাত-মুখ ধুয়ে নরম বিছানায় ওপর ওরা শরীর এলিয়ে দিল বিশ্রামের জন্য।

চা-জলখাবারের পর্বটা সেরে বেরিয়ে পড়ল তপেশ্বর।

পাশেই বিরাট গঞ্জ। খালের এপার-ওপার—দু'পারেই জাঁকিয়ে বসেছে পশারিরা বাণিজ্য-ব্যপদেশে। বড় বড় বাঁধা দোকান। তা' ছাড়া সাময়িক ব্যপারিদের পশরা সাজাবার জন্য প্রশস্ত খোলা জায়গা। কত লোকের আনা-গোনা সেখানে। কেউ বা চলেছে শুধুই কেনার জন্যে, কিংবা বিক্রির জন্যে—আবার কেউ কেউ চলেছে লেনদেন করতে। মন্দ লাগে না তপেশ্বরের।

খবর নিলো বিকেলেই জমে উঠবে গঞ্জ। হাজার হাজার লোক আসবে বেচ-কেনা করতে। হরেক রকম দ্রব্যসম্ভার জমবে। খুচরো, পাইকিরি, সব রকমের কাজ-কারবারই চলবে।

সিগার ধরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলছিল তপেশ্বর। এক বৈষ্ণবী আসছিল গান গাইতে গাইতে। হাতে তার একতারা। সাদা থান পরিহিতা, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে, রসকলি আঁকা মুখমণ্ডলে তুলসীর মালা জড়ান কণ্ঠে। বেশ দেখতে লাগছিল বৈষ্ণবীকে। বয়সও এমন কিছু নয়। যৌবনের ভারে যেন টলমল করছিল তনু অঙ্গ। এমনি বৈষ্ণবীদের নিয়েই কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের রোমাণ্টিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কাব্য বা গল্পের নায়িকা এমন বৈষ্ণবী না হলে কি মানায়!

বৈষ্ণবী গাইতে গাইতে আসছিল :

"বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥"

তার সঙ্গে সাত-আট বছরের একটি মেয়েও ছিল। সেও গাইছিল বৈষ্ণবীর সঙ্গে, সুর দিচ্ছিল গানে। তার পরনেও ছেঁড়া থান। দু'হাতে শুধু দু'গাছা বালা। নিশুত গড়ন। চোখে-মুখে কোথাও তার দুখের আঁচ লাগে নি। মনে যেন আনন্দের তুফান বইছে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তাদেরকে দেখছিল তপেশ্বর। ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল ওরা। গানের শেষ কলিগুলোও বেশ স্পষ্ট হয়ে এল :

"চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা।"

তপেশ্বরের সামনে এসে তারা এক-লহমার জন্যে থামলো। তপেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বৈষ্ণবী বললো : 'পিরীতির জ্বালা বড় জ্বালা গো ভাই। মরণেও সে জ্বালা থামে না।'

হেসে ফেলল তপেশ্বর। ঠিকই বলেছে বৈষ্ণবী।

তপেশ্বর জিজ্ঞেস করলো : 'সঙ্গে এটি কে?'

: 'ঐ তো আমার জ্বালা।' সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কেটে বললো : 'রাধা-মাধব—ছি ছি কি বললাম! ঐ তো আমার সব গো ভাই। আমার রাধিকা, আমার কানু। ওকে নিয়েই তো আছি এ-সংসারে। না হলে কবে বৃন্দাবন চলে যেতাম।'

জিজ্ঞেস করলো তপেশ্বর : 'তোমার মেয়ে?'

: 'হ্যাঁ গো। ওকে কোলের রেখে বিদায় নিলো ওর বাপ। তখন থেকে ওকে আগলিয়েই বেঁচে আছি। আর কানুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যেদিন তার সন্ধান পাব, তারই হাতে আমার প্রাণের রাধিকাকে সঁপে দিয়ে আমিও মুক্তি নেব।'

ফ্যালফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল মেয়েটি। এ সব সে বোঝে কি না সেই জানে। তবুও বলে ফেলে : "বঁধু, কি আর বলিব তোরে। অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।"

হেসে উঠে তাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বৈষ্ণবী। হেসে ওঠে তপেশ্বর।

: 'চলি গো ভাই। আবার হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে পথে।'

মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে গান ধরে তারা এগিয়ে যায়। কি যেন ভেবে পিছু ডাকে তপেশ্বর : 'শোনো গো বৈষ্ণবী।' পিছু ফিরে তাকায় ওরা। পথ চলতি লোকেরা ওদের দু-একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে চলে যায়। এগিয়ে যায় তপেশ্বর। বৈষ্ণবী বলে : 'বৈষ্ণবী বটে, তবে আমার নাম মাধবী গো ভাই। মাধবী বলেই ডেকো। কোন অপরাধ হবে না। তা হঠাৎ পেছু ডাকলে কেন?'

পকেট থেকে একটা দু'টাকার নোট বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে তপেশ্বর বললো : 'তোমাদের রীতিনীতি জানিনে মাধবী। এ দিয়ে তোমার মেয়েকে মিষ্টি কিনে দিও—ও যা ভালবাসে তাই।'

: 'এর নাম রাধা। তা তুমি এরই মধ্যে প্রেমের ফাঁস লাগিয়ে বসলে ভাই। এতে যে বড় জ্বালা গো, বড় জ্বালা।'

: 'তা হোক। রাধা নাম যেন সার্থক হয় এর।'

: 'ও কি বললে ভাই! সারা জীবন যে তাহলে পিরীতির জ্বালায় জ্বলে মরতে হবে গো।'

: 'না গো মাধবী না। তোমার রাধাকে কেউ জ্বালাতে পারবে না। ননী-চোরা শ্যামকে তোমার রাধা আঁচলে বেঁধে রাখবে।' রাধাকে আদর করে বলে : 'কি গো রাখবে—রাখবে না?' ফিক্ করে হেসে ফেলে মুখটা লুকিয়ে নেয় মায়ের গায়ে।

বৈষ্ণবী বলে : 'তোমার কথাই যেন ফলে। তাহলে চলি ভাই।'

: 'এসো।'

গাইতে গাইতে চলে যায় বৈষ্ণবী মাধবী আর তার মেয়ে রাধা। তপেশ্বরের মনে গুন্‌গুন্ করতে থাকে—'চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা।'

একটা সিগার ধরিয়ে পায় পায় এগিয়ে যায় তপেশ্বর। হঠাৎ জনৈক বৃদ্ধ বলে : 'কি বাবু, নিল তো দু'টো টাকা খসিয়ে। হুঁ-হুঁ, ও বড় চালাক মেয়েমানুষ বাবু। বৈষ্ণবী সেজেছে—ঠাকুরের নাম করে। বলি ঐ রূপ-যৌবন নিয়ে কি আর পথে না বেরোলে নয়! ঠাকুরের নাম কি ওর মুখে মানায় বাবু! ও বড় খারাপ মেয়েমানুষ। সন্ধ্যে হলেই কত লোকেরই না ভিড় হয় ওর ঘরে। শুনি, তারা নাকি রাতও কাটায় সেখানে।'

একসঙ্গে এতগুলো কথায় বিরক্ত বোধ করে তপেশ্বর। বলে : 'তা শোনেন, নিজের চোখে দেখেন নি তো?'

: 'ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন—দেখবো কি করে। আমি কি আর ঐ খারাপ জায়গায় যেতে পারি যে দেখবো।'

: 'তা একদিন গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসবেন?'—বলে চলে যাচ্ছিল তপেশ্বর। কিন্তু আর একটা মন্তব্য কানে যেতে থেমে গেল সে। 'বাবুর আবার গোঁসা হল। হবে না? অমন রূপ দেখেই তো দু'দুটো টাকা দিয়ে দিল অনায়াসে। এ সব কি আর ওঁর সহ্য হবে।'

ফিরে এল তপেশ্বর। ভাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বললো : 'হ্যাঁ দিয়েছি। তবে মাধবী বৈষ্ণবীকে তার রূপ দেখার দাম নয়, রাধার হাতে মিষ্টি খেতে।'

রূপ সাধনায়

সাধনার

দুটি অনবদ্য অবদান

সাধনা বিউটি ক্রীম

প্রতিদিন ত্বক চর্চায় একান্ত প্রয়োজন। কুসুম কোমল পেলব তনু ও যৌবন সুলভ লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথ পেষ্ট

দন্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র ও উজ্জ্বল, মাড়ী সুস্থ ও সুদৃঢ় মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, লালবাগ বাজার কলিকাতা-৬

প্রণেতা—ডিরেক্টরস্ বোর্ড, এম. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এফ. সি. এস. (আমেরিকা) আমলসার কলেজের ইনাল শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ রমেশচন্দ্র ঘোষ এফ. সি. পি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

S-25/1-67 B

ঃ 'ও ঐ একই কথা।' টিপ্পনী কাটলো কে একজন।

ঝাঁঝিয়ে উঠলো তপেশ্বর ঃ 'মুখ সামলিয়ে কথা বলুন। এতগুলো পুরুষ সাধু মানুষ ওকে বে-পথে যেতে দিলেন কেন? তখন খেয়াল হয় নি?'—বলে চলে গেল তপেশ্বর। আর ফিরেও তাকাল না তাদের দিকে, কানেও নিল না আর তাদের কোন কথা।

গঞ্জের মেলায় কারা যেন এ্যাম্প্লিফায়ার বাজাচ্ছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে পল্লীগীতির সুর।

মনটা খিঁচড়ে গেছে তপেশ্বরের। আর ভাল লাগল না। ফিরে এল সে।

একটা সিগার ধরিয়ে বসল নরম বিছানাটার ওপর।

বারিদবরণ বললো ঃ 'কি সাংবাদিক ঘুরে দেখা হল?'

ঃ 'হ্যাঁ। এখানকার লোকগুলো বড় নোংরা। অতি কুৎসিত।'

ঃ 'কেন সে রকম কিছু দেখলে না কি? তবে গঞ্জ জায়গা তো, এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক।'

কথা বাড়াবার আর কোন অবকাশ পেল না ওরা। গৃহস্বামী দিবা আহারের আয়োজন করেই রেখেছিলেন, শুধু তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন তপেশ্বরের জন্য। তিনি খেতে ওঠার তাগিদ দিলেন।

ওরা খেতে বসেছে এমন সময় একজন বৃদ্ধ একটি আট-দশ বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। গৃহস্বামী তাকে ডেকে বসালেন ঃ 'আসুন আসুন মোহনদা, এঁরা আজ আমার অতিথি। তাই আজ আর আপনার ওখানে যাওয়া হয় নি। কলকাতা থেকে এসেছেন।'

আগন্তুক ভদ্রলোক বসে বললেন ঃ 'তা এঁরা আজ থাকবেন তো?'

গুপ্তময় উত্তর দিলো ঃ 'না। আমরা বিকেলেই চলে যাব।'

ঃ 'এসেই যদি চলে যাবেন, তবে আর দেখবেন কি গাঁয়ের! দু'চার দিন থাকলে তো বুঝতে পারবেন গাঁয়ের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ।'

তপেশ্বর বলে ঃ 'সে সুযোগ আর কোথায় পাই বলুন। আজকের রাতচোর হলেই তো চাকরি বজায় রাখতে দৌড়তে হবে হালটান হয়ে। কোথাও যে দু'দণ্ড বসে দেখবো, তার আর উপায় কই!'

ঃ 'তা যা বলেছেন। আপনারা এসেছেন আমার বাড়ি। আপনাদের সঙ্গে বসে যে দু'চারটে গল্প করবো, তারও ফুরসৎ নেই আজ। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে—লক্ষ্মীমাকে আজ নিয়ে যাবে। সেই নিয়ে ব্যস্ত।'

গৃহস্বামী বললেন ঃ 'সে কি মোহনদা এখন তো নিয়ে যাবার কথা ছিল না।'

ঃ 'তা তো ছিল না। কিন্তু ওঁরা এসেছেন, নিয়ে যাবেন বলছেন। বিয়ে যখন দিয়েছি, তখন আর আটকাই কি করে। তাছাড়া বিয়ের পর অনেকদিনই তো রইল। আবার বলছে জামায়ের না কি অসুখ করেছে। তা নিয়ে যাক। আবার আনবখন।'

একটু দম নিয়ে বললেন ঃ 'তাই যাবার আগে লক্ষ্মীমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে এলাম।'—বলে সঙ্গের সেই আট-দশ বছরের মেয়েটিকে বললো ঃ 'যাও মা তোমার দাদুকাকাকে প্রণাম কর।'

একসঙ্গে চমকে তাকাল ওরা তিনজন—তপেশ্বর, গুপ্তময় আর বারিদবরণ। এতক্ষণ ওরা ভাবতেই পারে নি এই মেয়েটাই লক্ষ্মী—যাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে আজ নিয়ে যেতে এসেছে। এতক্ষণ ওরা লক্ষ্যই করে নি—মেয়েটির কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, নোয়া। পরনে লালপেড়ে শাড়ি।

মেয়েটির দিকে তাকাল তপেশ্বর। তার চোখে-মুখে কোন চিন্তা-ভাবনার লেশ মাত্র নেই। আর থাকবেই বা কি করে। তার মনে তো স্বামী-শ্বশুর, শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই জাগে নি। তবুও মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যাবে স্বামীর ঘর করতে। স্বামীর বয়সই বা কত কে জানে।

তাকে আদর করে দাদুবাবু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার জামায়ের বয়স কত হল মোহনদা?'

ঃ 'তা এখন বছর তেইশ হবে।'

আর একবার চমকে উঠল তপেশ্বররা। তেইশ বছরের ছেলের বৌ ঐ ছোট মেয়েটি! এ ব্যবস্থা তো অনেকদিন আগেই অচল হয়ে গেছে আমাদের দেশে! তবুও—

দাদুবাবু বললেন ঃ 'তবুও গ্রামের দিকে এমন বিয়ে অনেক হয় তপেশ্বরবাবু; এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।'

তাই বটে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সদ্য আলাপিতা মাধবী আর রাধার কথা। মাধবী তখন বললো ঃ 'কান্দুর সন্ধান পেলে তার হাতে রাধাকে সঁপে দেবো।' বুকটা একটা ব্যথায় টনটন করে উঠল তপেশ্বরের। ঐটুকু মেয়ে রাধারও কি বিয়ে দিয়ে দেবে এখনি। মাধবীর সঙ্গে আর একবার দেখা হলে, তাকে জিজ্ঞেস করত সে। তারপর বারণ করে দিত—এখনি বিয়ে দিতে।

ফেরার পথে গঞ্জে আবার দেখা হয়ে গেল মাধবীর সঙ্গে।

তপেশ্বর ভিড়ের মধ্যে ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারে নি। লক্ষ্মীর মতো ছোট একটা বিয়েজলা মেয়ে হাটে শাক বেচছিল। তাকেই দেখছিল তপেশ্বর। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে টক্‌টকে লাল সিঁদুর। গায়ে বস্ত্রের বালাই নেই। পরনের শাড়িটা কোলের ওপর ফেলে বসে আছে। হাজারো ক্রেতার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। আর মাঝে মাঝে তার শাকের ঝুড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বড় মায়া হল তপেশ্বরের মনে। ঐটুকু মেয়ে—তার বিবাহিতা, হাটে শাক বেচছে।

এমন সময় তাকে পেছন থেকে ডাকলো মাধবী ঃ 'চললে যে কি ভাই?'

ফিরে মাধবীকে দেখে তপেশ্বর অন্য কিছু না বলে জিজ্ঞেস করল ঃ 'মাধবী, যদি পাত্র পাও মনের মতো, তবে কি এখনি রাধার বিয়ে দেবে?'

ঃ 'বিয়ে কি বলছ ভাই। ও-যে জন্ম থেকেই কানুর কাছে উৎসর্গ করা। সে যখনই এসে চাইবে তার রাধাকে, আমি কি তখন তাকে ফেরাতে পারবো। সে অধিকার তো আমার নেই।'

বেন চিৎকার করে উঠল তপেশ্বর ঃ 'মাধবী। তা বলে ঐ ছোট্ট মেয়ে রাধাকে'—বলে তাকাল শাক-ব্যাপারী মেয়েটার দিকে। দেখে রাধা তার সঙ্গে গল্প করছে। রাধা জড়িয়ে ধরেছে তাকে। রাধা জিজ্ঞেস করছে ঃ 'তোর বর কেমন আছে রে?'

লজ্জানতা মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে ঃ 'ভালই। এখন ধান কাটতে গেছে মাঠে। তাই আমিই এলাম শাক বেচতে।'

বাঃ কি চমৎকার! এরই মধ্যে সংসার বুঝে নিয়েছে। সংসারের কাজে জড়িয়ে নিয়েছে ছোট্ট মেয়েটি নিজেকে। অবাক লাগে তপেশ্বরের।

মাধবী বলে ঃ 'এই তো ভাল গো ভাই। ছোটবেলা থেকেই সংসার বুঝে নেওয়া ভাল। বড় হলে অনেক ঝামেলা, অনেক নোংরা কথায় জড়িয়ে যায়। এতো আর তোমাদের শহর নয় গো ভাই। গ্রাম। এখানে অনেক সামলে চলতে হয়। লোকের মুখে কুৎসা রটতে, কলংক রটতে দেরি হয় না।'

তপেশ্বরের মনে পড়ল সকালের রাস্তার লোকগুলোর কথা।

কানে এল রাধার কণ্ঠস্বর। সে গাইছে ঃ "চন্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা।"

মাধবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল তপেশ্বর।

বাড়ি ফিরেও তার মনে গুন্‌গুন্ করছিল রাধার গলার গান ঃ "চন্ডীদাস কয় তখনি জানিবে পিরীতি কেমন জ্বালা।"

আমুখোরের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

শত্রুপক্ষ মরীচিকার পেছনে

২২শে এপ্রিল সকালে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা, সেগুলির প্রতিক্রিয়া ও শহর আক্রমণ করার নতুন পরিকল্পনা, যা প্রধান বাহিনী নিয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছি। সেই দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রধান বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে যে সব নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেই সম্বন্ধে একটুখানি বলা দরকার।

প্রথমেই বলি এই পাহাড়টির পজিসন নিয়ে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই পাহাড়টির অবস্থান তাদের প্রতিকূলে ছিল। প্রথমত পাহাড়টি অপেক্ষাকৃত নিচু। তার উত্তর ও পূর্বের সংলগ্ন পাহাড় দুটির উচ্চতা জালালাবাদ পাহাড়ের থেকে অনেকটা বেশি। শত্রুরা যদি ঐ দুটি পাহাড়ের ওপর মেশিনগান নিয়ে পজিসন নেয় তবে আমাদের ঘায়েল করতে তারা অনেক বেশি সুবিধে পাবে। তাছাড়া "Round Cover"-এর আড়ালে আত্মরক্ষার সুবিধে নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বড় বড় গাছ এই পাহাড়ের ওপর খুব বেশি ছিল না। আরো একটি কারণে জালালাবাদ পাহাড়টির সামরিক সুবিধে গ্রহণ করা আমাদের চাইতে শত্রুপক্ষের অনেক বেশি ছিল। এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মাত্র আধ মাইলের মধ্যে আছে রেল-লাইন। যে কোন সময়ে শত্রুপক্ষ ট্রেনযোগে হঠাৎ প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করে ফেলতে পারে। চট্টগ্রামে সাঁইত্রিশ বছর আগে ট্রাক, ট্যাক্সি বা পুলিশের মোটর গাড়ি ছিল না বললেই চলে। কাজেই ট্রেনযোগে বা হাঁটা-পথে ছাড়া সৈন্য ও পুলিশের বড় সমাবেশ করবার উপায় ছিল না। এই পাহাড়ের পাদদেশে রেল-লাইন থাকার জন্য শত্রুপক্ষ সৈন্য সমাবেশের সুবিধে পাবে তা বেশ বোঝা সত্ত্বেও তারা আরো দূরে আরো দুর্গম পথের স্বাভাবিক অবরোধের সুবিধে গ্রহণ করতে পারা যায় এরকম অন্য কোন পাহাড় বেছে নিতে পারে নি—কারণ, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে, লাঙল কাঁধে চাষীরা বেরোতে সুরু করেছে।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পাহাড়ের নিচে ছোট্ট একটি পুকুর ছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার জন্য এই জলাশয়ের জল ভিন্ন সারাটা দিন ও সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের অন্য কিছু খাবার জোটে নি। ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা অনুভব করলেও তার অনেকখানি উপশম হয়েছে যখনই তারা ভেবেছে আজই সন্ধ্যের সময় তারা শহর আক্রমণ করবে। মাত্র এই দিনটুকু বাকি—তারপর মৃত্যুর সঙ্গে তারা পাঞ্জা লড়বে। থেকে থেকে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে, কখনও বা হৃদয় কেঁপে উঠেছে, মাঝে মাঝে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় সময় হৃদয়তন্ত্রীতে রণ-সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে—আজই রাত্রে মরণ-পণ যুদ্ধ—তারপর সব শেষ! মরণ যুদ্ধের প্রতীক্ষায় পঞ্চান্নজন নির্ভীক বিপ্লবী জালালাবাদ পাহাড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আমরা যেমন ২১ তারিখ সকাল বেলা রজতের বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে আসন্ন সংঘর্ষের হাত থেকে বেঁচে গেলাম, ঠিক তেমনি ২১ তারিখ আমাদের প্রধান বাহিনীও শত্রুপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমরা এতক্ষণ আমাদের প্রধান বাহিনী ও আমাদের চারজনের কথা বলেছি, 'বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে সরকারী পক্ষ কিভাবে তাদের শক্তি সমাবেশ করছিল এইবার সে সম্বন্ধে কিছু বলবো। তাছাড়া শত্রুপক্ষের তথ্য থেকেও জানা যাবে কি ভাবে তারা আমাদের প্রধান বাহিনীকে ধরতে এসে নিজেদের দীর্ঘসূত্রতার জন্য বোকা বনেছে।

আমাদের মামলার ছাপানো জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—".....That same day (21st April) Abdul Gaffur, S. I. Hatazari P. S. on receipt of certain information went to the hills to the west of Chowdhury Hat railway station (about 12 miles from Chittagong on the Chittagong-Nazir Hat branch line) and on his way up the hill, known Badulla hill, he found lying on the path through the jungle two of those silver embroidered black velvet badges, a partly burned stocking and langote and at the top of the hill the skins of water melons and some torn paper bags which appeared to have contained eatables, lying on flattened and trodden thatching grass.

"The Badulla hill and its neighbours form part of the same range which extends north-east from the police lines and is about 4 or 5 miles north of Jallalabad hill. The S. I. was descending the hill by the south side about 4-30 or 5 P. M. (he had ascended by the north side) when on his way down he met Waijuddi who had gone that afternoon to graze his cattle near his Sankhola (thatching grass patch) in the hills. His cattle followed a path by the side of a hill stream into an open space surrounded on three sides by the hills and he went after

them to find to his astonishment about 60 or 70 Hindus, sitting down and some walking about. Some of them were wearing khaki shirts and shorts and other ordinary white shirts and dhoties. Beside them a number of guns were plled under a tree. They asked him where he was going and he replied that he had came to look after his cattle. To his query as to why they had come there, they replied that they had come from Calcutta for shikar." (হাটহাজারি থানার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার আবদুল গফুর কিছু সংবাদ পেয়ে চৌদ্দরীহাট রেল-স্টেশনের পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর অনুসন্ধান করতে গেলেন। চট্টগ্রাম নাজিরহাট রাস্তা রেল-লাইনের ওপর, শহর থেকে বারো মাইল দূরে চৌদ্দরীহাট রেল-স্টেশনটি অবস্থিত। যে পাহাড়ে আবদুল গফুর গেলেন সেটি 'বাদুল্লা পাহাড়' নামে পরিচিত। পাহাড়টিতে ওঠার পথে তিনি কালো ভেলভেটের ওপর রুপালী জরীর কাজ করা দুটি ব্যাজ, আনুষঙ্গিক সামান্য পোড়া মোজা, একটি লেভটি এবং সেই পাহাড়ের শিখরে তরমুজের খোসা ও পায়ে মাড়ানো কাগজের খাবার ঠোঙা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল দেখতে পান।

বাদুল্লা পাহাড় সংলগ্ন পর্বতমালা পুলিশ লাইনের উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত আর বাদুল্লা পাহাড়টি জালালাবাদের চার পাঁচ মাইল উত্তরে। ঐ সাব-ইন্সপেক্টার উত্তর দিক দিয়ে পাহাড়টিতে উঠেছিলেন এবং সাড়ে চার বা পাঁচটার সময় নামলেন দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে। এই সময় একজন চাষী, ওয়েজুদ্দির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ওয়েজুদ্দি তার শস্যক্ষেতের পাশে গরু চরাতে গিয়েছিল। পাহাড়ী সরু জলস্রোতের পাশে গরু চরাবার সময় গরুর পালকে অনুসরণ করে সে তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ে। এখানে ষাট সত্তরজন খাকী পোষাক পরিহিত হিন্দুকে দেখে এবং সেখানেই একটি গাছের নিচে স্তূপীকৃত রাইফেল দেখে চাষী ওয়েজুদ্দি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে। খাকী পোষাক পরিহিত লোকেদের মধ্যে কারও কারও খুতি সার্ট পরা ছিল এবং তারা কেউ বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যেই একজন ওয়েজুদ্দিকে জিজ্ঞেস করল যে সে কোথায় যাচ্ছে। উত্তরে সে জানালো গরু চরাতে এসেছিল। তারপর ওয়েজুদ্দিও প্রশ্ন করে, তারা কোত্থেকে আসছে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পায় যে কলকাতা থেকে শিকারে এসেছে তারা)।

তখন প্রায় পাঁচটা বেজেছে। ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই এই পাহাড়টি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে তারা এই কৃষককে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখবেন না কি ছেড়ে দেবেন? যদি কৃষকটি কোন ক্ষতি করতেও চায় তাহলেও শত্রুপক্ষ তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছবার অনেক আগেই তারা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন—এই কারণে কৃষকটিকে বন্দী না করে তারা ছেড়ে দিলেন।

সরকারী তথ্য থেকে জেনেছি যে, কৃষকটি সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই ছুটে সোজা পুলিশকে সংবাদ দেবার জন্য কোন থানায় যায় নি। সে "সোয়েম" ঘাস কাটবার জন্য তার "শাঁখোলা"তে যায়—(সরকারী তাঁবেয় লেখা আছে "সোয়েম ঘাস" ও "শাঁখোলা," এই শব্দ দুটির অর্থ কি তা আমার জানা নেই)। সেখানে তার সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টার আবদুল গফুরের দেখা হয়। আমাদের মামলার রায়ের সরকারী তাঁবেয় এইরূপ লেখা আছে—

"From there he went up the hill to his 'sankhola' to cut 'soem' grass and on his way back met the S. I. Abdul Gaffur who questioned him if he had come across any Sawdeshi Hindus in the jungle. Waijuddi told him what he had seen and pointed out the place to him."—(ওয়েজুদ্দি সোয়েম ঘাস কাটবার জন্য পাহাড়ের ওপরে তার শাঁখোলায় গেল এবং সেখান থেকে ফেরবার পথে এস্. আই, আবদুল গফুরের সঙ্গে তার দেখা হল। আবদুল গফুর সাহেব তার কাছে জানতে চাইলেন জঙ্গলের দিকে কোন হিন্দু স্বদেশীকে দেখা গেছে কি না। ওয়েজুদ্দি যা দেখেছে তাই বলল এবং অঙ্গুলি নির্দেশে স্থানটি দেখিয়ে দিল)।

এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের গুরুত্ব যে কতখানি তা বুঝতে সাব-ইন্সপেক্টারের খুব বেশি সময় লাগে নি। যে এইরূপ সংবাদ উচ্চ কর্তৃপক্ষকে আগে দিতে পারবে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যত দ্রুত সম্ভব আবদুল গফুর এই অমূল্য সংবাদ ডি, আই, জি, মিঃ ফার্মার সাহেবের কাছে পাঠানো যায় তার সব রকম ব্যবস্থাই করলেন। মিঃ ফার্মার কথা সময়ে আমাদের প্রধান বাহিনী ২১ তারিখ বিকেল পাঁচটায় যে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল তার খবর পেয়ে গেলেন। কিন্তু বিকেল পাঁচটার সংবাদ এস, পি, মিঃ জনসন এবং ডি, আই, জি, মিঃ ফার্মারের কাছে যখন পৌঁছাল তখন রাত প্রায় আটটা। এই সংবাদ পেয়ে ডি, এম, মিঃ উইলকিনসন কর্নেল ডালাস স্মিথ, মিঃ ফার্মার, মিঃ জনসন, এ, এস, পি, মিঃ শুটার ও মিঃ লুইস, সুর্মা ভ্যালি লাইট হর্স-এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন রবিনসন এবং এ, এফ, আই, ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন টেইট একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করলেন।

এঁদের মধ্যে আলোচনা যা হয়েছিল তার গল্প আমি একজন ভারতীয় অফিসারের মুখে শুনেছিলাম আমাদের মামলা চলাকালে। এই অফিসারটি আলোচনা চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন কর্তব্যক্তিদের আলোচনার কথা কি শুনেছিলাম আজ, এত বছর পরে, তার হুবহু বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যতটুকু মনে আছে তা লিখছি—২১ তারিখ, এই প্রথম, প্রধান বাহিনীর সংবাদ পাওয়ার পর শত্রুপক্ষ কি ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল তা বোঝবার পক্ষে এটুকু শোনাই যথেষ্ট।

শত্রুপক্ষ দুই অংশে তাঁদের সমর শক্তিকে বিভক্ত করেন। শহরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অর্ধেক সৈন্য রাখা হল এবং অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে "বিদ্রোহীদের" বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য আর একটি কমান্ড গঠন করলেন। তারপর উপস্থিত কর্তৃপক্ষদের মধ্যে এই ধরণের আলোচনা হল—

A .S. P. Mr. Lewis : "আমার মনে হচ্ছে অনেক দেরি হয়ে গেল। এখন প্রায় রাত দশটা বেজেছে। এতক্ষণে বোধহয় 'Raiders'-রা উধাও হয়েছে।"

D. I. G. Mr. Farmer : "ঠিকই বলেছ লুইস। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। আর দেরি না করে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে."

Col. Dallas Smith : "Dusk-এ (সন্ধ্যের সময়) আক্রমণের সুযোগ আমরা ইতিমধ্যে হারিয়েছি। তাছাড়া অজানা পাহাড়ে সৈন্যদের রাত্রে অভিযান চালাতে অনেক বেশি অসুবিধে হবে। 'Raiders'-রা চট্টগ্রামের পাহাড়ের পথ-ঘাট জানে বলে আমাদের বিরুদ্ধে রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে অনেক বেশি সুবিধে তারা নেবে। তাই আমরা

রাত্রে আক্রমণ করব না। ভোরের একটু আগে (Dawn-এ) তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো।"

সকলেই কর্নেল সাহেবের প্ল্যান মেনে নিলেন। এর অনেক পূর্বেই, সংবাদ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে, পুলিশ সাহেব ছিদ্দিক দেওয়ান (S. I.) এবং আবদুল গফুরকে মোটর যোগে চৌধুরীহাট পাঠানো হয়। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল যেন তারা বাদুল্লা পাহাড়ে বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে যথা সম্ভব লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করে। রাত প্রায় দশটা সাড়ে দশটার সময় Surma Vally Light Horse ও Eastern Frontier Rifles-এর সৈন্যের এক বিরাট অংশকে আদেশ দেওয়া হল ট্রেনযোগে চৌধুরীহাট স্টেশনে যাওয়ার জন্য।

তাদের কথায় আমরা এখানে মাত্র এইটুকু পাচ্ছি—

"A force consisting of some 50 men of the Eastern Frontier Rifles and a Lewis gun section of the A. B. Railway Battalion, A. F. I. under the command of Col. Dallas Smith accompanied by the D. I. G. (Mr. Farmer), the A. S. P. Mr. Lewis and Dr. Weldon left Chittagong by train and arrived about 4 or 4-30 a. m. at Choudhuryhat where they were met by Abdul Gaffur and Siddik Dewan who had returned there by motor car."—(Judgment Chittagong Armoury Raid case No. 1).

(Eastern Frontier Rifles Regiment-এর মাত্র ৬০ জন সৈন্য এবং A. B. Railway Battalion-এর একটি লুইস গান Section সঙ্গে নিয়ে ডালাস স্মিথ, ফারমার, লুইস ও ডাক্তার ওয়েলডন্ সাহেব সেই রাত্রেই ট্রেনযোগে ভোর চারটে বা সাড়ে চারটের সময় চৌধুরীহাটে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা সাব-ইন্সপেক্টর সিদ্দিক দেওয়ান ও আবদুল গফুরের সাক্ষাৎ পেলেন। এরা দু'জনে মোটরযোগে সেখানে উপস্থিত হয়)।

বোঝাই যাচ্ছে যে তাঁরা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ভোরে ভোরে চৌধুরীহাট এসে পৌঁচেছেন। রেলের প্রধান ডাক্তার ওয়েলডন্ সাহেবও তাঁর মেডিক্যাল ইউনিট নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২১ তারিখ সন্ধ্যার সময় খবর পেয়ে সারা রাত ধরে তাঁরা সব রকম তোড়জোড় করেছেন—সৈন্য সমাবেশ করেছেন, ছিদ্দিক দেওয়ান ও গফুর সাহেবকে প্রথম থেকে স্কাউট করবার জন্য পাঠিয়েছেন। যুদ্ধ আসন্ন।

যেটুকু সৈন্য সমাবেশের উল্লেখ সরকারী তথ্য হ'তে পাচ্ছি তা' থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা ২১ তারিখ ভোরে আমাদের প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। এই সত্য তাদের অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে মাত্র ষাট-সত্তর জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে প্রচুর সৈন্য সমাবেশের উল্লেখে একটু যেন রেমন লজ্জা বোধ হয়। তাই যে অনুপাতে সৈন্য সংখ্যা সঙ্গে নিয়ে গেছেন বলে তাঁরা জানাচ্ছেন তা' সম্পূর্ণ অসত্য। আমাদের পক্ষে ভারতীয় ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টরদের মারফৎ তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদের সংগৃহীত রিপোর্টটি অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ও সত্য। তাঁরা প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন ভেবে সুরমা ভ্যালি লাইট হর্স রেজিমেন্টের একটি কম্পানী ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের আর একটি কম্পানীকে সঙ্গে নিলেন। তা' ছাড়া ভিকার্স মেশিনগানের Section একটি এবং চারটি লুইস গান Section তাঁদের সঙ্গে ছিল। তখনকার বৃটিশ আর্মি ম্যানুয়েল অনুযায়ী কম্পানী ১৫৬ জনকে নিয়ে গঠিত।

২০ তারিখ বিকেলে তাদের কথামত একশ' জন সৈন্য নিয়ে, পাহাড়ে-জঙ্গলে আমাদের খুঁজতে গিয়েছিলেন স্বয়ং I. G., S. P., এবং কর্নেল ডালাস স্মিথ্। আর ২২ তারিখ ভোর রাত্রে নিশ্চিত যুদ্ধ জেনেও মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য ও ভিকার্স-গানের মাত্র একটি Section নিয়ে তাদের পরম শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তা' সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবা কঠিন। তা' ছাড়া যুদ্ধের সাধারণ নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ জয়ের জন্য কোন আক্রমণই প্ল্যান করা যায় না যদি নাকি শত্রুর চাইতে পাঁচ গুণ, অন্তত তিন গুণ বেশি শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামা না যায়। এই কারণেই আমাদের সংগৃহীত তথ্য সন্দেহাতীত।

চৌধুরীহাটে আবার শত্রুসৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হল। (ক) প্রথম ভাগে ভারতীয় সৈনদের ভারতীয় Non-Commissioned অফিসারদের নিয়ে একটি আট-ত্রিশ জনের প্লেটুন সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে যাবে। তারা বিপ্লবীদের গুপ্তস্থান থেকে তাদের দিকে গুলী ছুঁড়তে বাধ্য করবে। (খ) সাঁড়াসীর মত দুই পাশ থেকে সেই সময় দুটি কম্পানী আক্রমণ চালাবে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে কর্নেল ডালাস স্মিথ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ডি, আই, জি মিঃ ফারমার অন্য মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে এইরূপ একটি তীব্র আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা নিলেন। আক্রমণ চালাবার সামনের উঁচু পাহাড়ে তাঁদের ভিকার্স মেশিনগান বসান থাকবে স্থির হ'ল।

ভোর হওয়ার একটু আগে প্ল্যান অনুযায়ী হুকুম হ'ল। পঞ্চম জন বিপ্লবীকে ধরবার জন্য অভিমন্যু বধ করার চাইতেও প্রবল ব্যূহ রচনা করলেন। বীরত্বের সঙ্গে তিন দিক হ'তে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের—আমাদের প্রধান বাহিনী শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অনেক আগেই, ২১ তারিখ সন্ধ্যে আটটা-ন'টার সময় খিচুড়ী খেয়ে, এই বাদুল্লা পাহাড় ত্যাগ করে চলে গেছে। পরিত্যক্ত এই পাহাড় যখন শত্রু সৈন্যেরা বীরদর্পে দখল করে মনে মনে সান্ত্বনা পাচ্ছিল, তখন আমাদের প্রধান বাহিনী জালালাবাদে অপেক্ষা করছে—সন্ধ্যায় তারা নতুন প্ল্যান অনুযায়ী শহর আক্রমণ করতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বৃটিশ শক্তির এই অক্ষমতার গ্লানিকে চাপা দেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ খুব চেষ্টা করেছেন। তাই আজমেন্ট ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনি লিখেছেন—

"They discovered however abundant traces of recent occupation by the raiders viz., five police musket-ball cartridges, one police revolver, blank cartridge paper wrapping for police musket, etc., etc."—(যা হোক না কেন বিদ্রোহীরা যে সেখানে কিছু আগেও ছিল তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়; যেমন—পাঁচটি পুলিশ মাস্কেটের বল কার্তুজ, পুলিশ রিভলভারের একটি খালি খোল ও পুলিশ মাস্কেট জড়ানো কাগজ সেখানে পাওয়া গেছে)।

সত্যিই তো, যুদ্ধের জন্য তাঁদের এত তোড়জোড়, এত ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ, সাঁড়াসী আক্রমণের রণ-কৌশল—এসব তো একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎ না-ই বা মিললো, সেখানে যে কিছুক্ষণ আগেও তারা ছিল তার অসংখ্য প্রমাণ তো পাওয়া গিয়েছে!—হ্যাঁ, এই প্রমাণ নিয়েই সেদিন তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

জালালাবাদ পাহাড়ে অপেক্ষারত প্রধান বাহিনী, তাদের পেছনে পর্দার অন্তরালে শত্রুপক্ষের এই যে বিরাট আক্রমণ প্রচেষ্টা—এর কোন খোঁজই পায় নি। আর শত্রুপক্ষও ধারণা করতে পারে নি যে তাদের এত কাছে জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীরা শহর আক্রমণ করবার জন্য অপেক্ষা করছে। যখন বাদুল্লা পাহাড়ে শত্রুপক্ষ বিদ্রোহীদের দেখা পেল না, তখন তারা ভেবেছিল বিদ্রোহীরা স্বভাবতই শহর থেকে দূরে চলে যাবে—শহরের কাছাকাছি থাকবে না। কি করে জানবে তারা যে বিপ্লবীরা সেই রাত্রেই শহর আক্রমণ করবে?

বান্দরা পাহাড়ে শত্রুপক্ষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। তারাও তাদের মত চেষ্টা করে যেতে লাগল। কর্নেল ছালাস স্মিথ্ সৈনদের বড় অংশ নিয়ে "বরকরিয়া বটতলী" এলাকায় ক্যাম্প করলেন। ডি, আই, জি ও এস, পি অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। কর্নেল সাহেব হাটাজারি ও পাঁচলাইস থানা অফিসারদের নির্দেশ দিলেন যেন চৌকিদার ও দফাদারদের বিদ্রোহীদের খোঁজে পাঠানো হয় এই দুটি থানা থেকে দু'জন করে চৌকিদার নিয়ে দশটি দল গঠন করা হল। তারা সাদা পোষাকে সাধারণ গ্রাম্য চাষী সেজে মনোগুলে ও পাহাড়ে "স্বদেশীদের" খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ওদিকে পুলিশ সাহেব জনসন, হেম গুপ্ত, সিদ্দিক দেওয়ান প্রমুখ সাব-ইন্সপেক্টরদের চার্জে বিভিন্ন স্ট্রাউট পার্টি গঠন করে বিদ্রোহীদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাদের পাহাড় অঞ্চলে পাঠালেন।

বিদ্রোহীদের খোঁজ পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ যতখানি ব্যস্ত ও মরিয়া হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই পরিমাণ সজাগ ও তৎপর ছিল শহরের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। তারা শহরের প্রধান প্রধান ঘাঁটি—জেলখানা, ব্যাঙ্ক, সরকারী ট্রেজারী ও রেলের ট্রেজারী প্রভৃতি সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করেছিল। তা ছাড়া শত্রুপক্ষ সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত ছিল পাছে শহর বিদ্রোহীদের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়। তারা জানতে পেরেছিল আমাদের প্রধান বাহিনী শহরের উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে আছে। তাই উত্তর দিক দিয়ে শহরে প্রবেশের পথ দুটি দুর্ভেদ্য করবার জন্য প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করেছে। ইংরোপীয়ান ক্লাবের পথ ও প্যারেড গ্রাউন্ডের রাস্তাটি সৈন্যরা অবরোধ করেছিল—২২শে এপ্রিল শহরে আক্রমণ চালানোর জন্য আমাদের প্রধান বাহিনীকে সেই দিন অবরোধের সম্মুখীন হতে হোত। ২২ তারিখে প্রধান বাহিনী সহজে আক্রমণের সুযোগ পাবে, সে আশা তারা করে নি। তারা ঠিক করেছিল সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সেই রাত্রেই তাদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এই সুযোগ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে দিতে যেন প্রস্তুত নয়। স্কাউটরা খবরের পর খবর আনছে—কোনটা একেবারে বাজে খবর, কোনটা কিছু বা কাজের আবার কয়েকটা বেশ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তখনও তারা একেবারে নির্ভুল সংবাদ পায় নি।

এখন প্রায় বেলা এগারোটা। এমন সময় আমাদের প্রধান বাহিনী দেখতে পায় তাদের দিকে দু'জন কৃষক আসছে। আমাদের বিপ্লবী সৈন্যরা তাদের গোপন স্থান থেকে এই দুই কৃষককে লক্ষ্য করছিল। কৃষকেরা কিন্তু বিপ্লবীদের অবস্থান আগে বুঝতে পারে নি। যখন তারা একেবারে কাছে এসে পড়ল তখন পঞ্চাশ-ষাটজন সশস্ত্র স্বদেশীকে দেখে ভয়ে তাদের মুখ সাদা হয়ে গেল। এখন পালাবার আর কোন উপায় নেই।

নির্মলদা কৃষকদের প্রশ্ন করলেন—"তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছ? কি কাজে এসেছ?"

তাদের মধ্যে একজন কৃষক উত্তর দিল—"আমরা আমাদের গরু খুঁজতে এসেছি।" সত্যি কি তারা গরু খুঁজতে এসেছে—এ সন্দেহ তাদের মনে এসেছে; কিন্তু তারা যে গরু খুঁজতে আসে নি, এ সম্বন্ধেও বিদ্রোহীরা একেবারে নিশ্চিত নয়—এইটিই মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী। শত্রুর সঙ্গে রণনীতি ও রণ-কৌশলের প্রয়োগে মানবতা, মহানুভবতা এবং উদারতার স্থান কোথায়? 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'—এখানে দয়া নেই, মায়া নেই; ছল-চাতুরী, মিথ্যা ভান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি—এ সবই প্রতি পদক্ষেপে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যারাই শত্রুর চালে ভুলেছে, শত্রুর প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছে, শত্রুর মিথ্যা সন্ধি প্রস্তাব সরল মনে অনুমোদন করেছে—তারাই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। কাজেই যেখানে অসমান শক্তির মধ্যে লড়াই সেখানে তো সেইরূপ দুর্বলতা, মহানুভবতা ও মানবতার প্রশ্নই ওঠে না।

এই দু'জন কৃষককে সন্ধ্যে বা রাত পর্যন্ত বন্দী করে রাখা যদি তারা সাব্যস্ত করত তাহলে এইজন্য তাদের কোন বেগ পেতে হোত না। কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা—বন্দী করে রাখবে কি রাখবে না। ২১ তারিখ বিকেলে ওরেঞ্জুদ্দিকে বন্দী করে না রাখার তবু যুক্তি ছিল। কারণ, বিকেল পাঁচটায় ওরেঞ্জুদ্দি যদি গিয়ে শত্রুপক্ষকে খবরও দিত তাহলে বৃটিশ সৈন্যের পক্ষে দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রধান বাহিনীকে আক্রমণ করবার জন্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ঐ দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যেই, সন্ধ্যের সময়, প্রধান বাহিনীর বাদল্লা পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সকাল এগারোটার সময় এই কৃষক দু'জনকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিলে, তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে, শত্রুপক্ষ যে সন্ধ্যের অনেক আগেই জালালাবাদ পাহাড়ে প্রধান বাহিনীকে আক্রমণ করতে অতি সহজেই এসে পড়তে পারে, এ কথা তারা চিন্তাই করে নি। কিন্তু এ-দিকটা ভেবে, তাদের যখন সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে থাকা এবং সেই রাত্রেই শহর আক্রমণ করবার কথা, তখন কর্তব্যের খাতিরে বিবাহ-নাচের একটিমাত্র সিদ্ধান্তই তাদের নেওয়া উচিত ছিল—কৃষক দু'জনের প্রতি অভদ্রতা হলেও তাদের বন্দী করে রাখা বৈপ্লবিক কর্তব্য বলেই গণ্য হোত। কিন্তু তারা কৃষকদের সন্ধ্যে পর্যন্ত অন্তরীণ অর্থাৎ তাদের মার্চ সুরু করা পর্যন্ত, সেই পাহাড়ে বন্দী করে রাখা নিষ্ঠুরতা হবে—কে জানে যদি তারা সরল ভালোমানুষ হয়—এই ভেবে ওদের ছেড়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন।

কৃষকদের ছেড়েই যখন দেওয়া হবে, তখন তাদের মনে যদি বিশ্বাস জন্মান যায় যে 'তারা স্বদেশী নয়—পুলিশ' বিদ্রোহীদের বন্দী করতে এসেছে' তবে হয়ত মন্দের ভাল। এই ভেবে একটু জোরে জোরে কৃষকদের শুনিয়ে আমাদের সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল—

—"আচ্ছা, কোন্ দিক দিয়ে স্বদেশীরা গেছে বল্ তো? তারা এতদিন আছেও বা কোথায়?"

—"ঠিক আছে, আর কতদিন? বাছাধনরা যাবে কোথায়? শীগ্‌গিরই ধরা পড়বে—বড় জোর আজ না হলে কাল।"

—"আমাদের চারটি পার্টির বেড়াজাল ভেদ করে তারা যাবে কোথায়? উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম—কোন দিকেই পালাবার পথ নেই। ধরা তাদের পড়তেই হবে।"

এইভাবে কৃষকদের শুনিয়ে শুনিয়ে কথাবার্তা বলে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা হচ্ছিল যে আমাদের প্রধান বাহিনীটি পুলিশেরই একটা দল এবং আরো তিনটি অনুরূপ পুলিশ পার্টির সঙ্গে একত্র হয়ে জাল পেতেছে স্বদেশীদের ধরবার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমাদের কেউ একজন কৃষকদের বলল—

"দেখ বাবু, তোমরা যদি স্বদেশীদের কোন খবর বা খবরের সূত্রও পাও, তবে যত শীঘ্র পার আমাদের জানিও। খবরের সত্যতা প্রমাণিত হলে তোমাদের আমরা প্রচুর পুরস্কার দেব। আমাদের আরো তিনটি দল—পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে অপেক্ষা করছে। যাদেরই আগে পাবে তাদের কাছেই খবর দিলে হবে। নিশ্চয় দেবে তো?"

বলা বাহুল্য, তারা অবশ্য খবর সরবরাই করবে না বলে মুখ্যতা প্রকাশ করে নি। কৃষক দু'জন অবলীলাক্রমে ভরসা দিল—খবর পাওয়া মাত্রই তারা তা' পৌঁছে দেবে। কেউ তাদের আর বাধা দিল না। তারা চলে গেল। ভাগ্যদেবী তাদের এই 'মানবতার উপাসনা' দেখে অলক্ষ্যে হাসলেন।

এই নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটময় অবস্থায় প্রধান বাহিনীকে এখানে ছেড়ে যাচ্ছি আমাদের চারজনের পরবর্তী ঘটনা বলবার জন্য। [ক্রমশঃ]

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিদ্যাধরীর বৃত্তান্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিদ্যাধরী হাসল।

হাসা ওর স্বভাব, তাই হাসল।

বাতাসে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। বিদ্যাধরীর চোখের সামনে দূরে সেই সড়ক আর কাঠের পুলটার ছায়া। বিদ্যাধরী একটা নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণের অস্বস্তির বন্ধ বাতাসটা কেন নিশ্বাসে বেরিয়ে গেল।

—তুমি আজ গাইলা না?

একটা বড় নিশ্বাসের শব্দ কানে এল বিদ্যার। মদন মুখটা সামান্য তুলে বলল,—না।

—মানষে তোমার কথা কইতিয়াছিল।

—কি কইল?

—কইল, মদনের ব্যামো হইল নি? কিন্তু হইল মনসাচরণ।

মদন মুখটা তুলল। তাকাল বিদ্যার দিকে। চাঁদের আবছা আলোয় বালুচরের মত মনে হোল ওর মুখখানা। টান টান হয়ে বসল বিদ্যাধরী। মনে টান লাগছে।

—কি কইল তোমার?

—অর নাই কিছু।

—তর গান গাইলা না ক্যান?

আর একটা নিশ্বাস ফেলল মদন, শব্দ করে—কত্তার ইচ্ছার কর্ম। বুঝলা না?

বুঝল না বিদ্যাধরী। বলল,—কত্তা কেডা?

—দলের কত্তা। পতিতপাবন সাউ।

—সে তোমাক কি কইছে?

—আলায় কইব আর কি। আমারে আইজ খাইবার দিল না। কয় বলে, তর গান মানষে শুনবার চায় না। গাইয়া তর কাম নাই। এয়ার পরে তরে দিমু ছেকেন পাট। মনসা ফাচ্ পাট। আলা গাওনার বোঝে কি, খামখা খাচ্চর ম্যাচর করে।

বিদ্যাধরী বুঝল এবার। দলের কর্তা পতিতপাবন ওকে আজ বসিয়ে দিয়েছে। গাইতে দেয় নি। কারণ অবিশ্যি একটা ছিল। বিদ্যা নিজে কানেও কাল শুনেছে। অনেক লোকই কাল বলছিল। মদনের গলায় মরচে ধরেছে। ত্যামন গলা নেই! প্রাণে লাগে না গানের সুর। বিদ্যার নিজের কিন্তু ভালই লেগেছিল। হতে পারে—হয়তো মদনের গলা আরও ভাল ছিল। এ সব গানের জাত কেজাত ভাল বোঝে না বিদ্যা। ওর কাছে গান মানে মনের খুশিতে আওয়াজ তোলা। রসের ঢেউ যদি আসে তোমার মনে, সে ঢেউ এসে লাগবে মানুষের মনে। তারা রসে জারবে। সুখ পাবে। গান যেন খুশি খেয়ালের রসের স্রোত। তাতে নিয়মমাফিক কোন বাঁধন নেই।

মদনের মুখখানা থমথমে। আষাঢ়ের আকাশের মত।

একটা দুর্বা ঘাস চিবোতে চিবোতে বলে উঠল মদন,—ধুর আলায়, দলে আর থাকুম না। গান আর গামু না।

বিদ্যাধরীর গলাটা মমতায় ভেজা-ভেজা। বলল,—তোমার দ্যাশ কোরানে?

—বেতুল গঞ্জের কাছে মুড়িখাল, গাওয়ের নাম।

—দল ছাইড়্যা কি দ্যাশে যাইবা?

—কি করুম, তাই ভাবতাছি।

—দল ছাড়নের কাম কি। কত্তারে বুঝাইয়া কও গা।

—কথা আরও আছে। কত্তা এ দল তুইল্যা দিব। আলার ঘাটুর দল বানাইব। কয় বলে, ঘাটুর দলে ছ্যামড়া গো জন্যে খরচপাতি কম। মানষে ভাইঙ্গা পড়ে ঘাটুর গান শুনতে।

ঘাটুর দল বানাবে। সুন্দর সুন্দর ছ্যামড়া নিয়ে গানের নামে অসভ্যতা করবে। ও সব গান কি ভদ্দর লোকে শোনে। ব্যাটা পতিতপাবন আর ভদ্দর লোকদের গান শোনাতে চায় না। তারা পয়সা দিতে জানে না। ঘাটুর দলের বাহারের গান শুনলে আসরেই টাকা পড়বে, পয়সা পড়বে। শেখ ভালী ভোলা চাষী ভেঙে পড়বে আসরে।

মদন স্থির করেছে, দলে ও আর থাকবে না।

বিদ্যাধরী অন্তে জিজ্ঞেস করে,—দ্যাশে তোমার আছে কেডা?

—ভাইপনা ভাগনিয়া আছে, আর কেউ নাই।

বিদ্যাধরী আরও টান টান হয়ে বসল। ফস করে বলে বসল,—তর লও যাই আমার সাথে। মনের সুখে গান গামু, খামু-দামু-বেড়ামু। লও যাই, কাইলই চলো।

মদন সোজা হয়ে বসল। বিদ্যার দিকে ভাল করে তাকাল। ওর চাকার মত মুখখানার মস্ত চোখ দুটো চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। মুখখানায় হাসি যেন মাখা। রসে খুশিতে ভরপুর এই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালই

আসছিল। নইলে আর এত সব প্রাণের কথা ও ফস ফস করে বলে ফেলল কি করে? যে কথা ওকে আজ বলল, এ কথা কাউকেই বলা হয় নি। মনের কথা মনেই চেপে ছিল। একে বলল কেন তার দুঃখের কথা। আর শুনেই বা এ ফস করে বলে বসল কি করে চলো যাই আমার সঙ্গে। ভারি অদ্ভুত লাগছে।

আজ বড় অপমানিত হয়েছিল মদন। দল থেকে তাকে বাদ দেয়া মানে তার মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করা। তার গানের জন্যে যে সুখ্যাত যে মান, তাকে এক্ষণ ঘায়ে চুরমার করে দিয়েছে পতিতপাবন। এ যে তার কত বড় অপমান কেউ বুঝবে না। একা একা অর্জুনগাছের তলায় বসে সে জ্বলছিল আর ভাবছিল, কি করবে? এর পরে অপমানে মুখ নিচু করে কি করে সে দলে থাকবে। না থাকলে যাবেই বা কোথায়? এতকাল ধরে দলের সবাই তাকে খাতির করত, তার কথার ওপর কেউ কথা বলত না। কত্তা পতিতপাবনও তাকে বেশ মান্য দিত, আর এখন? কাল সকাল থেকে কেউ কেউ তাকে করুণা করবে, ম্যাদারা মুচকী হাসবে আড়ালে, মনসাচরণ আর কিছুকাল পরে তার সামনেই বিড় ধরাবে পা নাচাতে নাচাতে। অথচ এই মনসাচরণকে সে কত গান আড়ালে তাল করে শিখিয়েছে, কে আর জানবে সে কথা।

এ দলে আর এক মুহূর্তও তার থাকা চলে না। একমাত্র পায়ে সে অন্য দলে যেতে। সিরাজগঞ্জে গিয়ে অথবা টাঙ্গাইল গিয়ে কোন দলের কত্তাকে ধরলে তাকে নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাতে খুব সুবিধে হবে না। তিরিশের কোঠার বয়েস হোল। এখন আর মুখখানা তার তেমন কচি-কচি নয় যে কৃষ্ণ অথবা নিমাইয়ের গান অন্য কোথাও তাকে সমাদরে গাইতে বলবে।

তাছাড়া ভালও আর লাগে না। দুপুরে বেলা পড়বার মুখে খাওয়া আর রাত্তিরে তোরের দিকে খাওয়া। বর্ষাকাল বাদে সারাটা বছর ঘুর্ণির মত ঘোর। ইস্টিমারে, কোথাও নৌকোয়, কোথাও গরুর গাড়িতে, কোথাও বা দু-তিন ক্রোশ হেঁটে আসর পাতা, রাতভোর চিৎকার কর। মর! আর ভাল লাগে না।

এগারো বছরে সখি সেজে ঢুকেছিল, আর একটানা প্রায় বিশ বছর রাতের পর রাত এমনি করেই কাটিয়েছে। বর্ষার দিদির কাছে গিয়ে কমাস কাটিয়ে কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এখন ভাগনেরা বড় হয়ে উঠেছে। পনেরো বিঘে জমি চাষ, বাড়িতে গরু, বাগানে তরকারি, পুকুরে মাছ, অনটন নেই কিছু। দিদিও আর নেই। দু'সন আগে মারা গেছে। ভাগনেদের কাছে যেতে হয়, তারা মামার মর্যাদা বোঝে। যত্নআত্তি করে, হাজার হোক এ চক্করের একমাত্র কিন্তু তাদের মামা, তার মর্যাদাই আলাদা।

এখন তারাও যদি শোনে মামা কিন্তু থেকে বলাইয়ে নেমেছে, তবে তারা কি আর সেই মর্যাদা দেবে?

কোথাও পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচত মদন।

এমনি ভাবনার মুখে বাউলী বলে বসল, লও যাই। আমার সাথে।

কথাটা ফেলে দেবার তো নয়ই বরং অবাক হয়েছিল মদন। এমন একটা প্রস্তাব ঠিক সময়মত আর কানে শোনাল, এ কার দয়া। একি ভগবানের দয়া?

তাকাল মদন বিদ্যাধরীর দিকে। বড় বড় চোখদুটোর পাতা নামিয়েছে বিদ্যাধরী। মুখখানা চাঁদের আলোয় মাজা মনে হয় যেন। মাথার চাঁদির ওপর খোঁপাটি আলগা করে দিল বিদ্যাধরী। হাত দু'খানা তুলে খোঁপাটা খুলল, ভন্নীটি যেন চোখে লেগে রইল মদনের। কি পরিপাটি অথচ আলগা আলগা নড়াচড়া ভাবভঙ্গী। যেন স্রোতের মুখে ভেসে রয়েছে। মনে মনুষ্য নেশেই রয়েছে। খেয়াল-খুশিতে ডগমগ।

ভারি অদ্ভুত এই মেয়েমানুষটি।

মুখটা নামাল একটু বিদ্যাধরী।

অর্জুনগাছের পাতার ছায়া সরতে সরতে ওর কপাল আর ঠোঁটের ওপর পড়েছে।

চোখের পাতা নামাল। আস্তে আস্তে বলল,—তোমারে নি ভাল লাগল, মনে করলো, পতিকেই আমার কথাখান মনে ঠেইলো না। তুমি মানুষডা ভাল। তাই কথাখান কইলাম।

মদন মুখটা এগিয়ে এনে বলল,—মানুষ আমি ভাল, কইল কেডা?

—আমার ভাল মনে লয়। কইব আর কেডা।

মুখটা একবার তুলে তাকাল বিদ্যাধরী। চোখ দুখানা যেন দীঘির নিথর জল।

মদন হাসল।—নতুন কথা শুনাইলা। একদু দিনে মানুষ চিন?

—এক নজরে চিনব্যার পারি।

হাসল বিদ্যাধরী। সেই আলো চমকানি হাসি।

—তোমার ঘর-বাড়ি আছে নি?

—একখানা ঘর আছে। দোয়াইল গাও। আর আছে ভিক্যার ঝুলি। তোমার কণ্ঠে দিমু আর একটা ঝুলি, গান গামু, দুরি আওয়াজ তুইল্যা তুফানে ভাসাইয়া দিমু পঞ্চগাওয়ের মানুষেরে। কেমুন মজা ভাইব্যা দ্যাখ।

মজা বটে। ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে গান গাও, নাচ হাসো, যা জুটল খাও আর মনের বশে নিজেকে ভাসাও।

কিন্তু ভিক্ষে। মদনের মন ওঠে না। মর্যাদা বলে একটা কথা আছে। এ চক্করে কে না চেনে তাকে। একডাকে মানুষ চেনে। যাত্রাদলের কেষ্ট মদন ভুঁইয়া। শেষকালে ভিক্ষে করতে হবে এর সঙ্গে নেচে গেয়ে।

একটু থমকে ভাবে মদন।—আমি যদি কাম করি?

—কিসের কাম? কাম আমাগো এক-খান। তুমি সারিন্দা লইও, আমি লমু খঞ্জনী। আওয়াজ তুইল্যা দুইয়া বেড়ামু। আবার কামডা কিসের?

মদন হেলান দেয় গাছের গুঁড়িতে। থম মেরে বসে থাকে কিছু সময়। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না।

বিদ্যাধরী হাসে।—লও যাই। কাইল বিয়ানে চইল্যা যামু। তোমার কাথা-মাথা লইয়া আইস। ভাবনের আর কাম নাই।

মদন আস্তে আস্তে বলে,—তোমার ঘরে কেউ নাই?

—না।

—বিয়া করো নাই?

মস্ত চোখদুটো তুলে তাকায়। দেখে কৌতুক আর হাসির চাপা ঢেউ ওঠে।—ঘরে ঘরে বিয়া নাই আমাগো। বিয়ার মানুষ খুইজ্যা লইতে অয়। মানুষ পাইলে সব পাইল্যাম, বিয়া নিকা যাই মন লয় কর না ক্যান। মানুষ নইলে কিছুই অইব না।

মদন মনে মনে হাসল। বিয়ের সাধ আছে বোল আনা। জামাই জোটে নি। তেমন মানুষ পায় নি যাকে ও বিয়ে করতে পারে। কথাখানায় মানেটা যেমন করে নিল মদন, বিদ্যা তেমন করে বলে নি হয়তো। যে যেমন বোঝে।

মদন খুব একটা খুশি হয়ে উঠতে পারল না। কেমন যেন বাধছে। শেষকালে এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে। তাকে বিয়ে করবার জন্যেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে। ভিক্ষে করে খায়। তাকে বিয়ে করে কি সুখ পাবে মদন। মদনের বরাতে সুখ বুঝি আর নেই।

তবু মেয়েটাকে লাগে ভাল। কেমন মনের খুশিতে গা এলিয়ে বসে আছে। বসলে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। ভাবনা-চিন্তাগুলোর বাঁধন আলগা হয়ে যায়। কেমন গা এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওর মত। বড় মজার আছে মেয়েটা। মান-মর্যাদা নেই। চাল-চুলো না থাকার মত। গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। মন্দ কি! কেমন একটা টান ধরে মনে। কেমন একটা খাপা খাপা ভাব।

—নামডা তোমার কেপী ক্যান শুনলাম সেদিন?

—মানবে ডাকে খেপা।

অল্প অল্প হাসে মদন,—তুমি তোমারি খ্যাপা খুইজ্যা পাইলা না?

—পামু। সময় না হইলে ফল পক্ক অয় না।

—তোমার সাধনডা কি খেপা?

সাধনের কথা জিজ্ঞেস করল মদন। যাবার আগে খোঁজ-খবর জেনে নেয়া ভাল। ও শুনেছে এদের ভেতরে অনেক অদ্ভুত সাধনক্রিয়া আছে। সে সব বড় গুহ্য গোপন। কাউকে বলে না ওরা। কে জানে তেমন কোন সাধনক্রিয়ার খপ্পরে সে পড়বে নাকি। আগে-ভাগে সাবধান হতে দোষ কি?

বিদ্যার চোখ চলমল করে।—সাঁইয়ের নামে বাদাল তুইল্যা ভাইস্যা বেড়াও। এই না সাধন।

—আর কিছু না?

—না। আর যা সব অন্দরে, বাইর বইল্যা কিছু নাই।

মদন তাকায় আর মিটিমিটি হাসে,—আমাক সাধন শিখাইব্যা?

—কেডা কারে শিখায়। নিজের শিখন নিজের কাছে। নিজের মানুষডারে চিন। তার কাছে শিখ।

বিদ্যাধরী কারো কাছে শেখে নি। আকাশের দিকে তাকায়।

—চান্দরে কেডা শিখাইছে ওরানে বইস্যা জোছনায় ডুবাইয়া দিতে। কেডা শিখাইছে এই গাছডারে ছাওয়া দিতে। তোমাক কে শিখাইছিল এই ছমছমা রাইতে এরানে আইয়া বইতে। আমাকে কে শিখাইছিল তোমার কাছে আইতে, দুইডা সুখ-দুখের মিঠা কথা কইতে? কেউ নি কারে শিখাইবার পারে। সহি গুরু বাইরে নাই, আছে এরানে, এই বক্কের মধ্যে। সম্পলের বক্কের মধ্যে।

কথাগুলো যেন হাওয়ার পাতা নড়ার মত ফুসফাস্ করে বলে বিদ্যা।

—এ হগল কথা কওনের না, বলনের না। এ বিত্তান্ত যদি শুনবার চাও, তিবেনীর ঘটে ডুব দেও। রতন আছে গভীরে। এ হগল বড় অকথা বিত্তান্ত।

মজা লাগে মদনের। ভারি মজার কথা। বড় রহস্য কথা। এ খেপা সহজ মানুষ নয়। ও টলমল চোখ দুটোর আড়ালে আপার রহস্য। অর্জুনগাছের পাতার ফাঁকের আলোয় আলোয় সে রহস্য যেন আরও ঘন হয়ে এল। খেপার চোখের দৃষ্টি যেন মিছরির সুতোর মত তার মনটাকে ধরে টানছে।

মদন ভুইয়া একটা আশ্চর্য মজা পেয়ে গেছে। ওই খোলা মাঠের হুহু হাওয়ার মত বুকটা একটানে বড় করে দিয়েছে। অনেক বড়। মস্ত আকাশটা তার বুকে সেঁদোল কি করে? মদনের বুকটার কোথায় কোন এক ফোটা জঙ্গল বাদাড়ের মত পড়ে রয়েছে পতিতপাবনের গলানি, আর কিশ্চযাত্রার মর্যাদা। সব যেন ভুলিয়ে দিয়েছে খেপা।

খেপার চুল খুলে পড়েছে পিঠ বেয়ে। টান টান হয়ে বসে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছে মদনের দিকে। মস্ত চোখ দুটোয় পলক পড়ে না। দীঘির মত নিথর চোখ দুটোয় কি একটা ইসারা—এক রহস্যের হাতছানি।

মদন ভুইয়ার বুকের বাতাস থমকে গেছে। নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না।

—আমি যামু তোমার সঙ্গে।

মদন নিশ্বাস ফেলতে পারল এতক্ষণে,—কথা কইয়া আরাম পাইলাম বড়।

বিদ্যার চোখ দুটি তেমনি ভিজে ভিজে মেঘলা রহস্যে ভরা,—পথম দিনই চিনছিলাম তোমারে। তুমি আমার কালা মদন। তুমি চেন নাই।

হয়তো তাই। কেমন গা শিরশিরে কিসকিস কথা। মদনের বুকের বাতাস কাঁপছে। তাকিয়ে রইল খেপার দিকে। ভাব-ভাবনা কিছুই আর নেই। খেপার স্রোতে গা ভাসান আলগা ভাবখানা তাকেও যেন পেয়ে বসছে ধীরে ধীরে। মন্দ কি। জানা নেই, শুনো নেই, সামনের অজানা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারলে মন্দ কি। আর কিছু না থাক। মজা আছে। জানা পথে আর মজা কোথায়। যত মজা অচেনা পথে।

মদন ভুইয়া গা ভাসাল।

॥ পাঁচ ॥

না, জানা পথে ফিরবে না খেপা। মদনও রাজী। কুমি একটু কিন্তু কিন্তু করে। ভয়-ভয় লাগে।

বিদ্যাধরী হেসে খুন। হাসির ছোঁয়াতে হাসি লাগে।

ভোর বিয়ানে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ধুলো জমেছে। রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে। আঁচল যেন নাওয়ের পালের মত ফুলে উঠছে মাঝে মাঝে।

চলছে তো চলছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। যাবার পথে সঙ্গী ছিল। ফেরার পথে দলবল নেই। সঙ্গী-সাথী নেই।

ওরা তিনজন। মেলায় গিয়েছিল দুজন, সঙ্গে ছিল দলবল। ফিরছে তিনজন দলবল নেই। সায়রের মেলায় গিয়ে সওদা করে ফিরছে বিদ্যাধরী। নিজের পরানডা বেচে কিনে এনেছে আর একখানা পরান।

বিদ্যাধরী দুলতে দুলতে চলেছে। ভেতরটা ওর উথাল-পাথাল।

—পথ নি চিনস?

না পথ চেনে না বিদ্যাধরী। মানুষ চেনে। পথ চেনবার দরকারটা কি। চলতে চলতে এক সময় না এক সময় পৌঁছবেই নিশানায়। পথের ভাবনায় পথের মজাটা খোয়াতে চায় না বিদ্যাধরী।

সোজা সড়কের পথ ধরে চলেছে ওরা। ধুলোয় ভরা উঁচুনিচু পথ গরুর গাড়ির চাকার দাগে খানিকটা সমান সমান হয়েছে। গরুর গাড়ির চাকার দাগ সোজা সড়ক ধরে চলে গেছে যতদূরে চোখ যায়। দু' পাশে ক্ষেত আর মাঠ। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট জলা। জলের চেয়ে কাদা বেশি। কাদার ওপর টুকটুক করে আলতো লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বক চুনো মাছের সন্ধানে।

ওরা চলছে তো চলছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

পুব আকাশটায় রঙ ধরেছে। কাঁসার ঝকঝকে থালার মত সূর্য উঠবে এখুনি, তারই আভাস। বাঁ পাশে মটর কলাই ক্ষেত। মটর লতার কচি ডগাগুলো চিকচিক করছে ভোরের আলোয়। বাতাসে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চিকচিকে সবুজ কলাই ডগার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। বেশ ডাগর ডাগর মটর-শুঁটি। বাতাসে দুলছে মায়ের কোলে কচি বাচ্চার মত। ডানদিকে মাঠ পেরিয়ে বসত। কিছু গাছ-গাছালি ঘেরা ছোট একখানা গাঁও। দশ-বিশ ঘর মানুষের বাস। দুটো ন্যাংটো বাচ্চা ছুটতে ছুটতে কলাই ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। টকাটক মটর-শুঁটি ছিঁড়ে ছোট ছোট মুঠোয় দুটো মুঠোয় যে ক'টা পারে ভরে নিয়ে আবার ছুট।

ওদের ভয় দেখাবার জন্য একটু তাড়া করল মদন। পাঁই পাঁই করে দুটো পাখীর

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩০,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোনঃ ২২-৬৫৮০

মত হাওয়ার আগে কেন উড়ে গেল মাছ দুটো। সেই ছায়া ছায়া গাছ-গাছালি ঘেরা গাঁওয়ের ভেতরে। হেসে উঠল মদন। ভোরের বাতাসে মদনের ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল উড়ছে—পড়ছে মুখের ওপর। বাঁ হাতে মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিল মদন। ডান হাতে ধরে আছে মাথার ওপর ছোট একটা সুটকেশ—তার ওপর দুটো পুটলী। টিনের সুটকেশ। গোলাপ ফুল আঁকা ওপরের ডালায়। বছর ছয়েক আগে পলমাইটার হাট থেকে কেনা। দু-চার জায়গায় গাঢ় খয়েরী রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে রোদে-জলে। তবু এমন একটি সম্পদ খুব বেশি মানুষের নেই। এটা মদনের মর্যাদা বাড়ায়।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস। পায়ের নিচে ধুলো ঠাণ্ডা। সামান্য ভেজা ভেজা। মদন চলেছে। এমন চলা ও বহুকাল চলে নি। কোন ভাব-ভাবনা নেই, কাল-পরশুর চিন্তা নেই। সামনের আকাশ মাঠের মত কসখোলাসা বুকখনায় শুধু ভরা-ভরন্ত খুশি। এমন নির্ভাবনা ভোরের স্বাদ কখনো পায় নি মদন।

চলছে তো চলছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

কোথায় যাবে, কে অত ঠিকানা করে। কোথায় পৌঁছবে, কে অত খোঁজ রাখে। চলতে হবে, তাই চলছে।

অনেক পথ পড়ে রইল পেছনে। সূর্যটা উঠলেন এতক্ষণে। ওনার ঘুম ভাঙল।

বিদ্যাধরীর কাঁধে ঝোলান ডুব্বক, একতারা। কুমির পেট কোমরের আঁচলে বাঁধা সাতখানা টাকা। মুকুন্দর ঘরে জমেছে এসেছে ওর আঁচলে। কুমি বিদ্যার হাতখানা চেপে ধরে চলেছে।

বিদ্যাধরী গুনগুনিয়ে উঠল। হাওয়া উঠল কণ্ঠে। আওয়াজ উঠল বাইরের বাতাসে।

গুরু গো সুজন নাইয়া।
ভবপারে লও আমারে বাইয়া।
আমি ত' জানি না সাতার।'
অগো আমারে মাইরো না চুবইয়া।

মদন আগে আগে চলে। ওর কানের পাশ দিয়ে শনশনে বাতাসের বেগে সুরটা অনেক নরম ক্ষীণ হয়ে কানে লাগে। মনটা কেমন টনটন করে, ওর বুকের হাওয়ায় ঢেউ লাগে। বিদ্যার গানের সঙ্গে তুলে ও সুর দেয়। অ গুরু গো—ও-ও—

ডান দিকে খুব উঁচু ভিটের ওপর মস্ত টিনের ঘর। ছোট টিনের বাড়ি দু'খানা। ঝকঝকে তকতকে। সামনে কুয়োর জল তুলছে দুটো সেপাই। সেপাই দুটো বদনা ফেলে ওদের দিকে আসছে। ইসারায় কাছে ডাকে। এটা একটা থানা। থানায় সিপাই ডাকে কেন? কুমি বিদ্যার হাত ধরে টানে। সিপাই দেখলে বড় ভয় লাগে। চৌকিদারকে ও যমের মত ভয় করে। দেবতার মত খাতির করে। এরা চৌকিদারের ওপরে, জলজ্যান্ত সিপাই।

বিদ্যা কুমির হাতটা ধরে টানতে টানতে এগোয়।

একজন সিপাইয়ের মুখে চাপ দাড়ি। বলে,—বয় এয়ানে। আর একখান গান শুনা।

সিপাইয়ের হুকুম। কুয়োর ধার ঘেঁসে বসে পড়ে ওরা। মদন মাথা থেকে বোঝা নামায়। পা-দুখানা একটু জিরোল এতক্ষণে। এত হাঁটা অভ্যাস নেই মদনের। তবু হাঁটতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল না।

একতারার বং বং আওয়াজ ওঠে।

অ মন চোরা তুই তল্‌পী সামাল
রাখলি নি।
অ তর চারিধারে ছয়জ চোরে করে রে
যুলবুলানি।

বলিহারী। সিপাই বাবাজীর মুখে রসের হাসির ছোঁয়া লাগে। বাইয়া আওয়াজ তুলছে খেপী! কুমির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে। মদন পৌঁ ধরে। সুর দেয়—অ মন চোরা তুই তল্‌পী সামাল রাখলি নি। অ চোরা মনরে আমার।

বঙা বং বঙা বং—তারের আওয়াজ তাল ঠোকে।

অ তুই চোরে চাইপ্যা ধর, ঘরের বাইর
কর।
থানায় আইন্যা ধরাইয়া দে', তর সে
বুবি ক্যাদ্‌রনী।
অ মন চোরা তুই তল্‌পী সামাল
রাখলি নি।

কালা মদন জুরি ধরে—ও চোরা মন রে আমার—বঙা বং—বঙা বং—বঙা বং—

বিদ্যা খেপী কয়, কথা মিথ্যা নয়।
ভাবের চুরি বন্দ হইলে রসেরি উদয়।
অ তুই রসিক পুলিশ পাহারা রাইখ্যা,
খাবি রসের জলপানি।
অ মন চোরা তুই তল্‌পী সামাল
রাখলি নি।

অ চোরা মন রে আমার—বঙা বং—বঙা বং—

বাহারের গান গাইল খেপী। মদন জুরি ধরে আরও কেন মিঠে করে তুলেছে হাওয়া। সিপাই দু'জন দুলতে দুলতে শুনছে। ভোরের হাওয়া জমজমাট চেউরের মাথায় তুলেছে।

—তরা যাবি কোয়ানে?

মদন জবাব করে,—ঘোয়াইল—কালাকান্দির কাছে। কোন পথে যাওন ভাল হইব বাবু?

দাড়িওলা সিপাই বলে,—অই যে দ্যাখস বটগাছ, হ ওয়ানে গিয়া ডাইন মুয়া চইল্যা যা। নদীর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে কালাকান্দির সড়ক পেঁাছাবি।

বিদ্যাধরী একমুখ হাসি নিয়ে বলে,—তোমাগো কুয়ার হাত-মুখ ধুইয়া লমু নাকি কও বাবু?

সিপাইরা সম্মতি দেয়।—হ, হ, রইস জল তুইল্যা দেই।

দড়ি-বালতি নামিয়ে জল তুলে দিল সিপাই, ওরা হাত-মুখ-চোখ ধুয়ে নিল। কুমির মুখ ধুতে দু'দণ্ড দেরি হয়। ও বেশ ঘসে-মেজে মুখ ধোয়। কুলকুচো করে। দাঁত ঘসে মাটি দিয়ে। হাতের কনুই পর্যন্ত, পায়ের হাঁটু পর্যন্ত পরিষ্কার করে ধোয়। খানিকটা জল চক চক করে খেয়ে নেয়।

বড় আরামী আয়েসী শরীর কুমির।

আবার পেঁটরা বোঁচকা মাথায় তোলে মদন।

পথে নেমে মদন খুক খুক করে হাসে। খেপীর খুশির ছোঁয়া লেগেছে ওর বুকে। দড়িদড়ায় বাঁধন নেই, আলগা খুশির ছোঁয়া।

—গানখান বড় জবর গাইছ! পদ বানাইছ তুমি?

বিদ্যার হাসন লেগেই আছে।—যা মন নিল। আওয়াজে ভুরভুরাইয়া দিল্যাম।

মনে যা এসেছে, শব্দে সুরে তাই বার করে দিয়েছে। তাজ্জব কারখানা! এখুনি বানিয়ে ফেলেছে গানখানা! মদন তাকায় বিদ্যার দিকে। সত্যি বিদ্যার পরিচয় যত পাচ্ছে, ততই যেন বিদ্যার টানে ও নরম হয়ে যাচ্ছে। বড় গুণীন মাইয়া! গুণের সীমা নাই। হাসির খুশির সীমা নাই। প্রাণটা নিয়ে মুঠোর মুঠোর বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মদনের চোখে অবাক হাসি।

কুমি তাকায় মদনের দিকে। কালো ঘন জোড়া ভুরু কুঁচকে ওঠে। মদনের অবাক মিঠে দৃষ্টিটা তখনো বিদ্যাধরীর মুখের ওপর। মাথার বোঝাটা বুঝি বা পড়ে যায়। কুমি হাত বাড়ায় বোঝার দিকে।

—বুচকিগুলান পইড়্যা যাইব।

বলে হেসে বলে,—আমাগো হইব কলা। তোমার সোন্দর বাকসখান ভাইঙ্গা খানখান অইব।

মদন মাথায় টান সামলায়। কোন কথা বলে না।

ঠাণ্ডা জলে চোখ-মুখ ধুয়ে বেশ আরাম লাগে। বাতাস তেমনি বইছে হু হু করে, কিন্তু তেমন ঠাণ্ডা। সূর্যি উঠেছেন এক মানুষ সমান ওপরে। আকাশের রঙ মুছে শাদা করে তুলছেন। তবু রোদটা তখনও নরম। বাতাসে রোদে মিলে-মিশে লাগে ভাল। সূর্যি যত গরম হবেন, তত গরম হবেন পবন দেবতা। বাতাসে আগুনের হল্কা ছুটবে। পিকিতির মিল, হতেই হবে। কেউ কাউকে শিখায় না, যে যার মত পিকিতির নিয়মে কর্ম করে—বলেছিল খেপী। কাল বলেছিল, অর্জুনগাছের তলায় নিয়মে রাত্তিরে।

মদন আর কথা বলে না। ভেতরে কেমন একটা আনন্দ ওকে ভরে তোলে। চলছে ওরা।

চলছে তো চলছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

বটগাছের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। থামল মদন। বিদ্যা কুমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—কোন মুড়া যাইবার কইল, ডাইন না বাও?

সিপাইটা বলে দিয়েছিল বটগাছের কাছে গিয়ে পথ পাবে। সেই পথে নদীর ধারে চলে যেতে হবে। পাড় ধরে চলে যেতে যেতে কালাকান্দির ঘাট। তারপর আর কি? কালাকান্দি আর দোয়ালী। এ ঘর আর ও ঘর।

—কোন মুড়া যাইবার কইল?

কুমি আর বিদ্যা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মদন হাসে। থেমে পড়ে।—কও দেহি কোন মুড়া যামু?

সড়কটা চলে গেছে সোজা নাক বরাবর। কোথায় কে জানে। এই বটগাছের সীমানায় দু'পাশে সড়ক থেকে নেমে গেছে দুটো হাঁটা রাস্তা। একটা পুবে, একটা পশ্চিমে।

কুমি ভয়ে ভয়ে তাকায় মদনের দিকে।—তুমিও ভুইল্যা গ্যালা?

মদন মিটি মিটি হাসে।—পথ চিন না, আইল্যা কি কইর‍্যা?

—মানুষের সাথে আইছিলাম।

—অখন যাওনের পথে একলা।

বিদ্যাধরী ফিক ফিক করে হাসে।—একলা কোন দুখে, তুমি রইছ।

বিদ্যাধরীর কথায় মদন ভারি খুশি। বিদ্যাধরী নির্ভর করতে জানে, কুমি জানে না। কুমি ভয় পায়। ভয় দেখায়।

—আমি যদি ভুলাইয়া লইয়া যাই?

—ভুইল্যা ভুইল্যা যামু তোমার সাথে।

খাসা কথা বলে বিদ্যাধরী। মদন মনের সুখে এদিক-ওদিক তাকায়। বটগাছের আগা থেকে এক মঙ্গল কাক কা কা করে উড়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার এসে বটগাছের ওপরেই বসে। দুটো কুকুর কিমুচ্ছে বটগাছের মোটা শেকড়ের ওপর। চারদিকে ছড়ান ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর চাটাই।

—এ জানি শ্মশান-মশান মনে লয়।

কুমি বিদ্যার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। মদন সূর্য যেদিকে উঠেছে, সেদিকে একটু সময় তাকিয়ে একটু ভেবে বলে,—পুলিশ কইল ডাইনে যাওনের কথা, আমিও তাইব্যা দেখলাম। নদী পশ্চিমে না, পুবে। পুবদিকে চলো।

ডান দিকের রাস্তায় নেমে পড়ল ওরা। সরু পায়ে হাঁটা পথ। দু'পাশে আগাছার জঙ্গল। চোখের সামনে সূর্য। তাকান যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মুখের ওপরে রোদটা ক্রমেই চড়ছে। বেশ জ্বালা ধরছে। মদনের মাথায় বাক্স। কুমি মাথার ওপর ঘোমটা টেনেছে। বিদ্যাধরীর মাথার ওপর খোঁপা।

—উঃ! গেছিরে, খাড়াও।

কুমির কথায় দাঁড়াল ওরা। বসে পড়েছে কুমি। পায়ের তলায় একটা কাঁটা ফুটেছে। পায়ের আঙুলের মত লম্বা। টেনে বার করল কুমি। রক্ত বেরোল একটু। তার ওপর খানিকটা ধুলো চাপড়া করে মাখিয়ে দিল। ব্যস। ওই ধুলোই ওষুধ। ধুলোমাটির বড় ওষুধ নেই। ধুলোমাটির অনেক গুণ। জলমাটির দেহখানা জলমাটিতেই থাকে ভাল। পেকে যদি ওঠে, লাগাবে গাঁদা পাতার রস। ঘা সেরে যাবে দু'দিনে।

বিদ্যা হাসে।—মুখে-মাখমের শরীল আমাগো কুমির।

মদনও হাসে কুমির মুখের দিকে তাকিয়ে। সত্যি কুমির মুখখানা এরি মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। মুখের কালো চামড়া চিক চিক করছে ঘামে। চোখদুটোর দুটো কোণে লাল আভা।

খোঁচাটা সইতেই হয় কুমিকে। খোঁচাটা ও গর্বের কথা বলে মনে করে। দেহখানা ওর ভঙ্গুর-ভঙ্গুর। ঠাণ্ডা লাগে কষ্ট হয়। দেহের পরিপাটি তত্ত্বতালাস না করলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত নরম-সরম শরীর।

আবার হাঁটতে শুরু করে। দু'দিকে পাটের ক্ষেত। কাটা পাটের গোড়াগুলো শক্ত হয়ে রয়েছে রোদ মাটিতে। এখানে ধান রোয়া হয় নি কেন কে জানে। ওরা অত খপর রাখে না। নিজেদের জমি-জিরাত নেই। দিন আনা দিন খাওয়া। অত খপরে কি কাজ।

এদিকটার চাষ আবাদ ভাল নয়। কেন কে জানে। বোধ হয় নদীর জল উপচে এসে পড়ে এখানে। কে জানে।

দু'ধারে জঙ্গল আর আগাছা। জনবসতি নেই বললেই চলে। [ক্রমশঃ]

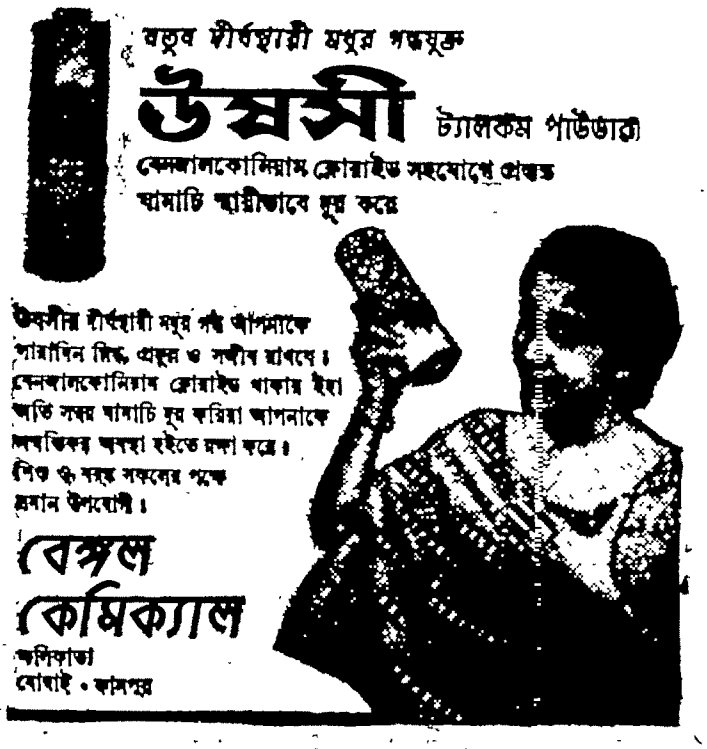

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পাকিস্তানের রাজনীতি ॥

পাকিস্তানের রাজনীতির কিছুটা আভাস পূর্বেই দিয়েছি। সেটা ছিল কেবলমাত্র আভাস। সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি। সেই আলোচনা পড়লেই পাঠক-পাঠিকারা পরবর্তী অধ্যায়গুলোর আমার বক্তব্যের মর্ম ও তার কার্য-কারণ সম্পর্ক ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

পূর্বে পাকিস্তানের রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে তাকে বলেছি মুসলিম-লীগের নীতি। সেই সময়ে অবশ্য সেই নীতিকে পাকিস্তানের নীতিই বলা যেত; কারণ, তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে যাঁরা রাজনীতি করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্য আর কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক দল ছিল না। সকলেই হয়েছিলেন মুসলিম-লীগ-নীতিরই সমর্থক; সুতরাং সে অবস্থায় ঐ নীতিকে পাকিস্তানের নীতি বললেও ভুল হত না; তবু আমি তাকে মুসলিম-লীগের রাজনীতি আখ্যা দিয়েছিলেম; কারণ, পরবর্তীকালে, ঐ নীতি থেকে পৃথক মতবাদ নিয়ে আরও কয়েকটি সর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিক দল গড়ে ওঠে। তখন পূর্বেকার অনুসৃত নীতি, মুসলিম-লীগেরই নিজস্ব নীতি হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যই আমি প্রথম থেকে ঐ অনুসৃত নীতিকে মুসলিম-লীগের রাজনীতি বলেই এর আগে থেকেই বলে এসেছি।

১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় যে মুসলিম-লীগ দল প্রথমে সৃষ্টি হয়, তার ভিত্তিই ছিল হিন্দু-বিদ্বেষ। এই হিন্দু-বিদ্বেষ, ক্রমে ভারত-বিদ্বেষের রূপ নেয়। ১৯৩৭ সালে নূতন শাসনতন্ত্রে (১৯৩৫ সালের) সাধারণ নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে (ইউ পি'তে) মন্ত্রিত্বের 'মসনদ' নিয়েই প্রথম মনোমালিন্য দেখা দেয়। নির্বাচনে 'কংগ্রেস' সেখানে একক সংখ্যাসরিষ্ঠ দলরূপে নির্বাচিত হয়। মুসলিম-লীগ দাবি করে যে তার সাথে মিলিত হ'য়ে কংগ্রেসের যৌথ-সরকার গড়তে হবে। কংগ্রেস রাজী নয়। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতিই ছিল, কোথাও সম্মিলিত যৌথ-সরকার (Co-alition) না-গড়া; সেইজন্য, কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে যৌথ-সরকার গড়তে রাজী হয় না। বাংলাদেশেও জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে গড়া 'কৃষক-প্রজা' দলের সাথেও মিলিত হ'য়ে যৌথ-সরকার গড়ে না। কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল, জিন্নাহ-নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম-লীগের সম্পূর্ণ বিরোধী—তাঁরা মুসলিম-লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এই দলের প্রায় অধিকাংশ সদস্য ছিলেন, জাতীয়তাবাদী; কেউ কেউ একেবারে খাস কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন; যথা, গাইবান্ধার জনাব আবু হোসেন সরকার, কুষ্টিয়ার মৌলভি সামসুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। তাঁরা কংগ্রেস-আন্দোলনেও বারে বারে 'জেলে' গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কংগ্রেসেরই একটি শাখা ছিলেন। জনাব ফজলুল হক সাহেবও একসময়ে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জনাব হকসাহেব ছিলেন মনে-প্রাণে একজন জনদরদী খাঁটি বাঙালী। তাঁর মতই আর একজন জনদরদী খাঁটি বাঙালী রাজনীতিক নেতাকে দেখেছি। তিনি ছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। এঁরা উভয়েই ছিলেন সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিক নেতা, আর একজন বৈজ্ঞানিককেও দেখেছি, খাঁটি বাঙালী-রূপেই। তিনি ছিলেন, আচার্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। এঁরা সকলেই বাংলার ও বাঙালীর কথা বলতে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। দেশবন্ধুর প্রতিটি বক্তৃতায়—"আমার বাংলা"—কথাটা ধ্বনিত হ'য়ে উঠতো। সে ধ্বনি আজও আমার কানে লেগে আছে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত জনাব হক সাহেবকে দেখেছি, 'বাংলার ও বাঙালীর কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলতেন—দুই চোখ দিয়ে অশ্রু যবে তাঁর গণ্ডদেশ ভাসিয়ে দিত। স্বাধীনতার ফলে, বাংলা-বিভাগের ব্যথা তিনি সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন। তাঁর ঐ মনোভাবের মধ্যে কোনও ফাঁক বা ফাঁকি ছিল ব'লে আমি মনে করি না। এহেন লোকের প্রতিষ্ঠিত রাজ-নীতিক দল—কৃষক-প্রজা পার্টির সাথেও সর্বভারতীয় 'কংগ্রেস' ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বাংলার কংগ্রেস দলকে যৌথ-সরকার (Co-alition) গড়তে দিলেন না। জনাব ফজলুল হক সাহেব বাংলাদেশে কংগ্রেসের সাথে যৌথ মন্ত্রি-সভা গড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। সে সময় যদি কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা দলের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলায় যৌথ মন্ত্রিসভার পরিচালনায় 'সরকার' গড়তেন, তাহলে শুধু বাংলারই নয়, সারা ভারতের ইতিহাসই অন্য রূপ নিত। মুসলিম-লীগও শক্তিশালী হ'ত না; সুতরাং দেশ-বিভাগও হ'ত না। কিন্তু ভারতের ভবিতব্য তা' ছিল না। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কিছুতেই যৌথ-সরকার গঠনে মত দিলেন না। বাংলার কংগ্রেসদলও নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হ'তে পারে নি; তাই, তাঁরা বিধানসভায় বিরোধী দল হ'য়েই থাকলেন; আর, জনাব হক সাহেব মুসলিম-লীগ দলের সাথেই অগত্যা হাত মিলিয়ে বাংলায় যৌথ-সরকার গঠন করলেন। হক সাহেবকে একরূপ জোর করেই মুসলিম-লীগের কোলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হ'ল। মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারেন এবং করেনও। সে ভুলের মাশুল তাঁকেই দিতে হয়। কিন্তু দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা নেতারা যখন ভুল করেন, তখন সে ভুলের মাশুল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—সারা দেশকেই সেই ভুলের মাশুল গুণতে হয়। সারা ভারতবর্ষ বিশেষ ক'রে, বাংলাদেশ—সেই ভুলের মাশুল আজ পর্যন্ত—সুদে-আসলে গুণে দিচ্ছে। আসামকেও দিতে হ'ত, যদি পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা-রূপে নিজ দায়িত্বে সেখানে সম্মিলিত যৌথ-সরকার (Co-alition) না-গড়তেন। এটা ঘটে ১৯৩৮ সালে। সুভাষবাবু তখন কংগ্রেস-সভাপতি। বাংলায় কৃষক-প্রজা দলের ও মুসলিম-লীগ দলের যৌথ-সরকার গঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন জওহরলাল নেহরু। তাঁর নেতৃত্বে পরি-চালিত কংগ্রেসের তৎকালে নীতিই ছিল, কংগ্রেস দল যে প্রদেশে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে না-পেরেছেন, সেখানে তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকা নেবেন—কিছুতেই অপর কোন রাজনীতিক দলের—সে-দল মুসলিম-লীগ বিরোধী হলেও—সাথে হাত মিলিয়ে যৌথ-সরকার গড়বেন না। এই নীতির ফলেই বাংলার কংগ্রেস দল, কৃষক-প্রজা দলের সাথে হাত মেলালেন না। উত্তর প্রদেশেও

"মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
মুক্তধারা ঝরনাটি
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়,ঢাকা
৬৬,সাধনা ঔষধালয় রোড,সাধনা নগর,কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,এম,এ,আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,এফ,সি,এস(লণ্ডন),
এম,সি,এস(আমেরিকা)সাগরপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
ডাঃ কবিরাজ-ক নরেশচন্দ্র ঘোষ,এম,বি,বি,এস(কলিঃ)আয়ুর্বেদাচার্য

না। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসই ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল; আর, সেখানে যৌথ-সরকার গড়লে, গড়তে হ'ত মুসলিম-লীগ দলের সাথে। জনাব খালিকুজ্জমান সাহেবের আব্দার সত্ত্বেও সে আব্দারে 'কংগ্রেস' কান দিল না। ক্ষমতালোভী মুসলিম-লীগ দল ক্ষমতা হাতে না পেয়ে একেবারে বে-পরোয়া মরিয়া হ'য়ে উঠলো। তাঁরা কংগ্রেস-শাসনে মুসলমান-নিপীড়নের ফিরিস্তি তৈরি করার জন্য পীরপুরের নবাব সাহেবকে চেয়ারম্যান ক'রে একটা তদন্ত কমিটি গড়লেন। এই পীরপুর-রিপোর্ট সারা ভারতময় একটা চরম উত্তেজনা মুসলমান সমাজের মধ্যে গড়ে তোলে। মুসলিম-লীগের দলীয় প্রচারযন্ত্র অবাধ গতিতে ভারতবর্ষের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে চলে। একেবারে নাৎসি জার্মানির গোয়েবলসীয় কায়দায় মুসলিম-লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার চলতে থাকে। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস-সরকার গড়ে উঠেছে, সেখানেও সরকার কোন বাধা দেন না। কংগ্রেস-নেতারা চিরদিনই প্রচারে অপটু, বা অ-মনোযোগী। আগেও যে অবস্থা দেখেছি, স্বাধীনতার পরেও সেই একই অবস্থা দেখছি। কাশ্মীর নিয়েই ধরা যাক না কেন—বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তান, আজ ভারতের চেয়ে অনেক বেশি রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতরা নির্বিকার! তাঁদের কোনও নির্দেশও দেওয়া হয় না। কিছুকাল আগে ভারত-সরকার, পূর্ব পাকিস্তান থেকে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ ক'রে ভারতে আসার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাপুর-কমিশন বসিয়েছিলেন। ঐ 'কমিশন' বিভিন্ন স্থান ঘুরে বহু বাস্তুত্যাগীর সাক্ষ্যও নিলেন—তাঁদের অনেকেরই দেহে বীভৎস অত্যাচারের চিহ্নও চাক্ষুষ করলেন—বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিলেন—ভারত-সরকার ঐ কমিশনের পেছনে 'গৌরী সেনের' টাকা খরচও কম করলেন না—'কমিশন'ও তাঁদের দায়িত্ব যথারীতিই পালন করলেন—তাঁরা তাঁদের রিপোর্টও যথাসময়ে সরকারের কাছে দাখিল করলেন। সম্প্রতি খুব উচ্চশিক্ষিত ডক্টরেট উপাধিধারী জনৈক অবাঙালী বন্ধু হরিয়ানা রাজ্য থেকে আমাকে যে পত্র লিখেছেন, তা থেকে একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তাতে সকলেই বুঝবেন যে, রিপোর্টটি কী বিরাট। তিনি লিখেছেন :

"From a friend of mine I have learnt that many months back Kapur Commission had submitted its report in three exhaustive volumes covering about two thousand pages. I wish if it could be published, it would serve as an eye-opener." (অর্থাৎ, আমি আমার জনৈক বন্ধুর কাছে শুনেছি যে কয়েক মাস আগে 'কাপুর-কমিশন' তাঁদের তৈরি ২,০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করেছেন। ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লে সকলেরই চোখ খুলে যাবে।)

কিন্তু কথা হচ্ছে, চোখ খোলাবে কে? ভারত-সরকার? দুরাশা! তাঁরা কপালে 'সত্যমেব জয়তে'-এর 'লেবেল' এঁটে রেখেছেন—তা'তেই সব হবে! সত্যও যে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে, তা তাঁরা বোঝেন না—বুঝতেও চান না!

পাকিস্তানের প্রচারদপ্তর যে গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচারে কত দক্ষ ও সক্রিয় তার একটা 'নজির' এখানে তুলে ধরছি। ১৯৬২ সাল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খান সাহেব ঢাকা থেকে হাওয়াই 'প্লেনে' হঠাৎ উড়ে আসেন রাজসাহী শহরে। তিনি একা আসেন না। সাথে ক'রে নিয়ে আসেন, একজন বিদেশী সাংবাদিককেও, উদ্দেশ্য, ঘোরতর দুরভিসন্ধি! দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দুর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে তাঁদের ভাবতে তাড়াতে হবে; কারণ চীনের আক্রমণের আগেই ভারতের ওপর অর্থনীতিক ও আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে দেওয়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে চাপ সৃষ্টি করা। পরিকল্পনা সব পাকাপাকি-ভাবে ঠিক করেই তিনি সাংবাদিকদের নিয়ে এলেন। রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে ব্যবধান—পদ্মা নদীর। এই ব্যবধানের মধ্যে কতকগুলো বড় বড় চর আছে; আর সেইসব চরের অধিবাসী বেশির ভাগই মুসলমান। চরের অধিবাসীদের কথায় টান, মুর্শিদাবাদ জেলার কথার মত। দেশ বিভাগের ফলে তারা পড়েছে রাজসাহী জেলার মধ্যে, যদিও মুর্শিদাবাদ জেলা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে, তথা ভারতে। এই সব চরের স্ত্রী-পুরুষ মুসলমানগণকে আগে থেকেই 'তালিম' দিয়ে রাখা হয়েছে। সাংবাদিকগণসহ আজম খাঁ সাহেবের বৈঠক বসে এবং ঐ সব মুসলমান নারী-পুরুষ আকুলি-বিকুলি হ'য়ে কেঁদে খাঁ সাহেবকে বলেন—"হুজুর! আমাদের সর্বনাশ হয়েছে! মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুরা, আমাদের বাড়ি-ঘর সব লুটে ক'রে পুড়িয়ে দিয়েছে, মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করেছে, বহু নর-নারীকে হত্যা করেছে! আমরা যে কয়জন বেঁচে ছিলাম, প্রাণের ভয়ে সকলে পালিয়ে এসেছি। 'হিন্দুস্থানের' সরকার ও পুলিশ আমাদের রক্ষা করে নি। এখন পাকিস্তান-সরকার আমাদের না-বাঁচালে আর আমাদের বাঁচার কোনও উপায় নাই। ....." ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর সে কী কান্না—একেবারে মর্মন্তুদ হাহাকার! চমৎকার অভিনয়—অতি চমৎকার! নটশ্রেষ্ঠ শিশির ভাদুড়ী মহাশয় যদি বেঁচে থেকে সেই দিনের সেই অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে দেখতেন যে তাঁর অভিনয়ও সেই দিনের অভিনয়ের কাছে অত্যন্ত ম্লান। সেদিনের সব কিছুই অভিনয় হলেও, বিদেশী সাংবাদিকদের প্রচারণার ফলে বিশ্বের দরবারে অভিনয়ই সত্য ঘটনা বলে প্রচারিত হ'ল। ঢাকার অনেকগুলো সংবাদপত্রই বেশ 'ফলাও' ক'রেই মুর্শিদাবাদে মুসলমান নির্যাতনের কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। শুধু প্রকাশ করলেন না ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' ও আরও দুই-একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র। 'পাকিস্তান অবজার্ভার' তাঁদের এক সংবাদদাতাকে পাঠালেন, মুর্শিদাবাদের ঘটনার তদন্ত ক'রে রিপোর্ট দিতে। তিনি এলেন, তদন্ত করলেন এবং রিপোর্টও দিলেন। তাঁর রিপোর্টে দেখা গেল যে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোটেই হয় নি। সেই রিপোর্টে আরও প্রকাশ পেল যে, মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই নাকি, তাঁকে বলেছেন যে, "এই জেলায় এখনও আমরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আমাদের ওপর ব্যাপক কোন অত্যাচার-উৎপীড়ন করা এখন পর্যন্ত অপর সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়।" এই সবই 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশ পেল কিন্তু পেলে কি হবে? যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেল। বিদেশেও সকলে জানলেন যে ভারতের হিন্দুরা মুসলমান-নিপীড়নকারী। রাজসাহী জেলাতেও দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রাজসাহী শহরের উপকণ্ঠে হিন্দুপ্রধান দাবুশা গ্রামে ব্যাপকভাবে অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরের দিনই হয়ে গেল। ঐ গ্রামে একদিনেই কমপক্ষে ১,৮০০ থেকে ২,০০০ হাজারের মত বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ নিহত হ'ল। সে যে কী নৃশংসভাবে তারা নিহত হ'ল তা' বর্ণনাতীত। রাজসাহী শহরের প্রত্যেকেই—শুধু রাজসাহীরই বা কেন, মুর্শিদাবাদ জেলার ও পদ্মাতীরের গ্রামের অনেকেই—দেখেছেন যে, রাজসাহী শহরের আশে-পাশে তিন দিন ধ'রে সমানে আগুন জ্বলেছে কিন্তু ডি সি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) জনাব পি এ নাজির, সি এস পি (P. A. Nazir,

C.S.P.) নির্বিকল্প, অবিচলিত। তাঁরই অক্লান্ত নেতৃত্বে এই সবই ঘটেছে। ১৯৬২ সালের হত্যাকাণ্ডের আগে রাজসাহী জেলা থেকে ব্যাপক কোন বাস্তুত্যাগ হয় নি। এইবার বাঁধ ভাঙলো। পদ্মা নদী পার হ'য়ে প্রতিদিন একরকমে ২০০।৩০০ ক'রে লোক মুর্শিদাবাদ জেলাতেই আসতে সুরু করে। ঐ ঘটনার পরে আজ পর্যন্ত এক মুর্শিদাবাদ জেলাতেই কমপক্ষে ৩০।৪০ হাজার লোক এসেছে। এদিকে তার ফলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার খুবই আশঙ্কা ছিল। রাজসাহী জেলার লোকের এই প্রবন্ধ লেখকের ওপর গভীর আস্থা বরাবরই ছিল। তিনি তখন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে এবং তাঁরই চেষ্টায় জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে ঐসব সবাগত বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্য সক্রিয় হন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীদিলীপ গুহ, আই এ এস মহাশয়ও খুব সহানুভূতির সাথেই তাঁর ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে থেকেই যতটা সম্ভব সাহায্য এই প্রবন্ধের লেখককে তৎকালে দিয়েছিলেন। বহু চেষ্টায় বাস্তুত্যাগীরা কোনওরকমে পুনর্বাসিত হয়েছে এবং লেখকের আপ্রাণ চেষ্টায় কোনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এখানে হ'তে পারে নি। শুধু তাই নয়—১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা এইবারই বোধহয় সর্বপ্রথমে—বাস্তুত্যাগীদের ভোটও পেয়েছেন। এইসব বাস্তুত্যাগীরা যখন এই জেলায় দলে দলে প্রতিদিন ভিখারীর বেশে আসতে থাকে, তখন তাদের বিষয় নিয়ে আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর ও কংগ্রেস-নেতা অতুল্যবাবুর সাথে আলোচনা করেছি। অতুল্যবাবুর সাথে প্রাদেশিক কংগ্রেসভবনে যে আলোচনা হয়েছিল, তার সামান্য কিছু অংশ এখানে নিবেদন করছি। অতুল্যবাবু আমাকে বলেন—

অঃ—"রাজেশ্বর দয়াল (তৎকালীন, পাকিস্তানে ভারতের হাই কমিশনার) আমাকে সবই বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে, আমরা যে এইসব বাস্তুত্যাগীদের সাহায্য করবো, তারা তো আমাদের সাহায্য নিয়ে পরে বামপন্থীদের সাথে ভিড়ে যাবে। সে অবস্থায় আমরা সাহায্য করবো কেন?

আমিঃ—কেন, এইসব বাস্তুত্যাগীরা বামপন্থীদের দলে ভিড়ে যায়, সে সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি?

অঃ—তাত্র অনেক কিছুই আশা করে আমাদের কাছে আসে কিন্তু আমরা তাদের সব আশা পূর্ণ করতে পারি না; তাই তা'রা বামপন্থীদের কাছে যায়।

আঃ—আপনারা তো শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আপনারা যাই হোক কিছু তো সাহায্য করেন কিন্তু বামপন্থীদের তো কানাকড়ি দিয়েও সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তবু তারা তাদেরই কাছে যায় কেন?

অঃ—আপনিই বলুন, কি জন্য যায়।

আঃ—আমার ধারণা, আপনাদের কাছে যে সহানুভূতি পাওয়ার আশা তারা করে সেই সহানুভূতি-টুকুও তা'রা পায় না। বামপন্থীরা আর্থিক কোন সাহায্য দিতে না পারলেও মৌখিক সহানুভূতি অন্তত তাদের প্রতি দেখায়, যা আপনারা দেখান না।"

এরপরে আমি এ-ও বলি যে—"আমি একবার পরীক্ষা ক'রে আমার মত ঠিক কি না দেখবো। আমি দেখেছি, পাকিস্তানে থাকতে, আজকের বাস্তুত্যাগী এই হিন্দুরাই, কংগ্রেসকে পুরোমাত্রায় সমর্থন করেছে। ১৯৪৬ সালে আমার নির্বাচনে দ্বিতীয় কোন হিন্দুই আমার বিরুদ্ধে প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ায় নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও আমার কোন টাকা-পয়সাও ছিল না—আমি খরচও করতে পারি নি। আর আমার নির্বাচনক্ষেত্র ছিল, রাজসাহী জেলার তিনটি মহকুমা জুড়ে। ভোটদাতারা সকলেই আমাকে কংগ্রেসের একজন কর্মী এবং দেশের একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসাবেই জানতো; তাই, তারা গ্রামে গ্রামে নিজেরাই চাঁদা ক'রে টাকা তুলেছে, ভোটের দিন নৌকা বা গাড়ি ক'রে নিজেরাই—ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে এবং ভোট দিয়েছে। ফলে, আমার বিরুদ্ধে যে দুইজনে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁদের জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে। যারা পাকিস্তানে থাকতে এতবড় কংগ্রেসভক্ত ছিল, তারা এদিকে এসেই কেন এতবড় কংগ্রেস-বিরোধী হল, সেই কারণই আমি অনুসন্ধান করে দেখবো।" সেদিন আমি এ-ও অতুল্যবাবুকে বলেছিলাম যে—"আমি যদি এখানে থাকি, তাহলে আমি দেখাব যে বাস্তুত্যাগীরাও কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করছে এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করছে।"

আমার কথা ফলেছেও—নেতারাও তা দেখেছেন কিন্তু তাতে তাঁদের মনের ভাবের কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে? আমার মনে হয়—হয় নি। তাই আজ আমি রাজনীতি থেকে প্রায় অবসর নিয়েছি—আমি কংগ্রেস ছেড়েছি। অন্য কোন দলেও যোগ দিই নি।

১৯৬২ সালের রাজসাহীর হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে আমি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে ও অন্যান্য আরও ২।৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনেক চিঠিপত্রও লিখেছি কিন্তু পাষাণ গলাতে পারি নি। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে মনে হয় সম্ভবত শ্রীনির্মল চ্যাটার্জি, এম-পি মহাশয় যখন পার্লামেন্টে রাজসাহীর ঐ হত্যাকাণ্ডের কথা তুলে ধরেছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী কেবল একটিমাত্র কথায় অর্থাৎ 'দারুণার ঘটনা বেদনাদায়ক' (tragic) বলেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন। কিসে যে বেদনাদায়ক এবং বেদনার কারণ ও পরিমাণই কত, তা কিছুই বলেন নি। পাকিস্তানের কোন সংবাদপত্রেই ঐ ঘটনা প্রকাশ হতে পারল না—ভারতের সংসদেও প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে তার কোনই বিবরণ প্রকাশ করা হল না। এটাই হল নেহরু-পরিচালিত ভারত-সরকারের নীতি। ভারত ও পাকিস্তানের নীতির মধ্যে তফাৎই এখানে। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর তিল পরিমাণ কিছু

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও র‍্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কল-১২ । ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রামমোহন পাল লেন, কল-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

হলেও, তাকে ভাল-প্রমাণ করে পাকিস্তান সরকার ঘরে-বাইরে প্রচার করেন, অর পাকিস্তানের সংখ্যালঘুর ওপর পর্যন্ত-প্রমাণ কিছু হলেও ভারত-সরকার তাকে সর্বপ্রযত্নে আড়াল করে ঢেকে রাখতেই প্রথমত চেষ্টা করেন—নেহাৎ যখন না পারেন, তখন তিনবার ঢোক গিলে যেটুকু না বললেই নয়, নেহাৎ সেটুকুমাত্রই বলেন। এটাই হল কংগ্রেস-পরিচালিত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নেহরু-নীতি। আজ অবশ্য নেহরুজী নেই কিন্তু কংগ্রেস আছে এবং নেহরু-নীতিও অব্যাহতই আছে। তাই আমার আশঙ্কা হয় কাপুর কমিশনের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হবে না। পাকিস্তানও ভারতের দেখাদেখি ভারতীয় বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের বাস্তুত্যাগের কারণ নির্ণয়ের জন্য একটা কমিশন বসিয়েছেন। সেই 'কমিশনের' গোয়েবল্‌সীয় রিপোর্ট যখন বিশ্বের দরবারে প্রকাশিত হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে, তখন হয়তো ভারত সরকার কাপুর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। তখন তার যথার্থতার মূল্য অনেকাংশে কমে যাবে। কাপুর কমিশনের সদস্য বিচারপতি রেদ্দপদ মুখার্জি মহাশয় এখানে (বহরমপুরে) এসে শুধু গুটিকয়েক সাধারণ ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়েছেন এবং দারুশা গ্রাম থেকে যে সামান্য লোক কয়টা-পোড়া বিকৃতদেহ নিয়ে এখানে এসেছে, তাদেরও স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন। তাঁদের রিপোর্টে সেই সব ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ থাকাই খুব সম্ভব, কিন্তু তা প্রকাশিত আজ পর্যন্তও হয় নি। কবে হবে ভারত-সরকারই জানেন। অবস্থা দেখে আমার মনে হয়, ভারতের রাষ্ট্র পরিচালক কংগ্রেস নেতারা পাকিস্তানে নিক্ষিপ্ত তাঁদের স্বাধীনতার সংগ্রামী সহকর্মিগণকেও স্বাধীনতার বলি হিসাবেই ধরে নিয়ে ভারত শাসন করছেন। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী জমিয়েতা সীমান্তগান্ধী নামে খ্যাত খান আব্দুল গফুর খান সাহেব বড় ক্ষোভে ও দুঃখেই গান্ধীজীর এককালের সেক্রেটারী পিয়ারিলালজীকে বলেছিলেন—"আমাদের নেতৃত্বের মুখে ফেলে দিয়ে তোমরা স্বাধীনতা ভোগ করছো। আজ তোমরা আমাদের ভুলেই গিয়েছ।" খান সাহেবের কথা তাঁর একারই কথা নয়। পাকিস্তানে অতীতের যেসব সংগ্রামী নেতা ছিলেন ও আজও আছেন, তাঁদের সকলেরই কথা তিনিই সর্বপ্রথমে ভাষার রূপ দিয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রচারের নমুনা তুলে ধরতে গিয়ে এত কথা বলতে হল। সেদিনের পীরপুর রিপোর্টেও সারা ভারতময় প্রচারণার উদ্দেশ্যেই কতক সত্য, অধিকাংশই অর্ধ-সত্য ও অবশিষ্ট একেবারেই অসত্য তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। সারা ভারতময় সেই রিপোর্ট নিয়ে মুসলিম-লীগের নেতারা পূর্ণ বেগে প্রচারকার্য চালিয়ে গেলেন। যে মুসলিম-লীগের ১৯০৬ সালে সৃষ্টি হয়েছিল, হিন্দু-বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে, সেই মুসলিম-লীগ এখন পীরপুর রিপোর্টের প্রচার চালাতে গিয়ে ক্রমশ ভারত-বিরোধী হয়ে উঠলেন। এইবার তাঁরা ঘোষণা করতে শুরু করলেন যে হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতে মুসলমানদের 'জান-মান-সম্মান' কিছুই নিরাপদ নয়। রাজনীতিক ক্ষমতাও তাঁদের হাতে কোনদিনই আসার সম্ভাবনা নেই; তাই হিন্দু-ভারতে মুসলমানরা থাকলে তাঁদের চিরকালই হিন্দুদের দাস হয়েই থাকতে হবে। সুতরাং চাই তাঁদের একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, যার নাম হবে—'পাকিস্তান'। এই প্রচারণার ফলেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও তার পাশাপাশি ২।১টি প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই পাকিস্তানের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁদের দাবি হল, মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূমি দিতেই হবে, নচেৎ স্বাধীনতা নেই-নেই-নেই! বাসভূমি মুসলমানদের চাই-ই চাই। এটাই মুসলিম-লীগের—তথা তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতির একমাত্র মূলসূত্র। এই মূলসূত্রের ভিত্তিতেই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন নেতা বা কোন সংবাদপত্রই বর্তমান ভারতকে, 'ভারত' বা 'ইণ্ডিয়া'—কোন নামেই অভিহিত করেন না। তাঁরা ভারতকে বলেন—'হিন্দুস্থান'। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বিশ্ববাসীকে তাঁরা জানাতে চান যে, ভারতে হিন্দু-রাজত্ব চলছে—মুসলমানের তাতে কোনই অধিকার নেই। যেসব মুসলমান সেখানে আছেন, তাঁরা হয় ব্যক্তিত্বহীন পুতুল, (show boy) অথবা 'দাস'। পাকিস্তানের নেতারা তাঁদের দেশের জনগণের মনকে এই নীতির ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ভারতের কংগ্রেস নেতারাও এই নীতির কাছেই পরাজয় স্বীকার ক'রে দেশ-বিভাগ করেছেন এবং পাকিস্তান-সৃষ্টির সুযোগ মুসলিম-লীগকে দিয়েছেন। ভারত-বিদ্বেষের ওপরই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাই তার একমাত্র উপজীব্য হ'য়ে আছে। শেখ আবদুল্লা যতদিন ভারতের সমর্থক হিসাবে কাশ্মীরের 'প্রধানমন্ত্রী' ছিলেন, ততদিন তিনি ছিলেন ভারতের 'শো-বয়' (পুতুল); আর, যখন তিনি ভারত-বিরোধী হয়েছেন, তখন তিনি পাকিস্তানের কাছে হয়েছেন—শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক? দেশ-বিভাগের মুখে যে মাস্টার তারা সিং ছিলেন ঘোরতর নায়কীয় দস্যু—মুসলমান নিধনকারী, আজ যখন তিনি ভারতকে খণ্ডিত করতে চেষ্টা করলেন, যা তার মুয়া ধরলেন, তখনই তিনি হয়ে গেলেন—দেশপ্রেমিক! ভারতের অখণ্ডতা-বিরোধী যে কোন ভারতীয় গোষ্ঠী মাথা তুলে ওঠেন, অরই, পাকিস্তান-সরকার, প্রশংসায় শুধু মুখর হয়েই ওঠেন না, তাকে সব রকমে সক্রিয় সাহায্যও করেন। ভারত-বিরোধী মাপা-মিজো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহীরা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সবকিছুই কিন্তু সেই একই নীতির শাখা-প্রশাখা মাত্র। সেই নীতিটাই হচ্ছে, হিন্দু-বিদ্বেষে আরম্ভ হ'য়ে এখন পুরোমাত্রায় ভারত-বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছে। শহীদ-ই-আজম মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাহ পরিচালিত মুসলিম-লীগের এই নীতির ফলেই ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে ভেঙে মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির—পাকিস্তানের—দাবি তাঁরা করেছিলেন এবং কার্যত তা' সফলও করেছিলেন—এই নীতির ফলেই, কংগ্রেস-নেতারা দেশ-বিভাগে রাজী হওয়ার পরে জিন্নাহ সাহেব লোক-বিনিময়েরও, অর্থাৎ মুসলমান সবই যাবেন পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের অ-মুসলমানরা আসবেন ভারতে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-নেতারা সেই প্রস্তাবে রাজী হন নি।

এই হ'ল মাছি

এই হ'ল মাছির যম
লাল টিনে ফ্লিট...
মাছি, মশা ও অন্যান্য সব উড়ে-চলা
পোকামাকড় মেরে ফেলে।
ফ্লিট
আপনার বন্ধুটি হয়ত করে—
এই পৃথিবীর সেরা কীটনাশক বিদিয়।

জিন্নাহ যে নীতি মেনে নিয়ে 'কংগ্রেস' দেশ-বিভাগে রাজী হন, যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে এই লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব ও তার সমর্থন করতেই রাজী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক কিন্তু 'কংগ্রেস' রাজী হন নি। আমি নিজেও ব্যক্তিগত-ভাবে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করি না; কারণ, প্রথমত আমি মনে করি যে, দেশ-বিভাগে রাজী হওয়াটাই হয়েছে একটা প্রকাণ্ড বড় রাজনীতিক ভুল—ভুলই বা বলি কেন, এটা ছিল পাপ—মহাপাপ, একেবারে আত্মহত্যার সামিল। দ্বিতীয়ত জিন্নাহ সাহেবের লোক-বিনিময়ের প্রস্তাবে রাজী হ'লে ভারতকে আরও জায়গা ছেড়ে অবশ্যই দিতে হ'ত। ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান যদি পাকিস্তানে যান, তবে তাঁদের বাসের ও বাঁচার জন্য আরও স্থান অবশ্যই ছাড়তে হ'ত; ফলে, হয়তো সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব—দুই-ই সম্ভবত সেজন্য ভারতকে ছাড়তে হ'ত। দেশ-বিভাগ ক'রে নেতারা একবার যে ভুল করেছেন, সেই ভুলেরই পুনরভিনয় যে দ্বিতীয়বার হয় নি, তার জন্য আমি ধন্য-বাদ জানাই। আবারও যদি ভুল করা হ'ত, তাহলে তার জন্য আরও অনেক বেশি 'মাশুল' দিতে হ'ত।

জিন্নাহ সাহেবের প্রস্তাব 'কংগ্রেস' গ্রহণ করলেন না—অতি বুদ্ধিমান ধুরন্ধর রাজনীতিক জিন্নাহ সাহেব মনে মনে হাসলেন মাত্র কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করলেন না। তাঁর পরিকল্পনা ছিল—তাঁর সাধের পাকিস্তান এক রাষ্ট্রীয় জাতির (এক 'নেশনের') লোকেরই কেবল বাসভূমি হবে। এই পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তোলার জন্যই তিনি দেশ-বিভাগের আগে থেকেই প্রচার করতে সুরু করে-ছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান—দুইটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি ('নেশন')। বহু রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে—ব্যক্তিপূজাই রাজ-নীতিক ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড রাজনীতিক হাতিয়াররূপে দেখা দেয়। একনায়ক-শাসিত রাষ্ট্রের তো কথাই নেই; ধর্ম-প্রধান ভারতবর্ষও তা থেকে বাদ পড়ে নি। জিন্নাহ সাহেব তো মুসলমানদের মধ্যে প্রায় 'পয়গম্বর'-এর কাছাকাছিই হয়ে গিয়েছিলেন; ভারতে নেহরুও কম যান নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই, তাই তাঁরা যে ভারতবর্ষের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরাও একটা সম্প্রদায় মাত্র, সে বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে বিশ্বাস করতে সুরু করেন যে, তাঁরা একটা পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি (নেশন) এবং এক দেশে—এক রাষ্ট্রে এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি একসাথে বাস করতে পারেন না। জিন্নাহ সাহেব একথাটা মুখ ফুটে প্রকাশ না করলেও তাঁর অন্তরের ইচ্ছা তাই ছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের পশ্চিম পাঞ্জাবের ইংরেজ গভর্নর—স্যার ফ্রান্সিস মুডী (Sir Francis Mudie) সাহেবের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ সাহেবের চিঠির মধ্যে। তিনি লিখে-ছিলেন :

"I am telling every one that I don't care how the Sikhs get across the border; the great thing is to get rid of them as soon as possible."

(অর্থাৎ আমি প্রত্যেককেই বলছি যে, কী ভাবে শিখদের সীমান্তের পরপারে পার করবেন, তার পদ্ধতি নিয়ে আমি মোটেই কিছু গ্রাহ্য করি না; মোদ্দা কথা হচ্ছে যে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের পরপারে (!) পাঠাতেই হবে।) জিন্নাহ সাহেবের মনের কথা যদি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাট সাহেব বেশ ভালভাবে না জানতেন, তা হলে কি তাদের হত্যার বা জোর-জুলুমের উস্কানি দিয়ে পাকিস্তানের বড়লাট জিন্নাহ সাহেবের কাছে ঐরূপ একটা চিঠি লিখতে কখনও সাহস পেতেন? কখনই না। জিন্নাহ সাহেব বুদ্ধিমান রাজনীতিক নেতা; তাই তিনি মনের ভাব মুখে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি কিন্তু বর্তমানকালের সামরিক বোদ্ধা রাজনীতিক পাকিস্তানের প্রেসি-ডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান আর অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মত মনের ভাব চেপে রাখতে পারেন নি—অল্প কিছুদিন আগেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান একসাথে একই দেশে—একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারে না! আয়ুব খান সাহেব যোদ্ধা—বোদ্ধার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ খুব কমই থাকে; তাই রাজ-নীতিক নেতা জিন্নাহ সাহেব যা মুখ ফুটে কখনও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি, বোদ্ধা-রাজনীতিক আয়ুব খান সাহেব সেই কথাই—মুসলিম-লীগের নীতির গোপন কথাটিই প্রকাশ ক'রে ফেললেন!

মুসলিম-লীগের—তথা তৎকালীন পাকিস্তানের, রাজনীতির এই সূক্ষ্ম গোপন কথাটি স্মরণ রাখলেই, আমি পরবর্তী পর্বগুলোতে পূর্ববঙ্গের তথা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যা বলতে যাচ্ছি, তা সম্যক বোঝার পক্ষে পাঠক-পাঠিকার বেশ সহজসাধ্য হবে বলেই আশা করি। এ যাবৎ সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় যে প্রবন্ধ-গুলো লিখেছি, তাকে আমার প্রথম প্রবন্ধ —'পূর্বাভাষ'-এরই কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা বলা যেতে পারে। এইবার আমি পূর্ববঙ্গের তথা পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তীকালকে ৪টি ভাগে ভাগ করে, ৪টি পর্বে শেষ করতে চাই। প্রথম পর্বে থাকবে, মুসলিম-লীগের রাজত্ব-কাল, দ্বিতীয় পর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকাল; তৃতীয় পর্বে সামরিক শাসনের কাল এবং শেষ অর্থাৎ চতুর্থ পর্বে, আয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রের (!) কাল।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেঙ্গালোর - শ্রীনগর - গৌহাটী

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নতুন পৃথিবীর সন্ধানে

ভাইকাস পরিকল্পিত হয়েছিল চার নম্বর ম্যারিনার উপগ্রহের রিপোর্টকে ঘিরে। রিপোর্টে বলা হয়, মঙ্গলগ্রহে জীবন থাকলেও থাকতে পারে। আর শুধু মঙ্গল কেন, বহু গ্রহ আছে এমন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন শত-সহস্র সৌরজগৎ আছে, যেখানে জীব-অধ্যুষিত গ্রহ থাকা মোটেই বিচিত্র নয়।

এই রিপোর্ট পড়ে অবধি বার বারই মনে হচ্ছিল, নতুন কিছু কথা হয়তো এতে নেই, কিন্তু পুরাতন একটি ধারণাকে যুক্তি ও প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করার প্রবণতা এখানে সুস্পষ্ট।

বিজ্ঞানীরা কিছুকাল আগে থেকেই বলে আসছেন, কোটি কোটি সূর্য আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে; আছে লক্ষ লক্ষ সৌর-জগৎ। সে জগৎগুলোর কোনো কোনোটি আমাদের সৌর-পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ, ঠিক আমাদেরটির মতোই কয়েকটি করে গ্রহ ও উপগ্রহ নিয়ে মহাশূন্যের বুকে সংসার পেতেছে ওরা।

সংসার পেতেছে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী-দের অনেকেই নিশ্চিত। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সে সংসারের চেহারাটা কেমন? আমাদের মতো ঘর-ভরা পেয্য আছে কি সেখানে? জীবন আছে? যদি থেকে থাকে তো কেমনতরো? ঠিক আমাদের মতোই কি দুঃখেসুখে আবর্তিত হয় ওরা? জন্মমৃত্যুর শাসন মেনে চলে? ওরা কি হিংসাদ্বন্দ্বে কলুষিত হয় কখনও? কখনও আবার ত্যাগে ও মহিমায় দেবতা হয়ে ওঠে?

জানি নে এসব প্রশ্নের উত্তর। তবে এ কথা অকপটে বলতে পারি যে, ভিন্ন সব সৌরজগতের কোনো কোনো গ্রহে জীবন থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কেন নয়, তা' ব্যাখ্যা করার আগে আমাদের সৌরজগতের আকৃতি, প্রকৃতি ও উদ্ভব নিয়ে খুব সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা দরকার।

যে নক্ষত্রমণ্ডলীতে আমরা বাস করি, সেখানে আছে এক লক্ষ কোটি সৌর-জগৎ। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোট দশ লক্ষ কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী আছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা।

কিন্তু নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় কিভাবে? মা নীহারিকার সবচেয়ে ঘনীভূত অংশ থেকে। সেখানে দীর্ঘকাল ধরে চলে রাক্ষুসে অগ্নির তাণ্ডব। সেখানে বিস্ফোরণের পর এক-একটি নক্ষত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারপর বাষ্পীয় পদার্থে পরিণত হয় ওরা এবং অবশেষে ওদের থেকেই আবার সৃষ্টি হয় নতুন নক্ষত্র। অতএব, আমরা যে সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী এ ধরণের ভাঙাগড়ারই অবশেষ বা পরিণতি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ আরও নেই যে, আমাদের সৌর-জগৎটিরও বয়স দশ লক্ষ কোটি বছর হতে চলল। এই কল্প-রূপান্তর ধরে সূর্যের উপর দিয়ে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। এবং এই সব কিছুর নিকট সাক্ষী হয়ে আছে আমাদেরই সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রমণ্ডলটি। এদিকে সৌরজগৎ যখন শীতল হতে লাগল, তখন তাতে আশ্রয় নিল জল, জলমিশ্রিত রাসায়নিক, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং অন্যান্য সব বাষ্পীয় পদার্থ ও কার্বনজাত যৌগিক পদার্থ, যেগুলো জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়।

এ পদার্থগুলো সূর্যের প্রতিবেশী নক্ষত্রলোকে অথবা দূরের নক্ষত্রমণ্ডলীর কোনো কোনো গ্রহলোকে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেন না, জন্মের পর থেকে সব নক্ষত্রেরই বিবর্তন, পরিণতি ও ব্রহ্মাণ্ড-পরিক্রমা প্রায় একই পথ ধরে চলে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিয়োটাইড সম্পর্কে। এরা প্রোটিন উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য এবং এই প্রোটিন ছাড়া জীবিত কোষ গড়ে উঠতে পারে না। এদিকে জীবন-রহস্যেরও অনেকখানি নিউক্লিক অ্যাসিড-এর মধ্যে সংগুপ্ত। আবার বিচিত্র এই অ্যাসিড-এর অণুগুলো কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও ফসফরাসের সাহচর্যে গড়ে ওঠে এবং তারপর এদের থেকেই সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়োটাইড।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, আমাদের প্রতিবেশী-গ্রহ মঙ্গলে নিউ-ক্লিয়োটাইড আছে কি? প্রথমেই বলতে ইচ্ছে হয়, দূরে-নক্ষত্রলোকের কথা পরে হবে, আগে তো ঘরের আশের গ্রহটির খবর নেওয়া যাক: আছে কি সেখানে উন্নত জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই রাসায়নিক যৌগিকটি?

বিজ্ঞানীদের অনেকেই বলছেন,—না, নেই: এবং নেই বলেই হয়তো উন্নত বা বুদ্ধিদীপ্ত কোনো প্রাণীকে মঙ্গলগ্রহে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে অনুন্নত ধরণের কিছু প্রাণী সেখানে থাকলেও থাকতে পারে।

অনেক বিজ্ঞানী আবার অন্য মত পোষণ করেন। ওঁদের ধারণা, জল আছে মঙ্গলগ্রহে; এবং আছে বলেই উন্নত কিছু প্রাণীর সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিছুদিন আগে ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ স্ট্যানলী মিলার তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, মঙ্গলগ্রহে জল আছে; আর আছে বায়ু। অতএব পৃথিবীতে যেমন, ওখানেও ঠিক তেমনি অনেক জৈব রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে।

এ নিয়ে গবেষণাও করেছেন ডঃ মিলার। পৃথিবীর আদি-যুগে জীবন কী করে এসেছিল, তা' জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্বারস্থ হয়েছেন। প্রথমে জল, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও মিথেন-এর একটি মিশ্রণ গড়ে তুলেছেন তিনি। তারপর সেই মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সঞ্চারিত করেছেন। বিদ্যুৎ-সংক্রমণের ফলে কয়েক ধরণের অ্যামাইনো এ্যাসিড সৃষ্টি হয়েছে। এই সব এ্যাসিড জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়।

কিন্তু তবু বলবো, এ পরীক্ষাটি হল পরোক্ষ উপায়ে জীবনের পরিবেশ-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। এ থেকে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; তাই সরাসরি পরীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর সামনে সমস্যা হল, পরীক্ষা চালাবেন তিনি কোন্ পথে?

সরাসরি পরীক্ষার একটি মাত্রই পথ খোলা আছে: এবং তা' হল উল্কাপিণ্ডের বিশ্লেষণ। কারণ, উল্কা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ আমাদের জানা নেই, যা পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে।

এই উল্কা নিয়ে হাল আমলে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেরাগত এই যৌগিক পদার্থটির কার্বনজাত বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এতে আছে শতকরা ৭ ভাগ জৈবপদার্থ। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় কোনো অ্যামাইনো এ্যাসিড এতে নেই। এইখানে প্রশ্ন ওঠে, উল্কা-পিণ্ডের যৌগিক পদার্থগুলো তবে কি যথাকাল আগে হারিয়ে যাওয়া সব জীবনের ধ্বংসাবশেষ?

বিজ্ঞানীরা বলছেন,—হ্যাঁ, ধ্বংসাবশেষই বটে। উল্কার মধ্যে যে সব জৈবপদার্থ

নম্র নত হবো

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

পঁচিশে বৈশাখ যেন নিষ্ঠুর মরুর রাজ্যে স্তব্ধ বনস্পতি।
প্রবল বালুকা ঝড়, ছায়াহীন বৃষ্টিহীন দাব-দগ্ধ দিন
রৌদ্রের আগুন জ্বেলে সে বনস্পতির মৃত্যু চেয়েছিল; তবু
কী এক কঠিন মন্ত্রে প্রতিজ্ঞার প্রতিবাদে আজো তা অক্ষত।

সারাটা সকাল হেঁটে ক্লান্ত আমি, বড়ো ক্লান্ত; একটু ছায়ায়
জীবন জুড়াতে চাই, একটু মাটিও আমি প্রাণভরে চাই
যে-মাটি মায়ের মতো; কোথা ছায়া কোথা মাটি? শুধু মরুভূমি
আদিগন্ত শুয়ে থাকে! আমার প্রার্থনা যতো ব্যর্থ ফিরে গেল।

তবু সুনিশ্চিত জানি, মৃত্যুর মুহূর্তপূর্বে আমি ফিরে যাব
সে বনস্পতির নিচে যেখানে ছায়ার স্নেহ, সুপবিত্র মাটি
সবুজ ঘাসের শয্যা; রোদ নেভবার আগে শুধু শেষবার
সেখানে পৌঁছুতে চাই। তারপর পৃথিবীতে অন্ধকার হোক্!

যা কিছু শান্ত ও সত্য মানবতা ক্ষমা পবিত্রতা, তুমি সেই
প্রতিনিধি; আমি তার কাছে নিঃসর্ত নীরবে আজ নত হবো!!

পঁচিশে বৈশাখে

শান্তনু দাস

চতুর ব্যাপারী হাত পাল্লা মেপে মেপে
পৃথিবীর প্রান্তরেখা টানে
শির ওঠা গলা নিয়ে কারা যেন অসহ্য চেঁচায়
'.....এখানে আসুন
এখানে শুনুন, মহাশয়
সাচ্চা মালের হাটে দর করে ভরে নিন থলি
কেন না ওজনে ফুল-অলি
গরমিল কখনো হবে না
কেন না আমিই একা অশ্বিতীয় হৃদয়-প্রধান

পাওনা অধিক হলে
উন্মাদের মত কেউ হাসে
রিক্ততর এ হৃদয় পূর্ণতম কখনো হবে না
মহাজন—
তোমরা জীবনভোর পাল্লা মেপে তোল
হিসেব পাওনা কড়ি গোনা
আটচালা খুঁজি আমি সারাদিন বেলা পড়ে যায়
ক্লান্ত হৃদয় নিয়ে বিবর্ণ দিন গুণে আনা

পাওয়া যায়, তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দূর-দূরান্তরে জীবনের অস্তিত্বকেই প্রমাণিত করে। অতএব প্রশ্ন দাঁড়ায়, চরাচরব্যাপী নীহারিকালোকের আরও অনেক জায়গাতেই কি জীবন আছে?

বিজ্ঞানীরা এর উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সময়ের মাপকাঠি বড় অদ্ভুত রকমের। সেখানে প্রতিনিয়তই গড়ে উঠছে নতুন সভ্যতা; আবার প্রতি-নিয়তই ধ্বংসে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলে প্রতি বছর একটি করে নতুন সভ্যতা আবির্ভূত হচ্ছে; অন্তত একটি করে নক্ষত্র সৃষ্টি হচ্ছে প্রতি বছর। কিন্তু প্রতি বছরই আবার একটি করে সৌর-জগৎ বিদায় নিচ্ছে। নক্ষত্রমণ্ডলের বিরাট ও বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সে; সৃষ্টির প্রাঙ্গণ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছে।

সন্দেহ নেই, নক্ষত্রের অস্তিত্ব যদি ঠিক এমনিতরো স্বল্পস্থায়ী হয়, তবে আমাদের মতো সভ্যতা গড়ে ওঠবার অবকাশ তার গ্রহলোকে খুবই অল্প। কারণ, কোনো সৌরজগৎকে জীব বস-বাসের উপযোগী হতে গেলে কয়েক কোটি বছর সময় দরকার।

এইখানে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন, বয়স্ক নক্ষত্রের সংখ্যাও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নেহাৎ অল্প নয়। ওদের সৌর-জগতে জীব-অধ্যুষিত গ্রহলোক থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু তবু সমস্যা দাঁড়ায়, দূরের কোনো গ্রহে বা দূরান্তরের কোনো সৌর-জগতে সত্যি যদি কোনোদিন কোনো বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তবে আমরা কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবো? চিন্তার আদান-প্রদান করতে পারবো কোনো প্রকারে?

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ জন সি লিলি বলছেন,—হ্যাঁ, পারবো। যদি আমরা আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ঔদ্ধত্যকে বেড়ে ফেলতে পারি, তবে পারবো। শিশু-সুলভ সারল্য নিয়ে আমরা যদি ওদের বোঝবার চেষ্টা করি, ভাবের আদান-প্রদান ঘটানো তবে হয়তো সম্ভব হবে।

জানি নে এসব অনুমানের শেষ কোথায়। তবে একটি সত্য সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত। সত্যটি হল, এমন নক্ষত্র আজও অনেক আছে, যাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। আলো সেকেণ্ডে চলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। অতএব যে নক্ষত্রের আলো এখনও পৃথিবীকে স্পর্শ করে নি, সে যে কত কোটি কোটি মাইল দূরে আছে, তা সহজেই অনুমেয়। এদিকে রকেটে বসে বা স্পুটনিকে চেপে যত জোরেই আমরা ছুটি না কেন, আলোর চেয়ে বেশি গতি-বেগ লাভ করা কোনোদিনই সম্ভব নয়। অতএব, কোনোদিন যদি এমন কি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণকেও কাটিয়ে উঠি আমরা, তবু লাভ হবে না বিশেষ কিছু। দূরবর্তী নক্ষত্রলোকগুলো চিরকাল আমাদের কাছে অধরাই থেকে যাবে। এদিকে আমাদের পৃথিবীও যে পরিচিত সূর্যটিকে মধ্যমণি করে চিরকাল অকাশ-প্রদক্ষিণ করবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোটি কোটি বছর পরে হলেও এমন একটা মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন আমাদের সূর্য ও তার সমস্ত গ্রহ-জগৎগুলোকে নিয়ে ভেঙে, ফেটে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মহা-শূন্যের বুকে মিলিয়ে যাবে। সেদিন হয়তো আমাদের সৌরজগৎ থেকে নতুন কোনো নক্ষত্রলোকের দিকে অভিসার করবে কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড; এবং অপরিচিত কোনো গ্রহের অদ্ভুত কোনো জীব সেই সব উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করতে করতে ভাববে, জৈবপদার্থ তো অনেক পাচ্ছি এতে; কিন্তু অ্যামাইনো এ্যাসিড কোথায় গেল?

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার যাত্রাসাহিত্য

শ্রীমন্তকুমার জানা

বিচিত্রমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রবল স্বীকরণশক্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা রবীন্দ্র-প্রতিভার সাগরসঙ্গমে এসে একাকার হয়ে গেছে। সুখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্র-রচনায় বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা রসসৌন্দর্যে ও চিন্তাদর্শে নবমূল্যায়িত ও উজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যাত্রাসাহিত্য সম্পর্কে কোনো চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে স্থান পেয়েছিল কি না এবং যাত্রাসাহিত্যের ভাববৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রসাহিত্যে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চেষ্টিত হব।

যাত্রাসাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ বাঙালীর রসপিপাসুচিত্তের তৃপ্তিসাধন করে আসছে। পূজাপার্বণে ও বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে, গ্রামজীবনের শ্যামল প্রাঙ্গণে ও শহরের বৈদ্যুতিক আলোক-সভায় যাত্রারম্ভে বাদ্যযন্ত্রের যে ঐকতান ধ্বনিত হয়—তা শিশু, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলকেই সমানভাবে আকৃষ্ট করে। যাত্রায় ভদ্রসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের বৈত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। যাত্রার কেন্দ্র-গত ভাববস্তু জনজীবনের নৈতিক ধর্ম-বোধের নিগূঢ় সান্নিধ্যধর্মী। তাই যাত্রায় অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ খুব কম। দ্বন্দ্ব-মুখরতা ধর্মপ্রাণ বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। যুগধর্মের প্রয়োজনে অতীত ইতিহাসের কাহিনী এবং সম-কালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট যাত্রায় গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু ঘটনার পরিণতিতে যাত্রা ন্যায়ের অমোঘবিধান—'ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়'-কেই সর্বত্র অক্ষুণ্ণ উর্ধ্বে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে। বাংলার আলো-হাওয়া, আবাশ-মাটি-জল এককথায় বাংলার জাতীয় জীবন থেকেই যাত্রার উদ্ভব।

যাত্রা বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৈষ্ণবসাহিত্য, শাক্তসাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজজীবন—এককথায় ভারতসংস্কৃতি ও বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যাত্রা যোগযুক্ত। যাত্রার সংলাপ, নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে মধুর, হাস্য, করুণ ও বীর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের উপস্থাপনা ঘটে। যাত্রায় মঞ্চসজ্জা থাকে না বলে সংলাপের গুরুত্ব খুব বেশি। পরিবেশ, পরিস্থিতি, চরিত্র ও ঘটনা সমস্তকিছু সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিবেকচরিত্র—অন্যায়-কারীর বিরুদ্ধে তাঁর উচ্চকিত সতর্কবাণী এবং পীড়িতের জন্য সান্ত্বনা ও আশ্বাস ঘটনার গতি ভিন্ন মুখে ফিরিয়ে দেয়। বিবেকচরিত্রের সংগীত যাত্রার নৈতিকতার আদর্শকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার বাংলা-দেশে আধুনিক ভাবধারা ও দেশীয় সংস্কৃতিচর্চার পুরোধাস্বরূপ ছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> "বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকলদিক্ দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশ-ভূষায়, কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।"১

রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে। সে সময় নবাগতমুখ কলকাতার ধনীদের বাড়িতে সখের যাত্রার প্রচলন ছিল। ঠাকুরবাড়ির বড় কর্তারা নাবালকদের যাত্রা শোনার অনু-মতি দিতেন না। কিন্তু দেখার ও জানার কৌতূহল থেকে বালক রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত থাকতে পারেন নি। আড়াল-আবডাল থেকেই তিনি যাত্রাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। পরিণত বয়সে কবি স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে যে সরস বর্ণনা দিয়েছেন তা পরম আনন্দের সামগ্রী।

> "আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী-ঘরে ছিল শখের যাত্রার প্রচলন। মিহি-গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরী করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের বরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বঙ্গদেশের ছিল জারী নেশা। এ পাড়ায়, ও পাড়ায়, এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত।...আমাদের বাড়ীতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু যাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার পোড়াকার জোগাড়-বন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁওয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালীপড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙ্-করা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল্ পিল্ করে চুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চারদিকে উস্‌বস্ করে আওয়াজ উঠছে; ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে ন'টা; পায়রার পিঠের উপর বাজপাখীর মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কঙ্কা-পড়া শক্তহাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা, ডাকছে, চলো শোবে চলো।' লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে।...আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই,... ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই জমাকম্ করতাল।"২

কবি একবার যাত্রা শোনার অনুমতি পেয়েছিলেন। সেটা ছিল নল-দময়ন্তীর পালা। সেবারে যাত্রার আসর ও গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবির যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তা দীর্ঘকাল স্মৃতিতে জাগরূক ছিল।

> "একদিকে বসে আছেন বাড়ির বড় কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকী জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটারে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশীরভাগ মানুষই ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে 'বাজে লোক।' তেমনি আবার পালা-গানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাসড়া-কলমে, যারা ইংরেজী কপি-বুকের মক্‌শো করে নি। এর সুরে, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পরমা-করা, এর ভাষা পণ্ডিতমশাই দেননি পালিশ করে।...
>
> "শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে মাঝে

তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা, সে খুশি চুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল বেন শুকনো গাঙে কোশ দু-কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেব মিটিয়ে।"৩

উদ্ধৃত অংশের মূল বক্তব্য—বাংলার জাতীয় জীবন থেকে যাত্রার উদ্ভব—বাংলার মাটি-জল-হাওয়া-আকাশের সঙ্গে রয়েছে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতা। তাই যাত্রার আসর মূলত লোকসাধারণের জন্যই।

॥ ২ ॥

বাংলার যাত্রাসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে কোনো চিন্তা করতে দেখা যায় না। দু-একটি রচনায় অন্য বিষয় আলোচনা করা কালীন যাত্রার কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে মাত্র। অবশ্য এর দ্বারা এই বুঝায় না যে, যাত্রাসাহিত্যের প্রতি কবির তেমন একটা ঔৎসুক্য বা আগ্রহ ছিল না। কারণ কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনার অল্পতা সেই বিষয়ের প্রতি লেখকের অনৌৎসুক্য প্রমাণিত করে না। সেক্ষেত্রে আলোচনার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় বেশি। যাত্রাসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে দু-একটি মন্তব্য পাওয়া যায় তার দ্বারা যাত্রাসাহিত্যের অভিনয়গত শিল্পসৌন্দর্য ও সমাজজীবনে তার প্রয়োজনীয়তা চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

যাত্রার মঞ্চসজ্জা থাকে না—থাকে একটা আসর। আর সেই আসর ঘিরে থাকে চারদিকের শ্রোতা। থিয়েটারী মঞ্চের সঙ্গে যাত্রার এইখানেই বিরাট পার্থক্য। থিয়েটার মঞ্চে থাকার জন্য শ্রোতা ও অভিনয়ের মধ্যে একটু দূরত্ব থেকে যায়। যাত্রার আসর জনগণ ও অভিনয় মিশিয়ে সামগ্রিক রসসৃষ্টি করে। থিয়েটারের স্থান-কাল-পাত্র নির্দিষ্ট করে দেখানো হয় দৃশ্যপটের সাহায্যে। যাত্রার অভিনয়-নৈপুণ্যের দ্বারা ঘটনা, পরিবেশ; ও চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। যাত্রা তাই সংলাপ-সর্বস্ব—সংলাপ শ্রোতার চিত্তে অফুরন্ত কল্পনা জাগ্রত করে।

রবীন্দ্রনাথ অভিনয়কে অন্যান্য সৃষ্টির মতো একটা শিল্প বলে মনে করতেন। অভিনেতার কাজ হবে সংলাপের সাহায্যে নাট্যোলিখিত বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে তোলা—যাতে দর্শকরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয়কে গ্রহণ করে। এক কথায় দর্শকদের কল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সংলাপনৈপুণ্যে তাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস-বোধের পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারলে অভিনয়ের সার্থকতা। তাই তিনি অভিনয়ে দৃশ্যপটের পক্ষপাতী ছিলেন না।—

"নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি যোগান তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকদের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন। তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলে না; তাহা আঁকা মাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

"তা' ছাড়া, যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানাকড়িও নেই। সে কি শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়ে নির্ভর করিবার জো নেই। যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন-সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।"৪

পক্ষান্তরে যাত্রাভিনয়ে দৃশ্যসজ্জা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে বলে তার প্রতি কবির আন্তরিক সমর্থন ছিল খুব বেশি।

"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নেই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।"৫

আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে যাত্রাভিনয়ের এদিক্ থেকে যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা' কবি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধ লিখিত হয়। কবি স্বদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যা চিন্তা করেছেন তার কেন্দ্রবর্তী হয়ে আছে এই প্রবন্ধটি। জনসংহতি, পল্লীসংগঠন, ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ধ্বনিত হয়েছে 'স্বদেশীসমাজ'-এ। এর জন্য পল্লীবাসীদের আনন্দদানের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। আনন্দের মাধ্যমে মানুষ যেমন কর্মের প্রেরণা ও শক্তিলাভ করে, তেমনি পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বহুবিধ শিক্ষাও তারা অতি সহজে অনায়াসভাবে লাভ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে কবি বৎসরান্তে একবার মেলা প্রবর্তনের কথা বলেন। মেলায় লোক-সঙ্গীতাদি ও যাত্রাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা এদিক থেকেই—

"দেশের হৃদয় লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে-সমস্ত চাল-চলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে-সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার, কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেই-গুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। ...তাহা হইলে আমরা বিলাতী ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইত।...সেখানে ভালো কথক, কীর্তন গায়ক, ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত।...

"আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানাস্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন, তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ব্যায়াম ও তোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না।"৬

দেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই পল্লীসংগঠনের কথা বলেছেন—দেশের প্রাণ সত্যই পল্লীজীবনের কেন্দ্রে নিহিত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে দেশনেতারা রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনের জন্য সচেষ্ট হন, তখনও কবি স্বরাজলাভের গোড়ার কথা পল্লী-সংগঠন ও জনশিক্ষার বিষয়টির গুরুত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। লোক-হিতের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসংহতি। এবং তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনশিক্ষা। প্রথমত লিখতে-পড়তে জানাটাই জন-সাধারণের পক্ষে একটা বিরাট ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য এই।

"আমাদের চাষাভূষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষার সকল দেশের অগ্রগণ্য।...

"আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে-পড়িতে শেখা।...আপাতত এই অবধেই, কেন না

এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বন্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া বাহির করিতে পারে।"৭

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রসৃষ্টিতে যাত্রাসাহিত্যের ভাবাদর্শ প্রতিভার বিকাশকাল থেকেই অল্প-বিস্তর প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে ঠাকুরপরিবারের যুবকদের স্বরচিত স্বদেশপ্রেমমূলক সংগীতের কথা আলোচনা করা দরকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেশপ্রেমজনিত প্রবল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে তরুণদের চিত্তে। এরই বাস্তব কর্মরূপ দেখা যায় 'হিন্দুমেলা' স্থাপনের (১৮৬৭, এপ্রিল ১২) মধ্যে। স্বচেষ্টায় সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দৈহিক শক্তিতে দেশের মানুষকে পূর্ণ স্বাদেশিক করে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য। এই মেলার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ,' গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে,' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'—প্রভৃতি জাতীয় সংগীত সৃষ্টি করেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত সংগীতের সুর একটু গম্ভীর ও বীররসধর্মী। যাত্রার বিবেকের গানও এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫, নভেম্বর ৩০। এই নাটকে রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশ উপলক্ষে একটি গদ্য বক্তৃতা ছিল। গদ্য রচনাটি সেখানে জোরালো হয় না বলে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দেন। কবিতাটি এই—

"জ্বলুক জ্বলুক চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।—
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥"

এই সময়ের আর একটি ঘটনা 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রতিষ্ঠা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর উদ্যোক্তা এবং রাজনারায়ণ বসু পুরোহিত। এই সভার লক্ষ্য ছিল দেশমুক্তির জন্য গোপন বিপ্লবাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া। সম্ভবত এই সভার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেন—

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাঁধুক প্রলয়
আমরা সহস্রপ্রাণ রহিব নির্ভয়...

উল্লিখিত দুটি গান দ্রুতলয়ের এবং তেজোদ্দীপক। প্রথম গানটি ইংরেজী সুরে গেয় বলে 'পুরুবিক্রমে'র পাদটীকায় নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এই দুটি গানের সুরের সঙ্গে যাত্রার বিবেকগানেরও সুর-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) ও 'কাল-মৃগয়া' (১৮৮২) রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ সময়ে থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রার গীতাংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং সংলাপ মুখ্য স্থান অধিকার করে। সমকালীন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ রায়। প্রমুখ নাট্যকাররা যাত্রার আদর্শে রামায়ণ মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ করে নাটক রচনা করেন। যা হোক ঊপরোক্ত গীতি-নাট্য দুটি যাত্রার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে বলেছেন—

"দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশী,..."৮

'বাল্মীকি প্রতিভা'র ডাকাতদের মত্ততার গানে বিলাতী সুরের প্রভাব আছে বলে কবি মন্তব্য করেছেন।৯ কিন্তু ডাকাতদের গানে বিলাতী সুরের প্রাধান্য থাকলেও সেখানে যাত্রার বিবেক গানের উদ্দীপনা ও বলিষ্ঠতার সূক্ষ্ম মিশোলও বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ ডাকাতদের গান থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল।

"এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন,
না মানি কাহারে।"

পরবর্তীকালে স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কেন্দ্রগত বিষয় ছিল জনজাগরণ ও স্বাবলম্বনবৃত্তির চর্চার দ্বারা দেশকে ভিতর থেকে গড়ে তোলা। স্বদেশী সংগীতের অধিকাংশ গানই লৌকিক সুরে গেয়। এ সময়ে রচিত সংগীতে বাউল, সারি প্রভৃতি লোকসংগীতের সুরের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। লৌকিক সুরে জনচিত্ত সহজে জেগে ওঠে। যা হোক, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তিসন্দীপক স্বদেশী সংগীত-গুলির মধ্যে যাত্রার বিবেকগানের উদ্দীপন-শক্তি অনুরূপিত হতে দেখা যায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। আমি ভয় করব না ভয় করব না,
দুবেলা মরার আগে মরব না
ভাই মরব না।...

২। এবার আর দেরী নেই ধর গো
তোরা ছাতে হাতে ধর গো,
এবার দিতেও হবে নিতেও হবে,
সামনে মিলন স্বর্গ।...

৩। আজি বাংলা দেশের হৃদয় থেকে
কখন আপনি,
আমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলেম জননি।...

গীতাঞ্জলি পর্বের দু-একটি আধ্যাত্মিক-ভাবমূলক গানে বিবেকগানের সুরের মিল স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১। আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমার
রাখবে কোথায় ঢেকে।...

২। অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে
আকাশ কাঁপে তারার আলো
গানের ঘোরে।...

৩। সর্ব খর্বতারে দহে হে তব
ভৈরব,
শান্তি দাও ভক্তপানে চাহো।...

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি কথা বলাই যথেষ্ট যে, রবীন্দ্রসংগীতে যাত্রার বিবেকী সুরের মিল যে প্রত্যক্ষ প্রভাবজনিত তা নয়। এটা মূলত দীর্ঘ-কালের জাতীয় ঐতিহ্যের একটি ধারা রবীন্দ্রপ্রতিভার একাকার হয়ে স্বাঙ্গীকৃত।

কতকগুলি রবীন্দ্রনাটকে যাত্রার বিবেক-চরিত্রের সমধর্মী চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলে। 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) ও 'মুক্তধারা'র (১৯২২) ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'রাজা'র (১৯১০) ঠাকুরদা এবং 'অচলায়তনে'র (১৯১২)' দাদাঠাকুরের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যাত্রা মূলত নীতিমূলক—ন্যায়ধর্মের আদর্শকেই যাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। যা অন্যায় তার পতন অবশ্যম্ভাবী, তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না—এই হচ্ছে ধর্মপ্রাণ বাঙালী তথা ভারতীয়দের বিশ্বাস। যাত্রার কেন্দ্রবর্তী এই চিন্তাদর্শের বাহক বিবেক। বিবেক সরল অনাড়ম্বর চরিত্রের লোক—কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়চেতা সংগ্রামী যোদ্ধা। রবীন্দ্রনাটকে সহজজীবন ও অনহজজীবনের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়ে সহজজীবনেরই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আগ ও কল্যাণকেন্দ্রিক সহজজীবনের ধারক ও বাহক উল্লিখিত চরিত্রগুলি। 'রাজা'র (১৯১০) ঠাকুরদা সর্বমানুষের সঙ্গে আত্মিকযোগে বিশ্বেশ্বরের সত্তাকে উপলব্ধি করেছে। রাণী সুদর্শনার সংকীর্ণ রূপ-মোহের বিরুদ্ধে সে সার্থক অভিযান করেছে। রাণীকে অরূপের সৌন্দর্যবোধ-লক্ষ্যে ঠাকুরদা সহায়তা করেছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) ও 'মুক্তধারা'র (১৯২২) ধনঞ্জয় বৈরাগী মানবতামন্ত্রে দীক্ষিত নির্ভীক জননেতা। দেশের প্রজাপীড়ক স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে সে জনগণকে জাগ্রত করেছে এবং রাজার সম্মুখে ন্যায়ের দাবিতে তাঁর অন্যায় কর্মের দৃপ্ত প্রতিবাদ করেছে। 'অচলায়তনের' (১৯১২) দাদাঠাকুর যুগ যুগ ধরে সমাজজীবনে গড়া মানুষের অর্থহীন আচার-অনুশাসনের অচলায়তন ভেঙে ফেলেছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রকে অনেকে বাউলের সমধর্মী বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, বাউলের গানে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত কোনো দ্বন্দ্বসংঘর্ষের কথা নেই। বৈদেহী জীবনসাধনার কথা প্রেমতত্ত্বের চমৎকার রসানুভূতিতে উজ্জ্বল। ধনঞ্জয় বৈরাগী তাই যাত্রার বিবেকচরিত্রের সমতুল্য। বলা বাহুল্য, যাত্রায় যে নীতিবোধ মূলত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী-আশ্রয়ী ছিল,—রবীন্দ্রনাটকে তা' সমকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়ে ব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

রবীন্দ্রনাটকে বহির্দ্বন্দ্বের অবকাশ খুব কম। রবীন্দ্রনাটক সুরধর্মী ও ভাবপ্রধান। য়ুরোপীয় নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় Edward Thompson সাহেব মন্তব্য করেছিলেন—"His dramatic works are the vehicles of ideas rather than that of action."১০

কিন্তু য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় নাটকের বিচার করা সমীচীন নয়। ভারতীয় জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রাধান্য নেই—জীবনের ভিন্ন বিন্যাস কিংবা রূঢ় কঠিন দিকটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসবোধের গভীর প্রশান্তির পশ্চাতে থেকে যায়। নাটকে তাই জীবনের নির্যাস আধ্যাত্মিকতা ও ভাবধর্মিতার প্রাধান্য। যাত্রার কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ ও নাটকীয় পরিণতির মধ্যে ভাবধর্মিতা ও সঙ্গীতময়তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। রবীন্দ্রনাটকে যাত্রার এই সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

যাত্রার যে বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মুগ্ধ, প্রীত ও শ্রদ্ধাশীল করে রেখেছিল তা' যাত্রার মঞ্চহীনতা। আপামর দর্শকের কল্পনাশক্তির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে যাত্রা অবাধে অভিনয়ের সাহায্যে একের পর এক বিভিন্ন চরিত্র ও পরিবেশকে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যাত্রার এই আদর্শ নাট্যাভিনয়ে গ্রহণ করার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কবির নিকট অভিনয় একটি বড় শিল্পরূপেই ধরা পড়েছিল। সেক্ষেত্রে নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য জড় করে বস্তুর উপকরণ বাহুল্যে, অভিনয়কে স্থূল ও দৃশ্যাপেক্ষ করে তোলা অর্থহীন। প্রাচীনকালে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যসজ্জার বাহুল্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রচারের ফলেই থিয়েটার সৃষ্টি হয় এবং নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপটের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বেশি—তখন দৃশ্যের পর দৃশ্য উপস্থাপিত করে বাস্তবকে পরিস্ফুট করার প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। এর জন্য কবির সুতীব্র বেদনাবোধ ধ্বনিত হয়েছে নিম্নের অংশে।

> "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে।"১১

আসলে রবীন্দ্রনাথ চিত্রের পর চিত্র এনে অভিনয়কে প্রাণহীন জটিলতাগ্রস্ত অনড় পদার্থ করার বিপক্ষে ছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন—তাহলে থিয়েটারে কি দৃশ্যপটের আদৌ প্রয়োজনীয়তা নেই। আধুনিক নাটকের বেলা যে কথাই খাটুক না কেন রবীন্দ্রনাটকের বেলা উত্তর এই যে, কবি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন দর্শকের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ আছে, সুতরাং মঞ্চে সূচীশয়ধর্মী দৃশ্যসজ্জার বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন—কেবল নাটকের ভাববস্তুর ইঙ্গিতময়তা বহন করার জন্য কোনো একটা গাঢ় রঙের দৃশ্যপট থাকবে মাত্র। ঠাকুরবাড়িতে প্রথম প্রথম অভিনয়ে বিলিতির অনুকরণে রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা হত।১২ কিন্তু পরে মঞ্চসজ্জার বাহুল্য উঠে যায়। 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন তা' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

> "আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটিমাত্র লাল ফুল এবং তার উপরে একটিমাত্র ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।"১৩

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এইরূপ দৃশ্যপট একটা ভাবের প্রতীকমাত্র—নাট্যবস্তুর অনুকৃতি নয়। দর্শকের কল্পনার উপর বাস্তবের কোনো ভার না চাপিয়ে তাঁর চিত্তকে অগাধ ভাবের রাজ্যে স্ফূর্তিলাভের সুযোগ দেওয়া হয় এতে। রবীন্দ্রনাটকে বিশেষত তত্ত্বনাটক ও নৃত্যনাটকে এইরূপ দৃশ্যপটই গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপট একটা নির্বিকল্প ইঙ্গিতধর্মী জিনিস—তার সম্মুখে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অভিনয় ঘটে—তারা বিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে ঘটনাকে পরিণতির মুখে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৃশ্যপট যদি অসীম হয়—তবে অসীমের সম্মুখে সীমার রূপবৈচিত্র্য ঘটছে—দৃশ্যপট নিরপেক্ষ থেকেও যোগ রেখেছে সীমার সঙ্গে। যাত্রার আসর ও য়ুরোপীয় থিয়েটারের মঞ্চসজ্জার এইরূপে রবীন্দ্রনাথ সমন্বয় সাধন করেছেন। তা' সত্ত্বেও লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ে একক দৃশ্যপটের নৈর্ব্যক্তিকতা ও ইঙ্গিতধর্মিতা যাত্রার আসরেরই নিগূঢ় সামিধ্যধর্মী।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। 'জীবনস্মৃতি' (১৯৬১ সং), বাড়ির আবহাওয়া, পৃ ৬৫
২। 'ছেলেবেলা' পঞ্চম পরিচ্ছেদ
৩। পূর্ববৎ
৪। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯৬৩ সং), 'রঙ্গমঞ্চ' পৃ ৭৪—৫
৫। পূর্ববৎ, পৃ ৭৫—৬
৬। 'স্বদেশীসমাজ'—'রবীন্দ্র রচনাবলী' ৩ (১৩৪৭ সং) পৃ ৫০২—৩৩
৭। 'কালান্তর' (১৩৫৫ সং), 'অভিনয়' পৃ ৩৮
৮। 'জীবনস্মৃতি' (১৯৬১ সং), 'বাল্মীকি প্রতিভা', পৃ ১০৭
৯। দ্রঃ পূর্ববৎ, পৃ ১০৭
১০। 'Rabindranath : Poet and Dramatist' (1932), P. 201
১১। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯৬৩ সং), 'রঙ্গমঞ্চ' পৃ ৭৭
১২। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭ সং), ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী দ্রঃ 'নাট্যস্মৃতি', পৃ ২৭—৪২
১৩। পূর্ববৎ, পৃ ৪০

এজেন্ট আবশ্যক

শতকরা ৩৫ টাকা হিসাবে কমিশনে প্রতি নগরে এবং শহরে সুবিখ্যাত এসকরুট ষ্টীনলিস্টার বিক্রয় করিবার জন্য। স্যাম্পেলের জন্য পত্র লিখুন।

The Manager (WBC-55)
P. B. 1115, Delhi-6.

রঙ্গমঞ্চ ও দেশে দেশে

সিনেমা এবং থিয়েটারের পার্থক্য

"গোর্কীর 'দি ফিলিস্‌টাইনস' নাটকের শুভ উদ্বোধন রজনীর আগের সন্ধ্যা—প্রধান ডিরেক্টরের ঘরে অভিনেতারা বসে ড্রেস রিহার্সাল সম্বন্ধে জোর আলোচনা চালিয়েছিলেন।

"প্রধান পরিচালক জর্জি টোভ্‌সটোনোগোভ—ইনি লেনিন প্রাইজ উইনার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পিপলস আর্টিস্ট—সোভিয়েট রঙ্গজগতে বিশেষ নামডাকওলা লোক। শিক্ষক এবং থিওরিস্ট হিসাবেও তিনি যশস্বী—আর সব থেকে বড় কথা হোল তিনি সত্যিকার সর্বগুণসম্পন্ন একজন নাট্য-পরিচালক। লেনিনগ্র্যাডের ম্যাক্সিম গোর্কী বলশয় ড্রামা থিয়েটারের বহু বৎসরের ক্রমান্বয় সাফল্যের মূলে রয়েছেন টোভ্‌সটোনোগোভ্‌"—লিখেছেন ভাষাচেষলাভ খোটুলেভ্‌। তিনি আরও বলেছেন—"আমাদের আলোচনা শুরুর প্রথমেই টোভ্‌সটোনোগোভ বলেছিলেন—'দি ফিলিসটাইনস্‌' সম্বন্ধে কিন্তু দয়া করে একটি কথাও তুলবেন না। আসন্ন প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধনের আগে যে বিষয়ে আলোচনা করাটা একটা অশুভ সঙ্কেতের মত। দশ বা পনেরটি প্রদর্শনী হয়ে যাবার পরই প্রডাকসন সম্পর্কে আলোচনা করা বিধেয়। প্রত্যেক থিয়েট্রিক্যাল প্রডাকসন তকতকে-ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে যখন দর্শকেরা এর সৃষ্টিতে নিজেরা অংশ গ্রহণ করে সাহায্য করেন। থিয়েটার ব্যাপারটা ঠিক সিনেমার মত নয়। সিনেমায় ছবিটি যখন তৈরি হয়ে বের হল—তার আর রদবদল হয় না।"

প্রধান বৈষম্য

উপরি-উক্ত উক্তির ভেতর দিয়েই টোভ্‌সটোনোগোভ্‌ নাট্যকলা এবং ছায়াশিল্পের আসল বৈষম্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—বস্তুগত পর্থক্য নয়—শিল্পগত বৈষম্য। সে যাই হোক, আমি বৈষম্যের বিষয় শুনতে বিশেষ আগ্রহী ছিলাম না—পারস্পরিক প্রভাবের দিকটাই জানবার ইচ্ছা হয়েছিল। কারণ আধুনিককালে কোন শিল্পই এককভাবে স্ফুরিত হয়ে ওঠে না। সঙ্গীত, সাহিত্য, সিনেমা এবং থিয়েটার সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হবার জন্য আজকাল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল! All the Muses influence each other, and in some way enrich each other.

থিয়েটার এবং সিনেমার একের অন্যের ওপর প্রভাবের ব্যাপারে আপনি আমার মতবাদ জানতে চান? আমার মনে হয় থিয়েটার সিনেমার থেকে বিরাট বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতার দিকটা গ্রহণ করেছে। চিন্তাধারাকে ঘনীভূত করতে শিখেছে থিয়েটারওয়ালারা সিনেমা দেখে, একথা আমি অবশ্য মানতে রাজী নই। কারণ সমকালীন সমস্ত শিল্পেই চিন্তাধারাকে ঘনীভূত করবার অদ্ভুত প্রয়াস দেখা যায়।

টোভ্‌সটোনোগোভ ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে কথা বলছিলেন। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম তিনি তৈরি করা উত্তর দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন না।

বহু স্তরবিশিষ্ট প্রকৃতি আজ আর সিনেমার একমাত্র বিশেষত্ব নয়। এ ব্যাপারটা অবশ্য সিনেমা গ্রহণ করেছে সাহিত্য থেকে। আর সিনেমাতে এর ব্যবহারের পর থিয়েটারেও এর অভ্যাগম হয়েছে। এরই ফলে একটা নতুন দিক খুলে গেছে, যাকে বলা চলে থ্রি ডিমেনশ্‌নাল পোট্রেয়েল—আর এই প্রথম থ্রি ডিমেনশ্‌নাল চিন্তাধারাও সম্প্র-

গ্রিবয়েডোভের 'Wit Works Woe' নাটকের একটি দৃশ্য

সারিত হচ্ছে। আজকের দিনের থিয়েটার এই আদর্শকেই লক্ষ্য করে এগোচ্ছে।

প্রধান সমস্যা

"সিনেমাটোগ্রাফীতে প্রধান সমস্যা কি? ভাল স্ক্রিপ্ট এবং প্রতিভাবান অভিনেতার অভাব? সেই জন্যই ফিল্ম ডিরেক্টররা মঞ্চের সেরা সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিতে টেনে নিতে চান। আমি সর্বসময়েই খুশি মনে আমার অভিনেতাদের ফিল্মে অভিনয় করতে দিই। কিরিল লাভ্‌রভ, ইয়েফিম কোপেলিয়ান এবং সারগে ইয়ার্সকি অনেক সময়েই রুপালী পর্দায় আবির্ভূত হন। তাঁরা যখন ছবির কাজ সেরে ফিরে আসেন তখন সঙ্গে করে আনেন ওখানকার সত্য এবং স্বাভাবিক ভঙ্গীর অভিনয় পদ্ধতি। এদিক থেকে সিনেমা থিয়েটারের এ্যাক্টরদের ওপর খুবই ভাল ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছে।"

জর্জি টোভসটোনোগোভ অন্যান্য থিয়েটার ডিরেক্টরদের মত নন্। তিনি নিজের থেকে তাঁর অভিনেতাদের ছায়াচিত্রে অভিনয় করতে দেন—তাছাড়া তিনি চান অভিনেতারা ছবিতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে স্টেজে এসে তাকে কাজে লাগাবে। টোভ্‌সটোনোগোভের থিয়েটারের এটা একটা বিশেষ গুণ—তাঁর যে কোন প্রডাকসন, তা সে গ্রিবয়েডোভের ক্ল্যাসিকাল নাটক "Wit Works Woe'ই হোক, বা বেরটল্ট ব্রেখটের 'Arturo Ui' অথবা আধুনিক জর্জিয়ান কমেডি, যেমন—'Me, Granny, Iliko and Illarion'-ই হোক, সবই যেন আজকের দিনের বলে মনে হয়—কারণ যে সব চিন্তাধারা এ সব নাটকের প্রডাকসন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা গভীরভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়।

এই ধরণের প্রডাকসনের জন্য রঙ্গমঞ্চে বাস্তবজীবনের ঘটনাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় না—যেমনটা বিগত দিনের থিয়েটারে করা হতো। আধুনিক শিল্প বলতে চিন্তাভিত্তিক শিল্পকেই বোঝায়—এর ভেতর সুপারফিসিয়েল-এর কোন স্থান নেই।

আধুনিক অভিনেতা

"জর্জি আলেকজান্দ্রোভিচ, আধুনিক অভিনেতা বলতে আপনি কি বোঝেন?" —আমি প্রশ্ন করলাম।

প্রথমত তার এতটা ধীশক্তি থাকা দরকার যার ফলে সে নাট্যকার বা ফিল্ম লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে

'Me Granny, Iliko and Illarion' নাটকে অভিনেতা ইয়েফিম কোপেলিয়ান (বাঁ দিকে) এবং সারগে ইয়ার্সকি।

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—অর্থাৎ অভিনয়ের মাধ্যমে কিছু বিশেষত্বের সূচনা করতে পারেন। এ্যাক্টরের প্রতিভার মৌলিকতা অনুসারে প্রডাকসন মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

[নাট্যাচার্য শিশিরকুমারও বলতেন যে অভিনেতা নাট্যকারের হাতের পুত্তলিকা নন। এবং তাঁরই অভিনয়ে প্রকাশ পেত যে ষোড়শীর জীবানন্দ বা আলমগীরের আলমগীর ইত্যাদি চরিত্র শুধু শরৎচন্দ্রের বা ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্ট চরিত্র নয়—এসব চরিত্রের মঞ্চে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শিশিরকুমারের মৌলিক প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বেরও যথেষ্ট অবদান ছিল।

["থিয়েটার বা ফিল্মে আপনি সব থেকে কোন জিনিস অপছন্দ করেন?"

মাঝামাঝি বা সাধারণ শ্রেণীর শিল্প এবং সাহিত্যকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। এগুলো বদ শিল্পের থেকেও খারাপ। ভাল ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ যদি একঘেয়ে বা বিশেষত্ববর্জিত হয় তার থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। আমাদের চারপাশের ঘটনাবলীকে প্রতিফলিত করলেই আজকের শিল্প পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে না—আজকের দিনের পৃথিবীর সমস্ত রকম ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে শিল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

"কিন্তু এই কারণে শিল্প কি প্রচারভিত্তিক হয়ে পড়বে না? আর তার ফলে তো শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে?"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্যিকার শিল্প সব সময়েই প্রচারধর্মী—কিন্তু এ প্রচারধর্মের সঙ্গে খবরের কাগজের পাব্‌লিসিজমের কোন মিল নেই। What I mean is the ability of art to reflect the contemporary tendencies will great skil'

গ্রন্থমেলা

উত্তরণ—সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ২।৮১ নাকতলা গভর্নমেন্ট স্কীম, কলিকাতা—১৭, দাম : এক টাকা।

গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় পাঠকের রুচি-অরুচির ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। এমনও দেখা গেছে যে, নানারকম ঢক্কানিনাদে কেউ কেউ সাময়িকভাবে অর্থ উপার্জন করলেও কালের বিচারে নামের চিহ্নটুকুও কখন মুছে যায়। শেষ পর্যন্ত পাঠকদের বিচারে তাঁরা খারিজ হন, অর্থাৎ পাঠককুলই তাঁদের ভাগ্যনিয়ন্তা। কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকসংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই সৎ কবি ছাড়া প্রায় সবাই নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটায়। বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ কবিতা পত্রিকা বের করার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজেদের ঢাক পেটানো। কাব্যসাধনা এখন অতীতের বস্তু। কাব্যের মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে অর্থ রোজগার করা যায়। আর তা' হাংরি জেনারেশন করছেও। তাঁদের সঙ্গে তাল মেলাবার ও তাঁদের মতো সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কোনো কোনো প্রগতিশীল তকমাধারী কবিসাংবাদিক উঠে পড়ে লেগেছেন। ভেতরে ভেতরে আপোষ আছে কোনো কোনো সম্পাদিত গ্রন্থের কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই তা' ধরা পড়ে যায়। অতএব একালের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাগুলির দিকে তাকিয়ে অল্প সংখ্যক কাব্যরসিক পাঠক হতাশ হচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্যের কাব্যশাখা মানবতার ভাষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নগণ্য সংখ্যক যে দু-চারজন কবি লিখেছেন তাঁরা দল-ভারী না হওয়ায় অপাংক্তেয়। কাব্যের আসরে সুরার সুরধুনীতে তাঁদের আহ্বান না আসুক, একদিন তাঁরা পাঠকের পবিত্র হৃদয়ে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবেন।

হালের এইরকম অবস্থার মধ্যে নগণ্য সংখ্যক পাঠকদের কিছু কাব্য উপহার দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। তিনি 'উত্তরণ'-এর বিশেষ সংখ্যা (১৩৭৩)-এর প্রথম পর্যায়ে কিছু দীর্ঘ কবিতা পুনর্মুদ্রিত করেছেন। দীর্ঘ কবিতাগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা তিরিশ ও চল্লিশ দশকের কবি। বয়সেও কেউ পঞ্চাশের কম ন'ন। বাংলা-সাহিত্য একদা এঁদের কাছ থেকে কিছু পেয়েছিল, এখন ভাঁড়ার থেকে তা' তুলে ধরে একালের কবিদের দেখানো দরকার ছিল যে,—তোমরা কি করছো, আর এঁরা কি করছেন। এই জন্যে অন্তত শ্রীসেনগুপ্তকে আমরা অভিনন্দন জানাবো। ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীসেনগুপ্ত বলেছেন : 'অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরা যেমন অনেকেই দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তেমনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দীর্ঘ কবিতা তেমন বেশি লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না।' 'হয় না' এ কথা সত্য। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত আছে—যারা যা লেখে না তাও কোনো কোনো বাংলা কাব্য সংকলনে স্থান পায়। অনেক সময় সম্পাদক ভয়েই নাকি সে কাজ করেন। আনন্দের কথা শ্রীসেনগুপ্ত সে ব্যাপারে সংসাহস অবলম্বন করে মোট সতের জনের দীর্ঘ কবিতা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অবশ্য বুদ্ধদেব বসুকে বাদ দেওয়া সম্ভব ছিল। তবে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র নাথ, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা অপরিহার্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ মিত্র কি বয়সের কারণে বাদ পড়লেন? পরবর্তী সংকলনে থাকবে "অপেক্ষাকৃত নবীন ও তরুণ কবিদের কবিতাবলী।" (সম্পাদকের 'আমাদের কথা') পরে তাহলে একথা বলার কারণ কি যে, 'অপেক্ষাকৃত আধুনিককলে দীর্ঘ কবিতা তেমন বেশি লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না।' এই ধরণের সন্দেহমূলক মনোভাব নিয়ে আসল কাজ কি সম্পন্ন করা সম্ভব?

এবার সংকলিত কবিতা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। কাব্য পাঠকদের কাছেও কয়েকটি কবিতা দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে। সেই কারণে প্রতিটি কবিতাকে টীকা-টিপ্পনির সাহায্যে সহজতর করা সম্ভব ছিল। প্রতিটি কবিতা রচনার পেছনে কবি-মর্জিকেও তুলে ধরা হয় নি। তাছাড়া তিরিশের তিরিশের বা তিরিশের চল্লিশের দশকে কবিদের দীর্ঘ কবিতা রচনায় মর্জির পার্থক্য কোন্‌খানে তাও সম্পাদক দেখান নি। অথচ কবি-সম্পাদকের কাছে এটাই আমাদের কাম্য ছিল। আমরা আশা করবো, পরবর্তী সংকলনে সম্পাদক এদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

দর্শক—সম্পাদক : রবি মিত্র, দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য : ৫০ পঃ।

দর্শকের ৭ম বর্ষের ১৮শ সংখ্যাটিতে তীর্থযাত্রা প্রবৃত্তিকে সাধারণ ভ্রমণ প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত করা যায় কি না, সুচিন্তিত সম্পাদকীয়র মাধ্যমে সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অন্যান্য রচনা দিয়েও সাধারণের মনে ভ্রমণেচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ভ্রমণোপযোগী বিভিন্ন অঞ্চলের তালিকা ও অন্যান্য খোঁজ-খবর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষ, তার সংস্কৃতি, শিল্প, ঐতিহ্যকে কিভাবে রক্ষা করছে—তা জানা আজ সমস্ত বাঙালীর একান্ত কর্তব্য। দর্শকের আলোচ্য সংখ্যাটিতে—সেই কারণে কোথায় কোন্ প্রাচীন দর্শনীয় মন্দির, শিল্পকলা রয়েছে—তা আকর্ষণীয়ভাবে রচনার ও চিত্রকলার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত 'যাত্রী' শিল্পকলা ভ্রমণপ্রবৃত্তি সম্পন্ন বাঙালীদেরই প্রতিরূপ। ছবির রেখা ও ছন্দ চলারই প্রেরণা দেয়। আমরা মনে করি, বাংলাদেশ ভ্রমণের জন্য যাঁরা উৎসাহ বোধ করবেন, তাঁরা নানা তথ্য দর্শক থেকে লাভ করতে পারবেন। 'বঙ্গদর্শন' 'সুন্দোর বনের এক রাত', 'ডাকে কাঁসাই' 'শীতলনাথের মন্দির' 'বাংলায় ভ্রমণ' প্রভৃতি রচনা ছাড়াও 'দর্শক'-এর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'বিবেকানন্দ শরণশিলা' 'দেশ-বিদেশের শিল্পবার্তা' ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের স্কেচ ও ছবিগুলি দেখলে প্রাচীন ইতিহাস প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'দর্শক'-এ মসজিদ ও গির্জাগুলির ঐতিহাসিক বিবরণও আমাদের কাম্য।

প্রগতি—সম্পাদক : মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। নব-নিকেতন; ৩৯। বি, ডেণ্ট মিশন রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য : ৫০ পঃ।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা প্রগতির দ্রুততর মানোন্নয়নে পাঠকেরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। ১লা বৈশাখে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিকে এবার রবীন্দ্র-নজরুলের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। 'রসিক রবীন্দ্রনাথ' লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ মূল্যবান বলেই দুর্লভ। আমরা মনে করি, সম্পাদক এই প্রবন্ধ সংগ্রহে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আরেক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে তার চমৎকার আলোচনা করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। নজরুল সম্পর্কিত ভবানী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে মোহিতলাল ও নজরুলের মনোমালিন্যের কথা বলা হয়েছে। 'প্রগতি'র এবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধসমূহ। খেলাধুলা, নারীশিক্ষা, বিপ্লবীদের জীবনী ইত্যাদি বিষয় হৃদয়গ্রাহী। গল্প ও কবিতাগুলি শুধু সুলিখিতই নয়, নতুনরা ভাল লিখছে সে-পরিচয়ও পাওয়া গেল।

২৫শে বৈশাখে—বহুরূপ

গত সংখ্যায় আমি লিখেছিলাম রবীন্দ্রসদন কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সত্বর পুনর্গঠিত না হলে অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সপ্তাহ অতিক্রম না করতেই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা' মোটেই প্রীতিকর নয়, বরঞ্চ অমর্যাদাকর বলা চলে। ২৫শে বৈশাখ বিকালে রবীন্দ্রসদনে একটা অনুষ্ঠান করার জন্য রবীন্দ্রসদন কমিটির সদস্য হিসাবে শ্রীশম্ভু মিত্রের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত শিল্পী সংস্থার নেতৃত্বে নাট্য, চলচ্চিত্র, সংগীত ও যাত্রার শিল্পিসমাজ সকালে বহিরাঙ্গনে একটা অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন, এবং শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু অনুমতি নয়, তিনি শিল্পীদের অভ্যর্থনা করা এবং অনুষ্ঠানে নিজে আবৃত্তি করবেন এমন কথাও নাকি বলেছিলেন। কারণ সকালের এই অনুষ্ঠানের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। গত দু-বছর যেসব শিল্পীরা পথের ওপর রবীন্দ্র জন্মোৎসব করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে সব শিল্পী গত বছর রবীন্দ্রসদনে প্রবেশাধিকার চেয়ে পুলিশের লাঠি খেয়ে ফিরে গেছিলেন, এবার তাঁরা চাইলেন দিন বদলের স্মারক হিসাবে প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান করতে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা শিল্পিসমাজের গণতান্ত্রিক বিজয়ের কথা ঘোষণা করতে চাইলেন। বলা বাহুল্য যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিগণ এই প্রস্তাবে আপত্তির কিছু দেখলেন না। বরঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা নিজেদের মাইক দিয়ে, পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় 'রবীন্দ্র প্রণাম' অনুষ্ঠান করে সহযোগিতার কথা জানালেন।

কিন্তু শ্রীশম্ভু মিত্র এতে বেঁকে বসলেন। তিনি প্রথমে জানালেন সকালের অনুষ্ঠান বাতিল করতে হবে; এবং এই দাবিতে শিল্পীদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলেন। শিক্ষামন্ত্রী এতে রাজী না হওয়ায়, পরে তিনি যুক্তভাবে একটা অনুষ্ঠান করতে চাইলেন। কিন্তু সংযুক্ত শিল্পীসংস্থা সকালের অনুষ্ঠান বাতিল করতে রাজী হল না। কারণ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে গত দু-বছরের ঘটনা এবং দিন বদলের কথা জড়িত রয়েছে। এ ছাড়া শ্রীমিত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে অনেক শিল্পী অনুষ্ঠান করতে রাজী নন। তার কারণ হিসাবে তাঁরা আমাকে বলেছেন,—'শ্রীমিত্র রবীন্দ্রসদন নির্মাণ ত্বরান্বিত করার দাবিতে আন্দোলনে সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি, বরঞ্চ বিরোধী কথা বলেছেন; গত বছর শিল্পীদের মিছিলে তিনি আসেন নি, বরঞ্চ কংগ্রেস সরকারের আস্থাভাজন হিসাবে কমিটিতে স্থান পেয়েছেন; শ্রীসত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রসদন কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু শ্রীমিত্র করেছেন; শিল্পীদের ওপর লাঠি চালনার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি; খাদ্য আন্দোলনের সময় বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে মৌন মিছিলে সকল প্রগতিশীল শিল্পী যোগ দিলেও তিনি যোগ দেন নি। গত কয়েক বছর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া তাদের কোন অন্যায় কাজের তিনি প্রতিবাদ করেন নি এবং শিল্পিসমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থন করেন নি। সুতরাং এমন একজন আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির নেতৃত্বে তাঁরা অনুষ্ঠান করবেন কেন? বিকালের অনুষ্ঠান তিনি হলের ভিতরে করুন; সকালেও বহিরাঙ্গনে অনুষ্ঠান হবে, কারণ এত অধিক সংখ্যক লোককে হলে স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না।'

এই নাটকের শেষ অঙ্কে দেখা গেল, শ্রীমিত্র এবং তাঁর কয়েকজন সমর্থক এক বিবৃতি দিয়ে বিকালের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে প্রকারান্তরে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার ওপর দোষ দিয়েছেন। তার পাল্টা জবাব দিয়েছেন এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এমন শেষ মুহূর্তে ওঁরা বিকালের অনুষ্ঠান বাতিল করলেন যে, এখন নতুন করে সংগঠন করার সময় নেই। এই নাটকীয় দ্বন্দ্বে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও জড়িয়ে পড়লেন—তিনি সকালের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না জানালেন। সকালের অনুষ্ঠানের আহ্বায়কদের তিনি অন্যতম। সকালের অনুষ্ঠানে অবশ্য কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলাম। তাঁরা বললেন তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, টেলিফোন করে অনুরোধ করা হয়েছে সকালের অনুষ্ঠানে যেন যোগ না দেন।

সুচিত্রা সেন

সকালের অনুষ্ঠান অবশ্য যথার্থ সার্থক হয়েছে। যেমন জনসমাগম, তেমনি শিল্পী সমাগম হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের পাঁচজন উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সমর্থন জানিয়েছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তথ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার রবীন্দ্রচিন্তা কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সকালের অনুষ্ঠান—সরকারী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এর পরে আর বলার প্রয়োজন নেই বিকালের অনুষ্ঠান বাতিল করে শ্রীশম্ভু মিত্র ও তাঁর সমর্থকরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার কাজ করেছেন কি না।

অবশ্য এত নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারত না শিক্ষামন্ত্রী যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রসদন কমিটি পুনর্গঠন করার শিল্পিসমাজের দীর্ঘদিনের দাবি যথাসময়ে কার্যকরী করতেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কমিটির কোন সদস্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে পারতেন না। —সুজন।

চিত্রআলোচনা

গৃহদাহ

[পরিচালনা—সুবোধ মিত্র]

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর যত চিত্ররূপ হয়েছে দর্শকগণ তা' অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছে। শরৎ সাহিত্যের আকর্ষণ এখনো অটুট। বহু পূর্বে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' যমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় চিত্ররূপ পেয়েছিল। সেই চিত্র দর্শকদের বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। পুরানো দিনের দর্শকরা সে ছবির কথা আজো মনে করেন। উত্তম ফিল্মস প্রযোজিত 'গৃহদাহ' সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় নতুন করে চিত্ররূপ লাভ করেছে। প্রথম ছবিটি যেমন প্রমথেশ বড়ুয়া-যমুনা দেবী, সেকালের আকর্ষণীয় শিল্পী দ্বারা অভিনীত হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিটিও একালের জনপ্রিয় উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন অভিনীত এবং চরিত্র রূপায়ণের দিক থেকে এঁরা বেশি সার্থক; বিশেষ করে সুচিত্রা সেনের অচলা তবে পরিচালনা দক্ষতায় সম্ভবত পুরানো ছবিটি বেশি আকর্ষণীয় হয়েছিল। বর্তমান ছবিটি ১৯৬৭ সালে মুক্তিলাভ করলেও পরিচালনা রীতি—পুরাতন ধারায় চলেছে। বরণ্ড পোষাক-আষাকে এ যুগ আর সে যুগ দু-যুগের সংমিশ্রণে কোথাও কোথাও কাল পরিচয়ের ভারসাম্য হারিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' বহু পঠিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়িকা অচলা অঘটনার আবর্তে পড়ে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যের আকাঙ্ক্ষার ক্রীড়নক হয়ে পড়ল। তার প্রতি পাঠকরা সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। আর সুরেশ কামনার দাস। সময় সময় সে বোঝে—সে কেবল অন্যের গৃহদাহ করছে না, নিজের জীবনকেও সেই আগুনে দগ্ধ করছে। কিন্তু কামনার আগুনে সে অন্ধ, নিজে পুড়ে—অন্যকেও সে পুড়িয়ে মারছে। তারই অন্তরঙ্গ বন্ধু মহিম, গভীর প্রেম ব্যক্তিত্ব ও উদারতায় জয়ী হয়েছে। এই তিনটি চরিত্রের সঙ্গে এসে জুটেছে কৌতুকময়ী প্রাণশক্তিতে পূর্ণ সরল গ্রাম্য নারী মৃণাল। এই চারটি চরিত্রের সঙ্গে অচলার বাবা তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ ধরণের চরিত্র কেদারবাবু—যাঁর মধ্যে আধুনিকতা আর স্বার্থবুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে। অথচ আত্মসম্মানে সচেতন। এই পাঁচটি চরিত্র চিত্রণে অচলারূপে সুচিত্রা সেন এবং মহিমরূপে উত্তমকুমারের অভিনয় যথার্থ উপভোগ্য। বহুদিন পরে এ দুজনের অভিনয় দেখতে ভালই লাগে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন পরে সুচিত্রা সেনের অচলা বাস্তবিকই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছবি দেখার সময়ে এবং পরে অচলার জন্য দর্শকদের মনে বেদনাবোধ জন্মে। কিন্তু এ দু-জনার তুলনায় প্রদীপকুমারের সুরেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে নি। সুরেশ এখানে অসহায় কামনার দাস হওয়ার পরিবর্তে অনেকটা হিন্দী ছবির দুষ্ট লোক হয়ে উঠেছে। বড় উচ্চরবের এই অভিনয় যথার্থ সুরেশকে উপস্থিত করতে পারে নি। মৃণালের চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অনবদ্য অভিনয়ে দর্শকদের মনে রেখাপাত করেন। এ ধরনের চরিত্র অভিনয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আছে। তিনি সেদিক থেকে দর্শকদের সন্তুষ্ট করেছেন। কেদারবাবুরূপে পাহাড়ী সান্যালকে বড় লাউড বা উচ্চরবের ব্যক্তি মনে হয়েছে। শরৎচন্দ্র চিত্রিত আর একটি বিশেষ ধরণের চরিত্র রামবাবু। তিনি উদারতায়, স্নেহ-মমতায় এবং পরোপকারে অদ্বিতীয়। অথচ যখনই শুনলেন যে অচলা সুরেশের বিবাহিতা স্ত্রী নয় তৎক্ষণাৎ ভয়ানক ভীতি দর্শনের মত স্থান ত্যাগ করলেন। স্নেহ-মমতা মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হল। মানুষের মনে সংস্কার যে কত প্রবল—তারই একটি দৃষ্টান্ত এই মানুষটি। সংস্কারের অন্ধতা তার সমস্ত ভালকে গ্রাস করে ফেলল। এই চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন প্রসাদ মুখার্জী। এ ছাড়া পদ্মা দেবী, গীতালি রায়, ইরা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী, কালীপদ চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

দরদী কাহিনীর ভাবাবেগে, এবং অভিনয়গুণে ছবিটি দর্শকদের ভাল লাগছে। কিন্তু গত যুগের পটভূমিতে এরূপ একটি ছবি করতে পরিচালকের যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন ছিল—ছবিতে তার অভাব আছে। জনতার দৃশ্যের কয়েকস্থানে যে স্বাভাবিকতা প্রয়োজন ছিল, সে সব দৃশ্যগুলি বড়ই কৃত্রিম মনে হয়েছে। যেমন পাল্কিতে চড়ে অচলার পতিগৃহে যাত্রা, ট্রেনে নিঃসঙ্গতা, অথবা প্লেগাক্রান্ত অঞ্চল ও হাসপাতাল ইত্যাদি স্বাভাবিক মনে করা যায় নি। এসব ত্রুটিগুলি না থাকলে ছবিটির উপভোগ্যতা আরো বেশি বৃদ্ধি পেত। অবশ্য রাত্রির ট্রেনে সুরেশের খেয়ালে অচলার ট্রেন পরিবর্তনের সময় প্রতীক দৃশ্যটিতে পরিচালক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবীন চ্যাটার্জী।

হিন্দী ছবি 'মেহেরবান'-এ সুনীল দত্ত দু'জন শিশুশিল্পীর সঙ্গে

মেহেরবান

[পরিচালক : এ, ভীম সিং]

এ, ভি, এম-এর হিন্দী ছবি 'মেহেরবান' মুক্তিলাভ করেছে নিউ এম্পায়ার সিনেমায়। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। তবে পরিচালক এ, ভীম সিং এবং চিত্রনাট্য লেখক জে, এন, সীতারাম মূল কাহিনীর কাঠামোটাই রেখেছেন। এই কাঠামোর উপর তাঁরা চরিত্রগুলিকে মোটা মোটা রেখায় এঁকেছেন, যাতে সর্বভারতীয় ভোলানাথ দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়।

ছবির কাহিনী হল কোটিপতি

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রসদনের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে ভাষণ দিচ্ছেন সংযুক্ত শিল্পী-সংস্থার আহ্বায়ক শ্রীমন্মথ রায়।

শান্তিস্বরূপ চিরদিন দান ও সহৃদয়তার জন্য শ্রদ্ধেয় ছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা গীতার বিয়ে যখন লক্ষপতি করমচাঁদের পুত্রের সঙ্গে স্থির হয়েছে সে সময় শেয়ার মার্কেটের বিপর্যয়ে তাঁর সর্বস্ব যায়। গীতার বিয়ে ভেঙে যায়, শান্তিস্বরূপের ছেলেরা নিজের নিজের স্বার্থ গুছাবার তালে থাকে, বিধবা কন্যার পরশ্রীকাতরতায় পরিবারটির ভাঙন আরো দ্রুত হয়। একমাত্র স্ত্রী ও কন্যা গীতা বাড়িতে তাঁর অবলম্বন। আর ছিল শান্তিস্বরূপের সহায় তাঁরই ভাগ্নে কানাইয়া—যার সঙ্গে তিনি পালিতা কন্যা লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়েছিলেন। কানাইয়া একটি কারখানায় কাজ নেয় এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মামার সহায়ক হতে চেষ্টা করে। ছেলেদের কাছে চরম আঘাত খেয়ে শান্তিস্বরূপ প্রাণত্যাগ করেন, বাড়ি নিলাম হবার উপক্রম হয়। এ সময় সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করেও কানাইয়া পরিবারটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। বিগ্রহের আশীর্বাদী ফুল নিয়ে সে মামীমার কাছে আসে। আসবার পথে মোটর দুর্ঘটনায় পতিত করমচাঁদের ছেলের জীবনরক্ষা করে। এতে করমচাঁদের মত পরিবর্তন হয় এবং বাড়িটা সে কানাইয়াকে দিয়ে দেয়। কানাইয়া একালের ভরত, সুতরাং সে সকলকে অধিকার দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনে।

ছবিটিকে চিত্রতারকাদের ছবি বলা যায়। অশোককুমার, সুনীল দত্ত, মেহ্‌মুদ, নূতন, সুলোচনা, শশীকলা, শ্যামা, জয়ন্তী, পদ্মা, সুদেশকুমার, রাজমেহ্‌রা, মুকরী প্রমুখ রয়েছেন। নতুন মুখ রয়েছে—এন, ভারতী। ছবিটিতে রবি পরিচালিত কয়েকটি গান রয়েছে। ছবিটি গানে, কাহিনীর ভাবাবেগে এবং বহু তারকার সমন্বয়ে দর্শক আকর্ষণ করবে।

তবে এসব কাহিনীচিত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র উৎসব

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৮ই মে থেকে ১৩ই মে ললিতকলা ভবনে ঋত্বিক ঘটক নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের এক উৎসব হয়েছে। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিসমূহের মধ্যে ছিল : মেঘে ঢাকা তারা, কোমলগান্ধার, বাড়ি থেকে পালিয়ে, সুবর্ণরেখা, অযান্ত্রিক এবং নাগরিক। শেষোক্ত ছবিটি সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য মুক্তিলাভ করে নি। ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে এ ধরণের উৎসব আয়োজন করে ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট ধন্যবাদের যোগ্য কাজ করেছেন। প্রত্যেকটি ছবি বক্তব্যে, আঙ্গিকে এবং উপস্থাপনা পদ্ধতিতে গতানুগতিক ছবি থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য এবং যথার্থ মূল্যায়নের জন্য এরূপ উৎসবের প্রয়োজন আছে।

ড্রামস অব ডেষ্টিনি

লাইট হাউস সিনেমায় 'ড্রামস অব ডেস্টিনি' ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে। কিছুদিন আগে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে ভারত-প্রবাসী আফ্রিকান ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রীর নিকট কয়েকটি আমেরিকান ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার দাবি করেছেন। তার মধ্যে 'ড্রামস অব ডেস্টিনি' অন্যতম। আফ্রিকান ছাত্রদের মতে এই ছবিগুলি আফ্রিকানদের পক্ষে সম্মানজনক নয়, এবং এগুলি এদেশে দেখাতে দিলে ভারত-

আফ্রিকান সংহতি নষ্ট হবার কল্পনা থাকে।

প্রধানমন্ত্রী কিভাবে বিবেচনা করছেন জানি না তবে এ ধরণের ছবি ভারতে প্রায়ই মুক্তিলাভ করে। ভারতের সিনেমাগুলি মার্কিনদের অথবা সি, আই ই-র প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক ছবি হামেশাই ভারতীয় সিনেমাগুলিতে দেখান হচ্ছে। সেন্সর বোর্ড এ ব্যাপারে একেবারে নীরব।

আলোচ্য ছবিটিতে যথেষ্ট কৌতূহল বজায় রেখে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আফ্রিকার বন্য জন্তুর জীবন দেখান হয়েছে। মার্টিন নামক একজন শিকারীর জবানীতে সে শিশুকাল থেকে কিভাবে শিকারে আকৃষ্ট হয়ে যুবকবয়সে দক্ষ শিকারী হল, কিভাবে বন্য জন্তুদের ছবি তুলল—যা লোকচক্ষুর আগোচরে ছিল এতকাল এবং কিভাবে জন্তু-জানোয়ার ধরলো ইত্যাদি তার তিন পর্যায়ের জীবন দেখান হয়েছে। জীব-জন্তুর এই অংশ বাস্তবিক উপভোগ্য এবং বিস্ময়কর ফটোগ্রাফির জন্য আকর্ষণীয়। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আসে আফ্রিকার মানুষ, যদিও তা' মুখ্য নয়। আফ্রিকার অর্ধসভ্য মানুষ, তারা ভীরু এবং সাদাদের প্রতি নির্ভরশীল। সাদাদের তারা রক্ষাকর্তা মনে করে ইত্যাদি। কিন্তু মার্টিন খুব সতর্কতার সঙ্গে চেপে গেছে যে, যার হাতে বন্দুক থাকে সেই সাহসী হয় না। সাদাদের হাতে বন্দুক আছে—নিরস্ত্র আফ্রিকানদের বল্লম একমাত্র অবলম্বন। তবুও এই বল্লম সম্বল করে ইট-পাটকেল নিয়ে তারা মত্ত হাতী, বাঘ, সিংহের সম্মুখীন হয়ে বেঁচে আছে। এই বীরত্বের কথা ছবিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সাদা-কালো যেই হোক কোন শিকারীই স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা ছাড়া শিকার করতে পারে না। কিন্তু বাহাদুরী নেয় শিকারী। এই ছবিতেও একই মনোভাব কাজ করেছে।

ছবিতে একটি লোক-নৃত্য রয়েছে, নাচটি খুবই দক্ষতাসম্পন্ন। তবে স্বাভাবিকভাবে ছবিতে আসে নি, আরোপিত মনে হয়।

নাটকের কথা

গণনাট্য উৎসব

গত ৫ই, ৬ই ও ৭ই মে দক্ষিণ কলকাতা জুথ সমিতির মাঠে গণনাট্য সঙ্ঘের কলকাতা শাখার উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী গণনাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তিন দিন যথাক্রমে শহীদ দিবস, গণ-আন্দোলন দিবস, সাম্রাজ্যবাদ দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। এই উৎসবে গণনাট্য সঙ্ঘের কলাকার, প্রান্তিক, সীমান্তিক, ইসক্রা প্রভৃতি শাখার উদ্যোগে কয়েকটি নাটক অভিনীত হয় এবং বিভিন্ন শাখা সংস্থার শিল্পিগণ গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। গণসংগ্রাম ও নাটক সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

এই তিন দিনে জুলিয়াস ফুচিক, ২০শে জুন, কিমলিস, তাসান, হারানের নাতজামাই এবং লঙ-মার্চ প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটকগুলির মধ্যে 'লঙ-মার্চ' সর্বাপেক্ষা অধিক দর্শকদের আকর্ষণ করে। এই নাটকটি দেখবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কিতীশ বসু, গুরুদাস পাল, পরিমল গোস্বামী, আশু মুখার্জী, লোকায়ত ও ইসক্রা শাখা।

রবিবার সকালে উৎসবমণ্ডপে এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল—গণসংগ্রাম ও নাটক। আলোচনা করেন—সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত, শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও রাজনৈতিক কর্মী সুধাংশু পালিত। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আশু সেন।

উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন নাট্যকার অভিনেতা উৎপল দত্ত ও কিশলয় সেন।

স্টার রঙ্গমঞ্চে 'দুই মহল'

গত ৮ই মে সোমবার সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গগৃহে সেন র‍্যালে য়্যান্ড এসোসিয়েটস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকটির অভিনয় পরিবেশন করলেন। দলগত অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। তবুও শ্যামালাল মৈত্র (মনুয়া), দিলীপ সেনগুপ্ত (লালুয়া) ও বিমল রায়চৌধুরী (ছোনেরাম) অভিনয়ে প্রতিটি দর্শকের প্রশংসা লাভ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করে দলগত সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন : সর্বশ্রী দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, বিমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামদাস সাহা, মুকুল রায়, অমিতাভ ঘোষ, শিশির নাথ, তাপস লাহিড়ী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, প্রণয় সোম, অরুণ ঘোষ, বরেণ্য মুখোপাধ্যায়, শিশির চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দে ও সবিতা সমাদ্দার।

স্টুডিও খবর

কালোর পরে আলো

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে (২নং) সিদ্ধেশ্বরী চিত্রমন্দিরের প্রথম প্রয়াস 'কালোর পরে আলো' ছবির মহরত হয়েছে। সূর্যমুখী রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। সুর সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীহেমন্ত মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ করবেন শ্রীরামানন্দ সেনগুপ্ত এবং সম্পাদনা করবেন শ্রীবিশ্বনাথ নায়েক। ছবিটি পরিচালনা করবেন বিনায়ক ছদ্মনামে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

সন্ধ্যা চিত্রমের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ছবির জন্য কয়েকটি গান সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গ্রহণ করা হয়েছে। অপরেশ লাহিড়ী সঙ্গীত পরিচালনা করছেন।

'আরোগ্য নিকেতন'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত

"রাজা রামমোহন" ছবির সাফল্যের পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বহু পঠিত উপন্যাস "আরোগ্য নিকেতন"-কে চিত্রায়িত করছেন—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন "ভগিনী নিবেদিতা" রাজা "রামমোহন" ও "বাঘিনী" খ্যাত বিজয় বসু। সুরসৃষ্টিতে রয়েছেন—রবীন চ্যাটার্জী। প্রণব রায় রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জী ও মানবেন্দ্র মুখার্জী।

এই সাহিত্যকীর্তির মহান দুটি চরিত্র "জীবন মশাই" ও "আতর বৌ"। এ দুটি চরিত্রে রূপদান করছেন—বিকাশ রায় ও ছায়া দেবী। অন্যান্য বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন—শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায়, রমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, কালী সরকার, বঙ্কিম ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ দাস, ছন্দা দেবী ও রমা দাস। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করছেন ১৯৬৬-র শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী হিসেবে বি, এফ, জে, এ পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষ্ণ চক্রবর্তী। বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বেটন কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দল

ইস্টবেঙ্গল বেটন কাপ বিজয়ী

ইস্টবেঙ্গল হকি টিমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়। বেটন কাপের বিদেশ যাত্রা প্রায় ঠিক। একদিকে দাবিদার গত-বারের বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিশ। অন্যদিকে ভিলাই স্টিলের লুব্ধদৃষ্টি। এই সংকটে ইস্টবেঙ্গলের দৃঢ়তা প্রশংসনীয়। এই দুটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে স্থানীয় হকির ইজ্জৎ রক্ষা করেছে ইস্ট-বেঙ্গল। এই দুঃসাধ্য সাধনে তাদের সম্বল ছিল অদ্ভুত মনোবল ও প্রাণঢালা প্রচেষ্টা। অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না ভাগ্যের পক্ষপাতিত্বের ছোঁয়াচ আছে এই স্মরণীয় জয়ের পেছনে। গত শনিবারে পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে সেমিফাইনালের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১৮ মিনিটের সময় এক গোলে হারছে। গোল খাওয়ার পর দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আরও জোরদার হয়ে উঠলো গোল শোধ দেওয়ার জন্যে। ইনামুর রহমানের ছন্দোময় গতি সার্থক হল যখন সুরিন্দার পাল তাঁর পাশ থেকে সুন্দরভাবে একটি গোল করলেন। ইস্ট-বেঙ্গল চাতুর্যের সঙ্গে আক্রমণ পরিচালিত করে। বিশ্রামের ঠিক আগেই ইনামুরের দেওয়া একটি বল পি ঘোষের আয়ত্তে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সুন্দর গোলের সুযোগটি নষ্ট হয়।

পাঞ্জাব পুলিশও তাদের খেলায় শক্তি ও চাতুর্য প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে নি। বিরতির পর পুলিশ দল ২টি শর্ট কর্নারের সুযোগ পায়। ইস্ট-বেঙ্গল ও ১টি শর্ট কর্নার পায়। কিন্তু কোন দলই সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে পারে নি। পরস্পরকে আক্রমণ করে উভয় দলই গোল করতে চেষ্টা করে। দর্শকরা উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হন। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ্য মনে হয়। বিরতির ষোল মিনিট পরে ইস্টবেঙ্গল জয়সূচক গোলটি করে। এই গোলের কৃতিত্ব খাম্না ও সুরিন্দার পালের।

শ্রীঅমিতাভ

১ গোলে পেছিয়ে থেকে পাঞ্জাব পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করে গোল শোধ করার জন্যে। ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে এই আক্রমণকে ব্যর্থ করে।

পাঞ্জাব পুলিশকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল শেষ খেলায় ভিলাই স্টিলকে পরাজিত করে ১ গোলে। এই জয়ের ফলে ফুটবলে কৃতী ইস্টবেঙ্গল দল হকিতেও নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর পর তাদের লক্ষ্য বোম্বাই-এর আগা খাঁ প্রতিযোগিতা।

গত সোমবার এই আকর্ষণীয় ফাই-নাল খেলাটি দেখবার জন্যে প্রচুর দর্শক সমাবেশ হয়েছিল। খেলাটি যদিও মাপ-কাঠির বিচারে উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে পড়ে না তবুও সকলেই স্বীকার করবেন খেলাটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। দর্শকরা একেবারে নিরাশ হন নি। খেলার মধ্যে মাঝে মাঝে হকির মণি-মুক্তার ঝিলিক দেখা গেছে। বিশেষ করে প্রবীণ খেলো-য়াড় আরম্যানের স্টিক থেকে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াশৈলী সমঝদার দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। খেলার বিচার করতে গেলে ইস্টবেঙ্গলের ইনামুর রহমানের অপূর্ব খেলা ইস্টবেঙ্গলের জয়ের প্রধান উপাদান। সেণ্টার হাফ ডি পেজের খেলাও খুব ভাল হয়েছিল। তাঁকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কারে ভূষিত করে সুবিচার করা হয়েছে।

ভিলাই স্টিল পরাজিত হয়েছে বটে ১ গোলে কিন্তু তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ছাপ রেখে গেছে। খুব নামকরা খেলোয়াড় সমন্বিত না হয়েও এই দলটি বেটন প্রতিযোগিতার শীর্ষে ওঠার সম্মান লাভ করেছে। এই কৃতিত্বের পেছনে তাদের ২ বছরের প্রচেষ্টা। আগামী বছরে পরিপূর্ণ সাফল্যের আশা তাদের পাথেয়।

ভারতীয় দল কেণ্টের কাছে পরাজিত

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে উপনীত হবার কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা ক্রিকেট সমালোচক বলেন যে ইংলণ্ডের ঘাসের উইকেটে ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের খেলতে যথেষ্ট অসুবিধা হবে। কারণ এবারের ইংলণ্ড সফরকারী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সকলেই স্ট্রোক প্লেয়ার। রক্ষণাত্মক ব্যাটসম্যান ভারতীয় দলে এক-জনও নেই। ইতিমধ্যে যে কটি খেলায় ভারতীয় দল অংশ গ্রহণ করেছে তাতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের রান তোলার বহর দেখে ওই ক্রিকেট সমালোচকের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

উরচেস্টারসায়ারের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলাটি বৃষ্টি এবং আলোকাভাবের জন্য পরিত্যক্ত হয়। উরচেস্টারসায়ার প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৩৩৫ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর ভারতীয় দল ৮ উইকেটে ১০৬ রান সংগ্রহ করার পর খেলা পরিত্যক্ত হয়।

স্লতে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্সের বিপক্ষে ভারতীয় দল অল্পের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হয়। ভারতীয় দল ৮ উইকেটে ২০৯ রানে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বোরদে সংগ্রহ করেন ৫৫ রান এবং সাক্সেনা ৪৬ রান এবং কুন্দেরান ৪২ রান। মোহন, সুব্রত গুহ এবং চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং-এ ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৫৬ রানে। মোহন ৩০ রানে ৫ উইকেট, গুহ ৯ রানে ২ উইকেট এবং চন্দ্রশেখর ১১ রানে ৩ উইকেট সংগ্রহ করেন। ফলো অনের সম্মুখীন হবার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ১০৮ রান সংগ্রহ করে তাঁরা কোনক্রমে পরাজয় রোধ করেন। সুব্রত গুহ, ভেঙ্কট রাঘবন এবং চন্দ্রশেখর যথাক্রমে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

ক্যাণ্টারবেরীতে অনুষ্ঠিত একটি খেলায় কেণ্ট দলের কাছে ভারতীয় দল ৭৬ রানে পরাজিত হয়। কেণ্ট প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে ৬ উইকেটে ৩১৬ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এ ডিক্সন ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন, আর উল্লেখযোগ্য হল শেফার্ডের অপরাজিত ৭০ রান। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে ১৭৩ রানে। ফারুকের ৫৩ রান, ওয়াদেকারের ৩৩ রান এবং হনুমন্তের ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। আণ্ডার উড মাত্র ৫৯ রানে ৫ উইকেট দখল করেন। কেণ্ট ৪ উইকেটে ৭৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই সময় জয়ের জন্য ভারতীয় দলের প্রয়োজন ছিল ২১৯ রান আর সময় ছিল ২১৫ মিনিট। কিন্তু ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৪২ রানে শেষ হওয়ায় ভারতীয় দল ৭৬ রানে পরাজিত হয়।

ময়দানে ফুটবল

১৯৬৭ সালের কলকাতা ফুটবল লীগ সুরু হয়েছে। প্রথম ডিভিশনের উদ্বোধনী দিনের খেলায় অংশ গ্রহণ করেন এরিয়ান্স হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে এবং বাটা জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে। মরশুমের প্রথম গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন এরিয়ান্সের কর্পুর ব্যানার্জী। এরিয়ান্স ১—০ গোলে হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে জয়ী হয়। অপর দিকে বাটা ২—০ গোলে জয়ী হয় জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে। বাটা দল ভাল খেলে জয়ী হয়। বাটার স্টপার আলেখ্য ঘোষাল উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বালী প্রতিভা এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব এই মরশুমের প্রথম খেলায় অংশ গ্রহণ করে ১—১ গোলের ফলাফলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে খিদিরপুর দল উয়াড়ি ক্লাবকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে লীগের খেলায় শুভ সূচনা করে।

লীগের দ্বিতীয় খেলায় এরিয়ান্স জর্জ টেলিগ্রাফকে পরাজিত করে ২—০ গোলে এবং উয়াড়ি ক্লাব হাওড়া ইউনিয়নকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। উয়াড়ি দল একটি পেনালটি লাভ করলেও কে সরকার সুযোগটি অপচয় করেন।

প্রথম ডিভিশনের যে দলগুলি ইতিমধ্যে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের খেলা দেখে মনে হয় অনুশীলন করলেও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে তাঁরা মাঠে নামতে পারেন নি। খেলার মধ্যে কেমন যেন একটা এলোমেলো ভাব।

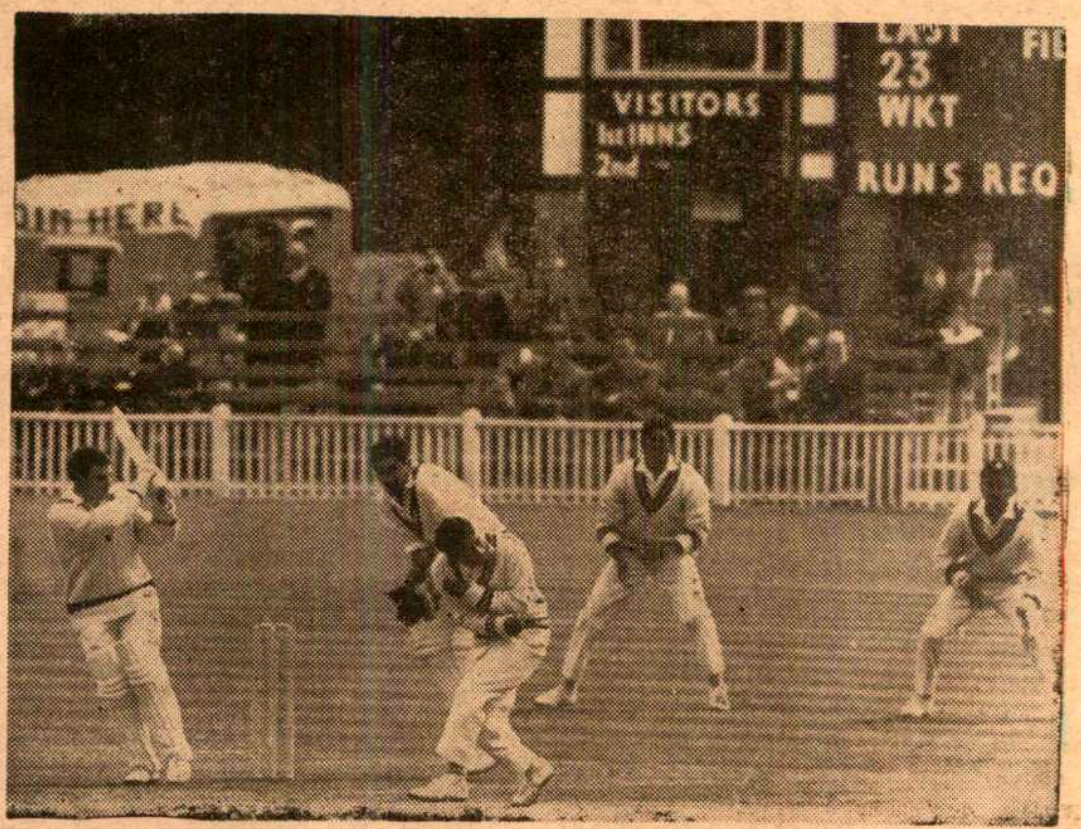

উরচেস্টারসায়ারের অরমরোডস সুর্তির বলে বাউণ্ডারী মারছেন

সেন তদন্ত কমিশনের বৈঠক

সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে সি-এ-বি'র সম্পাদক শ্রীনিতাইচাঁদ কোলে এবং গ্রাউন্ড ম্যানেজার শ্রীভূপেন দত্তের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সি-এ-বি'র সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এম দত্তরায়কে ২৩শে মে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হবার নির্দেশ দিয়ে সেন তদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে এক সমন জারী করা হয়।

সি-এ-বি'র গ্রাউন্ড ম্যানেজার শ্রীভূপেন দত্ত সি-এ-বি'র কৌঁসুলী শ্রীঅমিয় বসুর প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ১৯৫২ সাল থেকে মাঠের তদারকির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত জানান যে, বর্তমানে তিনি সি-এ-বি থেকে মাসিক ২৩৫ টাকা বেতন লাভ করেন। গ্রাউন্ড ম্যানেজার শ্রীদত্ত মাঠের পরিধি, ব্যাসার্ধ এবং বাউন্ডারি লাইন টানবার সঠিক পদ্ধতি বলতে পারেন নি। শ্রীদত্ত জেরার উত্তরে স্বীকার করেন যে, গাণিতিক পরিমাপ ব্যতিরেকেই বাউন্ডারি লাইন টানা হয়েছে। শ্রীদত্ত বলেন যে, প্রায় পঞ্চাশজন মালী তাঁর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত দর্শকাসনগুলিতে নম্বর লাগান। তিনি আরও বলেন যে, সি-এ-বি'র সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রতিটি দর্শকের জন্য ষোল ইঞ্চি স্থান বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, নিতান্ত ভুলবশত ৪৫ টাকার সিজন টিকিটের ব্লকে ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার পর্যন্ত দর্শকাসনে কোন নম্বর লাগানো হয় নি। শ্রীদত্ত বলেন যে, খেলা সুরু হবার আগে গ্যালারীগুলো সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখা হয় নি এবং সমস্ত দর্শকাসনে নম্বর লাগানোর পরও বিরাট এলাকা ফাঁকা পড়ে ছিল। শ্রীদত্ত কমিশনকে জানান যে, পয়লা জানুয়ারীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রী এন সি কোলে বলেন যে, রাজ্য সরকারের লিখিত অনুমতি নিয়েই তাঁরা কংক্রিট গ্যালারী তৈরি করেছেন। তিনি বলেন যে, ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ব্লক বাদ দিয়ে ইডেন উদ্যানে মোট ৫৮ হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, ১লা জানুয়ারীর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁরা সমস্ত দৈনিক টিকিট বিক্রয় বন্ধ করতে চান, কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র ২ হাজার ১৫ টাকার দৈনিক টিকিট বিক্রয় বন্ধ করতে রাজী হন। শ্রীকোলে বলেন যে, ১লা জানুয়ারী খেলা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হত, যদি না পুলিশ দর্শকদের ওপর লাঠিচার্জ বা কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করত এবং শ্রীসীতেশ রায়ের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাত। তাঁর মতে কার্যক্ষেত্রে অযথা বলপ্রয়োগ করতে গিয়েই পুলিশ যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে।

সাক্ষ্যদানের দ্বিতীয় দিন শ্রীকোলে জানান যে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদকে তাঁরা টিকিট দেন নি। বাম এবং দক্ষিণপন্থী সকল রাজনৈতিক দলই তাঁদের কাছ থেকে টিকিট নিয়েছেন। শ্রীকোলে বলেন যে, বিক্রীত টিকিটের বিক্রয়লব্ধ অর্থের কোন হিসাব নেই। টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে, তবে ব্যাঙ্কের হিসাব দাখিল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, তিনি নিজে প্রায় চার লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রয় করেছেন এবং এই টাকা তিনি সুবিধামত ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন এবং এর কোন পাকা হিসাব তাঁর কাছে নেই।

সমাচার দর্পণ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের হকি কমিটির সভায় আশুতোষ কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হকি লীগ বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। গত ৫ই মে আশুতোষ ও হেরম্বচন্দ্র দলের লীগের ফাইনাল খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং উভয় দলই উভয়ের বিপক্ষে প্রতিবাদ করে। কমিটি হেরম্বচন্দ্রের প্রতিবাদপত্র অগ্রাহ্য করে আশুতোষকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

* * *

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাশিবিরে যোগদান না করায় ক্যাসিয়াস ক্লেকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ক্লে বর্তমানে হাউসটনে রয়েছেন। তিনি স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার আসরে ভারতের সেন্টার ফরোয়ার্ড বলবীর সিং বল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

বাংলা ফুটবলের বর্তমান সমস্যা

ফুটবল আবার ময়দানে নতুন আশা নতুন উদ্দীপনার ভরা ডালি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আই, এফ, এ'র নব-নির্বাচিত সভাপতি বাংলার ফুটবলের আসরে এক নবযুগের সূচনা করতে পারবেন বলে বাংলার অগণিত ক্রীড়ানুরাগী আশা করে আছেন। আই, এফ, এ-র বিরুদ্ধে ক্রীড়ামোদীদের অভিযোগ এবং অসন্তোষের সীমা নেই। যে গলদ, অনাচার আর দুর্নীতি আজ সেখানে বিরাট শিকড় গেড়ে আছে, তা' অল্প সময়ে সমূলে বিনাশ প্রায় অসম্ভব।

ভারতীয় ফুটবলের মক্কা হিসাবে পরিচিত কলকাতা ময়দানের দিকে অবশ্য সব ফুটবল খেলোয়াড়েরই লক্ষ্য। এ'দের প্রত্যেকেরই স্বপ্ন কলকাতার ময়দানে খেলার। তাই প্রতি বছরই ফুটবল মরশুমের সুরুতে দেখা যায় বাংলার বাইরের বাছাই করা খেলোয়াড়েরা কলকাতার বিভিন্ন দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে আসেন। অবশ্য গত কয়েক বছর দেখা যাচ্ছে যে বাইরের খেলোয়াড় আগমনের স্রোতে অনেক ভাঁটা পড়েছে।

বাংলার ছেলেরা অনায়াসে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে অভাব পূরণ করতে পারেন কলকাতার ময়দানের নামজাদা দলগুলির। কিন্তু কলকাতার দু-একটি দল আবার মনে করেন বাংলার ছেলেরা তেমন কাজের নয়। আসল কথা হল যে এই সব দলগুলির ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের খুশিমত কাজ করতে চান, কিন্তু বাংলার খেলোয়াড়েরা ডিক্টেটরী চালচলনের প্রতিবাদ করে বসেন অনেক সময়। কিন্তু বাংলার বাইরের খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ করা দূরের কথা হাতের পুতুলের মত চলেন।

আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কলকাতা ময়দানের। কিন্তু এই বাংলা দেশের জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির আসরের ফলাফল মোটেই সন্তোষজনক নয়। সর্বভারতীয় ফুটবলের আসরে বাংলার সেই একচেটিয়া প্রাধান্য আজ আর নেই। বেচারা বাংলা ফুটবলের এই অবনতির দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেবার কেউই নেই বর্তমানে। এতদিন আই, এফ, এ মুদিত নেত্রে ছিলেন বললেই চলে, আর বড় দলগুলি অত্যন্ত ব্যস্ত কিভাবে ট্রফির সংগ্রহ বাড়ান যায়। বড় দলগুলির এই ট্রফির মোহে পরোক্ষভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় উঠতি তরুণ খেলোয়াড়েরা।

প্রতি বছর দল বদলের পালার শেষে হিসেব করলে দেখতে পাবেন কলকাতার প্রথম সারির দুই-একটি দলে এত খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে যে অনায়াসে তিন সেট দল গঠন করা যায়। ময়দানের কোন তরুণ খেলোয়াড়ের মধ্যে সম্ভাবনা দেখলেই বড় দলগুলির লোভনীয় টোপ পড়ে ওই সব খেলোয়াড়ের সামনে।

আলেখ্য ঘোষাল

মোহাচ্ছন্ন তরুণ এই সব খেলোয়াড়ের তখন নিজের ভাল-মন্দ বিচারের সময় থাকে না। ফলে বড় ক্লাবের টোপ গিলে নিজের সর্বনাশের পথ নিজেই তৈরি করে দেন।

কারণ একটি উদীয়মান খেলোয়াড়ের পর পর কয়েক বছর নিয়মিত খেলা প্রয়োজন লীগে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসরে। কিন্তু বড় ক্লাবে লোভে পড়ে যোগদান করে বসলে নিয়মিত খেলার সুযোগ ভাগ্যে জোটে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের জার্সি গায়ে চাপিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকতে হয়। খেলোয়াড়ী জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে এই-ভাবে লাইনের ধারে বসে থাকতে থাকতে অল্প সময়েই সম্ভাবনার বীজ নষ্ট হয়ে তাঁরা লাইনচ্যুত হয়ে যান।

তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়দের এই ধরণের আচরণকে স্বেচ্ছামৃত্যু বলা যায়। খেলোয়াড়েরা যদি নিজেরা তাঁদের লোভ সংবরণ না করতে পারেন তবে আর কি করা যায়। আই, এফ, এ অবশ্য দল বদলের আইন কিছুটা কড়া-কড়ি করলে কিছুটা সুফল পেতে পারেন।

শুধু তাই নয় বড় দলের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে অনেক সময় অনেক খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। কারণ বড় দলগুলির কর্তাব্যক্তিরা আবার দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন। যেমন জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল, জুনিয়ার ভারতীয় ফুটবল দল, বিশ্ববিদ্যালয় দল, সন্তোষ ট্রফির রাজ্য দল এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক খেলায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারতীয় দল গঠনের ক্ষেত্রে এ'দের প্রভাব বিরাট। তাই উঠতি খেলোয়াড়েরা এ'দের চটিয়ে অযথা নিজেদের ভবিষ্যতই বা নষ্ট হতে দেবেন কেন।

আন্তর্জাতিক খেলার পূর্ণ সময় হল নব্বুই মিনিট কিন্তু আমাদের কলকাতা ময়দানে গত বছরের পূর্ব পর্যন্ত খেলা ছিল পঞ্চাশ মিনিট। ফলে আন্তর্জাতিক খেলার আসরে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা দম পেতেন না। গত বছর থেকে আই, এফ, এ সময় বাড়িয়ে করেছেন সত্তর মিনিট। আই, এফ, এ-র এই সিদ্ধান্তকে সেদিন প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর ফুটবল লীগে ওঠা-নামা বন্ধ করে আই, এফ, এ ক্রীড়ামোদী এবং ক্রীড়াবিদ মহলের বিরাগভাজন হয়ে উঠলেন।

তিন বছর ওঠা-নামা বন্ধের কারণ হিসাবে আই, এফ, এ জানান যে সত্তর মিনিটের খেলা খেলবার জন্য বিভিন্ন দলগুলিকে কিছু সময় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই সময় হিসাবে এক বছর ওঠা-নামা বন্ধ রাখার যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তিন বছর ওঠা-নামা বন্ধ রাখা মানে জুনিয়ার ডিভিসনের দলগুলির উৎসাহ নষ্ট করা আর প্রথম ডিভিসনের নিকৃষ্ট কিছু দলকে অযথা সুযোগ দান।

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Thursday, 18th May, 1967 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C71
PRICE : 25 PAISE GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

মরেস্ক

ন্যারো রীডেড

মরক্কো পিন্‌হেড

রাফকাস্ট

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে
এইচ পি জি গ্লাস
ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্ব্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

হ্যামার্ড
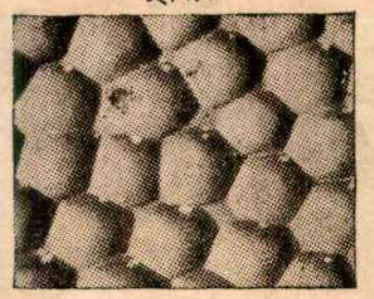

হেক্সাগোনাল ওয়্যারড

শীট গ্লাস

জর্জিয়ান ওয়্যারড

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1775A

সাপ্তাহিক বসুমতী

"বাঁশিতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি' ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়।
করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়াওনি মাথা, চির জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান।"

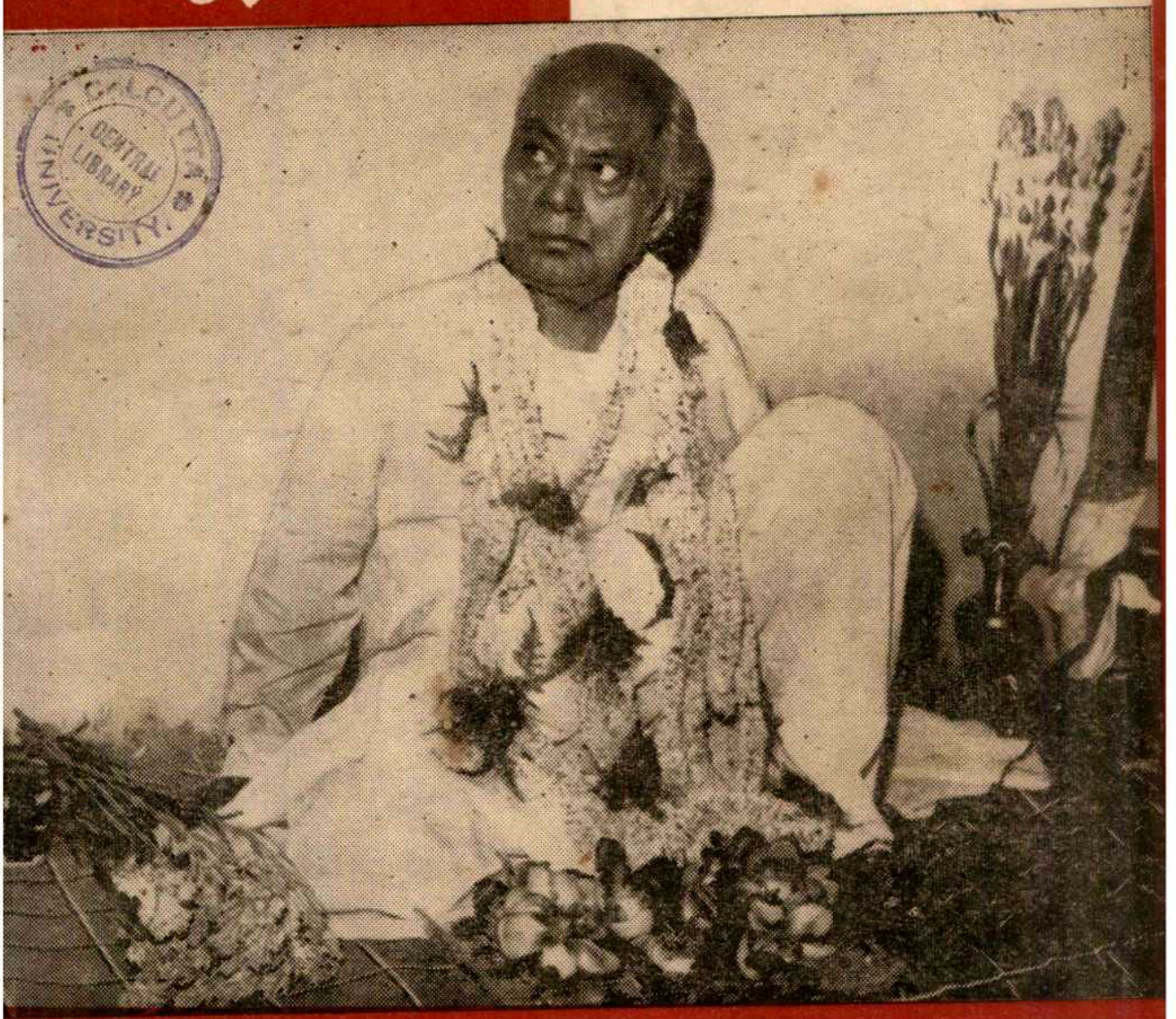

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ষ্ঠ ঃ ৫০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ● 25th May, 1967 * Vol. 71, No.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩১৩৯
আজকের মানুষ		৩১৪০
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	৩১৪১
ভারতদর্শন		৩১৪৩
আন্তর্জাতিক		৩১৪৭
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	৩১৪৯
নজরুল কাব্য প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	— নন্দিতা ভৌমিক	৩১৫৪
প্রতিভাষণ	— কাজী নজরুল ইস্‌লাম	৩১৫৬
বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৫৮
বল রে জবা বল (প্রবন্ধ)	— আবদুল আজীজ আল্‌ আমান	৩১৬১
আজ চাই কি? (প্রবন্ধ)	— কাজী নজরুল ইস্‌লাম	৩১৬২
নব মন্ত্রিসভা সমীপেষু	— এস কে শক্তি	৩১৬৪
রঙ্গদর্শন		৩১৬৬

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকানন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩৲
২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যাকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ঃ দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রাম বাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	৩১৬৯
প্রচ্ছদপট (গল্প)	— অপর্ণা সান্যাল	৩১৭৫
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৩১৭৮
প্রেম ও প্রহার (কবিতা)	— কাজী নজরুল ইস্‌লাম	৩১৮৪
নজরুল সঙ্গীত	— নীহারবিন্দু চৌধুরী	৩১৮৫
গ্রন্থমেলা	—	৩১৮৮
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	৩১৮৯
রঙ্গজগৎ		৩১৯১
পাঠকমন		৩১৯৬
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	৩১৯৭

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড ঃ—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ডঃ—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড ঃ—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)
মূল্য প্রতিখণ্ড ৪·৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ ঃ—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ।
(বোর্ড বাধাই) সাড়ে তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, ব্রজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

UNIVERSITY LIBRARY

৭১ বর্ষ ঃ ৫০শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 25th May, 1967

ক্ষুধার্ত রায়গঞ্জ

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় খরাক্লিষ্ট ও অনাহারক্লিষ্ট অসহায় মানুষগুলির দুর্ভিক্ষাবস্থার কথা লিখেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে এগিয়ে আসছেন। এগিয়ে আসছেন না একমাত্র জোতদার, মুনাফাখোর ও মজুতদারের দল। তারা লাভের অঙ্ক গুণে প্রহর গুণছে, সুতরাং পেছন দরজা দিয়ে চড়া দামে ছাড়া এক ছটাক চালও তারা ছাড়বে বলে মনে হয় না। সরকার নির্দিষ্ট ন্যায্য মূল্যে ধান-চাল বিক্রি না করার এই উদ্দেশ্য হতে পারে যে, দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হোক—তা'হলে মুনাফার পথ আপনিই খুলে যাবে।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা দু'টিতে দুরবস্থার কারণ আমরা বুঝতে পারি। স্বভাবতই এই দু'টি জেলা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে খরা প্রধান অঞ্চল এবং অনগ্রসরতার অখ্যাতির জন্যে এই জেলা দু'টির দিকে এতোকাল কেউ দৃকপাত করার প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হই তখনি, যখন দেখি পশ্চিম দিনাজপুরের মতো নদীবহুল ও শস্যোবৃত্ত অঞ্চল দুর্ভিক্ষ কবলিত! পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমা থেকে এখন পর্যন্ত যে সব দুঃসংবাদ আসছে তা' বিগত ৫০-এর মন্বন্তরকেও হার মানিয়েছে। এই জেলার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। বিগত বিশ বছরের শাসনে কৃষির উন্নতির কথা বলে 'আরো ফসল ফলাও' শ্লোগান তোলা হলেও কৃষিকার্যের কোনরকম উন্নতিই হয় নি। কৃষকদের জীবনও থেকেছে অবহেলিত। এই অবস্থায় তাঁদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে দেশদ্রোহী মজুতদারগোষ্ঠী। কৃষকের মাঠের ফসল বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছয় নি, তা' গেছে জোতদার ও মজুতদারদের গোলায়। আর সেই গোলাবন্দী ধান তারা পাচার করেছে এবং সুযোগ পেলেই এখনো করছে বিহার, নেপাল ও পাকিস্তানে। প্রসঙ্গত বলা দরকার পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। হাত বাড়িয়েই সেখান থেকে বেহাত করেছে ভারতীয় খাদ্যশস্য মুনাফালোভীর দল। তাদের কাছে দেশ ও দেশের মানুষ বড় নয়, তা' নইলে রায়গঞ্জ মহকুমার নিরন্ন মানুষগুলির অবর্ণনীয় দুরবস্থা দেখেও তাদের হৃদয় গলে না কেন? থালা-বাটি, জমি-জায়গা—যথাসর্বস্ব জলের দামে বিক্রি করছে। অবস্থা এখন এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেচে যে জমি-জায়গা কেনার খরিদ্দার নেই, চালের পরিবর্তে গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণের উপায় পর্যন্ত শেষ হয়ে আসায় ক্ষুধাতুর লোকগুলি দিনের পর দিন উত্থানশক্তিরহিত হয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের যে জেলার শস্য উদ্বৃত্ত ছিল এবং যেখানে খরার কোনো কারণ নেই, সেখানে এই শোচনীয় অবস্থার জন্য মূলত দায়ী এখানের মানুষগুলির প্রতি বিগত সরকারের নিদারুণ অবহেলা। এই অবহেলার জন্যেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মজুতদার ও শস্য পাচারকারীদের অদৃশ্য সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় হৃদয়হীন, দায়িত্বহীন প্রশাসন ব্যবস্থার হাল যেমন চলেছে, তেমনিই চলছে, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও বি· ডি·ও-রা শুধু শোভা বৃদ্ধিই করেছেন। তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন্ দশা ঘটতে পারে, তাঁরা তার খবর রাখেন নি বললেও ভুল বলা হয় না। সেই খবর রাখলে এই দুর্দশা কি আজ ঘটতে পারতো? অবস্থা যখন সঙ্গীন তখনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বুভুক্ষায় মৃত্যুর পথযাত্রী সহস্র সহস্র বুভুক্ষু মানুষের কথা।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, সহজসুরে আবেদন-নিবেদনে আর কাজ নেই। দুর্ভিক্ষাবস্থা শুধু বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ বা পশ্চিম দিনাজপুরেই নয়। দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল মূর্তি আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে। জনগণের সতর্কতায় আপাতত কিছু ধান বা চাল মজুত অবস্থা বা পাচার করার পথ থেকে সংগৃহীত হলেও তা' পরিমাণে অত্যন্ত সামান্য। সুতরাং আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সরকার এবার কঠোর হোন। সাধারণ মানুষ যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, সরকার তাদের বুভুক্ষার হাত থেকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আমাদের অনুরোধ, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতকে দৃঢ়তর করুন। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের যে কালো-ছায়া নেমে আসছে, তা' কোনো সরকারের পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মুখে যিনি যতই বলুন, মেকিয়াভেলীর উপদেশ কম-বেশি মেনে চলেন না, এমন রাজনীতিকের সংখ্যা আজকের ভারতভূমিতেও খুবই কম। ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম, সত্যাসত্য, পাপ-পুণ্য, সুনীতি-দুর্নীতি—ইত্যাদি কোনোটারই বিশেষ কোনো মূল্য নেই এঁদের কাছে। তবু সংখ্যায় স্বল্প হলেও কথায় এবং কাজে অন্যায় বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়েও কেবল মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এমন রাজনীতিকও তো আছেন। নইলে মহামাহাপ্রসাদ সিন্‌হাকে বিহার পেলো কী করে!

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাবার জন্যেই বাবু মহামায়াপ্রসাদ রাজনীতিতে এসেছিলেন, সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল আগ্রহ প্রকাশ করার জন্যেই সেদিন লবণ সত্যাগ্রহে সামিল হয়েছিলেন। গুরু পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মদনমোহন মালবীয়ার মতো নিষ্ঠাবান পূজনীয় নেতাকে, তাঁর আদর্শবিচ্যুতি ঘটার অবকাশটাই বা কোথায়! লাঞ্ছনা কম সইতে হয় নি তাঁকে এ-বাবদে, সহকর্মীদের হারাতে হয়েছে, দল ছাড়তে হয়েছে, ক্ষমতার শীর্ষ ছুঁতরণ বিলম্বিত হয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে অনেকখানি। কিন্তু সবই হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন মহামায়াপ্রসাদ, তাই বলে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে পারেন নি, রাজ্যের বিনিময়েও না।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন মহামায়াপ্রসাদ, রাজনীতির চেয়ে খেলাধুলোর দিকেই ঝোঁক ছিলো বেশি। খেলোয়াড় ও শারীরিক কসরতের জন্যে বিস্তর পুরস্কারও পেয়েছিলেন, বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ডঃ রামমূর্তির চেলা ছিলেন তিনি। কিন্তু মদনমোহন মালব্যের ছাত্র হয়ে দেশসেবা করবেন না, রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন—তাও কি কখনো হয়! কলেজের শেষ বছরে মহামায়াপ্রসাদ ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাজার ছাত্রের সঙ্গে লবণ সত্যাগ্রহে। এর পরে ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর জেলার তিনিই তো নেতা।

একবার যদি সেবকের ভূমিকা নিয়েছেন, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কাজে হাত দিয়েছেন তো মহামায়াপ্রসাদকে বাধা দেবে কে? সরকার, কভি নেহী! জেলে গেলেন, একবার দু'বার নয়, বার বার, নির্যাতনে নিপীড়নে আরো শুদ্ধ হলেন তিনি, মনের মধ্যে যদি কোনো সংশয় থেকে থাকে, জেলের পরিবেশ দেখে, জাতীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে সে-সব ধুয়েমুছে গেলো। জেলা কংগ্রেসকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়ে। এই নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বিহার রাজ্য ছিলো কংগ্রেসের একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ, এবং বিহারকে কংগ্রেস-মনা করার জন্যে মহামায়াপ্রসাদের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ তিনি কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে ১৬

মহামায়াপ্রসাদ

বছর তাঁর জেলায় থেকে গেলেন ওই প্রেসিডেন্ট পদে, তারপর ১৯৪৭ সালে বিহার প্রদেশ কংগ্রেসেরও সভাপতি হন। এ-আই-সি-সি'র সদস্যপদ অবশ্যি তাঁর জুটেছিলো অনেক আগেই। বিহার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতির পদ নেবার পর ওই কেন্দ্র থেকে পার্লামেন্টেরও সদস্য।

বিহার কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার কৃতিত্ব যদি হয় মহামায়াপ্রসাদের, তবে এ-রাজ্যে কংগ্রেসের পতন ত্বরান্বিত করার উদ্যোগও তাঁর। দুর্নীতির দুষ্ট বীজ প্রবেশ করেছিল রাজ্য কংগ্রেসে, নেতারা হয় চোখ বুজে তাকে সমর্থন করেছেন, নয়তো গায়ে মাখতে চান নি নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে। কিন্তু সে-ভয় যাঁর নেই, তিনি চুপ করে থাকবেন কোন্ যুক্তিতে? সহকর্মীদের সঙ্গে এই নিয়ে বিরোধ বাধলো মহামায়াপ্রসাদের, সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেন। তা হোন, তবুও তিনি ক্ষমতা রাখতে গিয়ে মেকিয়াভেলিজমকে বরদাস্ত করতে পারবেন না। ১৯৫১ সালে মহামায়াপ্রসাদ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে নতুন দল গঠন করলেনঃ কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। এই দলের টিকিটেই ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস-প্রার্থীকে পরাজিত করে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কৃষক মজদুর প্রজা দল যখন সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পি-এস-পি দল বলে পরিচিত হলো, মহামায়াপ্রসাদ তখন বিহার রাজ্য পি-এস-পি'র চেয়ারম্যানের পদ পেলেন। এই পদে থেকেই তিনি ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বিহারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিন্‌হার দক্ষিণহস্ত হিসাবে পরিচিত শ্রীমহেশপ্রসাদ সিন্‌হার চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জেলা সারণ ছেড়ে তাঁকে মজঃফরপুর আসতে হয়েছিল মহেশপ্রসাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে। সেদিন মহেশপ্রসাদের পরাজয় শ্রীকৃষ্ণ সিন্‌হারই পরাজয় সূচিত করেছিল।

কিন্তু যে-কারণে তিনি কংগ্রেস ছেড়েছিলেন সেই উপদলীয় কোন্দল দেখে মহামায়াপ্রসাদ একদিন পি-এস-পি'ও ছাড়লেন, আবার ফিরে গেলেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চেষ্টা করলেন তিনি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার কাছে গেলেন প্রতিকার চাইতে, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কামরাজের সাহায্য সহযোগিতা-প্রার্থী হলেন। বিহার মন্ত্রিসভা যে ক্রমাগত দুর্নীতি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে ঘুণ ধরেছে, তার প্রতি মহামায়াপ্রসাদ কেন্দ্রীয় সরকারের ও নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার শেষ চেষ্টা করলেন, ব্যর্থ হয়ে আবার তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হলো, গড়লেন নতুন দল—জনক্রান্তি দল।

কংগ্রেস ছেড়ে মহামায়াপ্রসাদ কি ভুল করেছেন? মনে হয় না। দেশ দলের ঊর্ধ্বে, বিশেষত যে-দলের সর্বাঙ্গে কর্কট-ক্ষত, যে-নেতৃত্ব নির্জস্বার্থকে দেশ ও দলের ওপরে স্থান দেয় তকে মেনে নেওয়া আর বিষধর সর্পের সঙ্গে মিতালী করা একই কথা। কংগ্রেসের ঘর আজ গুরুতর ভাঙনের মুখে, কিন্তু কংগ্রেসত্যাগীরা সংগঠিত না হলে আবার তো কংগ্রেসী দুঃশাসন চেপে বসবে। নতুন দল গঠিত হলো ভারতীয় ক্রান্তি দল, আর তার সভাপতির পদ বাবু মহামায়াপ্রসাদ ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কে দাবি করতে পারেন?

অবভাস

চন্দ্রগুপ্ত

কোন্ কবি যেন লিখেছিলেন 'জ্যৈষ্ঠের জাতক আমি বৃষ্টিহীন বিশ্বের তৃষ্ণাকে বুকে নিয়ে আছি।' আজ থেকে সাতষট্টি বছর আগের জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশতম দিনটিতে যে-কবি মর্ত্যধূলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে উপরের উক্তিটি আজ নিদারুণ আক্ষরিক-ভাবেই সত্য। নজরুল ইস্‌লাম বৃষ্টিহীন বিশ্বের তৃষ্ণার বেদনা-নির্বাক প্রাণমূর্তি।

সার্থক শিল্পী জন্মদুঃখী, বিষাদ তার নিত্যসহচর। বিপুল সংসারের জনতায় সে নির্জন, বন্ধুদের মধ্যে নিরবলম্ব। আপাত-চোখে নজরুল 'বিদ্রোহী'-খ্যাত জনতার কবি, কিন্তু একাধিক সময়েই তিনি নির্জন শিল্পী। মহাশ্বেতার বীণার সুরে যাকে তিনি খুঁজে বেড়ান, চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে তার অধিষ্ঠান। সেই সুদুর্লভাকে না-পাওয়ার বেদনাই কবির মূলধন, তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী। তাঁর চোখের জল যখন কারো চোখে পড়ে তখন তিনি বলেন ঃ

কি হবে জানিয়া বলো
কেন জল নয়নে

নজরুলের অন্যতম জনপ্রিয় এই গান আপাতচোখে মানব-মানবীর প্রেমের গান। কিন্তু আরেকভাবে অন্যতর বিচারে সংসারের তাবৎ সাধারণের প্রতি পৃথিবীর সব অসাধারণ শিল্পীর এই বেদনাগর্ভ উক্তিই যেন শেষ উচ্চারণ ঃ 'কি হবে জানিয়া' বলো কেন জল নয়নে।'

*

আপাতত নজরুল বোধশক্তিহীন। আমি কিন্তু বলি অন্য। অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন বলেই নজরুল আজ নির্বাক। নৈতিক সামাজিক সর্ববিধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিল্পীরা চিরবিদ্রোহী, কিন্তু সেই অন্যায় যখন চারদিক থেকে অক্টোপাশের মতো একটি দেশ ও কালকে বেঁধে ফেলতে থাকে, সার্থক কবি তখন নীরবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাতের নামে বজ্জাতির ধর্মের নামে ধর্মান্ধতার অনেক ঊর্ধ্বের নজরুল কবিদৃষ্টিতে হয়তো দেশ-বিভাগ, রক্তপ্লাবন, হিন্দুস্থান পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের নিত্য বিবাদ, অপশাসন, দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর সেই কারণেই হয়তো দুঃখে-ক্ষোভে রুদ্ধবাক্ হয়ে গেছেন।

*

যে-কালে নজরুলের আবির্ভাব ও প্রতিভার বিচ্ছুরণ, বাঙালী সাহিত্যিক তখন আজকের তুলনায় অনেক বেশি সাহিত্যপ্রাণ ছিল, মানুষ হিসাবে অনেক বেশি সৎ ও আন্তরিকতা-সম্পন্ন ছিল। নিজেদের মুখ সম্পর্কে কোন দুর্বলতা ছিল না বলে তাঁদের মুখোশ পরার প্রয়োজন হতো না। কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা তাঁরা করতেন। সবার উপরে ছিল সহমর্মিতা, উপচিকীর্ষা, বন্ধুপ্রীতি। অন্তত অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোলযুগ' পড়ে তাই মনে হয়।

কিন্তু আজ? 'কল্লোল'-পরবর্তীদের কথা ছেড়ে দিলাম, সেদিনের 'কল্লোল-যুগের' সাহিত্যিকরাই কি তাঁদের আদর্শে সংলগ্ন থেকেছেন, অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন কি মানুষের মৌল মহত্ত্ব, অন্যভাবে মানবিক মূল্যবোধগুলি? তা না হ'লে পরবর্তীকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ যে দুই সাহিত্যিক বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার দীপ্র বর্ণনায় 'কল্লোলযুগে'র অনেকগুলি পাতা প্রোজ্জ্বল, তাঁদের একজন কেন আরেক-জনকে নিজের গল্প চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে খবরের কাগজে চিঠি লিখতে যান? অভিযোগকারী স্বয়ং একজন বিখ্যাত বিদেশী লেখকের গল্প চুরি ক'রে একদা-ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে (অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্য অনুসারে) চৌর্যবৃত্তির জন্য যখন দায়ী করেন, তখন সমস্ত বিষয়টি কৌতুকপ্রদ শুধু নয়, তাঁর মতো অন্যান্য 'কল্লোলিত' সাহিত্যিকদের চরিত্র সম্পর্কেও সন্দিহান ক'রে তোলে।

তা না হ'লে যে-নজরুল তাঁদের বন্ধুমণ্ডলীতে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, যে-নজরুলের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল তাঁদের অনন্য সম্পদ, নজরুলের জন্য তাঁরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন? বঙ্গ-সংস্কৃতির চূড়াপ্রতিম লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুমানভাজন এই প্রবীণ কবি ও কথা-সাহিত্যিকরা সত্যিই যদি নজরুলকে ভালবাসতেন, নজরুলের সহমর্মী হতেন, তা হ'লে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে সেই প্রকাশককে তাঁদের রচনা ছাপতে দিতেন না, যে-প্রকাশক ১৯৩০ সালে মাত্র দু' হাজার টাকায় নজরুলের দু'শ কবিতা ও গানের ক্রেতাকে এবং সেই তারিখ থেকে অদ্যাবধি বিস্তর মুনাফা করা সত্ত্বেও যে-ক্রেতা কবিতা ও গানগুলির স্বত্ব ছাড়ছেন না। প্রকাশক বেঁচে থাকে লেখকের দাক্ষিণ্যে, নজরুলের তথাকথিত বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আজ জনপ্রিয়, খ্যাতিমান ও প্রতিপত্তিশালী। আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা যদি উক্ত প্রকাশকের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তবে নজরুলের ঐ দুঃশো রচনার অবিলম্বে রাহুমুক্তি ঘটবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বোধহয় ঘটবে না। কারণ এ দেশের নাম বাংলাদেশ, যে-দেশের সাহিত্যসংসারের নোংরামিতে আহত রবীন্দ্রনাথের মতো দেশ-প্রেমিককেও অনেক দুঃখে বলতে হয়েছিল ঃ 'যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়।' কেন এ ধারণা হলো সে কথা বলছি।

কয়েক বছর আগে আধুনিক কবিদের শীর্ষস্থানীয় একজন আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। উক্ত সংকলনে তিনি নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী'র অংশবিশেষ, 'ভাঙার গান' এবং 'দুরন্ত বায়ু পুবরৈঞা' এই চারটি রচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। সংকলনের প্রকাশক জানতে পারেন, রচনাগুলির মধ্যে 'ভাঙার গান' বাদে তিনটিরই স্বত্ব জনৈক মহিলার। প্রবাসিনী এই মহিলার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে একাধিক চিঠি লেখা হলো, কোন চিঠিরই উত্তর এলো না। এমন কি, এই চিঠির মধ্যে রেজিস্টার্ড চিঠি ডাকঘরের 'নট ফাউণ্ড' মন্তব্যসহ ফেরৎ এলো। অগত্যা নজরুলের বিখ্যাত কাব্যসংকলনটির (যাতে 'বিদ্রোহী' ইত্যাদি আছে) বিখ্যাভতর প্রকাশকের সাহায্য প্রার্থনা করা হলো। বিস্তর উপরোধ অনুরোধেও তাঁর মন গলানো গেল না। আলোচ্য আধুনিক কবিতা-সংকলনটির উদ্যোগী প্রকাশক তখনও হাল ছাড়েন না। গেলেন কয়েকজন খ্যাতিমান ও প্রতিপত্তিশালী সাহিত্যিকের কাছে, সমস্যা সমাধানে যাঁদের হস্তক্ষেপের উপর তাঁর কিছু আশা-ভরসা ছিল। যে-কারণেই হোক, ঐ সাহিত্যিকরা নজরুল রচনার প্রবীণ প্রকাশক মহোদয়কে নবীন প্রকাশকের হয়ে সামান্যতম অনুরোধও করলেন না। নবীন প্রকাশক উদ্যোগী শুধু নন, দুঃসাহসীও। মামলায় ঝুঁকি বহন করে 'বিদ্রোহী' আদি তিনটি রচনাই ছাপালেন। তাঁর আশা ছিল, বাঙালী সাহিত্যিক, বাংলাদেশের সংবাদপত্র, বাঙালী বুদ্ধিজীবী, বাঙালী তরুণ লেখকবৃন্দ তাঁর পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত আশা চূর্ণ হলো, যখন

অত্যন্ত দ্রুত এবং সহজভাবে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল, তিনটি রচনা ছাপানোর জন্য তাঁকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৬০০৲ গুণে দিতে হলো (পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এই রচনা তিনটির জন্য নজরুল পেয়েছিলেন ৩০৲ টাকা)। এবং অধিকন্তু ঐ তিনটি রচনা বই থেকে বাদ দিতে হয়েছিল।

উপরি-বর্ণিত এই সাংস্কৃতিক দুর্ঘটনার কথা খুব কম লোকই জানেন। প্রাথভযশা আধুনিক কবি-কৃত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন থেকে নজরুলের তিনটি বিশিষ্ট রচনা বাদ যায়, অথচ কোন বাঙালী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেন না। পরন্তু শুনেছি, কেউ কেউ এতে উল্লসিত বোধ করেছিলেন। তাই বলছিলাম, এ দেশ বাংলাদেশ, অন্যায়কে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা এ দেশের জনগণের মজ্জাগত।

এ অবধি বলে থামতে হচ্ছে, কারণ নতুন একটি ভাবনার উদ্ভাসে দেখতে পাচ্ছি, নজরুলের তথাকথিত সাহিত্যিক-বন্ধুদের লজ্জা দিয়ে নজরুলের বিভিন্ন রচনার স্বত্বাধিকারী মহাজনের হাত থেকে রচনাগুলিকে উদ্ধার করার জন্য জনসাধারণ এগিয়ে আসছেন। আমি বিশ্বাস করি যে-জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিয়েছেন, সেই জনসাধারণই জাতীয় কবি নজরুলের রচনাগুলিকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের হাত থেকে উদ্ধার করে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবেন।

*

গণতান্ত্রিক সরকার ঢিমে তেতালয় চলে, তার উপর সে সরকারের সামনে খাদ্য সমস্যার মতো সমস্যা যদি থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। অতএব আমাদের জনপ্রিয় সরকার নজরুলের রচনাবলী সংরক্ষণের দিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেবেন এমন আশা করি না। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বড় জোর কোন অনুষ্ঠানে কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে চলে যাবেন, কিন্তু কংগ্রেস সরকার প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র মতো 'নজরুল রচনাবলী' প্রকাশ করার কোন পরিকল্পনা আশু গ্রহণ করবেন কি না আমার সন্দেহ। অতএব গান-বাজনার মাধ্যমে মামুলিভাবে নজরুল-জন্মজয়ন্তী পালন না করে নজরুল অনুরাগিবৃন্দ নজরুল-জন্মদিনে কবির রচনাবলী উদ্ধারের ও সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন, এই প্রার্থনা জানাই।

নজরুল-রচনাবলী উদ্ধারের ও সংরক্ষণের কাজ কিছুটা দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ এবং এই কাজ 'নজরুল একাডেমী'র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করি। একটি সম্পাদক-মণ্ডলীর হাতে এই কাজ ন্যস্ত হওয়া উচিত। আপাতত রচনাস্বত্ব ইত্যাদির প্রশ্ন দূরে রেখে এই সম্পাদকমণ্ডলী কয়েকজন সাহিত্যকর্মীর সাহায্যে অবিলম্বে কবির সমস্ত রচনা সংগ্রহ করতে শুরু করুন। সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হলে সম্পাদনা এবং অন্তত 'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র আদর্শে এই সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। কয়েক বছরের অনলস চেষ্টায় নজরুলের সমগ্র রচনাবলী সংগৃহীত ও সম্পাদিত হলে রচনা-স্বত্ব ইত্যাদির প্রশ্ন দেখা দেবে, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বিশ্বাস; জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় তার আগেই সমস্ত আইনগত বাধা অপসারিত হয়ে যাবে।

*

এই সূত্রেই এসে পড়ে গ্রামোফোন কোম্পানী ও আকাশবাণীর প্রসঙ্গ। যেহেতু নজরুল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গীতিকার এবং সংখ্যার দিক থেকে সর্বাধিক গানের রচয়িতা (অন্যূন তিন হাজার, সম্ভবত রবীন্দ্রগীতির চাইতে কিছু বেশি গান নজরুল লিখেছিলেন), সেই জন্যই গ্রামোফোন কোম্পানীগুলির ও আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ যদি নজরুল-রচনাবলী-সম্পাদকের সাহায্য না করেন, তবে আলোচ্য সাহিত্য-কর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুজাফ্‌ফর আহমদ, নলিনীকান্ত সরকারের মতো কবির বন্ধুরা এখনও জীবিত, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, রাধারাণী দেবী, ফিরোজা বেগম, কমল দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও ধীরেন মিত্রের মতো নজরুল-গীতিবিদ এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, সুতরাং সরকার কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী না হয়ে নজরুল একাডেমী যেন অবিলম্বে নজরুল-রচনাবলী সংগ্রহ সম্পাদনের কাজে ব্যাপৃত হন। এ ব্যাপারে তাঁরা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'র নজরুল-সংখ্যা (বিশেষত গানের তালিকার জন্য) থেকে সাহায্য পাবেন। একাডেমী একালের জন্য প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের অর্থ আপাতত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। একবার কাজ শুরু করে দিলেই হলো, তারপর এক সময় কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়ে গেছে দেখা যাবে।

নজরুল একাডেমী আরও একটি কাজ করতে পারেন। পারেন কেন, পারা উচিত। নজরুলের গানের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই, কথা আর সুরের সার্থক সমন্বয়ে গীতি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর যে দু-চারটি নাম অবশিষ্ট থাকে, নজরুল তাঁদের অন্যতম। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। নজরুলের সব গান রসোত্তীর্ণ নয়, সত্য, কিন্তু এমন বেশ কিছু গান আছে, যেগুলি ভাবের গভীরতায়, প্রকাশ-ভঙ্গীর সহজ স্বচ্ছতায়, উপমা ব্যবহারের অভিনবত্বে, বাক্‌প্রতিমার মাধুর্যে, বিষয়-বৈচিত্র্যে, ছন্দ-সৌকর্যে এবং সর্বোপরি তারুণ্যের প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। সুর রচনার ক্ষেত্রেও নজরুলের দান অনস্বীকার্য। 'নির্ঝরিণী', 'রেণুকা', 'মীনাক্ষী', 'দোলনচম্পা' প্রভৃতি সুরগুলি যে নজরুলের সৃষ্টি, এ তথ্য অনেকেই হয়তো জানেন না। নজরুল নাকি একসময় বলেছিলেন, তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্যের কথা লোকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু গানে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। গানের মধ্যে নজরুল যাতে যথাযথভাবে বেঁচে থাকেন, তার দায়িত্ব 'নজরুল একাডেমী'র, অন্যভাবে আমার আপনার সকলের। 'যথাযথভাবে' এই শব্দটির উপর জোর দিতে চাই, কারণ ব্যবসায়িক কারণে এবং শিল্পীদের অমনোযোগিতার ফলে ইতিমধ্যেই কবির কথায় ও সুরে বিকৃতি ঘটতে শুরু করেছে।

*

আগামীকালই কলকাতায় এবং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নজরুলের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হবে। অনেক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানেই নজরুলের কবিতা পঠিত হবে, পরিবেশিত হবে গান, তরঙ্গিত হবে সর্বজ্ঞের বিবর্ণ ভাষণ। নজরুল কার সঙ্গে কত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এই তথ্য প্রমাণেই কেটে যাবে প্রবীণ বক্তাদের অধিকাংশ সময়। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে হয়তো চন্দ্রগুপ্তের মতো সাধারণ শ্রোতাদের উদ্দেশে ঝলমলে মঞ্চ থেকে ঝকঝকে কথা ছুঁড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র করে এই সব উৎসব, তিনি এর কিছুই জানবেন না।

জ্যৈষ্ঠের জাতক নাকি অশান্ত অতৃপ্ত উদারচিত্ত হয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ-স্পৃহা নাকি তার প্রতি রক্তকণিকায়। যে-কালে অন্যায় অসত্য ও দুর্নীতি সার্বিকভাবে দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত, যে-কালে শিল্পের উপাসনাগবর্বী সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সামান্য লাভের জন্য নির্লজ্জ হতে লজ্জা পান না, সেই কালে নজরুল ইস্‌লামের মতো মহাপ্রাণ শিল্পী মানসিকভাবে বেঁচে থাকলে প্রতি-মুহূর্তেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতেন।

সেই কালের কথা ভেবে নজরুলকে বোধশক্তিহীন রুদ্ধবাক্ করা ছাড়া প্রকৃতির গত্যন্তর ছিল না।

ভারতীয় ক্রান্তি দল

নেহরুজীর মৃত্যু এবং চতুর্থ নির্বাচন এই দুই প্রচণ্ড ধাক্কায় কংগ্রেস যেভাবে ভেঙে পড়ল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেছল যে কংগ্রেস মহীরুহ আরও আগেই ভূ-পাতিত হতে পারত, স্বর্গত নেহরুজী কোনক্রমে তাকে খাড়া করে রেখেছিলেন। এ মহীরুহের প্রকাণ্ড কাণ্ডটির ভেতর ফাঁপা হয়ে এসেছিল এবং সংগঠনের মূল-দেশের শক্তিহীনতা নয়ত রসাকর্ষণের মত ভারতের মাটিতে রসের অভাব কংগ্রেসের ভবিষ্যৎকে একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। অর্থাৎ অন্তর্দেশে কংগ্রেসের ভাঙনটা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। চতুর্থ নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে রাজ-নৈতিক ক্ষমতার অপহ্নবে ব্যাপারটা কেবল-মাত্র মোটা করে চাক্ষুষ করা গেছে মাত্র। ভারতের পাঁচটি রাজ্যের অকংগ্রেসী মন্ত্রি-সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন আজ কংগ্রেস পরিত্যাগী প্রাক্তন কংগ্রেসীরা।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ত্রিপুরা, কেরালা সর্বত্রই কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস, কেরালা কংগ্রেস, জনতা পার্টি, জনতা কংগ্রেস, জন-কংগ্রেস প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল বিভিন্ন রাজ্যের এই বিভিন্ন দলগুলিকে নিয়ে। এঁরা এককভাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস সংগঠনের বিরুদ্ধে কী আর এমন কাজ করতে পারেন। মূলত এঁদের বিক্ষোভ ও বক্তব্যে মিল আছে। এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন দেশব্রতী সংগঠন হিসেবে জনগণকে দেওয়ার মত কংগ্রেসের আজ আর কোন সম্পদ নেই। কেন-না "কংগ্রেসে না আছে সমাজতন্ত্র, না আছে গণতন্ত্র"—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। কেন-না "কংগ্রেস এখন মনিবগোষ্ঠীর দলে পরিণত"—শ্রীকৃষ্ণ মেনন। কেন-না "আত্ম-সংশোধনের মত প্রাণশক্তিও সে আজ হারিয়ে বসেছে"—ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব।

সুতরাং কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাক্তন কংগ্রেসীরা অনেকদিন থেকেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মিলিত হয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষরূপে নিজেদের খাড়া করার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে গত ডিসেম্বরেই দিল্লীতে কংগ্রেসত্যাগী রাজ্য সংস্থাগুলি একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে নিখিল ভারত জন-কংগ্রেস গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন সর্বসম্মতিক্রমে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয় নি।

নির্বাচনের পর এই রাজ্যদলগুলি আশাতীতভাবে জনসমর্থন লাভ করে পুনরায় সম্মিলিত হওয়ার আশু প্রয়োজন অনুভব করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে পাটনায় বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের পৌরোহিত্যে আর একটি সম্মে-

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে শ্রীমোরারজী দেশাই ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখা যাচ্ছে

লনে সমবেত হয়ে ভারতীয় ক্রান্তি দল নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। আশা করা যায় এবারের প্রচেষ্টা হয়ত দিল্লী সম্মেলনের মত প্রস্তাব গ্রহণেই শেষ হবে না। এই সম্মেলনে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীহুমায়ুন কবির সর্বভারতীয় দল গঠনের মূলে আদর্শবাদের লক্ষ্য ছাড়াও অদূর-ভবিষ্যতে ক্ষমতালাভের যে আশ্বাস তুলে ধরেছেন, প্রাক্তন কংগ্রেসীদের একজোট করার পক্ষে সেই আশ্বাস কম শক্তিশালী নয়।

শ্রীকবির কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল সম্পর্কে বেশ কিছুকাল গভীর আস্থা পোষণ করছেন। তিনি মনে করেন, ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার ভেঙে পড়বে এবং একটি অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেবে। সুতরাং বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসত্যাগীরা যদি ইতিমধ্যেই একটি সর্বভারতীয় দল গঠন করে ফেলতে পারেন তাহলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা তাঁদেরই করায়ত্ত হবে।

পাটনা সম্মেলনে কবির সাহেব সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে সকলকে এক হয়ে কংগ্রেসের সমকক্ষ একটি রাজনৈতিক দল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন তাই। তাঁর বিশ্বাসঃ চতুর্থ নির্বাচন প্রমাণ করেছে জনগণ কংগ্রেসের গণস্বার্থ-বিরোধী কর্ম-সূচী আর অনুমোদন করেন না। তাঁরা কার্যত কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন এবং ভারতবর্ষের জনগণ যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক উপায়েই গণস্বার্থ-বিরোধী যে-কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব।

তা ছাড়া, বিগত নির্বাচন একমাত্র মাদ্রাজের ডি এম কে ছাড়া এককভাবে কোন দলকেই অনুমোদন দান করে নি। এই নির্বাচনী রায়ই প্রমাণ করে যে কংগ্রেসকে যেমন জনগণ চায় না, তেমনি কোন বাম-পন্থী দলের প্রতিও তাঁদের পূর্ণ আস্থা স্থাপিত হয় নি। এজন্যই দেশ আজ তেমন একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিকে চাইছে, যে শক্তি গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতি করায়ত্ত প্রশাসনকে উৎখাত করতে সক্ষম হবে।

কংগ্রেসত্যাগীদের ক্রান্তি দল সেই উদ্দেশ্যেই একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান

গঠনে উদ্যোগী। পাটনা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবও একই লক্ষ্যকেই ঘোষণা করেছে। প্রস্তাবের মুখবন্ধে বলা হয়েছেঃ

এই সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যগণ (পূর্বোল্লিখিত রাজ্য সংস্থাগুলি এবং যোগদানকারী অন্যান্যরা) সামাজিক ন্যায়-বিচার এবং গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাস রাখে। ক্ষমতাসীন দল ও সরকার স্বাধীনতালাভের পর ঐ সমুদয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে জনগণের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়েছে।

তাই পাটনা সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যবর্গ ভারতে একটি গণতান্ত্রিক সামাজিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে। শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শোষণমুক্ত সমাজ গঠনই হবে লক্ষ্য।

সেই উদ্দেশ্যেই 'ভারতীয় ক্রান্তি দল' নামে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করছেন সম্মেলন।

ক্রান্তি দলের বর্তমান কর্মসূচী হবে, দুর্নীতি ও দমনমুক্ত একটি সমাজ গঠন যেখানে প্রশাসনিক কর্তারা হবেন সাধু এবং সত্যকার কর্মক্ষম। যেখানে মানুষের মূল প্রয়োজনগুলি মেটানো এবং কর্ম সংস্থানের আশু বন্দোবস্ত করা হবে।

সামাজিক ন্যায়বিচার কিন্তু সমাজবাদ নয়

পাটনা সম্মেলন কিন্তু কার্যত এক-একটি কংগ্রেসী সম্মেলন অপেক্ষা কোন বিশেষ নতুনত্বের নজীর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বললে ভুল হবে।

এই সম্মেলনেও সমাজতন্ত্রবাদ, বা আরও নরম করে যাঁরা ভাবতে ভালবাসেন তাঁদের উচ্চারিত সংজ্ঞা অনুসারে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কিম্বা প্রস্তাবে তার উল্লেখমাত্র রাখতে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। কংগ্রেস অনেক ঢক্কানিনাদ সহযোগে সমাজবাদের কথা অবশ্য প্রকাশ করে থাকে। ক্রান্তি দল, অন্তত সেই চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করতে উৎসাহ বোধ করে নি। তাঁরা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজের কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদী বা সমাজবাদী সমাজ গঠনের উল্লেখমাত্র রাখতে ভীষণ আপত্তির আওয়াজ শুনেছেন বৃদ্ধ কংগ্রেসত্যাগীদের পক্ষ থেকে।

সমাজবাদী সমাজ গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

মহারাষ্ট্রের শ্রী ভি পি নায়ক প্রথম দিবসের অধিবেশনে নিম্নোদ্ধৃত মর্মের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেনঃ

"আমরা বিশ্বাস করি যে সর্বপ্রকার অবিচার ও শোষণমুক্ত একটি সমাজবাদী সমাজ গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। সে সমাজে প্রত্যেকটি মানুষ দেশোন্নতির পুরো এবং সমান অংশীদাররূপে সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।..."

প্রস্তাবটি চোদ্দ-সদস্যক একটি কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য দেওয়া হয় এবং অবস্থা বিশেষে বেশ বোঝা যায় প্রস্তাবটির ভাগ্য নিতান্তই মন্দ।

ডঃ পি সি ঘোষ ব্যক্তিগতভাবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

অতঃপর শ্রীকবিরের ওপর একটি খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের ভার পড়ে। বলা বাহুল্য, এই খসড়া প্রস্তাবে 'সমাজবাদী সমাজে'র স্থলে 'গণতান্ত্রিক সমাজ' এবং 'ক্রান্তি' শব্দের পরিবর্তে 'নব-ভারত' শব্দাবলী রক্ষা করা হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সদস্যবর্গ সতর্ক করে সভায় এই কথাই

শ্রীহুমায়ুন কবির

বলতে চান যে, দেশের সাধারণ মানুষের মন আজ সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকেছে। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি একনিষ্ঠ। সুতরাং সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন কোন দলই আর জনমন জয় করতে পারবে না। অবশেষে তরুণ নেতৃত্ব বৃদ্ধ বক্তব্যকে খানিকটা কায়দা করতে পারে এবং শ্রীমহামায়াপ্রসাদ ও শ্রীকবিরের মধ্যস্থতায় তীব্র বাদানুবাদ অবসিত হয়। প্রস্তাবের মুখবন্ধে (পূর্বে উদ্ধৃত) 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' ও 'ক্রান্তি দল' বজায় রাখা হয়। শ্রীদত্তমজুমদার তাঁর তীব্র সমালোচনায় এক সময় বলেন যে, যদি এই রাজনৈতিক সংস্থাকে একটি গান্ধী সেবা-সঙ্ঘে কিম্বা গৌতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় তবে তার দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।

শ্রীমহামায়াপ্রসাদ ও শ্রীকবিরকে ধন্যবাদ, তাঁরা উদ্যোগী হয়ে মধ্যস্থতা করে একটি তিক্ত-বিরোধের অবসান করেছেন। কিন্তু এহো বাহ্য। কংগ্রেস ঠিক যে বিরোধ বুকে করে আজ জনগণের আস্থা হারিয়েছে, ক্রান্তি দলও যদি সেই পুরাতনীকেই তরুণ সচেতন ভারতের বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে উদ্যোগী হন তবে শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীই বলবেন, পণ্ডশ্রমে লাভ নেই, গণমুক্তির বাসনা ঐখানেই শিকেয় তুলে রাখা হোক। আচার্য কৃপালনী, শ্রীআবদুল গনি এবং ডঃ ঘোষের মত প্রাজ্ঞ বর্ষীয়ান নেতাদের বোধ হয় কালের গতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীকৃপালনী তো তাঁর কিষাণ-মজদুর-প্রজা পার্টির ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা জানেনই এবং আজ শ্রীকৃপালনী নিজের রাজনৈতিক জীবনকেও একটি চরম দক্ষিণী দলের ভাব-ভাবনার স্পর্শ থেকে বাঁচাতে পারেন নি। কালের উপযুক্ত সংস্কার প্রয়োজন।

এই পাটনা শহরেই শ্রীকৃপালনী প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের নেতারূপে নয়, আজ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিরূপে এই পাটনা শহরেই আবার এসে দাঁড়াতে হয়েছে। কিষাণ-মজদুর-প্রজা পার্টি গণহৃদয় জয় করতে পারে নি। এই ব্যর্থতা বারম্বার আসতে পারে যদি কালের দাবিকে স্বীকৃতি জানাতে পুরাতন ভাব-ভাবনা অক্ষম হয়।

শ্রীকৃপালনী বলেছেন, তিনি তিন মাসে দুটি নির্বাচনের সম্মুখীন হয়েছেন, সেটাই তাঁর তারুণ্যের যথেষ্ট লক্ষণ। শ্রীকৃপালনী হয়ত নির্বাচনে জয়-পরাজয়টাকে অধিক গুরুত্ব দান করেন।

কিন্তু সম্মেলনে ব্যর্থ মনোরথ একজন প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন। দু-দু'টি নির্বাচনে উত্তর বম্বের মানুষরা তাঁর সমাজতন্ত্র-প্রীতিকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করান নি। কিন্তু শ্রীযুত মেনন তত্রাপি বিশ্বাস করেন, সমাজতন্ত্র ছাড়া নান্যঃ পন্থা, এবং তিনি যে ভুল করছেন না, সচেতন তরুণ ভারত তা জানে। কৃষ্ণ মেনন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, যাঁরা 'সমাজতন্ত্র' শব্দে ভীত হয়ে পড়েন তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব নেই।

আচার্য কৃপালনী

তিনি সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও ভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগদানের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি।

কংগ্রেসের সমকক্ষ দল গঠন করবার সময় এই মূল বিরোধকেই মূলত সমাধান করে নিতে হবে। অন্যথা, সন্দেহ নেই, এও একটি অন্তর্দ্বন্দ্বে মৃত দলেই পরিণত হবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যথাপূর্ব অধিবেশন

সপ্তদিবসব্যাপী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে সংগঠনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবারকার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনকে কিছুটা নতুনত্ব দান করেছে। কংগ্রেসী নেতৃবর্গও কী অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনমত ভোল পাল্টাচ্ছেন কার্যকরী সমিতির এই বৈঠকে তারও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষত এই অধিবেশনে যাঁকে কার্যত একেবারেই তৎপর দেখা যায় নি তিনি হলেন শ্রী এস কে পাতিল। পাতিল সাহেবের সমর্থকবৃন্দও নাকি মনমরা ভূমিকা নিয়ে অধিবেশনে এক পাশে সরে থেকেছেন। আর যিনি সেই আবহমানের শক্ত পথ আঁকড়ে ছিলেন তিনি ভারতের একাধারে উপ-প্রধানমন্ত্রী অন্যদিকে অর্থ ভাণ্ডারের মালিক।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার এবং সংগঠনের তরফে নেতৃস্থানীয় বক্তারা সরকারের প্রতি এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, সরকার সংগঠনের গৃহীত নীতি ও প্রচারিত প্রস্তাবের কার্যত রূপায়ণে কোনও আগ্রহ দেখান না আর সে কারণে সাংগঠনিক কর্মীদের পক্ষে সরকারের কার্যাবলী সমর্থন করে জনমত গঠনে প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

কতিপয় সদস্য আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে সরাসরি জানিয়ে দেন, বিরোধীদের ন্যায় কংগ্রেসের কর্মীরাও সরকারের কার্যকলাপে অতঃপর বিক্ষোভ জানাতে বাধ্য হবেন, যদি সরকার পার্টির গৃহীত প্রস্তাবে সমর্থাবিধান না করেন। সাংগঠনিক তরফের বক্তারা বলেছেন, কথার ও কাজের মধ্যে ফারাকই কংগ্রেসের নির্বাচনে হারার মূল কারণ। অবশ্য সরকারপক্ষ সংগঠনকে এতোদূর খবরদারি করতে দিতে নারাজ।

শ্রীজগজীবন রামকে এবার সাংগঠনিক নেতাদের দিকেই অধিকতর ঝুঁকতে দেখা গেছে। আবার শ্রীরাম এক সময় কংগ্রেসের তরুণ বামবাদী মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে একান্ত করছেন বলেও মনে হয়েছে। কৃষ্ণ মেননের শূন্য স্থান পূরণ করেছিলেন শ্রী কে ডি মালব্য। অনেক সময় শ্রীরামকে শ্রীমালব্যের পথে

শ্রীজগজীবন রাম

বিচরণশীল বলেও অনেকের সন্দেহ হয়েছে। শ্রীরামের সমর্থনে এগিয়ে আসেন শ্রীযুত স্বরণ সিং, শ্রীসিং নেহরুবাদী অর্থনীতির সমর্থক হিসেবে সম্প্রতি বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন। এদিক থেকে শ্রীযুত জগজীবন রামের ভূমিকাও তাৎপর্যমণ্ডিত বলে পর্যবেক্ষক মহলের বিশ্বাস।

প্রধানমন্ত্রীকে স্থৈর্যের সঙ্গে অধিবেশনের সতর্ক শ্রোতারূপেই দেখা যায়। বিতণ্ডায় প্রবেশ তিনি করেন নি। তবে সাংগঠনিক সুবিধা-অসুবিধার কথা ধীর আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন, যেমন কংগ্রেসের বামপক্ষীয় বক্তাদের বক্তব্যকেও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে দেখা গেছে শ্রীমতী গান্ধীকে।

শ্রীযুত দেশাই কোন ভাল কাজেই কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের দাবিকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। ভূমিরাজস্ব বিলোপ, শস্য সংগ্রহের জন্য শস্য-মূল্যবৃদ্ধি, মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি, রেশনের মূল্যমান হ্রাস—কোনটাই তাঁর মনঃপূত নয়। অর্থাৎ তিনি বাঁচার মতো অবস্থাও সৃষ্টি করবেন না, মূল্যমানকেও নামতে দেবেন না। রাজ্যগুলির 'বায়না' তাঁর কাছে অসহ্য। কিন্তু মালব্য প্রমুখ বক্তারা কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ভূমিরাজস্ব হ্রাসের প্রশ্ন কংগ্রেসই প্রচার করেছে। এখন কংগ্রেসের পক্ষেই সেই প্রচেষ্টায় বাধ সাধা সমীচীন হয় না।

এবারকার অধিবেশনে শ্রীঅশোক মেহতা, শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম প্রমুখকে সর্বাপেক্ষা তৎপর দেখা যায়। নেপথ্যে শ্রীচ্যবনের সমর্থন আছে তাঁদের প্রতি। অন্য পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোক শ্রী ডি পি মিশ্র, শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহমেদ ও শ্রীদীনেশ সিংরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ।

শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত

বিদগ্ধ-মাধব

[বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকাসহ]

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

মূল্য : তিন টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

॥ বিশ্ব সাহিত্যে বসুমতীর অবদান অর্ঘ্য ॥

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী (বোর্ড বাঁধাই)			১ম খণ্ড	৩-৫০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী	"		২য় খণ্ড	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— উপন্যাস	—	১ম —	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— "	—	২য় —	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— "	—	৩য় —	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— সাহিত্য	—	১ম —	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— "	—	২য় —	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— "	—	৩য় —	৩-০০
(কাপড় ও বোর্ড বাঁধাই)			প্রতি খণ্ড	৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী		—	১ম —	৩-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী		—	২য় —	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী		—	১ম —	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী		—	২য় —	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী		—	১ম —	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী		—	২য় —	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী		—	১ম —	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী		—	৪র্থ —	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী		—	১ম —	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী		—	২য় —	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী		—	৩য় —	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী		—	১ম —	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী		—	২য় —	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী			—	৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী			—	৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী			—	৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী			—	৩-০০
হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী			—	৩-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী			—	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী		—	৩য় —	৩-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	বোর্ড বাঁধাই —	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী	— ২য়	—	" —	৩-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	" —	৩-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী	— ২য়	—	" —	৩-৫০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-৫০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-৫০
শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-০০
শৈলজা গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	" —	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী	— ২য়	—	" —	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী	— ২য়	—	" —	৩-০০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	" —	৪-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী	— ৩য়	—	" —	৬-৫০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	" —	৩-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী	— ২য়	—	" —	৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী		—	" —	৩-০০
রামপদ গ্রন্থাবলী	—	—	(কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা)	৩-৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা, কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুদৃশ্য জ্যাকিটের প্রচ্ছাদন।)				৬-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

এমন এক পরিবর্তমান পরিবেশে নয়া আবহাওয়ায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সপ্তদিবসব্যাপী অধিবেশনে প্রথাবদ্ধভাবে বেশ কয়েকটি গাল ভরা শব্দে সমন্বিত প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

সংগঠন ও সরকারের মধ্যে যে অসহযোগিতা নেহরুযুগ থেকেই চলে আসছে এবং যে কারণে একদিন স্বয়ং নেহরুজীকেই কংগ্রেস সভাপতি করে বিরোধ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, চতুর্থ নির্বাচনের পরও দেখা গেল সেই একই তিমিরে এখনও সরকার এবং সংগঠন আমস্তক নিমজ্জিত।

যাই হোক, কংগ্রেস সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ আরও দু'জন মন্ত্রী এবং দু'জন সদস্যকে নিয়ে একটা ইভ্যালুয়েশন কমিটি গঠিত হয়েছে যে কমিটি কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তার পর্যালোচনা করবেন।

কার্যকরী কমিটির এবারকার প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে : ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। বীমা জাতীয়করণ। খাদ্য আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসার প্রবর্তন। একচেটিয়া ব্যবসার সম্প্রসারণ সংকুচিতকরণ। শহুরে জমির সর্বোচ্চ সীমা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

কথায় বলে, বেল পাকলে কাকের কী। সত্যই উচ্ছিষ্টভুক কাককুলের তাতে একটুমাত্র উৎসাহ-নিরুৎসাহের প্রশ্ন নেই। কংগ্রেসী অধিবেশনে সুপারিশ পেলে লিপিবদ্ধ হলেও তেমনি জনগণের মনে সাড়া জাগার কারণ নেই। কেন না এমনধারা প্রস্তাব ঢের হয়েছে, সাধারণ সমস্যার সুরাহাও তাতে কিছুমাত্র হয় নি। হয়রানি বরং সাংগঠনিক কর্মীদেরই। সত্যিই ধকলটা তাঁদেরই ওপর। নেতারা রাঁচী ভুবনেশ্বর যেখানেই বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রস্তাব আর সুপারিশের মালা গাঁথুন, জনগণকে কিছু করার কৃতিত্ব দেখিয়ে সামান্য মর্যাদা লাভ করবেন, কংগ্রেস কর্মীর সে সুযোগ নেই।

সেই আক্ষেপ এবার শোনা গেছে। শুভ লক্ষণ বলতে হবে।

(১৯।৫।৬৭)

হংকং হাঙ্গামা : জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ

পশ্চিম এশিয়ায় কি সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছে? আরব-ইস্রায়েলের মধ্যবর্তী বাফার এলাকা থেকে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেবার ফলে দুই দেশের সৈন্যরা এখন পরস্পরের মুখোমুখি কামান উঁচিয়ে রয়েছে, সামান্যতম ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠবে সে-কামান, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হয়ে যাবে আবার মধ্যপ্রাচ্যে।

এখানে উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছে সিরিয়ার প্রতি ইস্রায়েলের সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর থেকে। সিরিয়াকে শাসিয়ে ইস্রায়েল বলেছিলো যে, ইস্রায়েল সীমান্তে যদি আর কখনো কোনো হাঙ্গামা ঘটে, তবে সিরিয়ার ওপর সে চরম আঘাত হানবে, কারণ সে মনে করে যে ওই হাঙ্গামার জন্যে সিরিয়াই সম্পূর্ণ দায়ী। সংযুক্ত আরব প্রভৃতি আরব রাষ্ট্র জানে ইস্রায়েলের এ-হুঁশিয়ারীর অর্থ কী। অর্থাৎ ইস্রায়েল যে আবার তার শক্তির পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এটুকু বুঝতে সংযুক্ত আরব বা সিরিয়ার কোনো কষ্ট হয় নি। তাই সমস্ত সেনাবাহিনীকে সংযুক্ত আরব সরকার সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইস্রায়েল আক্রমণ করলেই তাকে পাল্টা আক্রমণের জন্যে তৈরি থাকতে বলেছেন। সিরিয়া সরকারও সেনাবাহিনীকে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিয়েছেন। সংযুক্ত আরব ও সিরিয়া ছাড়াও আরব দুনিয়ার ইরাক, জর্ডান এমন কি আলজেরিয়া পর্যন্ত সাধারণ শত্রু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্যে দ্রুত প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই কি আরব-ইস্রায়েলের মধ্যে একটা পুরোদস্তুর সংঘর্ষ বাধবে?

সত্যি বটে সংযুক্ত আরব ঝুঁকি নিতে মোটে রাজী নয়, সে স্থল, বিমান ও নৌ-বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেছে নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইস্রায়েল যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে অধিনায়ক মনোনীত করেছে। ইতিমধ্যে আরব ও ইস্রায়েলের মধ্যবর্তী বাফার এলাকা গাজা অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রসংঘবাহিনীকে সরিয়ে নেবার অনুরোধ করলে সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। ১৯৫৬ সালে এখানে ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, কানাডা ও ব্রাজিল—এই ৭টি দেশের ৩৪০০ সৈন্য রাষ্ট্রসংঘের অধীনে রয়েছে। কিন্তু উ থাণ্টের নির্দেশে এখান থেকে রাষ্ট্রসংঘের পতাকা অপসারণ করা হয়েছে, গাজা অঞ্চলে এখন প্যালেস্টাইন মুক্তিফৌজ শিবির স্থাপন করেছে। সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আরবের প্রতিরক্ষা-চুক্তি রয়েছে, তাই সিরিয়া আক্রান্ত হলে সংযুক্ত আরব সে-চুক্তির মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে। অবশ্য আরব দুনিয়ায় যতই অস্ত্রের ঝনঝনানি হোক না কেন, ইস্রায়েল মনে করেন যে, সংযুক্ত আরবের সে-ক্ষমতা আছে যার জোরে সে দ্বিতীয় একটা রণাঙ্গন খুলতে পারে, কারণ তার ৭৫০০০ সৈন্য ইয়েমান প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। অবশ্য ইস্রায়েল একথাও বলেছে যে, যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে সে প্রস্তুত রয়েছে।

ইস্রায়েল সম্পর্কে আরব দেশগুলোর উষ্মা তার জন্ম থেকেই। আরব দুনিয়ার মাঝখানটিতে এই ইহুদী রাষ্ট্রের সৃষ্টি আরবেরা কখনো ভালো চোখে নেয় নি, তারা মনে করে এসেছে যে আরব দুনিয়ার সংহতি ও ভ্রাতৃত্বে ফাটল ধরাবার জন্যে এটা একটা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। প্যালেস্টাইনের আরো ক্ষোভের কারণ এখানে যে, নিজ দেশে তারা এখন পরবাসী হয়ে রয়েছে, হয় তারা উদ্বাস্তু, নয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকমাত্র। ইস্রায়েলকে সংযুক্ত আরব, ইরাক, ইয়েমেন, কুয়াইত ইত্যাদি আরব দেশ রাষ্ট্র হিসেবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি। প্রেসিডেণ্ট নাসের তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে সে একটা প্রতিবিপ্লব আনতে সচেষ্ট এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এতদিন এখানে যে ভূমিকা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই গ্রহণ করতে চাইছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া বৃটেন এক মুহূর্তও আরব ভূমিতে থাকতে সাহস করবে না। সাম্প্রতিক প্যালেস্টাইন দিবস কনফারেন্সে প্রেরিত বাণীতে প্রেসিডেণ্ট নাসের আরো বলেছেন যে, আমেরিকার সামরিক ও অর্থ-নৈতিক সাহায্য না পেলে ইস্রায়েল একদিনও টিকে থাকতে পারতো না। জর্ডান, সৌদি আরব এবং টিউনিসিয়াকে লক্ষ্য করে প্রেসিডেণ্ট নাসের বলেছেন যে, মার্কিন ছত্রচ্ছায়া সরিয়ে নিলে ফৈজাল, হুসেন কিম্বা বরগুইবা কি জনতার সম্মুখীন হতে পারবেন?

ইস্রায়েলের মতলব সম্পর্কে আরব-রাষ্ট্রগুলির মনে সংশয় ও সন্দেহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইস্রায়েলও সংযুক্ত আরবের ওপর আক্রমণ হেনেছিলো। গত বছরের নভেম্বর মাসেও ইস্রায়েল জর্ডানের সামু অঞ্চলকে অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো। সিনাই আক্রমণ করে ইস্রায়েল যে সাফল্য অর্জন করেছিলো, তাতে নিজের শক্তি সম্পর্কে তার অতি-আশাবাদিতা জন্মে গিয়েছে। অবশ্য, নিজের শক্তির ওপর ভরসা করেই যে ইস্রায়েল এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইছে তা নয়, বৃটেন, আমেরিকা পশ্চিম জার্মানীকে মুরুব্বি পেয়েই ইস্রায়েল ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, আরব দুনিয়ার নাকের ডগায় তুড়ি বাজিয়ে চলেছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে সরাসরি সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবুও মার্কিন অস্ত্রে ইস্রায়েলের অস্ত্রাগার যে পূর্ণ একথা কে না জানে? আমেরিকা পশ্চিম জার্মানীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে ইস্রায়েলে। পশ্চিম জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে কোটি কোটি টাকা ইস্রায়েল পেয়েছে তাই দিয়ে সে ফ্রান্সের কাছ থেকে প্রচুর মিরাজ—৩সি বিমান কিনেছে, যে-বিমানের গতি শব্দের চেয়েও তিনগুণ দ্রুত এবং ছ'মিনিটের মধ্যে ৩৬

হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে এই মিরাজ—৩সি'ই ইস্রায়েল বিমানবাহিনীর শক্তির কেন্দ্রস্থল। তার ওপর মার্কিনী ডগলাস স্কাইকে তো পাচ্ছেই।

কিন্তু এত শক্তিশালী এবং সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ইস্রায়েল সজ্জিত হলেও দীর্ঘ-স্থায়ী যুদ্ধ করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ প্রথমত শক্তির দিক দিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। আর সব সহযোগী রাষ্ট্রকে বাদ দিয়েও একা সংযুক্ত আরব আয়তনে ইস্রায়েলের চেয়ে ৭০ গুণ বড়, তার জনসংখ্যা ৩০০,০০০,০০ আর ইস্রায়েলের জনবল মাত্র ২০,০০০,০০। তাছাড়া, সোভিয়েট রাশিয়ার দৌলতে সংযুক্ত আরবের অস্ত্রবল নিতান্ত তুচ্ছ নয়, মিগ বিমানও তার হাতে যথেষ্ট রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সিরিয়া আক্রান্ত হলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে বলে জানিয়েও দিয়েছে। কারণ সোভিয়েট রাশিয়া ও সিরিয়ার মধ্যে তফাৎ সামান্যই, মাঝখানে তুরস্ক দেশটা মাত্র। কাজেই সিরিয়ার ওপর আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়া নিশ্চিন্ত থাকে কী করে।

তবে একথা কে না জানে যে, সত্যি-কারের যুদ্ধ ইস্রায়েল কখনই সুরু করতে পারে না তার মুরুব্বিদের অনুমোদন না পেলে। এক ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকা হিমসিম খাচ্ছে। আবার নতুন করে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা সংকটাপন্ন মার্কিন অর্থনীতির সাধ্যে কুলোবে কিনা সন্দেহ। কূটনীতির দিক থেকেও সে একাজ করতে পারে না, কারণ সে ক্ষেত্রে আরব দেশগুলোয় তার বাণিজ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। ব্রিটেন সৌদী আরব ও জর্ডান নিয়েই ব্যস্ত, আর ফ্রান্স আমেরিকা-ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইস্রায়েলকে সাহায্য করবে বলেও মনে হয় না। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন চলছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা প্রসঙ্গ নিয়ে। সেখানে আরব ইস্রায়েল প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া যদি ইচ্ছে করে তবে পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার প্রশমন করা যাবে, আর ওরা যদি চায়, তবে আগের মতো ঠাণ্ডা লড়াই চলবে।

হংকং ঃ

গত সপ্তাহে এখানকার চীনা অধি-বাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের যে হাঙ্গামা বেধেছিলো, মাঝে একদিন তা খানিকটা শান্ত হলেও খোদ চীনের মদৎ পেয়ে আবার তা বেড়ে চলেছে। হংকং একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ। কিন্তু এখানে লক্ষ লক্ষ চীনার বাস। চীনারা এখানে পুরুষানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অফিসে-আদালতে কাজ করে আসছে। কুলুনের একটা প্লাস্টিক কারখানায় হাঙ্গামার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। চীনা শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এই অভিযোগে চীনা শ্রমিকেরা কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কর্তৃপক্ষ হাঙ্গামা দমনের জন্যে পুলিশের সাহায্য নিলে শ্রমিক-অসন্তোষ তীব্র রূপ ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের যে সংঘর্ষ হয় তাতে উভয় পক্ষে ৫০—৬০ জন করে আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অনেক চীনা শ্রমিক-কর্মচারী এবং সাংবাদিককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

নাসের

কিন্তু তাতে চীনাদের দমন করা যায় নি, বরং তারা গভর্নর স্যার ডেভিড ট্রেন্স-এর কাছে ৫-দফা এক দাবিপত্র নিক্ষেপ করেছে যেখানে ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়েছে তাঁরা হংকং কর্তৃপক্ষের "ফ্যাসিস্ট আক্রমণ" বন্ধ করার নির্দেশ দিন, সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক, আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক ইত্যাদি।

চীনা অধিবাসীদের সঙ্গে হাঙ্গামার খবর পেয়ে চীনা লালরক্ষীরাও তৎপর হয়ে উঠেছে। ওরা ইতিমধ্যেই পিকিঙে এবং সাংহাইয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। লক্ষ লক্ষ লালরক্ষী এখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ব্রিটিশ-বিরোধী স্লোগান তুলেছে। লালরক্ষীরা ব্রিটিশ চার্জ দ্য অ্যাফেয়ারের বাসভবন আক্রমণ করে ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং অফিস তছনছ করেছে। বিদেশী দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ অবশ্যি চীনে এই প্রথম নয়, এর আগে সোভিয়েট যুগোশ্লাভ এবং ফরাসী দূতাবাস লালরক্ষীদের লক্ষ্যস্থল হয়েছিলো, কিন্তু দূতাবাসে জোর করে ঢুকে পড়ার ঘটনা এই প্রথম।

শুধু লালরক্ষীরাই নয়, চীন সরকার স্বয়ং বেরিয়ে এসেছেন হংকং-এর চীনা অধিবাসীদের সমর্থনে। চীন সরকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, চীনা অধিবাসীদের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা হবে না হংকং কর্তৃপক্ষের কাছে এ-দাবিও করা হয়েছে যে, অবিলম্বে চীনা অধিবাসীদের সমস্ত দাবি-দাওয়া যদি মেনে নেওয়া না হয় তবে চীন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চীন সরকার একই [illegible] প্রতিবাদলিপি বা বিবৃতি বিশ্বের উদ্দেশ্যেও প্রচার করেছে।

চীনের দেখাদেখি হংকং-এর চীনা অধিবাসীরাও তাদের দাবি আদায়ের জন্য [illegible] কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছে এবং তারা এখানকার সরকারী অফিস, গাড়ি দোকান ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। গভর্নর ট্রেন্সের কাছে চীনা অধিবাসীরা যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেছে তা অনেকটা ম্যাকাও-এর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে সেখানকার চীনা অধিবাসীরা যেমন দিয়েছিলো সেই ধরণের। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ চীনাদের দাবি সম্পূর্ণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ এখানকার চীনা ব্যবসায়ীরা পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে যেভাবে বয়কট করে চলছিলো তাতে এখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিলো। হংকং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চীনের আর একটি ক্ষোভ হলো তাদের ধারণা হংকং কর্তৃপক্ষ উপনিবেশটিকে মার্কিন বিমান-ঘাঁটিতে পরিণত করতে চায় এবং পুরো-পুরিভাবে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে চায়। এতে চীনের ভয় হলো, হংকং বিমানঘাঁটির পুরো সুযোগ নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার পক্ষে আমেরিকার খুব সুবিধে হবে। আপাতত হংকং-কে আমেরিকা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে বিমানঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রিটেন কি পর্তুগীজকে অনুসরণ করে চীনাদের দাবি সব মেনে নিতে বাধ্য হবে, না চীনের সঙ্গে একটা আপোষ-রফায় আসবে?

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

পড়াশুনা

(ত্রয়োদশ অধ্যায়)

বাল্যকালে গ্রামের স্কুলে

(১)

মাকে ও আমাদের তিন ভাইবোনকে বাবা তেলিরবাগে রেখে আসবেন এই স্থির হোলো। এর আগে যখন কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়েস বড় জোর দেড় বছর এবং খুকী তখনো জন্মায়ই নি। সুতরাং কোন রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় গিয়েছিলাম তা আমার একটুও মনে ছিল না। তা-ই এবারে আবার দেশে যাওয়া হবে শুনে আমরা এবং বিশেষ করে আমি খুব খুশি হয়ে যাবার দিন গুণতে লাগলাম। তখনো কলকাতা কর্পোরেশনে চেয়ারের হাতলে চাদর বেঁধে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ার রেওয়াজ আসে নি। সুতরাং বাবাকে অপেক্ষা করতে হোলো কবে দিন কতক ছুটি একসঙ্গে পাওয়া যায়। অবশেষে বড়দিনের ছুটি এসে পড়লে মাকে ও আমাদের তিন ভাইবোনদের নিয়ে বাবা রওনা হলেন। শুনলাম যে সে রেল গাড়িটার নাম গোয়ালন্দ মেল। বাক্স বিছানাপত্তর বেঁধে একটা ঠিকে গাড়ির মাথায় বোঝাই করে বাবার সঙ্গে আমরা গেলাম রেল স্টেশনে। শুনেছিলাম যে স্টেশনের নাম শিয়ালদহ। স্টেশনে গাড়ি থামতেই কুলীরা এসে গেল মালপত্তর নিয়ে গাড়িতে তুলে দেবার জন্যে। সারাটা স্টেশনে সে কি মানুষের ভিড়, ঠেলাঠেলি এবং উজ্জ্বল আলো! আমরা গিয়ে উঠলাম একটা গাড়িতে। সেটা নাকি ইন্টার ক্লাস—দেড়া ভাড়া। জিনিসপত্র বেঞ্চের তলায়, মাথার উপরে ও বাঙ্কে সাজিয়ে রাখা হলো। আমার কেবলই মনে হতে লাগল গাড়ি কেন ছাড়ছে না—দেশে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে যে। অবশেষে একটা বাঁশির আওয়াজ হতেই গাড়ির দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি দূরে একটা সবুজ বাতি। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ওটা নাকি সিগনেল, গাড়ি ছাড়বার ইঙ্গিত। ওটা না জ্বললে নাকি গাড়ি ছাড়ে না। গার্ডের হুইসিল বাজল—আস্তে আস্তে গাড়ি এগুতে লাগল এবং তার গতিবেগও বাড়তেই চলল। যত দূর মনে আছে বাড়ি থেকে খেয়েই এসেছিলাম। মা বললেন—'খোকা, শুবি আয়।' আমার ইচ্ছে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকি। কিন্তু অন্ধকার রাত—কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে গাড়ি না থেমেই দু' একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। ক্রমে দেহ মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বেশ কনকনে হাওয়ায় শীত শীত বোধ হলো। মায়ের বসবার জায়গার পাশেই কোনরকমে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়লাম। খুকী গুগু'র তখন অর্ধেক রাত। কতক্ষণ ঘুমলাম জানি নে। হঠাৎ বাবা ঠেলে বললেন, 'খোকা, ওঠ।' গা মোড়ামুড়ি দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে দেখি ভোর হয়েছে আবছায়া রকমে অর্থাৎ রোদ ওঠে নি কিন্তু আকাশের রঙ পাতলা হয়ে এসেছে। ক্রমশ পাতলা সাদা ধোঁয়ার মত মেঘ যেন ছড়িয়ে রয়েছে। শুনলাম আমরা গোয়ালন্দে এসে গেছি। এখানে রেল থেকে নেমে স্টিমারে চাপতে হবে। স্টিমারের কথা শুনেই মনটা লাফিয়ে উঠল এবং তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে নিলাম। দূরে পদ্মা নদী দেখা যাচ্ছিল।

গাড়ি থামলো আবার লোকের ভিড়—কুলীর ঠেলাঠেলি। গাড়ি দাঁড়িয়েছে এমন একটা জায়গায় যেখানে প্ল্যাটফরম বলে কিছু ছিল না। নদীর পারে বালির উপরে ট্রেন এসে থেমেছে। গাড়ি থেকে মাটি বেশ খানিকটা নিচে। নামতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল যাত্রীদের। যাই হোক, যাত্রীরা দেখলাম তা গ্রাহ্যই করছিল না। নেমেই পাঁই পাঁই করে ছুটছিল জাহাজঘাটের দিকে তাড়াতাড়ি গিয়ে জায়গা দখল করবার জন্যে। আমরাও যথাসম্ভব তাড়া-হুড়ো করে চললাম ভিড়ের পেছন পেছন। বাবা মাল মাথায় কুলীদের সামলাচ্ছিলেন। জাহাজের কাছে এসে দেখি কতকগুলি চওড়া চওড়া তক্তা ফেলে শক্ত করে বেঁধে পাড় থেকে জাহাজের গা পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই উপর দিয়ে যাত্রী ও কুলী ঠেলাঠেলি করে জাহাজে উঠছে। মার কোলে গুগু, আর খুকী ধরেছে বাবার হাত। মা আমার বাঁ হাতটা তাঁর ডান হাতে শক্ত করে ধরে তক্তার উপর দিয়ে প্রায় টেনেই নিয়ে এলেন জাহাজের উপরে। এখন কেমন বলতে পারি না, তখনকার দিনে জাহাজের একতলায় যাত্রীদের বসবার জায়গা থাকত না। যাত্রী-দের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নিজ নিজ ক্লাশে যেতে হতো। জাহাজের সামনে খানিকটা খোলা ছাদ এবং তার পেছনেই দুই লাইন ঘর—মাঝখানে পথ। শুনলাম ওগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের থাকবার কামরা। মাঝখানের সরু পথ দিয়ে খানা কামরায় আসা যেতো। জাহাজের পেছনে আর একটা সিঁড়ি ছিল। সেইখান দিয়ে উঠে মস্ত বড় ডেকটায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জায়গা এবং দু' একটা খাবারের স্টলও ছিল। আমরা এসে দেখি ততীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অনেকে তারই মধ্যে তাদের পছন্দ মত জায়গায় সতরঞ্চি বিছিয়ে মাথায় একটি বালিশ বা পোঁটলা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। ইন্টার ক্লাশের যাত্রীদের জায়গা ছিল একেবারে জাহাজের দোতলার পেছনের দিকে। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে দিয়ে পাশ কাটাতে কাটাতে গিয়ে সেই পেছনের ইন্টার ক্লাশের বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। রেলিংটা ধরে তাকিয়ে দেখি যাত্রীরা তখনো আসছে এবং অনেক কুলী মাল নামিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এমন সময় জাহাজে গোটা দুই ভেঁপু বেশ জোর আওয়াজে বেজে উঠল।

অল্পক্ষণ পরেই জাহাজে ওঠবার সিঁড়ির তক্তাগুলি একে একে তোলা হতে লাগল। যখন একখানা মাত্র তক্তা বাকী তখনও দু-একটি যাত্রী তারই উপর দিয়ে ছুটে উঠে এল জাহাজে। তারপর শুনলাম তিড়িং তিড়িং কিসের ঘণ্টা। বাবা বললেন জাহাজ এইবার ছাড়বে। জাহাজের দুইপাশে জল গুলিয়ে উঠল এবং জাহাজখানি আস্তে আস্তে পাড় থেকে সরে যেতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পরেই মোড় ঘুরে সামনের দিকে চলল। আবার বাজল ভেঁপু মোটা গলায় এবং তারপরই আবার তিড়িং তিড়িং ঘণ্টা। ক্রমশ জাহাজের গতিবেগ বাড়তে লাগল এবং জাহাজের দু'পাশে যেখানে চাকা ঘুরছিল সেখানে জল ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠল। আমরা চললাম আমাদের গ্রামের দিকে।

জাহাজ থেকে দূরে দূরে কত ছোট ছোট নৌকা সাদা সাদা পাল তুলে চলেছে। বাবা বলে দিলেন সেগুলি জেলে ডিঙি, মাঝিরা মাছ ধরে বেড়ায় নদীতে। জাহাজ কখনো যায় নদীর মাঝখান দিয়ে কখনো যায় বালির চরের ধার দিয়ে। আবার কখন ঢেউ তুলে চলে একেবারে উঁচু পাড়ের পাশ দিয়ে। শুনলাম যেখানে নদীর পাড় ভাঙে—সেখানে না কি খুব গভীর জল থাকে। উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ের তাদের মায়ের কোলে উঠে অথবা মায়ের হাত ধরে আমাদের জাহাজটাকে দেখছিল। কেউ বা তার আঙুলটি দিয়েছে তার মুখে, কেউ বা হাতছানি দিয়ে আমাদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করছিল। বাবা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন একতলার জাহাজের মাঝখানের খোড়লটার মধ্যে যেখানে এঞ্জিন সবেগে ঘুরে চলেছে তা দেখাতে। খুকী সঙ্গে গিয়েছিল কি না মনে নেই। ভীষণ গরম ছিল ঘরটা। শীতের দিনে বেশ আরামই লাগছিল। জানালা বলে কিছু ছিল না। মস্ত বড় তিনটে কি চারটে ঘোড়ার মাথার মত ভারি লোহা উঠছিল আবার ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল এবং সেই ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা জাহাজের মাঝখান দিয়ে জাহাজের দু'পাশে যে দুটো প্রকাণ্ড নাগরদোলার মত চাকা ছিল তাদের ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। বাবা বুঝিয়ে দিলেন কি করে জাহাজ চলে। এমন সময় আবার বেজে উঠল তিড়িং তিড়িং। চমকে উঠলাম। বাবা হাত দিয়ে দেখালেন এঞ্জিনের উপরে ঝুলছে দু'টা গোল দেয়াল ঘড়ি চকচকে পিতলের বাক্স। তাতে কি কি সব লেখা ছিল। আর ছিল একটা না দু'টা কাঁটা। যেই তিড়িং তিড়িং ঘণ্টা বাজে অমনি কাঁটাটা একজায়গা থেকে ঘড়ির আর এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। খালাসীরা আবার ঘড়ির তলায় একটা কি ঘুরিয়ে দেয়। বাবা বলে দিলেন যে জাহাজের উপর থেকে সারেঙ না কি ওই ঘণ্টা বাজিয়ে নিচের খালাসীদের নির্দেশ দেন পঞ্জিন জোরে বা আস্তে চালাতে হবে কিংবা আগে বা পিছনে চালাতে হবে এবং সেই সংকেত পেয়ে খালাসীরা একটা কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে সারেঙকে জানিয়ে দেয় যে তারা সারেঙ-এর নির্দেশ বুঝতে পেরেছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এঞ্জিনের ঘোড়াগুলির ওঠাপড়া দেখছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সেই গরম ঘরটা থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় এলাম সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার জন্যে। এমন সময় দেখি একটা খালাসী মোটা একটা দড়ির আগায় একটা ভারি ধরণের কি জিনিষ বেঁধে সেটা সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে এবং জাহাজ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে তুলে ফেলে "বাঁও" না কি যেন বলেই আবার সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে লোকটা কি মাছ ধরছে না কি? বাবা হেসে বললেন—'না, জল মাপছে। দেখছে জাহাজ যাবার যথেষ্ট জল আছে কি না।' এই খালাসীর জল মাপাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল।

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় দুপুরে নাগাদ জাহাজটা আস্তে আস্তে ভিড়ল একটা ফ্ল্যাটের পাশে। শক্ত করে বড় কাছি দিয়ে জাহাজটা বাঁধা হোলো ফ্ল্যাটের বড় বড় বেঁটে থামের সঙ্গে। তারপর আবার চওড়া তক্তাগুলি জাহাজ থেকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে বেঁধে সিঁড়ি করা হোলো। আমরা তারপাশা বা লৌহজঙ্গে পৌঁছলাম। কত ফিরিবালা পাতক্ষীর, গোল গোল ক্ষীরা ও গুড় নিয়ে উঠল জাহাজে বিক্রি করতে। আমরা সেবার গোয়ালন্দের জাহাজের বিখ্যাত মুরগীর কারি আর ভাত খাইনি—তখন তার খবরও আমি জানতাম না। মা সঙ্গে যে খাবার এনেছিলেন তা-ই আমরা খেলাম। ফ্ল্যাট থেকে একটা নৌকায় নেমে সবাই বসলাম। জাহাজটা আবার ভেঁপু বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল। আমাদের নৌকাও ছাড়ল। নৌকায় এর আগে যে চড়েছিলাম তা মায়ের কোলে বসে। এবার বড় হয়ে এই প্রথম নৌকায় চড়লাম। ভয় যে করছিল না তা বলতে পারিনে। তবে চলন্ত নৌকায় বসে জলে হাত দিতে ভারি স্ফূর্তি হয়—শীতকালের নদীর জল যতই ঠাণ্ডা হোক। এসে পড়লাম বহরের পাশে প্রবাহিত মস্ত চওড়া খাল—নদী বললেই চলে। বহর বন্দরের বাজারে নেমে আমরা গেলাম হেঁটে বাবার সঙ্গে, আর মা বোধ হয় গেলেন ডুলীতে গুগুকে কোলে করে। আমাদের তেলিরবাগ পৌঁছতে প্রায় বেজে গেল গোটা তিন কি চার।

(২)

আমরা যখন সেবার তেলিরবাগ যাই তখন আমার বয়েস ছিল বছর পাঁচেক। সেই সময়ে ভবানীপুরে কোনো স্কুলে পড়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। বহু দিন আগের কথা। যদি কোন পাঠশালায় বা স্কুলে গিয়েও থাকি তা বোধ হয় নেহাৎ ছেলে খেলার মতই হয়েছিল। সে আমলে এখনকার মত নার্শারী স্কুল, কি মণ্টেসোরী স্কুল ছিল না। হাই স্কুলে ঢোকবার আগে পর্যন্ত টুকিটাকি পড়াশুনো বাড়িতে বসেই হোতো কোন পণ্ডিতমশায়ের কাছে। কিন্তু কোনো পণ্ডিতমশায়ের কথা আমার ত' স্মরণে আসছে না। যাই হোক যখন বাবা মাকে ও আমাদের তেলিরবাগ গ্রামে রেখে এলেন তখন আমরা মধ্যের বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলাম। যে সময় ঐ বাড়িটা খালি থাকত পশ্চিমের বাড়ির লোকেরা ঐ দোতলা বাড়িতেই উঠতেন। আমরাও সেই মধ্যের বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলাম। সেই বাড়ির দক্ষিণের বড় উঠানের উপরই ছিল তেলিরবাগের কে, এম, ডি, এম, এইচ, ই স্কুল—অর্থাৎ তেলিরবাগের কালীমোহন দুর্গামোহন হাই ইংলিশ স্কুল বাবা যার ছিলেন সম্পাদক। বয়েস হয়েছিল আমার স্কুলে যাবার। বাড়ির মধ্যেই স্কুল। সুতরাং মায়ের চোখের উপরেই থাকব এবং টিফিনের সময় দোতলায় এসে এক বাটি দুধ খেয়ে যাব। এই সব ভেবে আমার স্কুলে যাবার ব্যবস্থা হোলো। কিন্তু মার কি রকম একটা ধারণা হোলো যে শাস্ত্রমতে ছেলের একটা হাতে খড়ি দিয়ে তারপর তার স্কুলে যাওয়াই বিধেয়। এতেই মনে হয় আমি আগে স্কুলে পড়ি নি যাই হোক মা ডেকে পাঠালেন আমাদের পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ানজী কালীঠাকুরকে। দেওয়ানজী সব কথা শুনে মায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন—"হ খুবই সঙ্গত কথা। আমি সব ব্যবস্থাই কইরা দিমু। সোনা বৌমাযের কোনো চিন্তা করতে হৈব না।" কালীঠাকুর সোজা গেলেন পুরোহিত মশায়ের বাড়িতে। আচমকা এ রকম সখবর পেয়ে গদাধর চক্রবর্তী মশায় খুবই খুশি হলেন। আমার মায়ের এই রকম ধর্মবুদ্ধি দেখে তাঁর খুশি হবারই কথা। দক্ষিণার আশাটাও যে তাঁর মনের মধ্যে ছিল না তা-ই বা কে বলবে। পুরোহিত ঠাকুর অবিলম্বে মার কাছে এলেন। মা ভূমিষ্ঠ হয়ে পুরোহিত ঠাকুরের চটি জুতা থেকে বের করা পায়ের দুটি বুড়া আঙুলের ধুলো মাথায় নিয়ে চিরায়ুষ্মতী হবার আশীর্বাদ পেলেন। কি কি জিনিষ হাতে খড়ির জন্যে দরকার হবে পুরোহিত ঠাকুর

একটা ফর্দ দিলেন মাকে। অচিরে গ্রামের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল যে 'পশ্চিমের বাড়ির সোনা বৌয়ের পোলার হাতে খড়ি হৈব।' খবরটা মধ্যের বাড়ির দেওয়ানজী হরি সিং-এর কানে পৌঁছতে দেরি হোলো না। সর্বসম্মতিক্রমে তিনজন দেওয়ানজীর মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং আমার মায়ের তাঁর সংগেই পরামর্শ করে কাজটা করা উচিত ছিল। মনে এই ভাবটা থাকলেও হরি সিং পিসা মায়ের সংগে দেখা করে একটু মুচকী হেসে বললেন—'সোনা বৌঠাইন, যদি খোকার হাতে খড়ি দিবেনই তবে সে কথা আমারে কইলেই ত' ঢাকা থলে আমি ভাল পণ্ডিত আনাইয়া দিতাম। ঠাকুর-দারে দিয়া হাতে খড়ি দেওয়াইলে কেমন হৈব কে জানে।' স্পষ্টই ইঙ্গিত করলেন যে 'ঠাকুরদা' অর্থাৎ গদাধর চক্রবর্তীর লেখা-পড়ার জন্যে নাম ডাক নেই এবং তিনি, হরি সিং, থাকতে সোনা বৌঠাইন এই ভুলটা কেমনকরে করলেন। যাই হোক গতস্য শোচনা নাস্তি। মা যখন পুরোহিত ঠাকুরকে বলেই ফেলেছেন তখন গত্যন্তর নেই। হরি সিং পিসাও বললেন যে সোনা বৌঠাইন যেন কিছু চিন্তা না করেন—তিনি (হরি সিং পিসা)-ই সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। কথায় না হলেও তিনি ভাবে ভঙ্গিতে বেশ স্পষ্টই জানা-লেন যে—খোকার লেখা পড়া—সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। মুখে মুখে হরি সিং-এর এই অপপ্রচার গিয়ে পৌঁছল পুরোহিত গদাধর চক্রবর্তীর কানে। পৌঁছে দেবার লোকের অভাব গ্রামে ছিল না, কেন না হরি সিং পিসা-খুব লোকপ্রিয় ছিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর ত' শুনেই অগ্নি-শর্মা। ছুটে এলেন মায়ের কাছে। উত্তেজিতকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'হারাম-জাদা হরি সিং-এর সাহস দ্যাখছ সোনা বৌমা। তোমার মুখের উপর কথা কয়। আমি গদাধর শর্মা—আমি খোকারে হাতে খড়ি দিমু—অর কি আস্পর্ধা যে কথা কইতে আসে? তুমি দেইখ্যা রাইখো সোনা বৌমা এই আমি আউজকা কইয়া থুইলাম—আমার কাছে হাতে খড়ি পাইয়া তোমার পোলা কতদূর যায়।' ভাগ্যে সেখানে তখন হরি সিং পিসা ছিলেন না। গালাগালিটা তাই একতরফাই হয়ে গিয়ে শান্তি হোলো। বেশ ঘটা করেই নাকি আমার হাতে খড়ি হয়েছিল। পরে আমি যখন বিলেতে বেশ ভাল করে পাশ করে ফিরে কলকাতায় আইন প্র্যাকটিস করতে নেমে ক্রমশ উন্নতির ধাপে উঠছিলাম মা প্রায়ই হেসে হেসে এই ঘটনার কথাটা আমাদের শুনিয়ে শেষে বলতেন—'পুরো-হিত ঠাকুর মশায়ের কথা কি মিথ্যা হতে পারে?' বলেই আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। আমি যখন কলকাতা হাই কোর্টের জজ হলাম তখন গদাধর চক্রবর্তীমশায় এবং হরি সিং পিসা দু'জনের কেউই আর ইহজগতে ছিলেন না। যদি পুরোহিত ঠাকুর বেঁচে থাকতেন তবে তিনি হরি সিং পিসাকে যে একহাত শোধ নিতেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। হাতে খড়ির পর আমি গ্রামের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলাম।

তখন তেলিরবাগ স্কুলের হেড মাস্টার-মশায় ছিলেন শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত-মশায়। তিনি বহরের চৌধুরী বাড়ির এক সরিক সুধন্যকুমার বসুরায় চৌধুরীর ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে দেখেছি মায়ের কাছে অনেকবার। আমরা তাঁকে মাসীমা বলে ডাকতাম। তাঁদের ছেলেদের মধ্যে দু'জনকে জানতাম —জ্যোতিষ আর বিনয়। বিনয় আমার সংগে পড়তেন দেশের স্কুলে। পরে তিনি বেশ ভালভাবে পাশ-টাশ করে মাস্টারী কি ওকালতি করতেন তা ঠিক বলতে পারিনে। জ্যোতিষদাকে দেখেছি কলকাতা হাই কোর্টের দোতলার বারান্দায় হাঁটা-হাঁটি করতে। কোনো উকিলের মুহুরী ছিলেন বোধ হয়। হেড মাস্টার বলতে যে রকম জাঁদরেল কড়া লোকের ছবি মনে জাগে কামিনীবাবু সে রকম হেড মাস্টারমশায় ছিলেন না। তিনি খুব বিদ্বান ও মিষ্ট-ভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি উপরের ক্লাশে পড়াতেন। কামিনীবাবুর পরে যে সব হেড মাস্টার মশায়রা এসেছিলেন তাঁদের কাছে আমি পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে শুনেছি তাঁরা খুব নাম করা হেড মাস্টার ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল ভুবনমোহন মুখার্জি, যদুলাল চক্র-বর্তী ও আমাদের বড় পিসামশায় প্রাণহরি সেন। সে সময় স্কুলের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন মহিম মাস্টার মশায়। মহিমবাবু প্যান্ট ও গলাবন্ধ কোট পরে স্কুলে আসতেন। তিনি ছিলেন বহরের চৌধুরী বাড়ির একজন নামী সন্তান। কেউ তাঁকে পদবী ধরে ডাকত না। 'মহিম মাস্টার' বলেই তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি পড়াতেন ইংরেজী। তিনি খুব দীর্ঘ-জীবন লাভ করেছিলেন। শুনেছি মৃত্যুর সময় তিনি একশ' বছরের কাছা-কাছি পৌঁছেছিলেন। আর একজন ছিলেন তেলিরবাগ ও বহরের বিখ্যাত পণ্ডিতমশায়। কেউ বলে তাঁর নাম ছিল রাজকুমার চন্দ আবার কেউ বলে নদেরচাঁদ চন্দ। লোকে সংক্ষেপে তাঁকে ডাকত 'নদি পণ্ডিত' বলে। তিনি পড়াতেন বাঙলা। মৃত্যুকালে তিনি একশ' বছর পার হয়ে গিয়েছিলেন। তেলিরবাগে হাই স্কুল হবার আগে পণ্ডিতমশায় একটি পাঠশালা চালাতেন। বাবা যখন গ্রামে প্রাইমারী ও ছাত্রবৃত্তি পড়তেন তখন তিনি এই নদি পণ্ডিতের কাছেই পড়তেন। আমি পণ্ডিতমশায়ের ছাত্রদের দ্বিতীয় পুরুষের একজন। সেই জন্যে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বড় হয়ে যখন আমার বড় ছেলে খোকন (সুরঞ্জন) হোলো তখনও পণ্ডিতমশায় বেঁচে ছিলেন এবং পড়া-তেনও। খুব ইচ্ছে ছিল যে খোকনকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের কাছে ক'দিন পড়িয়ে আনব। কিন্তু গড়িমসি করে সে ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল। পুরোহিত পাড়ার কৌশিকবাবু অঙ্ক কষাতেন। তখনকার দিনের আর কোনো মাস্টার মশায়দের কথা মনে পড়ে না এখন।

সে সময় যে সব ছেলেরা গ্রামের স্কুলে পড়ত তাঁদের কথা কিছু কিছু আগেই বলেছি। পুবের বাড়ির মনোমোহন জ্যেঠামশায়ের ছোট ছেলে ছোটকাদাদা ও করুণা জ্যেঠামশায়ের মেজ ছেলে বটাদাদা বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছর মাত্র বড় ছিলেন। দু'জনেই যতদূর মনে পড়ে পড়তেন আমার দুই ক্লাশ উপরে। পরে দু'জনেই বোধ হয় এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থী-দের শেষদলের মধ্যে ছিলেন। হেড মাস্টার কামিনীবাবুর ছোট ছেলে বিনয় ও পুবের বাড়ির লালবিহারী জ্যেঠামশায়ের ছোট ছেলে শিবেন্দ্র পড়তেন আমার সংগে। আমাদের পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ানজী কালীঠাকুরের বড় ছেলে বীরু ও হরি সিং পিসার ছেলে কুমুদিনীকান্ত বোধ হয় আমার ঠিক উপরের ক্লাশে পড়তেন। উত্তরের বাড়ির মোহিনীদাদার ছেলে রতিরঞ্জন পড়তেন আমাদের নিচের ক্লাশে। কুমুদিনীকান্তর পুরো নাম ছিল কুমুদিনীকান্ত কর—একেবারে অনুপ্রাসের অট্টহাস্য। ছোটকাদার সংগে তাঁর খুব ভাব ছিল। ছোটকাদা তাকে অনেক সময় ঠাট্টা করে ডাকতেন কে প্রি বলে। সিকদার বাড়ির মহিম জ্যেঠার বড় ছেলে জগদীশ হোড় অর্থাৎ আমাদের জগাদা ও গোঁসাই পুজার পূজারী রামমণিঠাকুরের একমাত্র সন্তান চন্দ্রকুমারদা তখনই বেশ উঁচু ক্লাশে পৌঁছে প্রায় স্থিতি লাভ করে-ছিলেন। আর মনে আছে পুবের বাড়ির সরলদাদার ছোট ভাই প্রেমরঞ্জনদাকে।

তিনি বেশ উঁচু শ্রেণীতে ওঠবার পর হঠাৎ কি অসুখ করে ক'দিনের মধ্যেই মারা যান। প্রেমরঞ্জনদা খুব লোকপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর অকাল মৃত্যুতে গ্রাম-সুদ্ধ ছেলে বুড়ো সবাই খুব আঘাত পেয়েছিলেন মনে। এরই অল্প আগে কি পিছে মারা যান পুবের বাড়ির জিতু-কাকার স্ত্রী যাঁর কথা আগেই বলেছি। আমার শৈশবে স্বগ্রামে বাস কালে এই দুটি মৃত্যু আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

(৩)

তেলিরবাগ গ্রামে বসবাস আমার খুবই ভাল লেগেছিল। পড়াশুনাও ছিল, আবার সেই সংগে নানা রকমের আনন্দও ছিল। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে এবাড়ি ওবাড়ি ঘোরা, মেয়েদের নানা ব্রতের সুন্দর সুন্দর গল্প ও কথা মুগ্ধ হয়ে শোনা, দাঁতার না জানার জন্যে ভয়ে ভয়ে পুকুরে স্নান ও ঠাঁই জলে দাঁড়িয়ে অন্যদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া, শীতের বেলায় নাকে হাত দিয়ে হঠাৎ একটা ডুব দিয়ে গাটা গরম করে নেওয়া ইত্যাদি কাজে সময় যেন হু-হু করে কেটে গিয়েছিল। গ্রামে বাস করলে ছয় ঋতুর সৌন্দর্য সমারোহ যেমন উপভোগ করা যায় সহরে তা সম্ভবই হয় না। এই ত' আমরা এলাম শীতকালে বড়দিনের সময়। সকাল বেলায় পুকুরের উপরে উঠতে দেখলাম ধোঁয়া। হাঁ করে নিশ্বাস ফেললে বের হয় ধোঁয়া। মাঠ শুকিয়ে গেছে। পশ্চিমের বাড়ির পশ্চিমে যে খাল ছিল সেই খালটা ও তার ওপারে খেলার মাঠ খট-খটে শুকনো। সেখানে ফুটবল, ধাপসি ইত্যাদি খেলা চলত সন্ধ্যা নামা পর্যন্ত। সেই খেলার মাঠের পাশ দিয়েই চলে গেছে পায়ে হাঁটা পথ বহরের বাজারের দিকে। সন্ধ্যেবেলা থেকে গ্রামের 'ঠারাইন'রা সবতেন তাঁদের গায়ে জড়ান মোটা চাদরটার নিচে বড় মালসায় তুঁষের আগুন জেবলে। চমৎকার লাগে শীতকালে তাঁদের চাদরের ভিতরে হাত দিয়ে আগুন পোয়াতে। তারপর শীতের প্রকোপটা যে কমতে লেগেছে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল কেন না রাত্রে আর তেমন লেপ লাগে না। পুকুরের জল চিন্‌চিনে ঠাণ্ডা নেই—ধোঁয়াও যেন কমে গেছে। ওদিকে প্রত্যেক বাড়ির উঠানে ও আশে-পাশে যে আম কাঁঠালের গাছ ছিল সেই আম গাছে মুকুল দেখা দিল। দেখতে দেখতে 'আম্রমুকুল সৌগন্ধে' গ্রাম ভরে গেল। আম গাছে গুটি বাঁধল। আমরা কাঁচা আম খাবার প্রত্যাশায় ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ হয়ে রইলাম। কাঁঠাল গাছে ধরল অজস্র কসি। সেই কসিগুলি দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল। 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'—এই প্রবাদ বাক্যটা তখনো শিখি নি।

তার উপর হতে লাগল শ্রীপঞ্চমী পুজোর আয়োজন। মধ্যের বাড়ির দক্ষিণের বড় উঠানটাতেই আমাদের স্কুল। তারই উত্তর-পুব দিকে পুজামণ্ডপ। কুমারেরা লেগে গেল সরস্বতী প্রতিমা গড়তে। আমি জন্মেছিলাম জ্যেঠামশায় ভুবনমোহনের বাড়িতে। দুর্গামোহন ও ভুবনমোহনরা ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে প্রতিমা পুজো দেখি নি। কিন্তু গ্রামের এই পৈত্রিক ভিটায় তাঁরা এই সব পুজা-পার্বণ বন্ধ করেন নি। গ্রামের গরীব লোকেরা তাই পুজো-পার্বণে আনন্দ করতে পারতেন। তা' ছাড়া স্কুলে সরস্বতী পুজো না হলে গ্রামের ও আশে-পাশের এতগুলি ছেলে কোথায় অঞ্জলি দেবে? আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রতিমা গড়া দেখতাম। দেখতে দেখতে বাঁশের কাঠামে পাঁক মাটিতে গড়া প্রতিমার দেহ-সৌষ্ঠব বের হতে লাগল। তখনো কুমারেরা দেবীর মাথাটি বসায় নি। আগে দেবীর হাত-পা ও গা'টা গড়া হয়ে গেলে কুমারেরা মাথাটা গলার উপর বসিয়ে দিল। তারপর এলো রঙের ঘটা। দেখতে দেখতে প্রতিমার চোখ-মুখ-কান ফুটে বের হতে লাগল। কি টানা টানা চোখ, গায়ে নির্মল শ্বেতবরণী রঙ। তারপর এল ঘন কালো চুল। মাথায় উঠল মুকুট, গলায় হার, হাতে কঙ্কণ, কানে কুণ্ডল। ঝলমল করে উঠল প্রতিমাখানি। শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে বেজে উঠল ঢোল আর কাঁসি ও সানাই। মা আমাকে বেশ সকাল সকাল স্নান করিয়ে ফরসা জামা পরিয়ে দিলেন। ধুতিখানা বোধ হয় বাসন্তী রঙে ছোপানই ছিল। সেজেগুজে মধ্যের বাড়ির দোতলা থেকে নেমে গেলাম পুজামণ্ডপে। আমার মত আরো অনেকগুলি গুঁড়ো গুঁড়ো ছেলেরা তার আগেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে জমা হয়েছিল। পুরোহিত ঠাকুর মশায় ছেলেদের আলাদা আলাদা দল করে দাঁড় করালেন। তারপর এক এক দল ছেলেদের প্রতিমার সামনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি কি দুটি গ্যাঁদা ফুল দিয়ে বললেন, 'আমার লগে লগে মন্তর পড়বি'। অর্থাৎ তিনি যেমন যেমন কথাগুলো বলবেন আমাদেরও তা-ই বলতে হবে। তিনি আস্তে আস্তে টেনে টেনে কেটে কেটে মন্ত্র বলতে লাগলেন আর আমরা সমস্বরে প্রতিধ্বনি করে যা বললাম তা' একটানা লিখলে খানিকটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল মনে স্মরণ হয়—

"ত্বং ত্বং সরস্বতী নির্মলবর্ণে
রতন বিভূষিত কুণ্ডল কর্ণে;
শিরে জটা গজমতি হার
দেবী সরস্বতী বিদ্যার ভার
লাগ লাগ বিদ্যা মোর কণ্ঠে লাগ"

মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলি দিয়ে আমরা ভক্তিভরে বীণাপাণি দেবীকে প্রণাম করে ঠাকুরমশায়ের পায়ের কাছে যে যা পারে একটি, দুটি কি চারটি পয়সা রেখে নরে দাঁড়ালাম। তারপর সুরু হোলো আর একদলের অঞ্জলি দেওয়া। এই রকম ক্রমান্বয়ে সব ছেলেরা পালা করে অঞ্জলি দিল।

গ্রামের ছোট মেয়েরা আমাদের স্কুলে অঞ্জলি দিতে এসেছিল বলে মনে পড়ে না। তখনকার দিনে ছেলে স্কুলে মেয়েরা আসত না এবং মেয়েদের লেখা-পড়ার তেমন তাগিদও হয় নি। তবে নদি পণ্ডিতমশায়ের বাড়িতে তাঁর শিক্ষিতা কন্যা ছোট মেয়েদের জন্যে একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। তেলিরবাগের মেয়েরা হয়ত সেখানে গিয়েই অঞ্জলি দিয়েছিল। যাই হোক, অঞ্জলি দিক বা নাই দিক সে সব মেয়েরা যে সকাল সকাল স্নান সেরে এলোচুলে বাসন্তী রঙের শাড়ির বাহার দিয়েছিল তা' একটু একটু এখনো মনে আছে। বাসন্তী রঙের কাপড়ে সেজে ছেলে-মেয়েরা বসন্ত কালকে আহ্বান করে নিয়ে এলো।

[৪]

চৈত্র মাস শেষ হয়ে এলো প্রায়। আমরা তখন তেলিরবাগে পুরানো হয়ে গিয়েছি। এপ্রিলের মাঝামাঝি পুকুর ধারে একদিন হঠাৎ জগঝম্প তালে ভীষণ জোরে বেজে উঠল জয়ঢাক। সে কি আওয়াজ! কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? ছুটে চললাম পুকুর পাড়ে। গিয়ে দেখি বেশ ক'জন লোক সমাগম হয়েছে। দু-তিন্‌জন লোক পুকুরে নেমে ডুব দিচ্ছে আর কি যেন খুঁজছে। কেউ জলে ডুবে গেল নাকি? আমি ত' ভয়ে কাঠ। শীগগিরই দেখি সেই ডুবুরিরা ভেসে উঠল হস্ত লম্বা ও বেশ মোটা ও লম্বা একটা কাঠ, গ্রাম্য ভাষায় যাকে আমরা বলতাম "খম", তাই টেনে পাড়ের কাছে এনে ফেলেছে। নতুন উদ্যমে জয়ঢাক আবার বেজে উঠল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওই জিনিসটা গাজনের গাছ। ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা তখন। তারপর সেই গাজনের গাছকে উপরে তুলে এনে খোলা জায়গায় একটা গর্ত করে পোঁতা হোলো এবং তার উপরের দিকটায় একটা কাঠের দু-তিন ধাপ সিঁড়ির মত একটা জিনিস যার দু'পাশের কাঠের মধ্যে ফুটো ছিল সেইটে বসিয়ে দিয়ে তার

মধ্যে গোটা তিনেক বাঁশ এক সংগে শক্ত করে বেঁধে বাঁশের দু'দিকের আগায় মোটা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। শুনলাম যে ঐ দড়িতে বেঁধে গাজনের সন্ন্যাসীদের ঘোরান হবে। প্রাচীন দু-একজন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বললেন যে, তাঁদের আমলে, ঐ দড়ি দু'টার শেষে দু'টা প্রকাণ্ড বঁড়শির কাঁটার মত জিনিস থাকত এবং সেই কাঁটা দু'টা সন্ন্যাসীদের পিঠের চামড়ার মধ্যে ফুটিয়ে সন্ন্যাসীদের ঘোরান হোতো। আমার সেকথা শুনে ভয়ে গা শিউরে উঠল দেখে বৃদ্ধেরা বললেন—"আইজ কাউলকার মাইনষের সে ধর্মজ্ঞান নাই, সবই তারা সহজ কইরা নিইছে। তাই বঁড়শি না বিঁধাইয়া ছোকড়ারা প্যাটে ঐ দড়ি বাইন্ধাই ঘুরপাক খায়, ছ্যাঃ।" বৃদ্ধদের মানসিক অসন্তোষ প্রসূত ঐ "ছ্যাঃ" ধ্বনি সত্ত্বেও আমি যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।

তারপর থেকেই আরম্ভ হোলো সন্ন্যাসীদের আনাগোনা ও মাঝে মাঝে "মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম ব্যোম" চিৎকার। ভাল করে চেয়ে দেখি সন্ন্যাসীরা গ্রামের ও আশে-পাশের চেনা ছেলেরাই। তারা চুলে তেল না দিয়ে, রঙিন কাপড় পরে এমন ভোল বদলিয়েছে যে প্রথমটা তাদের চিনতেই পারি নি। মেলা বসে গেল গাজন-তলায় চড়ক বা নীল পূজার দু'দিন আগে থেকেই। কত রকমের সুন্দর সুন্দর জিনিস বেচা-কেনা হচ্ছে। পাঁপড়ভাজা ও মিঠাই-মণ্ডা কত কি খাবার জিনিস। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল একদল লোক পট নাচিয়ে। সে এক মজার ব্যাপার। প্রত্যেক বছর চড়কের সময় এরা নানা রকম পট চিত্রিত করে এবং সেই ছবির বিষয়-বস্তু নিয়ে গান বানায়। একজন একটা লম্বা উঁচু সরু বাঁশের আগায় একটা পট ঝুলিয়ে ধরে থাকে আর একজন একটা সরু লাঠি দিয়ে সেই পটের ছবির দিকে দর্শকদের নজর আকর্ষণ করে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান করে। প্রত্যেক বছর নতুন পট আঁকা হয় এবং নতুন গান রচনা করা হয়। এই ছড়ার গান রচনায় বেশ কৃতিত্ব লাগে। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এই সব ছড়া খুবই সময়োপযোগী হয় এবং তা' শুনতে খুবই মজা লাগে। এতে অনেকের সম্বন্ধে ঠাট্টা ও বিদ্রূপও প্রচ্ছন্নভাবে করা হয়। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে পট নাচিয়ে পয়সা সংগ্রহ করে সন্ন্যাসীদের খরচ চলে। তাদেরও ত' সংসার চলা চাই।

তারপর এলো চড়কের দিন। সন্ধ্যা হতে না হতেই চড়ক ঘুরতে লাগল। দু'জন করে সন্ন্যাসী সেই বাঁশের আগায় বাঁধা দড়িটা আপন আপন পেটে বেঁধে ঝুলতে থাকে হাত-পা সোজা ছড়িয়ে দিয়ে। নিচ থেকে সেই সিঁড়ির সংগে বাঁধা দড়িটাকে ধরে কয়েকজন লোক খামটার চারদিকে ঘুরতে লাগল আর সংগে সংগে ওপরে বাঁশের আগায় দড়িতে ঝোলান সন্ন্যাসী দু'জনও ঘুরতে লাগল। ক্রমশ ঘোরার গতি-বেগ বেড়েই চলল এবং সন্ন্যাসী দু'জন আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে কত রকম কায়দা দেখাতে লাগল। নিচে যে সব সন্ন্যাসী ছিল তারা সমস্বরে বলতে লাগল—'মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম ব্যোম'। সেই 'মহাদেব মহাদেব' রবে গাজনতলা মুখরিত হয়ে উঠল। এই চলল রাত দুপুর পর্যন্ত। বাড়ি থেকে ঘন ঘন মায়ের তাড়া আসায় আমার এই সব লোমহর্ষক কার্যাবলীর শেষ না দেখেই বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরতে হোলো। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম—কিন্তু মনের মধ্যে রাত দুপুর পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে লাগল সেই গাজন গাছে ঘূর্ণায়-মান সন্ন্যাসী দু'টির চেহারা—ভয় হতে লাগল পাছে ছিটকিয়ে পড়ে। আর কানে বাজতে লাগল সেই—'মহাদেব, মহাদেব, ব্যোম ব্যোম' ধ্বনি। তখন বুঝি নি যে এই চড়কের ঘূর্ণি আরো একটা মস্ত বড় ঘূর্ণির প্রতীক মাত্র—যে বড় ঘূর্ণির টানে ঘুরে চলেছে দিন, মাস বছরগুলি অবিরামগতিতে এবং যার আবর্তে পড়ে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে চলেছে আমাদের এই পৃথিবীটাকে সজীব সুন্দর করে রাখতে।

[ক্রমশঃ]

সেরা
সওদা

রোভার সাইকেল যে কোন পথে স্বচ্ছন্দে চলার জন্যই তৈরী। যেমন ঝকঝকে চেহারা, তেমনি আছে সব রকম ধকল সইবার শক্তি। আর তাই রোভার সাইকেলের উপর লোকের এত আস্থা। আজকের একটি অতি জনপ্রিয় সাইকেল।

ROVER রোভার

এভারেষ্ট সাইকেলস লিমিটেড

মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা-১
রেজিষ্টার্ড-অফিস ও ফ্যাক্টরী—গৌহাটী
কেবলস্ এভসাইকেলস্ঃ কলিকাতা; রোভারঃ গৌহাটী

EC/12

নজরুল কাব্যপ্রসঙ্গ

নন্দিতা ভৌমিক

কাজী নজরুল ইসলাম আজ নিঃশব্দ। শুনতে পাচ্ছি শুধু তাঁর অস্ফুট বাণীর দীর্ঘশ্বাস। দেখতে পাচ্ছি, মনের ছন্দের তাড়নায় তাঁর সৌনমুখর মুখের গভীর ব্যাকুলতা।

পরাধীন ভারতের স্বাধীনচিত্ত কবি আজ যদি জানতেন, বুঝতেন তাহলে দেখতে পেতেন—তাঁর ঈপ্সিত স্বাধীনতা ইংরেজ সাম্রাজ্য শক্তির হাত থেকে আমরা গ্রহণ করেছি।

বিদেশী শক্তি সাগরপাড়ি দিয়েছে এখন বৈদেশিক বাণিজ্য তরীগুলিকে দানেব উপকরণেই ভর্তি দেখা যায়। তবু এদেশ থেকে দারিদ্র্য যায় নি। কোটি কোটি লোক আজ নিরন্ন। স্বাধীনতা লাভের পর এই অবস্থার মধ্যে নজরুল-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশি। কারণ বহিঃশত্রুকে বিদায় দিলেই দেশোদ্ধারেব কাজ সম্পূর্ণ হয় না; দেশ গঠনের কাজ পরিপূর্ণ হলে, দেশেব সমগ্র মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থা এবং লাঞ্ছনা ও ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা পেলে, দেশেব ওপর সকলের অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হয়। নজরুল তাঁর ফরিয়াদ কবিতায় শুধু স্বদেশেব মানুষের কথাই বলেন নি, পৃথিবীর সর্বহারা মানুষের স্বপক্ষে বলেছেন :

'সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধা সম জল,
পাখীর কণ্ঠে গান,—
সকলেব এতে সম অধিকার, এই
তাঁব ফরমান—'

সারা পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত না জনগণের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততোদিন নজরুলের কাব্য নিপীড়িত প্রাণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেই। যে-সব ইনটেলেকচুয়াল নজরুলকে তথাকথিত সাময়িক কালের কবি বলে এখনই নস্যাৎ করতে তৎপর তারা বর্তমানকালে মৃত বুদ্ধুদের কবরখানার ওপর পরমানন্দে ফুল ফোটাতে থাকুক—কিন্তু সে ফুলের চারা বিদেশী নষ্ট সাহিত্য থেকে আমদানীকৃত—এটাই দেশের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের কথা। নজরুল নিজেই বলেছেন, "যাঁরা ইন্‌টেলেকচুয়াল, তাঁদেব আমি জন-সাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বলি না।" (জন-সাহিত্য : ১৩৪৫) আমরাও বলি না। তবে দেশের মানুষের বক্তব্য :

আদি রিপুর মাস্তুল প্রচার করার স্পর্ধা যারা বিদেশী অর্থপুষ্ট হয়ে যেভাবে দেখাচ্ছে তা চুরমার করে দিতে হবে। নজরুল প্রমুখ কবিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যও তাদের সুপরিকল্পিত। লেখনীর পরিবর্তে তাই তারা বেশির ভাগ মৌখিক প্রচার চালাতে চায় দেশময়। তবে দৌড় বেশি দূরে নয়;...কফি হাউস পর্যন্ত। তবু এদের সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের সমগ্র সাহিত্যকে সর্বমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রসঙ্গত কিশোর বয়সে কবির রচিত পল্লীর লেটো দলের জন্য পালাগানগুলিও স্মরণীয়। নিরক্ষর কৃষকদের কাছে এই সব পঙক্তি উত্তেজনাময়,—

"লাগাও যান প্রধান ফসল
তরকারী কলাই সকল
দাও সময়-মতো জল
যাতে প্রাণ বাঁচে তার॥
অরি হতে ফসলে
রক্ষা কর সকলে;
নজরুল ইসলাম বলে—
নইলে বাঁচা হবে ভার॥"
('চাষার সঙ' নাটক)

কবি নজরুল ইসলামের কবিতার জগৎ সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ দুইদিকেই তাঁর কবিতায় বিধৃত। একদিকে ছন্দোবদ্ধ কাব্য, আর একদিকে তাল-লয় সমৃদ্ধ গান। এই গানই নজরুলের সাহিত্য-জীবনের এমন এক সৃষ্টি যার আবেদন সমকালের এবং দূরকালের মানুষের কাছে সমানভাবে গৃহীত হবে। নজরুল নিজে বলেছেন—"সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই; তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।" রবীন্দ্রনাথের পর সঙ্গীতের বিশাল রাজ্যে প্রবেশ নজরুল ছাড়া আর কার পক্ষেই বা সম্ভব হয়েছে? জনৈক একচক্ষুবিশিষ্ট কবি-সমালোচকও বলতে বাধ্য হয়েছেন—"শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি—পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান লেখেন নি। কথাটা অসম্ভব নয়—শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমাসে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন করে যাচ্ছিলেন—প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান হাসির গান—সব রকম। সে সব গান বোধ হয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয় নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না। নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে বেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই করে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-কোমল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ সে কবি শুধু বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা এমন কি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর।"

এই সমালোচক অবস্থান্তরে স্বমতের বিপর্যয় ঘটালেও নজরুল সম্পর্কিত মন্তব্যের কোনো রকম পরিবর্তন ঘটান নি। তবু একদল—যারা আসল কবিদের নস্যাৎ করার চেষ্টায় নিজেদের পদ্যের ঢাক বাজাচ্ছে, তাদের জানা উচিত: 'বিদ্রোহী,' 'সাম্যবাদী' বা 'সর্বহারা'র কবি নজরুল যদি আগামীকালে স্বীকৃতি না পান তাহলে তাঁর গানই তাঁকে যুগন্ধর কবির মর্যাদা দেবে। কিন্তু যারা আজ নিজেদের সোচ্চার প্রচার চালাচ্ছে তারা না করছে কবিতা সৃষ্টি, না লিখতে পেরেছে হৃদয় নিংড়ানো একটা গান। অর্থকরী পদ্য লেখকদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা উপরি উদ্ধৃত গুরু-বাক্য পাঠ করুন।

তবে নজরুল নিজের সম্বন্ধে 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ বলেছেন :

"বর্তমানের কবি আমি ভাই,
ভবিষ্যতের নই 'নবী',
কবি ও অ-কবি যাহা বলে মোরে
মুখ বুজে তাই সই সবি?"

নজরুল-এর কবি সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—একথা আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। সেই কারণে বলতে দ্বিধা নেই, নিজের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে এ কালের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিরোধীদের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। আর আগামীকালকে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

"যেদিন আমি হারিয়ে যাব
বুঝবে সেদিন বুঝবে,
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায়
আমার খবর শুধাবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে
ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি
সাগর আকাশ বাতাস চিরি'
যেদিন আমায় খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!
... ...
গাইতে বসে কণ্ঠ ছিঁড়ে
আসবে যখন কান্না,
বলবে সবাই—"সেই যে পথিক,
তার শেখানো গান না?"

কবির জন্মদিনেরই বাসরে তাঁর শেখানো গান শুনতে শুনতে শেষের দুই পঙক্তির কথাই কি আমাদের মনে হয় না? এটাই হয়তো ব্যক্তিজীবনের 'অভিশাপ'। তবু সেই গান শুনেই আমরা এগিয়ে চলি সত্যকে লাভ করতে;—সে-সত্যেরই অনুসন্ধান করেছেন কবি তাঁর কাব্যে সাহিত্যে। আমরা যদি সত্যানুসন্ধানের পথিক হই, তাহলে নজরুলকে করবো আমাদের প্রিয় সঙ্গী। কেউ কেউ বন্ধুর বেশে আমাদের সতর্ক করছেন,—ঐ পথ সত্যর পথ নয়, ঐ কাব্য খাঁটি নয়। আমরা বলি ঃ এই পথই জীবন-সংগ্রামের পথ। আত্মপ্রবঞ্চনা যদি না থাকে নিজেদের মধ্যে—তাহলে এই কাব্যই সমস্ত ফাঁকি থেকে উদ্ধার করে আমাদের নিয়ে যাবে আলোকের দ্বারপ্রান্তে, যেখানে—

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান্,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ,
অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে
তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

চুলের স্বাভাবিক আভা ফিরিয়ে আনুন

কেয়ো কার্পিন

শুধু চক্‌চকে করে রাখলেই তো আর চুল ভাল থাকবেনা· তার জন্যে চাই সত্যিকারের যত্ন

কার্পিন

মেখে দেখুন

কেয়োকার্পিন তেল আপনার চুলকে শুধু উজ্জ্বলই করবেনা—তার মূল পর্য্যন্ত গিয়ে চুলে নতুন স্বাস্থ্য সঞ্চার করবে। এর মৃদুগন্ধ সারাদিন আপনার শরীর মন ঝরঝরে রাখবে। আজই মেখে দেখুন

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

Dey's

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী
মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটী • কটক
জয়পুর • কানপুর • সেকেন্দ্রাবাদ
আম্বালা • ইন্দোর

প্রতিভাষণ

(১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনা-সভার সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের পর জাতির পক্ষ থেকে 'নজরুল-সম্বর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ' কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেন মিঃ এস ওয়াজেদ আলী। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিম্নলিখিত 'প্রতিভাষণ' দান করেন। কবির প্রত্যুত্তরের পর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে কবির স্বদেশী সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধমূলক কবিতার প্রশংসা করে এক বক্তৃতা দেন।)

বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে' দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে' নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে' উঠ্‌লো! নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বল্‌তে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্তত আজকের দিন যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্তত আজকের দিন তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়ত সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের—যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশি করেই স্মরণ করছেন;—ফুল ফোটানোর চেয়ে হুল-ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ!

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশি রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পান্‌সে বন্ধুত্বর চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধুলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন, এবং এই দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয় নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটিমাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন!.....

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্তত তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো মানুষ। কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসি নি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। পড়-পড় বাড়িটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার, যে ঐ পড়-পড় বাড়িটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারি নি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র—

"Beauty is truth, truth beauty."

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারি নি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটে নি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই!—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে-পাকে বাঁকে-বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দূল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব!

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে', নির্লিপ্ততা দেখে'। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছি বলেই কবি। বনের পাখী নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে বলে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান,

সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টে এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।...

যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই বলে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে ফুল-মেলার নও-রোজে আমায় খরিদ্দার রূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজ-মহলের ধ্যান-মূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহ-জাদা খুর্‌-রমের মতই আমার চোখে তাদের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখি নি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি, যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধ-কূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি, ও-দু'টোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত-মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটি-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেন না, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।.....

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে যে লো-বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভে যাবে, আমিও মরব। কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয় তা' হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরেদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত' এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—রসে খান অমৃত আছে, সে উঠল বলে'।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসি নি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিদ্যাধরীর বৃত্তান্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হাঁটছে তো হাঁটছে। পথ আর ফুরোয় না।

একটা ঘন জঙ্গলের পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় ওরা। সামনে পড়েছে একটা নালা। তিরতির করে জল বইছে। বোধ হয় নদীর সঙ্গে যোগ আছে এ নালার। কত জল কে জানে! যদি ডুব জল হয়, তবে উপায় কি!

চারধারে তাকায়। না, কোথাও কোন নৌকো ডোঙা নেই যে লগি ঠেলে পার হয়ে যাবে। ভাল বিপদে পড়া গেল যা হোক। কি করা যায়? এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কি করবে, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। সামনে এমন একটা আঘাটা পড়বে কে জানত! ব্যাটা সেপাই তো কিছু বললও না।

বেলা বেড়েছে। রোদ চড়চড় করছে মাথার ওপর। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কোন লাভ নেই।

বিদ্যাধরীর হাসি নেভে না।—ভালই হইল। সাতরাইয়া পার হমু।

কুমির মুখে বিরক্তি।—তর খ্যাপামী রাখ অখন। কাপড় নি ভিজ্যা যাইব।

—ভালই অইব। চান হইয়া যাইব।

—তুই থামলি নি। রঙ্গ-রসের আর সময় পাইলিন্যা?

মদন মিটিমিটি হাসে। বিদ্যা আর কুমিকে যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে ও। দু'জনের ভেতরে আশমান জমিন তফাৎ, অথচ দু'জন দু'জনের কত কাছে। কেউ কাউকে না হলে থাকতে পারে না, অথচ কেউ কারো কথা মেনে নিতে পারে না। একজন আনন্দে ভরপুর, খুশি খেয়ালে চলে। আর একজন প্রতিটি পা ফেলে সতর্ক চোখে, ভীষণ সাবধানে।

খেপী খেপেই রয়েছে, কুমি খ্যাপামীর ভয়ে তটস্থ।

মদন মধ্যস্থ হয়।—তোমরা খাড়াও এয়ানে। আমি আগে নামি।

কাপড়টা হাঁটুর ওপরে তুলে নিল মদন। আস্তে আস্তে নামল স্রোতের জলে।

বিদ্যা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুমির কাঁকালে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল,—আবার নি আছাড় খায়!

মেলায় যাবার সময় অন্যপথের এক খাল পার হতে গিয়ে পিছলে জলে পড়েছিল মদন। সেদিনও খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল বিদ্যা। ওর পা টিপে টিপে জলে নামা দেখে মনে পড়ে গেল কথাটা।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে মদন। না, ডুব জল নয়। হাঁটুর সামান্য ওপরে জল উঠল মাঝ বরাবর। মদন ওপারে চলে গেল। ফিরে দাঁড়াল। বিদ্যা আর কুমি নামুক এবার।

বিদ্যা নামল জলে, কুমি পেছন পেছন। এমন নালা খাল পার হওয়া ওদের অভ্যেস আছে। পা ফেলে ফেলে পার হয়ে এল বিদ্যা। মাঝখানটায় গিয়ে কুমি ঘুপ করে পড়ল একটা গর্তে। একেবারে কোমর ছাড়িয়ে জল উঠল বুকের কাছাকাছি।

—ধরো, টাইন্যা ধরো আমারে।

মদন আবার নামল। কিছুটা এগিয়ে কুমির দিকে লম্বা হাতখানা বাড়াল। মদনের হাত ধরে ওপরে উঠে এল কুমি। শাড়িখানা পুরোপুরি ভিজে। মাথাটা ছাড়া গা হাত পা সব ভিজে।

বিদ্যা হেসে কুটোকুটি। কুমি শাড়ির আঁচল নিংড়োতে নিংড়োতে রেগে তাকাল খেপীর দিকে।

—কি কুক্ষণে যে তর সাথে আইছিলাম!

মদন হাসতে লাগল। ভারি মজা লাগছে দু'জনকে নিয়ে। যেন জটিলা কুটিলা। খ্যাংরাকাঠির মত টুকটাক লেগেই রয়েছে দু'জনে। ঝগড়া হাসি, গান, গপ্প, বেশ কাটছে সময়টা। যাত্রাদলে থাকতে ওর ঘুম ভাঙত এই এত বেলায়, তার মুড়ি চা খেয়ে সখীর নাচের মহড়া চলত ঘন্টাখানেক। কে কত ভাল গেয়েছে, তাই নিয়ে চলত মন কষাকষি। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যেত। তারপর ঘুম। ঘুম থেকে উঠত রাত আটটা ন'টায়। আবার মুড়ি চা, কোথাও বা লেড়ো বিস্কুট। দশটা এগারোটায় গান শুরু হোত, ভাঙত শেষ রাত্তিরে। এসে শেষ রাতে হল্লা করে খেতে বসত। তারপর ঘুম। ঘুম থেকে উঠত আবার এই এত বেলায়। খাওয়ার টাইম বিকেল আর শেষ রাত। শোবার টাইম সন্ধ্যে আর সকাল। কি অদ্ভুত দিন কাটিয়েছে মদন ভুঁইয়া। আজ সব যেন অন্য রকম। সন্ধ্যের পর গানের তাড়া নেই। হিংসে-হিংসি বাদাবাদি নেই। কে ক'টাকা পুরস্কার পাবে, তাই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। বুক ভরে শ্বাস নাও। মন খুলে হাস।

এরা দু'জনও তাই। বিদ্যাধরী যে

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল!

সাধনা বিউটি ক্রীম

মেয়েদের ত্বক-সৌন্দর্যের গোপন রহস্য

প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য
কুসুম-কোমল পাপড়ি-পেলব যৌবন-সুলভ লাবণ্যময় সজীব ও সুন্দর ত্বক—এই তো সাধনা বিউটি ক্রীম-এর সবচেয়ে বড়ো অবদান।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য।

S-Ph-2/67

মুহূর্তটিতে বেঁচে আছে, সেই মুহূর্তে প্রাণভরে হাসে। কুমি হাসায়, ঝগড়া করে, ভয় পায়। কুমি পাশে না থাকলে খেপীকে বোধ হয় এমন করে চোখে পড়ত না। এমন অদ্ভুত মনে হোত না।

কুমি কি করে? জানে না মদন। নিশ্চয় কোন গয়লা বা পরামাণিকের মেয়ে। খায় দায় গাবিয়ে বেড়ায়। বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, বিধবা হয়েছে হয়তো। আবার একটা বিয়ে করলেই হলো। হয়তো তেমন পাত্তর জোটে না। কি দরকার মদনের অত খপরে? চলছ, চলো। চোখ মেলে দেখো চারিদিকে।

ওই তো উই দেখা যায় শাদা ধবধবে চাদরের মত নদীর জল আকাশ ছুঁয়ে পড়ে আছে। রোদের ঝলসানিতে শাদা দেখাচ্ছে নদীখানা। যেন মস্ত একখানা দুধের সর।

—নদী আইয়া গেল।

—কই, কোনদিন্টে?

—অই—চাইয়া দ্যাখ, জিক্যাগাছের ডালের মধ্য দিয়া চাও। হ', ওই।—

মস্ত একটা জিকাগাছ সামনে। আশে পাশে বুনো শ্যাওড়ার ঝোপ। জিকা-গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে তাকাও সামনে। নাক বরাবর। বালি আর বালি। শাদা চিনির দানার মত বালি। বালির চড়া নেমে গেছে জলে। হু-হু করে জল-ছোঁয়া বাতাস এসে ঝাপটে পড়ছে নাকে-মুখে।

বিদ্যাধরী মস্ত চোখদুখানা মেলে তাকিয়েছে। হায়রে হায়, পরাণটা যেন কেমন কেমন করে ওঠে। আকাশছোঁয়া নদী, চোখের দৃষ্টি উধাও। চোখ মেলে তাকাও। চোখখানা ছড়িয়ে পড়বে চার-দিকে। কোথাও থামবে না।

নদীর পাড়ে এসে চোখ আর ফেরে না। নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলো। কোথায় কে জানে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। চলছে তো চলছে। এমনি করে চলতে চলতে যদি পড়ো গিয়ে সাগরে-সমুদ্দুরে। তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি? সব একাকার। বিদ্যাধরী তাকায় আর ফিক ফিক হাসে।

—উঃ! মইল্যাম!

ককিয়ে উঠল কুমি। কি হোল কুমির? তাকাল ওর দিকে মদন।

—পায়ের তলা জ্বইল্যা গ্যাল। বালুর মধ্যে চুলার আগুন ধরছে।

তা বটে। কথা মিথ্যে নয়। বাতাস জলে ছোঁয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, কিন্তু পায়ের তলার বালি যেন উনুনের আগুনের মত। বড় বড় চিনির দানার মত বালি যেন আগুনের ফুলকি।

—গ্যালামরে মইল্যাম।

বিদ্যাধরী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

—হাসন দেইখ্যা গাও জ্বলে। তর পায়ে ত' চাম নাই, খড়মের নাগাল ঠক্কর ঠক্কর কইর‍্যা চলস!

কুমির রাগ দেখে মদন হেসে ফেলে।

মিষ্টি করে বলে,—এট্টু সইয়া লও। অই ঘাটলা দ্যাখা যায়। ওয়ানে বইয়া জিরামু।

সামনে বেশ খানিকটা দূরে বিরাট পাঁচ-ছ'টা বটগাছ পাকুড়গাছ। ওখানে ছায়ায় ছায়ায় বালির পাড়টা ঢালু হয়ে জলে নেমেছে। কিছু মানুষ ছেলে-পিলে দেখা যাচ্ছে। চান করছে। ঝাঁপাচ্ছে। উঁচু পাড় দিয়ে চলতে চলতে দূর থেকে খুব ছোট দেখাচ্ছে ঘাটের মানুষগুলো। বাচ্চা-গুলো মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট শুশুক। ডুব দিয়ে ভেসে উঠছে। কিছুক্ষণ বা সাঁতরাচ্ছে। কতক্ষণ এমন ঝাঁপাঝাঁপি করবে ওরা? যতক্ষণ না ওদের দিদি কিম্বা মা এসে ওঠবার জন্যে হাঁক পাড়বে। এই চনচনে রোদে জল থেকে উঠতে চায় কে? ওরা যখন উঠবে, পেটে তখন আগুন, কোনমতে গা-মাথা মুছে মাটির দাওয়ায় বসে যাবে খেতে। লাল মোটা চালের ভাত, ডাল আর কুমড়ো বটি। তখন যেন স্বর্গের সুধা!

মদনেরও এমন দিন গেছে। ওদের দেশের পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে গেছে। অনেকে বলে নদী নয়। নদী থেকে বেরিয়েছে একটা মস্ত নালা। তা হোক তবু ওই সোনাশালী নদীতে যখন খাবলা খাবলা তেল মেখে ঝাঁপাত ওরা তখন যে কি সুখ পেত, সে সুখের স্বাদ জীবনে আর একবারও পেল না। তারপর ঘরে গিয়ে গপাগপ পুরো এক থালা ভাত খেয়ে আবার বেরোত একটা নড়ি নিয়ে কামরাঙা অথবা কাঁচা আমের খোঁজে। ট্যাঁকে থাকত একটা শিশি ভর্তি ঝাঁজ কাসুন্দী। কাসুন্দী দিয়ে গোটা আট-দশ কাঁচা আম খাওয়া হয়ে যেত বিকেলের ভেতর। নয়তো শ' খানেক জাম।

মদন তাকায় দূরে ওই ছেলেগুলোর দিকে। গোটা দশ-বারো ছেলে কিলবিল করছে জলে। যেন ওরা জলেরই পোকা। নদীর পাড়ে যাদের ঘর তাদের ঘরের পোলাপানদের জলের সঙ্গে জন্ম থেকে সম্পর্ক। তবে ভয় একটা আছে যদি ভাঙন ধরে। ওরা পাড় দিয়ে চলেছিল। জলের ওপর খাড়া দু' মানুষ উঁচু পাড়। এক-একটা জায়গায় স্পষ্ট দেখা যায় ভাঙনের রেখা। অনেকটা পাড় জুড়ে ধনুকের মত চিড় খেয়েছে, তলায় দু' মানুষ নিচে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ, তলা থেকে মাটি খসিয়ে নিচ্ছে, ধুয়ে দিচ্ছে। পাড়ের তলায় অনেকটা খেয়ে গেলে ঝপাং করে পড়বে পাড়ের একটা ধস। জলে ধীরে ধীরে যাবে বালিমাটির মস্ত চাঁই। আবার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ, আবার তলা থেকে খেতে খেতে এগোবে। কত গাছ-গাছালি ঘর বাড়ি যে নদীর গর্ভে যায়!

ওরা ঘাটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। সূর্যি উঠেছেন মাথার চাঁদির ওপরে। মাথার টিনের স্যুটকেশটা যেন কামার-বাড়ির লোহার মত তেতে উঠেছে। হনহন করে এগোচ্ছে ওরা। কুমি সব সময়ই কিছুটা পেছনে পড়ছে। পড়ুক। পথ কিছু ঘোরাল আঁকাবাঁকা নয়, যত পিছেই পড়ুক, ঠিক আসবে।

ঘাটে এসে পৌঁছল মদন আর বিদ্যাধরী।

এদিক-ওদিক দেখে বটগাছের সবচেয়ে মোটা শেকড়টার ওপর বসল—মাথার বোঝা নামিয়ে। বিদ্যাধরী একতারা নামাল, আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল।

এখানে পাড় উঁচু নয়। পাড় কেটে মাঝখানে মাটি ঢালু করে দেয়া হয়েছে জল অব্দি। জল থেকে ওঠা-নামায় ঘাটটা কাদায় পিছল। একটা ছেলে উঠতে গিয়ে দু'বার আছাড় খেল। গোটা তিনেক ন্যাংটো বাচ্চা এসে ঘিরে দাঁড়াল ওদের। বৌ দুটি চান করে গায়ে গামছা জড়িয়ে উঠছিল। মদনকে দেখে ঘোমটা টেনে দিল।

ঘোমটার ভেতর থেকে আড়চোখে দেখল বিদ্যাধরীকে। ওর মাথার ওপর খোঁপা আর একতারাটা পরিচয় দিচ্ছে।

বৌ-দুটি বাঁ হাতে ঘোমটা ফাঁক করে দু'জন ফিস ফিস করে কথা বলল। তারপর বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল। কি বলল কে জানে! এমন তো কত মানুষই কত কথা বলে! ও সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না বিদ্যাধরী।

কুমি প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে পাশে বসল—গেছি রে, মরছি রে, আর আমি হাটবার পারুম না।

মদন হাসল। বিদ্যা মদনের দিকে তাকিয়ে বলল,—এই ঘাটলায় চান করা নি যায়?

—যাইব না ক্যান? করো।

বিদ্যাধরী বোঁচকার কাছে গেল। টিনের স্যুটকেশের ওপর থেকে বোঁচকা নামাল, খুলল। ধীরে-সুস্থে বসে আস্তে আস্তে কাপড় নামাল। চিরুণী ও ছোট আয়না।

কুমির মুখটা উজ্জ্বল হোল। যাক এখানে তবে একটু জিরিয়ে সাতিয়ে নেয়া যাবে। খেপীর ভাবসাবে মনে হচ্ছে, এখান থেকে এখুনি উঠবে না। বাঁচা গেল।

এই ঘাটেই আপাতত নোঙর করল ওরা।

[ক্রমশঃ]

বল রে জবা বল

॥ আবদুল আজীজ আল্ আমান ॥

সাধারণভাবে নজরুলসংগীত নিয়ে কিছু আলোচনা হ'লেও নজরুলের শ্যামা-সংগীত নিয়ে আজ পর্যন্ত কোথাও বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। অথচ শ্যামা-সংগীতগুলি সমগ্র নজরুলসংগীতের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ সংগীতের আলোচনা না হ'লে নজরুলসংগীত সম্পর্কীয় আলোচনা কোনক্রমেই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। এবং আমার বিশ্বাস, এ সংগীতগুলির সঠিক আলোচনা না হ'লে নজরুল-জীবনীও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সঠিক-ভাবে নজরুলের ব্যক্তি-মানসকে চেনা ও জানার জন্যে এ সংগীতগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নিখিল ভারতের ওপর দিয়ে এমন একটি বিষাক্ত হাওয়া বয়ে গিয়েছিল—যার ফলে এ দেশের কোটি কোটি মানুষের অধিকাংশই, নিতান্ত সাময়িক হ'লেও, অকস্মাৎ 'অতি-হিন্দু' অথবা 'অতি-মুসলমান' হ'য়ে উঠেছিল—যার কুফল বংশপরম্পরায় আজও আমরা ভোগ করছি। সেই ভয়ংকর বেদনার দিনে যে ক'টি মহৎচিত্ত অনির্বাণ দীপ-শিখার মত জ্বলে বিপথগামী মানুষকে পথ দেখাতে সাহায্য করেছিল—তাদের মধ্যে কবি নজরুল অন্যতম। ঘৃণ্য কোন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে কবি কোনো দিন প্রশ্রয় দেন নি। সমসাময়িক ভয়ংকর বিষাক্ত গলিত পঙ্কের মধ্যে বাস করেও তাঁর চিত্ত-শতদল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উদার সূর্যালোক-চুম্বন করেছে। এবং এই মহৎ উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বাংলা সংগীত-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ শ্যামা-সংগীতগুলি রচনা করা সম্ভব হ'য়েছে। সংগীতগুলির আলোচনা-কালে দেখব ঃ কবির সমগ্র চিন্তা-ভাবনা, এমন কি তাঁর সমগ্র আত্মা মাতৃপদে লীন হ'য়ে গেছে। সংস্কারমুক্ত মনে কতখানি অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তি থাক্‌লে এমনভাবে আত্মলীন ও আত্ম-সমাহিত হওয়া যায় তা' সহজেই অনুমেয়।

সাধক-কবি রামপ্রসাদের হাতে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড ও শক্তিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে শ্যামা-সংগীতগুলি যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে শ্যামা-সংগীত বলতে যা' বুঝি তার সূত্রপাত রামপ্রসাদের হাতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাম বসু (১৭৮৬ খৃঃ—১৮২৮ খৃঃ), দাশরথি রায় (১৮০৪ খৃঃ—১৮৫৭ খৃঃ), মীর্জা হুসেন ও এণ্টনী ফিরিঙ্গি কিছু কিছু শ্যামা-সংগীত রচনা করলেও সংগীত-জগতের এই বিশেষ অধ্যায়ে এঁরা কোন সুস্পষ্ট ছাপ ও কৃতিত্ব রেখে যেতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে রাম-প্রসাদের পর দীর্ঘ এক শো' বছর এই সংগীতের নীরবতার কাল। এই সুদীর্ঘ-কালের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভঙ্গ করলেন কবি নজরুল। মহাবন্যার তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলার পর শান্ত সৌন্দর্যের মত বিদ্রোহ ও রণদামামার উন্মাদনাময় অধ্যায়-শেষে গীতিকবিতার অনাবিল সৌন্দর্যের পথ বেয়ে এলেন নজরুল। আমার বিশ্বাস—নজরুলের হাতেই এই সংগীত পরম পূর্ণতা লাভ করেছে। এই ক্রমবর্ধমান ধর্ম-বিশ্বাস-হীনতার যুগে আবার যে পরম নিষ্ঠায় শ্যামা-সংগীত রচিত হ'বে সে কথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দেয় না।

নজরুলের শ্যামা-সংগীতগুলিকে নানান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। কোন্ কোন্ গানে কবি শ্যামাকে নিজ বালিকা-কন্যারূপে সম্বোধন করেছেন, কোন কোন গানে আপন মাতৃপদে অভিষিক্ত করেছেন। কিছু কিছু গানে কালী হ'য়েছেন ভয়ংকরী আবার অনেকগুলি গানে তিনি হ'য়েছেন বিশ্বসৌন্দর্যের আধার। সমসাময়িক ঘটনার—ইতিহাস হ'য়ে আছে অনেকগুলি সংগীত। আবার কিছু কিছু সংগীত স্বল্পায়তনের মধ্যে হ'য়ে উঠেছে ভয়াল কালস্তোত্র। এ ছাড়া কম-বেশি সকল গানেই আছে গীতি-সাহিত্যের দুর্লভ সঞ্জীবন স্পর্শ।

নজরুল-কবিতার মত নজরুল-সংগীত সম্পর্কেও বড় অভিযোগ এই যে কেবল-মাত্র গীতি-কবিতা হিসাবে এগুলিকে পাঠ করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সুরের কথা ছেড়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রায় গানই যেমন নিটোল গীতিকবিতা—নজরুলের অধিকাংশ গানই সে হিসেবে ব্যর্থ। কথার সঙ্গে সুরের সংমিশ্রণ না হলে এগুলির অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। এই বড় অভিযোগটি নজরুলের অন্যান্য সংগীত সম্বন্ধে প্রয়োগ করা গেলেও তাঁর নিটোল শ্যামা-সংগীত সম্পর্কে নয়। প্রকৃত-পক্ষে নজরুলের অধিকাংশ শ্যামা-সংগীত আশ্চর্যভাবে এই দোষ-দুর্বলতা হ'তে মুক্ত। সুরারোপ ছাড়াও তাঁর শ্যামা-সংগীতগুলি আদর্শ রসোত্তীর্ণ গীতি-কবিতা হিসেবে পাঠ করা চলে। আর এই রসোত্তীর্ণ গীতি-ছন্দে যখন সুরের দুর্লভ মাধুর্য ছড়িয়ে পড়ে তখন যে অপূর্ব সংগীতলোকের সৃষ্টি হয়, বাংলার গীতি-সাহিত্যের ইতিহাসে তার বড় একটা নজীর মেলে না।

মীর্জা হুসেনের শক্তি-বিষয়ক সংগীতের মধ্যে কেমন যেন একটা দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ঐ যুগের অধিকাংশ গীতিকারের মধ্যে, কি হিন্দু কি মুসলমান, এই দূরত্বটুকু লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু নজরুলের শক্তি-বিষয়ক সংগীতে এমন কোন দূরত্ব নেই। বিশ্বাসের গভীরতার জন্যেই হোক অথবা হৃদয়াবেগের আকুলতার জন্যেই হোক—নজরুলের এই সংগীতগুলি মাতৃপূজার অর্ঘ্য হ'য়ে উঠেছে। ভক্তি-বিশ্বাসের কথা বাদ দিলেও, কেবলমাত্র হৃদয়ানুভূতির ঐকান্তিকতায় যে এ সংগীতগুলি রস-মাধুর্যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে তা' বিশ্বাস করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি নজরুলের শক্তি-বিষয়ক অনেকগুলি গানে শ্যামা বালিকা-কন্যারূপে চিত্রিত হয়েছে। 'আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে', 'আয় বিজয়া আয়রে জয়া উমার লীলা দেখে যারে', 'আমার উমা কই গিরিরাজ কোথায় আমার নন্দিনী' প্রভৃতি গানগুলি তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। 'আনন্দিনী উমা আজো এল না তার মায়ের কাছে' গানটিতে কবিকে আমরা মাতৃরূপে দেখতে পাই। কন্যাকে হারিয়ে অথবা কন্যার অদর্শনে মাতৃহৃদয়ের বেদনা-ঘন হৃদয়-চাঞ্চল্যটুকু এই কবিতায় সুন্দররূপে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। 'তত্ত্ব তালাস নিই নি মায়ের তাই বুঝি মা অভিমানে', শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কথাও কবির মনে হ'য়েছে। কবিতা-টির শেষে দেখি আর পাঁচজন বাঙালী মাতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়টিও কন্যার বিরহে ক্রন্দন-ফেনিল হ'য়ে উঠেছে এবং তিনি 'ক্ষীর নবনী থালায়' নিয়ে ব্যাকুল হ'য়ে কন্যার আগমন অপেক্ষায় দিন গুণছেন।

'কন্যারূপী' কবিতাগুলির মধ্যে বাৎসল্য-প্রেমের যে সুনিবিড় চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন তা' একাধারে যেমন মধুর, তেমনি চিত্তগ্রাহী। কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে কেবল মাতৃহৃদয়ের অনাবিল ভালবাসাটুকু নেই, তাড়ন-ভৎর্সনাও আছে। কন্যার অভিমানে ক্রন্দনরত মা সমগ্র হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে যেমন তাকে কোলে তুলে নিয়েছে তেমনি কন্যার অবাধ্যতা ও দোষ-ত্রুটিতে

আজ চাই কি ?

কাজী নজরুল ইসলাম

আজ চাই সারা ভারত জোড়া একটা বিরাট ওলোট-পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শ্মশানভূমিতে "শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা" কাব্যবুজের মধুগুঞ্জন শোভা পায় না, সে নির্লজ্জ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মত প্রাণে এসে বেঁধে। আজ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার তর্জন, দুর্দম দুর্মদ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণ উন্মাদ আর তাদের ছেষা বৃংহনের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ। আজ অলক-তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধক ধক জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মত ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক পরতে হবে। আজ কোমল-কুসুম মালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিথ্যাচারী অসুরের 'অস্থি-কপালের মালা' প্রমত্ত বিক্রমে স্ফীতবক্ষে দোলাতে হবে। এ শ্মশানে আজ সবার মুখে স্তিমিত স্মিত হাসি নিভে গিয়ে দেখা দিক এক নিকট মৃত্যু করাল রক্তলোলুপ দুর্নিবার অধর্ম বিদ্বেষ। আজ অবিচার কদাচারে ভরা এই বিলাস আলয়ের কেলিকুঞ্জে যমরাজ তাঁর যতসব হিংস্র শৃগাল কুক্কুর শকুনি গৃধিনীকে একবারে বল্গা আলগা দিয়ে লেলিয়ে দিন। এই মোহ সুপ্ত মরণ-মগ্ন জাতির বুকের উপরে প্রেত পিশাচের তাণ্ডব চলতে থাকুক। আজ মিথ্যার সকল সন্ধি গ্রন্থি ছিন্ন বিদীর্ণ হোক। মিথ্যা মদিরার সব পেয়ালা ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাক, শয়তানের আরামের আসর হতভম্বা হোক, সারা দেশটা ভরা আজ এক বিকট উন্মাদলীলা, শুধু মস্তিষ্কহীনের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকান-পাট ঘরসংসার সাজসরঞ্জাম সকলের মাঝে এর বিরাট ভণ্ডামী, ধর্মের নামে ফাঁকি-বাজি। ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ করে কেবল কপটতার প্রবঞ্চনার পুণ্য লৌকিকতার বহর জাহির করে বিধাতার বিশ্ববংশী যন্ত্র-নিষ্ঠুর আঘাতে তাদের অহংকারকে চূর্ণ নিষ্পেষিত করে না? এ অন্যায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? নারায়ণ তাঁর অনন্ত শয্যায় আর কতকাল নিদ্রিত থাকবেন। এ সুন্দরী ধরিত্রী যে পাপ রাক্ষসের দুর্গন্ধ ক্লেদ-বিষ্ঠার জঘন্য নরকে পরিণত হলো, মধুসূদনী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য রিষবহ্নি উগার ক'রে বাসুকী কি তার সহস্র জিহ্বা লকলকিয়ে ছুটে আসবে না। আজ কি তার ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছয় নাই? আজ সাগর ভূধর সংসার কানন সব দলিত মথিত করে আসা চাই মহা-প্রলয়ের মহা আলোড়ন। ভারতের জীবনের অণু-পরমাণু আজ পচা গলা বিষ-নির্যাস বাসা হয়েছে। আজ পরিপূর্ণ সৃষ্টির আয়োজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে। এই সত্য যজ্ঞে সকল মিথ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ভস্ম করতে না পারলে যজ্ঞ পূর্ণ হয়ে না। অটল সাধনের রক্ষাকারক যজ্ঞ হবিতে এ দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না; হলে পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হলে তাতে দেব-জীবনে অভিনব সৃষ্টি জেগে উঠবে না। সৃষ্টির বাঁশরীর আকুল করা প্রেরণা সেই দিনই আমাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করবে, যে দিন মহেশের ডম্বরু বিষাণের শঙ্খে ভীত ত্রস্ত হয়ে ভণ্ডামী, ন্যাকামি অবিচার অনাচারের ছায়ামূর্তি পর্যন্ত এদেশের জীবনভূমিতে উঁকি মারতে সাহস পাবে না।

আজ চাই, ভরাট জমাট জীবনের সহজ

তাকে চরম ভর্ৎসনাও করেছে। কিন্তু এই ভর্ৎসনার মধ্যেও হৃদয়ানুভূতির গভীরতা-টুকু লক্ষণীয়। এ যেন শত্রুরূপে মাতৃ-পূজা। এই শ্রেণীর একটি সম্পূর্ণ কবিতাই আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

সর্বনাশী! মেখে এলি এ কোন্ চুলোর ছাই?
শ্মশান ছাড়া খেলবার তোর জায়গা কী আর নাই!!
মুক্তকেশী কেশ এলিয়ে
বেড়াস কখন কোথায় গিয়ে
এক নিমেষও তোকে নিয়ে
শান্তি নাহি পাই॥
ছাড় জ্বালানী মেয়ে! হাড়ের মালা কোথায় পেলি
ভুবনমোহন গৌররূপে কালি দেখে এলি।
তোর গায়ের কালি চোখের জলে
ধুইয়ে দেব আয় মা কোলে
তোরে বুকে ধরেও মরি জ্বলে, নিই মা গালি তাই॥

তাড়ন-ভর্ৎসনার ভেতর দিয়ে মাতৃ-হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসাটুকু যে গভীর ভাবে এই কবিতায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেই।

শ্যামাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে কবি অনেকগুলি সংগীত রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসাদ হতে শুরু করে সকল কবিই মাতৃকল্পনায় সর্বাধিক সংখ্যক শ্যামা-সংগীত রচনা করেছেন। আর এ কথাও সত্য ভক্তের দল কন্যা-রূপের আদর-সোহাগ ও তাড়ন-ভর্ৎসনা অপেক্ষা সকল পাপ ও পুণ্য নিয়ে মাতৃপদে বিলীন হ'তে অধিকতর উৎসুক। এর কারণ বোধ হয় এই যিনি আমাদের দেবী হবেন, ত্রাণ-দাত্রী হবেন তিনি হবেন অধিকতর শক্তিশালিনী ও উচ্চাসনের অধিকারী। অন্তত এমনটা হ'লে তাঁর পদতলে আমরা অবলীলাক্রমে নিজেদের সমর্পণ করতে পারি। সেজন্যে অধিকাংশ কবিই দেব-দেবীকে আমাদের অধস্তন না ভেবে—মাতৃ অথবা পিতৃরূপে অভিষিক্ত করেছেন।

এই শ্রেণীর কবিতাবলীতে নজরুল যে আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন শাক্ত-সাহিত্যের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। আমরা সাধক এবং অমর কবি রামপ্রসাদের কথা স্মরণে রেখেই এ মন্তব্য করছি। 'মোরে আঘাত যত হান্‌বি শ্যামা ডাকব তত তোরে। মায়ের ভয়ে শিশু যেমন লুকায় মায়ের ক্রোড়ে', 'তোর কালো রূপ লুকাতে মা', 'কে পরালো মুণ্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে। সহস্রদল জীবন কমল দোলেরে যাঁর চরণ তলে', 'কোথায় গেলি মাগো আমায় খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে', 'আমি নামের নেশায় শিবের মত ডাকি গো মা বলে। নাই দিলি তুই সাড়া মাগো নাই নিলি তুই কোলে', 'মায়ের আমার রূপ দেখে যা শ্যামা আমার কেবল জ্যোতি', 'জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়', 'বল মা শ্যামা বল্ তোর বিগ্রহ কী মায়া জানে', 'কে সাজালো মাকে আমার বিসর্জনের বিদায় সাজে', 'কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণী সিন্ধুকূলে। ক্ষুদ্র ঘটে এ সিন্ধুজলে কেমন করে নেব তুলে?' 'থির হ'য়ে তুই বস্ দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে' প্রভৃতি সঙ্গীতগুলিতে মায়ের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার তুল্য রূপ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি অঙ্কিত হ'য়েছে কী? হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে অটল বিশ্বাস ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের ত্রিবেণী-সঙ্গমে শাক্ত-গীতিকবিতায় যেন পুণ্য-স্নান হয়েছে। এই দুর্লভ কবিতাগুলি চিরকাল বাঙালী পাঠকের চিন্তা ও চিত্তে আবেগ সঞ্চার করবে।

নজরুলের শ্যামা-সংগীতগুলির বিভিন্ন দিকে নিয়ে আলোচনা করার সুদীর্ঘ অবকাশ রয়েছে। অথচ আমাদের আক্ষেপ রয়ে গেল এ ব্যাপারে সমালোচকবৃন্দ নিরুৎসাহ ও নীরব। আশা করি সুধীজন এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

স্বচ্ছন্দ সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও কোন জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা না থাকে। আজ পথের বাধা পাষাণ অটল হিমাচলের মত বজ্র দৃঢ় হলেও সত্য সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে। অমৃতের সন্ধানী যে ভগবৎ শক্তি যার শিরায় শিরায় অমিত বীর্যের অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত করছে তার বল-দর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান হবেই হবে। তার রোষ কটাক্ষের সম্মুখে অবিদ্যাজনিত সব ভয় বিতাড়িত হবে। সমাজ ধর্মের দুরহঙ্কারের উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে, এ হতেই হবে। সত্য ও মুক্তির জয় রথের যাত্রাপথ রোধ করতে পারে এমন কোন যক্ষ-রক্ষ দানবের নাই। সত্য-সাধককে পথভ্রষ্ট করতে পারে এমন গন্ধর্ব কিন্নরের মায়া এ দুনিয়ায় নাই। যে সত্যের ভান এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দু'দিনের তরে আপন প্রভাব-মহিমা বিস্তার করে দুর্দিনেই নিজের বোনা জালে নিজের গড়া শিকলে আবদ্ধ পঙ্গু ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ত, আজ তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজ ঐ নেবে আসছে ভারতের বিশাল জীবনের 'পরে পরিপূর্ণ সত্য মুক্তির আলোকপ্রপাত। আর তারই স্পর্শে তাতে জ্বলে উঠবে বিচিত্র নব সৃষ্টির অফুরন্ত আশা ও আনন্দ। আজ মনকে আঁখি ঠেরে ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে পারা যাবে না। আজ রাষ্ট্রে যারা অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী তাদের সমাজ ধর্ম ও মুক্তি ব্যাহত থাকলে বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে তাদের যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। তা' থেকে কোন মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, কবচ মাদুলি তাদের রক্ষা করতে পারবে না, মিথ্যাচারের লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হবেই হবে। সমাজ ধর্মে যারা মুক্তির কোন ছেদ বা সীমা মানতে চায় না, তারা যদি এই বিরাট দেশের বুকের উপর রাষ্ট্রপরাধীনতার রাক্ষসীকে ব'সে ব'সে রক্ত শুষতে দেয়, সে অপরাধে তাদের মার্জনা নেই। কোথাও মিথ্যা অন্যায়ের সাথে মাঝপথে রফা হতে পারবে না। আজ সকল ভারতমাতার বীর সন্তানকে বুকঠুকে হেঁকে নিঃসংকোচে এই সত্য প্রচার করতে হবে. মনের কোণে বসে যদি কোন ছিচকাঁদুনী সংস্কার বুড়ি তোমার আঁচল ধরে পিছনে টেনে রাখতে চায় তবে তাকে নির্মমভাবে লাথি মেরে তোমার জীবনগৃহের চতুঃসীমা হতে বাহির করে দাও। ওগো আমার ওস্তাদ চাষী, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলাবার আকাঙ্ক্ষা যদি করে থাক তা'হলে তোমার সেখানে আবর্জনা-কণ্টক দুষ্ট কীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে ত'

আপন মনে

ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নব জীবনের পরিপুষ্ট ফসল। সকলের শাসনের দাসত্ব যদি সত্যই হেয় বলে বুঝে থাক, যদি তার পাষাণ চাপে ফাঁপর হয়ে হাঁপিয়ে উঠে থাক তবে তুমি কোন্ লজ্জায় নিজের ঘরের অত্যাচারের অধীনতা মাথা পেতে নিচ্ছো? এই পরতন্ত্রতার হীনতা হ'তে না এড়ালে তোমার স্বর্গ নেই রয়েছে বীভৎস নরক। এ তুমি স্থির জেনো মুক্তির দিশারী যদি তুমি হয়ে থাক হতে হবে তোমায় বৃহতের ও মহতের পূজারী! তোমার দেবতার সৌন্দর্য শক্তিমহিমা অনাদি অনন্ত কোন গুরু পুরোহিতের মন্ত্রশাস্ত্রের নিগড়ে সে বিরাট পুরুষ বাঁধা পড়ে নেই। সত্যের স্বরূপ জানবার মত আলো তোমার মাঝে আছে।

সাধনার রুদ্রবহ্নি চারিদিকে জ্বালিয়ে তুলে তুমি সকল মিথ্যার অপবাদের দড়াদড়ি পুড়িয়ে ফেল—জগজ্জয়ী শক্তি তোমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হবে, অনন্ত জ্ঞান ও অটল অফুরন্ত প্রেম তোমার দৃষ্টি-ঝাপসা কাটিয়ে দেবে, তোমার প্রাণের শতদলকে বিকশিত করবে। ভাঙাগড়া কোনটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না, যে গড়তে যাচ্ছে সে যদি না জানে কতখানি জীর্ণ অকর্মণ্য হয়েছে তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারৎ চোখের পলকে ধ্বসে পড়বে। তাই দেশের সেই সঙ্গে নিজের যারা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে তাদের ভাঙবার বেলায় মনে কোন দুর্বলতার স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হয়েছে তার একচুলও যদি ভাঙতে বাকী থাকে তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে প্রায় ষোল আনা ঘুণ ধরে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধ্বংসের নেশায় যতই মত্ত হন ততই মঙ্গল। আজ রুষে আসুক কালবৈশাখীর উন্মাদ ঝঞ্ঝা রক্ত পাথরের অবারিত স্রোতে, অযুত ফণা বিস্তার করে আজ সব অগ্নিবাণ নাগ-নাগিনী বিপুল উল্লাসে বিচরণ করুক। এই প্রলয়-পয়োধি জলে মিথ্যার সৌধশীর্ষ ডুবে যাক। তবেই আবার অনন্ত জীবনের সহস্রদলের উপর বেদ-উদ্ধারণ নারায়ণের আবির্ভাব হবে।

নব মন্ত্রিসভা সমীপেষু

[ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ]

পশ্চিম বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দৈনিক বসুমতীর সদ্য প্রত্যাগত রিপোর্টার যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা' ভয়াবহ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ছাড়া মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পরিষ্কার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনই সরকারীভাবে দুর্ভিক্ষাঞ্চল ঘোষণা করে সর্বাধিক ত্রাণ ও সাহায্যের সকল দরজা খুলে দিয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হবে। নিশ্চুপ কেন্দ্রীয় সরকারকে অবস্থার ভয়াবহতার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে হবে। এরই সাথে সাথে দেখতে হবে যেন পশ্চিম বাংলার অন্য জেলাগুলিতে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত না ঘটে। এখনই এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের আশংকা অমূলক নয় যে, এই সুযোগে মুনাফাশিকারীরা চুপচাপ বসে অহিংস উপায়ে কালহরণ করবে। দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব চিরদিনই ভাগ্যনির্মাতাদের সুবর্ণ সময়। নেকড়ের মত ওৎ পেতে আছে মুনাফাশিকারীর দল। আমাদের দেশে এ বিষয়ে গত মহাযুদ্ধ থেকে তারা নানা সুযোগে নানা ট্রেনিং নিয়ে অভিজ্ঞতায় মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেছে। সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত তাদের মেসিনারী বিস্তৃত আছে দেশের দুরতম দুর্গম প্রান্তে প্রান্তে।

বহু দেরি হলেও যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্য সংকট প্রতিরোধে খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী তৈরি করে অগ্রসর হতে চলেছেন। আমাদের আশংকা এই যে সাত মণ তেল পোড়ার আগে রাধা অপহৃতা না হয়ে যায়। খাদ্য সংগ্রহে সরকার নামবে দিবালোকে তার অশ্ব গজ পদাতিকের অক্ষৌহিণী সাজিয়ে কিন্তু মুনাফাশিকারীদের অভিযান হবে অন্ধকারে মূষিকের মত নিঃশব্দে নানা বেশে নানা রূপে। সরকারী পাহারাদারদের তারা ভয় করে না, অন্তত ভয় করার মত কোন কারণ আছে বলে তারা অতীতে বিশ্বাস করে নি এবং আজও সেই বিশ্বাস তাদের অটল আছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন বলেই দেখা যাচ্ছে। তাই গণ-কমিটির সহায়তায় সরকার খাদ্য ও ত্রাণ সমস্যার মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। জেলা, মহকুমা ব্লক ও অঞ্চল পর্যায়ে এই গণ-কমিটি গঠনের নির্দেশ গিয়েছে। দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। আপাতদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে এ এক গণতান্ত্রিক প্রস্তাব। কিন্তু কমিটি গঠনে একটি গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে। স্থির হয়েছে প্রতিটি ওপরের কমিটি তার নিচের কমিটিতে পাঁচজন করে সদস্য মনোনয়ন দেবে। অর্থাৎ জেলা কমিটি প্রতি মহকুমাকে দেবে পাঁচজন আবার মহকুমা তার অধীনে প্রতি ব্লকে দেবে পাঁচজন আর ব্লক প্রতি অঞ্চলে দেবে পাঁচজন। ফলে প্রতিনিধিত্বের নামে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলো দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির এক নতুন হাতিয়ার পেয়ে গেছে। এখানে শারিকানা নিয়ে এখনই গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এমনিতে প্রতি স্তরের কমিটিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একটি করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। তাহলে পাঁচজন করে মনোনয়ন দেবার সার্থকতা কোথায়? ফলে বাঞ্ছিত লক্ষ্য যে শস্য সংগ্রহ অভিযান তার বদলে পার্টি বিস্তৃতি অভিযান প্রকট হয়ে উঠবে। আর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পার্টিরা মানসিকভাবে ঈর্ষাতুর ও সন্দেহগ্রস্ত হবে। যার অনিবার্য পরিণতি সেই এক বালতি দুধে এক ফোঁটা গোমূত্রের ফলাফল সদৃশ হবে। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের শেষ লক্ষ্য ও কাম্য কিন্তু বাস্তবে কি সম্পূর্ণ সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের দেশের পক্ষে এখন সে পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে নি। গণতন্ত্রের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন স্বীকৃত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পঞ্চায়েতীরাজ চালু করা হয়েছে। কিন্তু ফললাভের ব্যালান্স সীটে সহযোগিতার ঘরে ঘাটতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। বাংলা দেশের পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের প্রথম সারির এক এলাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে প্রথমে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল দশ বছর পরে তার এক শতাংশ অবশিষ্ট নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত ত' দূরের কথা অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভা আহ্বান করলে কোরাম হয় না। এই আমাদের দেশের চেহারা। তাই কম্যুনিটি প্রোজেক্টের সকল স্কীম ব্যর্থতার সার্টিফিকেট বহন করছে। এখন এই যে সমষ্টিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নির্ভরশীল পঞ্চায়েত কাঠামোকে বর্জন করে রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সদস্যদের নিয়ে যে খাদ্য ও ত্রাণ-কমিটি গঠন করা হচ্ছে তাতে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যাবে কি? ব্যষ্টির অত্যুৎসাহ বা নৈরাশ্য লক্ষ্য সাধনের পরিবর্তে অরাজকতা বা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে। কোন আর্থিক সম্পর্ক না থাকলে আমাদের দেশে ব্যষ্টি সক্রিয় হয় না। স্বেচ্ছাসেবক মনোবৃত্তি পরিষ্কার বন্ধ্যা হয়ে গেছে। অবাশ উত্তপ্ত করে তুললে কোন সাময়িক কাজ করান যেতে পারে কিন্তু দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ কোন কাজে সাফল্যলাভ করা যায় না। পার্টি রাজনীতি অবশ্য উত্তেজক দ্রব্য বিশেষ। হয়ত কিছু ফলদান করতে পারে। কিন্তু উত্তেজনা দ্বারা ফলপ্রসূ কিছু সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসাত্মক কাজই বেশি হয় আর উত্তেজনা-উত্তর জীবনের অবসাদ আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। যে রাজনৈতিক পার্টি উত্তেজনা সৃষ্টিতে সর্বাধিক সক্ষম হবে সে হয়ত সাময়িক বাহাদুরি তৎপরতা দেখাতে পারবে। রাজনৈতিক পার্টি দ্বারা আমাদের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে তাই আশঙ্কা করার আছে। অবশ্য সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র যদি আন্তরিকভাবে এই গণ-কমিটির সংগে সহযোগিতার কাঁধে কাঁধ মেলায় তাহলে অন্য কথা। তারা এখন প্রায় দূরে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেটুকু না করলে নয় তার অতিরিক্ত কিছু সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাদের এই আচরণ কোন কোন ক্ষেত্রে অভিমানসঞ্জাত আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি-প্রবুদ্ধ। জনসাধারণ বেশ ভালরকম নাস্তানাবুদ হয়ে তাদের কাছে আবার আত্মসমর্পণ করুক এইটে তারা দেখতে চায়। প্রশাসনযন্ত্রের জেলা শাসক থেকে থানার এক কনস্টেবল পর্যন্ত এমনি মনোভাবে ভুগছে। এটি একটি মানসিক রোগ এবং তা আরোগ্য করা দরকার। বিশ বৎসর ক্ষমতার কুপরিচালনা করার অভ্যাসের দাসত্বে তারা বন্দী। তাদের বাইরে দেশপ্রেমিক আছে এবং দেশের প্রয়োজনে তাদের অবদান গ্রহণ করতে হয় এই ক'টি কথা মনে রাখলে অনেক বিবাদ কমে যাবে—এই সহজ সত্য তাদের উপলব্ধি করান দরকার।

কিন্তু সবার ওপরে পলিসির স্বচ্ছতা ও সরলতার ওপর প্রয়োগক্ষমতার সাফল্য নির্ভর করে। খাদ্য সংগ্রহনীতি ক্রমশ প্রফুল্ল সেনের মত জটিল হতে চলেছে। খাদ্য নীতিতে স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। যেমন পুরা রেশনিংয়ের কর্ডন এলাকার বাইরে চাল, ধান চলাচল ও খোলা বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। অবাধ চলাচলে বাধা দিলেই বাজার শুকনো হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়, কিন্তু বাজারে যোগান ও সরবরাহ কেমন করে অক্ষুণ্ণ থাকবে সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার মতামত নেই। প্রথমত ১২ একরের ওপরের মালিকদের পরিবারের মাথা পিছু ১ মণ ধান ও একর পিছু ২ মণ বীজ ধান সরকার সংগ্রহ করে নেবেন। এমন কি ১২ একরের নিচের উদ্বৃত্ত মালিকদের প্রয়োজনে ঐরূপ উদ্বৃত্ত নিয়ে নেওয়া হবে। তা হলে খোলা বাজারে চাল কোথা থেকে আসবে? দ্বিতীয়ত ঘাটতি এলাকার উদ্বৃত্ত উৎপাদকের কাছ থেকে যে শস্য সংগ্রহ হবে তা ঐ এলাকায় যে সম্পূর্ণ বণ্টন করতে হবে এমন নিশ্চয়তামূলক আদেশ কোথায়? ঐ ঘাটতি এলাকার চেয়ে অধিকতর ঘাটতি এলাকার দোহাই দিয়ে অন্যত্র চলে গেলে সংগ্রহকারী এলাকায় ঘাটতি পূরণ কে করবে? যখন এম আর নেই তখন অবস্থা কি আরও খারাপ হবে না? যে শস্য সংগ্রহ হবে তা সরকারী প্রস্তাব মত স্থানীয় এম আর সপ দিয়ে বিক্রি করা হয় তবে তার দর কত হবে? কেন না সরকার নিজের রেশন দোকানে লোকসান দিয়ে বিক্রি করেন। গ্রামে ধানের সংগ্রহ মূল্য নির্দিষ্ট আছে কিন্তু সেই ধান যদি সরকার এম আর দিয়ে বিক্রি করান তার দর ঠিক করেন নি। খোলা বাজারের মূল্য সম্বন্ধেও অস্পষ্টতা বর্তমান। মাথা না থাকলে ও মাথা ব্যথা থাকে না কিন্তু শস্য সকল স্তরে সংগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও আমরা বাড়তি শস্য বাজারে বেরুবে ধরে নিয়েছি কিন্তু তার সীমাহীন দর নিয়ন্ত্রণ করবে কে? অথচ অভিজ্ঞতায় বলে দর নির্দিষ্ট করে দিলে খোলা বাজার অদৃশ্য হয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাবে। এদিকে গ্রামে গ্রামে ফুডের গণ-কমিটি গড়া হয়ে যাবে। তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না ও তারা কালোবাজারী বন্ধ করার উৎসাহবোধ না করে পারবে না। তখন আবার নিগ্রহ লাঞ্ছনা আর হয়রানির পুনরাবৃত্তি না হয়ে যাবে না। আর বিভিন্ন রাজনীতির দলের সদস্যের গঠিত ফুড কমিটির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত যে গড়াবে না তার নিশ্চয়তা নেই। তখন সে বিষয়ের কে মধ্যস্থতা করবে আর কেই বা সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেবে? আর সবার ওপরে বাড়তি এলাকার গণ-কমিটি নিজ এলাকায় দরকে নিম্নমুখী করার চেষ্টায় চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলে ঘাটতি এলাকায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ও এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। আমি এই সব সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার মতামত পরিষ্কারভাবে জনসাধারণকে অবগত করা প্রয়োজন বোধ করছি।

—এস কে শক্তি

ঘেরাও--

ক্ষুধার্ত রায়গঞ্জের কঙ্কালসার মূর্তি

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ ও দিনাজপুর জেলা থেকে যে সমস্ত সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উক্ত জেলা চারটিতে দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাঁকুড়ার উনিশটি থানার মধ্যে ছয়টি থানার (মেজিয়া, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, কোতলপুর) অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই অঞ্চলগুলির ছয় লক্ষ মানুষ আজ চরম অনাহারের কবলে পতিত। পুরুলিয়া জেলার পনের লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা আশীজন আজ অনাহারের সম্মুখীন। এদিকে উত্তরবঙ্গের মালদহ ও দিনাজপুর থেকেও যে সংবাদ আসছে তাতে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। ওই দুটি জেলাতে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁদের সপ্তাহে দু'দিনও অন্ন জোটে।

যদিও আমরা প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের শোচনীয় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি, তথাপি এটা অনেকেরই খেয়ালে আসে নি যে আমাদের নিজেদের রাজ্যে অন্তত চারটি জেলায় সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা জেলা কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা চোখে দেখেও নির্বিকার থেকেছেন, এবং যথাসময়ে তা সরকারের দৃষ্টিগোচর না করার দরুণ সরকারও হয়ত অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবগত নন। বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুর উদ্বৃত্ত জেলা হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ কোনদিনই বিগত সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিচার পায় নি, আর পুরুলিয়া যবে থেকে বিহারে ছিল, তবে থেকে আজ পর্যন্ত শুধু অবজ্ঞাই পেয়ে এসেছে। মালদহে বরাবরই আমের ফলন ভাল, কিন্তু এবারে তা একেবারেই উৎপন্ন হয় নি। তদুপরি গত বছরের নিদারুণ খরায় পরস্পর সন্নিহিত চারটি জেলায় তীব্র জলাভাবের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভিক্ষের অবস্থা একদিনে আসে নি।

উপরিউক্ত চারটি জেলার বারো আনা মানুষই আজ প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কোথাও একদানা শস্যের চিহ্ন নেই। মজুতদারেরা আগে থেকেই সব লোপাট করে রেখেছে। সরকারের তরফ থেকেও তেমন কোন ত্রাণকার্যের নিদর্শন নেই। স্মরণ থাকতে পারে বাঁকুড়া জেলায় ত্রাণখাতে গত বছরে যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল, তার যদি সদ্ব্যয় হত তাহলে সেখানে এখন দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হোত না।

কিন্তু এখন আর দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। চরম সংকট যখন এসেই গেছে তখন তার মোকাবিলা যাতে করা যায় সেদিকে এখন সচেষ্ট হবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই জেলাগুলির অবস্থা গয়া জেলার চেয়ে কম শোচনীয় নয়। দৈনিক বসুমতীর ভ্রমণরত সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরটি যেন ১৩৫০ সালের বাংলাদেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট আমাদের বিশেষ নিবেদন এই যে যেন তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে এগিয়ে আসেন। অন্য সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে মন্ত্রিসভাকে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জেলাগুলিতে যেতে আমরা অনুরোধ করি। এ ছাড়া আমাদের আরও দাবি এই যে অনাহার কবলিত এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখ চেয়ে এই চারটি জেলাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হোক। জনসাধারণের নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই যে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত এই জেলাগুলির উদ্ধারকল্পে তাঁরা যেন এগিয়ে আসেন। জনসাধারণের বদান্যতা ও সক্রিয় সহযোগিতায় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাতে পারা যেতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

উপনির্বাচনের শিক্ষা

তমলুক ও উলুবেড়িয়ার উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ ও কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতি-

হাসে একান্তই তাৎপর্যপূর্ণ কেন না এই নির্বাচনে জনসাধারণ বিশেষ এক ধরণের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই পরাজয় রীতিমত শোচনীয়, কেন না দুটি কেন্দ্র থেকেই কংগ্রেস পূর্বের তুলনায় অনেক কম ভোট পেয়েছে।

যদিও এই নির্বাচনের প্রচারকার্যে কংগ্রেসের তরফ থেকে আকাশছোঁয়া মূল্য-বৃদ্ধির বিষয়টিকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রচার করা হয়েছিল, তথাপি নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের রায়ের দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যে সমস্যা বিগত উনিশ বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনে পুষ্ট হয়েছিল, মাত্র তিন মাসে সেই জটিল সমস্যার সমাধান করা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই বাস্তব-সচেতনতার পরিচয় দিয়ে নির্বাচক-মণ্ডলী যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা বর্তমান উপনির্বাচনের ফলাফলের গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই নির্বাচন থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। জনসাধারণের শত অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ আজও এই সরকারের ওপর অকুণ্ঠ আস্থা প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাফল্য তারই প্রমাণ। **কিন্তু জনসাধারণ নেতাদের ওপর যে আস্থা প্রকাশ করেছেন, নেতারা কি সেই আস্থার উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজী আছেন?** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে বিধানসভার অকংগ্রেসী কোন কোন সদস্য জনসাধারণের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার তো প্রমাণ হাতেই রয়েছে। নেতারা যে বহুস্থলে তাঁদের ওপর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন না তার প্রমাণ ভারতবর্ষের কতিপয় রাজ্যে পাওয়া গেছে যেখানে অর্থ, প্রতিপত্তি ও মন্ত্রিত্বের লোভে কোন কোন নেতা সোজা ডিগবাজী খেয়ে শত্রুশিবিরে যোগদান করেছেন।

জনসাধারণ যে সম্পূর্ণভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর আস্থা পোষণ করেন, উপনির্বাচন দুটির দ্বারা তা প্রমাণিত হলেও, যুক্তফ্রন্ট নেতাদের উল্লাসিত হবার বিশেষ কারণ নেই। যাতে এই সমর্থন বরাবর বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যুক্তফ্রন্ট সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছেন যার ফলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ রীতিমত বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার বাড়ালেই সব হয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত বৈষয়িক অধিকার বর্ধিত হয়। সত্য বলতে কি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার জন্য কেন্দ্রের হাতে সর্বক্ষমতা ন্যস্ত থাকার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে কোন মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর নয়। বর্তমান সেট-আপে জনসাধারণের জন্য প্রকৃত কোন কাজ করা অসম্ভব।

কিন্তু একটি কাজ যুক্তফ্রন্ট সরকার করতে পারেন, কিন্তু তা খুব মনোযোগ সহকারে ও দৃঢ়তার সঙ্গে করা হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি। তা হচ্ছে দুর্নীতি দমন। প্রশাসনিক ও অপরাপর ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত দুর্নীতির জন্য কোন ওপরতলার ব্যক্তি শাস্তি পেয়েছেন বলে আমরা জানি না। অথচ দুর্নীতির আসল উৎস সেখানেই। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকার যে নজীর স্থাপন করেছেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করে, সেরকম কোন নজীর পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা বর্তমান ধনতান্ত্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশে সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চয়ই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে পারেন। কোন বিষয়ে নিজে না লিপ্ত হয়ে, সেই বিষয়ের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলা, এবং সেখানে কোন অন্যায় বা দুর্নীতি দেখলে অন্যায়কারীর টুঁটি টিপে ধরা এই কাজটাই যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার করেন তাহলেই যথেষ্ট হবে।

গত উনিশ বছরে কোন অন্যায়কারী সাজা পায় নি। যারা আইনকানুন মেনে চলতে চায় তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপহসিত হয়েছে। ফলে সততার ওপর মানুষের বিশ্বাসই লুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে দুর্নীতিপরায়ণদের কঠোর শাস্তি দিয়ে এমন নজীর সৃষ্টি করা, যা চিরকাল লোকে মনে রাখবে।

বিশেষভাবে সেই সকল লোকেদের খুঁজে বার করতে হবে এবং চরমতম শাস্তি দিতে হবে যারা বেপরোয়া মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। এই জাতীয় লোকেদের একজনও শাস্তি পেয়েছে বলে আমরা জানি না, দু'চারজন চুনোপুঁটি হয়ত ধরা পড়েছে, কিন্তু রাঘববোয়ালেরা বহাল তবিয়তে গাড়ি বাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে শুধুমাত্র এইটুকু প্রত্যাশা করে যে, এই সব ক্রিমিনালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। স্বরাষ্ট্র ও দুর্নীতি-দমন বিভাগ তো মুখ্যমন্ত্রী নিজেরই হাতে। কাজেই তাঁর প্রতি আমাদের একান্ত নিবেদন যে, দুর্নীতি দমনে তিনি আরও তৎপর হোন। অসৎ ব্যবসায়ী ও মুনাফাবাজ মজুতদারদের লক-আপে রাখার জন্য যদি নতুনভাবে প্রিভেন্টিভ ডিটেনসন আইন তৈরি করার প্রয়োজন-বোধ হয় তবে তাও করতে হবে। আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি যে, হৃদয় পরিবর্তনের নীতি এদেশে খাটবে না। যে দেশের ব্যবসায়ীরা শিশুর খাদ্য নিয়েও মজুতদারী মুনাফাবাজী করতে কুণ্ঠিত নয়, তাদের প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ

ভারতীয় সংবিধানের তথাকথিত যুক্ত-রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পরিবর্তন করার দিন বোধ হয় এসে পড়ল। সংবিধানের ছাত্র-মাত্রেই জানেন যে, রাজনৈতিক তথা অর্থ-নৈতিক সকল ক্ষমতার সিংহভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকার দরুণ রাজ্যগুলি একটি তাৎপর্যহীন সত্তায় পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসী আমলে এ অবস্থা হয়ত বা চলতে পারত, এবং চলেও ছিল, কেন না সেই সময় রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের তাঁবেদারী করা ভিন্ন আর কিছু করার ছিল না। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কেন্দ্রের তরফ থেকে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী রাজ্যে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হবে না। এই ঘোষণাটি যে একান্তই আনুষ্ঠানিক তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। একটি বিশেষ দলের কুক্ষিগত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ শাসিত রাজ্য সরকারের প্রতি সুবিচার করবে এটা কখনোই আশা করা যায় না। কেরলের শোচনীয় দৃষ্টান্ত এখনো জনসাধারণ ভুলে যান নি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, মুখে কেন্দ্রীয় সরকার অকংগ্রেসী সরকারগুলির উদ্দেশ্যে যতই প্রীতির প্রকাশ ঘটান না কেন কার্যক্ষেত্রে তাঁরা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন যাতে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে টিকে থাকাই দুষ্কর হয়ে ওঠে।

আমাদের এই অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সরবরাহে অবহেলা। এ অবহেলা ইচ্ছাকৃত। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যখন হাতে মারার উপায় নেই, তখন অবশ্যই তাকে ভাতে মারতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাসিক এক লক্ষ টন খাদ্য চেয়েছিলেন। গত বছর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যখন কংগ্রেসী আমলে ছিল, কেন্দ্র থেকে এর চেয়েও বেশি হারে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। এবারে কিন্তু সাহায্যের

বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক লক্ষের জায়গায় পৌনে এক লক্ষ টন। কিন্তু এও কাগজে কলমে। বাস্তবে কেন্দ্র থেকে কোন মাসেই এর অর্ধেকও পাঠান হয় নি। এবং এই না পাঠানোর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যে যুক্তি দিয়েছেন তাও অভিনব। বিশাখাপত্তম বন্দরে নাকি শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছে, অতএব পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রেরণ বন্ধ।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা শোচনীয় অবস্থায় নেমে এসেছে। কংগ্রেসী সরকার শস্যভাণ্ডার শূন্য করে রেখে গেছে, এবং ফসল ওঠার মরশুমে কিছুই সংগ্রহ করা হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবশ্য সংগ্রহকার্য শুরু হয়েছে, এবং তাতে যা সংগৃহীত হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। খাদ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দু'দুবার জরুরী চিঠি লিখেছেন, স্বয়ং সেচমন্ত্রী দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় খাদ্যচিত্রের পরিচয় দিয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু তাতে কেন্দ্রের হৃদয় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নি। যে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বিহারের জন্য যতটুকু করা উচিত, দলীয় স্বার্থে তার ভগ্নাংশটুকু করেন নি, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের আকুল আর্তনাদ যে নিষ্ফল হবে একথা বলাই বাহুল্য।

কংগ্রেসী আমলে যা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে নিশ্চয়ই তা সম্ভবপর হবে না। ভবিষ্যতে কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পর্কের আরও অবনতি হবে, বর্তমান অবস্থা থেকেই তা বুঝে নেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের দৌলতে কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বড় কম উপার্জন করে না। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গতভাবেই তার একটা ভাগ দাবি করতে পারে যা দিয়ে সে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানী করবে। তা ছাড়া খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষও সীমাবদ্ধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে অনন্যোপায় হয়েই আপাতত এগুলি করতে হবে। কিন্তু তা করেও সম্পর্কের ভাঙন রোধ করা যাবে না, যদি না সংবিধান সংশোধন করে রাজ্যগুলির ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্য

যুক্তফ্রন্ট সরকার মনস্থ করেছেন যে, শাসন বিভাগের কব্জা থেকে বিচার-বিভাগকে পৃথক করবেন। এই বিষয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅমর চক্রবর্তী আইনসভার আগামী বাজেট অধিবেশনে বিল নিয়ে আসছেন। এই সংস্কারটির প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরেই ছিল, কংগ্রেসী আমলেও এই প্রসঙ্গটি বার বার উঠেছিল যদিও কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি।

বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্য না থাকলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থাটাই যে একটা প্রহসনে পরিণত হয় একথা নতুন করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। প্রচলিত ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের একজন অফিসারের পক্ষে বিচার করতে কোন বাধা নেই। যে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে একটি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হল সেই ম্যাজিস্ট্রেটই যদি তার বিচারকর্তা হয়ে বসেন সে ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সুযোগ খুব অল্পই ঘটে। সুখের বিষয় এই যে, বিচার ব্যবস্থার ওপরের ক্ষেত্রে অবশ্য বহু পূর্বেই বিচার বিভাগকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে, এখন নিচের ক্ষেত্রেও শাসন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের সময় এসেছে।

কিন্তু আইনমন্ত্রীর এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য হলেও, এর দ্বারা আমাদের দেশে বিচারের সমস্যার সমাধান হবে না, যদি না বিচার ব্যবস্থাকে অধিকতর দ্রুত ক্রিয়াশীল ও স্বল্পব্যয়সম্পন্ন বিষয়ে পরিণত করা হয়। যথাযোগ্য অর্থব্যয় না করতে পারলে দরিদ্রের পক্ষে সুবিচার লাভ একেবারেই অসম্ভব। আমাদের দেশের বিচারালয়গুলি ধনীদের জন্য, দরিদ্রের জন্য নয়, এ কথা রূঢ় হলেও ধ্রুব সত্য। বিচারের চেয়ে বিচারের সাজ-পোশাকটা এদেশে অনেক বেশি এবং সেই সাজপোশাকের দাবি মিটিয়ে বিচারকের সামনে বক্তব্য তুলে ধরা দরিদ্রের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। উকিল-মোক্তার-পেশকার-টাউট আর কাগজপত্রের দাবি মিটিয়ে মামলায় তারাই জয়লাভ করতে পারে যাদের টাকা আছে, অথচ এই দেশ নাকি গণতন্ত্রী। কাজেই আইনমন্ত্রীর নিকট আমাদের নিবেদন যে, বিচারালয়ে তিনি যেন বিচারপ্রার্থীদের বাস্তব অধিকারটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, বিচারের নামে সময় ও অর্থের অপচয় থেকে দেশ-বাসীদের বাঁচান, এবং অর্থহীন ব্যক্তির পক্ষে সুবিচারপ্রাপ্তির পথটিকে উন্মুক্ত করে দেন। বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করলেই বিচারপ্রার্থীদের দুর্গতি মিটবে না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৬)

আমরা ইতিপূর্বে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু সেগুলি তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছে কি না তা অবশ্য আমরা এখনো বুঝতে পারছি না।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের যে ভদ্রলোকের কথা আমরা লিখেছিলাম, তাঁর চাকরী-কালের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও (তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রত্যক্ষ অভিযোগ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও,) তাঁকে যে কেন নতুন করে নিয়োগ করা হচ্ছে তা সত্যই একটি রহস্য। জানি না স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি করছেন।

এবারে আমরা স্বাস্থ্যকৃত্যকের অপর এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছি। যিনি স্বাস্থ্য অধিকর্তার একজন ঘনিষ্ঠ কর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতায় ওই দপ্তরে জাঁকিয়ে বসেছেন। বর্তমানে তিনি না কি একজন ওয়ার্ডমাস্টার হিসাবে চাকুরীতে বহাল আছেন এবং ওই পদে তাঁর মাহিনা ও উন্নতি হয়েছে, অথচ আশ্চর্য তিনি নাকি একদিনও ওয়ার্ডমাস্টার হিসাবে কোথাও কাজ করেন নি। আজ থেকে ছয় মাস আগে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাস-পাতালে ওয়ার্ডমাস্টার হিসাবে এই ভদ্রলোককে বদলী করা হয়, কিন্তু তাঁর মুরুব্বি স্বাস্থ্য অধিকর্তার সেই ঘনিষ্ঠ কর্মচারী তাঁকে ছাড়তে নারাজ। ৩১।৩।৬৭ তারিখে স্বাস্থ্য দপ্তরের সহ-অধিকর্তা না কি তাঁকে নিশ্চিতভাবে ছেড়ে দেবার জন্য হুকুম দেন, কিন্তু স্বাস্থ্য অধিকর্তার সেই ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি সেই হুকুমের কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐ ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি এই ব্যক্তিকে নাকি আবার ট্রানসপোর্ট অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে নিয়োগ করতে চাইছেন, এবং ভদ্রলোক তাতে রাজী আছেন কি না তা জানতে চেয়ে তাঁকে না কি চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

এই ভদ্রলোক এবং আরও অনেকের ব্যাপার নিয়ে একটি তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই তদন্তের রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি চেপে রেখেছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা—স্বাস্থ্য অধিকরণের প্রকৃত মালিক কি স্বাস্থ্য অধিকর্তার ওই ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি?

স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটির বিরুদ্ধে নিজের সেকশনে অপ্রয়োজনীয় টাইপিস্ট ও মহিলা কর্মী-দের, এবং একদল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে রেখে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে দিয়ে নিজের বাড়ির কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বদলী হবার আদেশ হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটিকে নিজের স্থান থেকে নড়ানো সম্ভবপর হয় নি।

স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি এবং তাঁর প্রিয়ভাজন উপরিউল্লিখিত কর্মচারীটির বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় একটু ভেবে দেখবেন কি?

॥ মহানাদ আদিকথা ॥

গ্রামবাংলার কথা

প্রকাণ্ড বিল, যতোদূর দৃষ্টি যায় থৈ-থৈ জল আর জলা। কাদা জমি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠা দল-ঘাসের একবুক জঙ্গল। মোষ চরাতে এসেছিল কানাই। মোষ মনিবের। সে রাখাল। দেখে-শোনে, চরায়-খাওয়ায়। অনেকগুলো আছে পালে। গাই মোষই বেশি। মস্ত মদ্দাও আছে গোটা দুই।

কিন্তু ওরা আজ বদমায়েসী জুড়েছে। কানাই-এর বয়স হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। নিকষ কালো রং, আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুলে দেখায় যেন যমরাজের সাক্ষাৎ অনুচর। যমের বাহন কালো কালো ঐ মোষের দলকে জব্দ করতে সে পারে। মস্ত মোটা গিঁটোলো বাঁশের পাকা লাঠি দিয়ে দমা-দম পিটিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না দরকার হলে।

কিন্তু আজ ওদের বজ্জাতি অন্য রকম। আজ ওদের খাওয়ার টান, লোভের বজ্জাতি। দোষও নেই। চোত-বোশেখের ধু-ধু খরা। দহের ওদিকে ঐ উঁচু দিকটায় ঘাস প্রায় নেই বললেও চলে। যতোটুকু আছে রাজ্যের গরু-বাছুর খুঁটছে রাতদিন। এদিকটা নিচু। একবুক জল-কাদা, বজবজে পাঁকে ভর্তি, আর তারই মধ্যে নমি পেয়ে বেড়ে ওঠা ঘাসের জঙ্গল। সতেজ, সবুজ লক-লকে। মোষের দল পেয়েছে মজা। নরম ঠাণ্ডা জলকাদায় নেমেছে প্রায় বুক ডুবিয়ে, মুখের সামনে ঘাসের গোছা, মহা আনন্দে খাচ্ছে মস-মস, মস-মস।

কিন্তু মুস্কিলও আছে যে। বড্ড সাপের উৎপাত এদিকটায়। শামুক-ভাঙা কেউটে আর তেঁতুলে গোখরো। জলা-জুঁইয়ে তাদের অবাধ বিচরণ। দিনের বেলাই চরে বেড়ায়। বলা যায় না দেয় যদি ঠুকরে। দুধোলো গাই রয়েছে, কচি কোয়ালে বাছুরও রয়েছে কয়েকটা। কানাই ভয় পায়, উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকতে থাকে—উঠে আয়—হোঃ হোঃ হোঃ উঠে আয়, উঠে আয়। মোষেরা ওঠে না। আজ তাদের বজ্জাতিতেই ধরেছে। সবচেয়ে বজ্জাত ঐ জোয়ান মদ্দাটা। ঐ দলের সর্দার। হুড়মুড় করে নিজে গিয়ে নামলো, নামালো অন্য সব-গুলোকেও। কানাই ডাকে—আয় গুণ্ডা আয়, উঠে আয়—উঠে আয়।

গুণ্ডা আসে না। ডাক শোনে, ঘাড় উঁচু করে ছোট ছোট রক্তাভ চোখে চেয়ে দেখে একটু। তারপর মস্ত শিং সুদ্ধু

পারুল ভট্টাচার্য

মাথাটায় ছোট একটু ঝটকা দিয়ে মুখ নিচু করে খেতে থাকে আবার।

কানাই বিরক্ত হয়। ভারি পাজী মোষ হয়েছে গুণ্ডা। পাজী আর অবাধ্য। আস্কারা পেয়ে পেয়েই হয়েছে আর কি। আস্কারা ওকে একটু বেশিই দেয় কানাই। এগারো দিনের বাছুর রেখে মা মরে গিয়েছিলো ওর, একেই মোষের বাচ্ছা বাঁচে না, তায় আবার মা মরা। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ওর খেদমত খেটেছে কানাই। বাঁশের চোঙায় দুধ খাওয়ানো, শীতকালে সেঁকতাপ, খড়ের আঁটির বিছানা পেতে শুইয়ে রেখেছে নিজের সিথান গোড়ায়। কোথায় কচি ঘাস, কোথায় নরম পাতা, ফিকিরে ঘুরেছে দিনরাত। নিজের ভাগের ভাগ যে কতো ওর পেটে গিয়েছে তার আর ঠিক নেই। তারপর গুণ্ডা বড় হয়েছে, দুষ্টু হয়েছে, আর এখন তো সে প্রকাণ্ড জোয়ান মদ্দা মোষ। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড শরীর, মেঘের মতো কুচ্‌কুচে কালো রং, আর তেলে জলে পাকানো চক্‌চকে শিং জোড়া যেন লাঙলের সুচলো ফলা। কানাই-এর ভারি আদুরে মোষ গুণ্ডা। মনিবগিন্নী ঠাট্টা করে বলেন—মোষ নয়, ও কানাই-এর বেটা।

কিন্তু এখন তার রাগ ধরে যায়। বৃথা চেষ্টায় ডাকা-ডাকি করে আরও বারকতক। তারপর বিরক্ত হয়ে উঠে এসে বসে সরু উঁচু সঙ্কীর্ণ বাঁধটার ওপর। মরগে যা, গোল্লায় যা। দেবে কেউটে সাপে ছুবলে, বুঝবি তখন—বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। পা ছড়িয়ে বসে কোঁচড় খুলে মুড়ি বার করে মুখে দেয় মুঠো মুঠো। মনে উদ্বেগটা থাকে। একটা চোখের নজরও পড়ে থাকে মোষগুলোরই দিকে। কিন্তু কি আর করা যাবে, ওরা যখন উঠবেই না কিছুতে—

চটকাটা ভেঙে গেল আচমকা। দুপুরের সূর্য আরও ওপরে উঠেছে, আশ-পাশে হিজলের ঘন ছায়া। কিন্তু ঘুম ভাঙলো কেন? মোষগুলো ওদিকে ঠিকই আছে। শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল কানাই। খেয়ে যাচ্ছে এখনও একভাবে। খেতে খেতে একটু এগিয়েও গেছে ওদিকে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বিলের ওপর দিয়ে। কিন্তু তন্দ্রাটা ভেঙে গেল কেন। তাড়াতাড়ি উঠে এদিকে-ওদিক চাইতেই নজরে পড়লো বাঁধের ঠিক নিচটাতে, হাত পাঁচেকের মধ্যেই হবে উঁচু লম্বা ঘাসবন দুলছে ঘন ঘন। মৃদু শব্দ হচ্ছে সর-সর, সর-সর। মুহূর্তে সতর্ক হলো কানাই। জায়গা ভাল নয়। সাপ তো আছেই, বাঘের উপদ্রবও হয় মাঝে মাঝে। ক'দিন আগেই বড় বাঘা একটা এসেছে এদিকপানে। গরু ছাগল নিচ্ছে, মানুষও নাকি নিয়েছে একটা-দুটো। কিন্তু এখন এই দিনের বেলায় নিচু হয়ে বাঁশের লাঠিটা তুলে নিতে গেলো কানাই, আর তখনই নজরে পড়লো বুকভোর উঁচু ঘাসবনের আড়ালে প্রকাণ্ড হাঁড়ালো মুখ, হলদে কালো

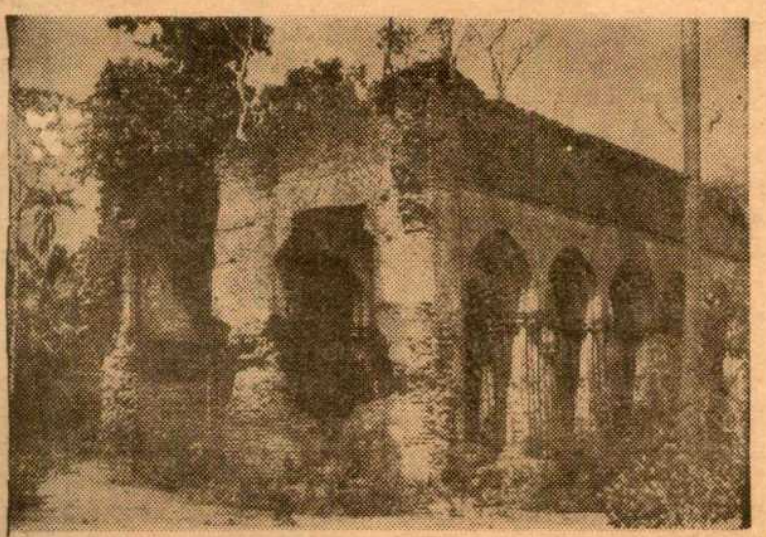

একদা প্রাসাদময়ী মহানাদের ইদানীং ধ্বংসাবস্থা

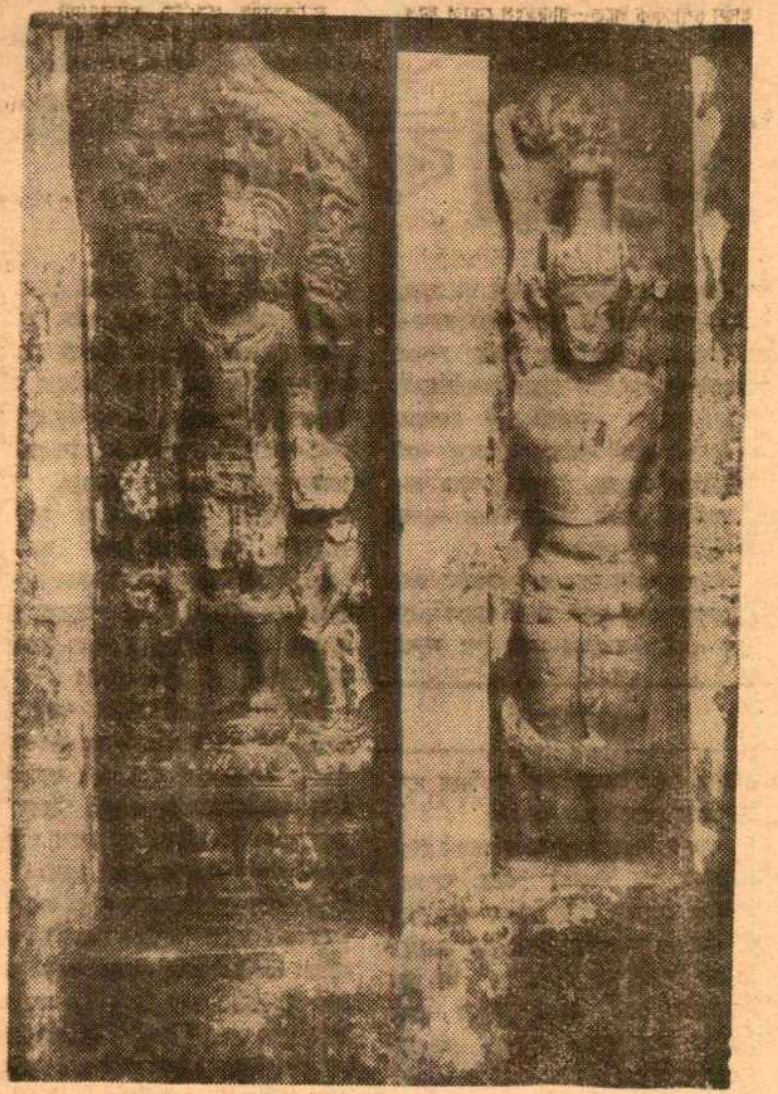

মহানাদে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি

ডোরার আভাস, আর ঝিলিক-হানা ক্রুর কপিশ পিঙ্গল চোখ এক জোড়া—

এক মুহূর্ত। বাঘের লেজ দুলছে। শরীরের সামনের অংশ একটু নিচু। লাফ দেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নিজের অসহায় অবস্থাটা যেন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলো কানাই। মাথার ওপরে হিজলের ডাল অত্যধিক নিচু! বাগিয়ে লাঠি ধরা যাবে না এখানে। ধরলেও, মারা যাবে না ঘুরিয়ে। বাঁধ সরু, সঙ্কীর্ণ, সরে-নড়ে এগিয়ে-পিছিয়ে যাবারও জায়গা নেই। লাফ দিলো বাঘ। অবরুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে ঠক করে একটা শব্দ। কানাই-এর লাঠি লেগেছে তার মাথায়। তেমন জোরালো নয়, তবু আঘাত, এবং ঠিকরেও পড়েছে বাঘ। আর ঠিক সেই সঙ্গে বুকফাটা একটা আর্তরব বেরিয়ে এসেছে কানাই-এর মুখ দিয়ে—গুণ্ডারে খেয়ে ফেললে। বাঘ আবার লাফ দিলো, সরে গিয়ে পাশ দেবার চেষ্টা করলো কানাই। পারলো বটে কিন্তু বাঁ-কাঁধের এক চাপড়া মাংস উঠে গেলো বাঘের থাবার আঁচড়ে।

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। মুহূর্তে মুখ তুলেছে মোষের পাল। লম্বা গলা উঁচু করে সচকিতে সাড়া দিয়েছে গুণ্ডা—আঁ-আঁ-আঁ। আর তার-পরেই জলা-জমি তোলপাড় করে ঘাসবন ঝোপ-ঝাড় ভেঙেচুরে তছনছ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে লাগলো মোষের পাল। সকলের আগে প্রকাণ্ড জোয়ান মদ্দা মোষ গুণ্ডা।

বাঘ বেচারী বে-কায়দায় পড়েছে তখন। মোষের দলকে ঘাঁটাতে সে চায় নি। ঘুমন্ত মানুষটাকে টুক করে তুলে নিয়ে যাবে এই ছিল তার বাসনা। কিন্তু মানুষটা জেগে উঠেই বিভ্রাট বাধিয়েছে। আর ওদিকে কালান্তক যমের মতো ধেয়ে এসেছে মোষের পাল। অর্ধ গোলাকারে দাঁড়িয়ে গেছে খুঁটে পেতে। এবং এখন সেই বেষ্টনী ছোট হয়ে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। সারি সারি শিং বাঁকিয়ে পাতা। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসে অবরুদ্ধ ঝড়ের ইঙ্গিত।

ইতস্তত করে একবার বোধ করি পালাবারও চেষ্টা করলো বাঘ। তার পরেই সম্ভবত মনে পড়ে গেল তার—সেও জঙ্গলের রাজা, অরণ্যের অধীশ্বর। হুঙ্কার দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বাঘ, প্রচণ্ড গর্জনে দিগন্ত কাঁপিয়ে লাফ দিয়ে পড়লো সকলের আগে এগিয়ে আসা মত্ত সেই মদ্দাটার ঘাড়ে।

লড়াই শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চটকানো, থেঁতলানো, দলা পাকানো বাঘের দেহটা পড়েছিলো একপাশে। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড গুণ্ডার শরীরটাও ঘাড় মুখ গুঁজড়ে হেলে পড়েছে এক হাঁটু জল-কাদা আর দলবনের মাঝখানে। একটা চোখ নেই, গর্দানের মাংস উড়ে গেছে। গলার কাছে টুঁটি কেটে লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে গল-কম্বল। গলগল রক্তধারায় গা ভাসিয়ে এলিয়ে পড়ে হাঁফাচ্ছিল গুণ্ডা। বড় বড় নিশ্বাসের ধাক্কায় সারা শরীর কাঁপছিল তার।

চীৎকার করে উঁচু বাঁধের ওপর থেকে লাফ দিয়ে আছড়ে আপসে পড়েছিল কানাই। বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠেছিল গুণ্ডার এলানো হেলে-পড়া রক্তাক্ত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে।

মোষ চরানো ছেড়ে দিয়েছিল কানাই বাউরী। বাঁ হাতখানা শুকিয়ে ঝুলে পড়েছিল কাঁধের নিচ থেকে। দুর্ঘটনার পরে খবর পেয়ে লোকজন নিয়ে মোষের মালিক ভিন গাঁয়ের সদগোপ-কর্তা যখন ছুটে গিয়েছিলেন তখন গুণ্ডা মরে গেছে। কানাই অজ্ঞান আর বাদবাকী মোষগুলি দুটি দেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নিচু মুখ বিষণ্ণ। ধরাধরি করে ঘরে আনা হলো কানাইকে। প্রাণ বাঁচলো কিন্তু হাত-খানা সারলো না। বাঘের পাঞ্জার আঁচড় লেগেছিল বাঁ কাঁধে। সারা বাঁ-হাতখানাকে নিয়ে তবে ছাড়লো।

লোকে বলে মাথাও নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। বিড়বিড় বকতো, হেথা-হোথা ঘুরতো। কাঁদতো আপন মনে। কেউ বলে গুণ্ডার শোকে। কেউ বলে অত্যধিক ভয়ে আর বাঘের থাবার ঘায়ের শকে। হবেও বা হতেও পারে।

* * *

না আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলছি না। বাদাবন বসতের অসম সাহসিক শোনা ইতিকথাও নয়। এই মাত্র সেদিনের কথা। মহানাদের চন্দ্রদহের আশে-পাশে ছিল বিস্তীর্ণ বিল। বন ঘাসবন, আর দল-জঙ্গল। পায়ে পায়ে সাপ আর পলকে

পলকে বাঘের সাক্ষাৎ। সেইখানেরই মোষের রাখাল কানাই বাউরী আর তার পোষা মোষ গুণ্ডার কথা কাহিনী হয়ে আজও ফেরে মানুষের মুখে মুখে। আশ-পাশের পাঁচটা গ্রামের হাড়ি ডোম বাউরী বাগদী পাড়ায়

* * *

কিংবদন্তী আছে মহাশঙ্খের ধ্বনি উঠেছিল এখানে। তাই নাম হয়েছে মহানাদ। কিন্তু কিংবদন্তী কিংবদন্তীই। একটুখানি বলে বেশির ভাগটা চুপ থাকে। তাই কাদের শঙ্খ, কে বাজালো, কেনই বা প্রয়োজন হলো সহসা মহাশঙ্খ বাজাবার এসব প্রশ্নের কোন জবাব তার ভাঁড়ারে নেই। থাকলেও সে দেয় না, কিংবদন্তী একেবারে নীরব এখানে।

কেউ কেউ বলেন অনেক কালের গ্রাম। কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোন আদি ইঙ্গিত পাওয়া যায় না আজও। মান্ধাতার আমলের গ্রাম। তাই থেকেই হয়েছে মানাদ বা মহানাদ।

কিন্তু জটেশ্বরনাথ-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এখানে। বাংলার নাথ ধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র, নাথপন্থী শৈব সন্ন্যাসীদের মহা তীর্থস্থান। তাই মহানাথ তীর্থ থেকেও মহানাদ হতে পারে। অন্তত অনুমান করলে দোষের কিছু নেই।

* * *

জনবসতিহীন জল ও জঙ্গলময় মহানাদে মল্লভূমির বিতাড়িত মহারাজা চন্দ্রকেতু বর্মা এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে লিখেছেন মহানাদ বা বাংলার গুপ্ত ইতিহাস প্রণেতা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সিংহ বংশ মৌদ্গল্য গোত্রীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। সম্ভবত বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা আদিশূরের তাড়া খেয়েই এদিকে পালিয়ে এসে থাকবেন তাঁরা। মহানাদে সিংহ বংশের অধিকার, তাঁদের প্রভাব, প্রতিপত্তি শৌর্য-বীর্য প্রভৃতি নিয়ে অনেক কথা ও কাহিনী প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। কিন্তু প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি। রাজা চন্দ্রকেতুকে নিয়ে কিংবদন্তী যতই থাক, কোনো শিলালিপি, স্বর্ণমুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি কিম্বা পাথর পাওয়া যায় নি তাঁর সম্বন্ধে। যাতে করে ইতিহাসের আদালতে রাজা চন্দ্রকেতুর একদা অস্তিত্বকে সত্য বলে সপ্রমাণ করা যায়।

তথাপি কিংবদন্তী আছে, মহানাদের সিংহ বংশ আছে, চন্দ্রদহ, চন্দ্রগড়, চন্দ্রদীঘি প্রভৃতি নামধারী জলাশয়গুলি আছে। আর আছে মানুষের মুখে মুখে গাওয়া গান—

মহানাদ মহাস্থান—দিব্য চিন্তামণি ধাম
শিবের মন্দির মনোহর।
রাজা চন্দ্রকেতু গড়ে—রাজহংস কেলি করে
কমল শোভয়ে মনোহর—

আর এতই যখন আছে তখন মহানাদে সিংহ বংশের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে যৎসামান্য জল্পনা করলেই বা ক্ষতি কি।

* * *

প্রায় তিনশো বছর আগে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ের পণ্ডিত জগমোহন লিখিত একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই পুঁথিতে মানাত দেশ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে।

"অথ মানাত দেশ বিবরণম্—
যোগি জাতি গৃহে জাত
ভাগ্যবান্ সর্বলক্ষণঃ।
মহেন্দ্র নারায়ণ নৃপো
মানাত নগরে পুরা॥
মৃত্তিকাময় দুর্গস্তু মর্যাদাভঃ
সমন্বিতম্
স্থাপিতা বেণু-বৃক্ষাস্তু
দুর্গমধ্যে পুরানৃপৈঃ॥
* * *
প্রাচীনা রাজবাটী চ বর্ততে
ভগ্নবাটীকা।
রাজবাট্যাঃ পার্শ্ববর্তী—
বহব্যো যোগিজাতয়ঃ
মানাত খিখ্যাতো রাঢ় দেশেষু॥

By Manata is meant the district of Hoogli where there is a famous village called Manada. It sepeaks of Chinnaukna popularly known as China Akna, of Saptagrama, where,

জটেশ্বরনাথের মন্দির (মহানাদ)

in by-gone days, a vaidya dynasty of kings is said to have ruled. It further speaks of Triveni where the three rivers meet of, Peduapagrana and of (45A) Padanadana (?) where there was a temple of Goddess Visalaksi.

45A. Colophon. ইতি দেশাবলি বিবৃতৌ রাঢ় দেশ মধ্যে মানাত দেশ বিবরণম।"

Catalogue Sanskrit Manuscripts Government Collection Page 51.

মহানাদের প্রামাণ্য দলিল বলতে এই। এবং যদিও এখানে এক মহেন্দ্রনারায়ণ নৃপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি সিংহ বংশীয় নরপতি কি না সে সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত নেই। তাই অনেকেই এঁকে জটেশ্বরনাথের সেবাইত যোগীরাজ মহান্ত বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু এ নিয়েও চিন্তা করবার আছে। এবং কয়েকটি বিশেষ বিষয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমত মহানাদে যোগীরাজ মহান্তদের নামের যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মহেন্দ্র নামধারী কোনো মহান্তের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত জটেশ্বরের মহান্তরা নাথপন্থী, হঠযোগী, এবং কান ফাটা সম্প্রদায়। এঁরা আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকেন, দেহান্তে এঁদের সমাহিত করা হয় এবং মহান্ত পদীতে আসীন হতে হলে নামের শেষে নাথ শব্দ এঁদের অবশ্য ধারণীয়। যেমন হরকনাথ সহজনাথ দুর্নিনাথ ইত্যাদি।

মহেন্দ্রনারায়ণে কোনো নাথ নেই। নামের শেষে ইন্দ্র তথা নারায়ণ সাধারণত রাজা বা জমিদারকুলেই যুক্ত হয়ে থাকে। বিশেষত একদা রাজবাড়ির আশে-পাশে যুগী জাতির (যোগি নয়) বৃহৎ বাসভূমি ছিল বলে আজও জানা যায়। এবং সম্ভবত এই যুগীরাই জগমোহনের লেখনী বিভ্রাটে যোগীতে পরিণত হয়ে থাকবে।

হওয়া অসম্ভবও কিছু নয়। কারণ জগমোহন পাটনার অধিবাসী ছিলেন। পাটনা বিহারে, এবং জগমোহন পণ্ডিত মানুষ। তাই সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দীই ছিল তাঁর কথ্য-ভাষা এমন আশা করা যায়। হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দমালায় 'ব'-এর উচ্চারণ নেই। আছে 'ইয়'। কাজেই যুগী হবে না, হবে ইয়ুগী। আর এই ইয়ুগীই যদি অধিকতর পরিমার্জনে ইয়োগী (যোগি)-তে পরিণত হয়ে থাকে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই তাতে।

১৬০৫ থেকে ১৬২৭ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। মহানাদের রাজবংশ তালিকার এই সময়ের মধ্যে এক নরপতির নাম পাওয়া যাচ্ছে মহেন্দ্র। ১৫৭০-এ তাঁর পিতার মৃত্যু এবং তাঁর রাজত্বকালের সূত্রপাত।

তাঁর সূত্রপাত, কিন্তু সিংহ রাজবংশের শেষ ঘনিয়ে এসেছে তখন। পাণ্ডুয়া এবং মহানাদে মুসলমান অধিকার স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, রাজা মহেন্দ্রের অন্তত তিন থেকে চার পুরুষ পূর্বেই।

পাণ্ডুয়া আর মহানাদে তখন একই হিন্দু রাজার শাসন ছিল, দিল্লীর পাঠান সম্রাট জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহের ভাগিনেয় শাহ সুফী পাণ্ডুয়ায় বাস করতেন। কোনো কারণে হিন্দু নরপতি রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের ওপর বড়ই বিরক্ত হন। বিরক্তির মাত্রা শাহ সুফীর ওপরে কিছু বেশিই হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। কারণ প্রাণভীত শাহ সুফী পালিয়ে যান দিল্লীতে এবং সম্রাটের সৈন্যদল ও ত্রিবেণী-বিজেতা জাফর খাঁ গাজীর সহায়তায় আক্রমণ করেন পাণ্ডুয়া। পাণ্ডুয়া বিজিত হয় ও সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে রাজা সরে আসেন মহানাদে।

পাণ্ডুয়া সহজেই বিজিত হয়েছিল। কিন্তু মহানাদে এসে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় শাহ সুফীকে। প্রবাদ মহানাদে নাকি জীয়ৎ কুণ্ড ছিল। এই কুণ্ডের জল ছিটিয়ে দিলে মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করতো। ফলে মহানাদের হিন্দু সৈন্যদল মরেও মরছিল না। কুণ্ডের জলস্পর্শে প্রাণ ফিরে পেয়ে যুদ্ধে এগিয়ে আসছিল আবার। পরিশেষে চক্রান্ত। কাজিমন ফকীর নামে এক ফকীর হিন্দু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে জটার মধ্যে গোমাংস লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে স্নান-ছলে কুণ্ড অপবিত্র করে দেন। কুণ্ডের জীয়ৎ শক্তি অন্তর্হিত হয়। ফলে হৃতবল মহারাজের পরাজয়—মহানাদেরও পতন।

কুণ্ড কথা অলৌকিক হতে পারে। কিন্তু বড় রকমের একটি যুদ্ধ যে মহানাদে হয়েছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য। পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেণীর মতো মহানাদেরও মন্দিরগুলি অপবিত্র, মূর্তিগুলি খণ্ড-বিখণ্ড, ও রাজপ্রাসাদ ধ্বংসে করা হয়েছিল। জলতলে নদীগর্ভে জগলে মাটির তলায় কুঠারক্ষত দেবমূর্তি খণ্ড-বিখণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ এবং কারুকার্যখচিত মন্দিরের অংশবিশেষগুলিতে তার ছড়ানো ছিটোনো প্রমাণ আজও পড়ে রয়েছে মহানাদের হেথা-হোথা—সর্বত্র।

সংশয়ী প্রশ্ন করতে পারেন এতই যদি হয়েছিল, জটেশ্বরের মন্দির রক্ষা পেয়ে গেল কি করে?

উত্তর—রক্ষা পায় নি। আক্রমণ জটেশ্বরনাথের মন্দিরেও হয়েছিল। প্রমাণ মন্দিরের সামনে প্রায় সাত হাত উঁচু এবং দু'হাত প্রস্থ-ব্যাস বিশিষ্ট প্রকাণ্ড ভগ্ন, কুঠারক্ষত চিহ্নযুক্ত শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট। এতবড় শিবলিঙ্গ বাংলাদেশে নেই। ভারতবর্ষেও আছে কিনা সন্দেহ। এবং এই এতবড় শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত হওয়ার মতো মন্দির বা শিবতীর্থ কাছাকাছির মধ্যে আর কোথাও নেই, একমাত্র মহানাদের নাথতীর্থ ছাড়া। একথা অবশ্যই স্বীকার করা যেতে পারে যে, হানাদারেরা নিশ্চয়ই অপর কোনো দূর দেশ থেকে ভাঙা মূর্তির পাথরের বোঝা বয়ে এনে এখানে ফেলে রেখে যায় নি ও বিগ্রহ জটেশ্বরনাথেরই আদি লিঙ্গ। মন্দির আক্রান্ত হয়েছিল, বিগ্রহ নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বাইরে। বর্তমান বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মন্দিরও সংস্কৃত হয়েছে সন্দেহ নেই।

মনে রাখতে হবে এ সমস্ত ঘটনাই দেশাবলি বিবৃত রাজা মহেন্দ্রর অনেক আগেকার কথা। এসব ঘটনা ঘটে যাবার পরেও মহানাদে সিংহ বংশ ছিল, এবং রাজা নামেই ছিল। (সম্ভবত পূর্ব মহারাজা খুব বড় রকমের ধনসম্পত্তি দিয়ে একটা আপোষ করে নিয়ে থাকবেন শাহ সুফীর সঙ্গে) যদিও নামে মাত্র রাজা। রাজ্যের অবস্থা তখন শোচনীয় এবং দীনাতিদীন দৈন্যের একেবারে কিনারায় এসে ঠেকে রাজকীয় গৌরব—হৃতশ্রী হৃতগৌরব রাজকুলের দৈন্য তথা দারিদ্রের সেই দীন মূর্তিটিই ধরা দিয়েছে জগমোহনের লেখনীতে—

প্রাচীনা রাজবাটী চ বর্তন্তে ভগ্না বাটীকা—

* * *

মহানাদে সিংহ বংশের অস্তিত্বকে হয়তো অস্বীকার করা যায়। কিন্তু প্রাচীন পরিশত এবং শক্তিশালী একটি রাজকুলের অধিকার যে এখানে ছিল এ তথ্য উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মূর্তি, মন্দিরাংশগুলি, মকরমুখ জলনিকাশ, এবং বিচিত্র কারুকার্যময় পাথরের স্তম্ভগুলিতে সেই সত্যই প্রমাণিত। প্রাচীন পরিখার অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। চন্দ্রদহ, বশিষ্ঠ গঙ্গা প্রভৃতি জলাশয়গুলি ঐ পরিখারই না মজে যাওয়া অংশ। পুরাতন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপও সন্ধানী চোখে আজও ধরা পড়ে।

জটেশ্বরের মন্দির সাদামাটা। শিবলিঙ্গের কোনো জাতি নেই। কিন্তু পাশেই দোচালা মন্দিরে অন্নপূর্ণার মূর্তি লক্ষণীয়। মন্দিরটি কিছু আধুনিক কিন্তু মূর্তির জাতি নির্ণয়ে সম্ভবত ঐতিহাসিককে পিছিয়ে যেতে হবে অনেক কাল।

হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেফটেনান্ট

থাকবার দিকেই যার প্রবণতা বেশি। যুক্তি যেখানে তর্কসাপেক্ষ, প্রমাণ যেখানে অনুমাননির্ভর, সেখানে এই কথা-কাহিনীর সুতো ধরে ধরেই ইতিহাসের ইশারা খুঁজে আনতে হয়। অনুসন্ধানের আসল প্রচেষ্টা তার অনেক পরে।

মহানাদের সিংহ বংশ প্রমাণিত হোক অথবা না হোক, ইতিহাসের দরবারে তার অস্তিত্ব অভ্রান্তির স্বীকৃতি পাক কিম্বা নাই পাক, কিংবদন্তীরা থাকবে, উপ-কথারা থাকবে। আর মানুষের মানসে থাকবে তাদের একটি অটল আসন, এক অচ্যুত আশ্রয়। একদিন যা ছিল আজ যা নেই, সেই একদা থাকা—এবং অধুনা না-থাকার এক করুণ-মধুর, আনন্দ-বেদনার মিশ্রিত সৌরভে অপরূপ এক-খানি স্মৃতির অনুরণন।*

[*আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত। পরের বারে—'মহানাদ পরের কথা']

প্রভুদাস

শ্রীঅপর্ণা সান্যাল

সবেমাত্র ভাতের গ্রাস মুখে তুলেছে। ডাক পড়ল। সামনেই বসেছিলেন মা। মনটা অন্যমনস্ক। উঠোনে রক্তকরবীর গাছটায় দুটো শালিক ঠোকাঠুকি করছে। চোখটা সেইদিকে। ডাক শুনে মুখ ফেরালেন।

শাকের ভেতর ডালটা ঢেলে নিয়েছে সুব্রত। গোগ্রাসে গিলছে। গলার শিরাটা ফুলে উঠছে। চামড়ার আবরণ ঢাকা কয়েকখানা হাড়। একনজর তাকিয়েই সুমতি দেবী উঠে দাঁড়ালেন। থান কাপড়টার অনেক জায়গায় তালি। গায়ের ওপর একটু গুছিয়ে নিলেন—তুমি খাও, আমি দেখছি।

কোনমতে শেষ করল খাওয়াটা। সমর অপেক্ষা করছে। তাড়াহুড়ো করে লুঙ্গিটাকে ছেড়ে রাখল। ডিউটির পোষাক পরে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল—কি ব্যাপার?

সেক্রেটারী একবার আপনাকে ডেকেছেন—

এখন হবে না,—বলে দিও পরে দেখা করব।

সমর তবু গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। একটু ইতস্তত করল—আর একটা কথা। থ্রি-ফোর—কোন ক্লাশেই ব্ল্যাকবোর্ড নেই। আরও কিছু জিনিষের দরকার।—এবার ঢোক গিলল—কিছুটা আমরা সংগ্রহ করেছি। পাঁচ-সাত টাকা শর্ট পড়ছে।

চিন্তার রেখা ফুটেছে সুব্রতর মুখে। মাসের শেষদিক। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সমর। এই একটা লোকের ওপর কতই আর চাপ দেওয়া যায়। একটা অদ্ভুত বিদ্বেষে মনটা তেতো হয়ে রইল। এই আদর্শপল্লীতে, এমন কি স্কুল কমিটিতেও এমন অনেকেই রয়েছেন—যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি আছে, কিন্তু উপদেশ ছাড়া অন্য কোনরকম দানে আগ্রহের একান্ত অভাব। স্কুলটা যেন সুব্রতদার পৈতৃক সম্পত্তি। এই মাসের গোড়ার দিকেই আরো কিছু সাহায্য করেছে ও। আবগারি বিভাগের ঐতো চাকরি। স্কুলটাকে নেহাত না কি প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—তাই!—সকালবেলা চাঁদা আদায়ের তিক্ততাটুকু মনের মধ্যে জমাই ছিল—আর এক পোঁচ রং চড়ল তাতে।

সুব্রত ততক্ষণে ভেতরে ঢুকেছে। চিন্তিত মুখে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল—মা—কয়েকটা টাকা—

একমুহূর্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সুমতি। ছেলের দুর্বলতা তাঁর জানা। অভাবের সংসার। দুই বোন ঘাড়ে। তাদের পড়াশোনা আছে। বিয়েও দিতে হবে। তাই নিজে বিয়ে করে নি সুব্রত। বিড়ি-সিগারেট-পান কিছুই খায় না। থাকার মধ্যে একটু-আধটু আড্ডা আর তাসের নেশা। বলে—ওতে তো পয়সা খরচ নেই। এই একটিমাত্র দুর্বলতা—স্কুল। তাই কিছু বলতে বাধে।

নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকলেন। নিজে না হয় বুড়ো, ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ে লজ্জা নেই। কিন্তু অনু-তনু? পুরোনো টিনের সুটকেশ থেকে একটা কৌটো বের করলেন। সব খুচরো। আধুলি-সিকি, দশ-পাঁচ পয়সা।

সুব্রতই মাকে উপদেশ দিয়েছে খুচরো পয়সা রাখতে। তাতে না কি খরচ কমানো যায়। যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই নেওয়া যায়।

টাকা গুণে নিয়ে ও সমরের হাতে দিল। তারপর ওর সাথেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। মনে মনে হিসেব চলল—কার কাছে ধার পাওয়া যেতে পারে।

স্কুলের জন্যে ও অনেক কিছু করেছে। সহ্যও করেছে অনেক। ঔপনিবেশিক নগরে দলাদলি, কুটিলতা যত বাধা দিয়েছে—ওর রোখও তত চড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কয়েকজনের সহায়তায় একজনের ফাঁকা জমিতে টিনের চাল তুলে এই প্রাইমারী স্কুল দাঁড় করিয়েছে। এই কয়েক মাসে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও মন্দ দাঁড়ায় নি। এবারে এই ইন্সপেকশনের ওপর স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সাহায্য পেলে আরো বড় হবে স্কুল। আরো কয়েকটা ক্লাস খোলা যাবে। তাই এত দুশ্চিন্তা, এত তোড়জোড়।

সময় নেই সুব্রতর। অনেক চেষ্টা করে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনটা তাই অস্থির। ইন্সপেকশনটা না হওয়া পর্যন্ত যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। স্বস্তি পাচ্ছে না একটুও। ডিউটির একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। শেষ খবরটা জেনে আসা যাক। ঠিকানা খুঁজে ওদের অফিসে গিয়ে হাজির হোল। আর আশ্চর্য ঘটনা ঘটল সেইখানে।

ইন্সপেকশনের দায়িত্ব যাঁর হাতে পড়েছে তিনি সাব-ইন্সপেক্টর নন।

মে আই কম ইন প্লিজ?

ইয়েস—মেয়েলি স্বর।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই চোখাচোখি। চোখ তুলে তাকিয়েছেন সাব-ইন্সপেক্‌ট্রেস। এক ঝলক বিস্ময়। বিস্মৃতির কুয়াশায় অস্পষ্ট কয়েকটা ছবি।

চেনা কঠিন। তবু কিন্তু চিনতে পারল শমিতা। শমিতা বোস। সুব্রত-ও। হয়ত ভোলা আরও কঠিন বলেই।

সুব্রতর পা আড়ষ্ট। থমকে গেল একটু। গলা দিয়ে স্বর ফুটতে চাইল না। উদ্ধার করল শমিতাই। বয়েস বেড়েছে অনেক। তার চেয়ে বেড়েছে মনের বয়েস। আপনা থেকেই আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব এসে পড়েছে। ইন্সপেক্‌ট্রেসের গাম্ভীর্যে বলল—বসুন।

কথাবার্তা যা হোল সবটাই অফিসিয়াল। পরিচয়ের চিহ্নটুকুও মুখে ফুটতে দিল না। ভেতরে ভেতরে সুব্রত ঘামতে শুরু করেছে। শুকনো শুকনো লাগছে ঠোঁট। শমিতার অলক্ষ্যেই বারকয়েক চেটে নিল। বয়েস তো ওরও বেড়েছে। তবে কেন এত নার্ভাস লাগছে নিজেকে? বড় বেশি নগ্ন মনে হচ্ছে। ঐ চোখের সামনে যে বসে রয়েছে—সে যেন সেদিনের রাজশাহী কলেজের নামকরা স্পোর্টসম্যান, নামকরা ডিবেটার এবং বাঁশি বাজিয়ে সুব্রত রায় নয়; তার একটা নিরাবরণ কঙ্কাল। কোনমতে কথা শেষ করে পালিয়ে বাঁচল ও।

নিজেকে কোনদিন এত তুচ্ছ, এত ছোট মনে হয় নি। শমিতা—! শমিতা বোস।—অথচ সেদিন শমিতা ছিল শুধুই একটা মেয়ে। ইন্সপেক্‌ট্রেস নয়। মিষ্টি মিষ্টি মেয়েটা রাজশাহী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। সুব্রতর সেকেণ্ড ইয়ার। কলেজ ফাংশনে, খেলার মাঠে দুই মুগ্ধ-চক্ষুর দাক্ষিণ্য লক্ষ্য করে বন্ধুরা কতদিন ওকে ঠাট্টা করেছে—

কি হে—আমরা তো হত্যে দিয়েও দেবীর প্রসাদ পাই না, তুমি দেখি—

কৌতুকে যোগ দিয়েছে ও নিজেও। ওর তরফে দুর্বলতা যে একেবারেই ছিল না—তা নয়। তবে সামান্যই। শমিতা না হয়ে অন্য যে কেউ হলেই ওটুকু থাকত। অর্থাৎ যৌবনের ঊষায় যেটুকু রং, যেটুকু চাঞ্চল্য স্বাভাবিক—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তবু শমিতার আগ্রহেই ও কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। অফ পিরিয়ডগুলো কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছিল নারকেল-সুপারির ছায়াঘেরা পদ্মার তীরে, কলেজের বাঁধানো ঘাটে।

পদ্মার উন্মত্ত জলস্রোতকে সাক্ষী রেখে অনেক সন্ধ্যাই কেটেছে। পদ্মার কলধ্বনির সঙ্গে বাঁশীর সুর—'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'...। এই বাঁশিতেই আরো মুগ্ধ হয়েছিল শমিতা। অমন পাকা স্পোর্টসম্যান—দিগন্তপ্লাবী জলরাশির দিকে তাকিয়ে কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়ত। সমুদ্র ও দেখে নি। দেখে নি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ আটলান্টিক। জন্ম থেকেই ও শুধু দেখেছে পদ্মা। তাই এই সীমাহীন গৈরিক জলরাশির কাছে সপ্তসমুদ্রের আকর্ষণও তুচ্ছ মনে হয়। পকেট থেকে বাঁশি বের হয়। "মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে—আমি মানব ভ্রমি একাকী" ...,কখনো বা "মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে..."

বাঁশিটা রেখে কখনো শমিতাকে বলত— কি বিরাট স্পোর্টিং স্পিরিট—দেখেছ?

যেন ঘুম ভাঙত শমিতার। অনেকদূরে অন্ধকার চিহ্নিত দিগন্তরেখার কাছে অস্পষ্ট ছবির মত স্টীমারের সারি। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে আনত—

স্পোর্টিং স্পিরিট? কার?

কেন—এই পদ্মার? ভাঙা-গড়া কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই—

পদ্মার কলোচ্ছ্বাস ছাপিয়ে এবার হাসির শব্দ শোনা যেত। শমিতা হাসছে—

কি ইম্যাজিনেশন!—পদ্মা স্পোর্টসম্যান...থুড়ি ওম্যান...

কঠিন ক্রোধে এবার শাসন করেছে সুব্রত—ঠাট্টা হচ্ছে? দাঁড়াও—কঠিন শাস্তি দেব।

স্পোর্টসম্যানের শাস্তি,—কঠিন বৈকি। সাঁড়াশীর মত হাতটা হাতের ওপর চেপে বসতেই শমিতার আর্তনাদ—উঃ ছাড়ো ছাড়ো—লাগছে.....

এমনি এক ঘনিষ্ঠ, এবং খানিকটা অসম্বৃত মুহূর্তকে আবিষ্কার করেছিল বন্ধুরা। আড়ালে ডেকে বলল—

কি হে—খুব তো বলতে তোমার কোন উইকনেস নেই?

উইকনেস কোথায়? আমি স্পোর্টসম্যান—

হুঁ—ওটা তবে কি হচ্ছিল?

এবার কৌতুকের হাসি ফুটল ঠোঁটে। চোখে একটা অর্থপূর্ণ ভাব ফুটিয়ে বলল —পজিটিভ-নেগেটিভের সংঘর্ষে তাই বলে আলোও জ্বলবে না?

.....তা সত্যি স্পোর্টসম্যান সুব্রত। দেশের ভাঙন, পারিবারিক ভাঙন—সব কিছুই গ্রহণ করল স্পোর্টিং স্পিরিটে। পড়ে রইল ব্যাট, পড়ে রইল বাঁশি। কোথায় গেল শমিতা। ১৯৪৯-এ কলকাতার কাছাকাছি এই ঔপনিবেশিক নগর আদর্শপল্লীর আস্তানাটুকু বাবাই যোগাড় করেছিলেন। এক সময় তিনিও চোখ বুজলেন। কুড়িয়ে আনা সঞ্চয়ের কোঠা তখন শূন্য। বি-এসসি পড়া বিদ্যে নিয়ে অনেক কষ্টে সুব্রত আবগারি বিভাগের এই সামান্য চাকরিটা জোটাতে পারল।

আবগারি! তার মানে মদ-গাঁজা-আফিম, জাল-জুয়াচুরি, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি। খানিকটা দমে গিয়েছিলেন মা। আজন্ম শিক্ষাব্রতীর পুত্র প্রফেসরের বদলে আবগারি বিভাগের চাকুরে।

মা'র বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে সুব্রতই বলেছিল—এই বা আমাকে কে দিচ্ছে বলো? শেয়ালদা স্টেশনের অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছ না? তবু তো...

চমক ভাঙল। ছোট বোন লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকেছে। বিছানার ওপর নজর পড়তেই বলল—একি দাদা এখনো শুয়ে? পোষাকটাও যে ছাড়ো নি।

তাই তো রে! লণ্ঠনটা দে—।

সেক্রেটারীর সাথে দেখা হয় নি। ভুলেই গিয়েছিল সুব্রত। সোমবার অর্থাৎ পরশু ইন্সপেকশন। তার আগেই দেখা করা চাই। ওঁকে অন্তত বলতে হবে কথাটা। আর সব পারবে সুব্রত। সব করবে। অফিসিয়াল যত কাজ আছে—সব। কিন্তু এটা অসম্ভব।

রেশন আনবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। অনিমেষ এসে ঢুকল—এত সকালেই ডিউটিতে বেরুচ্ছ যে?—

না—মানে রেশনটা নিয়ে এসে—তারপর.....ব্যাগদুটো তুলে নিল। চিনি-সুজি এবার ছাড়তে হবে। যা যোগাড় হয়েছে তাতে টেনেটুনে চাল আর গমটাই হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে অনিমেষ বলল—কাল সন্ধ্যায় সেক্রেটারীর ওখানে স্কুল কমিটির

সবাই-ই এসেছিলেন। সবাই তোমাকে খুঁজছিলেন। যাওনি যে?

হুঃ—কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কি সম্ভব নয়?

ইন্সপেকশনের দিন স্কুলে উপস্থিত থাকা।

সেকি? কেন?

এমনিই—মিটিমিটি হাসতে লাগল সুব্রত—কারণ অপ্রকাশ্য। তারপর খানিকটা কৌতুকের সাথেই ইন্সপেকট্রেসের সাথে তার পরিচয় প্রসঙ্গ বর্ণনা করল। অবাক হল অনিমেষ। আড়চোখে কয়েকবার লক্ষ্য করল সুব্রতকে। কেমন যেন চিন্তামগ্ন। একটু বা বিমর্ষ। মরুভূমিতে ওয়েসিসের অস্তিত্ব মিথ্যে নয় তাহলে। মুখে অবশ্য কোন মন্তব্যই করল না। চলে গেল।

লম্বা লাইনটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল সুব্রত। সামনে বচসা বেধেছে। দোকানদার বলছে—

নিতে হয় নিন্—না হয় চলে যান। আমরা কি করব? আমাদের যা দিতে দিচ্ছে—তাই তো দেব?

কর্কশস্বরে একটি ছোকরা বলে উঠল —হ্যাঁ হ্যাঁ—আমরা জানি এক টাকা দশ, কুড়ির চালও আপনাদের দেয়া হয়, কোথায় সেই চাল? বের করুন। গতবার যা দিয়েছিলেন—তা কি মানুষের খাদ্য—না পশুর?

বয়স্ক এক ভদ্রলোক পেছন থেকে টিপ্পনী কাটলেন—ছিঃ—পশুর খাদ্য কেন হতে যাবে? পশুদেরও মান-সম্মান আছে। ডি এল রায় বেঁচে থাকলে "মানুষ আমরা নহি তো মেষ" কথাটা নিশ্চয়ই কেটে দিতেন।

অন্তত এই একটা জায়গায় বাঙালী অনন্য। ফেরার সময় মনে মনে ভাবছিল সুব্রত। কালভেদে, সময়ভেদে মানুষের চরিত্র বদলায়। এই একটি ক্ষেত্রে বাঙালী-চরিত্র বোধ হয় স্থিতিশীল। রসবোধ আর বাক্যবিলাসিতার। সজীবচন্দ্রের সেই অশ্বত্থগাছটার মত আমরাও বড় রসিক। নীরস কঠিন জিনিষেও রসের সন্ধান পাই। চালের পাথরও আমাদের রসোৎসের মুখ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না।

রবিবার। সন্ধ্যার খানিকটা আগেই সুব্রত সেক্রেটারীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল। নইলে একা পাওয়া মুস্কিল।

কি ব্যাপার—। এই ফিরছেন না কি? আজও ডিউটি ছিল?

হুঃ—

বিজয়বাবুই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন। বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলেন—আপনি না কি কাল স্কুলে আসছেন না?

হ্যাঁ—একটু অসুবিধা আছে।

এত কি অসুবিধে আমি বুঝতে পারছি না। সব করতে পারলেন, আর এইটুকু.....

মাপ করবেন, অসুবিধেটা ব্যক্তিগত। তাছাড়া আমি তো স্কুল কমিটিতেও নেই। আমার থাকা না থাকায় কি এসে যায়?

কথাটা কি অভিমানের? ঠিক ধরা গেল না। এই স্কুলের জন্ম-সূচনা থেকেই সক্রিয়ভাবে ও এর সাথে জড়িত। ইন্সপেক্শনের ব্যবস্থাটাও আগাগোড়া প্রায় একাই করেছে। কিন্তু সেই স্বীকৃতিটুকুও স্কুল কমিটির অনেকেই দিতে নারাজ। তার জন্যেই কি? তবু বিজয়বাবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন—

নিজেই এত কিছু করলেন—অনুপস্থিত থাকাটা কি খুব শোভন হবে?

শোভন! উপস্থিত থাকাটাই যে সুব্রতর পক্ষে কতখানি অশোভন—সেটা ওঁদের ধারণার বাইরে। কিন্তু সেকথা বলা যায় না। তাই চুপ করে রইল।

এনি রোমান্টিক স্টোরি?—মুখের দিকে চেয়ে আচমকাই প্রশ্ন করলেন সেক্রেটারী। দু'চোখ কৌতুকের হাসি থমকে আছে। বয়সে প্রবীণ বটে, হৃদয়টা কিন্তু সরস।

রোমান্টিক স্টোরি! সুব্রত চমকাল। রোমান্টিক স্টোরি! শমিতা—শমিতা বোস।— সাব-ইন্সপেক্ট্রেস। হ্যাঁ—ঠিক! অনিমেষের কাজ! Et too Brutus!

ওর নীরবতায় একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন বিজয়বাবু।

রোমান্টিক স্টোরিই বটে। একটুকরো হাসি সুব্রতর ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে গেল। দেখে আরো বিব্রতবোধ করলেন বিজয়বাবু। ঠোঁটের কোণের ঐ হাসির সাথে চোখের ছায়ার মিল কৈ? শুধু রোমান্টিকই নয়—ট্র্যাজিকও? জিজ্ঞেস না করলেই হয়ত ভাল হোত।—

আচ্ছা চলি,—আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়েই আচমকা বেরিয়ে গেল সুব্রত।

পায়ে পায়ে ঝিলের পথ। এখানকার বুড়োরা বলে ঝিল। দেশ-গাঁয়ের সামান্য স্মৃতিকেও একটা শব্দের মধ্যে ধরে রাখতে পারলেই তারা খুশি। সমরের মত ইয়ং জেনারেশন অবশ্য বলে—ছোঃ—ঝিল আবার কি! এটা আমাদের লেক। সাউথ ক্যালকাটায়, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, নিদেন যাদবপুরেও লেক থাকতে পারে—আমাদের নেই?

আবছা হয়ে এসেছে দিনের আলো। ছায়াশরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারপাশের গাছগুলো। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে ঝিলের কালো জলে। ওপারের হোগলা বনের সবুজ অস্তিত্বের ওপরেও সেই ছায়ার আবরণ।

সেই বিরাট-দেহ অশ্বত্থগাছটার নিচে এসে দাঁড়াল সুব্রত। ভারি ভাল লাগে এই গাছটা। কত পুরোনো। মাটির পর মাটি ফেলে খানা-ডোবা ভরাট করে, ঝোপ-জঙ্গল কেটে গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ। গাছটাই শুধু সেদিনের সাক্ষী। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাকালের মত। পাখীদের আশ্রয়।

ওপরের দিকে তাকাল। আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে পাখীরা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে। নীড়ে ফেরার তাগিদ। তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কর না পাখা।

অন্যমনস্ক হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। একটা লাল পেন্সিল হাতে ঠেকলো। যা খুঁজছিল—নেই। তাই তো! বাঁশি তো কবেই বিদায় নিয়েছে। আজ কেমন বাজাতে ইচ্ছে করছে।

একটু এগিয়ে জলের সামনে এসে দাঁড়াল। জলে ওর ছায়া পড়েছে। সুব্রত না তার প্রেতাত্মা? একটা দীর্ঘ অর্ধনগ্ন কঙ্কাল দেহের ছায়া। একবার অপাঙ্গে নিজের দিকে চেয়ে দেখল। ছ'ফুট লম্বা আধকুঁজো দেহটায় খাকী হাফ-প্যান্ট আর হাফ-সার্ট। সরকারী পোষাক। চমৎকার।

এনি রোমান্টিক স্টোরি? এবার হেসে ফেলল সুব্রত। ভাগ্যিস দেখা হয়েছিল। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে শমিতা। বিশেষত্ব বর্জিত সাধারণ একটা গল্পকে সুন্দর প্রচ্ছদপটে ঢেকে দিতে পেরেছে। রোমান্টিক স্টোরিই বটে! ডিউটির দোহাই দিয়ে কতই আর সামলানো যায়। একটা ভদ্র, সামাজিক পরিবেশে উপস্থিত হবার মত, একজন ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়ানোর মত আস্ত একটা কাপড়-ও যে ওর নেই—একি একটা বলবার মত কথা, না তাই বলা যায়? তার চাইতে বরং.....।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় আমরা চারজন

আগেই লিখেছি চট্টগ্রামের হ্রদ—'ঢেবার' পাড়ে অবস্থিত রেলের কোয়ার্টার, বিকেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিত্যাগ করি। আমাদের বেশভূষার কথাও আগে কিছু বলেছি। সবাই ছাত্র ও মাস্টার সেজে চলাটা সমীচীন মনে করি নি। আনন্দ সাজলো ছাত্র, মাখন অফিস কর্মচারীর পোষাক নিল, গণেশ সামান্য একজন ব্যবসাদার আর আমি একজন মোটর গাড়ির ব্রোকার। প্রত্যেকেরই হাঁটবার ভঙ্গী একটু পরিবর্তিত হল। এতদিন পর্যন্ত যেভাবে চুলের সিঁথি করে এসেছি তা না করে অন্যধরণের করে নিলাম সকলে। আনন্দ ও মাখনের গোঁফ ওঠার বয়স নয়, তবু তারা খুর দিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামাল। এতেও চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন আনে। পরস্পরের সম্পর্ক ঠিক করে নিলাম—মামা, ভাগ্নে, কাকা, ভাইপো, ইত্যাদি। প্রত্যেকের নাম ও সেই অনুসারে বাপের নামও স্থির করা হল যেন পুলিশের জেরায় কোন ইতস্তত ভাব না আসে।

সামরিক শিক্ষা কেমন প্রয়োজন তেমনি আবার ছল-চাতুরী প্রভৃতির জন্য ছদ্মবেশ, বিভিন্ন ভঙ্গীতে হাঁটা, মিথ্যা নাম-ধাম বলে পরিচয় দেওয়ার ট্রেনিংও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষার একটি অঙ্গ—বিশেষ করে আমাদের ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এখন রণক্ষেত্রের রণ-কৌশল নয়, উপস্থিত প্রয়োজন—ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাবার সময় মিলিটারী বা পুলিশ পেট্রল পার্টিকে হতবুদ্ধি করে আমাদের চার-জনের যে কোন উপায়ে সাত মাইল দূরে ভাটিয়ারী রেল স্টেশনে পৌঁছনো।

চারজনের হাতেই পুরোনো চারটে ছাতা, একটি জীর্ণ সতরঞ্চি দিয়ে জড়ানো ছোট্ট একটি বিছানা, একজনের হাতে একটি ঘটি ও অপর একজন নিয়েছে একটি হারিকেন—অতি "নিরীহ সাধারণ যাত্রী", এতে কোন সন্দেহ নেই—কেবল জামায় ঢাকা চারজনের কোমরে বাঁধা গুলীভরা মাত্র আটটি পিস্তল! এই পিস্তলের সংবাদ তো কেউ রাখে না—কাজেই "নিরীহ যাত্রীরা" যদি তাদের চোখ-মুখের ভীতিপূর্ণ বিবর্ণ ছবি পুলিশের কাছে প্রকাশ না করে, আগে থেকেই গুপ্তস্থানে সংরক্ষিত পিস্তলের বার্তা ঘোষণা না করে, তবে ভাবনা কি? কাজেই কেবল কথার জবাব দিয়েই পুলিশকে সন্তুষ্ট করলে হবে না চেহারা ও হাবভাব দেখেও তারা যেন নিঃসন্দেহ হয় তার জন্য সহজ সরল মুখের ভাব রাখা চাই। বেশভূষা কথাবার্তা কোন কাজেই আসবে না যদি না কি নিরীহ যাত্রীর অভিনয় ও সরলতার ভান নিখুঁতভাবে চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে না ওঠে। এইভাবে পুলিশ বা মিলিটারীকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে সাফল্য লাভের জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত ছিলাম তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। তবে, Subjective চিন্তা করে করে নিজের পক্ষে সেইরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশকে সফলতার সঙ্গে কিভাবে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব সেই সম্বন্ধে মাত্র একটি বাস্তব ধারণা ছিল—এই যা। একবার যদি আমরা এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করি তাহলে এই বিষয়ে নিজেদের অনেক-খানি শিক্ষিতও করে নিতে পারি। পুলিশের জেরায় পড়বার বাস্তব অবস্থার অনুভূতিই সেই সময় আমাদের এইভাবে প্রস্তুত হতে আরও বেশি সাহায্য করেছে।

ভাটিয়ারী রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে চলেছি। প্রায় আট মাইল পথ হাঁটতে হবে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। এই ট্রাঙ্ক রোডটি চাঁদপুর পর্যন্ত প্রায় ৯০ মাইল চলে গেছে। পথটির বেশির ভাগই কাঁচা, মাঝে মাঝে অনেকটা পথ আবার বালির ওপর দিয়ে গেছে। যুব-বিদ্রোহের চার-দিন পরে, ২২শ তারিখে এই ট্রাঙ্ক রোডটি যে মিলিটারী ও পুলিশ পেট্রল পার্টি পাহারা দিচ্ছে তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি পুলিশ পেট্রল পার্টির সম্মুখীন হব। একটু অন্ধকার হতে না হতেই হারিকেনটি জ্বালিয়ে নিলাম। আলো হাতে তো আর চোর ডাকাত পথ চলে না! তবু কি নির্ভয়ে চলতে পারছি? কোথা হতে অজানা বিপদ এসে জুটবে কে জানে? যা হোক, অজানা বিপদ দেখা দিল না—জানা সঙ্কটই আত্মপ্রকাশ করল। প্রায় দুশ গজ দূরে একটি বাস দাঁড়াল দেখা গেল। মনে হল তাতে খাকী পোষাকে পুলিশ বা মিলিটারী আছে। যদি নেহাতই সামনে পড়তে হয় তাহলে, পুলিশের চাইতে মিলিটারীর উপস্থিতিই আমাদের অধিক কাম্য ছিল। কারণ পুলিশ পার্টি যদি হয় তবে তাদের মধ্যে কেউ হয়ত গণেশ বা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। মিলিটারীর কাছে অবশ্য সেই ভয় নেই। যাই হোক, অত দূর থেকে অন্ধকারে পুলিশ অথবা মিলিটারী, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। প্রতি পদ-ক্ষেপেই তাদের দিকে এগিয়ে চলেছি—ব্যবধান ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা সুরু হবে। এইরূপ অবস্থার কথা আগে থেকেই খুব ভাল করে জানা ছিল। তবু, কি জানি কেন, গতি আমাদের মন্থর হয়ে গেল। পেছন ঘুরে পালানো বা হাঁটতে আরম্ভ করা যে মূর্খতা তা বুঝেছিলাম—তাতে প্রহরারত সৈনিকেরা সন্দেহ করবেই। তাই গতি মন্থর হলেও সামনে চলা ছাড়া উপায় ছিল না। পথ ও সময় যতই সংকীর্ণ হতে লাগল ততই বেশি করে ভেতরে ভেতরে একটা কম্পন অনুভূত হচ্ছিল। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেও আরও একটু নিরীহ সরল পথিকের ভান করবার চেষ্টা করলাম। আনন্দকে বললাম জোরে জোরে গান ধরতে। চট্টগ্রামের intonation-এ, মিশ্রিত সুরে সে

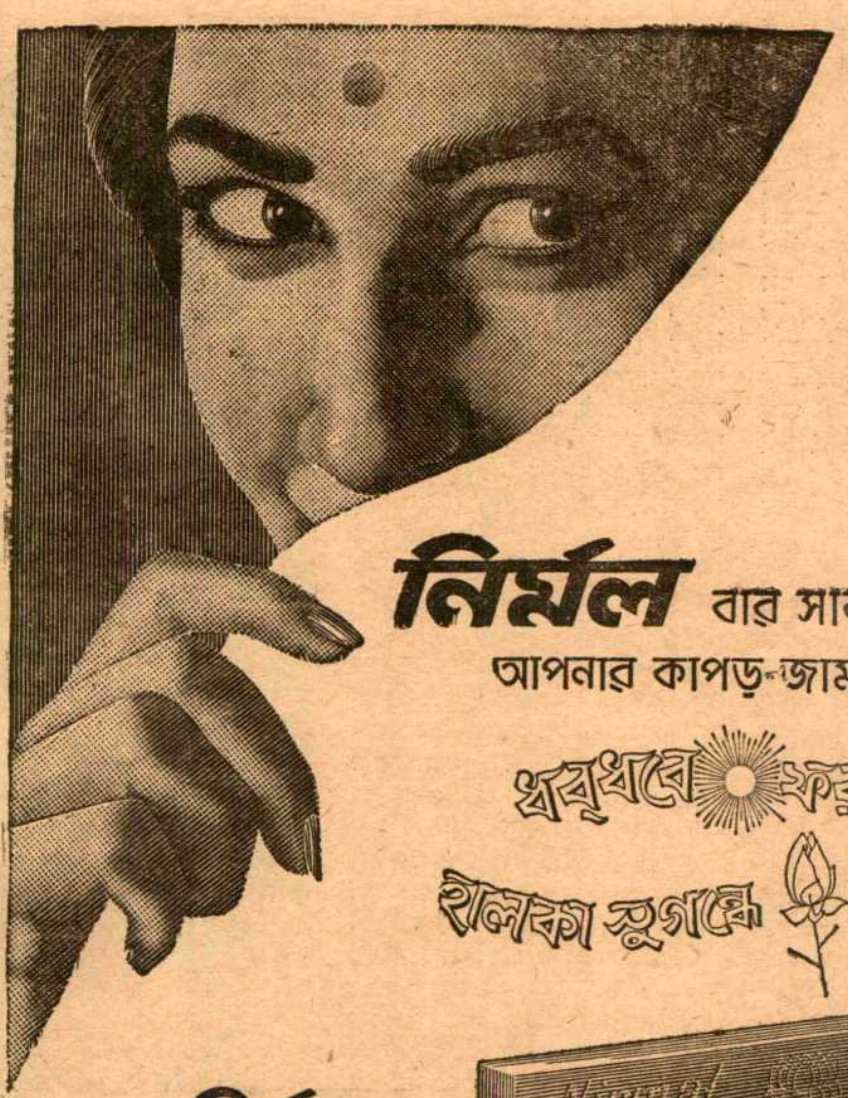

নির্মল বার সাবানে কাচলে আপনার কাপড়-জামা হবে

ধবধবে ফরসা

খালকা সুগন্ধে ভরপুর

নির্মল

বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়সুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে। নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

নির্মল

পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই কাটতিতে সবার ওপরে

কীর্তন সুরু করল—"কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, তাইতো তমাল ভালবাসি.....।"

ট্রাঙ্ক রোড বলতে ধরে নেবেন না যে G. T. Road বা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—গাড়ি, লরি, বাস বা লোকজন সব সময় ছুটোছুটি করছে। চাঁদপুর পর্যন্ত ট্রাঙ্ক রোডটি প্রায় নির্জন বললেই চলে। লোকজন, গাড়ি ইত্যাদি দিনের বেলাতেও এই রাস্তায় খুব কম দেখা যায়। সন্ধ্যের পর থেকেই রাস্তাটি প্রায় একেবারে নিস্তব্ধ ও নির্জন। আনন্দের গান শোনবার জন্য রাস্তায় লোক ছিল না। গান শুনছিলাম আমরা ও সেই পুলিশ পার্টি। অবশ্য যাদের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হচ্ছিল তাদের ভাল লাগছিল কি না বলা যায় না, তবে তাদের শুনতেই হয়েছে। ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়লাম। বাইরের ভাবে মনে হচ্ছে আমাদের যেন একেবারে ভ্রূক্ষেপই নেই যে সেখানে পুলিশ বা মিলিটারীর বাস দাঁড়ান আছে। আমরা যে অতি নিরীহ লোক—সাধারণ মানুষের পুলিশ এবং মিলিটারী সম্বন্ধে কৌতূহল বা আতঙ্ক থাকবে কেন? তাদের উপস্থিতিতে আমাদের কোন ভাবান্তর হতেই পারে না—আমরা আপন মনে বেশ সহজভাবে চলেছি। তাদের প্রায় বিপরীত দিকে একটু দাঁড়িয়ে হারিকেনটি উঁচু করে গণেশের মুখের সামনে ধরলাম। সে হারিকেনের পলতের আলোয় টুক্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল। তারপর আমার বিড়িটা আমি গণেশের প্রজ্বলিত বিড়ির আগুনে জ্বালালাম। এই অভিনয়টুকু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা করেছি, আগে থেকে কোন প্ল্যান করা ছিল না।

হয়ত পোষাক, ভাবভঙ্গী খুব উপযোগী হয়েছিল বা ঘটি, ছাতা ও হারিকেন সাধারণ যাত্রীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছিল এবং আনন্দের গান অথবা বিড়িতে আগুন ধরানোও অতি নিখুঁতভাবে অভিনীত হয়েছিল; কারণ, এই সবকিছু মিলিয়ে "নিরীহ যাত্রী চারজন" অত্যন্ত কৃতকার্যতার সঙ্গে পুলিশের পেট্রল পার্টিকে ধোঁকা দিয়েছিল। আশ্চর্য! পুলিশ পার্টি একটুও বিচলিত হল না—তারা আমাদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করাও প্রয়োজন মনে করে নি—যেন একেবারে কোন উৎসাহই বোধ করল না। আমরা পুলিশ পেট্রলের হাত থেকে এইভাবে নিষ্কৃতি পেলাম—এবারেও আর একটি ফাঁড়া কাটলো!

ভাটিয়ারী স্টেশনে রাত আটটার আগে পৌঁছনো দরকার। চট্টগ্রাম থেকে মেল ছাড়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়। বাকি পথটায় পুলিশ বা মিলিটারীর কাছে আর বাধা পাব কি না জানি না, তবে প্রতিপদেই সে অশঙ্কা বোধ করছি। ভেবে কিছু লাভ নেই, বাধা আসুক আর নাই আসুক, ভাটিয়ারী স্টেশনে সময় মত পৌঁছবার চেষ্টার মধ্যে ত্রুটি থাকলে চলবে না। আমরা হাঁটতে সুরু করলাম। সৌভাগ্য আমাদের, পথে পুলিশ পার্টির সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি। রাত আটটার কিছু আগেই ভাটিয়ারী স্টেশনে পৌঁছলাম আমরা।

মাখনকে টিকিট কাটতে পাঠিয়ে আমরা তিনজন প্ল্যাটফরমে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। থার্ড ক্লাশের চারটে কুমিল্লার টিকিট মাখন টিকিট কাউন্টারে চাইল। ভাটিয়ারী থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত টিকিট দেবার ব্যবস্থা নেই—লাকসাম জংসন পর্যন্ত টিকিট পাওয়ার রীতি আছে। কাজেই মাখন টাকা দিয়ে লাকসামেরই চারটে টিকিট কিনলো। মনে হল স্টেশন মাস্টার সন্দেহ করেছে। যাই হোক, সন্দেহ হয়ে থাকলেও সে কিই বা আর করতে পারে? আমাদের যখন যেতেই হবে তখন এই নিয়ে ভেবে কি লাভ? ট্রেন এল, আমরা একটি থার্ড ক্লাশ কামরায় উঠে পড়লাম।

ভেবে-চিন্তে কম্পার্টমেন্টের দরজার কাছে বসি নি। পেছনের দিকে ট্রেন-কামরার দেওয়াল ঘেঁষে একেবারে শেষ-প্রান্তে জায়গা করে নিই। ট্রেন প্রায় খালি ছিল বললেই চলে। দরজার কাছে বসা ঠিক নয় বলে মনে হবার কারণ হচ্ছে হঠাৎ আক্রান্ত হবার আগে টের পাওয়া যাবে না। দরজা থেকে দূরে থাকি তাহলে হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব হলেও কিছু আগে জানা যাবে এবং সেইমত প্রস্তুত হতে একটু সময় পাব।

আমরা মোটামুটি সজাগ ছিলাম। তবে ভাবগতিক দেখে মনে হল না যে পুলিশ রেলপথে তখনও তাদের তৎপরতা সুরু করেছে। স্বভাবতই আমাদের মধ্যে একটু গাফিলতি ও উপেক্ষার ভাব এসেছিল। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশ্য খুব গাঢ় ঘুম হওয়া সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে ট্রেন স্টেশনে থামার সময় ঘুম ভাঙছে—চা-বিড়ি-পান বিক্রির ডাক কানে আসছে। হঠাৎ মনে হল গাড়ি একটা স্টেশনে থামল। শুনলাম—"হেনী, হেনী", অর্থাৎ ফেণী স্টেশনে গাড়ি এসে পৌঁছেছে। ফেণী চট্টগ্রাম মেইন স্টেশন থেকে প্রায় ষাট মাইল। এখন রাত প্রায় দুটো বেজেছে।

ট্রেন থামার মিনিটখানেকের মধ্যে দেখি একদল পুলিশ আমাদের কামরায় উঠছে। তাদের মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেক্টার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব যাত্রীদের জিজ্ঞেস করছে—"ভাটিয়ারী স্টেশন থেকে চারজন কারা লাকসাম যাচ্ছেন?" কোন কোন যাত্রীর টিকিট চেয়ে নিয়ে দেখছে এবং ক্রমাগত ঐরূপ প্রশ্ন করে চলেছে। ভাটিয়ারী থেকে লাকসামের চারজন যাত্রীকেই যে তাদের বিশেষ প্রয়োজন তা বোঝা গেল। পুলিশের দলটিতে বারোজনের কম ছিল না, কিছু বেশি সংখ্যাও হতে পারে। দুজন অফিসারও ছিল এই দলে। পুলিশ দেখে মুহূর্তে আমাদের ঘুম কোথায় চলে গেল! ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম বটে, কিন্তু এক-আধটু নড়ে-চড়ে প্রত্যেকে নিজের রিভলভার দুটি কোমরে ঠিক করে নিলাম যেন একটানে বার করতে পারি। বুকের ভেতর তখন ধড়াস ধড়াস করছে। ভাবতে লাগলাম, পুলিশকে কোন সুযোগ না দিয়ে আগে থেকেই গুলী চালাব না কি ফাঁকি দিতে পারি কি না দেখব। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগেই পুলিশ আমাদের একেবারে কাছে এসে উপস্থিত। তারা আমাদের ডাকতে লাগল। সেই ডাকেই যেন সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে এমনভাবে গা মোড়া দিয়ে, চোখ কচলে, হাই তুলে, ঘুমের ঘোরেই তাদের প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁ, কি চাই আপনাদের?" তারাও পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইল—ভাটিয়ারী থেকেই আমরা আসছি কি না—লাকসাম যাচ্ছি কি না—টিকিট চারটে কোথায়—ইত্যাদি। টিকিটগুলি তাদের দিলাম। প্রশ্নের উত্তরে জানালাম আমরা চারজনেই লাকসাম যাত্রী এবং ভাটিয়ারী স্টেশন থেকেই আসছি।

প্রথম পর্বটি এইভাবে শেষ হওয়ার পর পুলিশ তার কাজের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু করল। জেরা চলতে লাগল—নাম-ধাম, কি করি, কোথায় যাচ্ছি ও কেন যাচ্ছি, আমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কি..... ইত্যাদি, ইত্যাদি। আগে থেকেই আমাদের এই সব রিহার্সেল দেওয়া ছিল। কাজেই সব জেরারই যথাযথ উত্তর দিলাম। তবু পুলিশের সন্দেহ যায় না—তারা ভাটিয়ারী স্টেশন মাস্টারের telegram পেয়ে তবেই এসেছে। চারজনকেই যখন পেয়েছে তখন পুলিশী কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য তাদের দাবি হল আমাদের গাড়ি থেকে নামতে হবে এবং তারা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। অবস্থা বড়ই বেগতিক! গণেশ খুব কাকুতি-মিনতি করে বলল—"দারগাবাবু, আমরা পুলিশকে বড় ভয় করি। আমাদের দয়া করে ছেড়ে দিন; আপনাদের পায়ে পড়ি—ছেড়ে দিন।" গণেশ টুক করে প্রণাম করে দারোগাবাবুর মন ভোলাতে চেষ্টা করল। কত বিনয়-নম্র ভাব, গদগদকণ্ঠে কত মিনতি—"আমাদের ছেড়ে দিন!" ইন্সপেক্টারবাবুকে দেখে

মনে হচ্ছিল যেন আমাদের প্রতি কিছুটা দয়াপরবশ হয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে আমরা আরও অনুনয় করলাম—"স্যার, আপনি হুকুম দিলেই হয়। বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা কোন কিছুতেই অপরাধী নই। নির্দোষীদের কেন স্যার অযথা হয়রানি করবেন? আপনাদের পায়ে পড়ি—আমাদের যেতে দিন।"

ইন্সপেক্টারবাবু সাব-ইন্সপেক্টারের দিকে তাকাল। এই অবস্থায় আমাদের নিয়ে কি করবে এটাই তার প্রশ্ন। সাব-ইন্সপেক্টার মহোদয় হাবিলদারের দিকে একবার তাকিয়েই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে কেউই দায়িত্ব নিতে চাইছে না। বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধবে? যে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলবে এবং ইন্সপেক্টার অনুরূপ আদেশ দেবে তাকেই ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তারা সকলে একমত হয়ে দিতে পারলে হয়ত বা আমরা নিষ্কৃতি পেতাম, কিন্তু সেইরূপ Democratic decision নেওয়ার উপায় ছিল না—তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

আমাদের কাকুতি-মিনতিতে কোন কাজ হল না। ইন্সপেক্টার মহাশয় বললেন—"দেখুন, আপনাদের ছেড়ে দিতে পারলে আমরা খুশিই হতাম। কিন্তু আমরা চাকরি করি, আমাদের অনেক সময় অপ্রিয় কর্তব্য করতেই হয়। আমরা টেলিগ্রামে ভাটিয়ারী স্টেশন থেকে আপনাদের সম্বন্ধে নির্দেশ পেয়েছি। আপনাদের কোন ভয় নেই—শুধুমাত্র জবানবন্দি নিয়েই আমরা আপনাদের ছেড়ে দেব।"

সত্যি, ভাটিয়ারী স্টেশন মাস্টার অশ্বিনী ঘোষ রেল-কর্মচারী হয়েও পুলিশের কাজ করেছিল। আমাদের মামলার রায়ে অশ্বিনী ঘোষের কীর্তি লেখা আছে—

At 8 p.m. Aswini Ghosh, Station Master, Bhatiari, found a person asking for four tickets for Comilla suspiciously. The station master took down the numbers of the tickets and at the time the train was leaving he showed them to the guard Ferrera and wired to Sitakundu, Feni, Comilla and Laksam."

(ভাটিয়ারী স্টেশন মাস্টার অশ্বিনী ঘোষ, রাত আটটার সময় একজনকে সন্দেহজনকভাবে চারখানা কুমিল্লার টিকিট চাইতে দেখলো। এতে তার সন্দেহ হওয়ায় সে টিকিটগুলির নম্বর টুকে রাখে। তারপর ট্রেন ছাড়বার সময় গার্ড ফেরেরাকে ঐ চারজনকে গোপনে দেখিয়ে দিল এবং সীতাকুণ্ডু, ফেণী, কুমিল্লা ও লাকসামে টেলিগ্রাফে খবর পাঠাল)।

কতখানি লজ্জার কথা—আমরা এই একনিষ্ঠ বৃটিশভক্ত স্টেশন মাস্টারের এতখানি বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। অশ্বিনী ঘোষ আমাদের সন্দেহ করেছে, টিকিটের নম্বর টুকে রেখেছে, গার্ড ফেরেরাকে গোপনে আমাদের চারজনকে দেখিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন স্টেশনে আমাদের ধরবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে—কি করে সে আমাদের চোখের আড়ালে এতখানি ফাঁদ পাততে সফল হল? এই স্টেশন মাস্টার শেষ পর্যন্ত রেলের চাকরিতেই বহাল ছিল না কি বাংলায় ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সাদরে তাকে বরণ করে নিয়েছিল, তা আমার জানা নেই। আমি আজ এও বলতে পারছি না যে এই প্রখ্যাত ভদ্রমহোদয় ইংরেজের আমলে রায়বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হয়ে আরও উৎসাহের সঙ্গে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ করে পুণ্য সঞ্চয় করেছে কি না।

আজ যতই অশ্বিনী ঘোষের ইংরেজ-প্রীতির প্রতি কটাক্ষ করি না কেন তাতে আমাদের অক্ষমতা ঢাকা পড়বে না। যদি আমরা আরো সতর্ক হতাম, উদাসীন না থাকতাম, তবে কি এতখানি বিপদের সম্মুখীন হতাম? উদাসীনতা, গাফিলতি, অসতর্কতা ও অবহেলা বিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক কাজের প্রধান শত্রু। ষড়যন্ত্রমূলক কাজের প্রতি পদক্ষেপে এই শত্রুকে যদি বিপ্লবীরা বিনাশ করতে না পারে তবে তাদের কাজ নিষ্ফলতার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদেরও সেই দুর্দশায় পড়তে হল। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে—হিমাংশুকে ভুলের জন্য দিতে হয়েছে, জালালাবাদে চাষীদের ছেড়ে দিয়ে যে ভুল করেছিল ত.. অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছে, চন্দননগরে গাফিলতি ও অবহেলার জন্য তাদের কঠোর সাজা হয়েছে। আমাদের অসতর্কতা ও উদাসীনতার জন্য আমরাও নিষ্কৃতি পেলাম না। এ সব পরে জানাবো।

আমাদের ত্রুটিকে অস্বীকার করা যায় না—ক্ষমা করাও সম্ভব নয়; তবু অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এটুকু বলতে পারি, এই ঘটনাটির আর একটি দিকের তাৎপর্য খুব সামান্য হলেও, একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। যদিও অশ্বিনী ঘোষ, ভাটিয়ারী স্টেশন মাস্টার, আমাদের চারজনের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখেছিল তবু হয়ত একেবারে সাধারণ যাত্রীর বেশভূষায় পুরোপুরি বিপ্লবী বলে আমাদের প্রতি তার সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। যদি আমাদের সম্বন্ধে বিপ্লবী বলে অশ্বিনী ঘোষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকত তবে তার টেলিগ্রামের ভাষা ও মর্ম আরো সুস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং সেই সূত্রে পুলিশ আমাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, ফেণীতে অতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতো না। এর একমাত্র কারণ আমরা অসতর্ক থাকলেও আমাদের ছদ্মবেশ এবং অভিনয় প্রায় নিখুঁত হয়েছিল।

ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে ভাটিয়ারী স্টেশন থেকে যদি সচরাচর কুমিল্লার টিকিট বিক্রির পদ্ধতি না থাকে এবং তা সত্ত্বেও ভুলে যদি আমরা কুমিল্লার টিকিট চেয়েও থাকি, তবু তাতে স্টেশন মাস্টারের ঐরূপ সন্দেহ হওয়ার বিশেষ কারণ কি থাকতে পারে? আমরা তখনও জানি না জালালাবাদ পাহাড়ে বিকেল চারটা-পাঁচটা থেকে রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক: **রমেন্দ্রনাথ মল্লিক**

বিষয়সূচী: রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতাপত্র। প্রতিমা দেবী (স্মৃতিচারণ), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব), সাধনকুমার ভট্টাচার্য (সংগীতে সুন্দর), উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক গল্প), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-আলোকে ড্যাগ হ্যামারশল্ডের কবিতা), শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (পদাবলী ও রবীন্দ্র-কাব্যের সাহিত্যমূর্তি), শীতাংশু মৈত্র (প্রতীচ্যে রবীন্দ্র-স্পর্শ), রামকৃষ্ণ লাহিড়ী (রবীন্দ্রনাথের নৃত্যপ্রয়াসে পারিবারিক প্রভাব), অজিতকুমার ঘোষ, ধীরেন্দ্র দেবনাথ (গ্রন্থ সমালোচনা)। **চিত্রসূচী:** রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র।

বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (হাতে ও সাধারণ ডাকে), **সাত টাকা** (রেজিস্ট্রী ডাকে)।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

শত্রুবাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে।

ট্রাইব্যুনালের জজ আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"On the night of the 22nd April the clash at Jalalabad was not the only incident but on the same night at the station of Feni there took place another dangerous event."

(২২শে এপ্রিল জালালাবাদের সংঘর্ষই একমাত্র ঘটনা নয়, সেই রাত্রেই ফেণী রেল স্টেশনে আবার একটি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছে)।

জালালাবাদ যুদ্ধের সংবাদ সব স্টেশনে দেওয়া হয়েছিল এবং রেল-কর্মচারীদের প্রতিও সজাগ থাকবার নির্দেশ ছিল। তাই অতি তৎপর বৃটিশভক্ত অশ্বিনী ঘোষ, রেলের ডিউটি অপেক্ষা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করাই পরমার্থ লাভের একমাত্র সাধনা বলেই মনে করেছিল। তার টেলিগ্রামের ভাষা সুস্পষ্ট না হওয়ায় পুলিশ মরিয়া হয়ে আমাদের আক্রমণ করে নি। পুলিশ যখন এল তখন আমাদের তিন বন্ধুর প্রত্যেকের কাছে দুটো করে রিভলভার আর আমার সঙ্গে একটি অটোমেটিক পিস্তল ও একটি Webly Army Revolver ছিল। এই আর্টটি অস্ত্রের সঙ্গে আমাদের আরও দুটি খুব শক্তিশালী অস্ত্র ছিল—একটি, "ভীত-ত্রস্ত মুখের ভাব", দ্বিতীয়টি, "মুখে সরলতার ভান"। এই দুটি অস্ত্র কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ হয়েছিল বলেই পুলিশ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে আমরা কিছুটা নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পাই।

বেশভূষা, চাল-চলন যতই সাধারণ নিরীহ যাত্রীর মত হোক না কেন বাস্তব দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ ছিল না। যতই থার্ড ক্লাশের যাত্রী সাজি না কেন তার সঙ্গে আনন্দ ও মাখনের ফর্সা গায়ের রং, সুন্দর মুখশ্রী, অল্প বয়স—কোনটাই পুরোপুরি খাপ খাচ্ছিল না। আবার এই দুটি অল্প বয়সের ছেলে কি ঐ সব "দুর্ধর্ষ বিপ্লবী" দলের লোক হতে পারে? কাজেই স্টেশন মাস্টার ও পুলিশ ঠিকমত হিসেব লাগাতে পারে নি—বিপ্লবীরা তো কথা বলার আগেই মানুষকে কাটে, খুন করে, গুলী করে, এত বিনয়ী নম্র ভদ্র ও ভীতু যারা, তারা কি ঐসব বিপ্লবী হতে পারে?

তাদের মনের benefit of doubts—সংশয়ের সুযোগ আমরা পেলাম। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। পুলিশ হেপাজতে আমাদের যেতেই হবে। সেখানে আমাদের জবানবন্দী না নিয়ে ছাড়বে না। দারোগাবাবু বললেন—"চলুন, দেরি করবেন না। আমরা আপনাদের জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেব। আপনারা পরের ট্রেনেই চলে যেতে পারবেন—আসুন, আসুন।"

যদি সত্যি সত্যি আমাদের জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেয় তবে কোন আপত্তিই নেই। কিন্তু পুলিশ custody-তে একবার গেলে আমাদের শরীর তল্লাসী হবে না—এ কথা ভাবতে পারছিলাম না। যা হোক সে তো পরের কথা, আপাতত তারা যখন বলছে, ট্রেন থেকে নামতেই হবে। আমরা পুলিশবেষ্টিত হয়ে ট্রেনের কামরা থেকে নামলাম। ট্রেনটি স্টেশন বিল্ডিং ছাড়িয়ে প্ল্যাটফরমের সামনের দিকে ছিল। পশ্চিমে সামনের দিকে, রেল লাইন গেছে। লাইনের বাঁ দিকে, অর্থাৎ, দক্ষিণে ফেণী সাবডিভিশন শহর ও লোকালয় আছে। লাইনের ডান দিকে মাঠ, ধানক্ষেত ও জংলা জায়গা এবং দূরে, উত্তরে, ফেণীর পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। যখন ট্রেন থেকে নামছি তখন থেকেই মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন চলছিল—কিভাবে পালাব, কখন সেই সুযোগ নেব, custody-তে যাওয়ার আগে চেষ্টা করব না কি শেষ পযন্ত দেখব—যদি জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেয়? অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! পুলিশ তল্লাসী না করে ছাড়বে না জেনেও 'শেষ পর্যন্ত দেখার মনোভাব' আর কিছু নয়—যদি সহজে বাঁচা যায়!

ট্রেনের কামরা থেকে নেমে অবধি বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। সুযোগ-সুবিধা খুঁজছিলাম কোন্ সময়ে আক্রমণ করব? শেষ পর্যন্ত custody-তে যে যাবই তেমন সিদ্ধান্ত তখনও নিই নি। স্থির করেছিলাম প্রথম সুযোগেই আক্রমণ চালাব পুলিশবেষ্টনী ভেদ করতে—তবে মনের আড়ালে কি ছিল না—'যদি statement নিয়েই ছেড়ে দেয়?' এত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব কি তখনই বিচার করে দেখতে সময় পেয়েছি? তবে মনে আছে ট্রেন হতে নামার পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই আমার আশঙ্কা ছিল যদি আমি পিস্তল ও রিভলভার বার করবার আগেই তারা আমাকে বন্দী করে! জামার নিচে খুব চেপে বেল্ট দিয়ে অস্ত্র দুটি বাঁধা আছে বাইরে থেকে যেন ওদের অস্তিত্ব কোনমতেই বোঝা না যায়। পুলিশের এতগুলি তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ আমাদের ওপর ছিল—তারা সব সময় চোখ বুলিয়ে দেখছিল জামার নিচে আমরা মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছি কি না। আমাদের হাত যদি একবারও জামার নিচে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটুকু নড়ে ওঠে তখনি তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেইজন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। তাদের এই সতর্ক দৃষ্টির অগোচরে কি করে, তারা আক্রমণ করবার আগেই, আমার পিস্তল ও রিভলভারটি একটানে বার করে হাতে নেব সে কথাই ভাবছিলাম। এক সেকেণ্ডের শত ভগ্নাংশের এক মুহূর্তেও অবস্থার অনুকূলে বা প্রতিকূলে পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই আমার ভাবনা, পুলিশের বোঝবার আগেই আমি কি করে অস্ত্র হাতে নেব।

গাড়ি থেকে নেমেই আমি খুব দুর্বল ও অসুস্থতার ভান করতে লাগলাম। বুড়োদের মত একটুখানি ঝুঁকে পড়েছি, মাঝে মাঝে কাঁপছি, মাংসপেশীগুলি সব একেবারে বাধাহীনভাবে নিচে ঝুলে জামার আচ্ছাদন শিথিল মাংসপেশীগুলির আসল রূপ ঢেকে রাখতে সাহায্য করেছে। আমার দুটি দুর্বল বাহু কাঁধ থেকে যেন একেবারে বাধাহীনভাবে নীচে ঝুলে পড়েছে। এই অবস্থায় পুলিশবেষ্টনীর মধ্যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি আর কেবল সুযোগ খুঁজছি কোমরে বাঁধা অস্ত্র দুটিকে একটু আলগা করে রাখতে, যেন টেনে বার করবার সময় জামায় আটকে না যায়। কাশির সঙ্গে এক-আধটু অঙ্গভঙ্গী ও হাত দুটি খুব সামান্য ব্যবহার করে পিস্তল ও রিভলভারটিকে একটু আলগা করে নিলাম। এত কিছু করেও পুলিশের আক্রমণের আগে আমি যে অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে পারবই, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

আমরা পুলিশবেষ্টিত হয়ে ট্রেনটিকে বাঁদিকে রেখে স্টেশন বিল্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। লম্বা ট্রেনটি যেখানে শেষ হল, তারও বিশ-পঁচিশ গজ পুবে গেলে স্টেশন বিল্ডিং-এ পৌঁছানো যায়। মনে হল আমাদের স্টেশন বিল্ডিং-এরই কোন ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা চট্টগ্রাম-কলকাতা মেলটির শেষপ্রান্ত অতিক্রম করেছি তখন দেখি স্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকে একটা মেইন লাইন ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় লাইনের ওপর আর একটি ট্রেন দাঁড়ান আছে—ইঞ্জিনের মুখ পুব দিকে—চট্টগ্রামের দিকে। একটা ট্রেন যদি চট্টগ্রামের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো থাকে তাতে কার কি এসে যায়—ও নিয়ে ভাববারই বা কি আছে? কিন্তু এই ট্রেনটি আমাদের খুব বিচলিত করলো। এই ট্রেনটি গুর্খা সৈন্যে ভর্তি—একটি কম্পানী, অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা একশ' চল্লিশ বা দেড়শ' হবে। এতক্ষণ যা-ও বা কিছু আশা ছিল তাও নির্মূল হতে চলেছে, এখন কি করি?

এই সৈন্য অবশ্য চট্টগ্রামে যাচ্ছিল না।

আগরতলা মহারাজার সৈন্য—ইংরেজ সরকারের অনুরোধে বিলোনিয়াতে আমাদের প্রধান বাহিনীর বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যূহ রচনা করবার জন্য যাচ্ছিল। এই তথ্য আমরা পরে সংগ্রহ করি। জাজমেণ্টে এই-টুকুই মাত্র লেখা আছে—

"About 11-15 p.m. the Station Master's telegraphic message was received by S.I. Jatindra Mohan Roy officer-in-charge of Feni P.S. who had gone to the Feni Railway Station along with the Inspector Fazlul Baset, to receive the Tripura State Troops who were on their way from Agartala to Belonia."—(ফেণী থানার ইন-চার্জ, সাব-ইন্সপেক্টার যতীন্দ্রমোহন রায় রাত ১১-১৫ মিনিটের সময় স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়ে ইন্সপেক্টার ফজলুল বাসত্কে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সৈন্যদের সাথে আগরতলা থেকে বিলোনিয়া যাওয়ার পথে দেখা করতে যান)।

এখানে স্টেশন মাস্টারের যে টেলিগ্রামের কথা বলা হয়েছে, সেটি কিন্তু ভাটিয়ারী স্টেশন মাস্টারের তারবার্তা নয়। সৈন্যদের শুভ সম্ভাষণ জানাতে এই টেলিগ্রাম পাঠান ফেণীর স্টেশন মাস্টার। স্টেশনে এসে ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টার ভাটিয়ারীর খবর পান। এই সম্বন্ধে আর বেশি কিছু উদ্ধৃত করলাম না। গুর্খা সৈন্য কাদের, কি উদ্দেশ্যে বা কোথায় যাচ্ছে—এই সব সংবাদের তখন আমাদের অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। আমরা গুর্খা সৈন্য ভর্তি এই ট্রেন দেখেই প্রমাদ গুণেছি। উত্তরে মাঠের মধ্যে পালাবার পথ অবরোধ করে এই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশন বিল্ডিং ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দক্ষিণে শহরে যাবার পথও রুদ্ধ। দক্ষিণে শুধুমাত্র যাত্রীদের বেরোবার পথটিই খোলা ছিল। অবশ্য লাইন ধরে পূর্বদিকে পালাবার পথ খোলা ছিল, কিন্তু সেদিকে দৌড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারলে নির্দিষ্ট গতিপথ লক্ষ্য করে পেছন থেকে গুলী ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করা শত্রুর পক্ষে সহজ ছিল।

Manoeuvre করার জন্য বাইরের অবস্থান খুব সংকীর্ণ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাচ্ছিল না। তবু ক্ষীণ আশা—যদি জবানবন্দী নিয়েই ছেড়ে দেয়!

আমাদের স্টেশনের একটি ঘরে নিয়ে এল। ঘরের পুলিশবেষ্টনীর বর্ণনা সরকারী তথ্য থেকেই দিচ্ছি—

"They were marched along the platform and taken inside the Asst. Station Master's room. The S.I. and the Inspector entered the room with them along with the Havildar, and several constables. In the room also were the Asst. Station Master, Pulin Behari Majumdar, a ticket collector, Prafulla Pathak, another ticket collector, Abdul Hakim and a signaller Lal Mia."—(প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে তাদের হাঁটিয়ে আনা হল সহকারী স্টেশন মাস্টারের গৃহে। এস, আই ও ইন্সপেক্টার এবং তাদের সঙ্গে হাবিলদার ও কয়েকজন কনেস্টবলও ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে সহকারী স্টেশন মাস্টার পুলিনবিহারী মজুমদার, একজন টিকিট কালেক্টর প্রফুল্ল পাঠক এবং আর একজন টিকেট কালেক্টর আবদুল হাকিম ও সিগ্‌নেলার লাল মিঞা উপস্থিত ছিল)।

ঘরটিতে একটিমাত্র দরজা, কিন্তু খুব প্রশস্ত। একই দেওয়ালে, দরজার পাশে একটা খোলা জানালা আছে। এই মস্ত জানালা জুড়ে ঘরের মধ্যে একটি খুব বড় টেবিল পাতা রয়েছে। টেবিলের চার-পাঁচ হাত দক্ষিণে খুব বড় বড় দুটি আলমারী ছিল। আলমারী ও টেবিলের মাঝখানে দরজা পর্যন্ত যে স্থান সেখানে আমরা চারজন সিপাইবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়েছি। ইন্সপেক্টার সাহেব একটি চেয়ারে বসেছেন। সাব-ইন্সপেক্টার মহাশয় টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলেন।

আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ—ছোট্ট ঘরে পুলিশবেষ্টিত হয়ে রয়েছি। সামনে ট্রেন বোঝাই গুর্খা সিপাই। কাঁটাতারে প্ল্যাটফরমটি ঘেরা। আর বেশি সময় নেই—শেষ পর্ব এখনই শুরু হবে। চূড়ান্ত পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

[ক্রমশঃ]

প্রকাশিত হল

দীনবন্ধু রচনাবলী

নীল-দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত। দীনবন্ধু-চর্চার সুবিধার জন্য দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা আমরা একত্রে একটি খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করলাম। দীনবন্ধুর বিক্ষিপ্ত রচনাও এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। দীনবন্ধু রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম·এ·, ডি· ফিল·। তাঁর লেখা দীনবন্ধুর 'জীবন-কথা' ও 'সাহিত্য-কীর্তি' এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। দীনবন্ধু, তাঁর জায়া ও পরিবারবর্গের আর্ট প্লেট; আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য রচনাবলীর মত শোভন সংস্করণ।

দীনবন্ধু রচনাবলীর সূচী

নাটক ও প্রহসন
নীল-দর্পণ
নবীন তপস্বিনী
বিয়ে পাগলা বুড়ো
সধবার একাদশী
লীলাবতী
জামাই বারিক
কমলে কামিনী নাটক
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ

গল্প-উপন্যাস
যমালয়ে জীবন্ত মানুষ
পোড়া মহেশ্বর

কাব্য কবিতা
সুরধুনী কাব্য
স্বাদশ কবিতা
নানা কবিতা

সংযোজন

দাম মাত্র তের টাকা

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলি—৯

প্রেম ও প্রহার

কাজী নজরুল ইসলাম

'প্রেম' ও 'প্রহার' এই দুটি মোর নীতি!
এই দুটি মোর আল্লার দান, গাহি ইহাদেরই গীতি।
যারা নিপীড়িত যারা নির্জিত দুনিয়ায় নিশিদিন,
তাহাদেরি তরে পথে পথে আমি বাজাই প্রেমের বীণ।
উহাদের লাগি' নিতি ভিখ্ মাগি' দুয়ারে দুয়ারে আমি,
ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী।
প্রাণ যার আছে তারি কাছে চাই উহাদের তরে প্রাণ,
যারা যত পারে উহাদের তরে করুক আত্মদান।
যুক্তিতে ঐ মুক্তি আসে না, তাই প্রেম দিয়ে ডাকি,
রস-সুন্দর রথ ত্যাগ ক'রে চলি পথ-ধূলি মাখি'।
আত্মারে যারা বন্দী রেখেছে না ক'রে আত্মদান,
যাহাদের ভোগ-বাসনা এনেছে অশেষ অকল্যাণ,
ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দেয় না সর্বহারার তরে,
জনগণে রাখি' উপবাসী ঘরে ধন সঞ্চিত করে,
ধর্ম যাদের শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চিত করা,
মর্মে বেদনা নাই, শুধু যারা চর্ম-মাংসে ভরা,
তাদের প্রাপ্য প্রেম নয়, ওরা গলিবে না কভু প্রেমে,
প্রহার পাইলে উহাদের প্রেম গলিয়া আসিবে নেমে।
প্রেম ও জ্ঞানের কেন্দ্র দেখিবে দিব্য খুলিয়া যাবে,
যেদিন তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে নিদারুণ মার খাবে!
বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মত অমোঘ ওষুধ নাই!
মনের সিংহ বাঘ পোষ মানে, প্রেম-ভরে চাটে পা,
যদি অকরুণ প্রহারের চোটে হাড়ে হাড়ে ফোটে ঘা।
মানব দানব মদ-গর্বীরা সকলেই হয় বশ,
বক্ষে বসিয়া টুঁটি টিপে যদি খাওয়াও প্রহার-রস।
তাই প্রহারের সেনাদল চাই শৌর্য-দীপ্ত প্রাণ,
জরা ও মরায় তরায় যাহারা নিত্য-নৌজোয়ান।
পুরুষের বেশ, পৌরুষ নাই—দেখিবে ভারত-ভরা
ক্লৈব্য-ক্লিষ্ট, ভব্য আচার, সভ্য পোষাক পরা!
যুদ্ধের নামে নিশ্বাস হয় রুদ্ধ, হাত পা ভয়ে
উদার উদরে প্রবেশিতে চায় যেন আড়ষ্ট হয়ে।
ভুয়ো তর্কের তুর্কী-নাচন সহসা থামিয়া যায়,
যুক্তি পলায় কুর্দিস্থানে আশ্রয় খুঁজি, হায়!
ধ্বস্তা-বোঝাই-প্রস্তাব ভোট পথে যায় গড়াগড়ি;
জাতিভেদ ভুলে' কাঁদে সঙ্ঘে ক'রে রেল-রথে জড়াজড়ি।
হাসি পেট ভ'রে, রাশি রাশি এই বাসি-মড়াদের দেখে',
আগুন জ্বলিবে ইহাদেরই দেহে প্রেমের তৈল মেখে'।
অন্তরে যার নিত্যোৎসবে যৌবন ফাগুনের,
আগুনোৎসবে মাতিতে পারে যে, ফাগুনোৎসবে সেই
রণ-উন্মাদ যৌবন-বন-বিহারী! মৃত্যু নেই
কোনো কালে তার! সেই ফিরে ফিরে আসে
এই পৃথিবীর যৌবন-বনে, উদ্দাম রণ-রাসে!
ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া,
ভোগ-বিলাসীর তখ্ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া।
ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর আঙিনাতে!
এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্নাহেনা!
অসুন্দরের সংহার ক'রে সুন্দর করে ধরা,
ইহাদেরই তেজে অসি বশীভূতা, সাথী ও স্বয়ম্বরা।
এরা ঘনঘোর নিশীথ প্রহরী প্রবল প্রহার হাতে
দুর্বল মানুষের বল হয়ে লড়ে অমানুষ-সাথে!
সংঘবদ্ধ হয়ে আজ এরা এসেছে রণ-নটে
আঁকিবে নতুন ছবি এরা পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে!
যারা দুর্বল যারা অসহায়, এরা তাহাদেরি প্রেমে
পেয়ে আল্লার সহায়-শক্তি ধরায় এসেছে নেমে।
বলহীনে এরা রক্ষা করিবে, বলীরে দানিবে বলি,
এক হাতে ভীম প্রহরণ, আর হাতে প্রেম-অঞ্জলি
লয়ে এরা জনগণের আলয়ে এসেছে চৌকিদার,
যার যা প্রাপ্য পাইবে এবার, প্রেম অথবা প্রহার!
প্রেম ও প্রহার—চমৎকার কি নয় আমার এ নীতি?
প্রহারে করিব সংহার, প্রেমে যুচাব সর্বভীতি।

নজরুল সঙ্গীত

নীহারবিন্দু চৌধুরী

বাংলা মা চিরকালই অমিত প্রতিভাধর সন্তানের জন্মদাত্রী। শিল্প-সাহিত্যে, কাব্য ও চিন্তাজগতে বাংলায় যে কত দিক্‌পাল মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে তা' গুণে শেষ করা যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গুণিবর্গ অমর অবদান রেখে গেছেন।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), যদু ভট্ট, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সঙ্গীতাচার্যগণ সারা ভারতে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। সর্বোপরি গীতি-কবিতা ও নবশৈলীর সুর সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগতে যিনি বাংলার তথা ভারতের মর্যাদা অতুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন—তিনি সুরকার কবি বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ।

সাধারণত দেখা যায়—কবি বা গীতিকার কথা রচনা করেন এবং অপর কোন সুরকার তাতে সুরারোপ করেন। এটাই সাধারণ রেওয়াজ; এর কারণ বোধ হয় এই যে, একই ব্যক্তির মধ্যে কথা ও সুর এই উভয়ের মালা গাঁথার ক্ষমতা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। অবশ্য এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নেই যে তা' নয়।

আমাদের বাংলা দেশ এই দিক থেকে খুবই ভাগ্যবান—একই ব্যক্তি এখানে কবি ও সুরকার—একই ব্যক্তি-প্রতিভার মধ্যে এই যুগল গুণ প্রকাশমান—এমন দৃষ্টান্ত এখানে বিরল নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায়ও এই নিদর্শনের অমিল নেই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় কাব্য ও সুরলোকে এই যুগ্ম প্রতিভার আশ্চর্য সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কান্তকবি রজনীকান্ত প্রমুখ গীতিকার-সুরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার এই গোষ্ঠীর ভেতরে যিনি জনপ্রিয়তায় অনুপম ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল তিনিই হলেন একাধারে গীতিকার-সুরকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বাংলার শিল্পৈতিহ্য ও সুরৈতিহ্যের সার্থক গুণী শিল্পী হলেন চারণকবি নজরুল। নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীত-প্রতিভাঙ্গন এতই বিরাট ও বিস্তৃত যে, এ ধরণের অল্পায়তন নিবন্ধে তার কণা মাত্রেরও পরিচয় দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

নজরুলের সঙ্গীতসৃষ্টি এমনই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যমুখী যে, গুণগত বিশিষ্টতায়ই শুধু নয়; পরিমাণগত গরিষ্ঠতায়ও তা' সকল সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। শোনা যায় তিনি কম-বেশি তিন হাজারেরও ওপর সসুর গান রচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের সুরকার শুবার্ত ও প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ অত অধিক সংখ্যক সুর রচনা করেছেন বলে জানা নেই।

নজরুলের সাহিত্য নিয়ে আমাদের দেশে যথেষ্ট আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; কিন্তু নজরুলসঙ্গীত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। নজরুল স্বভাব-কবি। সুরকার হিসাবেও তিনি প্রকৃতির অজস্র দানে শক্তিমান। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষা ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর সুরের মণিকাঞ্চন যোগে তিনি বাংলা দেশকে মাতিয়ে রেখেছেন।

বস্তুত নজরুল এ যুগের সার্থক চারণকবি। তাঁর উদ্দীপনাময় ও দেশাত্মবোধক গানে উদ্বুদ্ধ হয় নি এমন লোকের সন্ধান মেলা ভার। বাংলার কাব্যসঙ্গীতকে নজরুল এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তাঁর কাছে সব চাইতে বেশি ঋণী। বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি নজরুলের গান থেকে অকুণ্ঠ প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর প্রাণমাতানো গীতরসে উদ্ভ্রান্ত হয়ে কত যুবক-যুবতী যে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নজরুলের গানের বাণী ও সুর সংযোজনা যেন দেশপ্রেমের মাদকতায় ভরপুর। তাঁর গান গেয়ে কতই না দেশপ্রেমিক হাসিমুখে ফাঁসীর রজ্জু আপন গলায় পরিয়ে নিয়েছেন। পরাধীন বাংলার বিদ্রোহী বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে তিনি তাঁর সুরভারতীর অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। নজরুলের গানে যেন বিদ্রোহের আগুন ঝলসে পড়ত। তাঁর অশান্ত মনের তান যেন বাঁধন ছেঁড়ার গান।

বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ কবি ও সুরস্রষ্টারূপে যখন তাঁর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে সমাসীন—তখন নজরুলের ন্যায় এক অজ্ঞাত অখ্যাত যুবকের পক্ষে কাব্য ও সঙ্গীতজগতে আপনাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা যে কতটুকু দুরূহ ব্যাপার তা' সহজেই অনুমেয়।

নজরুল স্বভাব-বিপ্লবী। কোথাও বা কখনো তিনি কোন বন্ধনই স্বীকার করতে চান নি। কী কাব্য রচনায়—কী সুর যোজনায় তিনি সব সময়ই নতুনের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। চিরাচরিত বাঁধা পথে কখনো তিনি বিচরণ করতে চান নি। তাঁর কাব্যসম্ভারে যেমন তিনি আরবী-ফার্সী শব্দ চয়ন করে বঙ্গভারতীকে সুসমৃদ্ধ

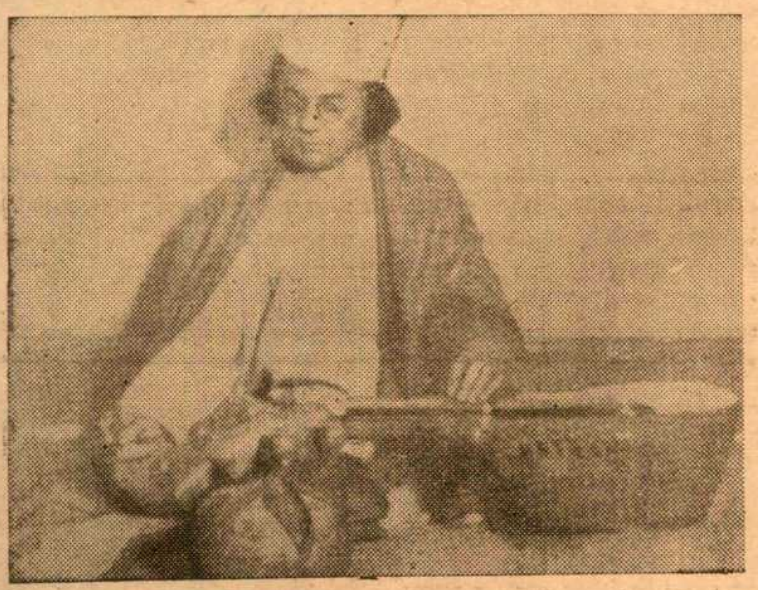

সুরশিল্পী নজরুল

করেছেন—ঠিক তেমনি বহু বিদেশী সুর আহরণ করেও তিনি সুরসরস্বতীকে ঐশ্বর্যান্বিতা করেছেন। সুরমহলের সব প্রকোষ্ঠেই তিনি পদচারণা করেছেন। এমন কোনও ভারতীয় সঙ্গীতশৈলী নেই যাতে তাঁর অনবদ্য প্রতিভার স্পর্শ না লেগেছে। প্রাচীন সঙ্গীতাবয়বের প্রতি যেমন তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—আবার প্রয়োজন বোধে পুরনো সঙ্গীতের রীতিনীতি ভাঙতেও তিনি পশ্চাদপদ হন নি।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান শৈলীনিচয় —যেমন ধামার, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভাগের দাদ্‌রা, কাজরী, ঝুমুর, চৈতী, আধুনিক, ভাটিয়ালী, বাউল, কীর্তন, ভজন, শ্যামা-সঙ্গীত, কাওয়ালি, রাগপ্রধান প্রভৃতি প্রতিটি রীতিতেই নজরুল গান রচনা করে তাঁর বিরাট প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। বহু বিদেশী সুর নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং বহুলাংশে সফল-কামও হয়েছেন। তাঁর এ জাতীয় গানের লোকপ্রিয়তাই এর অকাট্য প্রমাণ।

* * *

নজরুলের সঙ্গীতকৃতির প্রধান কৃতিত্ব তাঁর গজলশৈলীর গানের অবদান। এইটিই তাঁর গীতাবলীর মুখ্য সাঙ্গীতিক কীর্তি। পারস্য দেশীয় প্রেম বিষয়ক সুরাশ্রিত গীতিকবিতাকে (লিরিক) গজল বলা হয়। এই পারসীক গীত-রীতির গান ভারতে তথা বাংলার মাতৃভাষায় প্রবর্তন করে নজরুল সঙ্গীতজগতে এক যুগান্তর আনেন। ভাবুক বাঙালী তাঁর এই গজল-ধর্মী গানগুলিকে সোৎসাহে স্বাগত জানান। তাঁর বাংলা গজলের পদ-সম্ভার যেমনি চিত্তাভিরাম—তাঁর সুরমাধুর্যও তেমনি কর্ণাভিরাম। তাঁর আধুনিক প্রেম-সঙ্গীতগুলিও কাব্যসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর গজলশৈলীর প্রেম-গীতি-গুলি বিরহ-মিলন রসাপ্লুত; আবার কখনো কখনো তাঁর গানে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। নজরুলের বিখ্যাত গজলগুলির কয়েকটি পংক্তিমাত্র নিম্নে দেওয়া হল। বাংলা গজল গানে 'শ্যার' (গানের মাঝখানে আবৃত্তি)-এর রীতিও তিনি চালু করেন।

(১) "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল
শাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজো তার ফুল কলিদের
ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল।"

(২) "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।"
—মিশ্র ইমন

(৩) "আমারে চোখ ইসারায় ডাক
দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং মহলার তিমির-
দুয়ার ডাকিলে যদি।"
—মিশ্র ভৈরবী

(৪) "কে বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।"
—গারা-খাম্বাজ

(৫) "নহে নহে প্রিয় এ নয়
আঁখি জল।"

(৬) "ভুলি কেমনে আজো যে মনে...।"

(৭) "এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া...।"

(৮) "এত জল ও কাজল চোখে,
পাষাণী আনলে বল কে।"

(৯) "চেয়ো না সুনয়না আর
চেয়ো না ঐ নয়ন পানে.....।"

(১০) "কেন আন ফুলডোর
আজি এ বিদায় বেলায়.....।"
—কানাড়া মিশ্র

(১১) "কোন্ কূলে আজ
ভিড়লো তরী.....।"

(১২) কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায়
কারে কহি.....।"

(১৩) "মোর ঘুম ঘোরে এলে
মনোহর.....।"
—ভৈরবী

* * *

সঙ্গীতজগতে ও জাতীয় জীবনে নজরুলের আর একটি বরণীয় ও স্মরণীয় অবদান হল তাঁর রচিত প্রগতিধর্মী উদ্দীপনার গানগুলি। তাঁর এই কোটির গান-গুলি স্বদেশী সঙ্গীত বা জাতীয়তাবাদী সঙ্গীতরূপেও আখ্যাত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্তি লাভের আন্দোলনে এই গানগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে সামান্য কয়েকটির মাত্র উদ্ধৃতি দেওয়া হল। কোরাস্ বা সম্মেলক গান রচনায়ও কাজী সাহেব যথেষ্ট মুন্সী-য়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কোরাস গানগুলি বাস্তবিকই স্বজাতিকতা ও সংগ্রামীভাবের উদ্বোধক। নিচের এই গানটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(১) "দুর্গম গিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রীরা হুঁসিয়ার।"

(২) "জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা
জাগো স্বাহা সীমন্ত রক্তটীকা—।"

(৩) "এই শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবে রে বিকল।"

(৪) "কারার ঐ লৌহ কপাট...।"

(৫) "জননী মোর জন্মভূমি,
তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী
স্বদেশ আমার ভারত মাতা।"

(৬) "ঝড় ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান
ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে
জাগো জাগো তন্দ্রা অলস রে,
সাজো সাজো রণ-সাজে।"

মার্চের সুর (যুদ্ধযাত্রা গান) গ্রন্থনায় নজরুলের সমকক্ষ প্রতিভা সত্যিই বিরল। বীররসাত্মক তাঁর মার্চ সঙ্গীতগুলি সংগ্রামশীলতারই দ্যোতক। তাঁর এই গান-গুলি উত্তেজক ও দেশপ্রেমবোধক। এখানে কয়েকটি বিখ্যাত মার্চের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌.....।"
Tempo-di-Marcia
—Quick Walty—
6/8 time.

(২) "টলমল টলমল পদভরে
বীরদল চলে সমরে.....।"
—Slow March

(৩) "শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে
বাজিছে শঙ্খ ঐ
পুণ্যচিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের
যাত্রী কই।"

(৪) "চল্‌রে চপল তরুণদল বাঁধনহারা
চল্ অমর সমরে চল্
ভাঙি কারা।"
—Quick March

(৫) "বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল
যৌবন-সুন্দর চিরচঞ্চল।"
—Alegretto

* * *

নজরুল তাঁর সঙ্গীতকর্মে লোক-সঙ্গীতের যে সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা' বাস্তবিকই চিত্তহারী। নজরুলের সঙ্গীতপ্রতিভা বহুমুখী। বাংলার পল্লীসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কথা ও সুরের যে শুভ-পরিণয় তিনি সাধিত করেছেন, তা' যেমনি হৃদয়স্পর্শী —তেমনি বাংলার সঙ্গীতভাণ্ডারকেও তা' নানাভাবে বিত্তবান করে তুলেছে। যেমন—

(১) "আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল...।"
—বাউল

(২) "আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো
চল আমার বাড়ী
ওগো ভিন গেরামের নারী।"
—ভাটিয়ালী

এজেন্ট আবশ্যক

শতকরা ৩৫ টাকা হিসাবে কমিশনে প্রতি নগরে এবং শহরে সুবিখ্যাত এসকর্ট ট্রান-জিস্টার বিক্রয় করিবার জন্য। স্যাম্পেলের জন্য পত্র লিখুন।

The Manager (WBC-55)
P. B. 1115, Delhi-6.

(৩) "ও মিতালী সইলো
মনের কথা কইলো.....।"
—ঝুমুর

(৪) "তোর রূপে সই গাহন ক'রে
জুড়িয়ে গেল গা।
তোর গাঁয়েরই নদীর ঘাটে
বাঁধলাম মোর না।"
—ভাটিয়ালী

(৫) "পদ্মার ঢেউরে তোর পদ্ম দিয়ে
যাও রে।"
—ভাটিয়ালী

(৬) "ওরে ও বিদেশী বন্ধু.....।"
—ভাটিয়ালী

(৭) "ভুলায় নি আমারি কুল
ভুলেছে নিজেও সে কুল।"
—বাউল

(৮) "আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি॥"
—বাউল—লোফা

* * *

কাজী সাহেবের সুরে বিদেশী সঙ্গীতেরও প্রভাব দেখা যায়। বাংলার সঙ্গীতের বিশিষ্টতা বজায় রেখে তিনি বিদেশী (প্রধানত মধ্য প্রাচ্য ও অন্যান্য দেশ) সুরসম্পদকে দেশীয় সঙ্গীতরসে নিষিক্ত করেছেন। তাঁর বিদেশী প্রভাবান্বিত সুললিত গীতি-গুচ্ছগুলির তুলনা আমাদের সঙ্গীতে মেলা ভার। যেমন—

(১) "রুম ঝুম্ রুম ঝুম্ রুম্
ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতায় নূপুর বাজায়ে
কে যায়?"—আরবী সুর

(২) "বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে।"
—নৌ রোচকা

(৩) "মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে
নেচে যায়—।
বিহ্বল চঞ্চল পায়॥"
—ইজিপ্সিয়ান ড্যান্সের সুর

(৪) "দূর দ্বীপ-বাসিনী
চিনি তোমারে চিনি।
দারুচিনির দেশের তুমি
বিদেশিনী গো,
সুমন্দ ভাষিণী॥"
—কিউবান ড্যান্সের সুর

পারস্য দেশীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি নজরুল তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। পারসীক সঙ্গীতের মোকাম ও গুম্বা অতি দক্ষতার সঙ্গে তিনি আমাদের গানে প্রয়োগ করেছেন। পারস্য ভাষার রাগিণীর নাম 'শোভা'। নজরুল ব্যবহৃত কয়েকটি পারসীক 'মোকামে'র নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা:—রিহাবি, হোসেনী, বুজুর্গ, ইস্কাহান, লুবা, রোসুলিখ, ওস্বাহ, জংগুলা, হিজাজ, বাস্ট, ইরাখ্, কোবাক্ প্রভৃতি। এই মোকামগুলি আমাদের ভারতীয় ঠাটের অনুরূপ।

ভজন, কীর্তন, ভক্তিসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও নজরুল তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবির ভক্তিমূলক গানগুলি ভক্তিরসে আপ্লুত। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলি এতই জনপ্রিয় যে, বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে সেইগুলি জনসাধারণের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে। তাঁর রচিত কীর্তনাঙ্গের "আমি কী সুখে লো গৃহে রব" গানটি একটি অনবদ্য রচনা। তাঁর শ্যামাসঙ্গীত "কে পরালো মুণ্ডমালা", "নাচে রে মোর কালো মেয়ে", "মাতৃল গগন-অঙ্গনে ঐ আমার রণ-রঙ্গিণী মা", "দেখে যা-রে রুদ্রাণী মা হয়েছে আজ ভদ্রকালী", "মহাকালের কোলে এসে গৌরী আমার হ'ল কালী", "আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়", "শ্মশান-কালীর নাম শুনে রে ভয় কে পায়", প্রভৃতি গানগুলি শুনে ভাবোদ্দীপ্ত সারিত হয় না এমন ব্যক্তি খুবই দুর্লভ।

* * *

কবির রাগভিত্তিক গানগুলি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি অসংখ্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগে গান বেঁধেছেন। মিশ্র রাগ বা উপরাগেও তাঁর অনেক গান রয়েছে। ঐ গানগুলি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে বহুশ্রুত ও স্তুতিধন্য। ছায়ানটে রচিত তাঁর "শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয় ফিরে আয়" খেয়াল অঙ্গের গানটিতে তিনি "পা রে রা গা ম ধা পা" এই মীড়ের কাজটুকুতে এমন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলছেন যে, তা' সত্যিই তুলনাবিহীন।

তাঁর ভজন (রাগিণী লাচ্ছাশাখ—ত্রিতালী) "শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল" গানটির সুরবিন্যাসে তিনি কেমন করে যে শেষ পংক্তিতে "সপা-া পা পা। ধ পা ম গা র সা ধ্ ন্যা। লাগিয়েছেন তা শুনলে প্রাণ ভরে ওঠে। শুদ্ধ রাগ-রাগিণী ছাড়াও তিনি বেহাগ-খাম্বাজ, ভৈরবী-পিলু, সাহানা-বাহার, পিলু-খাম্বাজ, পরজ-বসন্ত, সিন্ধু-ভৈরবী প্রভৃতি মিশ্ররাগেও অনেক মধুর গান রচনা করেছেন। বাহুল্য বোধে সেগুলির উদাহরণ দিতে বিরত রইলাম।

কাজী সাহেব লুপ্ত ও অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর প্রচলনেও যথেষ্ট সহায়তা দান করেছেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টায় ভারতের অনেক লুপ্ত রাগের উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। কৌশিক কানাড়া ও শিবরঞ্জনীর বাংলা গান তিনিই আমাদের দেশে প্রচলিত করেন। তাঁর অসংখ্য গান রেডিও-তে গীত হয়েছে। বর্তমানেও তাঁর গান আবার জনপ্রিয়তা লাভ করছে। নজরুল ভারতের তথা বাংলার সার্থক গীতিকার-সুরকার।

আজ কবিবরের গানের সমালোচনার সময় তাঁর বর্তমান দৈহিক পীড়ার কথা মনে হলে বেদনায় আমাদের মন ভরে ওঠে। বহু বৎসর যাবৎ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে ভুগে জীবন্মৃতের ন্যায় শয্যাশ্রয়ী হয়ে আছেন। তাঁর পুণ্য জন্ম-বার্ষিকীতে বাংলার চিরপ্রিয় সুরকার—ভারতের জাতীয় বিপ্লবী-কবির উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের অন্তরের আন্তরিক শ্রদ্ধা—জানাই আমাদের সভক্তি প্রণতি। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও কবির কল্যাণ কামনা করছি।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

গ্রন্থমেলা

শিশুসাথী — শ্রীমতী দাশগুপ্ত ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ প্রতি সংখ্যা ৬০ পঃ

এখন যারা ছেচল্লিশে পা দিল, তারাও মনে রেখেছে তাদের শিশুকালের সাথী 'শিশুসাথী'কে। 'শিশুসাথী'ও ৪৬ বৎসরে পড়ল। বাংলা দেশে সংবাদটা প্রচার করার দরকার হয় না। শিশুদের হাতে হাতে ঝকমকে মলাটের শিশুসাথী। শিশুসাথীর বয়স নাকি ৪৬। তবু বিশ্বাস করে না তারা। তাদের এমন সঙ্গীর বয়স ৪৬ কি করে হয়? ঠিক তাদের মনের মতো প্রিয় গল্প, ছড়া, রূপকথা, উপকথা, নানাকথা কোনোদিন পুরাতন হবার নয়। বরং শিশুসাথীতে যা বার হয়, তা বারবার শোনার মতো, শোনাবার মতো। আর পুরাতন হয় না বলেই সারা বছরের বই বাঁধিয়ে রাখার মতো। তবে অবশ্য শিশুসাথীতে এ ক' বছরে আরো অনেক নতুন নতুন লেখা যুক্ত হয়েছে। সম্পাদিকা শ্রীমতী দাশগুপ্ত শুধু নতুন ধরণের লেখাই প্রকাশ করেন নি, অনেক বড় লেখককে 'শিশুসাথী'তে এনেছেন। পাশাপাশি ছোট ছেলেদের লেখা শিখিয়ে তাদের লেখা প্রকাশ করেছেন। ছেলেরা ভালবাসে খেলতে, তিনি খেলার বিভাগকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। আরো কতো কি! যেমন বিজ্ঞান, ভূগোল, ম্যাজিক, অভিনবধারা, ভ্রমণকাহিনী এবং অনেক কিছু। এই 'শিশুসাথী'ই সারা বাংলাদেশের শিশুদের মন জয় করা পত্রিকা। এখন এই পত্রিকাতেই পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার লেখকদের সম্মিলন ঘটে। শিশুসাথীর বৈশাখ (১৩৭৩) [illegible] চমৎকার। এতে নামী লেখকদের মধ্যে আছেন বন্দে আলী মিঞা, শিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীঅমিতাভ, মনোতোষ রায়, অমরনাথ রায়, সুমথনাথ ঘোষ, সুনন্দা দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর, শান্তশীল দাস প্রমুখ।

নরনারী—সম্পাদক ঃ সুবোধ মিত্র। সহ-সম্পাদক ঃ মোহন মিত্র। ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ তিন টাকা।

১৩৭৪-এর বৈশাখে প্রকাশিত 'নরনারী'র বিশেষ সংখ্যাটি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনালোচিত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরণের কার্যকর পরিকল্পনা ও সৎসাহসের জন্য সম্পাদকগোষ্ঠীর কৃতিত্ব অবশ্যই গুণিমহলে স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে ধর্মান্ধ যাঁরা, যুক্তিতেও যাঁরা বিশ্বাস করেন না, এই সংখ্যাটি পড়ে তাঁরা ক্ষেপে যাবেন, কিন্তু সত্যিকারের উপকৃত হবে সাধারণ মানুষ যারা বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিতে উৎসুক। বলা বাহুল্য, আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নরনারীর মতামত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এমন অবিকৃত অবস্থায় ধর্মীয় তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব তথ্যের সম্মিলন দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতে যৌনতার সঙ্গে ধর্মের যে প্রলেপ লাগানো হয়েছে তা কার্যকারণসহ বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করেছেন। উদার দৃষ্টিতে ধর্মের বিচার করার ফলে এবং ধর্মের সঙ্গে মানবতার সাযুজ্য নিদর্শনের ফলেই এবম্বিধ হৃদয়গ্রাহী ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব হয়েছে। আমরা মনে করি, এই রচনাগুলির মাধ্যমে 'নরনারী' নতুন পথ প্রদর্শন করলো, এবং নরনারী তার দীর্ঘজীবনের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করলো। বহু রচনাই ভাষান্তরের যোগ্য। সেই আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত ভিন্নদেশের বিভিন্নধর্মের আলোচনায় মানুষের রুচিবোধের পরিচয় এবং মঠ, মন্দির বা গির্জায় উৎকীর্ণচিত্রে বা মূর্তিতে আদি রিপুর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক, একালে তার আবেদন সম্পর্কিত আলোচনা এবং বহু দুর্লভ ছবি নরনারী পত্রিকার উৎকর্ষ অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। ঈর্ষণীয় লেখকদের মধ্যে আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, উমাপদ পণ্ডতীর্থ, দুর্গাদাস সরকার, আদিত্য ওহদেদার, অরুণকুমার রায়চৌধুরী, মদন রাণা, যজ্ঞেশ্বর রায়, রায় রত্নাকর, মোহন মিত্র এবং আরো অনেকে। প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচায়ক।

বনসভা — সম্পাদক ঃ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস। পোঃ রায়না (বর্ধমান)। দাম ঃ ৭৫ পঃ।

এটি ১৩৭৩-র প্রথম সংখ্যা। ষান্মাষিক হিসেবে প্রকাশিত হবে জানানো হয়েছে। পত্রিকাটির বিষয়বস্তু, গল্প কবিতা প্রবন্ধ ধারাবাহিক রচনা প্রভৃতি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে পত্র লিখেছেন তা থেকে জানা গেল যে, "শান্তিনিকেতনের আদর্শকে সামনে রেখে 'বনসভা' নাম দিয়ে" পত্রিকাটি বের করা হয়েছে। 'বনসভা' নামটিকে সার্থক করে তুলতে হলে গ্রামের মানুষের ধ্বনি-শব্দ-ছবি—সব কিছুই প্রকাশ করতে হবে। করতে হবে প্রকাশ সেই ভূখণ্ডের, যেখানে বনভূমি কেটে একদা জনভূমি গড়ে তোলা হয়েছিল। মোটামুটি আমরা চাই আঞ্চলিক কাহিনী সেখানের কিম্বদন্তী, প্রচলিত ছড়া ও প্রবচন প্রভৃতি। সেই সঙ্গে বিশ্বের বিশ্বাস প্রযুক্ত হোলে সম্পাদকদ্বয়ের আশা নিশ্চয়ই সার্থক হবে। সম্পাদকদ্বয় বর্তমান সংখ্যায় যে উৎকর্ষ ও রুচিশীলতা দেখিয়েছেন, আমরা মনে করি, পরবর্তী সংখ্যায় নবলব্ধ চেতনায় তাকে সত্য ও সুন্দরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'বনসভা' যথার্থ প্রেরণাদায়ক কবিতা। আমরা কামনা করি, তাঁর বাণী সত্য হোক।

রঙ্গমঞ্চ ও দেশে বিদেশে

জন জ্যান ড্রুটেনের 'প্লেরাইট এট্ ওয়ার্ক' বইটি প্রত্যেক নাট্যরসিকের পড়ে দেখা উচিত। বইটিতে অনেক মজার মজার কথা আছে—শেখবার মত জিনিসও কম নেই। একজন দর্শনার্থী একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি পুরাতন প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই নাটক রচনা করেন কি না। নিয়মটা কি জানতে চাইলে, উত্তর পেয়েছিলেন—নাটকের প্রথম অংকটা হচ্ছে নাউন, দ্বিতীয় অংকটি ভার্ব এবং তৃতীয়টি সেন্‌টেন্সের প্রেডিকেট—সেন-টেন্স বলতে অবশ্য সমগ্র নাটকটিকেই বোঝাচ্ছে। ড্রুটেনকে অবশ্য স্বীকার করতে হয়েছিল এই নিয়মটি তাঁর সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

আর একদিন এক বিখ্যাত নাট্যকারকে আর একটি নিয়মের ব্যাখ্যা দিতে শুনে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—প্রথমে আমি সবাইকে বলি আমি কি করতে যাচ্ছি। তারপর সেই অনুসারে কাজ করি এবং শেষে তাদের জানাই যে, যা বলেছিলাম তা করেছি। ড্রুটেনের মনে হয়েছিল এতে তো নাটক এক অংকের ভেতরই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়—অর্থাৎ দ্বিতীয় অংকটিতে, যেখানে তিনি আসলে কাজ করছেন। পরিচালকের কাজ করতে গিয়েও ড্রুটেনের প্রথমে এই একই ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রথম প্রডাকসন করবার আগে তিনি বেশ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দু'জন লোকের কাছে যান এ বিষয়ে উপদেশ নিতে। আগে গেছিলেন একটি তরুণ পরিচালকের কাছে—এঁর প্রতি ড্রুটেনের বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। যুবকটি একটি বড় কাগজের সিট্ নিয়ে তার ওপর একটি মঞ্চের প্রতিকৃতি আঁকলেন। এরপর ঐ স্টেজটিকে নানাভাগে ভাগ করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন কোন ভাগটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যুবক বলেছিলেন—স্টেজের সামনের ডান দিকটাই সব থেকে আকর্ষণীয় জায়গা। খবরের কাগজেও এই কারণেই ঐ জায়গাটিতেই সব থেকে বেশি জরুরী খবরটি ছাপা হয়। সুতরাং ঐ জায়গাতেই নাটকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটা উচিত। তিনি অনেকগুলো এ্যারো আঁকলেন, মন্ডল এবং স্তর সম্পর্কে বহু আলোচনা করলেন এবং এর ফলে ড্রুটেনের ভীতি আরও বেড়ে গেল। অপর যে লোকটির কাছে ড্রুটেন গিয়েছিলেন তাঁর নাম হল জোসুয়া লোগেন। তিনি ড্রুটেনের আগের দিককার একটি নাটকের স্টেজের ব্যবস্থাপনা করেছিলেন এবং তারপর ক্রমাগত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করছিলেন।

ড্রুটেন লোগেনকে গিয়ে নিজের সমস্যার কথা বললেন। লোগেন খুব সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দিলেন। তিনি বললেন—আপনাকে শুধু কি করতে হবে জানেন? কমন্‌সেন্স ব্যবহার করতে হবে এবং নজর রাখতে হবে যেন প্লে'টি দেখতে ভাল লাগে। বহু বছর ধরে আপনি আপনার প্লে'গুলো একজন পারদর্শী ডিরেক্টরের দ্বারা সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে দেখেছেন—তাছাড়া আপনি নিজেও যথেষ্ট সদরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। যে ডিরেক্টরটির কথা লোগেন বলেছিলেন তিনি হলেন অরিওল লী। এই মহিলার কাজ দেখে এবং কথাবার্তা শুনে ড্রুটেন সত্যিই অনেক কিছু শিখেছিলেন। নিজের কাজ সম্পর্কে এই মহিলার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

লোগেন আরও বলেছিলেন—দলের অভিনেতাদের কাছে যে বিষয়ে আপনি জানেন না, তা স্বীকার করতে ভয় পাবেন না। তাদের শ্রদ্ধা পাবার জন্য আপনাকে সবজান্তা হতে হবে এর কোন অর্থ নেই। বরং নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরলেই তারা আপনাকে অন্তর থেকে ভক্তি করবে।

লোগেনের উপদেশ শুনে খুবই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ড্রুটেন। খুবই উৎ-সাহিত বোধ করেছিলেন এবং উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। ড্রুটেন বলেছেন, নাটক লেখার বেলাতেও লোগেনের উপরি উক্ত উপদেশাবলী সমানভাবেই প্রযোজ্য।

ব্রিটিশ নাট্যকার ক্লিফোর্ড ব্যাঙ্কের একটি প্রবন্ধের একটি লাইন ড্রুটেনকে খুব সচকিত করে তোলে। লাইনটি হচ্ছে—প্লে'গুলো হচ্ছে নশ্বর সামগ্রী। কারণ দু-একটি ব্যতিরেক ছাড়া নাটকগুলোও জনপ্রিয় হয় তখনি, যখন জার্নালিজমের মত তারা সমাজের উত্তেজক ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। বেশির ভাগ পাঠক লিটারারি ক্লাসিকের থেকে খবরের কাগজ পড়তে ভালবাসে। সাধারণ দর্শকেরা রঙ্গালয়ে সুন্দর ওয়ার্ক অভ্ আর্ট দেখতে যায় না--তারা চায় প্রাত্যহিক জীবনের নির্মম বা হাস্যকর দিকগুলোর সম্বন্ধে ভাষ্য শুনতে।

এই প্রসঙ্গে সমারসেট মমের 'দি সার্কিল অপ' বইটির কথাও ড্রুটেনের মনে হয়েছে। এতে মম্ থিয়েটারের সম্বন্ধে ক্ষণস্থায়ী বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন—এবং এ কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই কারণেই তিনি রঙ্গমঞ্চের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অবশ্য মমের মতে কাব্যনাটক হচ্ছে এই নিয়মের ব্যতিরেক।

"Plays in verse are not ephemeral, not perishable commodities; plays in prose, seem to be. That, very briefly, was why mangham left the theatre."
—["Van Druten.]

ড্রুটেনের মনে হয়েছিল মম্ উপরি উক্ত মন্তব্য করবার সময় খানিকটা ঔদাসীন্য এবং সিনিকের মনোভাব নিয়ে কথাটা বলেছিলেন। ক্লি-ফোর্ড ব্যাঙ্কও একই কারণে একই ধরণের মত প্রকাশ করেছিলেন। অথচ একথাও ড্রুটেনের মনে হয়েছে যে এঁদের দু'জনের সঙ্গে তাঁরও মতের ঐক্য আছে অনেক দিক থেকে—থিয়েটার ক্ষণস্থায়ী এবং প্লে'গুলো সময়ের সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আরও অনেক জিনিসেরও ব্যাপারে তো তাই হয়। এভারেজ নভেলের বেলায়ও তো তাই হয়। সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্রেও এ শ্রেণীর উদাহরণ পাওয়া যায়। সুতরাং সময়ের সীমার দ্বারা গন্ডীবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নাট্যশিল্পকে তুচ্ছজ্ঞানে বিনা চর্চায় দূরে সরিয়ে রাখার কোন অর্থই হয় না।

"কাব্যনাট্য ক্ষণস্থায়ী নয়"—এ উক্তি ড্রুটেন নির্বিচারে মেনে নিতে রাজী নন্। কাব্য সম্বন্ধে কোন সস্তা বাহবা থাকাটাও উচিত নয়। শেক্সপীয়ার ছাড়া (অবশ্য সব ব্যাপারেই শেক্সপীয়ারকে বাদ দিয়েই আলোচনা করা বিধেয়) ইংরাজী ভাষার আর ক'টি কাব্যনাট্য সমসাময়িক গদ্যনাটোর তুলনায় বেশিদিন সমাদৃত হয়েছে? মার্লোর গোটা দুই, বা ওয়েবস্টারের—হয়তো শেলীর 'দি চেন্‌চী' নাটকটি। তাও 'চেন্‌চী' সম্বন্ধে বেশি জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। ব্রাউনিং বা টেনিসনের একটি নাটকও যে কালের যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারে নি সে তো সবাই জানেন।

স্টিফেন ফিলিপস্ এক সময় কাব্য-নাট্য রচয়িতা হিসাবে জনপ্রিয় ছিলেন—এখন আর কে তাঁকে মনে রেখেছে। ক্লিফোর্ড ব্যাঙ্কের কথাও তো আজকালকার নাট্যরসিকেরা ভুলে গেছেন। এই একই কথা বলা চলে ক্রিস্টোফার ফ্রাই, টি, এস্, এলিয়ট এবং ম্যাকওয়েল এণ্ডারসন সম্বন্ধে —'Dead poetry can be

almost deader than dead prose, even if its form is dramatic.'

ড্রুটেনের সঙ্গে এখানে এক বিষয়ে আমার মতদ্বৈধ হচ্ছে। আমি মনে করি এলিয়টের নাটকগুলো কালজয়ী হবে এবং দিন দিন ওই সব নাটকের কদর এবং জনপ্রিয়তা বাড়বে বই কমবে না। এলিয়টের কাব্যনাট্যকে যিনি dead poetry-র পর্যায়ে ফেলবেন, তাঁর নিজের কাব্য বিচারের ক্ষমতাই dead হয়ে পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

এরপর ড্রুটেন প্রশ্ন তুলেছেন—থিম্, স্টোরি, প্লট ও মুড বলতে কি বোঝায়?

প্রথমে থিম্—অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে প্লে রচিত—অর্থাৎ নাটকটির বক্তব্য—বা নাটকের যা মেসেজ অথবা বাণী। ড্রুটেন বলেছেন প্লট বা চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না না বলেও থিম্টা বলে দেওয়া যায়। হ্যামলমার এবং হেডভিগের নামোল্লেখ না করেও 'দি ওয়াইল্ড ডার্কের' থিম্কে বিবৃত করা যায়। ঐ নাটকের থিম্টা হচ্ছে এই—অনেক লোকের জীবনে ইলিউশন থাকাটা দরকার। যে মানুষটি এসে এদের জীবনের ইলিউশন নষ্ট করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লাগে, সে আসলে ঐ বেচারীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। 'হেডডা গ্যাবলারের' থিম হচ্ছে 'সাইকোটিক ইফেক্ট অভ্ ফ্রাস্ট্রেশন'। 'ডেথ অব্ এ সেলস্ম্যানের' থিম্ হচ্ছে 'আমেরিকান ড্রিম অভ্ সাকসেস' ওথেলোর থিম জেলাসী। হ্যামলেটের থিম এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি—সারা দুনিয়ার সমালোচকেরা এখনও এ নিয়ে গবেষণা করছেন। আজকের দিনে হ্যামলেটের থিমের ওপর আমরা যত গুরুত্ব দিচ্ছি মহাকবি নিজে হয়তো নাটকটি রচনা করবার সময় সে বিষয় নিয়ে তেমন মাথা ঘামান নি।

স্টোরি এবং প্লট—দুটি কি একই জিনিস? তা যদি না হয়, তাহলে তাদের পার্থক্য কোথায়? ই. এম. ফরস্টার তাঁর 'এ্যাসপেক্টস অভ্ দি নভেল' বইতে এর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—স্টোরি সময়ের ওপর নির্ভরশীল। রাজা মারা গেলেন। তারপরে রাণী মারা গেলেন। অর্থাৎ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ঘটনার পরম্পরা।

প্লট কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। রাজা মারা গেলেন এবং তার ফলে অন্তরে নির্মম আঘাত পেয়ে রাণী মারা গেলেন। নভেলের বেলায় অডিয়েন্সের মনে প্রশ্ন জাগে—And then ?

প্লটের সম্বন্ধে অডিয়েন্সের প্রশ্ন আরও গভীরতাপূর্ণ—And why?

স্টোরি ছাড়া প্লট হয় না। কিন্তু প্লট ব্যতিরেকেও স্টোরি হতে পারে। স্টোরি আবিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ —কিন্তু ভাল প্লট সৃষ্টি করবার জন্য বিশেষ ধরণের উদ্ভাবনী প্রতিভার দরকার—

"It needs a kind of mathematical instinct, a power to tie pieces together, thread incidents so that they lead logically (and unexpectedly) from one to another, and then turn the whole thing into a neat package for the ending. You can do it, or you cannot. If you can, you are liable to become very popular."
—[Jan Van Druten.]

বিগত পঞ্চাশ বছরে রঙ্গমঞ্চে যদি নতুন কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে মুড-প্লে। এ জাতীয় নাটকের বিশেষত্ব হল কোন একটি বিশেষ মুডকে আঁকড়িয়ে রাখা এবং তাকে সঞ্চালিত করা—এরই মাধ্যমে সামগ্রিক এ্যাকসনকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ ধরণের নাটকের সংখ্যা খুব বেশি নয়—কারসন ম্যাককালারের 'দি মেম্বার অভ দি ওয়েডিং' এবং টেনেসি উইলিয়ামের 'দি গ্লাস মেনাজেরি'কে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

এ প্লে'র আদি জন্মভূমি কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ড্রুটেন বলেছেন—সর্বপ্রথম এ ধরণের প্লে'র বর্ণনা পেয়েছিলাম ১৯১১ সালে—আমার বাবা-মা লণ্ডনের স্টেজ সোসাইটির দ্বারা প্রদর্শিত একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। আমার মা—তিনি খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন, আর ইবসেন এবং ক্লাসিকস সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল—এসে আমাকে বলেছিলেন, সমস্ত ব্যাপারটাই মনে হয় পাগলামীতে ভরা, আর তা না হলে সারা প্রেক্ষাগৃহটাই বোধ হয় উন্মাদে পরিপূর্ণ ছিল। যে প্লে'টি তাঁরা দেখে এসেছিলেন সেটি ছিল একজন রাশিয়ান নাট্যকারের লেখা, নাটকের নাম 'দি চেরী অর্চার্ড'। তারপরে অবশ্য চেখভ সম্বন্ধে অনেক পড়েছি এবং তাঁর নাটকও ভালভাবে স্টাডি করেছি। ক্রমশ দেখতে পেয়েছি শ্রোতা এবং সমালোচকেরা আর চেখভের নাটককে উদ্ভট বা অদ্ভুত বিবেচনা করেন না। বরং নাট্যকার হিসাবে দিনে দিনে চেখভের খ্যাতি যশের উচ্চতম শিখরে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে।

আচ্ছা, কি কারণে চেখভের নাটককে আগেকার নাটকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বলে মনে হয়েছে? কেন মনে হয়েছে এর টোন-স্কেল আলাদা, এসব নাটকের কোন ফর্ম নেই, এদের ভেতর মেলডীর অভাব। ঠিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাঁদের কান হ্যাণ্ডেল, গ্লুনড এবং ভার্ডির মিউজিকে অভ্যস্ত ছিল, তাঁদেরও এক সময় ওয়াগনার, স্ট্রাউস, ডেবুশী এবং স্ট্র্যাভিনস্কির সঙ্গীত (যা তাঁদের কানে ছিল অনভ্যস্ত) শুনে এই রকমটাই মনে হতো। প্লট বা নির্দিষ্ট স্টোরি-লাইনের অভাবে, পুরনো প্রথায় নাটকে ফর্মের অভাবের জন্যই অনভ্যস্ত দর্শক প্রথম দিকে চেখভের নাটকের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারতো না।

এরপর ১৯১৪ সাল থেকে সমাজে সব কিছুর ওপরই দ্রুত ওলট-পালট হতে লাগল। সারা পৃথিবী বদলাতে লাগল। লোকের ব্যবহার, নীতিবোধ, টেম্পো অভ লাইফ সবের ভেতর এল দ্রুত পরিবর্তন। আজকাল অত্যন্ত প্রগতিশীল কিছু সমালোচক এমন কথাও বলছেন যে, ইবসেন এবং চেখভও বিগত যুগের পর্যায়ে চলে গেছেন।

মুডের ওপর নির্ভর করে যাঁরা লেখেন তাঁদের প্লট বা স্টোরির দরকার হয় না, বা ও সব থাকলেও তাদের স্থান গৌণ।

"He may have only a mood, a thing of all most hard to describe or communicate other than through his actual writing. But if it has excited him, if he himself is deeply moved by it, then that will be apparent. He has in many way the most difficult of all tasks, because the field is almost too clear for him. Working within limits is an easier thing than working with none.

[ক্রমশঃ]

কিস্তিবন্দী হিসাবে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৩০ টাকা কিস্তি হিসাবে অভঙ্গুর, প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার ক্রয় করুন। মূল্য ৩২০ টাকা।

আবেদন করুন :

Jagsons Agencies (WBC—88)
P.B. 1212, Delhi-6.

রঙ্গজগৎ

দুর্গত মানুষ ও শিল্পিসমাজ

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা' রীতিমত উদ্বেগজনক। কোন কোন পক্ষ থেকে অবস্থাকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সেরূপ ভয়াবহ অবস্থা কি না আমরা জানি না, তবে অত্যধিক খরার জন্য মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মত মজুতদার চোরাকারবারীরা মানুষের অন্ন নিয়ে মুনাফা লুটছে। তিনটি অঞ্চলে খরা হলেও আশেপাশের জেলার যে সহায়তা পাওয়া উচিত ছিল মজুতদার মুনাফাখোররা সে সহায়তালাভ থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করছে। এই মজুতদার চোরাকারবারীদের একদিকে যেমন অতি মুনাফার লোভ আছে আর একদিকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অপদস্থ করবার ইচ্ছাও আছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী এই সব অঞ্চলের জন্য ত্রাণ তহবিল খুলেছেন এবং কিছু রিলিফ পাঠিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রের সাহায্য না পাওয়ায় মন্ত্রিসভা বিপদে পড়েছেন।

দেশের এই দুর্দিনে শিল্পিসমাজের কিছু করণীয় আছে। শিল্পিসমাজ জনগণের বিপদের মুহূর্তে কখনো নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কলকাতার শিল্পীরা সহস্র সহস্র টাকা সংগ্রহ করে দুর্গতদের রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কয়েক বছর আগে বন্যায় দুর্গতদের বাঁচাবার জন্য শিল্পীরা কলকাতার পথে পথে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। নিজেরাও দান করেছিলেন, শিল্পীদের প্রতিনিধিরা গ্রামে গিয়ে দুর্গতদের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দেশে যখনই কোন বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে, তখনই শিল্পিসমাজ জনগণের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। বর্তমানে তিনটি জেলায় যখন খরায় মানুষকে অনশনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তখন শিল্পিসমাজ নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না।

গত ২৬শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পিসমাজ সমবেত হয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাবার জন্য। শিল্পীদের সমর্থিত মন্ত্রিসভা আজ সমস্যার সম্মুখীন। আর এই সমস্যার সুযোগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থ, প্রতিক্রিয়াশীল আর মজুতদারের দল চক্রান্ত করছে। এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য শিল্পিসমাজকে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

পুরনো ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রত্যেক শিল্পীর আজ খরাত্রাণের জন্য যথাসাধ্য কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করা উচিত। নিজেদের যথাসাধ্য দান ছাড়াও কলকাতার মানুষকে সাহায্যদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিল্পিসমাজকে আবার পথে নামতে হবে সাহায্য সংগ্রহের পাত্র নিয়ে। বিভিন্ন স্থানে, পার্কে ও প্রেক্ষাগৃহে শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। বর্তমানে মধ্য ও উত্তর কলকাতায় দুটি সাংস্কৃতিক মেলা চলছে। এই মেলা দুটি সম্ভবত প্রমোদকরমুক্ত এবং সহস্র সহস্র দর্শক চাঁদার নামে দর্শনী দিয়ে মেলায় উপস্থিত থাকছেন। সুতরাং মেলা দুটির আয় বড় কম হবার কথা নয়। এই আয়ের টাকা কোথায় যায়, বা কিভাবে ব্যয় হয় আমরা জানি না। তবে এ বছর এই আয়ের টাকাটা যদি মুখ্যমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলে দান করা হয় তবে মেলার উদ্যোক্তারা যথার্থ শিল্পীর মত কাজ করবেন। তিনটি জেলায় মানুষ অন্নাভাবে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধুঁকছে, আর কলকাতায় উজ্জ্বল আলোর নিচে বসে মানুষ আনন্দ উপভোগ করছে, এবং নিরুদ্বেগচিত্তে মেলার উদ্যোক্তারা আনন্দ পরিবেশন করে উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব করছেন, এই দৃশ্য চিন্তা করতেও কষ্ট হয়। দুটি মেলাতেই

অরবিন্দ মুখার্জী পরিচালিত 'জীবনসঙ্গীত' ছবিতে রীণা ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহৃত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদে আজকের শিল্পিসমাজ উদ্বুদ্ধ। আশা করা যায় মেলা দু'টির উদ্যোক্তারা মানবতাবোধের পরিচয় দিয়ে অন্যদের পথ দেখাবেন।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

এরাবেসকিউ

আমেরিকার চলচ্চিত্র বক্তব্য ও কাহিনীর দিক থেকে বিশেষ একটা ভূমিকা গ্রহণ করছে। ক্রমশ সুসাহিত্য ও মহৎ কাহিনীর ভিত্তি থেকে সরে এসে মার্কিন ছবি বিশ্বব্যাপী প্রচার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক সময় ভালোয়-মন্দয় হলিউড ছবির একটা চলচ্চিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে ছবিগুলি এদেশে মুক্তিলাভ করছে তার অধিকাংশ একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। কখনো বিশেষ কোন দেশ বা মতবাদসম্পন্ন লোকদের বিরুদ্ধে প্রচার, কখনো কোন জাতিকে হেয় করার চেষ্টা, কখনো আমেরিকানদের সুপিরিয়রিটি বা তারা যে অন্য দেশের মানুষ অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান ও চতুর সেকথা বোঝাবার চেষ্টা এবং কখনো খোলাখুলি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-ই'র প্রচার। সম্প্রতি গোয়েন্দা সিরিজের যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলিতে উগ্র যৌনতা আর মার্কিন গোয়েন্দাবৃত্তির চাতুর্য দেখান হয়ে থাকে। যৌনতার আকর্ষণে এই ছবিগুলিতে একটা প্রচার থাকে। 'এরাবেসকিউ' এ ধরণের একটি ছবি সম্প্রতি মেট্রো সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবির নায়ক একজন আমেরিকান অধ্যাপক। এই অধ্যাপক নিজে গোয়েন্দা না হয়েও কিভাবে আরবের এক প্রধানমন্ত্রীর জীবন বাঁচালেন তারই বৈচিত্র্যময় কাহিনীচিত্র। অর্থাৎ মার্কিন দেশে দেশে বৈধ সরকারগুলিকে রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে। সমগ্র বিশ্বের শান্তিরক্ষা করছে আমেরিকানরা ইত্যাদি। সংলাপে গোয়েন্দাসংস্থা সি-আই-ই'র কথা এসেছে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সি-আই-ই'র প্রচার সংযোজিত হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশে যখন আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। যখন সকলে মনে করছে মার্কিনরা বিভিন্ন দেশে নিজেদের পুতুল সরকার গঠন করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ করছে, তখন এ-ধরণের ছবি দেখিয়ে হয়ত তারা নিজেদের পক্ষে একটা ধারণা সৃষ্টি করাতে চায়। ছবির নায়িকা বিখ্যাত সোফিয়া লোরেন হয়েছেন আরবদের গোয়েন্দা। শেষ পর্যন্ত এই স্পাই আমেরিকান অধ্যাপকের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করল এবং তারই সহযোগে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করল। ছবিকে আকর্ষণীয় করবার জন্য সোফিয়া লোরেনের মত বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রীকে প্রায় বিবস্ত্রা করে দেখান হয়েছে। স্নানের দৃশ্য এবং নানা রকমভাবে উপস্থিত করে যৌন আবেদনের চেষ্টা হয়েছে। এই গোয়েন্দা চিত্রগুলির ধরণ এ-রকমই।

এই ধরণের ছবি সেন্সর বোর্ড মঞ্জুর করে কেন এ নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। আমরাও বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছি। সম্ভবত আমেরিকানদের ছবি বলে সেন্সর বোর্ডের সাহসে কুলাচ্ছে না।

মেট্রোয় 'এরাবেসকিউ' ছবিতে গ্রেগরি পেক ও সোফিয়া লোরেন

স্টুডিও খবর

"নয়ে রাস্তে"

বি, পি, প্রোডাক্‌সন্‌সের প্রথম নিবেদন "নয়ে রাস্তে" কলকাতার স্টুডিয়োতে নির্মীয়মাণ একটি হিন্দী ছবি।

"নয়ে রাস্তে"র চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন—নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সুর সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত—সহকারী নিখিল চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে সুনীতি মিত্র ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর গুহের ওপর।

সংগীতে নেপথ্য কণ্ঠ বিস্তার করেছেন হেমেন ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকালিপি সমৃদ্ধ হয়েছে—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দীতে এই প্রথম), সর্বেন্দর, বিদ্যারাও, বাণী হাজরা, সীতা মুখার্জী, অজিত চ্যাটার্জী মাঃ কেশব ও নবাগতা রীতা।

প্রায় সবটাই আউট-ডোরে গৃহীত এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাটি সমাপ্ত প্রায়।

নাটকের কথা

'আমরা বাঁচতে চাই'

বিহারের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যসংস্থা বিহার আর্ট থিয়েটার গত ১৪ই মে সন্ধ্যায় স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে তাঁদের এ-বছরের নতুন নাটক 'আমরা বাঁচতে চাই' পাটনার বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের সামনে মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানটিতে পৌরোহিত্য করেন পাটনার বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক সার্চলাইট পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার।

বিহার আর্ট থিয়েটারের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবারের নাটকটিও নাট্যরচনা থেকে প্রয়োগকৌশল সবই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক তাই বৈচিত্র্যময়। কাহিনীটি অনাড়ম্বর তাই সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রযোজনা যেন স্বাভাবিক ও সহজ।

অভিনয়ের দিক দিয়ে পর্বতের ভূমিকায় অজিত গাঙ্গুলী ও সারার ভূমিকায় সুষমা

'ধীরে বহে ডন'—সোভিয়েত ছবির একটি দৃশ্য

সান্যাল অপূর্ব। মংপুর ভূমিকায় ব্রজগোপাল সান্যাল ও ছেনাফেলার ভূমিকায় সুশীল চক্রবর্তী দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। সমস্ত পরিবেশটি তৈরি করতে আলোর মায়া সৃষ্টি করেছিলেন মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য। নাটকটির সুষ্ঠু পরিচালনা করেছিলেন সুশীল চক্রবর্তী। প্রযোজনা করেছিলেন শ্রীমতী পুষ্প মুখোপাধ্যায় ও নাটকটি রচনা করেছেন অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিহার আর্ট থিয়েটারের দ্বিতীয় নাটক 'বিয়ে মাইনাস বৌ' সমীর সেনগুপ্তের পরিচালনায় ঐদিন মঞ্চস্থ হয়। নাটকটিতে অভিনয় করেন প্রলয়ঙ্কর—নেপাল ভট্টাচার্য, প্রফেসর পাঁচ—ব্রজগোপাল সান্যাল, ম্যানেজার—সুশীল চক্রবর্তী, প্রাঞ্জল—সমীর সেনগুপ্ত, ঝঙ্কার—আশীষ ঘোষাল ও মাণিক—নারাণ মজুমদার। সকলেরই অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়। বিশেষ করে সমস্যা-তথা-ক্রাইম সাসপেন্স নাটক 'আমরা বাঁচতে চাই' দেখার পর দর্শকরা মন হাল্কা করে প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে যান। সার্থক নাট্য-প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘায়ু কামনা করতে করতে।

সংবাদকণা

কানস্ চলচ্চিত্র উৎসব

কানস্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মাইকেলাঞ্জেলো আন্তনিওনি নির্মিত 'ব্লো আপ' সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জন করেছে। ছবিটি বৃটেনে নির্মিত এবং বৃটেন থেকে উৎসবে প্রেরিত হয়েছিল। কার্লো পন্টি ছবিটির প্রযোজক।

মৌলিক গুণের জন্য জুরীর বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে বৃটেনের 'অ্যাক্সিডেণ্ট' এবং যুগোশ্লাভাকিয়ার 'আই মেট সাম জিপসীজ'। এই বিশেষ পুরস্কার উৎসবের দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে ধরা হয়।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন সুইডেনের মিস পিয়া ডেজেরমার্ক 'এলভিরা ম্যাডিক্যান' ছবিতে অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন ইস্রায়েলের মিঃ কোটলার, 'থ্রি ডেজ অ্যাণ্ড এ চাইল্ড' ছবিতে অভিনয়ের জন্য। এ ছাড়া শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন হাঙ্গেরীর 'টেন থাউজ্যাণ্ড সামস্' ছবির পরিচালক মিঃ কোসা। চিত্রনাট্য রচনার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন ইতালীয় মিঃ এলিওপেত্রী ও ফ্রান্সের মিঃ অ্যালা জেসুয়া।

মুক্তি প্রতীক্ষায় 'ধীরে বহে ডন

মিখেইল সোলোকভ রচিত নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত 'ধীরে বহে ডন' সাহিত্য-জগতে এক আলোড়নকারী সৃষ্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে নভেম্বর বিপ্লব রাশিয়ার সমাজে এবং বিশ্বের মানবজীবনে আমূল

পরিবর্তন এনেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় ডন নদীর তীরবর্তী কসাকদের জীবন আলোড়িত করে তুলেছিল। ডন নদীর তীরভূমির মানুষদের নিয়ে এমন প্রামাণ্য ও প্রাণময় রচনা বিশ্বসাহিত্যের এক সম্পদ। বিপ্লবের ইতিহাসাভিত্তিক কাহিনী লিখতে গিয়ে সোলোকভ বিপ্লবোত্তরকালের মানুষের কাহিনী লিখেছেন।

এই বিশ্ববিশ্রুত কাহিনীর চিত্ররূপ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এতবড় কাহিনীকে বিখ্যাত পরিচালক সের্গেই গেরাসিমভ এমন নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন যা থেকে পূর্ণ কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিটি দেখবার মত। আমাদের দেশের দর্শকরা বহুদিন থেকে এই ছবিটি দেখবার জন্য আগ্রহ নিয়ে আছেন। 'ধীরে বহে ডন'-এর সংগে এদের বহু পাঠক পরিচিত। ছবিতে গ্রিগরি, আকসিনিয়া, নাটালিয়া এই তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে পিওতর গ্লেবভ, ইলিনা বাইস্ট্রিট-স্কায়া, জিনাইদা কিরিয়েনকো।

অ্যাডেপ্ট এডভারটাইজিং-এর পরিপরিবেশনায় গীতা পিকচার্সের উদ্যোগে এই ছবি শীঘ্র কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে।

বান্ধব সমিতির সম্মেলন

গত ১৪ই ও ১৫ই মে অশোকনগর বান্ধব সমিতির পরিচালনায় সংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দিন বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান সহ সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

দ্বিতীয় দিন ১৫ই মে সোমবার স্থানীয় শিক্ষায়তন 'পুবালী' কর্তৃক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বিবর্ণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকটি অভূতপূর্বভাবে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে।

অভিনয় করেছেন,—সর্বশ্রী অমূল্য দাস, রঞ্জন গুপ্ত, অশোকতরু ব্যানার্জী, প্রবীর ভট্টাচার্য, গোপাল বক্সী, তপন মুখার্জী, শৈবাল সরকার, বাদল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমোদ ইজারদার ও অমল বোস এবং শ্রীগায়ত্রী বোস।

'সংস্কৃতি'র 'উত্তাল তরঙ্গ'

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' তাদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই মে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'উত্তাল তরঙ্গ' নাটকটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে পাগলাবাবা, দিলীপ, পল্টু, দুলাল, মিনু, ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় যথাক্রমে নবীন মান্না, সুকুমার পাত্র, দিলীপ মান্না, কৃষ্ণ পাত্র, অনিতা পাত্র ও ফেলু দোয়াজী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই ধরণের প্রয়োগগত সমস্যাপূর্ণ ও দুঃসাহসিক মঞ্চ-প্রযোজনার জন্য নাট্যকার শৈলেশ গুহনিয়োগী 'সংস্কৃতি' কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। নাটকটির প্রয়োগ ও নির্দেশনায় ছিলেন নির্মল পাত্র ও নিমাই মান্না।

'দাবী' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব

আগামী ৩রা জুন, শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷ টায় স্টার থিয়েটারের দাবী নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতি—কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় শিল্পী ও থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মিগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।

চতুরঙ্গের নতুন নাটক

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে সতীনাথ ভাদুড়ী একটি বিশেষ নাম। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবেই এনেছিলেন চমক, চলে যাবার সময়ও যার রেশ মিলিয়ে যায় নি।

প্রধানত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ীর সংগেই পাঠকের পরিচয়, কিন্তু তিনি যে একখানি ছোট নাটকও লিখেছিলেন তা' অনেকেরই অজানা। এটি একটি ব্যংগ নাট্য, নাম-"পারবে না এদের সংগে"।

চতুরঙ্গ নাট্যগোষ্ঠী এই নাটকটি

মহেশ কাউল পরিচালিত 'পালকী'-তে রাজেন্দ্রকুমার ও ওয়াহিদা রহমান

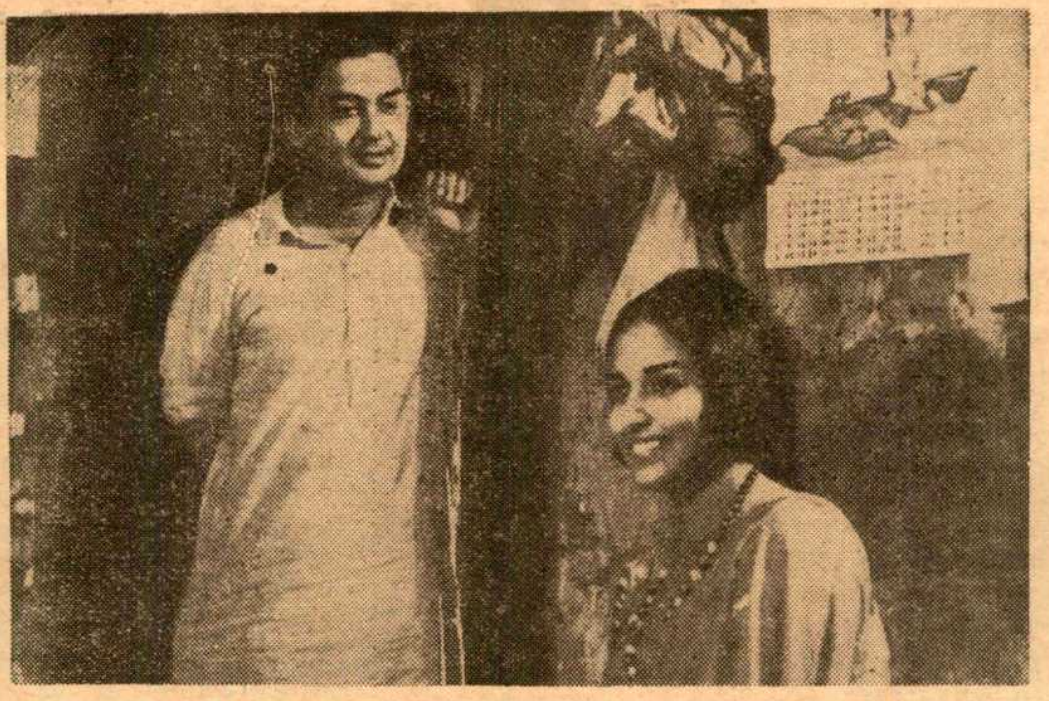

বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত 'উসকী কাহানী'-র একটি দৃশ্যে তরুণ ও অঞ্জু মহেন্দ্র

সংবর্ধিতরূপে প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। এটি চতুরঙ্গের আগামী নাট্যপ্রয়াস। খুব শীঘ্রই এটি মুক্ত অঙ্গনে বরুণ দাশগুপ্তের পরিচালনায় নিয়মিত অভিনীত হবে।

রবীন্দ্র উৎসব

শ্রীযুক্তা বিভা মুখার্জীর প্রযোজনায় ব্যারাকপুর লাটবাগান মহিলা সমিতি বিগত ১৪ই ও ১৫ই মে স্থানীয় ওডিয়ন হল ও এস, এ, সি, প্যারেড গ্রাউণ্ডে মুক্ত অঙ্গনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্ম উৎসব সাড়ম্বরে পালন করেছে। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকার অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল মিত্রের পরিচালনায় পঞ্চাশাধিক ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-বৃন্দ বৈতালিক, কবিপ্রণাম, বৈশাখী উৎসব, বুদ্ধপ্রণাম ও কবিপ্রশস্তি এই পাঁচটি পর্যায়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত পরিচালনার কৃতিত্ব শিক্ষায়তনের অধ্যাপক মনোজ সেনগুপ্তের একক সঙ্গীতে —শ্রীসেনগুপ্ত, চন্দনা গুহরায়, শান্তিকায়া নন্দন, গীতশ্রী সেন এবং নৃত্যে "শ্রীমতীর বুদ্ধপ্রণাম" ও চণ্ডালিকার "প্রকৃতির" ভূমিকায় ডলি মণ্ডল এবং দইওয়ালার ভূমিকায় ছন্দা ভট্টাচার্যের সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর নৃত্য সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। ডলি মন্ডলের "বুদ্ধপ্রণাম" অপূর্ব। অন্যান্য সঙ্গীতে শ্যামলী চক্রবর্তী, শিপ্রা বিশ্বাস, ঊর্মি মুখার্জী, গীতা সেনগুপ্ত এবং নৃত্যাংশে মীরা সেনগুপ্ত, নন্দা ভট্টাচার্য, সীমা চৌধুরী, সন্ধ্যা মুখার্জী প্রশংসনীয়। সুজিত বসুর পরিচালনায় ছাত্রীবৃন্দ গীটারে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

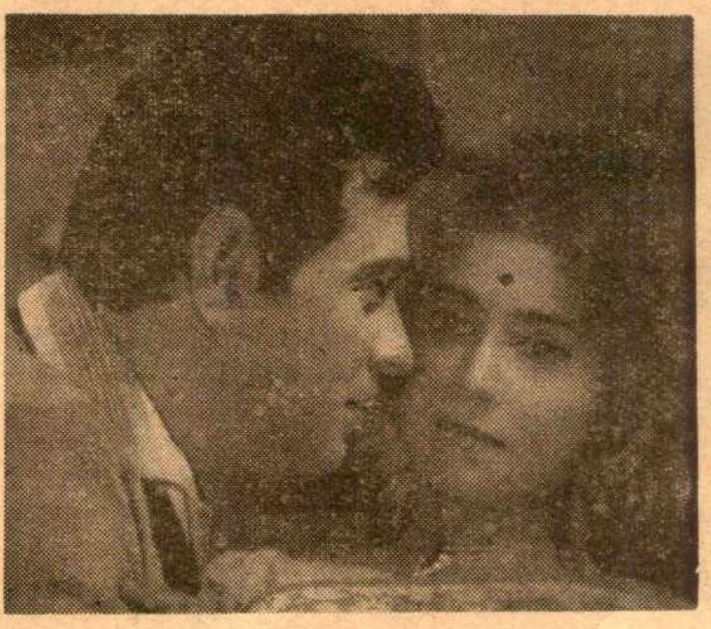

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'প্রতিদান' ছবিতে অনিল চ্যাটার্জী ও কাজল গুপ্ত

আপনার পত্রিকায় বঙ্গদর্শনে মাধ্যমিক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিগুলির পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমি বিগত একাদশ বৎসর ধরিয়া মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক। আমার অভিজ্ঞতায় (১) মাধ্যমিক স্কুলগুলির কমিটির অধিকাংশ সভ্যবৃন্দ শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন। (২) বিদ্যালয়ের নানা সমস্যার সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা ও উপলব্ধি ইহাদের নাই। (৩) ইহারা শিক্ষক মহাশয়দের সমালোচনায় অতি মুখর, কিন্তু মাসের পর মাস বেতন না পাইয়াও শিক্ষা-ব্যবস্থা যাঁহারা চালু রাখিয়াছেন তাঁহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করিবার ক্ষেত্রে—মূক। (৪) কংগ্রেসী সরকার ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে আন্দোলনের সময় হাতিয়ার স্বরূপ শিক্ষক বিরোধী অভিযানে নিয়োগ করিয়াছেন। (৫) দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক যেহেতু তাঁহারা প্রধান শিক্ষক, কমিটির প্রিয়পাত্র হইতে জান-মান কবুল করিয়া থাকেন। (৬) অধিকাংশ কমিটির কর্তা-ব্যক্তিদের সম্পর্কে জনগণের সন্দেহের কারণ ঘটিতেছে, তাহা বর্তমান সরকার একটু তলাইয়া হিসাবপত্র দেখিলে হয়ত উপলব্ধি করিবেন। বৎসরান্তে যে 'অডিট' হয় তাহা 'ভাউচার' সর্বস্বই। আসলে, এই কমিটিগুলির মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সামগ্রিকভাবে কোন ভূমিকা নাই। ব্যক্তিগতভাবে সামান্য কয়েকজন প্রগতিশীল ব্যক্তি কমিটিতে আছেন মাত্র।

আমি পশ্চিমবঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যসংখ্যা হ্রাস করার পক্ষপাতী। যেমন অভিভাবক হইতে ১ জন, প্রধান শিক্ষক ও সরকারী মনোনীত সদস্য ১ জন করিয়া ও শিক্ষক প্রতিনিধি ৩ জন—মোট ৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত হউক।

শ্যামলী সেনশর্মা
বহরমপুর

* * *

কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'শিক্ষামন্ত্রীর নিকট নিবেদন' এই শিরোনামায় ম্যানেজিং কমিটির প্রসঙ্গ আলোচনায় আপনি চন্দননগরের যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই বিদ্যালয়টি আজ নানান দুর্নীতি ও অনাচারের পীঠস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পরিচালক সমিতিতে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন স্থায়ী সদস্য আছেন, যাঁহাদের না কি কোন আইনের দ্বারাই সরান যায় না। বাকি যাঁহারা অভিভাবকদের তরফ হইতে নির্বাচিত হইয়া আসেন তাঁহারা একটি সংখ্যালঘু শ্রেণী হওয়ার দরুণ কিছুই করিতে পারেন না। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক একান্তই অযোগ্য। যে কয়জন উপযুক্ত শিক্ষক আছেন তাঁহাদের বরাবরই কোণঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে। এই দুই মহাত্মা কয়েকজন সুবিধাবাদী ফাঁকিবাজ শিক্ষক সহযোগে পবিত্র বিদ্যাঙ্গনে একটি কায়েমী স্বার্থের চক্র সৃষ্টি করিয়াছেন, ফলে সৎ শিক্ষকেরা ক্রমশ হতাশ হইয়া পড়িতেছেন।

এই বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও জনসাধারণের অনেক অভিযোগ আছে। বিদ্যালয়গৃহ, লাইব্রেরী, আসবাবপত্র ইত্যাদি বাবদ এই বিদ্যালয় সরকারের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ পাইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা যে উহার অধিকাংশই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করিয়াছে। এ বিষয়ে একটি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

নিছক ভদ্রতার খাতিরে বিদ্যালয়টির নাম উল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম। যদি প্রয়োজন হয় তাহা করিতে আমার আপত্তি নাই। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের বহু বিদ্যালয়েরই আজ এই অবস্থা তবে এই বিদ্যালয়টি শিক্ষায়তনের চরম ব্যাধিগ্রস্ততার একটি নগ্ন উদাহরণ।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দে
চন্দননগর, হুগলী

* * *

গত ১১-৫-৬৭ তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিশু মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের কথা' প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে চাই। উল্লিখিত প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হয়েছে—'কিন্তু সত্যকারের রবীন্দ্রবিদ্বেষী ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ রায়'। বিশুবাবুর এই মন্তব্য কিন্তু একেবারেই অযথার্থ। যদিও একথা স্বীকার্য, অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রবিয়ানা'-গ্রন্থে কবির বিরুদ্ধে স্থলে স্থলে অসংযত কটূক্তি বর্ষিত হয়েছিল এবং যে কারণে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত পত্রে অমরেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায়ই সঙ্গত, তবে তাহার ভাষা আর একটু সংযত হইলেই ভাল হইত।'—তবুও অমরেন্দ্রনাথ রায়ের রবীন্দ্র-গুণগ্রাহিতার পরিচয় অন্যত্র অনুসন্ধানে অ-প্রাপ্তব্য নয়।

'অর্চনা' (পৌষ, ১৩১৬) পত্রিকায় 'চিত্রাঙ্গদা' নামক এক প্রবন্ধে অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '.....মানবহৃদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। মানবচিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা দর্শকের অঙ্গ বটে, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সেই বিশ্লেষণশক্তি বঙ্গসাহিত্যে আর কাহারো নাই। এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় চিত্রাঙ্গদা কাব্যের স্থানে স্থানে আছে।'

এই প্রবন্ধটি ছাড়া 'অর্চনা'য় অন্য এক সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দ বিদায়' প্রহসনটির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ সমালোচনায়, 'ছোট গল্প' নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের উপমা' ও 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা' শীর্ষক দুটি আলোচনায় এবং 'বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষা-নীতি' নামক গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথ কবিগুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ হৃদয়ের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

পরিশেষে বক্তব্য, যে কোন প্রবল বিপ্লবীশক্তির আত্মপ্রকাশের কালে প্রতিক্রিয়া তো উত্থিত হবেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মত একজন অতিপ্রাকৃত প্রতিভার আবির্ভাবের ঘটনায় তার ব্যত্যয় ঘটবে কেন?

সুতরাং 'রবীন্দ্রবিরোধী' সমালোচকগণকে 'বিদ্বেষী' বা 'অসূয়া প্রবণ' ইত্যাদি বিশেষণে চিহ্নিত করলে তরল রবন্দ্রভক্তিই প্রদর্শিত হয় এবং তা ইতিহাস-চেতনার অভাব বহন করে।

কোন আধুনিক লেখকের লেখায় সেটা কাম্য নয়। নমস্কারান্তে—ইতি।

ভানু মজুমদার
রিজিওন্যাল কোল সারভে স্টেশন
বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ

* * *

৪।৩।৬৭ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত রচনা গ্রামবাংলার কথায় হুগলী জেলার ইটাচুনা গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্য লিখেছেন ইটাচুনার বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে শুধু ইংরাজীতে অনার্স আছে। মনে হয় তিনি ভুল খবর জেনেছেন অথবা ভুল লিখেছেন। আমি নিশ্চিত জানি ঐ কলেজে আরও অনেক বিষয়ে অনার্স আছে যথা—ইংরাজী, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিত।

—**জীবনমোহন কোঙার**

ইস্টবেঙ্গল ও কালীঘাট দলের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলার দৃশ্য

ময়দানে মোহনবাগান

নতুন আশা নিয়ে মোহনবাগান ক্লাব এই মরশুমের ফুটবল লীগের খেলা সুরু করেছে। গত মরশুমে লীগ এবং শীল্ডের সম্মান হাতছাড়া হবার ফলে এ বছর মোহনবাগান ক্লাব যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। দলীয় শক্তি-বৃদ্ধির জন্য মোহনবাগান ক্লাব এ বছর এত বেশি খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছে, যাতে দুটি দল গঠন করা সম্ভব হয়। মোহন-বাগান ক্লাবের এ বছরের সংগ্রহে কয়েকজন উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়ও আছেন যাঁদের বর্তমানে নিয়মিত খেলার প্রয়োজন। কিন্তু একরাশ খেলোয়াড় নেবার ফলে ক'জন যে ক'টা খেলায় নামতে পারবেন তা জানি না। জার্সি গায়ে সাইড লাইনের ধারে বসে থেকে অনেক উদীয়মানের খেলার মানে মরচে ধরে যাবে। হায় রে ট্রফির মোহ! অবশ্য এই খেলোয়াড় সংগ্রহ আর ট্রফির মোহ কলকাতার আরও দু-একটি নামজাদা ক্লাবেরও আছে।

কলকাতা প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের চলতি মরশুমের প্রথম আবি-র্ভাবে মোহনবাগান হাওড়া ইউনিয়ন দলকে মাত্র ১—০ গোলে পরাজিত করে জয়যাত্রা সুরু করেছে। সত্তর মিনিট অজস্র সহজ সুযোগ অপচয়ের কাহিনী অবশ্য এই জয়যাত্রাকে কতটা কলুষিত করেছে জানি না। ভারতীয় ফুটবলের তথাকথিত ফুটবল তারকাদের গোলের সম্মুখে দিশে-হারা ভাব আর অজস্র সুযোগ অপচয়ের ধারা দেখে সত্যিই মায়া হয়। গোলের সম্মুখে আমাদের দেশের ফরোয়ার্ডদের এই স্নায়ুদুর্বলতা অজানা নয় কারুরই।

মোহনবাগান আর হাওড়া ইউনিয়নের খেলায় মোহনবাগানের একমাত্র বিজয়-সূচক গোলটি করেন অশোক চ্যাটার্জী। দ্বিতীয়ার্ধের নয় মিনিট সময় কাননের পাশ থেকে হেড করে অশোক গোলটি করেন। অশোক চ্যাটার্জী বিজয়সূচক গোলটি দিলেও কমপক্ষে তিনি তিনটি অবধারিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন, সুকুমার সমাজপতিও এই এক দোষে দোষী। হাওড়া ইউনিয়ন থেকে নবাগত পি গাঙ্গুলীর খেলা বেশ ভাল হয়, লতিফ

শ্রীঅমিতাভ

এবং ভবানী রায় দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষণ-ভাগের দায়িত্ব পালনের ভার ও অক্লান্ত-ভাবে বল জুগিয়েছেন পুরোভাগের সতীর্থ খেলোয়াড়দের। মরশুমের প্রথম খেলা তাই আশা করা হচ্ছে যে মোহন-বাগানের পুরোভাগ সত্বর নষ্টদোষ কাটিয়ে উঠতে পারবে।

মরশুমের সুরুতে জায়ান্ট কীলার ইস্টার্ন রেল দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে উয়াড়ী ক্লাব মৃদু বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। প্রথম গোল করে অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্যন্ত রেল দল পরাজিত হয়। এবার দল বদলের ফলে ইস্টার্ন রেল দল বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এই ভাঙা টিম উয়াড়ীর বিপক্ষে সামগ্রিক প্রাধান্য বিস্তার করলেও শুধুমাত্র গোলের সম্মুখে চরম ব্যর্থতা প্রদর্শনের জন্য পরাজিত হয়।

কলকাতা ময়দানের ত্রিশক্তির অন্য দুটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এখনও অবতীর্ণ হয় নি আর বি এন রেল দল জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বালী প্রতিভাকে ২—১ গোলে পরাজিত করার পর বি এন রেল দল খিদিরপুরকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। বি এন রেলের বিপক্ষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজয় স্বীকার করে বালী প্রতিভা দল। রেল দলের পক্ষে গোল দুটি করেন সুনীল দাশ, বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি সত্যিই দর্শনীয় ছিল।

লীগ খেলার ফলাফল ঃ—

বি এন আর	(২)	বালী প্রতিভ	(১)
রাজস্থান	(১)	বাটা	(০)
ইস্টার্ন রেল	(২)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন	(০)
বি এন আর	(৩)	খিদিরপুর	(১)
এরিয়ান্স	(০)	বালী প্রতিভা	(০)
মোহনবাগান	(১)	হাওড়া ইউনিয়ন	(০)
উয়াড়ী	(২)	ইস্টার্ন রেল	(১)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	(১)	বাটা	(০)
রাজস্থান	(১)	কালীঘাট	(০)
জর্জ টেলিগ্রাফ	(১)	খিদিরপুর	(১)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন সকল অনুমোদিত ফুটবল প্রতিযোগিতা-গুলিতে নব্বুই মিনিট খেলা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস নব্বুই মিনিট ফুটবল খেলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কাছে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। নৈনিতালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নব্বুই মিনিট খেলার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

খুবই আনন্দের কথা যে অন্তত এতদিন পর আমাদের সর্বভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা খেলার সময় বৃদ্ধির এই বহু পুরাতন আবেদনটি রক্ষা করলেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক মানের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই সময় সমস্যা। কারণ পূর্বে আমাদের দেশের ফুটবল খেলার সময় ছিল পঞ্চাশ মিনিট, কয়েক বছর হল সময় হয়েছে সত্তর মিনিট, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ফুটবল খেলা হয় নব্বুই মিনিট। ভাল খেলে অগ্রগামী থেকেও শেষে দম ফুরিয়ে হেরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত ভারতীয় ফুটবল দলের অনেক আছে।

স্বর্গত স্মরণীয় ফুটবল কোচ রহিম সাহেব ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের এই দমের ঘাটতির কথা খুব ভালভাবে বুঝতেন বলেই, ট্রেনিং ক্যাম্পে খেলোয়াড়দের গড়ে পিঠে তৈরি করে নিতেন। রহিম সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি ভারতীয় ফুটবল দল রোম অলিম্পিকে যে অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল তা' সত্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রহিম সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর অভাব পূরণ করার মত ফুটবল কোচ ভারতীয় ফুটবল পায় নি, আর স্বল্পকালীন ট্রেনিং ক্যাম্পে দমের ঘাটতি পূরণ করিয়ে খেলোয়াড় গড়ে-পিঠে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

গত বছর কলকাতা ময়দানে লীগের খেলায় সত্তর মিনিট খেলা চালু হবার ফলে লীগে ওঠা-নামা বন্ধ হয়েছে তিন বছরের জন্য, ভয় হয় নব্বুই মিনিট খেলা চালু করে আবার আই, এফ, এ আরও তিন বছরের জন্য ওঠা-নামা বন্ধ না করে দেন।

এ বছরের নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র বিষয়ে আলোচনার সময় তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। ছাড়পত্রের অনুমোদন দেবার ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ করে মহীশূর রাজ্য দলের প্রতিনিধি। আন্তঃরাজ্য দল পরিবর্তন করতে পারবেন একজন খেলোয়াড় যখন তিনি কমপক্ষে ছয় মাস সেই রাজ্যে বসবাস করবেন অথবা যদি তিনি সেই রাজ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। মহীশূর রাজ্য কর্তৃক উত্থাপিত এই দুটি প্রস্তাব এ, আই, এফ, এফ গ্রহণ করলেও, এ বছরের খেলোয়াড়দের রাজ্য বদলের অনুমতি দেন।

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন কয়েকটি বিদেশী ফুটবল দলকে ভারত সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, উত্তর কোরিয়া, জাপান, রুমানিয়া, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং আরও কয়েকটি দেশকে আমন্ত্রণ জানান হবে।

মেহতা রিপোর্ট

বেশ কিছুদিন পূর্বের কথা; অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সভাপতির পদে সদ্য আসীন হয়েছেন জেনারেল

পতৌদির নবাব

কারিয়াপ্পা। জামাইকার কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় দলের হতাশাব্যঞ্জক এবং অত্যন্ত নিম্নস্তরের ক্রীড়ামান দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় দলের বেশ কিছুদিন বিদেশ সফর বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

কমনওয়েলথ গেমসের পর ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল প্রেরণের পূর্বে খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু কড়াকড়িই করা হয়। ব্যাঙ্ককে ভারতীয় দলের সঙ্গে শ্যেফ দ্য মিশন হিসাবে প্রেরণ করা হয় কমোডর সি এল মেহতাকে।

ব্যাঙ্কক থেকে ফেরার পর এয়ার কমোডর মেহতা একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের কাছে। কয়েকটি কারণে এই রিপোর্টটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আরও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি দলের সঙ্গে একজন কোচ নিশ্চয় প্রেরণ করা উচিত বলে মতামত প্রকাশ করেছেন শ্যেফ দ্য মিশন। যদি ম্যানেজার অথবা কোচ প্রেরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয় তবে প্রথম সুযোগ দিতে হবে কোচকে। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যদি দল প্রেরণ করতে হয় তবে অন্তত দশ দিন পূর্বে দল প্রেরণ করা উচিত, কারণ খেলোয়াড়দের বিদেশের আবহাওয়া এবং পরিবেশের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এবার ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসে একেবারে অন্তিম সময়ে দল প্রেরিত হয়েছে, এবং নানান অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয় খেলোয়াড়েরা প্রশংসনীয় ফলাফল প্রদর্শন করতে পেরেছেন বলে শ্রী মেহতা উল্লেখ করেছেন।

সেন তদন্ত কমিশন

সি, এ, বি-র সম্পাদক শ্রী এন, সি কোলের দীর্ঘ সাক্ষ্যদানের অসমাপ্ত অংশ উপস্থিত করছি এবার। সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সাক্ষ্য দিলেন তিনি এখন পর্যন্ত।

সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে শ্রী কোলে বলেন যে, টেস্ট ম্যাচের টিকিট নিয়ে যে চোরা কারবার হয়েছে, তার জন্য দায়ী বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ক্লাব সি, এ, বি-র থেকে পাওয়া ভাগের টিকিট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেছে।

কমিশনার কৌঁসুলী শ্রীবিরেশ্বর ভট্টাচার্যের জেরার উত্তরে শ্রী কোলে বলেন যে, ১৯৬৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তাঁর বেলেঘাটাস্থ বাসভবনে বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টেস্ট ম্যাচের টিকিট কালেক্টরের কর্মচারীরা শীলমোহর লাগান। এই সময় সেখানে তিনি এবং সি, এ, বি-র কতিপয় বিশ্বস্ত কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি বাইরে যান। তিনি বলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঁচ থেকে দশ হাজার টিকিট সরিয়ে ফেলা অসম্ভব। তিনি জানান যে প্রেস থেকে টিকিট এনেছে তাঁর

পুরাতন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ড্রাইভার এবং তার টিকিট সরানোর কথা তিনি বিশ্বাস করেন না।

শ্রীকোলে বলেন যে, মাঠে পঁয়ষট্টি হাজারের বেশি দর্শক ছিল বলে তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে মোট টিকিটের চেয়ে আনুমানিক তিন হাজার বেশি দর্শক মাঠে অনুপ্রবেশ করেছিল। জেরার উত্তরে কংগ্রেস ভবন বা তৎকালীন মন্ত্রীদের টেস্ট ম্যাচের টিকিট দেওয়ার কথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন।

ভেণ্ডার ব্যাজ নিয়ে অনেক লোক মাঠে প্রবেশ করেছিলেন এবং কিছু গ্ল্যামার গার্ল ভেণ্ডার ব্যাজ নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেছিলেন একথা শ্রীকোলে স্বীকার করেন। পঁচিশ টাকার দর্শকদের জন্য কেন চোদ্দ ইঞ্চি স্থান বরাদ্দ করা হয়েছিল এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শ্রীকোলে কোন সদুত্তর দিতে অক্ষম হন।

জেরার উত্তরে সি, এ, বি সম্পাদক শ্রীকোলে জানান যে ১লা জানুয়ারী গণ্ডগোলের সময় তাঁর আত্মগোপন করার সংবাদ সত্য নয়, তিনি এবং সি, এ, বি-র সভাপতি শ্রীঅমর ঘোষ এই সময় সি, এ, বি-র অফিসে উপস্থিত ছিলেন। সি, এ, বি-র কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্য এবং কলকাতায় ভারতীয় টেস্ট দলের ম্যানেজার শ্রী এম দত্তরায় এই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। এই দিন চরম বিশৃঙ্খলার মুখে ভারতীয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েদের ফেলে রেখে সি, এ, বি-র কর্মকর্তারা গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে আগন্তুক দলের কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়কে সি, এ, বি-র কর্মচারীরা পৌঁছে দেন, ভীত সন্ত্রস্ত কিছু খেলোয়াড় নিজেরাই পালিয়ে যান।

শ্রীকোলে বলেন যে, পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের সংখ্যা ১৬০১৯; মোট ৪০৭০০ খানা টিকিট তাঁরা ছাপিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে মোট ১৪৩৬৪ খানা টিকিট বিক্রয় করেছেন, অবিক্রিত টিকিট ছিল মোট আঠারোশো। শ্রীকোলে এই অবিক্রিত আঠারোশো টিকিট কমিশনের সামনে জমা দেন এবং আরও কার্ড বা টিকিট খুঁজে পেলে সেগুলোও তিনি কমিশনের কাছে জমা দেবেন বলেন।

গত ১৭ই মে বুধবার কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে শ্রীকোলে অসুস্থ বোধ করায় আড়াই ঘন্টা সাক্ষ্যদানের পর চেয়ারম্যান তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণের নির্দেশ দেন। এই দিন সাক্ষ্যদানের সময় শ্রীকোলে বলেন যে, মোট ১৮০০ ভেণ্ডার ব্যাজ বিতরণ করা হয়েছিল এবং খেলার প্রথমদিন ছিল নয় রকমের ভেণ্ডারের ব্যাজ, অবশ্য পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই দিন কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ডাঃ এস কে চৌধুরী এবং লালবাজার সেণ্ট্রাল লক আপ ও ইনজুরি হাসপাতালের ডাঃ পি এল ঘোষের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। কমিশনের কৌঁসুলী শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্যের জেরার উত্তরে ডাঃ চৌধুরী স্বীকার করেন যে বেপরোয়া লাঠিচার্জে মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই

অশোক চ্যাটার্জী

অসম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন যে মাথায় আঘাতের ফলে শরীরের যে কোন অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে।

সমাচার দর্পণ

বৃষ্টির জন্য অক্সফোর্ড এবং ভারতীয় দলের তিনদিনের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ৮ উইকেটে ৩৩৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সফরের প্রথম সেঞ্চুরী করেন অধিনায়ক পতৌদি, তিনি ১৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন। অক্সফোর্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১৩৪ রানে এবং ফলো-অনের সম্মুখীন হবার পর অক্সফোর্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪০ রান সংগ্রহ করার পর খেলা শেষ হয়। এজবাস্টনে ওয়ারউইকসায়ারের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলার প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হয় নি।

* * *

অতীতের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ স্বর্গত শ্রীদীনবন্ধু সেনের (দাঁতি সেন) প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন মন্দিরে একটি স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। আগামী সংখ্যায় স্বর্গত শ্রীদীনবন্ধু সেনের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আন্তঃকলেজ হকি লীগ বিজয়ী আশুতোষ কলেজ দল

বর্ণ-বৈষম্যের বলি

কেপটাউন শহরে হোটেলে, কাফেতে, চায়ের দোকানে, ক্লাবের আড্ডায় বক্সিং-এর আলোচনা। গ্রীন পয়েন্ট স্টেডিয়ামে লড়াই হবে রনি ভ্যানডার ওয়াল্ট-এর সঙ্গে ব্ল্যাকি সোয়ার্ট-এর। সবার মুখেই রনির কথা। উদীয়মান বক্সার। বয়স ২৯ বছর। ১০০টা লড়াই-এ আটবার মাত্র হার হয়েছে। রনির বৈশিষ্ট্য—ন্যাটা হাতের ঘুষি ঠিক মতন লাগলে প্রতিপক্ষ খাড়া থাকতে পারবে না—নির্ঘাৎ ঘুরে পড়বে। রনির হাতে ঘায়েল হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন উইলি লাডিক। উইলি বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশীপের একজন দাবিদার। সুতরাং ওয়েল্টার চ্যাম্পিয়ন উইলি লাডিককে হারিয়ে রনির খ্যাতি আফ্রিকাময় ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রীন পয়েন্ট স্টেডিয়ামে রনির লড়াই দেখবার জন্যে টিকিটের চাহিদা বেশ। রনির ভাগ্য এবার ফিরে যাবে।

লড়াই-এর ঠিক আগের দিন এক অঘটন ঘটল। শহরের লোক অবাক। গ্রীন পয়েন্ট লড়াই-এর সমস্ত পোস্টারগুলি দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিশেষ করে রনির ছবির ওপরেই যত রাগ। খবরের কাগজে ঘোষণা বেরুল লড়াই বাতিল। রনি অস্পৃশ্য—সে শ্বেতাঙ্গ নয়—সে কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে লড়াই করার অধিকার তার নেই। আইন অমান্য করলে মোটা জরিমানা অথবা কারাবাস।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের প্রচণ্ড আঘাত রনির ভবিষ্যৎ এক মুহূর্তে চূর্ণ করে দিল। তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। অপরাধ—তার রক্তে কালা আদমীর রক্তের খাদ রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ হবার কৌলিন্য তার নেই। রনি অশ্বেতাঙ্গ—তাকে এখন থেকে লড়তে হবে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে। পেশাদার বক্সিং-এ রনির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কালা আদমীর লড়াই-এ যা উপার্জন হবে তার চেয়ে মাথায় মোট বওয়া ভাল। রনি দারুণ নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছে। কঠোর আইনের বজ্রমুষ্টি আজ তাকে বেল্টের নিচে অত্যন্ত বে-আইনিভাবে আঘাত করেছে—কিন্তু রেফারী নীরব।

মজার কথা রনি ছেলেবেলা থেকে শ্বেতাঙ্গ বলে পরিচিত। শ্বেতাঙ্গ স্কুলে বরাবর লেখা-পড়া করেছে। শ্বেতাঙ্গদের জন্য আলাদা রেস্টুরেন্টে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শুধু তাই নয় ১৭ বছর বয়স থেকে সে পেশাদারী বক্সিং করছে শ্বেতাঙ্গ হিসাবে। ১২ বছরের দীর্ঘ সাধনায় জীবনযুদ্ধে যে যখন সাফল্য লাভ করতে চলেছে—হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হয়ে গেল কলমের এক খোঁচায়—আইনের এক প্যাঁচে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের আইন বড় কড়া। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কালা আদমীর ছোঁয়াচ বাঁচানর জন্যে অবমাননাকর আইন চালু করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের লড়াই আজ বিশ্ববিশ্রুত। এই বিংশ শতাব্দীতেও তাদের গোঁড়ামী একটুও কমে নি। খেলাধুলার

রনি ভ্যানডার ওয়াল্ট

ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ একঘরে। অলিম্পিকে যোগ দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া স্বজাতি বলে ক্রিকেটে কুটুম্বিতা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। টেনিসেও দক্ষিণ আফ্রিকা উইম্বলডেনে যোগ দেয়। এর বিরুদ্ধে রাশিয়ান টেনিস খেলোয়াড়রা একবার প্রতিবাদ করেছিলেন খেলা বর্জন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সব সময় পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। যারা অশ্বেতাঙ্গ—তাদের পরিচয়পত্রে লেখা থাকে—বাণ্টু—কালা আদমী ইত্যাদি। এই পরিচয়পত্র দেবার আগে দস্তুর করা হয়। রনি লিখেছেন—"সে এক জঘন্য ব্যাপার। স্থানীয় কর্মচারীরা আপনার বাড়িতে ঢুকবেন। তন্ন তন্ন করে সব জিনিস দেখবেন। সেদিন আমি ও আমার স্ত্রী বাড়িতে ছিলাম। কর্মচারীরা বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তাঁদের মুখের ভাব আমরা যেন কোন অন্যায় অপরাধ করেছি। তাঁরা বাড়ি তল্লাস বা তদন্ত করতে এসেছেন। কষাইরা যেমন জবাই দেওয়ার জন্য পশু কেনে—এবং কেনবার আগে পশুর সারা দেহ খুঁটিয়ে দেখে। কর্মচারীরা আমার শিশুপুত্র দু'টি ও স্ত্রী রেচেলকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠল—তাতে রেচেল কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমিও প্রমাদ গুণলাম। বুঝতে দেরি হল না—তদন্তের ফল কি হবে।"

দিনকয়েক পরে রনি চিঠি পেল—তার শ্বেতাঙ্গের পরিচয়পত্র বাতিল হয়েছে। সে এখন থেকে সাউথ আফ্রিকায় অশ্বেতাঙ্গের মর্যাদা পাবে।

রনির প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টেও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী মহোদয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"রনির সম্বন্ধে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বলবৎ থাকবে। রনি ভোনকালেও শ্বেতাঙ্গ ছিল না এবং কোন কালেও শ্বেতাঙ্গ হতে পারবে না।"

এ সিদ্ধান্ত যেন রনির মৃত্যুদণ্ড। সাউথ আফ্রিকা তার জন্মভূমি—তার বড় প্রিয়। স্বাধীনতার জন্যে সে জন্মভূমি ত্যাগ করবে। ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়ে সে স্বাধীন মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। নিজের বাহুর জোরে জীবিকা অর্জন করে—শিশুপুত্র দু'টিকে মানুষ করবে। বর্ণ-বৈষম্যের আইনের জুলুম সে মানবে না। রনির শেষ কথা—"সাউথ আফ্রিকা তার প্রতি যে অবিচার করেছে—দুনিয়ার মানুষের কাছে তার বিরুদ্ধে সে বিচার চাইবে।"

—কাশীনাথ মজুমদার

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬২০০

Thursday, 25th May, 1967 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C71
PRICE : 25 PAISE GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

26 MAY 1967

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জগতের অন্ত মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

৩৩, সাধনা ঔষধালয় রোড সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

সাপ্তাহিক বসুমতী

কর্মমুখর কলকাতার কয়েকটি চিত্র

(১) দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর বিদায়-সম্বর্ধনা
(২) বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিনে
(৩) খরাত্রাণ তহবিলের জন্য সাহায্য সংগ্রহে মিছিল

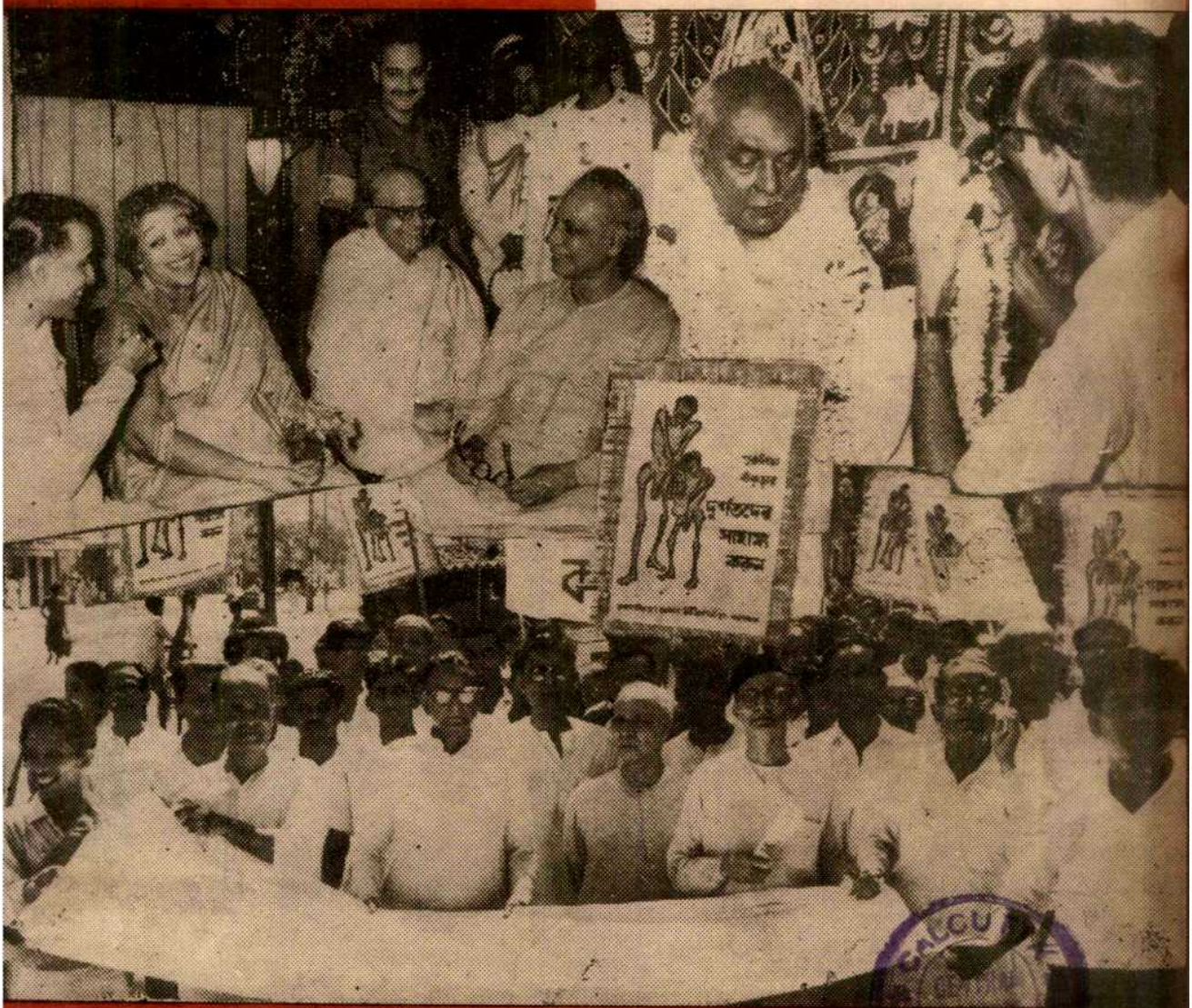

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

বর্ষ ঃ ৫১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ● 1st June, 1967 Vol. 71, No.

...কিন্তু, এক বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত—

বোরোলীন

—কাটা-ছেঁড়া-ফাটা হাজা, শুকনো, খস্‌খসে কিংবা বর্ণহীন ত্বকে
যে কোন বিভ্রাটে—বোরোলীন নির্ভরযোগ্য অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩২০৩
আজকের মানুষ		৩২০৪
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	৩২০৫
আমি যাঁদের দেখেছি	— পরিমল গোস্বামী	৩২১০
ভারতদর্শন		৩২১৫
আন্তর্জাতিক		৩২১৯
নবমন্ত্রিসভা সমীপেষু	— এস কে শর্মা	৩২২১
চোরা গর্তের ইঁদুর (গল্প)	— রাম রায়	৩২২৩
আকাশবাণী-পরিক্রমা	— মেঘদূত	৩২২৫
আশ্চর্য কলকাতা (কবিতা)	— বেণু দত্তরায়	৩২২৬
রমেশ শীল স্মরণে (কবিতা)	— সুফিয়া কামাল	৩২২৬

ধোনাম্মা
সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
*
ছিট কাপড়

শৈললাল মতিলাল
বহুবাজার ৩ শ্যামবাজার
ফোন ৩৪-২৯২৬ ট্রামডিপোর দক্ষিণে

মিহাতেন্দু
বিছানা
*
শাল ও আলোয়ান

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শকুন (কবিতা)	শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩২১৬
গ্রন্থমেলা		৩২২৭
বঙ্গদর্শন		৩২২৯
বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৩৩
পাক-ভারতের রূপরেখা	প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	৩২৩৯
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৩২৩৩
আণবিক যুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৩২৩৬
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৩২৩২
রঙ্গজগৎ		৩২৩৫
পাঠকমন		৩২৩০
খেলাধূলো	শ্রীঅমিতা	৩২৬১

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের
—নবতম অর্ঘ্য—

"দাঁড়াও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা মুচাব মা তোর দৈন্য!
মানুষ আমরা নহি তো মেষ।
দেবী আমার! সাধনা আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ!"

মাতৃমন্ত্রের ঋত্বিক, অপরাজেয় মানবমহাত্ম্যের স্বপ্নদর্শী কবি, যুগপ্রবর্তক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ডে আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক সাজাহান, তৎসঙ্গে সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব রুস্তম ও পরপারে। মুদ্রণ পারিপাট্যে ও গ্রন্থন সৌকর্যে মনোহর। কবির প্রতিকৃতি সমন্বিত সুদৃশ্য আর্ট-পেপারের জ্যাকেটের প্রচ্ছদ; কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি—১২

৪১ বর্ষ ঃ ৫১শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 1st June, 1967

কেন্দ্রীয় বাজেট

মূল্যবৃদ্ধির চাপে ভারতের জনগণ যখন হিমসিম খাচ্ছে, তখন ঘাটতি বাজেট দূর করার জন্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে ধরণের বাজেট উপহার দিয়েছেন, তাতে জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হওয়া দূরের কথা, এই বাজেটের ফলে তাদের দারিদ্র্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীদেশাই যে বাজেট পেশ করবেন, তদ্দ্বারা নতুন আশার আলো সাধারণ মানুষ কল্পনাও করে নি, কারণ আগে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, তার হাহাকার আজো শোনা যায়। কালোটাকা যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তাঁর স্বর্ণনীতি কোনো রকমেই ফলপ্রসূ হয় নি। পরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকেই নীতি বদল করতে হয়েছে। ভারতীয় জনগণের এমনই দুর্ভাগ্য কালোবাজারীদের কালোটাকা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। সরকার সেখানে হাত দিতে পারেন নি। এমন কি রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনেও কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পরিষ্কার নয়—যদিও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এ ব্যাপারে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন কিছু থকবে না আশা করা গেলেও প্রত্যাশা ছিল যে, এমনভাবে কর বসানো হবে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি না হয়। এই প্রত্যাশার কারণ, মূল্যহ্রাসের ফলে এমনিতেই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এমনভাবে কর নির্ধারণ করবেন যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আর বৃদ্ধি না পায়। তাছাড়া অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রীদেশাই দেশবাসীকে এই আশার বাণী দিয়েছিলেন যে, যেভাবেই হোক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতেই হবে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ হওয়া দূরের কথা, শ্রীদেশাই বাজেট পেশ করবেন, এই আশাতেই বাজেট পেশ হবার আগেই বহুপ্রকার জিনিসপত্র বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছিল এবং এখনো সেই অবস্থা বিরাজ করছে। মজুতদারদের কপাল ভালো যে, শ্রীদেশাই এমনভাবে কর নির্ধারণ করেছেন যার ফলে তাদের এখন পোয়া বারো। এবারের কর নির্ধারণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই, যে-সব জিনিসের উপর কর বাড়ানো হয়েছে তার অধিকাংশই নিত্য প্রয়োজনীয়। চা, কফি, জুতা, সিগারেট, বস্ত্র, পেট্রোল প্রভৃতির কর বাড়ালে কিভাবে যে এদের দাম বৃদ্ধি পাবে না তা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা মুস্কিল। মিহি বস্ত্রের উপর কর বৃদ্ধির ফলে চরকার ব্যবহার বাড়বে, এবং জনগণের পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে না—এই হচ্ছে সরকারী মত। কিন্তু অর্থনীতির জ্ঞান যাঁদের নেই, তাঁরাও ভালোভাবে বোঝেন যে একটা জিনিসের দাম বাড়লে বিকল্প বস্তুটির চাহিদা বাড়ে। আর চাহিদা বাড়লেই জিনিসের দাম বাড়াবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, সরকার যতো কথাই বলুন না কেন—এবারের বাজেটের দ্বারা জনগণের দুর্ভোগ বাড়বেই। শ্রীদেশাই চেয়েছিলেন ঘাটতি বাজেট দূর করে বর্তমান বাজেটে সামঞ্জস্য বিধান করতে, কিন্তু সামঞ্জস্য বিধানের নামে যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার খোলসের মধ্যে বড়লোক ও গরীব লোকের অসামঞ্জস্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশ কি যথার্থ উপকৃত হবে? তবে এবারের বাজেটে দেশের শিক্ষার জন্যে কিছুটা সুবাহা করা হয়েছে। এতে অবশ্য লাফালাফির কোনো প্রয়োজন নেই। শিক্ষার জন্যে বাজেটে যা বরাদ্দ থাকে, তার বিরাট অংশ হিন্দী প্রচারের জন্যই ব্যয় করা হয়। এবারেও যে সেই আশায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতেই বা সন্দেহ কি—বিশেষত শ্রীমোরারজী নিজেই যে একজন হিন্দী-সমর্থক।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী, ব্যক্তিগত জীবনে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে, দক্ষ প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও মোরারজী দেশাই জনমনে যেন শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার স্থায়ী আসন করে নিতে পারেন নি। তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা বা দেশপ্রেম অন্য কারো চেয়ে কম নয় এটাও সত্যি, কিন্তু তবুও নেহরু, নেতাজী বা প্যাটেলকে যেমন দেশবাসী সহজেই নায়কের আসন পেতে দিয়েছিলো, মোরারজীর বেলায় তা জোটে নি। হয়তো তাঁর বরাতই মন্দ তাই। কিম্বা অন্য কোন ত্রুটি রয়েছে তাঁর, যার জন্যে তাঁর পাওনা তিনি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে পান নি।

পাওনা বলতে প্রধানমন্ত্রীর পদের কথাই বলছি। এই সুদুর্লভ পদটির দিকে তিনি দুবার হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু দুবারই তাঁকে হতাশ হতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালে শাস্ত্রীজীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে, ১৯৬৭ সালে আপোষ রফা করতে হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। অথচ নেহরুর পর কে?—এই প্রশ্নের একমাত্র জবাব একদিন শ্রীমোরারজী দেশাই-ই ছিলেন। কিন্তু প্রধান ছেড়ে অপ্রধান নিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো কেন? প্রথমত, প্যাটেল বা নেতাজীর পেছনে একটা সংগঠিত দল বা শক্তি ছিলো অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে তাঁরা জননেতা ছিলেন এবং দলের লোকেদের তাঁরা দেখতেন কিম্বা নেহরু, পন্থ, লালবাহাদুরের পেছনে কোন সংগঠিত দল না থাকলেও তাঁদের সমর্থকদের স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করে চলতেন—মোরারজীর এর কোনটাই নেই সেজন্যে নেতৃত্বের লড়াইয়ে দেখা গিয়েছে তাঁর সমর্থকরাও পাশ থেকে সরে গিয়েছেন। কেন এমনটি হলো? এ জন্যেই কি যে মোরারজী দেশাইয়ের মধ্যে বেশ খানিকটা আত্মম্ভরিতা, গোঁড়ামী রয়েছে বলে?

কোন রাজনৈতিক নেতারই গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু মোরারজী এতদিন রাজনৈতিক জগতে সম্মানের সঙ্গে বিচরণ করেও কেন ওই গোঁড়ামীর ওপরে উঠতে পারলেন না? তবে কি তিনি যাকে একবার সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাকে সহজে ত্যাগ করেন না বলেই গোঁড়া বলে তাঁর নিন্দা রটেছে। অথচ ভারতের আর পাঁচজন নেতার মতো তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে—আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বরং মোরারজীর জীবনে কিছু বৈচিত্র্য ছিলো যা অন্যত্র সহজলভ্য নয়।

অর্থাৎ বোম্বাইয়ের উইলসন কলেজে শিক্ষা শেষ করে মোরারজী প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের তোড়ে মোরারজীও ভেসে গেলেন, চড়া মাইনের লোভজনক উঁচু পদ ছেড়ে তিনি ওই আন্দোলনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিটি আন্দোলনে মোরারজীর অনিবার্য উপস্থিতি ঘটেছে, বোম্বাই

মোরারজী দেশাই

কংগ্রেসের নেতৃপদ অলঙ্কৃত করেছেন। দেশসেবার পুরস্কার বৃটিশ সংজ্ঞা ও আইনে কারাবাস, মোরারজীকেও বার বার কারান্তরালে যেতে হয়েছে, ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত মোট চারবার ওই তীর্থযাত্রা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে যখন কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠন করলো, তখন মোরারজী দেশাই বোম্বাই আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তার আগে গুজরাট কংগ্রেস কমিটির ছিলেন তিনি সম্পাদক ১৯৩১-৩৭ পর্যন্ত। কিন্তু মন্ত্রীর পদ পাবার জন্যে তাঁকে আরো প্রায় দশ বছর ধৈর্য ধরতে হয়েছিলো, ১৯৪৬ সালে তিনি প্রদেশের মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র দপ্তর পেয়েছিলেন। মোরারজীর খ্যাতি, তাঁর কর্মক্ষমতা এবং নিষ্ঠা, সর্বোপরি তাঁর সরল ও পবিত্র জীবনযাত্রা অচিরেই নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ১৯৫২ সালে তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদে তিনিই মনোনয়ন পেলেন দলের। এর পরে ডাক এলো তাঁর রাজধানী থেকে, প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর (১৯৫৬-৫৭) পরে অর্থমন্ত্রী।

কিন্তু তারপরেই যেন রাহুর ভবলে পড়লেন তিনি, সে-রাহু কামরাজ-কৃষ্ণমেননের মূর্তি ধরে এসেছিলো হয়তো। কামরাজ পরিকল্পনায় মোরারজী দেশাই ছাঁটাই হলেন, দিল্লী থেকে দূরে সরে গিয়ে উত্তরাধিকারীর লড়াইয়ে তাই তাঁর সাফল্যের আশা করা যায় কী করে। মোরারজীও গান্ধীজীর মতো লক্ষ্য ও পন্থা উভয়ই ভালো চান, তিনি ছল-চাতুরী পছন্দ করেন না। করেন না বলেই নেতৃত্বের জন্যে ইন্দিরা বা শাস্ত্রীজীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

এত ত্যাগ, এত নির্যাতন সয়েও দেশের জন্যে এত করেও দেশের প্রতি মোরারজীর যেন স্থায়ী অবদান কিছু নেই। এর কারণ কি? কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থমন্ত্রী হিসেবে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বিধি প্রবর্তন করে সাধারণ লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মাদকদ্রব্য বর্জন আইন করেও বহু লোকের নিন্দে কুড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু মোরারজী কয়েক বছর রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে থাকার পর আবার দৃশ্যমান হয়েছেন। প্রথমে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তারপর ইন্দিরার সঙ্গে আপোষ রফা করে উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর পদে। মোরারজী সুষম বাজেটের নামে দেশবাসীকে যা উপহার দিলেন এবার তার জন্যেও তিনি সমালোচনার পাত্র হয়েছেন।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(৫)

চড়কের পর এলো গ্রীষ্মকাল। রোদটা হয়ে উঠল চনচনে কড়া। কিন্তু তেলিরবাগে তেমন গরম লাগত বলে মনে পড়ে না। গ্রামের দক্ষিণে অদূরেই ছিল বিরাট চওড়া পদ্মা নদী। তার উপর দিয়ে খালি মাঠগুলি পেরিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে আসত দখিন হাওয়া সন্ধ্যা হতে না হতেই। সারা দিনের ক্লান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে যেতো সেই মন্দ-মধুর মলয় বাতাসে। গ্রামের ডোবাগুলি এবং উত্তর-পূব কোণের মস্ত বড় কচু খালটা গেল প্রায় শুকিয়ে। সেই সব নিচু জমিগুলিতে পাঁকের মধ্যে জন্মালো কত রকম লতা, গুল্ম। খালের কাদা মাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল এবং বড় বড় ফাটলের দাগ বেরোল যেন খালের বুক চিরে। খালের ও পাড়ের ক্ষেতগুলিতেও বের হতে লাগল চিড় খাওয়া ফাটলের কত রকমারী নক্সা। ক্ষেতের মাটিটা যেন জলের তৃষ্ণায় হা হা করে ধুঁকছে। এদিকে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় কচি আমগুলি বেশ পুষ্ট হয়ে উঠল। সুরু হয়ে গেল আমাদের আম কুড়োবার ধুম। কত রকমেরই না ছিল আমগুলি আর কত বিচিত্রই না ছিল তাদের নাম। কাঁচামিঠা চিনিটুকুইরা, সিন্দুইরা, হাতীর লাদা এবং আরো কত কি? শেষোক্ত আমের নামকরণের ইতিহাসটুকুর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। বাবার বিয়ের সময় তাঁকে নেবার জন্যে যে একটা হাতী এসেছিল সেটাকে নাকি এ-আম গাছটার সঙ্গে বেঁধেছিল। হাতী যদি বাঁধাই হয়ে থাকে তবে তার জন্যে আমটার ঐ রকম একটা বিশ্রী নাম দেবার কি অর্থ বা কারণ ছিল তা বড় বয়স পর্যন্তও জানতে পারি নি। মাঝে মাঝে আসত ঝড়, মাঝা যাকে বলতেন কালবৈশাখী। ঝড়গুলি কিন্তু হোতো বেশির ভাগ সময়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রের দিকে। সে যে কী ঝড় তা কিছুতেই শহুরে লোকেরা বুঝবে না। হাওয়া ছুটে আসছে উদ্দাম গতিতে। বিদ্যুৎ সহসা আকাশের বুক চিরে আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল করে মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে নিমিলিত হয়ে যেতো। নিকষ ঘন অন্ধকারে পৃথিবীটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। মধ্যের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখেছি ঘন কালো মেঘে আকাশ ঠাসা এবং আকাশের ঐ মেঘ আর পদ্মার নীল জল যেন মিশে এক হয়ে গেছে। নদীবক্ষে একটিও নৌকা নেই। আর সে কি ঝড়ের দমকা হাওয়া। গাছগুলির আগাগুলি আথালী-পাথালী আছাড় খেয়ে পড়ছে। কোনো কোনো পুকুরের কোণায় কোণায় যে শাপলালতা ছিল তার বড় বড় পাতাগুলি জলের ঢেউয়ে উলটে-পালটে যাচ্ছে আর শাপলা ফুলগুলি মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ে জলে ডুব দিয়ে উঠছে। অপূর্ব এই কালবৈশাখীর সমারোহ তেলিরবাগ গ্রামে যা দেখেছি তা কলকাতায় কখনো দেখি নি। পরে অবিশ্যি দেখেছি শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে।

বিকেলে ঝড় উঠলে আমরা ছুটতাম আম কুড়োবার জন্যে। কিন্তু আম পাবার যো নেই। 'ঠারাইন'রা তার আগেই 'আগইল' অর্থাৎ ধামা নিয়ে আম গাছের তলায় হাজির। রাত্রে ঝড় উঠলে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাব আম কুড়োতে। কি মজা না হবে। ও হরি, গিয়ে দেখি 'ঠারাইন'রা তারো আগে গিয়ে রণক্ষেত্র দখল করে আছেন। সব সময়ে যদি এই রকম করে 'ঠারাইন'রা আমাদের বঞ্চিত করেন তবে আমরা করি কি? দিন রাত তাঁদের বকুনী—'কি ব্যাদপ পোলাপানরে'—শুনে শুনে আমরা ঝালাপালা বিরক্ত হয়ে যেতাম। গাছের থেকে খসে পড়া আম যদি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করা না যায় তবে দায়ে পড়ে অভদ্র আচরণের কথা যদি ছেলেদের মনে জন্মায় তবে তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত বলেই মনে করতাম। যা কুড়িয়ে পাওয়া গেল, না তা ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে পেড়েই নিতে হয়—ন্যায়শাস্ত্রের এই সহজ সিদ্ধান্তটাই আমরা গ্রহণ করলাম। অগোচরে, পরের গাছে চড়ে আম পেড়ে নিলে সে কাজটাকে যদি চুরি বলে অপপ্রচার করা হয় তবে সে চৌর্যবৃত্তির মূলেই রয়েছে ঐ সব ঠারাইন'দের ছেলেদের প্রতি নির্মম নির্যাতন। তাছাড়া পরের জিনিস নিলে চুরি হয় শুনেছি, কিন্তু নিজেদের বাড়ির গাছেরও আম পাড়া যেতো না আমাদের নিজ নিজ মা, জ্যেঠি খুড়িদের তাড়নায়। অতএব নিতান্তই নিরুপায় হয়েই আমাদের নানা ফন্দিফিকির করতে হোতো। আমাদের প্রত্যেকের জামার পকেটে কিংবা কোঁচড়ে থাকত কাগজে মোড়া নুনের পোঁটলা। আম সংগ্রহ হলে তার চোকলা ছাড়াব কিসে? ছুরি পাব কোথায়? ছুরি কেনবার পয়সা চাইলেই সব জানাজানি হয়ে বকুনীর অন্ত থাকবে না। একটা সনাতন প্রথা ছিল তা শিখে নিলাম। গ্রামের পুকুরে ঝিনুকের অন্ত নেই। নাক টিপে এক ডুব দিয়ে পাঁকমাটিতে হাতড়ালেই ঝিনুক পাওয়া যেতো। যার যত ইচ্ছা। একটিতেই যথেষ্ট। সেই ঝিনুকটি পরিষ্কার করে ঘাটের শানের উপর খানিকক্ষণ জোর করে ঘন ঘন ঘষলেই সেই ঝিনুকের মধ্যিখানটায় একটা ফুটো হয়ে যেতো। সেই ফুটোটার চারিপাশটা হয়ে যেত ভীষণ পাতলা আর অসম্ভব তীক্ষ্ণ। কাঁচা আমের গায়ে ঝিনুকের সেই ফুটোটা বুলালে আমের উপরের সবুজ চোকলাটা বেমালুম উঠে আসত। ছুরি দিয়ে কাটলে চোকলা ছাড়া আমের শাঁসও খানিকটা চলে-যায় যত মিহি করেই কাট না কেন। কিন্তু এই ফুটো করা ঝিনুক দিয়ে কাঁচা আমের চোকলা ছাড়ালে এতটুকুও অপচয় হয় না। সুতরাং আমরা ছেলেরা নুনের পোঁটলা ও ফুটো ঝিনুক নিয়ে বের হতাম আম সংগ্রহ করার জন্যে অর্থাৎ পরের, কি নিজের, গাছে চড়ে সঙ্গোপনে আম পেড়ে আনবার জন্যে। কিন্তু গাছ থেকে আম পেড়ে আনাটা বলা যত সহজ কাজে ততটা সোজা ছিল না। ঐভাবে

আম যোগাড় করতে গিয়ে অনেক সময় দৈব-দুর্যোগ বা অনর্থ ঘটে হেতো। স্কুলের কতকগুলো পাড়ার 'ঠারাইন'রা থাকতেন সদা জাগ্রত। গাছে উঠলেই সেই ঠাকুমার ঝুলির রাক্ষসীর মত তাঁদের টনক নড়ত এবং তক্ষুণি 'কেরে, কেরে' করে হুংকার দিলেই গাছ থেকে লম্ফ দিয়ে মাটিতে পড়েই দে ছুট ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। ধরা পড়লে যে দুর্গতি হোতো তা লোক ডেকে ডেকে বলবার মত হোতো না।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে—বলেই ফেলি। একদিন দুপুরে মা গেছেন উত্তরের বাড়িতে পাড়া বেড়াতে। মধ্যের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে যে একটা পাকা পায়খানা ছিল তারই কাছাকাছি বেশ বড় ঝাঁকড়া একটা আম গাছ ছিল—যার ফল ছিল অতীব সুস্বাদু ও রসাল। বাড়ির কর্ত্রীর অনুপস্থিতির সুবর্ণ সুযোগে হরি সিং পিসার ছেলে ভ্যাগা উঠলেন গাছে। আমি আর কে কে ভলায় দাঁড়িয়ে রইলাম আম কুড়োবার জন্যে। এমন সময় হয়েছে কি, মধ্যের বাড়ি ও উত্তরের বাড়ির মাঝে যে দেয়ালটা ছিল সেটা ভেঙে পড়ে যে একটা পথ হয়ে গিয়েছিল মধ্যের বাড়ি থেকে উত্তরের বাড়ির যাতায়াতের জন্যে সেই পথ ধরে এলেন আমারই মা। বোধ হয় উত্তরের বাড়ির মেয়েরা সেদিন বাড়ি না থাকায় মা মধ্যের বাড়ি ফিরে আসছিলেন। যেই না মাকে দেখা আমরা যারা নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা ত' দে ছুট—একেবারে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার অখিলবাবুর কোয়ার্টারের কোণায় দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম ভ্যাগার কি দশটা হয়। ওদিকে মাকে দেয়ালের এপিঠে আসতে দেখে ভ্যাগা একটা উঁচু ডাল থেকে মারলে লাফ। পড়েই নিজের ডান দিকের গালটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—'বাবারে গেছিরে'। ভ্যাগাকে ডুকরে কেঁদে উঠতে দেখে মা ভাবলেন যে ছেলেটা হয়ত ইঁটের উপর পড়ে খোঁচা খেয়ে আঘাত পেয়েছে। হাজার হোক মায়ের প্রাণ। তিনি শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কাটছে নেকি?' ভ্যাগা ছাবল মায়ের মনটা ভিজেছে—সেই জন্যে সেই ভেজা মনটাকে একেবারে গলিয়ে দেবার জন্যে একটু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—'এপিট ওপিট ফোকা হৈয়া গেছে!' হয়ে গেল হিতে বিপরীত। 'কি সর্বনাশ, চল শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুর কাছে' বলে মা যেই ভ্যাগার ডান হাতটা ধরতে গেছেন ভ্যাগা তখন পালিয়ে পার। তার গালে একটু আঁচড়ও লাগে নি। মা বুঝলেন যে গালটা এপিঠ ওপিঠ ফুটো হবার কথাটা মাকে ভোলাবার জন্যে ভ্যাগার ধাপ্পা মাত্র এবং তখন—'যত ব্যাদ্দপ পোলাপান' বলতে বলতে তিনি মধ্যের বাড়ির দোতলায় উঠে গেলেন। সেদিন আম নুন-খাওয়াটা তেমন জমল না।

(৬)

বর্ষা যদি উপভোগ করতে হয় তবে যেতে হয় পদ্মা নদীর পারে অবস্থিত কোন গ্রামে—যেমন ছিল আমাদের তেলিরবাগ। আকাশ ঘন কালো জলভরা মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল সূর্যদেবের মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে। তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর বুকে নেমে এল বর্ষার অবিশ্রাম বারিধারা। যে সব বাড়িতে ছিল টিনের চাল সেগুলি মুখরিত হয়ে উঠল মোটা মোটা বারিবিন্দুপাতে। কৃষকেরা হরষিত হয়ে উঠল অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া বর্ষার সমাগমে। মাঠে বেরোল তারা তাদের লাঙল ও নানা রংয়ের বলদগুলি নিয়ে। কেউ সাদা, কেউ বাদামী, কেউ বা পাটকিলে রংয়ের। জমির ফাটলগুলি অচিরে বুজে গিয়েছিল প্রথম পশলা দুই বৃষ্টির জলে। মাঠে মাঠে লাঙল দেওয়া হলো। মই দিয়ে ঢেলা-ভাঙা হলো। ওদিকে দেখতে দেখতে নদী-নালা বিল-খাল ফুলে উঠল জলের তোড়ে। পাড় ডিঙিয়ে সে স্রোত চলে এলো মাঠের উপর দিয়ে। বীজধানগুলি ও পাটের বীজ বপন করা হলো। মাঠে জল যেমন বাড়তে লাগল ধানের ও পাটের চারা-গাছগুলিও সেই অনুপাতে বেড়ে উঠতে লাগল। তেলিরবাগের ছোট খালটি জলে ভরে গেল এবং স্রোতও বইতে লাগল এবং তাতে নৌকা চলাচল সুরু হয়ে গেল। মাঠ, ক্ষেত জলে জলময় হয়ে গেল। ছেলে বুড়ো এমন কি বৃদ্ধা রমণীরাও ছিপ হাতে গ্রামের খালে পুঁটিমাছ, ট্যাংরামাছ ধরতে লাগলেন। উৎসাহী যাঁরা বেশি তাঁরা স্রোতের মুখে স্থানে স্থানে চাঁই পাতলেন কই মাগুর মাছ ধরবার আশায়। চারিদিক জলে থৈ থৈ। তারি মধ্যে আমাদের তেলিরবাগ গ্রামের বসতি অঞ্চলটুকু যেন গলা বাড়িয়ে মাথা উঁচু করে ভেসে থাকত ছোট একটি স্বপ্ন দেশের দ্বীপের মত। গাছে গাছে কদম্ব ফুল একটা মাদক গন্ধ ছড়িয়ে দিতে লাগল পাড়াময়।

এই রকম এক ভরা বর্ষায়—সন-তারিখ মনে নেই—আমাদের মামাবাড়ি থেকে খবর এলো যে আমাদের সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠান হচ্ছে। বোধ হয় দিদিমা গুগুকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। আমার ত' আর তর সয় না। লোক আসছে না কেন? মা ধমকালেন—'আইবখন।' শেষ পর্যন্ত লোক এল নৌকা নিয়ে। সেকালে রেওয়াজ ছিল মেয়ের বাপের বাড়ির লোকেদের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনা ও ফিরিয়ে পাঠান—অর্থাৎ মেয়ের বাপের বাড়ির ঘাড়েই পড়ত যাবতীয় খরচটা। সেই রেওয়াজ অনুসারেই দিদিমা—দাদা মশায় তখন বেঁচে ছিলেন না—লোক দিয়ে কা পাঠিয়েছিলেন মাকে ও আমাদের নিয়ে যেতে। যে লোকটি এলেন মা তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন—'কৈলাস সিং মাউসা'। শুনলাম তিনি মামাবাড়ির খুবই অনুগত প্রজা এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মায়ের ছিল বোনেরই মত সম্প্রীতি। সুতরাং তিনি যে আমাদের 'মাউসা' হবেন তাতে কোন ভুল নেই। সেই দিনটা কৈলাস সিং মাউসা বিশ্রাম করলেন। মা সব জিনিষ গুছিয়ে তৈরি হলেন। পরদিন ভোরে আমরা সবাই নৌকা করে রওনা হলাম কৈলাস সিং মাউসার জিম্মায় মামাবাড়ি হাসাড়ার উদ্দেশ্যে।

বাবা যখন কাছে থাকতেন না তখন খুকীরও নালিশের বালাই থাকত না। বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে মা'র কাছে বেশি প্রশ্রয়ও পেত না। কাজেই তখন আমার সঙ্গে খুকীর বেশ সদ্ভাবই থাকত। নৌকা আমাদের অপরিসর খাল বেয়ে কত বেত ঝাড়ের পাশ দিয়ে শেষে গিয়ে পড়ল বহরের বড় খালটার মধ্যে—যেটাকে বোধ হয় সরকারীমহলে তালতলার খাল বলত। খাল না যেন নদী। বর্ষায় সে খাল টুবুটুবু ভর্তি এবং পদ্মা থেকে জল-স্রোত ঠেলে এসে পড়ছে এই খালটার মধ্যে। বড় খালে পড়া মাত্র খুকী—'দাদা দ্যাখ, ঐ যে' বলে হাত বাড়িয়ে কত ফুলে ভরা মন্দির ও কদম্ব গাছ এবং এটা-ওটা কত কি দেখিয়ে নিজেই উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগল। কত খাল, নদী, নালা বেয়ে এবং এক-একবার সময় ও পথের দৈর্ঘ্য বাঁচাবার অছিলায় মাঝিরা চুপি চুপি পরের ধান ক্ষেতের উপর দিয়েই চলল নৌকা চালিয়ে। জল আর জল। ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে যে নৌকা গেছে নৌকায় চড়ে সে বুঝবেই না যে সে কি অপরূপ দৃশ্য এবং সে নৌকাবিহারে কি অপূর্ব আনন্দ। নৌকা যেমন এগুচ্ছে, ধানগাছগুলি তাদের ফলন্ত শিষ সমেত মাথাগুলি আস্তে আস্তে নুইয়ে নুইয়ে জলের মধ্যে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার-পর নৌকাখানা তাদের উপর দিয়ে চলে যাবার পরই সেই ধানগাছগুলি সোনা ধানের মঞ্জরী মাথায় করে যেন এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মেরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং টপ টপ করে ঝরে পড়তে থাকে রোদে ঝলমল জলবিন্দুগুলি। অপূর্ব শোভন সে দৃশ্য আমার বালক-মনে যে রেখাপাত করে গেছে আজও তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে আমার স্মৃতিতে। যতই ভেসে চলছি জলের উপর দিয়ে, চোখ আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ ধান

ক্ষেতের দিগন্ত বিস্তার দেখে দেখে। আনন্দের হিল্লোল উঠেছিল আমার শিশু-হৃদয়ে সেই প্রাণ-প্রাচুর্যের স্রোতধারার বেগে। ধান ক্ষেত পেরিয়ে নৌকা যখন পড়ল আর একটি খালে তখন বুড়া মাঝির কোলে বসে তার হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৈঠা দিয়ে জল টানা যে কি উল্লাসকর ব্যাপার কি করে সে বুঝবে সে না টেনেছে বর্ষার জলে স্ফীত খালের মধ্যিখানে ছই তোলা নৌকার দাঁড়।

(৭)

দেখতে দেখতে এসে গেল শরৎকাল। নদী তখনো ভরা এবং খরস্রোত বয়ে চলেছে। কিন্তু আকাশের রং কেমন যেন একটু বদলিয়ে গিয়ে ফিকে হয়ে এলো। বাতাসে যেন কিসের স্পর্শ পাওয়া গেল যা অনুভব করতে পারে ছোটরাও, যদিচ সেটা ব্যক্ত করতে পারে না তারা ভাষায়। মাঠের জল খুব একটু একটু করে নামতে সুরু হলো। মাথার উপর আকাশে মেঘে যেন ফাটল ধরতে লাগল এবং মাঝে মাঝে ঘন নীল আকাশ চকিতের মত দেখা যেতে লাগল। ক্রমশ এই মেঘের ফাটল-গুলি বাড়তে লাগল এবং পুঞ্জীভূত মেঘ-গুলি ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট সাদা পাল তোলা ডিঙি নৌকার মত আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণ কিরণ এসে পড়তে লাগল উঁচু গাছের ডগায় এবং তারপর আমাদের মুখে বুকে পিঠে। সুরু হয়ে গেল ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা। বাতাসের স্পর্শ যেন স্নিগ্ধ শীতল হয়ে উঠল। ধানের শিষে নোলকের মত ঝুলতে সুরু হলো শরতের শিশিরবিন্দুগুলি। সবুজ ধান ক্ষেতগুলি যেন শরৎকালের সাড়া পেয়ে আস্তে আস্তে সোনালী হয়ে উঠল। অন্ন-প্রাচুর্যের আসন্ন প্রত্যাসায় ঘরে ঘরে আশা ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হলো। বর্ষার দিনে ধান ক্ষেতে সবুজ আঁচল বিছিয়ে আলস্যে অবলুণ্ঠন সারা করে মেঘের অবগুণ্ঠন মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে আলো-ঝলমল রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়ালেন জ্যোতির্ময়ী শারদলক্ষ্মী। আমার বালকচিত্তের মধ্যেও কেমন যেন একটা আনন্দের ছোঁয়া লেগে গেল আমার অজানিতে নিভৃতে নীরবে। আকাশে-বাতাসে একটা আগমনীর সুর উঠল—প্রথম খুব মৃদুভাবে। ক্রমশ সেই সুর মূর্ত হয়ে উঠে 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঁচিল বাজনা বাজি।' এই শোভন সুন্দর পরি-বেশের মধ্যে বেজে উঠল শারদোৎসবের বাজনা। এই 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঁচিল বাজনা বাজি' যে কি অদ্ভুত, অনির্বচনীয়, আশ্চর্য ব্যাপার তা যে গ্রামে বসে সে বাজনা শোনে নি সে কি করে বুঝবে?

আমাদের দেশে যাবার পর যে প্রথম দুর্গা পূজা হয়েছিল সেটা আমার বেশ মনে আছে। কলকাতায় থাকতে দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের গাড়ি চেপে গঙ্গার ধারে দুর্গা পূজার ভাসান দেখেছিলাম বটে কিন্তু এত কাছাকাছি দুর্গা পূজা আগে কখনো দেখি নি। আমাদের গ্রামে তিনটি বড় পূজা হতো—দক্ষিণের বাড়িতে, মধ্যের বাড়িতে আর আমাদের পশ্চিমের বাড়িতে। মধ্যের বাড়ির প্রতিমাটি হতো সব চেয়ে বড় এবং জমকালো। মাঝারি সাইজের প্রতিমা হতো দক্ষিণের বাড়িতে এবং আমাদের বাড়ির দেবী প্রতিমাটি হতো ঐ দুইটির চেয়ে কিছু ছোট। পূজার বেশ কিছুদিন আগে থেকে কুমারেরা যখন প্রতিমার কাঠামোটা বানিয়ে খড় ও পাঁকমাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ত আমরা ছেলেরা দল বেঁধে তিন বাড়িতেই ঘুরে আসতাম স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর। প্রতিদিন একটু একটু করে দুর্গা ঠাকুরাণী ও তাঁর পুত্র-কন্যাদের ও দেবীর বাহন সিংহটির ও মহিষাসুরের দেহের চেহারাগুলি যেমন যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকত আমরা অবাক হয়ে তা অনেকক্ষণ বসে দেখতাম। সরস্বতী প্রতিমা গড়ার সময় যা দেখেছি এ ক্ষেত্রেও তাই দেখলাম। রোজ নতুন মাটির প্রলেপ পড়ত প্রতিমার প্রত্যঙ্গে। যখন সেগুলি কুমার কারিগরের পছন্দসই হতো তখন প্রত্যেকের গর্দানের উপর তাদের মাথা বসান হতো। তারপর এলো প্রতিমার গায়ে রঙ লাগাবার ধুম। সরস্বতীর মাথায় ঘন কালো চুল ও গায়ে সাদা নির্মল রঙ এবং লক্ষ্মীর মাথায় কোঁকড়ান চুল ও গায়ে একটু হলদে রঙ। গণেশের গায়ে লাল এবং কার্তিকের কাল চুল ও গোঁফ ও গায়ে ঈষৎ হলদে রঙ। দুর্গা-ঠাকুরাণীর মুখে রক্তিমাভা, মাথায় কালো গুচ্ছ গুচ্ছ চুল। কুমারদের কাজ আমরা তন্ময় হয়ে দেখতাম। এর পর হতো চাল-চিত্রে কত রঙ-বেরঙ-এর ছবি এবং কত রকমের সোলা ও রাংতার পাতে কালর এবং ঠাকুরদের গায়ে জমকালো গহনা। তা ছাড়া দেবীর দশ হাতে দশ রকমের প্রহরণ। বর্শাটা গিয়ে মহিষাসুরের বুকে যেখানে গিয়ে বিঁধেছে সেখানে রক্ত যেন ছিটকিয়ে বের হয়েছে! দেখে দেখে আমাদের চোখ আর ফেরে না। গ্রামের সবাই বললেন যে "পশ্চিমের বাড়ির পিরতিমা ছোট হৈল কি হইব দ্যাখতে সকলের থনে ভাল।" এই তিন বাড়ির ভূইঞাদের মধ্যে পশ্চিমের বাড়ির আমি একলা সেবারে গ্রামে উপস্থিত ছিলাম বলেই পশ্চিমের বাড়ির প্রতিমার প্রশংসা হলো কিনা জানি না।

তারপর মহালয়ার পরে বাবা এলেন কলকাতা থেকে। স্যোক আনন্দ আমাদের ভাই-বোনেদের। সবাই পেলাম নতুন জামা ও জুতা এবং আমি একটা বেশি পেলাম ছেলে বলে—লেজআলা জরি দিয়ে বাঁধা পাগড়ি বা টুপী। মেয়েরা ত' পাগড়ি পরে না তাই তারা পাগড়ি পেলা না। সেদিন রাত্রে যে নতুন জামা, জুতা ও পাগড়ি মাথার বালিশের কাছে রেখে শুয়েছিলাম তা এখনো মনে আছে। তারপর ষষ্ঠি পূজোর দিন সানাই, ঢোলা ও কাঁসর বেজে উঠল। আমাদের কাওয়ালী বাড়ির রাম-কানাই ভাইয়েরা ঢোলা বাজান একটা শোনবার মত জিনিষ ছিল। সে কি বাজনা —সে কি আস্ফালন! ঢোলের বোলগুলি যেন কথা বলে উঠছিল। আমি তন্ময় হয়ে শুনলাম সে বাজনা আর হাপুস নয়নে দেখলাম দেবী প্রতিমার দিকে। আমার শিশুমন অচিরে ভরে উঠল কানায় কানায় শারদোৎসবের আনন্দ-হেল্লোলে। পূজা-মণ্ডপের সামনেটা ভূইমালীরা আগেই চমৎকার করে চেঁছে গোবর দিয়ে লেপে দিয়েছিল। তাতে কত বর্ণের আলপনা দিলেন মেয়েরা। নৈবেদ্য সাজান হলো বড় বড় থালায়। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো এবং চারদিনব্যাপী দুর্গা পূজা সুরু হলো।

রোজ সন্ধ্যায় আরতি ও সন্ধ্যা-পূজার সময় ভিড় জমে যেত। মস্ত বড় পঞ্চপ্রদীপে বাতি জেবলে পুরোহিত ঠাকুর সেটিকে ডান হাতে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবং বাম হাতে পিতলের ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি আরম্ভ করলেই কাওয়ালী বাড়ির চুলীরা ঢোল বাজনা সুরু করে দিত। সে কি অপূর্ব ঢোল বাজান। পূজামণ্ডপের সামনে লোক গিজগিজ করত। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নরনারীরা এলেন পূজা দেখতে—চাঁড়াল, জোলা কেউই বাদ গেল না। দক্ষিণের ও পশ্চিমের বাড়িতে প্রত্যহ ছাগবলি হলো। কিন্তু মধ্যের বাড়িতে জীববলি কালীমোহন বন্ধ করে দেওয়ায় সেখানে আখ, চাল-কুমড়া ইত্যাদি বলি হতো। মহাষ্টমীর দিন সকালে শুনলাম সেদিন রাত্রে আমাদের পশ্চিমের বাড়িতে নরবলি হবে। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! কি সর্বনাশ! অথচ দেখবারও কৌতূহল। আমাদের বাড়ির পূজামণ্ডপের একটা জায়গায় দেখলাম পর্দা দিয়ে ঘেরা—কি যেন কাজ হচ্ছে। সন্ধ্যার পর রাত্রি যখন নামল এবং বাতি জ্বলল তখন ভীষণভাবে ঢোল ও কাঁসর বেজে উঠল। লোকে বলল যে নরবলি হচ্ছে। অচিরে পর্দার বেড়াটা সরিয়ে নেওয়া হলো এবং দেখলাম সেখানে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের ছিন্ন মাথাটা একখানা বড় মানকচু পাতার উপর—চারিদিকে সে কি রক্ত! অদূরে

উপুড় হয়ে আছে সেই লোকটার ধড়টা—তার গলা দিয়ে সেকি রক্ত বেয়ে পড়েছে আর একটা মানকচুর পাতার উপর। চেয়ে চোখ বুজে ফেললাম এবং মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তখন বুঝি নি। পরে শুনলাম এই নরবলির অভিনয় একটা মামুলী ব্যাপার। একটা বড় গর্তের মধ্যে একজন লোক বসে থাকে—তার মাথাটা মাটির উপরে থাকে। তার গলার চারিদিকে গোল করে কাটা কচু পাতা পেতে গর্তের মুখটা ঢেকে দেওয়া হয় এবং সেই লোকটির গলার উপর ময়দা না পিঠালীর প্রলেপ দিয়ে এবং লাল আলতা ছিটিয়ে দিয়ে এমনভাবে সাজান হয় যেন দূর থেকে মনে হয় সত্যি সত্যি একটা মাথা ধড় থেকে কচু পাতার উপর রেখে ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আর একজন লোক উপুড় হয়ে শুয়ে মাথাটা একটা গর্তের মধ্যে নিচু করে রাখে এবং তার গর্দানের উপর ময়দা না পিঠালী দিয়ে আর একটা গলা তৈরি করে কচু পাতার উপর রেখে তাতে আলতা ছিটিয়ে দেয়। তখন কিন্তু তা বুঝি নি। মনে হয়েছিল সত্যিই বুঝি একটা মানুষকে বলি দিয়ে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে বিজয়া দশমী এসে পড়ল। দিনগুলি যে কোথা দিয়ে গেল তা বোঝাই গেল না। যাই হোক সন্ধ্যার সময় তিন বাড়ির প্রতিমা নিজ নিজ বাড়ির পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হলো। তারপর শান্তিকলস ভরে নিয়ে তিন বাড়ির লোকেরা বাজনা বাজিয়ে নিজ নিজ পূজা-মণ্ডপে ফিরে গেলে সেই শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়া হলো সবাইয়ের মাথায়। তারপর সুরু হলো কোলাকুলির পালা। এই সব সেরে নতুন কাপড় পরে বাবার সঙ্গে চললাম বহরের পশ্চিমের খাল পার দিয়ে পদ্মা নদীর দিকে। কত লোক কত প্রতিমা জোড়া নৌকায় তুলে আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে পদ্মার স্রোতে। বহরের চৌধুরীদের লাঠিয়ালদের সে কি সড়কীর আস্ফালন! এ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোয় সড়কীগুলি ঝকঝক করে উঠছিল। মারামারি কিন্তু কিছু হলো না সেবার। তারপর অনেকবার ঘুরে ফিরে নৌকা জোড়াটা দু'দিকে বেয়ে নিয়ে যাওয়ায় মাঝখানে একটা বড় ফাঁক হয়ে প্রতিমা পদ্মার অতল জলে তলিয়ে গেল। আমরা খুব হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরের দিন স্নানের সময় দেখলাম মধ্যের বাড়ির পুকুরঘাটে বহু ছেলে-মেয়ের ভিড়। দেখলাম আগের দিন যেখানে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছিল সেখানে গোটা দুই তিন লম্বা বাঁশ জলের উপর উঠে রয়েছে। অনুসন্ধানে জানলাম যে প্রতিমা যাতে ভেসে না ওঠে সে জন্য প্রতিমার কাঠামোর মাঝখান দিয়ে বাঁশ মাটিতে শক্ত করে পুঁতে দিয়েছে এবং সেই পোঁতা বাঁশেরই মাথাগুলো জলের উপর উঠে রয়েছে। ছেলে-মেয়েরা সব মধ্যের বাড়ির পুকুরের বাঁধান ঘাট থেকে এক সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে দূরে পুকুরের মাঝখানের সেই বাঁশ ছুঁয়ে আবার ঘাটে ফিরবে। যে প্রথম ফিরবে তারই হবে জিত এই হচ্ছে খেলা। আমি শহুরে ছেলে। যদিচ ১৪৮নং রসা রোডের বাড়িতে দুটো প্রমাণ সাইজ পুকুর ছিল তবাচ আমি তখনো সাঁতার শিখি নি। সঙ্গীরা ডাকতে লাগল 'খোকা আয়।' যেতে পারছি না বলে লজ্জাও লাগছে অথচ যেতেও করছে ভয়। হঠাৎ দুজনে দুদিক থেকে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে ফেলল জলে এবং আমাকে বললে—'জল কাটা'। ওরা আমাকে একটু তুলে ধরেছিল। আমি ওদের মতই হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম। কয়েকবার খাবিও খেলাম। কিন্তু জলও ঢুকল পেটে কিন্তু গিয়ে পৌঁছলাম সেই বাঁশের কাছে। বাঁশ ধরে দম নিয়ে আবার ছেলেদের সঙ্গে ফিরে এলাম ঘাটে। দেখলাম যে সে এক মজার ব্যাপার। তারপর ভয় কেটে গিয়ে আমার নিজেরই উল্লাস হলো ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। দিন পাঁচ সাতের মধ্যে আমি শিখে গেলাম সাঁতার কাটা। একটা কাজের কাজ হয়ে গেল।

(৮)

তারপর ছোট ছোট পূজা হয়েই চলল। লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি। লক্ষ্মী পূজায় কোন বাড়িতে ছাগবলি হয় না। কিন্তু হয় আমাদের পশ্চিমের বাড়িতে। মা বললেন—'তরা শাক্ত কিনা তাই।' বুঝলাম না কিছু। লক্ষ্মী পূজার পর বাবা ফিরলেন কলকাতায়। তারপর আবার আমাদের স্কুল খুলল। পড়াশুনা সুরু হলো। হঠাৎ খবর এল যে সরকারী স্কুল ইন্সপেক্টর আসবেন আমাদের স্কুল দেখতে। সাজ সাজ রব উঠল। ইন্সপেক্টর আসা তখনকার দিনে ছিল একটা মহা ব্যাপার। তাঁর রিপোর্টের উপরে নির্ভর করবে স্কুলের ভবিষ্যৎ। রিপোর্ট খারাপ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে নামও কাটা যেতে পারে এবং যদি সরকারী সাহায্য বরাদ্দ থাকে তবে সে বরাদ্দ বাতিলও হয়ে যেতে পারে। আমাদের দস্তুরমত রিহার্সেল সুরু হলো। বলা হলো সেদিন ভাল কাপড় পরে স্কুলে আসতে হবে। ইন্সপেক্টর সাহেবকে নম্রভাবে কেমন করে নমস্কার করতে হবে, কি ধরণের প্রশ্ন হতে পারে এবং তার কি জবাব দিতে হবে তা' মহিম মাস্টার আমাদের সবই শিখিয়ে দিলেন। তারপর সেই ভয়াবহ দিনটি এসে পড়ল। সব বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে। তেলিরবাগের মাঝখান দিয়ে যে খাল গেছে পুবের দিকে সেই খালের পারেই মধ্যের বাড়ির বড় ফটক। সেই ফটক থেকে দোতলা বাড়ির নিচের বারান্দা পর্যন্ত চেছে-ছুলে সাফ করে লাল শালু পাতা হয়েছে। দু'ধারে বাঁশ কেটে মাটিতে পুঁতে দুই দিকের বাঁশের মাথায় যে গর্ত ছিল তার মধ্যে বাখারী ঢুকিয়ে খিলান বা আর্চ করাও হয়ে গেছে। বাঁশে ও আর্চে সবুজ পাতা জড়ান। আমরা ছেলেরা দুইধারে লাইন করে দাঁড়ালাম যখন ইন্সপেক্টর সাহেব এলেন। আমরা জোড় হাতে তাঁকে নমস্কার করলাম। লাল শালুর উপর দিয়ে তিনি ঢুকে যাবার পর কে একটি ছেলে একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে যেই না দিয়েছে হেলান অমনি সেই বাঁশের মাথার গর্ত থেকে ব্যাখারীটা ছিটকিয়ে গিয়ে লাগবি ত' লাগ আমারই কপালে ডান চোখের ভুরুর ঠিক উপর এসে লাগল। রক্তাক্ত হয়ে দোতলায় দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছে হাজির। বাড়িতেই ছিলেন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার অখিলবাবু। তিনি মলম দিয়ে যেন বেঁধে দিলেন। ফিরে গেলাম ক্লাশে। শেষ পর্যন্ত হায় ইন্সপেক্টর সাহেব আমাদের ক্লাশেই এলেন না। উপরের দুটো ক্লাশে গিয়ে হেডমাস্টার মশায় ও সুপারিনটেনডেন্ট মহিম মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে চলে গেলেন ভলযোগে সেরে। রিপোর্টটা শুনেছি ভালই হয়েছিল। যাক তাইতেই আমাদের সব আয়োজন সার্থক হয়ে গেল এবং অবসান হয়ে গেল হেডমাস্টার ও সুপারিনটেনডেন্ট মহিম মাস্টার মশায়দের সকল দুশ্চিন্তার। যাকে কথায় বলে সব ভাল যার শেষ ভাল।

ইন্সপেক্টর সাহেবের আসার কিছু পরেই হলো আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা। আমি এর আগে কখনো পরীক্ষাই দিই নি। মনে মনে ভয় যে করছিল না তা' বলতে পারি নে। আশ্বাস দিলেন নদি পণ্ডিত মশায়—'কোন ভয় নাইরে—তুই তইর‍্যা যাবি।' পরীক্ষা না দিয়েও উপায় নেই। কি করা যায়। দিলাম পরীক্ষা নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে ও ভয়ে ভয়ে। পণ্ডিত মশায়ের বাক্য কি মিথ্যে হয়? আমি সত্যি সত্যিই তরে গেলাম। সেইবারই গুজব উঠেছিল যে মোহিনীদাদার ছেলে রতিরঞ্জন বুঝি বা আটকে যায়। মোহিনীদাদার মা, আমাদের জ্যেঠিমা, হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আমাদের বাবা ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী। তিনি যখন বড়দিনের বন্ধে তেলিরবাগ এলেন তখন

জ্যোঠিমা কালক্ষেপ না করে বাবা আসা মাত্র নালিশ রুজু করলেন—'সতীশের ইস্কুলে আমার রইত্যা পরমোশন পাইব না—এত বড় কথা কয় হ্যাডমাস্টর। তুমি এর একটা বিহিত না করলে ভাল হৈব না কইয়া থুইলাম।' অর্থাৎ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে সেক্রেটারীর সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক না হলে প্রয়োজনবোধে সেক্রেটারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আপিল যেতে পারে আরো উপরআলাদের কাছে। বাবা খালি বললেন—'আইচ্ছা, দেখুম অনে'। দেখা গেল যে গুজবটা সত্য নয়। তবে ব্যাপারটা রতিরঞ্জনের কানের কাছ ঘেঁসেই গেছে। সব ভাল যার শেষ ভাল। রতিরঞ্জন যথারীতি প্রমোশন পেলেন এবং সে যাত্রায় বেঁচে গেল বেচারী হেডমাস্টার মশায়ের চাকরিটা। সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে কাজেই আপিলের আর প্রয়োজন হলো না। যতদূর মনে আছে সিকদার বাড়ির মহিম জ্যোঠার বড় ছেলে আমাদের জগাদা ও গোঁসাই পুজার রামমণি ঠাকুরের একমাত্র পুত্র চন্দ্রকুমারদা সেবার যে ক্লাসে ছিলেন সেইখানেই রয়ে গেলেন। তাঁদের দু'জনের কারুরই ঠাকুমা তখন বেঁচে নেই এত বড় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে তাঁরা নিজ নিজ অদৃষ্টকে যথেষ্টই ধিক্কার দিয়েছিলেন।

[ক্রমশঃ]

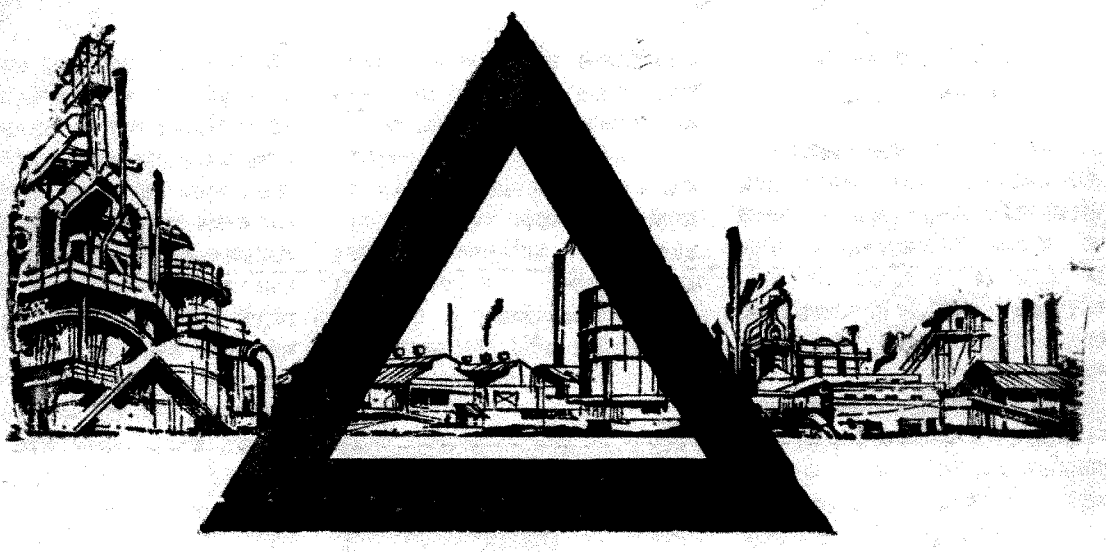

জামশেদপুরে কাজের একটি দিক হল নিরাপত্তা

কলকারখানায় শতকরা পঁচাত্তরটি দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায় কারণ, দেখা গেছে, কর্মীদের অসাবধানে ঝুঁকি নেওয়ার ফলেই বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে। তাই টাটা স্টীলে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত, প্রত্যেক কর্মীকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিয়মিত তালিম দিয়ে নেওয়া হয়।

ইস্পাত কারখানায় ঢোকার পর প্রথমে যা শিখতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিরাপত্তার বুনিয়াদি শিক্ষা। শুরু থেকে একের পর এক কতকগুলো পর্যায়ে তালিম দিয়ে হাতে-কলমে ঝালিয়ে নেওয়া হয়। নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো এবং সেই সঙ্গে সেফটি কমিটির ঝানু লোকেদের হুঁশিয়ার দৃষ্টি এই সব মিলিয়ে দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ সম্ভব হয়, কর্মীরা নিরাপদে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বাঁধা রুটিনে পড়াশুনো, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা এ সবেরও ঘন ঘন বন্দোবস্ত করা হয় যাতে বিপদ এড়িয়ে কাজ করা কর্মীদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের হিসেব একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ সব প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে। টাটার কারখানায় দুর্ঘটনার হার গড়ে প্রতিমাসে ২৪৯ থেকে ৬৪তে নেমে এসেছে। আর ১৯৬৬ সালের ১লা জুন থেকে ১৪ই জুনের হিসেব দেখলে তাজ্জব হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই —এই ক'দিনে চব্বিশ লক্ষ শ্রমঘণ্টা কাজ হয়েছে অথচ একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। নিরাপত্তায় টাটা স্টীল ভারতের ভারী শিল্পে একটি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

জামশেদপুরে কাজের একটা দিক হল নিরাপত্তা —এখানে শিল্প শুধু জীবিকা নয়, জীবনের অঙ্গ।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

EN 36174

আমার চাঁদের বন্ধুরা

পরিমল গোস্বামী

(১৮) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

(১৮৮৩—১৯৬১)

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর (১৯৩২-৩৩) আগে চারুচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। কিন্তু কোথায় কি উপলক্ষে তা আর এখন আমার মনে পড়ে না। কারণ সে পরিচয় মৌখিক পরিচয়, এবং ধারাবাহিকতাও ছিল না। ধারাবাহিকতা রাখতে পারলে স্মৃতিরও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

প্রথম পরিচয়ে তাঁকে 'বেপরোয়া' দলের মানুষ বলে মনে হয় নি। বেপরোয়া নামক অসাময়িক (আসলে সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী অর্থে) পত্রিকাখানি ১৯২২-২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই দলের প্রধান পুরোহিত ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯২৫ সালে। 'বেপরোয়া' অবশ্য আগেই পড়া ছিল, কিছু এবং তখন থেকেই তার কার্টুন ছবি ও ব্যঙ্গকবিতার অংশবিশেষ মনে গাঁথা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে চারুচন্দ্রের স্থান কোথায় তা আমার জানা ছিল না। তাঁকে তখন ফিজিক্স্-এর অধ্যাপকরূপেই জানা ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সাহিত্যরসের আকর্ষণ কোন সূত্রে তা তখন বুঝতে পারি নি, বুঝতে চেষ্টাও করি নি। কিন্তু বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ডাক্তার অথচ সাহিত্যিক অথবা শিল্পী কেন, এ প্রশ্ন কিন্তু মনে আদৌ জাগে নি, কারণ তিনি কতখানি ডাক্তার তা দেখবার অবসর তিনি দেন নি, কারণ তিনি ব্যঙ্গসাহিত্য ও চিত্র রচয়িতারূপে অতি প্রবলভাবে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন।

চারুচন্দ্রের স্বভাববৈশিষ্ট্য পরে যা দেখলাম, তাতে বোঝা গেল, তাঁর পক্ষে কোথাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। মোটামুটিভাবে নেপথ্যে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব।

কিন্তু তাই বলে পথ্যে নয়।

পথ্যে তাঁর যে দুঃসাহস ছিল, তাতে তিনি প্রাচীনকালের বাঙালী ভোজনবীরদের সঙ্গে প্রায় সমান আসন দাবি করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এ সব স্বভাববৈশিষ্ট্য প্রথম দিকে সামগ্রিকভাবে আমার অজানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটি আচরণে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই।

ঘটনাটি বাইরের দৃষ্টিতে সাধারণ, সাধারণ তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়েই মানুষের আসল পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সাল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় হয়ে এসেছে। একদিন সকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল একটি রোল নম্বর নিয়ে। তিনি ছিলেন তখন ট্যাবুলেটর। তিনি

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ফটো : হিমানীশ গোস্বামী (১৯৬০)

আমার ঠিকানা রেখে দিয়ে অপরাহ্ণে এক ভদ্রলোক মারফত আমাকে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তখন একই পথের বাসিন্দা। যাঁকে আগে ফলাফল জানানো বিষয়ে সকালে কড়া কল্পনা করেছিলাম, তাঁরই এক দূত অপরাহ্ণে আমার দরজার কড়া নেড়ে জানিয়ে দিলেন আমার ধারণা ভুল। সেই থেকে তাঁকে আর ভুলি নি।

একটি স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর ব্যবহারে। তাঁর হাসিটি ছিল তাপহীন আলোর মতো। এই সহজ মানুষটির সঙ্গে পরে অল্পদিনের জন্য কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠন উপলক্ষে। অল্পদিনের জন্য বলছি, কারণ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ সময় দিলে আমার মনে একটা তৃপ্তি হত, তা দেওয়া সম্ভব হয় নি বলে, এবং অন্যান্য নানা কারণে আমাকে পরিষদ ছেড়ে আসতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম পরিষদের উদ্দেশ্য যখন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার, তা বাইরে থেকেই করা যাবে। করেছিলাম যথাসাধ্য, এবং এখনও করি—কিন্তু পরিষদ এবং আমি এ বিষয়ে সমান অসহায়। পরিষদ তবু তো তার সীমাবদ্ধ কাজে আত্মতৃপ্ত, আমার কাজের সীমা নির্দিষ্ট না হলেও সক্রিয় বাধা সাধারণ সাময়িক পত্রিকাদি থেকে আসে। সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হয়। বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার সম্ভব যাতে না হয়, তারই জন্য বাইরের এই আয়োজন অতি শক্তিশালী। চারুচন্দ্র জীবিত থাকলে সম্ভবত লড়াইয়ে কিছু জোর পাওয়া যেত। তবে রাজশেখর বসু হেরে গিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বলবার আর কেউ জীবিত নেই এখন।

চারুচন্দ্রের সঙ্গে পরে বিশ্বভারতী অফিসে মাঝে মাঝে দেখা হত। তিনি সেখানে যেতেন তাঁর নিজস্ব অধিকার বলে। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। আমি যেতাম পুলিনবিহারী সেনের কাছে, নানা উপলক্ষে, কখনো বিনা উপলক্ষে।

আমি প্রবেশিকা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষক থাকাকালে (পুলিনবাবু ছিলেন প্রথম পত্রের পরীক্ষক) পরীক্ষার খাতা থেকে কিছু কিছু উদ্ভট উত্তর টুকে রাখতাম, এবং তা নিয়ে পরে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছি এবং নানা পত্রিকায় তা ছাপাও হয়েছে। চারুচন্দ্র পেপার-সেটার বা প্রশ্নপত্র রচয়িতা ছিলেন। তিনিও ছেলেদের উত্তরপত্র থেকে কয়েকটি "হাউলার" টুকে রেখে পুলিনবাবুর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেই "হাউলার"-গুলিও আমি আমার প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। প্রবন্ধটি আমার 'সপ্তপঞ্চ' (মিত্র অ্যান্ড ঘোষ) বইতে আছে। কৌতুককর ব্যাপারে চারুচন্দ্র

সমাজের কৌতুককেন্দ্র কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠত, এ থেকেও তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমি সেই সব নমুনা পুনরুদ্ধৃত করছি—তিনি লিখছেন,

"এবার ম্যাট্রিকের সায়েন্সে আমারই একটি প্রশ্ন ছিল—মানবদেহে রক্ত চলাচলের রীতি বর্ণনা কর— Describe the circulation of blood in the human body. একটি ছেলে এর উত্তরটা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু শেষে লিখেছে—কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িক যে অত্যাচার চলছে তাতে আমাদের রক্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত চলছে, ইচ্ছে হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে বেরোই। আর আমি থাকতে পারছি না, আমি এক কবিতা লিখি—

"এর পর তিন পাতা কবিতা চলল। শেষে লিখেছে কবিতাটি আমি এখানেই মাটি করলুম। কি রকম হয়েছে, সার?"

চারুবাবু সংস্কৃত ও ইংরেজী উত্তর-পত্র থেকেও কিছু নমুনা ঐ সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কয়েকটা উপহার দিচ্ছি;

অনুবাদ সংস্কৃত থেকে—"বাতেন উদরং পূরয়িত্বা—filling the belly with gout." [বাত বায়ু অর্থে, বুঝতে পারে নি।]

বাংলা থেকে ইংরেজী—"এক শৃগাল এক দ্রাক্ষাস্তবক—A jackal seeing a heron in grapes." [দ্রাক্ষাস্থ বক ভেবেছে।]

বাংলা প্রথম পত্র থেকে—"রামের সুমতি গল্পে লিখছে: 'রাম অনেকবার সুমতির পরিচয় দিয়েছে। দশরথ যখন তাকে বনে যেতে বলল সে কোনো প্রতিবাদ না ক'রে গেল।' ইত্যাদি।"

বাইরে বাইরে স্থিরাচারী ব্যক্তিটি অন্তরে অন্তরে পুরো রসিক ছিলেন। কিন্তু শুধু সাহিত্যরসিক ছিলেন তাই নয়, ভোজনরসিকও ছিলেন। এবং বাইরে বাইরে প্রচার ছিল তিনি gourmet, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিলেন gourmand। 'গুরমে' প্রকৃত ভোজনরসিক, কিন্তু 'গুরমাঁ' একমাত্র অগ্নিদেবের সঙ্গে তুলনীয়। দৃষ্টান্ত অবশ্যই দেব। আমি প্রথম তাঁর এই বিলাস লক্ষ করি ৭২ বকুলবাগান রোডে। ১৯৬০ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে আমি এই চিঠিখানা পাই—লেখক রাজশেখর বসু।

"প্রীতিভাজনেষু...আগামী শুক্রবার ২২ জানুয়ারি বিকালে আন্দাজ পৌনে চারটের সময় আপনার কাছে গাড়ি যাবে। চারুবাবু থাকবেন।"...

এই ২২ জানুয়ারি (১৯৬০) যা যা ঘটেছিল তার একটি বর্ণনা লিখেছিলাম এবং চারুচন্দ্র তাঁর সম্পাদনাকালে তা বসুধারায় (১৩৬৭, বৈশাখ সংখ্যা) ছেপেছিলেন। তার থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করি—

"উৎকৃষ্ট সব খাবার এসে গেল। তখন চারুচন্দ্র একটু যেন মাত্রাতিরিক্তরূপে সবাক হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। নিজে থেকেই বয়সের কথা তুলে বললেন, আমি ৭৭, যতীন্দ্রকুমার [সেন] ৭৮, আর রাজশেখর ৮০। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি শিশু—শিশু!...

"চারুচন্দ্র আরও বললেন, তাঁর ৭৭ বছর বয়সেও সবগুলো দাঁত স্বস্থানে আছে, একটিও স্খলিত হয় নি। শুনে সে সময় একটি কথাও বলতে পারলাম না, কেন না আমার দুপাশের দুটি দাঁত নেই। সুতরাং নীরবে, তিনি ৩২টি দাঁতে এবং আমি ৩০টি দাঁতে সম্মুখস্থ খাদ্য-বস্তু নিষ্পেষিত করতে লাগলাম।"

খুব বড় কচুরি এবং সিঙাড়া প্রতি প্লেটে বোধ হয় ৮টি বা ১০টি করে ছিল। তার উপর ছিল কয়েকটি করে বড় বড় সন্দেশ। চারুচন্দ্র অবলীলাক্রমে সেগুলি সাবাড় করলেন। মনে পড়ছে, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনও প্লেট শূন্য করে ফেলেছিলেন। আমি শুধু দুখানা সিঙাড়া ও কচুরির বেশি খেতে পারি নি, মিষ্টি একেবারেই খাই নি। আমাকে এই কারণেই শিশু বলেছিলেন, নিজের হজমশক্তির পক্ষ সমর্থনে।

কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস রাজ-শেখরের বাড়িতে বসে এই খাওয়া তাঁর লুকিয়ে খাওয়া, বাড়িতে এ খাওয়া চলত না। কারণ এটি ঘটেছিল ১৯৬০ সালে, কিন্তু তিনি এর নয় বৎসর আগে লিখে-ছিলেন, "আজ প'য়ত্রিশটা লেডিকেনি-খাওয়া চারু ভট্‌চাজ পারের ঘাটে এসে পৌঁছেছে এখন তার রাত্তিরের খাওয়া হল দুখানা রুটি।"

অবশ্য এটুকু পড়ে বোঝা যায় না যে তিনি বাইরে নানাস্থানে নানা অখাদ্য (তাঁর বয়সের পক্ষে) খেয়ে এসে রাত্রে দুখানা রুটি খেতেন কি না। কিন্তু প'য়ত্রিশটা লেডিকেনি খাওয়ার ব্যাপারটা খুব মজার। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—

"আমি ছিলুম আমাদের বংশের কুলাঙ্গার, তবু আমার কীর্তিকাহিনী উল্লেখ করি। তখন সবে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। সাতই পৌষের উৎসবে আমরা সব গিয়েছি। দুপুরবেলা একসঙ্গে খেতে বসা হয়েছে। শেষে মিষ্টি এল, লেডিকেনি ও দরবেশ। আমার ঠিক পাশে বসেছিলেন শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ। খাইয়ে বলে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। বললুম, জ্যোতিষবাবু, আসুন, মিষ্টিতে কম্পিটি-শন লাগান যাক। জ্যোতিষবাবু তখনই আমার চ্যালেঞ্জ আক্‌সেপ্ট করলেন। হয় লেডিকেনি, না হয় দরবেশ, একটা ওঁর পাতে একটা আমার পাতে, এই রকম চলতে লাগল। চৌত্রিশটায় যখন দাঁড়াল তখন বুঝলুম একটু কষ্ট হচ্ছে। জ্যোতিষ-বাবুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর চোখ দুটো ঠেলে বেরবার জো হয়েছে। তাঁকে দিতে গেলে তিনি বললেন, আর না। আমি বললুম,—আর একটা। জয়মাল্য আমার গলাতেই এসে পড়ল, কিন্তু আমার অহংকার স্থায়ী হল না। পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি, তিনি বললেন,

'চারুবাবু, আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে কায়স্থ জ্যোতিষ ঘোষের কাছে খাওয়ায় হেরে গেলেন।'

'না, আমিই জিতেছি, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন।'

'না, আপনার হার হয়েছে।'

'কি করে হল, আমি প'য়ত্রিশটা খেয়েছি, আর জ্যোতিষবাবু খেয়েছেন চৌত্রিশটা।'

'আপনারই হার হয়েছে। তবে শুনুন। রাত্তির আটটার সময় যখন শুতে যাব, তখন একটু অস্বস্তি বোধ করলুম, আপনারা দুজনে কে কেমন আছেন। একজনকে বললুম, একবার যা তো গেস্ট-হাউসে, চারুবাবু ও জ্যোতিষবাবু কি করছেন দেখে আয়। কোনো কথা জিজ্ঞেস করিসনে, শুধু দূর থেকে তাঁদের দেখে ফিরে আসবি। সে এসে বলল, ওঁরা সকলে গল্প করছিলেন, এমন সময় রাত্তিরের খাবারের ডাক এল। চারুবাবু বললেন—আমি খাব না শুতে যাই, জ্যোতিষবাবু খেতে গেলেন। বলুন, হার হল কার?'"

বিশ্বভারতী সবে স্থাপিত হয়েছে, তা হলে ধরতে হবে সেটি ১৯২০-২১ সাল। অতএব তখন চারুবাবুর বয়স প্রায় ৩৮ বছর। এই ৩৮ বছরে অন্যান্য খাওয়ার শেষে ৩৫টি মিষ্টান্ন ভক্ষণ উল্লেখযোগ্য অবশ্যই, এবং আমি তাঁর ৭৭ বছর বয়সে খুব বড় আকারের কচুরি সিঙাড়া মিলিয়ে গোটাদশেক এবং তৎসহ বড় বড় দুটি সন্দেশ ভক্ষণ দেখে তাঁর এই অবনতিতে দুঃখ পেয়েছিলাম কি না মনে নেই. তবে তিনি আহার ব্যাপারে সে সময় আমাকে শিশু বলাতে আমি যে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শান্তিনিকেতনে জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে ভোজন প্রতিযোগিতার কথাগুলি তাঁর "খাদ্য জিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ (শারদীয় যুগান্তর ১৩৫৮) থেকে উদ্ধৃত। এই প্রবন্ধটি আমিই তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিলাম। এতে তিনি একই সঙ্গে ভোজন-রসকথা, সাহিত্য পর্যায়ের রসিকতা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিরাপদ

বিধিভঙ্গের কথা আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিধি অমান্য করেই অনেকে বেশি স্বাস্থ্য লাভ করেছেন, কিংবা অনেকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছুই না জেনে আজীবন সুস্থ থেকেছেন, এসব প্রসঙ্গে, তিনি স্বয়ং বিজ্ঞানসেবী হওয়া সত্ত্বেও, মুক্ত মনে যুক্তি-সঙ্গতভাবে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন, যে জন্য এই রচনাটি বহু দিক দিয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। সব চেয়ে মন ভোলে তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে। আরও সামান্য একটুখানি নমুনা দিতে লোভ হচ্ছে—(প্রায় গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি—)

"অনেক দিন আগেকার কথা। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সবে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছেন। তখনও ভাইটামিন আবিষ্কৃত হয় নি অথচ আমরা বেশ সুস্থ সবল আছি। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ খাদ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন। প্রত্যেকের প্রত্যহ এতটা পরিমাণ ক্যালরি খেতে হবে, খাদ্যে এই পরিমাণ শর্করাজাতীয়, এই পরিমাণ চর্বিজাতীয় জিনিস চাই, এতটা পরিমাণ প্রোটিন পেটের মধ্যে চালান করতে হবে—এই সব বলে যাচ্ছেন।...তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওই সব নতুন তথ্য শুনে চলেছি, আর কথাগুলো মগজের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছি। কি আশ্চর্য! এ সব কিছুই জানতুম না, অথচ বেঁচে রয়েছি। যা হোক, কাল থেকে ঠিক ওই হিসেবে খেতে হবে। হাতের পেশীটা টিপলুম...! অধ্যাপক মশায় তাঁর বক্তৃতার শেষে বললেন—আমি এতক্ষণ যা বললুম, তা একজন সাধারণ লোকের পক্ষে খাটে, কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলর সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর সিকি পরিমাণ খেয়ে সুস্থ ও সবল আছেন, আর বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর এর চারগুণ খান, তাঁর শরীরও বেশ ভাল।

ও হরি, এর নাম কিছু কিছু ব্যতিক্রম! একশ'র জায়গায় এক দিকে পঁচিশ আর অন্য দিকে চারশ'। এই রকম যার ব্যতিক্রম তাকে বিজ্ঞান বলতে হবে! সব উৎসাহ চলে গেল, এখন ব্যতিক্রম খুঁজতে লাগলুম। বেশি দূর যেতে হল না, বাড়িতেই মিলল। আমার জাঠতুতো দাদা আমার চেয়ে ছ' বছরের বড় ছিলেন। দুজনে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগছি, শেষে দার্জিলিং গেলুম। দুই জংবিলি স্যানিটেরিয়মে থাকি। কয়েক দিনের মধ্যে দাদার শরীরের কি রকম উন্নতি হল বলছি। শেষের দিকে রাত্তিরের খাওয়ায় রুটির সংখ্যা ছাপ্পান্নতে উঠল, উপযুক্ত পরিমাণ তরকারি, মাংসটা নিতে হত স্পেশাল। খাওয়া দেখবার জন্য চারদিকে ভিড় জমে যেত। একদিন জিজ্ঞেস করলুম, আর পার? বললেন, কি জানি, রুটি কি না, চোয়াল ব্যথা করে যে!"

এর পর আশ্চর্য সব ব্যতিক্রম-কথা দিয়ে সাজানো হয়েছে তাঁর এই রচনাটি। রচনা রসনা-বিষয়ক বলেই এতে তিনি এতটা রসসিঞ্চন করতে পেরেছেন। নিজ নিজ প্রিয়বস্তুই তো কাব্যের প্রেরণা। এই দীর্ঘ রসসমৃদ্ধ রচনাটির শেষে চারুচন্দ্র আর এক ভোজনরসিককে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। এই সাক্ষী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি দিয়ে তাঁর রচনা শেষ করেছেন সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাই আমিও সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর।

দেহের তামসিকতা ছি ছি মাংস হাড় পেশি,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফতা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথাধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,
পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে,—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলংকৃত।

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক,
এদেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণ ভয়
গোঁড়জনে করেছে জয়
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

লঙ্কা আনো, শর্ষে আনো,
শস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘন্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো—তাহার পরে মৃত।

এই স্বপক্ষ-সমর্থনী সাক্ষীটি চারুচন্দ্র 'প্রহাসিনী' বই থেকে তুলে দিয়েছেন, মাঝখানের দুটি স্তবক বাদ দিয়ে।

তাঁর খাদ্যাভিজ্ঞাসা প্রবন্ধটিতে 'ব্যতিক্রম' কাহিনীগুলি চমকপ্রদ। চারুচন্দ্রের মামার পিতা, মফঃসল থেকে পনেরো মাইল হেঁটে কলকাতা এলেন, পাঁচ থালা ভাত খেয়ে। রওনা হবার আগে একথালা ও কলকাতা দুদিন থেকে সেখানকার জল-স্পর্শ করবেন না, সেই হিসাবে চারথালা। খাদ্যবিজ্ঞান তা হলে কার পক্ষে সত্য?

বিজ্ঞানী চারুচন্দ্র খাদ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থাপত্রকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু আমি এ প্রবন্ধটি নিয়ে এতটা বেশি আলোচনা করছি অনেকগুলো কারণে। প্রথমত এর ভিতর দিয়ে চারুচন্দ্রের চরিত্রের কয়েকটি দিক খুব স্বচ্ছভাবে দেখা যাবে। তিনি নিজে অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় ছিলেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাঁর এই রচনা আপাত-দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিরোধী মনে হলেও তিনি অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলেছেন, অর্থাৎ গড় মানুষের জন্য যে ব্যবস্থা, অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে গড় মানুষের বাইরে বাস করেন (আসলে গড় মানুষ কল্পিত মানুষ, সংসারে তার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ)। কিন্তু তার পরের কথা হচ্ছে, এবং (যা আমার নিজের বিশ্বাস) তিনি ভোজন বিষয়ে 'গুরুমা'-ধর্মী ছিলেন বলেই ঐ সব স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থা উল্টিয়ে দিয়ে, যাকে বলে 'প্র্যাগম্যাটিক' দৃষ্টিভঙ্গি, তারই সাহায্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানকে বিচার করেছেন, এবং এমন সব দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন, যাতে তাঁর নিজের আহার বিষয়ে রুচি সমর্থিত হয়। কিন্তু মূলে এর প্রেরণা যাই থাক না কেন, সরস রচনায় (এবং সরল ভাষার রচনায়) তিনি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এটি তার একটি বড় প্রমাণ।

এর আগে পরীক্ষার খাতা থেকে 'হাউলার' সংগ্রহে দেখেছি তাঁর কৌতুক-প্রিয়তা। এই রচনার মধ্যে দেখলাম তাঁর রসসৃষ্টির ক্ষমতা। অতঃপর 'বেপরোয়া' নামক পত্রিকায় দেখব তাঁর ব্যঙ্গনিপুণতা।

'বেপরোয়া' নামটি বড় ভয়ানক। চারুচন্দ্র নিজে আহার ভিন্ন অন্য বিষয়ে বেপরোয়া ছিলেন না। তাঁদের দলের প্রধান এবং প্রকৃত বেপরোয়া ছিলেন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। বনবিহারীবাবু চারুবাবুর চেয়ে এক বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু ব্যঙ্গপ্রষ্টা বনবিহারীবাবুর সঙ্গে চারুচন্দ্র ব্যঙ্গসাহিত্যের টানেই এসে মিলেছিলেন। বনবিহারী ছিলেন প্রভঞ্জনের মতো। যেমন ধারালো চেহারা তেমনি সর্বজাতীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাঁর ধারালো ব্যঙ্গ-অস্ত্রখানা

সদা-উদ্যত। চারুচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল মনের দিক থেকে, আচরণের দিক থেকে নয়। চারুচন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন।

বেপরোয়া কাগজখানা অনিয়মিত তিন সংখ্যা বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমাজের উপর এমন কঠিন আক্রমণ সে সময়ে অবশ্যই জনপ্রিয় হতে পারে নি। কালটা ১৯২৩, আজ থেকে ৪৪ বছর আগে। কাগজখানা বেশি দিন চললে চারু-চন্দ্রের হাতের ব্যঙ্গসাহিত্যও সম্ভবত আরও বেশি পাওয়া যেত। আমার হাতে মাত্র একখানা বেপরোয়ায় তাঁর একটি মাত্র ব্যঙ্গ রচনার নমুনা আছে। তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করি—

ইলেকট্রিসিটি

স্বর্ণ।—ভারতধর্মমহামণ্ডল কর্তৃক পরিচালিত একখানি কাগজে দেখা গেল যে "স্বর্ণের ভিতর এক প্রকার তড়িৎ আছে যাহা দেহের সহিত মিশ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকে অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তোলে।" এই জন্যই বিধবার স্বর্ণালঙ্কার বর্জনীয় এবং বিধবা ব্যতীত অন্য সকল স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত রাখা উচিত—তা তাঁহাদের বয়স ৫ মাসই হউক কি ১০৫ বৎসরই হউক।

লৌহ।—লৌহনির্গত তড়িৎ স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে। হস্তস্থিত লৌহবলয় নারীকে স্বামী-সোহাগিনী করে তাই সধবা স্ত্রীলোককে হাতে লৌহ ধারণ করিতে হয়। পূর্বে স্বর্ণের গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাই আজকাল শুধু লৌহ তাঁহারা পরেন না, উহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন। পুরুষের হস্তস্থিত লৌহবলয় মস্তিষ্ক শীতল করিয়া তাহাকে ধীর শান্ত করে, যথা, কালীমাতার বালা বা দারোগা সাহেবের বালা। এইরূপে দেখা যায় বিভিন্ন ধাতু-নির্গত বিভিন্ন তড়িৎ আপনার বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া মানবদেহের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। চতুর মানব অষ্টধাতুর আঙটিতে সব গুণগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া লয়েন।

"আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ। এই দেহস্থিত তড়িৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিশ্চয়ই ল' অভ রিপালশন অনুসারে মস্তক ও পদ, শরীরের এই দুই প্রান্তে চালিত হয়। পদসংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে মস্তকস্থ তড়িৎ। এই তড়িৎকে যদি অল্প-পরিসর স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায় তো ঐ তড়িতের পোটেন্‌শিয়াল খুব বেশি হওয়ায় উহার কার্যকারী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ শাস্ত্রে

"বেপরোয়া" গ্রুপ ফোটো
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসী ভট্টাচার্য, বিরূপ দ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বনবিহারী মুখোপা ধ্যায়।

বাৎপন্ন আর্যগণ একথা জানিতেন, তাই তাঁহারা রাখিলেন টিকি। সমস্ত তড়িৎ টিকিতে সংহত হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি ঊর্ধ্বে ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতে থাকে তো তড়িৎ পয়েন্ট দিয়া আকাশে লীক করিয়া যাইবে, তাই তাঁহারা টিকিতে ফাঁস দিয়া তাহার ডগাটি মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। ফলে শিখায় নিবদ্ধ সমস্ত তড়িৎ প্রাণন শক্তিমূলক মেডালা অবলংগাটা, স্পাইন্যাল কর্ডের উপরি-ভাগ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর, নিঃশেষে ব্যয়িত হইল—সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠিল। কিন্তু পদদেশে চালিত তড়িৎ তো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাঁহারা বসিবার আসন করিলেন সব নন-কন্‌ডাক্টর— মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, প্রভৃতি। কিছুই নষ্ট হইতে পারিল না।...

"টেলিগ্রাফি প্রভৃতি লইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গর্বের আর অবধি নাই। তাঁহারা মনে করেন তড়িৎকে তাঁহারাই বশে আনিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি অনাদিকাল হইতে এই ভারতবর্ষে টেলি-গ্রাফির প্রচলন ছিল না? এই সেদিন যশোহর জেলার এক স্থান খনন করিতে করিতে এক পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকায় খানিকটা ছিন্ন তার পাওয়া গেল। ইহা হইতেই ত বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রাচীন যুগেও আর্যগণ টেলিগ্রাফি জানিতেন। এবং আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, ঢাকা জেলায় সেইরূপ একটি ভগ্ন অট্টালিকায় তারটার কিছুই পাওয়া যায় নাই। সুতরাং স্থির হইতেছে যে, হের্ট্‌স্‌, জগদীশ বোস, মারকনির বহু পূর্বেও এদেশে অয়ারলেস টেলিগ্রাফির সাহায্যে আর্যাবর্তের দিগ্‌দিগন্তে

সংবাদাদি প্রেরিত হইত।" (বেপরোয়া, চৈত্র, ১৩২৯)

ইলেকট্রিসিটি নিয়ে সে যুগে আমাদের দেশে খুবই উত্তেজনা। এ বস্তু যে আমাদেরই আবিষ্কার একথা প্রমাণের অনেক চেষ্টা হয়েছে তখন। এবং আমাদের অনেক প্রথাকেও বিদ্যুতের সংগে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ নিজে এর অনেক আগে এ সব বিষয়ে ব্যংগ রচনা করেছেন। তাঁর ম্যাগনেটিজ্‌ম ও গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি বিষয়ক ব্যংগ রচনাগুলি দ্রষ্টব্য।)

রসবোধ, রসনা ও রসসৃষ্টির দিক-গুলির পরিচয় পাওয়া গেল, এ ভিন্ন চারুচন্দ্রের চরিত্রের আর একটা দিক আছে, সেটি তাঁর রস-বিশ্লেষণের দিক। অনেকেই জানেন না যে চারুচন্দ্র অভিনয় শিল্প-প্রিয় ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা অতুলনীয়। কলকাতার থিয়েটার তিনি প্রায় গোড়া থেকেই নিয়মিত দেখেছেন, এবং মনে হয় কোনো একটি অভিনয়ও তিনি তাঁর তালিকা থেকে বাদ দেন নি। এবং তারই ফলে তিনি নটনটী ও নাট্য বিষয়ে অতি সুন্দর একখানা বই লিখে-ছেন। বইখানা ছদ্মনামে লেখা। আমি আগেই বলেছি তিনি নেপথ্যে থাকাটাই পছন্দ করতেন। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তিনি আত্মপ্রকাশে প্রবল আগ্রহী ছিলেন না, এবং তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের মতো দুর্দান্তও ছিলেন না। নাটকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু নাটকীয়তাপ্রিয় ছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধু শিশিরকুমার ভাদুড়ির‌ও সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর সূত্রধার ছদ্মনামে লেখা "অথ নট ঘটিত" (বসুধারা প্রকাশনী) বইতে একস্থানে, আর্ভিঙের অভিনয়ে অসংযত আতিশয্য দেখে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের উদ্ধৃতি সহ নিজে বলছেন, "অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলি, শিশিরকুমারের চাণক্যে এই 'অসংযত আতিশয্য' বেশ কিছুটা ছিল।"

(এই প্রসংগে একটা কথা অবান্তর বোধ হলেও বলি—আমি ১৯২৪ কিংবা ২৫ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে চন্দ্রগুপ্তের একটি বাছাই করা দৃশ্য অন্যান্য প্রোগ্রামের সংগে অভিনীত হতে দেখেছিলাম। তাতে চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার সম্পূর্ণ নতুন ভংগিতে অভিনয় করেছিলেন। কন্যা প্রাপ্তি দৃশ্যে সেদিন দেখলাম, মনের ভিতর যে বিচিত্র ভাবের খেলা চলছে, তা যেন মর্ম ভেদ করে বেরোচ্ছে চাপা কণ্ঠে। চিৎকার নয়, অস্থিরতাজনিত অংগভংগ বা লম্ফঝম্ফ নয়, একটা যেন ভাষাহীন অস্ফুট ধ্বনি শোনা যাচ্ছে কণ্ঠ থেকে। স্টেজে তাঁর চাণক্য দেখার পর এ অভিনয় আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। এর পরেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি করে এটা সম্ভব হল। তিনি হেসে বলেছিলেন, নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখি, সব সময় আরও ভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার নিজের মনে হয় এতখানি সূক্ষ্ম-ভাবের খেলা জনপ্রিয় হবে না ভেবেই তিনি ঐ দৃশ্যে অন্যভাবে অভিনয় করতেন, তাতে আতিশয্য ছিল অবশ্যই। কিন্তু তাও তো অতুলনীয় রূপেই দর্শকমনে গাঁথা হয়ে আছে।)

কিন্তু চারুচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। তিনি "প্রফুল্ল" নাটক সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা তাঁর এই বিশ্লেষণ ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি লিখছেন—

"রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লকে নিয়ে নাটকটি গড়ে ওঠে নি, সুতরাং নামটি নিরর্থক। রমেশ শিক্ষিত, সে অপুত্রক, একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে সে মেরে ফেলতে উদ্যত। হঠাৎ কোনো উত্তেজনাবশে নয়, ধীরে ধীরে স্ত্রীকে মেরে ফেলল। এ চরিত্র অস্বাভাবিক। কাঙালীচরণ মানুষ-দানব নয়, শুধুই দানব। আর জগমণি শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব। সুরেশ চরিত্রটি মনোরম। আর যোগেশ! আগে একটু একটু মদ খেতো, প্রথম দৃশ্যতেই দেখি সে মদের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সুতরাং তার সাজানো বাগান কোথায় কবে ছিল দর্শক দেখতে পেল না। দু-তিন মাসের মধ্যে সে এত মাতাল হল যে, ছেলের হাত থেকে পয়সা কেড়ে নিচ্ছে, পথে পথে ভিক্ষা করে পয়সা নিয়ে মদ কিনছে, স্ত্রীকে লাথি মারছে। এ সব টেম্পারেন্স সোসাইটির বিজ্ঞাপন হলে মানানসই হতো। ব্যাংক ফেল হওয়া শুনে যোগেশের মদ খাওয়া বেড়ে গেল, কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে ব্যাংকের 'রিকভার' করার কথা যোগেশ জেনেছিল। কতকগুলি কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য ঘটনাজাল নাটকটিকে একেবারে নামিয়ে দিয়েছে।"

এই সব নানা জাতীয় লেখার ভিতর দিয়ে চারুচন্দ্রের চরিত্রের নানা দিক বেশ ভালভাবেই দেখা যাবে। তবু এর পরেও কিছু অবশিষ্ট আছে। সে হচ্ছে তাঁর অনুমান ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে আসা এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের সংগে যুক্ত হওয়া। তিনি শেষ পর্যন্ত এ কাজ নিষ্ঠার সংগে পালন করে গেছেন এবং রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬ খণ্ড তাঁর সম্পাদনাতেই বেরিয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের যে সব রচনা 'প্রচ্ছন্ন' রেখেছিলেন সে সবের "অধিকাংশই অসম্পূর্ণ অপরিপক্ক" বলে, তাও সংকলিত হয়ে অচলিত সংগ্রহ নামে দুই খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীর সংগে যুক্ত হয়েছে, সে দুই খণ্ডেরও প্রধান সম্পাদক চারুচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছিলেন (১৯৪০) "প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার জন্যেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে। প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয় তো, ইতিহাসে, মনো-বিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পার্সপোর্ট পেয়ে থাকে।"

এবং এ বিষয়ে তিনি নানাভাবে আপত্তি জানিয়ে চিঠিতে গদ্যে পদ্যে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। চারুচন্দ্র লিখিত 'নিবেদন' থেকে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি—

সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপা-যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা
জীর্ণ শীর্ণ মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণ-পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোপার গাধা?

এই জাতীয় সব আপত্তির জবাবে চারুচন্দ্র একস্থানে বলেছেন, "ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়—যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না.....রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয়, কোন্ দান শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহার বিচার-ভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না, আমরা নিজেরাও সে ভার গ্রহণ করি নাই—ভাবী কালের উপর রাখিয়াই এই গ্রন্থ-গুলি সংকলন করা হইল।"...

রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে চারুচন্দ্র অ্যান্ড কো, ভোটে পরাস্ত করে অচলিত সংগ্রহ দুই খণ্ড, রচনাবলীর অনুসারী করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যিস করে-ছিলেন, নইলে আমরা মস্তবড় একটি সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকতাম। (এবং এই প্রসংগে আমার একটি গোপন কথা বলি,—এই অচলিত সংগ্রহ হাতে পেয়েছিলাম বলেই আমার "রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান" নামক বৃহৎ—এবং রবীন্দ্রায়ণ ২য় খণ্ডের সর্ববৃহৎ প্রবন্ধটি লেখা সম্ভব হয়েছিল।)

আমার কথাটি ফুরলো, কিন্তু একটি অপরাধ আমার স্বীকার করা বাকি আছে। চারুচন্দ্র বংগীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং বিশ্বভারতী—এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকেই চিঠি দিয়েছিলেন গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আমাকে ফোটোগ্রাফির ইতিহাস লিখে দিতে। অনুমান ১৯৫২-তে বিশ্বভারতী অফিসে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম কাদের জন্য লিখব? তিনি বললেন, বিজ্ঞান পরিষদের জন্যই লিখুন। (সাক্ষী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন।)

কারো জন্যই অদ্যাবধি লেখা হয় নি।

বচনবাগীশ বাজেট

বিগত মার্চ মাসের অন্তর্বর্তী বাজেট ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উপ-প্রধান তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মূল্যবান ঝোলা থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

যেহেতু বাজেট মানেই নতুন করের বোঝা, সুতরাং বাজেট প্রকাশের মাস-খানেক আগে থেকেই প্রথাবদ্ধভাবে জিনিসপত্র পাইকারী ব্যাপারীর গুদামে আটক ছিল। দ্রব্যাদির মূল্য আকাশচুম্বী অতি-মুনাফার লোভে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা যাঁরা করেন, বাজেটের গন্ধ তাঁরা আশ্চর্যভাবে আগেই পেয়ে থাকেন। ঠিক যেগুলির ওপর পরম দয়ালু সরকারবাহাদুর পুনশ্চ করভার চাপাবেন (কারণ কর প্রতি বছরই বৃদ্ধি পায়) বেছে বেছে যেগুলির দর রোগীর গায়ের ক্রমবর্ধমান উত্তাপের মত চড়তে থাকে। লোভোন্মত্ত সম্প্রদায়ের জ্বরগ্রস্ত প্রতিনিধি অস্ম-দ্দেশীয় বাজেট তাই একার্থে জাতীয় জ্বরেরই উত্তাপ। বাজেট বক্তৃতা সেজন্যই বিকারগ্রস্ত বিবৃতি। শ্রীদেশাই-এর বাজেট বিবৃতিও সে-কারণে বচনসর্বস্ব হওয়াই স্বাভাবিক এবং কার্যত তাই-ই হয়েছে।

বচনবাগিশতা বাজেটের আয়নাতেই ধরা পড়ে। কংগ্রেসী সরকার কংগ্রেসী অধিবেশনে বহুতর বাক্য এবং বয়ানের সৃষ্টি করে থাকেন। সেখানে গরীবের জন্য দরদের ভাষা কলসি উপচে পড়ে আর বিকৃতির বিকার শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বাঁধা বুলিতে গিয়ে চরম উন্মাদনায় স্থিত হয়। এবারকার বাজেটেও হেরফের কিছু হয় নি। মোরারজী দেশাই যথারীতি একচেটিয়া ধনিক-স্বার্থের অনুকূলে দরিদ্র দমন বাজেট পেশ করেছেন, যার চাপে নিষ্পিষ্ট সাধারণ এবার ছিন্নভিন্ন হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হলেন।

বাজেট সম্পর্কে দেশের নেতৃবৃন্দ প্রথম চমকে যে সুমদয় মন্তব্য রেখেছেন তার থেকে কমন ফ্যাক্টর সঙ্কলন করলে এক কথায় এ বাজেটকে গণস্বার্থ-বিরোধী এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সংরক্ষক বলেই অভিহিত করতে হয়। তাঁরা তাই করেছেন। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি পর পর সাজিয়ে তোলা যাক।

বাজেটের পক্ষে কংগ্রেসী বিবৃতি

শ্রীকমলানায়ান বাজাজ (কং) বলেন ঃ দেশের সাধারণ অবস্থা এবং দেশীয় অর্থ-নীতির সম্বন্ধে শ্রীদেশাই দেখালেন গুরু-মশায়ী বোধ (?) 'masterly under-standing'. কি উত্তাল জলরাশির মধ্যে

বাজেট স্বাক্ষররত শ্রীদেশাই

তিনি দেখালেন কাণ্ডারীর কৃতিত্ব। খুব বিবেচকের মতই তিনি বাজেটে সমতা আনয়ন করেছেন, যদিও প্রত্যাশিত সাহসিকতা প্রমাণ করতে পারেন নি। (কিসের সাহস, গরীব নিধনে অধিকতর নির্মমতার?)

বাজেটের বিপক্ষে সর্বদলীয় মন্তব্য

কিন্তু শ্রীযুত মোহন ধারিয়া (কং) বললেনঃ এ বাজেট ধনীকে দিল অপ্রতিহতভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ, কিন্তু দরিদ্রকে রক্ষা করার ব্যাপারে দেখাল নিতান্ত দেউলেপনা।

শ্রীযুত অর্জুন অরোরা (কং) বলেছেনঃ বাজেট গণ-বিরোধী। প্রত্যক্ষ ছাড় এবং পরোক্ষ কর ধনীকে দিচ্ছে সুবিধা আর দরিদ্রকে করছে ফাটকাবাজ ও কালোবাজারীর করুণার পাত্র। গরীবের প্রাতরাশ, দিবাগ্রাস তো বটেই যাতায়াতের দৈনন্দিন খরচাকেও এ বাজেট মহার্ঘ করে তুলবে।

বাম কম্যুনিস্ট শ্রীনীরেন ঘোষের মন্তব্যঃ বিশ্বব্যাঙ্কের মিঃ বেলকে এ বাজেট অবশ্যই তুষ্ট করবে।

শ্রীগোপালনের উক্তিঃ বড় ধূর্ত এবং একচেটিয়া স্বার্থের অনুকূল এই বাজেট।... অর্থনৈতিক সঙ্কট গভীরতর করা, ছোট উদ্যোগ খতম করা এবং দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি করাই এ বাজেটের ফলশ্রুতি।

ডান কম্যুনিস্ট ডাঙ্গে মনে করছেনঃ নতুন বাজেট আনবে অর্থনৈতিক জগতে চরম নৈরাজ্য।

নির্দলীয় এস এম ব্যানার্জীর মন্তব্যঃ ক্ষুধার্ত এবং রুধিরাক্ত লক্ষ মানুষের শরীর থেকে এই বাজেট আর এক খাবলা (পাউন্ড) মাংস দাবি করল।

জনসঙ্ঘের শ্রীবাজপেয়ী দেখতে পেলেনঃ বাজেট ভর্তি সদিচ্ছা, কিন্তু দুঃসাহসী অগ্রগতির অভাব।

দুঃসাহস আর কেমন করে দেখালে সুবিধা হত আদার ব্যাপারী সাধারণ মানুষের তা অজ্ঞাত। অবশ্য যদি বলা যায় পরোক্ষ করের ভারে সাধারণের ওপর পেছন থেকে খাঁড়ার ঘা দিয়ে মোরারজীভাই যথার্থ ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করেন নি। একেবারেই যদি সোজাসুজি বুক চেপে বসার বীরত্ব অধিকতর প্রকাশিত হ'ত তবে বাজপেয়ী মহাশয়ের 'গুড ইন্টেনশন' ভাষান্তরে সদিচ্ছার স্বরূপ কি শ্রীদেশাই সঠিক প্রকাশ করতে পারতেন? কিন্তু পাঁঠা ল্যাজেই হোক, মুড়োয়াই হোক, জনসাধারণ-নামক বিচিত্র ছাগবলি শ্রীযুক্ত দেশাই যথারীতি এবং যোগ্যতার সঙ্গেই সমাধা করেছেন। এর পরেও অসন্তুষ্টির কারণ নেই।

কেন না করের বোঝাটা বসেছে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্তের ওপরই। জুতো আর কাপড়, চা ও কফি, পেট্রোলে কর অর্থে রেলের সঙ্গে অন্যান্য যানবাহনেরও ভাড়া বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত সব রকম দ্রব্যের পরিবহনগত মূল্যবৃদ্ধি—এ-সবই এসে পড়ছে স্বল্পবিত্তের ওপরই। সিগার ও চুরুট নিয়ে দুর্ভাবনা কম। কারণ কম লোকেই ও দুটিতে অভ্যস্ত। সেজন্য এ খাতে আয়ের আশাও মাত্র এক লক্ষ টাকা। কিন্তু সিগারেট? এ খাতে টাকা উঠবে ২৮ কোটি। মদ্যপরা ছাড় পেয়েছেন। যদিও কালোটাকা ঐখানেই ওড়ে বেশি। ডাক ও তার বিভাগের সার্ভিসের ওপর কর ধার্যে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার চাপই গরীব শ্রেণীকে সহ্য করতে হবে। ধনীর মূল্যবান প্রসাধনসামগ্রী বা আরামের সুব্যবস্থার ওপর মোরারজী ভাইয়ের দৃষ্টি পড়ে নি।

পড়া উচিত নয়। কংগ্রেসীদের মধ্যে অন্যতম 'সেন ম্যান' বা বিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীদেশাই। তিনি অন্তত কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের 'ইনস্যানিটি' কিম্বা বিকারে বিশ্বাসী নন। সুতরাং তাঁর কাছে দেশের লোক যা প্রত্যাশিত তাই-ই পেয়েছেন।

শ্রীদেশাই চান, এক শ্রেণী ভোগ করুন কিন্তু অপর শ্রেণী যাঁরা দেশের সংখ্যাধিক সম্প্রদায় সেই ভোগের রসদ যুগিয়ে যান রক্ত মাংস দিয়ে। তাই অর্থমন্ত্রীর তথা উপপ্রধানমন্ত্রীর দেশীয় অর্থনীতির পর্যালোচনায় স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, দ্রব্যোৎপাদনে ঘাটতির দরুণ মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নয়; আর বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণপ্রথা চালু করেও সুবিধে হবে না (লক্ষণীয়, কার সুবিধে)। তাই সুতরাং যা করা উচিত তা হল ভোগ-নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু কার জন্য এই দুর্ভোগ? মোরারজী রাজত্বে অবশ্যই সে দুর্ভাগারা হল দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। ভোগ-নিয়ন্ত্রণেরই ফিরিস্তি তাঁর বাজেট। ভোগ-নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রীদেশাই মাহিনা বা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির পয়লা নম্বর অসমর্থক। তাঁর ধারণা যে দরিদ্র সম্প্রদায় দধীচিস্বরূপ, তাদের আয় বৃদ্ধি মানেই অস্থানে-কুস্থানে ভোগের ব্যবস্থা; আর তার ফলেই নাকি জিনিসের দাম হু-হু করে চড়ে যায়। ছাত্রাবস্থায় শুনেছিলাম, অর্থনীতি একটা বিরাট ধোঁকাবাজি, দেশাই-সমাজ সেই ধোঁকাই সাধারণ্যে পরিবেশন করে থাকেন। তাঁর বাজেটেও ধোঁকা ব্যঞ্জনের অসদ্ভাব আছে এমত অভিযোগ কেউ উত্থাপন করবেন না।

মোট কথা শ্রীদেশাই তাঁর সর্বজনব্যাখ্যাত 'গণস্বার্থ-বিরোধী' বাজেটে যথার্থই নিজেকে তুলে ধরেছেন। এই বাজেটের দ্বারা শ্রীদেশাই যথার্থই সততার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সমর্থক শ্রেণীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করে। এমন কি তা করতে গিয়ে তিনি কোন গালভরা চাতুরির আশ্রয় নেন নি। ধনবাদী অর্থনীতিতে শ্রীদেশাই সঠিক বাজেট খুবই রূঢ়তার সঙ্গে পেশ করে যথেষ্ট বলিষ্ঠতারই পরিচয় দিয়েছেন। তথাপি যাঁরা শ্রীদেশাই-এর মধ্যে যথেষ্ট সৎ সাহসের অভাব দেখেছেন, তাঁরা স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনীকে এক কোপেই কাটতে চান। বলা বাহুল্য শ্রীদেশাই ব্যবসায়ী নন, রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ভালই করেছেন। তাঁর বাজেটে কংগ্রেসী বাজেটের ঐতিহ্য, চরিত্র এবং সেইমত অগ্রগতি যথার্থই বজায় আছে।

তবে ইনফ্লেশন বা অর্থমূল্য হ্রাস রোধের যে স্বপ্ন শ্রীদেশাই দেখে থাকেন তাঁর বাজেটেই সে স্বপ্নকে খাঁটি দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত করবে। শ্রীদেশাই-এর বাজেট সেইটুকু বচনবাগিশতাকেই শুধু উপহাস করেছে।

দেশরক্ষার ব্যয়

অন্তর্দেশকে পরোক্ষ করের চাপে প্রাণমুত করে রেখে মোরারজী দেশাই দেশরক্ষা খাতে অন্তর্বর্তী বাজেটে ২৭ কোটি টাকা বাড়িয়েছিলেন। এবারের বাজেটে দেশরক্ষা খাতে ছয় কোটি টাকা কমাবার প্রস্তাব আছে। কার্যত তাহলে নতুন বাজেটে একুশ কোটি টাকা দেশ রক্ষার জন্য বাড়ানো হল। প্রসঙ্গত দেশাই বলেছেন চীন পাকিস্তানের সঙ্গে সব রকমভাবে ভারত সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করতে চায়। কিন্তু তার আগে দেশটা বাঁচাতে হবে তো।

লম্বা বক্তৃতা

বাজেট উত্থাপনের আগে উপ-প্রধানমন্ত্রী এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে দেশের দুরবস্থার যে চিত্র আঁকেন, তার চেহারাটা এই রকম।

খরার ফলে দেশের অবস্থা শোচনীয়। তা ছাড়া বছর তিনেক ধরে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং চাহিদার অভাবে উৎপাদনের ক্ষতি দেশকে গোল্লায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীদেশাই এই অবস্থার যথাশীঘ্র অবসান চান।

এই সব জরুরী অবস্থার ওপর তিনি এমনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ 'করবেন-করবেন' ভাবছেন যার ফলেই নাকি আমাদের ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস পুনরায় খাড়া হয়ে উঠবে। তখন জাতির নিরাপত্তাই হোক আর সামাজিক ন্যায়বিচারই হোক (সমাজবন্ধ নয়) কোন দাবিই উপেক্ষিত থাকবে না। তখন দীর্ঘকাল, শ্রীদেশাই মনে করেন, দেশের লোক একটা স্থিতিশীল মূল্যমান চেখে চেখে ভোগ করবে আর তখন যে পরিমাণ আত্মনির্ভরশীলতা আমাদের মধ্যে চেগে উঠবে তাতে আমরা অনায়াসেই মজা করে বড় বড় উন্নতি করতে পারব।

তবে আর কী। আমরা বড় নিশ্চিন্ত রইলাম। বাজেটে দরিদ্র মানুষের ঘটি বাটি বাস্তুভিটা পর্যন্ত সবকিছু অপহরণের জন্য বহুতর পরোক্ষ উপায় (করের ব্যবস্থা) আছে বটে। মোরারজী দেশাই সেজন্য বেচারা দেশভাই-এর জন্য কিছু মূল্যবান বচন প্রথমেই উপহার দিয়েছেন।

মোরারজী জানেন, শুধু পেট ভরাবে পেটুকে, বিজ্ঞজন মনের খোরাকও চান। সেই মনের খোরাকের রসদ তিনি তাই প্রারম্ভেই উপড়ে করে দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে এই বচনবাগিশতাই এখনো ভব্যতার আকারে টিকে আছে, সেটা কী কম কথা!

পাঞ্জাব :

অনাস্থা টেকে নি

পাঞ্জাবে গুরনম সিং মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আশি দিনের মধ্যেই অনাস্থার ঢেউ ভাঙতে শুরু করেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র তেতাল্লিশজন কংগ্রেসী এম এল এ-র সমর্থনপুষ্ট অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি চাইলে স্পীকার যোগীন্দর সিং মান তা গ্রহণ করেন। বিষয়টিকে সমর্থন জানাবার জন্য অকালী দলের আসন থেকে দুই বিরুদ্ধবাদী আকালী নেতা শ্রীহুদিয়ারা এবং শ্রীহাজরা সিং গিল উঠে দাঁড়ান; কিন্তু তাঁদের ভোট

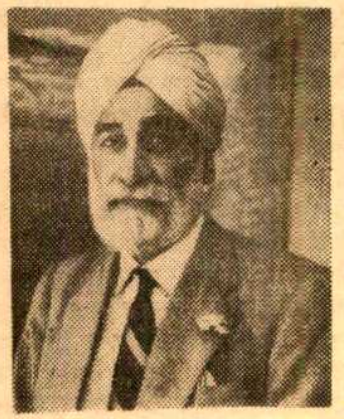

শ্রীগুরনম সিং

গণনা করার আগেই তাঁরা পুনরায় অকালী তরফেই আসন গ্রহণ করেন। আলোচনার জন্য দু'দিন ধার্য করা হয়েছিল।

কিন্তু সন্ত আকালী দলের অন্যতম নেতা হুদিয়ারা ও হাজরা সিং গিলের (যুক্তফ্রন্ট সদস্য হওয়া সত্ত্বেও) প্রকাশ্য কংগ্রেসপক্ষ সমর্থন এবং পাতিয়ালার মহারাজা শ্রীযাদবেন্দ্র সিং-এর সমর্থন সংগ্রহ করেও অনাস্থা প্রস্তাব বিরোধী কংগ্রেসীরা টেকাতে পারেন নি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ৫৭-৪৬ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

পাঞ্জাব বিধানসভার সদস্যসংখ্যা মোট এক শত চার। কংগ্রেস তেতাল্লিশ আসনের অধিকারী। তিনজনের প্রকাশ্য সমর্থন তাঁরা আদায় করতে পেরেছেন। যদিও পাতিয়ালা মহারাজার ভূমিকা পূর্বাহ্নে সঠিক বোঝা যায় নি। কেন না অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের আবেদনটি

যেদিন গৃহীত হয় মহারাজা সেদিন লবিতে উপস্থিত থাকলেও সভা-গৃহে তাঁকে দেখা যায় নি। প্রকাশ, আকালী ও জনসঙ্ঘ মহারাজাকে নিরপেক্ষ থাকায় নিমরাজি করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু আসল ভোটাভুটির সময় মহারাজা যথাস্থানেই অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষেই এই যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দেন। অন্য-দিকে দু'জন কংগ্রেসী সদস্য সিকন্দর ও গুরবচন সিং যাব কি যাব না করে প্রথমে কংগ্রেস তরফ ত্যাগ করলেও পুরোপুরি পার্শ্বপরিবর্তন শেষ পর্যন্ত করেন নি।

মহারাজাকে দলে টানবার জন্য কংগ্রেস মহারাজার সামনে একটি লোভনীয় টোপ রেখেছিল। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের জনৈক প্রবীণ সদস্য পাঞ্জাব কংগ্রেসকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি মহারাজা কিছু নির্দলীয় নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান তবে কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন জানাবে, অর্থাৎ ব'কলমে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে। মহারাজা সম্ভবত পুরো ভরসা পান নি। দু'নৌকায় পা পেতে দাঁড়াতেই তিনি মনস্থ করেছিলেন। অন্তিমকালে স্বভাবের তাড়নাই তাঁকে কংগ্রেসপক্ষে টেনেছে। অর্থাৎ জল ঢালু জমিতেই গড়িয়েছে অবশেষে।

ইতিমধ্যে মহারাজা কিছু নির্দলীয় এবং দু'জন ডেপুটি মন্ত্রী নিয়ে একটা নতুন দলও গজিয়ে তুলেছেন। এই দল জনগণের ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবেন।

রাজ্য রিপাবলিকান দল বিগত ২৪শে মে যুক্তফ্রন্টে থাকবেন কি না এ নিয়ে গভীর চিন্তা শুরু করেছেন বলেও জানা যায়। রিপাবলিকান দলের একজন সদস্য বর্তমান মন্ত্রিসভায় আছেন।

অনাস্থা বিতর্ক কিন্তু ফ্রন্ট মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধে পর্বত প্রমাণ বিষোদ্গার সত্ত্বেও তেমন জমাটি হয় নি। বিগত বাজেট বিতর্কের সময়ই বিরোধীপক্ষ আপন তূণীরের সব তীর ক'টিই ছিলা-চ্যুত করে বসেছিলেন, নতুন বক্তব্যে তাই সভা চমকিত করার সুযোগ ঘটে নি। আর এই কারণেই সরকারপক্ষ চারদিন বিতর্কের প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে-ছিলেন প্রথমেই। তাঁদের আপত্তি যথার্থ্য অতঃপর বিতর্কের উদ্দেশ্যহীনতায়ই প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিতর্কের উত্তরে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রীপ্রবোধচন্দ্রের বক্তব্যকে হতাশ রাজ্য-হীনের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্গার বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের ফ্রন্ট-বিরোধী জেহাদ প্রতিবারই ফ্রন্টকে কেবল-মাত্র শক্তিশালী করেছে। এখনো তিনজন কংগ্রেসী ফ্রন্টে যোগদানে ইচ্ছুক। কিন্তু ফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন গ্রহণ করতেই পরামর্শ দিয়েছেন।

হিন্দু-শিখদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীলছমন সিং গিল অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস যা কুড়ি বছরে করতে পারে নি যুক্তফ্রন্ট তাই দশ সপ্তাহে করেছে। হিন্দু-শিখ সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় যুক্তফ্রন্টের অবদান অনস্বীকার্য।

কংগ্রেস আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি গদি কাড়াকাড়ির প্রশ্নেই আবদ্ধ ছিল। ফ্রন্ট সরকার যে গণস্বার্থবিরোধী কোন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র

নীতির দ্বারা পরিচালিত এমন অভিযোগ তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি কোনও নজির টেনে।

সন্ত আকালী দলে ক্ষমতা কাড়াকাড়ি

আকালী দলের সভাপতি সন্ত ফতে সিং আকালী নেতা শ্রীহরচরণ সিং হুদিয়ারা ও শ্রীহাজরা সিং গিলকে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সমর্থনের নির্দেশ অমান্য করার জন্য সদস্যপদ থেকে সাসপেণ্ড করেন। কিন্তু তলে তলে হুদিয়ারা-বাহিনী ঘাঁটি প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। বিগত ২৬শে মে দলের এক জরুরী সভায় ৩৭৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে দু' শ' জন সদস্য সন্তজীকেই সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান কার্যকরী কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে নব-নির্বাচিত সভাপতি শ্রীহরচরণ সিং হুদিয়ারাকে।

নয়া তারা সিং

শ্রীহুদিয়ারার পশ্চাৎ ইতিহাস খুব উজ্জ্বল বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন না। ইনি গত চল্লিশ বছর আকালী আন্দো-লনের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তলে তলে তিনি লোকান্তরিত সর্দার কায়রনের সংযোগ রক্ষা করে গেছেন যখন আকালী আর কংগ্রেসে প্রায় শত্রুতার সম্পর্ক।

শ্রীহুদিয়ারার টান প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতি। তিনি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার পক্ষে সংশোধন আনার পক্ষপাতী।

হুদিয়ারা জাতীয় সংহতি সম্পর্কেও কোন ঐকান্তিকতা রক্ষা করেন না। তিনিও তারা সিং-এর মতই শিখীস্তানের দাবিদার। সম্প্রতি তারা সিং-এর সন্ত ফতে সিং বিরোধিতার উল্লেখ করেও শ্রীহুদিয়ারাকে এই আশা পোষণ করতে শোনা গেছে যে, তারা সিং যদি সন্তজীর প্রতিপক্ষে এমন-ভাবে খাড়া থেকে থাকতে পারেন, তবে হুদিয়ারাই বা কম কি। তিনি নাগাদের মত স্বাধীন শিখভূমি গঠনের স্বপ্ন দেখেন।

আকালী দলে হুদিয়ারার ক্ষমতালাভ মাস্টার তারা সিং-কে নিশ্চয় চাঙ্গা করে তুলবে—একই সঙ্গে সীমান্তরাজ্য পাঞ্জাব সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মনে শঙ্কার কারণ জাগ্রত হবে। অবশ্য পাঞ্জাব কংগ্রেস শ্রীহুদিয়ারাকে নিয়েই যদি গদি দখল করতে পারে তবে সে চেষ্টায় সংহতির প্রশ্নে তারা ইস্তফা দেবে বলে মনে হয় না।

বিহার:

অকংগ্রেসী সরকারের সম্মুখে সঙ্কট

মহামায়াপ্রসাদ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বিহার রাজ্যের গদি পুনরধিকারের জন্য কংগ্রেসী প্রচেষ্টা শুধু যে জোরদার হয়ে উঠেছে তাই নয়, সংবাদে প্রকাশ, বিরোধী কংগ্রেসী নেতা শ্রীমহেশপ্রসাদ সিংহ হাই কমাণ্ডের আশিষ গ্রহণের জন্য দিল্লী, মাদ্রাজ সফরে বের হয়েছেন। দিল্লীতে প্রধান ও উপপ্রধান-মন্ত্রীর কাছে মহেশপ্রসাদ ইতিমধ্যেই তাঁর অভিযানের পরিকল্পনা পেশ করেছেন, অতঃপর কংগ্রেস সভাপতির কাছেও তিনি দরবার করবেন বলে জানা যাচ্ছে। মহেশ-প্রসাদের এই গদির আকাঙ্ক্ষায় যথার্থ সম্মতি মেলে নি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসতেন্দ্রনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্বও মহেশ-প্রসাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কিভাবে গ্রহণ করে

বেন, এ পর্যন্ত তা-ও সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে রামগড়রাজ কামাখ্যানারায়ণ সিংহকে যদি মহেশপ্রসাদের সম্ভাব্য মন্ত্রি-সভায় উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণে রাজী করানো যায় তবে কংগ্রেসী ইচ্ছা হয়ত বাস্তবায়িত হতে পারে। বর্তমানে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসীরাই হলেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। ৩১৮ সদস্যক সভায় কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা ১২৮। জন-ক্রান্তি দলের আছেন ২৬ জন, যাঁদের ১৫।১৬ জন এম-এল-এ রাজার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্যশীল। মহেশপ্রসাদ রাজাকে দলে টেনে এঁদের সমর্থনলাভেরও আশা রাখেন। এ-ছাড়া ২১ জন নির্দলীয়ের [illegible] যে পনের জন দলত্যাগী প্রাক্তন কংগ্রেসী আছেন, মহেশ-কংগ্রেসী ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা তাঁদেরও গণনার মধ্যে রাখছেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষারও অপর পিঠ আছে, যে পৃষ্ঠের চিত্রটিও কম চিন্তার কারণ নয়।

কংগ্রেস রামগড়রাজকে নিয়ে দল ভাঙালে যেমন নতুন কিছু এম-এল-এ ক্ষমতা লাভের নবীন উৎসাহে কংগ্রেসী মৌচাকের আশেপাশে এসে জমায়েৎ হবেন বলে আশা করা যায়; তেমনিই অন্যপক্ষে বর্তমান কংগ্রেসী এম-এল-এ গোষ্ঠীর অনেকে আবার রামগড়রাজকে সঠিক সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কংগ্রেসপক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। আর অকংগ্রেসী দল ভেঙে কংগ্রেসে প্রবেশ অপেক্ষা কংগ্রেস ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তুলবে।

বিধানসভায় অন্যান্য দলের স্ব স্ব শক্তি হলঃ এস-এস-পি ৬৮, জনসঙ্ঘ ২৬, সি-পি-আই (এম) ৪, সি-পি-আই ২৪, পি-এস-পি ১৮ ও স্বতন্ত্র ৩। জন-ক্রান্তি ২৬ এবং নির্দলের ২১-এর কথা আগেই বলা হয়েছে।

অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় রামগড়রাজ কামাখ্যানারায়ণ ঠিক জুৎ করে উঠতে পারছেন না। কম্যুনিস্টদের গা ঘেঁষে বসবাস, তেলে-জলে সহাবস্থান! এর থেকে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি আর কি হতে পারে। পাঞ্জাবে যেমন পাতিয়ালা, বিহারে তেমনি রামগড়রাজ, কংগ্রেস-ই এঁদের সঠিক কুলায়।

সুতরাং মহেশপ্রসাদ মনে জোর পাচ্ছেন। রামগড়রাজকে উপমুখ্যমন্ত্রী করতে পারলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গদি অধিকারের বাসনা তাঁর পরিপূরণ হতে পারে।

কংগ্রেসী উৎসাহের স্রোতে এখন যে-ক'টি বাধা মহেশপ্রসাদ তা যথাসাধ্য অপসারণের চেষ্টা পাচ্ছেন। প্রকাশ কংগ্রেসী ক্ষমতা-সন্ধানী নেতারা নাকি বর্তমানে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করছেন।

হাজারি কমিটির রিপোর্ট বিতর্ক

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির একটি বৈঠকে গত ২৬শে মে হাজারি কমিটির প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে এক বে-সামাল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শ্রীঅর্জুন অরোরা বিড়লা শিল্পসংস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আনীত নথিপত্রের ফাইলের ফিতে খুলতে গেলে বাধা পান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে। কংগ্রেসী মন্ত্রী ও সদস্যদের ওপর বিড়লা শিল্পসংস্থা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, শ্রীঅরোরা তারও একটি পরিচয় তালিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, উপপ্রধান তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই তখন শ্রীঅরোরাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শ্রীঅরোরার কোন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া অনুচিত। তাঁকে সেজন্য ক্ষমা চাইতে হতে পারে। অতঃপর শ্রীঅরোরা একচেটিয়া পুঁজি ও মুষ্টিমেয়ের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান। সংসদীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য বিগত কয়েক বছর ধরে লাইসেন্সিং প্রথার মাধ্যমে কি পরিমাণ টাকা উক্ত একচেটিয়া সংস্থার করায়ত্ত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি উচ্চ-ক্ষমতা-সম্পন্ন তদন্তের স্বপক্ষে সুপারিশ করেন।

একই সঙ্গে একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত সদস্যগণ হাজারি কমিটি যাতে কমিটির প্রতিবেদন চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করতে না পারেন সেজন্য সর্বদা চেষ্টিত আছেন বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

হাজারি কমিটি এ পর্যন্ত যতদূর প্রতিবেদন তৈরি করেছেন তাতেই দেখা গেছে ভারতের অর্থনীতি বৃহৎ ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কব্জায় কেমনভাবে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনকে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীগোষ্ঠী কিভাবে গ্রাস করেছে শ্রীঅরোরা তার যথাযথ সমীক্ষার জন্য ডঃ আর, কে, হাজারিকে ভবিষ্যতে আর সুযোগ দেওয়া হবে কি না এ-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে শ্রী ডি, পি, হিম্মৎসিংকা প্রমুখ কয়েকজন সদস্য সভাকে সতর্ক করে বলেন, হাজারি কমিটির প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে তাড়াতাড়ি কোনও সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত—কেন না হাজারি কমিটিও একচেটিয়া কারবার সংক্রান্ত কমিশনের মধ্যে বিরোধ আছে। এঁদের মতে কমিশনের প্রতিবেদন হাজারি কমিটির প্রতিবেদন অপেক্ষা প্রামাণ্য।

নেহরু স্মরণে

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতবাসীর প্রশ্রয়লালিত জনপ্রিয় নেতা জওহরলাল নেহরুর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র জাতি নেহরুর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাবেশে।

জাতির জীবনে নেহরুজী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এক মহানায়কের চিরস্মরণীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত। ২৭শে মে তাঁর লোকান্তর যাত্রা।

২৭শে মে-র স্মরণে আমাদের শ্রদ্ধাকে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করি। (২৮-৫-৬৪)

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে। মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ।

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)
—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
২। মনের মতন (As You Like It)—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৩। অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রা—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু।
৪। রোমিও জুলিয়েট—অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
৬। জুলিয়াস সীজার—অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

(দ্বিতীয় ভাগ)
—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু। (নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—অনুবাদক সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন— অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ।
৬। টুয়েলফথ নাইট—অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য।

একত্রে মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-১২।

আরব-ইস্রায়েল সম্পর্ক আরো অবনতির দিকে মোড় নিয়েছে। কী কুক্ষণেই না ইস্রায়েল সিরিয়া অভিযান করবে বলে শাসানি দিয়েছিল। এখন শুধু সিরিয়াই নয়, প্রায় সমগ্র আরব দুনিয়া ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। এমন কি জর্ডান, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশও ইস্রায়েলী আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে সিরিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সংযুক্ত আরব তো রয়েছেই।

ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন এবং এ-ঘোষণার দ্বারা তাঁরা এটাই বোঝাতে চান যে, ইস্রায়েলকে তাঁরা সহজে ছাড়বেন না। প্রেসিডেন্ট নাসের আকাবা উপসাগরে ইস্রায়েলী জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং একথাও বলে দিয়েছেন যে অন্য কোন দেশকেও ইস্রায়েলকে সাহায্য করার জন্যে এই উপসাগর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ইতিপূর্বে গাজা থেকে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিলেন প্রেসিডেন্ট নাসের, তারপরে আকাবা উপসাগর বন্ধ করে দেবার ফলে সংযুক্ত আরবের শক্তি সম্পর্কে ইস্রায়েল এবং তার পশ্চিমী বন্ধুদের কোন সন্দেহই থাকছে না। এ-ঘোষণার দ্বারা আরব রাষ্ট্রগুলির নৈতিকশক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

তবে ইস্রায়েল কিম্বা আমেরিকা এই আকাবা বন্ধ করার কাজটিকে মোটেই ভাল চোখে দেখে নি। ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী এসকল ঘোষণা করেছেন যে, সংযুক্ত আরব যে একটা যুদ্ধপ্রস্তুতি করছে এর দ্বারা তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসন তো সরাসরি বলেছেন যে আকাবা উপসাগরটি আন্তর্জাতিক জলপথ, কাজেই এটা এককভাবে বন্ধ করে দেবার কোন অধিকার সংযুক্ত আরবের নেই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার আরো জানিয়েছেন যে, ১৯৫৭ সালে ইস্রায়েলকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমেরিকা ওই উপসাগর ব্যবহার করার অধিকার প্রয়োগ করবে, সকলেরই এ-উপসাগর ব্যবহারের সমান অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে হস্তক্ষেপ করবে—এ-কথাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু সংযুক্ত আরব বলেছে যে, আকাবায় কোন ইস্রায়েলী জাহাজ দেখা গেলেই তাকে আগ্রাসন বলে বিবেচনা করা হবে, যদি ইস্রায়েল যুদ্ধ চায় তো ভাল কথা। আকাবা উপসাগরের গুরুত্ব এখানে যে ইস্রায়েলের এলাত বন্দরে যেতে হলে এই উপসাগরটি ব্যবহার করতে হয়। আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ব্যাপারেও আকাবা ইস্রায়েলের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য ইস্রায়েল বলেছে যে, আকাবা

ইস্রায়েলী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সংযুক্ত আরবের যুদ্ধ প্রস্তুতি

তার না হলেও চলবে, এমন কিছু বাণিজ্য ওপথ দিয়ে তার হয় না।

কিন্তু ইস্রায়েলের চেয়ে আমেরিকার উদ্বেগটাই যেন বেশি। আমেরিকা ইতিমধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়াকে তার প্রভাব খাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার কথা বলেছে। পশ্চিম এশিয়া থেকে সমস্ত মার্কিনী পর্যটকদের দেশে ফিরে আসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আকাবা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যতই দুশ্চিন্তা থাক না কেন, সংযুক্ত আরব জানিয়ে দিয়েছে যে, এই উপসাগরটির ওপর তার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব রয়েছে এবং এ-সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য, কারো সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা সম্ভব নয়।

পরিস্থিতি যে অত্যন্ত জটিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাই রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট কায়রো এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে পরামর্শ করতে। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রসংঘে ফিরে যাবার আগেই পশ্চিমী দেশগুলির আগ্রহে এবং কানাডা-ডেনমার্কের উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তিপরিষদে পশ্চিম এশিয়া প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়। সোভিয়েট, ভারত ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি এই বলে অধিবেশন স্থগিত রাখতে চান যে সেক্রেটারী-জেনারেলের অনুপস্থিতিতে এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা ঠিক হবে না। যদিও এখানে প্রস্তাব আনা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল কার্যত সংযুক্ত আরবের নিন্দা করা—তবুও তা পাশ করা যায় নি।

সংযুক্ত আরব এবং সমগ্র আরব দুনিয়া যে এবার ইস্রায়েলী হুমকীকে অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রহণ করেছে এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ উভয় পক্ষই এখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, বারুদ শুকনোই রয়েছে, অগ্নিসংযোগ হলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। তবে তা রোধ করার প্রচেষ্টাও চলছে বৈ কি! ফ্রান্স চতুঃশক্তি বৈঠকের প্রস্তাব করেছে বিষয়টির মীমাংসার জন্যে। আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স—এই ৪টি দেশ যেন এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে তার

উ থাণ্ট-নাসের আলোচনা

জন্য রাষ্ট্রসংঘের ফরাসী প্রতিনিধি প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু সংযুক্ত আরব ফ্রান্সকে ভালভাবেই চেনে। তার মনে আছে ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স সুয়েজ জাতীয়করণ প্রশ্নে বৃটেনের সংগে যোগ দিয়ে সংযুক্ত আরবের বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং ইস্রায়েলকে সমর্থন করেও সংযুক্ত আরবের সংগে লড়েছিল। কাজেই ফরাসী প্রস্তাবে সে রাজী হতে চাইবে কেন? সংযুক্ত আরব তাই বলেছে যে, মধ্য প্রাচ্যের কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।

কায়রোতে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সংগে আলোচনা শেষ করে উ থাণ্ট রাষ্ট্রসংঘে ফিরে গিয়ে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। সেই রিপোর্টে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে মধ্য প্রাচ্যে অবস্থা আবার শীগ্‌গিরই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। উ থাণ্ট সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, বর্তমানের উত্তেজনার মুহূর্ত বা বিস্ফোরণের স্তর থেকে যেন তারা সরে যায় এবং নিরাপত্তা পরিষদকে বর্তমান সংকটের কারণ নিরূপণ এবং সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি কোন পক্ষকেই সরাসরি অভিযুক্ত করেন নি, কিন্তু বলেছেন যে, তিরান প্রণালীতে যে-অবস্থা তাতে শান্তি ব্যাহত হবার আশংকা রয়েছে। এবং আরব ও ইস্রায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে তা' সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে উ থাণ্ট প্রস্তাব করেছেন যে, মিশর-ইস্রায়েল মিশ্রযুদ্ধবিরতি কমিশন আবার প্রতিষ্ঠা করা হোক। এই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল, কিন্তু ১৯৫৭ সালে ইস্রায়েল এই চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে একক-ভাবে, তবে রাষ্ট্রসংঘ তা' স্বীকার করে নেয় নি। উ থাণ্ট আরো বলেছেন যে, কায়রোতে আরব নেতাদের সংগে কথা বলে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সংযুক্ত আরব সুয়েজ আক্রমণের আগে ১৯৫৬ সালের অবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক এবং ওই যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি মেনে চলতে চায় ইস্রায়েলের সংগে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সংগে কথা বলে উ থাণ্টের আরো মনে হয়েছে যে, তিনি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চান। শ্রমিক নেতাদের কাছে নাসের একথাও বলেছেন যে, যুদ্ধ যদি বাধে তবে তা' সিরিয়া বা সংযুক্ত আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ইস্রায়েলের খতম করাই আমাদের লক্ষ্য হবে। প্যালেস্টাইন মুক্তি-যোদ্ধারাও প্যালেস্টাইনকে ইস্রায়েল-মুক্ত করার নতুন শপথ নিয়েছে। ইস্রায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াশিংটন ঘুরে এসেছেন। তিরান প্রণালীতে জাহাজ পাঠানোর ব্যাপারে আমেরিকা যাতে তাঁকে সাহায্য করে তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। এদিকে সংযুক্ত আরবের প্রতিরক্ষাসচিবও মস্কো ঘুরে এসেছেন। আরো অস্ত্রের ব্যবস্থা তিনি করে এসেছেন নিশ্চয়ই। অর্থাৎ দু-পক্ষই প্রস্তুত। এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া যদি নিজেদের প্রভাব বিস্তার না করে তবে এখানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে।

এজেণ্ট আবশ্যক

শতকরা ৩৫ টাকা হিসাবে কমিশনে প্রতি নগরে এবং শহরে সুবিখ্যাত এসকরুট ট্রানজিস্টার বিক্রয় করিবার জন্য। স্যাম্পেলের জন্য পত্র লিখুন।

The Manager (WBC-55)
P. B. 1115, Delhi-6.

নব মন্ত্রিসভা সমীক্ষা

[মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ]

মন্ত্রিত্ব টিকবে তো? আর কতদিন আছে? এমনি ধরণের নানা আলোচনা আরম্ভ হয়েছে স্বার্থসংশ্লিষ্টমহলে। একটা মিথ্যাকে বার বার প্রচার করে সত্যের মত বিশ্বাসযোগ্য করা যায়—গোয়েবল্‌সের এই থিয়োরী এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলে আমরা আন্তরিক সুখী হবো। দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সকলেই কংগ্রেসী অপশাসনের অবসান কামনা করেছিল ও স্বাভাবিকভাবে তাই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে এবং সরকারের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা পোষণ করে আছে। সুতরাং উদ্বেগজনক কার্যকলাপ দেখলে মন শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে। মন্ত্রিসভার বদনামকারী ঘটনা বা অস্তিত্বের বিঘ্নস্বরূপ কোন বিষয় তা হিমালয়সদৃশ হলেও তা আমরা উইটিপির মত তুচ্ছ করে দিতে চেষ্টা করছি পাছে শত্রুপক্ষ তার সুযোগ নিতে আসে। তবু কেন মানুষের মনে প্রশ্ন ক্রমশ দানা বাঁধছে এ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নিয়ে?

প্রথমত নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তরের দাম গত তিনমাসে আকাশছোঁয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা বাজার থেকে প্রতিদিনই ফিরে আসে থলির শূন্যতাকে বাড়িয়ে। কেন চাল ডাল তেল আলু ও মশলার দাম প্রতিদিনই বাড়ছে? কেন এই সরকার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কোন সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে না? এই প্রশ্ন সবার মনে। রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ খরা আক্রমণের ফলে ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একথা গোচরে থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ সকল দোষ ঐ সরকাররূপী নন্দ ঘোষের ঘাড়ে চাপাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। বর্তমান সরকারের খাদ্যনীতির বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করার অক্ষমতা আজ সমালোচনামুখর করে তুলেছে। নিয়ন্ত্রণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত না হওয়া, সারা দেশে কালোবাজারী আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতার অবসান করার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসা সৃষ্টির পরিবর্তে নিন্দার ভাগী করে তুলছে। আর এই নিন্দা-বর্ষণের ভূমিকায় সাধারণ গৃহস্থ মনোবৃত্তির অধিকারীদের মূল্য না দিলেও চলত যদি না দেখতুম যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিরা প্রকাশ্যে নিন্দা-চর্চায় অংশ নিয়েছে। শুধু পার্টি কেডার নয় উচ্চ স্তরের নেতারাও অহেতুক সমালোচনা করছে। যেন খাদ্যনীতির আপাত ব্যর্থতার মূল দায়িত্ব একমাত্র ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের এবং মন্ত্রিসভার কোন দায়িত্বই নেই। তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষ মন্ত্রিসভার মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে মনে করে নানা প্রশ্ন তুলছে। তা ছাড়া উগ্র বামপন্থী দুই শরিকের অনেকেই ডঃ ঘোষকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে আরম্ভ করেছেন এবং কেন্দ্রের কংগ্রেসকে তোষণ করে চলছেন এই অভিযোগ আনছেন। মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরায়ার আক্রমণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে শালীনতা লঙ্ঘন করেছে। তাঁর অনধিকার চর্চাকে বিভেদের বীজ মনে করলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

প্রধানত আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে জনসাধারণের একাংশ ক্রমশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ঘেরাও আন্দোলন যে হারে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে শিল্পপতিদের বিপন্ন বোধ করার মত কিছু নেই একথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়॥ ঘেরাওয়ের কারণের পিছনে শিল্পপতিদের অন্যায় মুনাফা শিকারী অমানবিক শোষণপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত থাকলেও ঘেরাও হওয়ার ফলে তাদের অত্যুগ্র আত্মসম্মান যে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তাতে কোন সন্দেহই নেই। তারই ক্রমপরিণতি হতাশা ও শিল্প পরিচালনায় অনীহা সৃষ্টি করে এবং সক্ষম শিল্পপতিরা অন্যত্র মূলধন সরিয়ে নিতে চাইলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রতিষ্ঠান ও মূলধন সরিয়ে নিতে দেওয়া হবে না সরকারীভাবে এ প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠান মালিক ও পরিচালকরা তা সুবোধ বালকের মত স্বেচ্ছায় মেনে নেবে না এটা ধরে নেওয়া যায়। ফলে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একটা নৈরাজ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। ঘেরাও আইনত সিদ্ধ কি অসিদ্ধ সে বিতর্কিত বিষয়ে না গিয়ে বা মালিকদের পক্ষে ওকালতি না করেও বলা যায় যে, ঘেরাও মনোভাব বুমেরাং হয়ে সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে সংক্রামক ব্যাধির মত। আর এই মনোবৃত্তি শিল্প এলাকা ছাড়িয়ে কৃষি এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ছে অতি দ্রুতভাবে। যুক্তফ্রন্টের শরিক একটি ছোট রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে

ভূমিখণ্ডনের নামে দশ-পনের বিঘার জমির মালিকদের ওপর ভীতি প্রদর্শন করছে। প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে যে, জমানা বদল হয়েছে, তারা যা সিদ্ধান্ত করবে তাই মেনে নিতে হবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কেউ কেউ প্রকাশ্যে অরাজকতার প্রশ্রয় দিচ্ছে। নকসালবাড়ী ঘটনার কোন শিক্ষা যদি গ্রহণ করা না হয়, তবে মন্ত্রিসভার দুর্দিন নিকটবর্তী এ আশঙ্কা মুছে ফেলতে পারছি না। অবশ্য দু'টো উপনির্বাচন ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বিরাট জয়লাভে যদি আত্মসন্তুষ্ট ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে আমাদের বক্তব্যের গুরুত্ব থাকে না।

আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশ প্রায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বেছে নিয়েছে। যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ নিয়ে নাগরিকরা পুলিশের শরণাপন্ন হচ্ছে সেখানে কোন প্রতিকার ঘটছে না এ অভিযোগ সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। আমি কয়েকবারই বলেছি যে, এক অভিমান ও এক প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি এ-বিষয়ে কাজ করছে। মন্ত্রীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যায় না, এমন কি বাড়িতে পুলিশ প্রহরী রাখেন না উপরন্তু পুলিশের সহায়তা অবাঞ্ছনীয় বলে মন্ত্রীদের ঘোষণা তাদের অভিমানাহত করেছে। অবশ্য অদৃশ্য পথে অর্থাগমনের দরজা কিঞ্চিৎ বন্ধ হওয়ায় পুলিশের ক্রোধের কারণ ঘটেছে। পুলিশের জৌলুষ নেই, তার অপ্রতিহত প্রতাপ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তুচ্ছ জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে এই সব ভেবে তারা আহত ও ক্ষুব্ধ। কিন্তু আহত সাপের মত তারা ভয়ংকর হয়ে আছে, সুযোগ পেলেই ছোবল বসিয়ে দেবে। হওড়ার ঘটনা তারই অঙ্গুলি-নির্দেশক। এখনই পুলিশের মধ্যে এই রোগের প্রতিকার করতে না পারলে বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গিরণ অসম্ভব নাও হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, হাওড়ায় পুলিশ শ্লোগান দিয়েছিল ঃ 'এই যুক্তফ্রন্ট সরকার খতম হোক'। অবশ্য জনসাধারণের বিরুদ্ধে পুলিশের কিছু অভিযোগ আছে। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে অকারণ অপমানিত হচ্ছেন এমন ঘটনা শোনা গেছে। আর এই সঙ্গে পরাজিত কংগ্রেস নেতারা পুলিশকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে, যাতে পুলিশ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীলতা কোনরকমে সংঘবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিপন্ন করতে না পারে।

—এস· কে· শর্মা

ভ্রম-সংশোধন

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ৫০শ সংখ্যা (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪)-য় প্রকাশিত 'অবক্তব্য'তে (পৃ ১৩৪১) একটি মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। ঐ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলামে তৃতীয় প্যারাগ্রাফে ১০-১৬ পংক্তি এভাবে পড়তে হবে ঃ "তাহলে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে সেই প্রকাশককে তাঁদের রচনা ছাপতে দিতেন না, যে প্রকাশক ১৯৩০ সালে মাত্র দু'হাজার টাকায় নজরুলের দু'শ কবিতা ও গানের স্বত্বকে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং সেই তারিখ থেকে অদ্যাবধি বিস্তর মুনাফা করা সত্ত্বেও যে-স্বত্ব কবিতা ও গানগুলির স্বত্ব ছাড়ছেন না।"

দশভুজ(আ)---

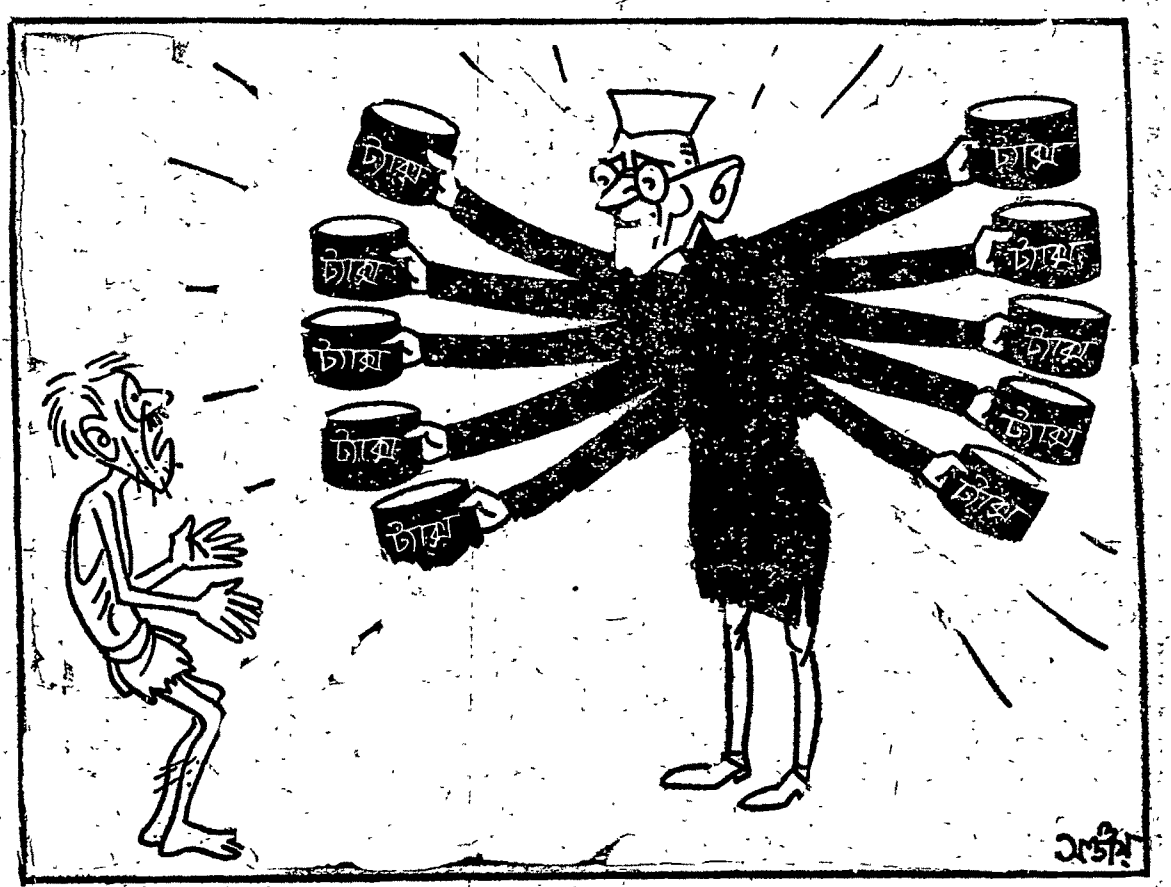

অনেক মেহনত করে বিচ্‌কে একটা ইঁদুর-ধরা-কল তৈরি করল। শেতল প্রামাণিকের গুদামঘরে ইঁদুরের বড় উৎপাত। হৃষ্টপুষ্ট বেড়ালছানার মত এক-একটা ইঁদুর। দাঁড়িপাল্লায় চাপালে এক-একটার ওজন এক কে-জি হবে।

বিচ্‌কে গ্রামের ছেলে। ষোল বছরের অপুষ্ট শরীর, কিশোর। নালা-নর্দমায় ভেসে বেড়াত। লাথি-ঝাঁটা খেত পরের। ছেলেটিকে জানকীরাম শেতল প্রামাণিকের দোকানে নিয়ে এসেছিল। ঝাঁট-পাট করবে। ধুনো গঙ্গাজল দেবে। মাল ওজন করবে।

কাজটা মোটেই বিচ্‌কের পছন্দ হয় নি। পাল্লার কাঁটা ধরে তেল নুন ডাল মাপা। মালে কম দিয়েও দুটো পাল্লার মাঝখানের কাঁটা কি করে যথাস্থানে ধরে রাখা যায়, এ বিদ্যা আর কৌশল কিছুতেই রপ্ত করতে পারল না সে। কাজেই প্রথম দিকে শেতল প্রামাণিকের ব্যবহারে যে মধু ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে তিক্ততা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিল। কতদিন আর শেতল প্রামাণিকের মুখ-ঝামটা সহ্য করবে বিচ্‌কে! টিন থেকে একটু তেল কি গুড় ভুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল, কি একটা জিনিস ওজন কবে খদ্দেরকে দিতে দেরি হোল, ব্যস্‌ অমনি একরাশ ইতর কথা তার ওপর বর্ষণ হতে শুরু করল। বিচ্‌কে জানে, কেবল জানকীরামের জন্যে তার কাজটা টিকে আছে।

বাবু, ওকে তাড়াবেন না। ছেলেটা খুব বিশ্বাসী। ওকে কাজে লাগবে।

কিন্তু ও যে আমার এদিকের কারবার ফেল করিয়ে দেবে।

শেতল প্রামাণিকের সামনেই বিচ্‌কেকে শাসন করে জানকীরাম।

মন দিয়ে কাজ করবি। বাবু যা বলবে শুনবি। কাজ গেলে তোকে আর কেউ কাজ দেবে না।

বিচ্‌কেকে হাতের ইসারায় যেতে বলে শেতল।

বাবু, ছেলেটা আপনার ক্যাশ থেকে পয়সা সরায় না?

শেতল মাথা নাড়ে।

না, এদিক থেকে ছেলেটা খুব বিশ্বাসী। কতদিন ক্যাশ খুলে চলে গেছি। কৈ, একটা পয়সা সরিয়েছে বলে মনে হয় না।

বাবু, ছেলেটা বিশ্বাসী জেনেই এনেছি। ঠিক করেছি, ওকে দিয়েই এদিকের কাজটা চালাব।

ও কি পারবে?

কি এমন শক্ত কাজ। ওর চেয়ে কত ছোট ছেলে দিন-দুপুরেই দু'-তিন মন করে মাল পাচার করছে।

তুমি খড়ের গাড়ি এনেছ কি?

এনেছি। দশ কিলো আছে।

এত কম?

বেশি মাল আনতে আর সাহস হয় না। সরকার পাল্টে যেতে ওরা ঘুষ নেয়াও বন্ধ করেছে।

বিচ্‌কে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেতল প্রামাণিকের সঙ্গে জানকীরামের যে কি সম্বন্ধ তা আজও অব্দি বুঝতে পারে নি বিচ্‌কে। জানকীরাম শহরে খড় বেচতে আসে। প্রতি হাটবার খড় বোঝাই গাড়িখানা তার দেখা যাবে এই শেতল প্রামাণিকের দোকানের সামনে। গাড়ির খড় গাড়িতেই থাকে। লাইটপোস্টে বাঁধা থাকে শীর্ণকায় বলদ দুটো। কেউ খড় কিনতে এলে জানকীরাম জবাব দেয়—খড় বিক্রি হয়ে গেছে, বাবু।

দোকানের মধ্যে শেতলবাবুর সঙ্গে কি-সব কথা হয়।

বিচ্‌কে একদিন ঠিক করে ফেলেছিল, এ-কাজ ছেড়ে দেবে। ছেড়েও দিত, যদি না এই রকম এক উত্তেজনাপূর্ণ কাজ না পেত সে। হঠাৎ একদিন শেতল প্রামাণিকের

গুদামঘরে ইঁদুরের উপদ্রব শুরু হোল। কে জানে, কোন্ চোরা-গর্তে লুকিয়েছিল এত ইঁদুর। হঠাৎ এক রাত্রে তাদের লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেল। অনেক গভীর রাতে নিঃশব্দে আসে তারা। আর রাত শেষ হবার আগেই নিঃশেষ করে দিয়ে যায় যেখানের যত শস্য।

আকারে ক্ষুদ্র হলেও এমন ভয়ঙ্কর জীব দ্বিতীয় নেই। শুধু বাংলা দেশের ভাঁড়ার থেকে এরা কি পরিমাণ শস্য প্রতিদিন নষ্ট করছে, তার একটা হিসেব কষলে যে-কেউ-ই বিচলিত হবে। এই জাতটা নাকি অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। অতএব ইঁদুর মার। শস্য বাঁচাও।

ইঁদুর মারতে পটু এই বিচ্‌কে। গ্রামে এক সময় তারা দল বেঁধে ইঁদুর বধে বার হ'ত। বিরাট এক মাঠে শুরু হোত ইঁদুর-নিধন যজ্ঞ। মাঠের মধ্যে কোনখানে ইঁদুরের চোরা-গর্ত আছে আগে তা সন্ধান হোত। ইঁদুরের গর্তের সন্ধান পেলে যোগাড় হোত শুক্‌নো খড় পাতার। দাহ্য বস্তুতে ঠেসে দেওয়া হোত গর্তের মুখ। তারপর তাতে আগুন ধরানো হোত। গর্তের মুখ থেকে আধ-ঝলসানো প্রাণীটি বেরিয়ে এলে তাকে ঠেঙিয়ে বধ করা হোত।

কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। না, আধ-ঝলসানো ইঁদুরের মাংসের জন্যে নয়—ইঁদুরের গর্তে যে জমানো শস্য আছে, তারই উদ্ধারের জন্যে। এক-একটা গর্ত থেকে কম করে একপো-আধপো শস্য বেরুত।

বিচ্‌কে কল পেতে দু'দিনে দুটো ইঁদুর ধরল। ছোট ছোট দুটো ইঁদুর। এখনো গা থেকে লালচে ভাব কাটে নি। দুটোকেই ঠ্যাঙে সুতো বেঁধে বাসের চাকার তলায় পিষ্ট করে মারা হোল। এসব ব্যাপারে বিচ্‌কের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই।

সে বলে, শালারা আমাদের খাবার নষ্ট করে, জিনিস-পত্তর কাটে, ওদের এমনি করে মারব না তো কাদের মারব?

একদিন একটা খুব বড় ইঁদুরের অস্তিত্ব টের পেল বিচ্‌কে। সকাল বেলা গুদামঘর খুলে যেখানে ইঁদুর-কলটা পাতা হয়, সেখানে এসে দেখে কলটা নেই। দুটো বস্তার ফাঁকে সেটা আটকানো। টেনে বলটা বার করল। যা ভেবেছে, তাই। কল কেটে শালা পালিয়েছে।

ইঁদুরটা ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারী। দাঁতে ওর ইস্পাতের ধার। চলাফেরা অত্যন্ত দ্রুত। খুব চতুর। একবার কল কেটে বেরিয়ে এসে আর দ্বিতীয়বার সে সেই ফাঁদে পা দিল না। অন্যগুলোকেও সতর্ক করে দিয়েছে।

বিচ্‌কে ভাবতে লাগল কি করে ওটাকে ধরা যায়। ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারী চতুর লোভী জীব ছাড়া থাকলে অচিরেই সব শস্য উধাও হয়ে যাবে। ওটাকে যেমন করে হোক ধরতেই হবে। বিচ্‌কে সেই ভাবনায় মগ্ন।

ইতিমধ্যে একদিন জানকীরাম এসে হাজির। শেতল প্রামাণিকের দোকানের পাশে দেখা গেল সেই খড়ে বোঝাই গরুর গাড়ি। লাইটপোস্টে বাঁধা শীর্ণকায় দুটো বলদ।

আজ কতটা আছে?

আজ এক ছটাকও দিতে পারবো না। বড্ড কড়াকড়ি।

তোমাকে দিয়ে-আমার কারবার চলবে না।

সামনে হাটবারে আনবো।

আগের বারেও তাই বলেছিলে। মোটে দশ কে-জি দিয়ে গেছ।

এবার বেশি আনবো।

কতটা?

কুড়ি কে-জি।

মোটে।

জানকীরাম চুপ করে রইলো। পরে বলল, আজকাল শুধু পুলিশ নয়, জনসাধারণের এদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি। কাগজে ঘটনাটা পড়েছেন তো?

কি?

মাতাদীনের গুদাম ঘেরাও করে পঞ্চাশ বস্তা চাল উদ্ধার করেছে ওরা।

শেতল হাসল। মুচ্‌কি হাসি।

তুমি আমার চোরাকুঠুরিতে ঢুকেছ কোনদিন? পিঁপড়েরাও তার সন্ধান জানে নি।

বেশ। এই হাটবারে আমি কিছু বেশি মাল দিয়ে যাব। তবে খড়ের গাড়ি আর আসবে না, আসবে কুমড়োর গাড়ি।

চালকুমড়ো? হা হা করে হাসে শেতল। হাসি থামিয়ে বলে, ছোঁড়াটাকে এবার বেশ ভাল কাজ দিয়েছি হে।

কি কাজ?

ইঁদুর মারা কাজ। শালারা বড্ড উপদ্রব শুরু করেছে। আমার চোরাকুঠুরির সন্ধান পেলে আর রক্ষা রাখবে না।

গুদামঘরের পাশে একটি ঘরে বিচ্‌কের শোবার জায়গা। ঘরটা আগে গুদামঘরের অংশ ছিল। পাঁচিল তুলে আলাদা করা হয়েছে।

রাত অনেক। হয়ত শেষ রাত। বাইরে হটর হটর গরুর গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আজ হাটবার।

বিচ্‌কের ঘুম আসছে না। ক'দিন ধরেই আসছে না। সেই ধূর্ত লোভী ভয়ঙ্কর ইঁদুরটা তার চিন্তার রাজ্যে চলাফেরা করছে। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, একটা মস্ত ইঁদুর। চারদিকে যত শস্য আছে সব সে তার চোরা-গর্তে নিয়ে গিয়ে পুরছে। ইঁদুরটাকে কেউ মারতে পারছে না। মারবে কি করে, তার চোরা-গর্তের সন্ধান কেউ জানে না।

খাবারে বিষ মিশিয়ে এখুনি ওটাকে মারা যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় শেতল প্রামাণিকের আপত্তি। যদি ওই ইঁদুর না মরে অন্য কিছুতে মুখ দেয়! শেতলের নিজের মরার ভয়টাই বেশি।

খুট্ খুট্ খুট্। বিচ্‌কে কান খাড়া করল। ঐ আবার শব্দ! ইঁদুর কি এত সতর্ক হয়ে শব্দ করতে পারে।

খট্-খটাং। ইঁদুর কি দরজা খুলতে পারে! বিচ্‌কে উঠে বসল।

ফিস্ ফিস্ করে কারা? ইঁদুর কি কথা বলতে পারে!

রুদ্ধশ্বাসে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল বিচ্‌কে। গুদামঘরে টিম্‌টিমে কুপি জ্বলছে। কুপি হাতে আর কেউ নয়। স্বয়ং শেতল প্রামাণিক।

মস্ত বড় বড় কুমড়ো। কুমড়োগুলো বয়ে আনছে জানকীরাম।

রাত কি তবে ফর্সা হয়ে গেল? বিচ্‌কে বাইরে তাকাল। না, এখনো আকাশে গাঢ় অন্ধকার। আজ হাটবার। গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে হাটে কুমড়ো আসে। কিন্তু তা তো কোনদিন শেতল প্রামাণিকের গুদামে ওঠে না?

বিচ্‌কে আবার ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। আর সেই মুহূর্তেই একটা কুমড়ো জানকীরামের কাঁধ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল চালগুলো।

বিচ্‌কে অবাক হয়ে গেল। তাহলে ঐ কুমড়োগুলোর মধ্যে চাল আছে। কি ভাবল সে। এবার সে বুঝতে পারল জানকীরামের সঙ্গে শেতল প্রামাণিকের কিসের সম্বন্ধ। ঐ খড়ের গাড়িতে লুকিয়ে চাল আসে এখানে। আর এই চাল আসে বিচ্‌কের গ্রাম থেকে।

একটা হৃষ্টপুষ্ট থল-থলে ইঁদুর। লোভী ধূর্ত ভয়ঙ্কর ইঁদুরটাকে বিচ্‌কে দেখতে পেল। তাদের গ্রামের সমস্ত শস্য যে ইঁদুরটা তার চোরা-গর্তে নিয়ে এসে জমাচ্ছে।

রাত থাকতেই বিচ্‌কে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। লোক জমাতে হবে। অনেক লোক। না হলে অতবড় ইঁদুরটাকে ধরা যাবে না।

কিস্তিবন্দী হিসাবে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৩০৲ টাকা কিস্তি হিসাবে অভঙ্গুর, প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার ক্রয় করুন। মূল্য ৩২০৲ টাকা।

আবেদন করুন :

Jagsons Agencies (WBC—88)
P.B. 1212, Delhi-6.

আকাশবাণী-পরিক্রমা

মেঘদূত

'আকাশবাণী' নামটির সর্বভারতীয় রূপ অক্ষত রইল না। মাদ্রাজের ডি, এম, কে, সরকার আকাশবাণীর মতো একটি অপূর্ব মিঠে নাম দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নিঃসন্দেহে অতীব মর্মান্তিক ঘটনা, বিশেষ করে 'আকাশ-বাণী' নামটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

মাদ্রাজ সরকারের এহেন আচরণের জন্য দিল্লীর দুই-দুই মনোভাবকে দায়ী করবেন অনেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দির প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে তামিলনাদের এই আচরণ। ভারত সরকারের মনোরাজ্যে মাত্র একটি ভাষা সুয়োরাণীর গদিতে বসবার অধিকার পেয়েছে, আর সংবিধানে উল্লিখিত বাকী চোদ্দটি ভাষার কপালে ভর করেছে দুয়োরাণীর দুর্ভাগ্য। বলতে পারেন, কেন এই পক্ষপাতিত্ব? পারলেন না তো,—উত্তর খুব সোজা, দেশের সংহতির জন্য এর প্রয়োজন।

পরিবারের কর্তা ঘরের পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে বঞ্চিত করে একটি আহ্লাদে ছেলেকে গোগ্রাসে গেলালে কি সুফল পাওয়া যাবে! ভাবতে কষ্ট বোধ হয়, এই অতি সহজ তত্ত্বটুকু ভারত সরকারের বুঝতে এত দেরি হচ্ছে কেন? হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা দেবার জন্য আকাশবাণীকে প্রচারের নির্লজ্জ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সংহতির নামে তথ্য ও বেতারমন্ত্রণালয়ের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব অহিন্দিভাষীরা কি বলে সমর্থন করবে। প্রতিটি সভ্য মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা হচ্ছে জীবনবেদ। মাতৃভাষার প্রতি অবমাননা মানুষ সহ্য করতে পারে না। যে জাতি তার মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পারে নি সে জাতির সংস্কৃতি বা অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভাষার ব্যাপারে সভ্যসমাজে জবরদস্ত মনোভাবের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। এমনতরো মনোভাবই আজ আমাদের ভাঙনের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে না কি!

বাঙলায় খবর শুনছি। শোনা শেষ হয়ে গেছে, দেখছি শিবু বার হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন খবর পড়ার সময়ে এসে দাঁড়ায়, বাড়ি বাড়ি ডিম বিক্রি করে। রেডিওতে বাঙলায় খবর শুনতে ভালোবাসে। শোনা যায়, শিবু নাকি এ সব খবরের কিছু-মিছু নিজের আন্ডায় ছেড়ে দিয়ে মাতব্বরি করে। ওকে হঠাৎ বলতে শুনলাম, পাকিস্তানে ঝেঁটিয়ে বান ডেকেছে। আমি বললাম, সেকি গো শিবু, তেমন তো শুনলাম না। অবশ্য এও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলাম, আকাশবাণী প্রচারিত 'ঝঞ্ঝা-বাত্যা' ওর কানে পৌঁছেচে ঝেঁটানো বান হয়ে। তাইতো হবে, যে-মানুষের অক্ষরজ্ঞান হয় নি সে দাঁতভাঙা লম্বা লম্বা তথাকথিত তৎসম শব্দের সঙ্গে কিভাবে পরিচিত হবে? বাঙলা খবরের কাগজ পড়তে পারে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা তিরিশের বেশি নয়। অর্থাৎ বাকী সত্তরজন লোক খবর জানতে পারে হয় আকাশবাণী মারফৎ না হয় লোকের মুখ থেকে। মুখের খবর অনেক সময় শিবুদের কৃপায় 'ঝেঁটানো বান' হয়ে নিরক্ষর সমাজকে মাতিয়ে তোলে। এ হেন অবস্থায় নিরক্ষর মানুষকে খবর শোনাতে বেছে বেছে তাল তাল কড়মড়ে শব্দ ছুঁড়ে মারবার কি দরকার। এ যেন মুখ্যুকে 'পণ্ডিত' বলে উপহাস করা। দেশের অক্ষরজ্ঞানহীন জন-সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সংবাদ পরিবেশন করলে শব্দ চয়নের ত্রুটিগুলি বহুকাল পূর্বে ধরা পড়তো। সাধারণকে বোঝাতে ছোট ছোট সহজবোধ্য শব্দ চয়ন করা চাই, বাক্য অত্যন্ত সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেতার প্রচারিত সংবাদে বাক্যের চেহারা অহরহ এত প্রাচীন (archaic) হয়ে পড়ে যে তা' আর আজকের বাঙলা ভাষা বলে মনে হয় না। ধারনা হয়, ঊনিশ শতকের সংস্কৃতের আওতায় লালিত বাঙলা গদ্য শুনছি। তাই সবিনয়ে বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করি, দয়া করে পাণ্ডিত্যা-ভিমানের কাঁচ-ঘর থেকে বার হয়ে আসুন সাধারণ মানুষের মুক্ত প্রান্তরে, আর মনে করুন, আমরা বিশ শতকের উত্তর-ষাটের যুগের মানুষ। একথা বলি, কারণ, আজকের বাঙলা ভাষার স্বরূপটিকে স্মরণে রেখে খবর বিলি করা চাই। অন্যথায় প্রচা-রিত খবরের ভুল অর্থ হবে নিরক্ষর মানুষের হাতে। দেশে বহিরাক্রমণের সময়ে বড়ো বড়ো পোস্টার পড়ে, তাতে লেখা থাকে 'গুজবে কান দেবেন না।' তখন শিবুর কি দোষ বলুন তো, সে যদি উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চড়িয়ে 'ঝেঁটিয়ে বান ডাকায়,' সেটা কি তার ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলে গণ্য হবে? গুজব রটানোর একটি বড়ো অস্ত্র স্বয়ং আকাশবাণীর হাতে ঝলমল করছে। বেতারের মাধ্যমে যে ধরনের ভাষা প্রচারিত হয় তাতে করে মনে হয় যেন দেশের শত-করা একশোজন লোকই শিক্ষিত।

রাত্তির দশটায় প্রত্যহ 'সংবাদ পরিক্রমা' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ হয় তার ভাষা বুঝতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ সরবরাহ করতে চাই কি চলন্তিকাও ফেল করে যেতে পারে। এই অনুষ্ঠানটির নাম কেন যে 'সংবাদ পরিক্রমা' হলো তাও বোঝা গেল না। অনুষ্ঠানটির আলোচনা দেশের মুষ্টিমেয় পণ্ডিতলোক ছাড়া কারুর মগজে ঢুকবে না।

এসব দেখেশুনে মনে হয়, বেতার কর্তৃপক্ষ দেশের ভাষাতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন, বিশেষজ্ঞরা স্থির করে দেবেন বেতারে প্রচারিত ভাষার (বাঙলা সংবাদ, সংবাদ সমীক্ষা, স্থানীয় সংবাদ, সংবাদ পরিক্রমা, সংবাদ বিচিত্রা, পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ) চেহারা কেমনতরো হওয়া উচিত।

৯-১৫ মে ১৯৬৭-র বেতার জগৎ-এর প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা একখানি চিত্র ছাপা হয়েছে। ছবিটি বেশ ভালোই লাগলো। বেতার জগৎ-এর পাতা উল্টে যাচ্ছি আর রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে বেতার বক্তাদের মুদ্রিত আলোচনায় চোখ বোলাচ্ছি। সর্বশেষ আলোচনায় এসে দৃষ্টি হঠাৎ হোঁচট খেলো একখানা প্রায়-উলঙ্গ আলোকচিত্রের ওপর। লেখিকার নিজের ছবির মাথার ওপর আন্দামানের আদিবাসী এক ওঙ্গী দম্পতির নগ্নপ্রায় ছবি শোভমান। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখিকা আদিবাসীদের সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। অথচ এ ছবিখানা ছাপানোর কি কারণ থাকতে পারে তা বোঝা গেল না। বেতার জগৎ সম্পাদককে জিজ্ঞেস করি, 'উলঙ্গ সংস্কৃতি' ছাড়া হতভাগ্য আদিবাসীদের সম্পর্কে কি কিছুই বলার নেই, আর তা' বোঝাতে অব্যক্ত pictogram-এর মতো শুধু ওই ছবিখানা ছাপিয়ে দেওয়া হলো?

২০শে মে, বড়ে গোলাম আলি খান্ তিনবার গাইলেন, দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান। তাঁর গান শুনতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। অনুষ্ঠানটির জন্য বেতার কর্তৃপক্ষ প্রশংসা পাবেন। একই দিনে গাইলেন লীনা ঘটক। গাইলেন—খেয়াল, ঠুংরি, আধুনিক এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান। বেতার কর্তৃপক্ষের মতে শ্রীমতী ঘটক হয়ত একজন সুদক্ষ শিল্পী, তবু বলি, এক দিনে একজন শিল্পীর জন্য এতটা সময় ছেড়ে না দিলে হয়তো ভালো দেখাতো।

২৩শে মে, বুদ্ধপূর্ণিমার পবিত্র দিনে কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত রচিত 'মহাপরি-নির্বাণ' সঙ্গীতালেখ্যটি একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান, এতে সুর দেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। গানগুলি সুগীত।

২৪শে মে ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যে সংস্কৃত চর্চা : বাংলা কথিকাটি সুপাঠ্য

CALCUTTA CENTRAL

আশ্চর্য কলকাতা

বেণু দত্তরায়

আশ্চর্য কলকাতা দেখলাম।
হাড়ের পাথরে গড়া বাংলাদেশ—তার নাম
রাজধানী কলকাতা!

তুমি জানো কী মন্ত্রে বেদনা গান হয়
গুলী খেয়ে লুটোবার আগে
বুকের হিরণ-জ্বালা ঢেলে দেলে
রক্তাক্ত পাথরে।
যে তার দুধের ভাই—তাকে বলে গেল—
আমার বুলেট-বিদ্ধ কলজের বদলা নিস্ তুই
মুখু কেশ মা আমার বিদীর্ণ-হৃদয়
তার শোক যেন ক্রোধে আগুনের বৃষ্টি হ'য়ে ঝরে!

আশ্চর্য কলকাতা তাই
হুসেনেরা রমেশেরা পাশাপাশি উদ্দীপ্ত দাঁড়িয়ে
হাড়ের পাথরে গড়া বাংলাদেশ—
কী ভেল্‌কি দেখালো
চারদিকে সবাই দেখছে,
আমি দেখছি, তুমি দেখছ, সবাই উৎসুক
নব প্রাণস্পন্দনের আশ্চর্য কলকাতা!
অন্যায়ের ক্ষমা করতে কলকাতা শেখে নি!

রমেশ শীল স্মরণে

সুফিয়া কামাল

চীন বটের শিরে কত ঝঞ্ঝা, কত প্রভঞ্জন
স্বাক্ষর রাখিয়া গেছে বলে প্রহরা
তবু তার শতশাখা বাহু বিস্তারিয়া
ছায়ায় করেছে শ্যাম ধরণীর হিয়া।
এই দেশ! এদেশের মানুষের প্রাণ
করেছে সরস যার দুঃখ ব্যথা জাগানিয়া গান
মাঠে-ঘাটে গলাগলি, কোলাকুলি মানুষে মানুষে
ভুলায়ে বিদ্বেষ নীল বিষে
এনেছে শ্যামল স্বপ্নঘন
বাঁচিবার বাঁচাবার নিত্য নিমন্ত্রণ
গাথায় গাথায় ভরি চারণ সাধক কবি তার
নিত্য নিত্য দিয়ে উপহার
হতাশায় ক্লিষ্টমনে কর্মক্লান্ত ক্ষণ অবসরে
উদাত্ত কণ্ঠের সুরে ভরে
এদেশের মাটি ও মানুষ
আত্মার আত্মীয় করি স্নেহে ভালবেসে
ডাক দিয়ে গেছে বার বার
কী দিয়ে শুধিব ঋণ তার?
তুচ্ছ এক তৃণ আমি চাহি সেই মহীরুহ পানে
নোয়াই শীষের শির, সে চারণকবির সম্মানে!

শকুন

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

শকুন উড়ছে দেখলে এক বিষণ্ণ ছবি মনে পড়েঃ
বাংলা দেশের সেই নিরন্ন দিনগুলি
সেই ক্ষুধার্ত রাতগুলি, আর প্রেতচ্ছায়ার মতো
কঙ্কাল-মানুষের দীর্ঘ মিছিল, পথে মৃতদেহ আর
লঙ্গরখানার সামনে করুণ চীৎকার—
সহসা স্মৃতির ভিতর বড় শব্দহীন জেগে ওঠে!
তাই শকুন উড়ছে দেখলে আমি বুকের ভিতর
এক বিশাল শ্মশানের ছবি, এক অন্তহীন হাহাধ্বনি
অনুভব করি।

নিষ্পত্র গাছের ওপর কোথায় শকুন থাকে, কিছুকাল
বেশ ভুলে ছিলাম।
আবার আজ এই গম্ভীর সকালবেলা কাগজ খুলে
বাঁকুড়ার মাঠে অশুভ নকশার মতো দেখতে পাচ্ছি
সেই দীর্ঘ ডানার কালোছায়া, সেই আকাশে ভয়ানক
বাতাস কেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি পুরুলিয়ায়...
মালদহে...পশ্চিম দিনাজপুরে...

মৃত শিশুর মুখের মতো আজ বড় থমথম চারদিক!

আলোচনা করলেন ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য। বক্তা তথ্যবহুল আলোচনাটি বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ করে বলতে চেষ্টা করেছেন। তবে দীর্ঘ সংস্কৃত উক্তিটির বাঙলা অনুবাদ দিলে বোধহয় বক্তা ভালো করতেন।

তবে বর্তমানে বেতারের বহু অনুষ্ঠান বেতারকর্মী ও Staff artist-দের দিয়ে করানো হচ্ছে। ফলে অনুষ্ঠান অত্যন্ত গতানুগতিকধর্মী হচ্ছে। এক কণ্ঠ এক ভঙ্গী বার বার শোনা যাচ্ছে এবং শ্রোতারা বিরক্তবোধ করছেন। বেতার জগৎ-এ বহু অনুষ্ঠানের বক্তার বা শিল্পীর নামোল্লেখ করা হয় না। কেন নামোল্লেখ করা হয় না তার জবাবদিহি করা উচিত কর্তৃপক্ষের। প্রতিটি বক্তা বা শিল্পীর নাম বেতার জগতে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করি।

১৭ থেকে ২৭ মে '৬৭ তারিখের মধ্যে একজনকে নব নব রূপে পাওয়া গেল—স্বরচিত কবিতা পাঠে, নাটক রচনায়, গ্রন্থনায়, প্রযোজনায়। আকাশবাণীর তিনি কর্মী। ২৭শে মে তাঁর প্রযোজিত (বেতার জগতে নাম অলিখিত) কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে (বিচিত্রাঃ বাংলা রূপক) শেষ কবির উক্তি 'শুধু কবিতার জন্য আমি আমার অমরত্ব তাচ্ছিল্য করতে পারি বিমল আনন্দ দিতে পেরেছে শ্রোতাদের। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এক-এক দশক ধরে অনেক কবির কবিতা পাঠ তাঁদের স্বকণ্ঠে ও ভিন্ন কণ্ঠে শোনানো হলো। পঞ্চাশ দশকের গোজামিল দিতে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাসের মতো কবিদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হলো না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা থেকে গুণে দুটো লাইন মাত্র দু' সেকেণ্ড (সবচেয়ে কম সময়!) শোনা গেল। আকাশবাণীর এ-কৃপাটুকু না পেলে কবি যতীন্দ্রনাথের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো না। কারণ, বাদ দিয়ে বা অবিচার করে সত্যকার কবিদের চেপে রাখা যায় না। বেদনা বোধ হচ্ছে, আকাশবাণী-পরিক্রমা করে কবি পরিচিতির কি অপূর্ব নমুনা পেল মেঘ

গ্রন্থমেলা

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য—ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য ঃ ৪·৫০।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবেদন এমনই সর্বজনীন যে, তা দেশকালের সীমা পার হয়ে ভাষান্তরে সর্বমানুষের প্রাণের কাছে পৌঁছেচে। অধিকন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য অন্যান্য ভাষার সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার সম্যক আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু ঘরের পাশে ভারতীয় সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রসাহিত্য—আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ আলোচনার যে অভাব ছিল তা ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎ পরিমাণে দূর করলেন। এই ধরণের প্রভাব বের করার কাজটা মুখে বলা সহজ হলেও আসলে কাজে-কর্মে ততোটা সহজ নয়। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা থাকলেই প্রভাব বের করা সম্ভব। তাছাড়া, ঐ সব ভাষায় জ্ঞান থাকাটাও প্রাথমিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সাধক-পাঠক এবং ভারতীয় কয়েকটি ভাষার সঙ্গে তাঁর জ্ঞান তীক্ষ্ণ হওয়ার উপরি উক্ত তথ্যমূলক ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। গবেষকের কাজ তথ্যসংগ্রহ, রসিকের কাজ রসসঞ্চারিত করা—এই দুয়ের হরগৌরী মিলন ঘটিয়েছেন ডঃ চট্টোপাধ্যায়।

তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার এই গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রমাণিত হলো যে, বাংলা ভাষার ধমনী থেকে সাহিত্যের যে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে, ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলিকে তা সতেজ করতেই সাহায্য করছে। সেই কারণে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা ও ঐসব ভাষার সাহিত্যকে সমান স্বীকৃতি দান প্রয়োজন। তিন ভাষা-সূত্রের কথা বলে যাঁরা হিন্দীকে অপরের ওপর বলপূর্বক চাপাতে চান, তাঁদের উচিত হচ্ছে ভারতীয় ভাষাগুলির কাছে হিন্দী কিভাবে ঋণী তার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা। তাহলে তাঁরা ভারতীয় ভাষাগুলির মর্যাদা উপলব্ধি করবেন এবং হিন্দী ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ স্থাপনের একগুঁয়েমী-ভাব ত্যাগ করতে পারবেন। বাঙালীকেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দীর ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃকপাত করিবে না।" ভাষার ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ আজ স্মরণীয় ঃ "যদিচ একীকরণ ইংরেজরাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের কৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন।" হিন্দীকে পৃথক মর্যাদা দানের দ্বারা একালেও ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি করা হচ্ছে—তা আর বিশেষভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

"রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য" গ্রন্থটিকে মোট সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাগাধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাংলার ভূমিকায় লেখক ভারতীয় সাহিত্য ও সাধনক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে অন্য সকলের সাংস্কৃতিক যোগ, ভিন্ন ভাষার সাহিত্যের উদ্ধৃতির সাহায্য নির্ণয় করেছেন। পরবর্তী পরিচ্ছদগুলিতে পাই ভারতীয় ভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের বিস্তারিত বিবরণ। তুলনামূলক আলোচনায় এসেছে ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, কন্নড়, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যের বিবরণ এবং ঐ সব ভাষার সাহিত্যের সাহিত্যিকরা কিভাবে গদ্যের স্টাইলে কাব্যের ভাব, ছন্দের নৈপুণ্য নিখুঁতভাবে অনুকরণ করেছে রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ওড়িয়া অসমীয়া হিন্দী সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব। অবশ্য এই যে প্রভাব—তা কি করে সম্ভব হলো তারো সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন ডঃ চট্টোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে প্রভাব এমনই যে, মনে হয় অনুবাদ। এই ধরণের প্রভাবে ঐ সব সাহিত্য ঋদ্ধ হয়েছে বলা চলে। সবচেয়ে বড় কথা, একা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যই বিরাট সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভব করেছে তা ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদের রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য বর্তমান গ্রন্থে অপরিহার্য ছিল না। কারণ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রবরণ ও বিরোধিতার আলোচনা একালে নতুন কিছু নয়।

মাই ইংলিশ জার্নি ঃ শ্রীসাধনকুমার ঘোষ—প্রকাশক ঃ রাইটার্স ওয়ার্কশপ, কলিকাতা (১৬২।৯২ লেক গার্ডেন্স, কলি-৩১) মূল্য ঃ দশ টাকা।

অধ্যাপক ঘোষের ইংলণ্ড পরিক্রমা বিষয়ক ইংরাজীতে লেখা বই—বইটি ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। অক্সফোর্ডের প্রখ্যাত অধ্যাপক সি, এম, বাউরা পরিচায়িকায় লিখেছেন—Sadhan Kumar Ghose is an Indian scholar who knows English literature better than most of us know it ourselves. His visit to England was that of a passionate pilgrim. With his wide reading, his generous understanding and his excellent memory, he set himself with delighted enthusiasm and unconquerable energy to examine the English scene. This friend from an ancient land knows what he is talking about, and it is our privilege to listen to him."

বইটির ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ফ্র্যাঙ্ক সুইনারটন্ যাঁকে বলা হয় লণ্ডনার পার এক্সেলেন্স। রচনাশৈলী এবং লেখার কারিগরী সৌকর্যের সার্থকতার জন্য সমালোচক-মহল সুইনারটনকে আর্নাল্ড বেনেটের যোগ্য শিষ্য হিসাবে গণ্য করেন। অধ্যাপক ঘোষের বইটি সম্বন্ধে সুইনারটন বলেছেন ঃ "Professor Ghose came, saw, and conquered....This book is never a dead book. It will amuse and instruct a host of learners to whom the personal reactions of living people will give new interest to a great literature."

বইটি পড়তে পড়তে এই কথাই আমার বার বার মনে হয়েছে যে ইংলণ্ডে তো কত লোকেই গেছেন এবং তার ভেতর অনেকে দীর্ঘকাল ওদেশে থেকেছেনও, আমাদের শিক্ষিতসমাজের মধ্যে ইংরাজী-সাহিত্যও অনেকেই ভালভাবে পড়েছেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ঘোষের মত ক'জন ওদেশকে এবং ওদেশের সাহিত্যকে এমন অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পেরেছেন।

ইংলণ্ডের বিদগ্ধ অধ্যাপকবৃন্দ এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে অধ্যাপক ঘোষ নিজের আলাপ-আলোচনার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আমাদের চোখের সামনেই ওসব ব্যাপার ঘটছে।

সমালোচক জে, বি, লিসম্যানের সঙ্গে শেক্সপীয়ার ক্রিটিক অধ্যাপক এ, সি, ব্র্যাডলের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাধনবাবু মন্তব্য করেছেন যে, ব্র্যাডলের শেক্সপীয়ার ক্রিটিসিজম সম্বন্ধে যে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাও নিঃশেষ হয়ে এসেছে এবং আবার নতুন করে ব্র্যাডলের অনুকূলে ঐ প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। কথাটা খুবই সত্য!

অধ্যাপক বাউরার সঙ্গে সাধনবাবুর যে কথাবার্তার বিবরণ এ বইতে পাওয়া যায় তা থেকে বাউরার অন্তরের আসল উদার মাহাত্ম্যের দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডি, এইচ, লরেন্স সম্বন্ধে সাধনবাবু বলেছিলেন যে, লরেন্স অযথা বেশি খ্যাতি পেয়ে গেছেন। প্রফেসর বাউরাও উত্তর দিতে গিয়ে জানান যে, এ বিষয়ে তিনি সাধনবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কেম্‌ব্রিজে ই, এম, ফরস্টার-এর সঙ্গে আলোচনার সময় অধ্যাপক ঘোষ বলেছিলেন যে, এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া পড়ে তাঁর মনে হয়েছে যে এর লেখক মুসলমানদের যত ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তেমনভাবে হিন্দুদের জানেন না। অধ্যাপক ফরস্টার কিন্তু এ কথা মানতে রাজী হন নি। অধ্যাপক এফ, এল, লুকাস —ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে বই লিখে যিনি বিদগ্ধসমাজে সর্বত্র পরিচিত—অধ্যাপক ঘোষকে চায়ের নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, আর্থার কুইলার কাউচের কেম্‌ব্রিজকে যদি দেখবার সুযোগ হত তবে অধ্যাপক ঘোষ কেম্‌ব্রিজের আসল চেহারা দেখতে পেতেন। ফরস্টার সম্পর্কে স্যার সিডনে রবার্টসের মন্তব্যটি ভারি চমৎকার— 'All I can say is that he cashed, in on the reaction against Kipling.'

সমকালীন সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা—অর্থাৎ যাঁদের যাঁদের সঙ্গে সাধনবাবুর আলাপ-আলোচনা হয়েছে—তাঁদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি পাঠকেরা উপলব্ধি করবেন এই বইটি পড়বার সময়। ডি, এইচ, লরেন্সকে নিয়ে যে বড় বেশি মাতামাতি করা হয়েছে—তাঁর দার্শনিক মতবাদে যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই—তিনি যে মানুষ হিসাবেও খুব উচ্চস্তরে বিরাজ করতেন না—ওদেশের সত্যিকার জ্ঞানীগুণীদের কথা-বার্তা থেকে তা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক ঘোষ। 'দি ম্যান হু লাভ্‌ড্‌ আইল্যাণ্ডস' গল্পটিতে লরেন্স যে স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জীকে নিয়ে ক্যারিকেচার করেছেন এই বিস্ময়কর তথ্যটি সাধনবাবুর লেখা থেকেই জানবার সুযোগ পেলাম। মোট কথা এমন একটি তথ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সচরাচর চোখে পড়ে না।

পদধ্বনি প্রতিধ্বনি—রবীন্দ্র গুহ। ইউরেকা পাবলিশার্স। ৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম ঃ আট টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটি রঙরুটদের জীবনালেখ্য। 'রঙরুট' কথাটি ইংরাজী 'রিক্রুট' শব্দেরই অপভ্রংশ। রঙরুটদের দৈনন্দিন জীবনের ওস্তাদ-ভীতি, ফৌজী-বিধিনিয়ম, শপথশৃঙ্খলা, হাসি-আহ্লাদের এক নিখুঁত অ্যালবাম এই বইটি। মিলিটারী ফৌজী আইনের রিক্রুটদের কোন মূর্তি নেই, স্বাতন্ত্র্য নেই, জাতি ধর্ম নেই—সকলেই রঙরুট অথবা খাঁটি জওয়ান। তাই এখানে হাবিলদার বলদেও সিং, ল্যান্স নায়ক হাফিজ আলি কিংবা রঙরুট স্বামীনাথন-এর মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই,—জংগীজওয়ানই এদের একমাত্র পরিচয়। মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠা, সমস্ত বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করা আর দশের জন্য দেশের জন্য জান দিতে প্রস্তুত থাকাই রিক্রুটদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। রিক্রুটদের বাঁধাধরা জীবন, দুঃসহ কষ্টকর শ্রম, নিঃসঙ্গতার মাঝে শ্রীবাস্তব মাস্টার, রঙরুট ছোটন, রাঙাদিদিমা প্রমুখ চরিত্র কাহিনীকে মাধুর্য ও বৈদ্যুতিক শক্তি দান করেছে।

রঙরুটের দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায়, তার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ আছে। রিক্রুটদের দুঃসহ জীবনের মধ্যে থেকে লেখক তাদের জীবনের অন্তর্নিহিত করুণ-রসটিকে নিঃশেষে ক্ষরিত করে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাবার্দ্রতার সনাতন ধারাটিকেই পুষ্ট করেছেন। মাঝে মাঝে লেখকের তীব্র শ্লেষাত্মক বর্ণনা এই করুণরসটিকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। তবে শেষের দিকে ভুয়ো বন্দীশিবিরে বিচারটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য। বইখানির প্রচ্ছদপট প্রশংসার যোগ্য।

অথবা নিষিদ্ধ মৃত্যু ঃ শিপ্রা পাল। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ঃ তিন টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা আজ নানা কারণেই উদ্দাম ও উন্মুখর। পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরপরম্পরায় অতি পুরাতন মূল্যবোধ—ধ্যানধারণা চিরাচরিত রীতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কেঁপে উঠতে শুরু করেছে। আজকের জীবন যেহেতু জটিল, মানুষের মন ও মানসিকতা যেহেতু অস্থির ও অসংবৃত, সে কারণে জীবন ও সমাজের ভাঙাগড়া ও তার রূপ নির্ণয় শিল্পিমানসের চেতন-অবচেতন-লোকে এক নতুন বোধের জগৎ তৈরি করতে চাইছে, যেখানে শিল্পীমাত্রেই ভিন্ন ও অপরিচিত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

হাল আমলের অনেক তরুণ কবির কাব্যচিন্তায় দেহসর্বস্ব শিল্পকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত মাতামাতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং তৎজনিত ক্ষোভ-বিক্ষোভ চীৎকার যন্ত্রণা ও অন্ধকারবিলাসিতার উৎকৃষ্ট আত্মপ্রকাশের পর্বে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের তরুণ কবিকে বিষয় নির্বাচনে পৃথক ও পরিণতিচেতন সুস্থ মনের মনে হয়েছে।

যে বিষাদমন্থর অস্থিরতা ও বেদনার বর্ণমালা হৃদয়কে ক্লান্ত করে, এমন কি জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলিকেও অবিশ্বাসী করে তোলে সে যন্ত্রণা তো অমল, তাই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে সেই অমল যন্ত্রণার অনুভূতি প্রকাশের সুস্থ-সুন্দর অনুষঙ্গ যে কোনো কবিতা পাঠককে মুগ্ধ করবে। প্রথমত কাব্যচিন্তায় সংস্কারাশ্রয়ী বিন্যাসে বীতরাগ, অকারণ 'আধুনিকতা'র মোহে অবিশ্বাস, শব্দ নির্বাচনে সংস্কার-হীনতা, আবেগের তীব্রতা ও সর্বোপরি এক আত্মক্ষয়ী অভিমানী কণ্ঠস্বর আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের সর্বত্র সঞ্চারিত। একই শব্দের প্রয়োগ একাধিকবার থাকলেও 'যন্ত্রণা'র অনুরণন জীবনকে অস্থির নৈরাশ্য ও বেদনাঘন স্তব্ধতা থেকে এক আপাত সহনশীলতার দিক নির্ণয় করেছে ঃ ধানের শীষের মতো কৈশোর লাবণ্যে ভরা/একটি করুণ মুখ মনে পড়ে'/এই প্রশান্ত আত্মজিজ্ঞাসায়। অন্যত্র তাঁর কবিতার এক বিরাট অংশ জুড়ে প্রেম ও ভালোবাসার অবক্ষয় ও তার সোচ্চার আর্তনাদ, নৈরাশ্য, মূল্য-বোধের অভাব চিত্রকল্পের নিপুণ প্রয়োগে তাঁর উপলব্ধিকে সজোরে নাড়া দিয়েছে ঃ 'হে প্রিয়! তুমি আমাকে ভেঙে প্রবাল দ্বীপ গড়ো/বিষাদ-নীল সমুদ্রের যন্ত্রণার তীরে, বেদনাবোধে গভীরে যাও, গভীরে যাও আরো'/এছাড়া 'কোনো জীবন্মৃতের প্রতি', 'অন্তর্জলি', 'কোনো এক বারাঙ্গনার স্বগতোক্তি', 'অথবা নিষিদ্ধ মৃত্যু' কবিতায় আজকের নগরকেন্দ্রিক জীবনের দ্বন্দ্ব-জটিল ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকাশ ঘটেছে।

যাঁরা গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা জানেন যে শোচনীয় পরিণতিটি ঘটার বহু আগে থেকেই নাট্যকার দর্শকমনকে তার জন্য প্রস্তুত করে দেন, এবং ঘটনাগুলি ধাপে ধাপে যেন অনিবার্য গতিতে শেষ পরিণতির দিকে ছুটে চলে। কোন অঘটনই ঘটনার গতির মোড় ফেরাতে পারে না।

ব্যাপারটা শুনতে খুব খারাপ লাগলেও বিশ্বাস করতেই হবে যে, কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা অপরাপর রাজ্যগুলির সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ইতিমধ্যে ধরেই গেছে, এবং সম্পর্কের উন্নতি না হলে এমন দিনও আসতে পারে যেদিন যোগসূত্রগুলি একেবারেই ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সাম্প্রতিক ঘটনাচক্র যেভাবে দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে সেই দিক থেকে বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে কোনদিনই কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবে না এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত তা তাঁরা সাব্যস্ত করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার শতকরা আশী ভাগ কেন্দ্রের হাতে রেখে কুড়ি ভাগ রাজ্যগুলিকে বিতরণ করা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে চিরকাল একটি বিশেষ দলই অধিষ্ঠিত থাকবে, কাজেই কুড়ি ভাগ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও রাজ্যগুলি কোনরূপ সোরগোল না তুলে কেন্দ্রের বশীভূত হয়ে থাকবে।

কিন্তু তাঁরা এটুকু খেয়াল করেন নি যে দিন বদলাতে পারে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যসমূহে অকংগ্রেসী সরকারও স্থাপিত হতে পারে। এ জিনিসটা গোড়া থেকে খেয়াল করলে তাঁরা কোন ব্যবস্থাপত্র হয়ত দিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু হায়, সে রকম কোন ব্যবস্থাপত্র দেবার প্রয়োজনীয়তা যে আছে এটুকু খেয়াল না করার দরুণ তাঁরা সংবিধানের মধ্যেই তথাকথিত 'ভারত যুক্তরাষ্ট্রের' যুক্তরাষ্ট্রত্বের কবর খোঁড়ার উপকরণ রেখে গেলেন।

সংবিধান রচয়িতাদের নির্বোধ বলার ধৃষ্টতা আমাদের নেই, তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তাঁরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন না, এবং তাঁদের অধিকাংশেরই শিক্ষা-দীক্ষা তথা শ্বিজত্বের ক্ষেত্র ছিল ইংলণ্ড, কাজেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, এইরকম কোন পরিবেশের সৃষ্টি হলে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই বৃটিশ ধরণের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হবেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা খেলোয়াড়ী মনোভাব গ্রহণ করবেন। কেন না একমাত্র গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধই গণতন্ত্র সৃষ্ট

হাওড়া পুলিশের আক্রমণে আহত মহম্মদ ইলিয়াস ও বন্ধু

সমস্যার সমাধান গণতান্ত্রিক উপায়েই করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধারগণের অনেকেই মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও আসলে ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য মোটেই গণতন্ত্রের ধার ধারেন না একথা আজ স্কুলের ছাত্রও বোঝে। কেরলে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকারকে যেভাবে "গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে" উচ্ছেদ করা হয়েছিল, সে স্মৃতি সকলেরই মনে আছে। সেই ঘটনার পর হয়ত কেরলে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকে নি, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনামের। কেন্দ্রীয় সরকার যে গণতান্ত্রিক আচরণ করবেন এবং অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে ভালোভাবে কাজ করতে দেবেন, একথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

এবং বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কোন আচরণ করেন নি যা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্বিষ্ট নন। বরং বিপরীতটাই সত্য। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতে যখন মারাই যাচ্ছে না তখন ভাতে মারতে দোষ কি? এবং একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন।

কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাতে মারার চেষ্টা করছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিলেন খাদ্যের জন্য, এবং বললেন যে গত বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তাও যদি কেন্দ্র না দিতে পারেন, তাহলে না হয় কিছু কমিয়েই দিন। কেন্দ্রীয় সরকার এই কথায় কোন কানই দিলেন না। কোন যুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরের তুলনায় এ বছরের বরাদ্দ এক চতুর্থাংশেরও বেশি কর্তন করলেন তা বোঝা গেল না। বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার থাকলে বরাদ্দ কর্তনের কোন প্রশ্নই উঠত না।

সে কথা যাক। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার জানালেন যে প্রতি মাসে এক লক্ষ টনের বদলে পচাত্তর হাজার টন করে গম পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হবে। দু মাস কেটে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র সতের হাজার টন। এটা কি নিছক খামখেয়ালী নয়? কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের কারণ কি? এ তো হক্কের জিনিষ।

যখন পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ আর দিনাজপুর দুর্ভিক্ষের মুখে, যখন অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যখন দেখা যাচ্ছে ক্ষুধিত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী দল যথাসর্বস্ব বিক্রয় করে বন্ধক দিয়েও দু'মুঠো খাদ্যের সংস্থান করতে পারছে না, তখন খাদ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নক্কারজনক রাজনীতি দেখে বলতে ইচ্ছা করে কি না 'ধরণী দ্বিধা হও'?

ভিক্ষা নয়, দয়ার দান নয়, হক্কের পাওনা। আর তা আদায় করতে গিয়ে রাজ্যের সেচমন্ত্রী নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছেন আর প্রধানমন্ত্রী ডিপ্লোম্যাটিক-

জুলেভ বক্রবদনে ঘন ঘন মাথা নাড়াচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গের এই খাদ্য সমস্যার অস্ত্র দিয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বধ করবেন। কিন্তু এ কূট-নীতির রহস্য বহু দিন আগেই ধরা পড়ে গেছে।

এরপর যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেন যে, পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সংকুচিত করে দেওয়া হবে, তাহলেই কেন্দ্রীয় সরকারের মাতব্বরেরা চেঁচিয়ে গগন ফাটাবেন এই বলে যে, গণতন্ত্র গোল্লায় গেল, জাতীয় সংহতি গোল্লায় গেল।

শুধু খাদ্য কেন, সকল বিষয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ডিগবাজী খাওয়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হন্যে হয়ে উঠেছে। অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাফ কথা—কিছু দিতে পারব না। পুনর্বাসনমন্ত্রী দিল্লী গেলেন উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে কিছু করা যায় কিনা সে বিষয় পরামর্শ করতে। এখানেও একই উত্তর—কিছু পারবো না। যদি কিছুই না পারবে তাহলে তোমায় মানবো কেন, এই প্রশ্ন তো সংগতভাবেই রাজ্য সরকার করতে পারেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছেন যে, পশ্চিম-বঙ্গে নাকি ল এণ্ড অর্ডার বিঘ্নিত হচ্ছে।

এই রকম আচরণ যদি পদে পদে কেন্দ্রীয় সরকার করে যান তাহলে বাধ্য হয়েই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যদি এই রকমই থাকে তাহলে জাতীয় সংহতি যে থাকতে পারে না—এ কথা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। নিছক দলীয় স্বার্থে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সম্ভব নয়, বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। তবে কোন পথে কিভাবে তা আসবে তা বলা যায় না। সমসাময়িক ঘটনাবলী একটা পরিণতি খুঁজছে, এবং সেই পরিণতি হতে পারে সম্পর্কের বিচ্ছেদে। তার দায়িত্ব নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়। তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, যে সরকার রাজনৈতিক বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে, ভারতের একটি অঞ্চলের মানুষকে তার প্রাপ্য অন্ন থেকে বঞ্চিত করে একটি বৈধ জনগণ-তান্ত্রিক রাজ্য সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করছেন।

পুরুলিয়ার ইছিন্দাপুর গ্রামের এই শীর্ণকায় ছেলে তিনটি লঙ্গরখানার খাবারের গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে

এই ঔদ্ধত্যের প্রতিবিধান হোক

॥ ১ ॥

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন মহলে যে চক্রান্ত চলছে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনীর একাংশ যে গভীরভাবে সংযুক্ত তা প্রমাণিত হল গত সোমবার ২২শে মে তারিখে হাওড়া থানার ঘটনায়।

'যুক্তফ্রন্ট সরকার হাওড়ায় চলবে না' এই ধ্বনি দিতে দিতে রণং দেহি মূর্তিতে হাওড়া থানার পুলিশ ইট-পাটকেল, পাথর, বেটন-লাঠি ইত্যাদি নিয়ে হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ, এম-এল-এ, এমন কি ভূমিরাজস্বমন্ত্রী সহ শত শত মানুষের উপর ওইদিন আক্রমণ চালায়।

হাওড়া হাটের একটি মসজিদকে ভেঙে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সেখানে একটি স্টল তোলার চেষ্টা করছিল যা জানতে পেরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওই মসজিদের জমি থেকে স্টলের কাঠামো ইত্যাদি অপসারিত করার জন্য হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া থানার ও-সি-কে আদেশ দেন।

বেলা একটা নাগাদ ও-সি সেখানে পুলিশবাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে মুখ্য-মন্ত্রীর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং কুৎসিত ভাষায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গালিগালাজ করতে থাকেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হাওড়ার বিখ্যাত জননেতা জনাব ইলিয়াস ও-সি-র আচরণের প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর করতে করতে থানায় নিয়ে যায় এবং থানায় তাঁর উপর আর এক দফা মারধোর করে।

এই অকথ্য অত্যাচারের সংবাদ হাওড়া শহরে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা থানা ঘেরাও করে এই অন্যায়ের প্রতিকার ও উক্ত ও-সির শাস্তিবিধান দাবি করে। অতঃপর সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-ডি-ও উপস্থিত হন এবং এস-ডি-ওর নির্দেশে ও-সির উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়।

এই সময় অকস্মাৎ থানার আলোগুলি পটাপট নিভে যায় এবং 'যুক্তফ্রন্ট সরকার হাওড়ায় চলবে না' এই ধ্বনি দিতে দিতে অন্ধকার থানার ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বড় বড় ইট ও পাথর ছুড়ে নিরস্ত্র জনতার উপর আক্রমণ চালানো হয়। তারপর শুরু হয় প্রবল লাঠি চার্জ যার

ফলে অসংখ্য মানুষ মারাত্মক রকমে আহত হয়। উন্মত্ত পুলিশের আক্রমণের হাত থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস-ডি-ও বাদ যান না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজ পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রহার করা হয় এই এস-পির সম্মুখেই।

॥ ২ ॥

এখন প্রশ্ন এই, থানার একজন ও-সি কিংবা এস-পির এতখানি বুকের জোর কোথা থেকে এল যে, তারা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মন্ত্রী এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যার জন্য পুলিশ লেলিয়ে দিল? সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার সাহস তারা কোথা থেকে পেল? এই কাজ শুধু আইন অমান্যের অপরাধই নয়, একে সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতাও বলা চলে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাঙ্গামার সময় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে ফোনে ডাকতে গিয়ে তাঁর নাকি পাত্তা পান নি। পুলিশের বড়কর্তার কি দায়িত্ব ছিল না নিজেই সেখানে উপস্থিত হওয়া?

শুধু তাই নয়, এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে হাওড়া শহরের পুলিশকর্মীরা কার্যত কর্মবিরতি পালন করছে। থানায় ডায়েরী লেখা হচ্ছে না। পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী কোন লোক এলে বলা হচ্ছে 'যুক্তফ্রন্ট নেতাদের কাছে যান।' অর্থাৎ এক কথায়, পুলিশ বিদ্রোহী হয়েছে। নাগরিকদের প্রতি পুলিশের যে কর্তব্য তার বিন্দুমাত্র সম্পাদিত হচ্ছে না। ট্রাফিক পুলিশেরা কর্মবিরতি শুরু করেছে। রাস্তার দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করেই জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় গত কয়েকদিন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছেন। একজন পুলিশ অফিসারের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রতিক্রিয়ায় পুলিশ যে আচরণ শুরু করেছে তা নিন্দা করার ভাষা নেই।

কিন্তু পুলিশের এই আকস্মিক ঔদ্ধত্যের কারণ কি? হাওড়ার ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অনুরূপ একটি ঘটনার মহড়া তার আগেই ঘটে গেছে রাণাঘাটে। দুটি ঘটনারই চরিত্র এক। উভয়ক্ষেত্রেই পুলিশের প্ররোচনায় তুচ্ছ বিষয়কে ইচ্ছা করে ঘোরাল করে তোলা হয়েছে। জনতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করা হয়েছে। রাণাঘাটে এক ভদ্রলোক ও তাঁর ভগিনী আসছিলেন তাঁদের এক মৃতা আত্মীয়াকে শেষ দেখা দেখবার জন্য। জনৈক সমাজবিরোধী অতঃপর থানায় জানায় যে, ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে ফুসলে নিয়ে এসেছেন (আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শনে এই কথাটা বারবার বলেছি যে প্রত্যেক থানায় গেলেই দেখা যাবে সেই অঞ্চলের কয়েকটি নামকরা সমাজবিরোধী ব্যক্তি অফিসার-ইন-চার্জের টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। একশোটিরও মধ্যে একশোটি ক্ষেত্রেই।) অতঃপর সেই ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকটিকে যেভাবে কুৎসিত গালিগালাজ ও প্রহার সহ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করে জনতার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে থাকা সম্ভবপর ছিল না (সে কথা বলা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়, কেন না সেগুলিতে রুচিবোধ পীড়িত হবার সম্ভাবনা আছে, তদন্তকালে সবই প্রকাশ পাবে।)। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যতক্ষণ না পর্যন্ত জনসাধারণের নীতিবোধ সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জনতা উত্তেজিত হয় না। এখানে পুলিশের তরফ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হয়েছে।

ঠিক একই ভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হয়েছে হাওড়াতেও। মহম্মদ ইলিয়াস একজন সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক নেতা এবং পার্লামেন্টের একজন প্রাক্তন সদস্য। এই রকম লোককে গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে থানায় নিয়ে আসা এবং সেখানেও তাঁকে গুরুতরভাবে প্রহার করার যে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে কোন সভ্যদেশের পুলিশের পক্ষেই তা শোভন নয়। রাণাঘাটের মত এখানেও জনসাধারণকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করা হয়েছে।

উভয়ক্ষেত্রেই পুলিশের তরফ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। যেন সুইচ অফ করে দিয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকার সৃষ্টি করে প্রহার করাটা যে কল্পিত তাতে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্ন এই রকম নৈরাজ্য সৃষ্টির পিছনে পুলিশের কি মতলব আছে?

কারণটি অনুসন্ধানের জন্য আমাদের আরও কিছুটা পিছিয়ে যাওয়া দরকার। যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থাপিত হওয়ার পর এই সরকার এক শ্রেণীর পুলিশ অফিসারের চক্ষুশূল হয়েছে। বৃটিশ আমলে পুলিশের ভূমিকা ছিল জনগণের স্বার্থবিরোধী, একান্ত স্থূল ও কদর্য। কংগ্রেসী আমলে এই ট্রাডিশানের কোন পরিবর্তন হয় নি। তারা কংগ্রেসী আমলে ঘুষ, অন্যায় ও দুর্নীতির কারবারে ফেঁপে উঠেছে। জনগণের দিক থেকে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার বিচারে পুলিশ কোনদিনই জনগণের মিত্র হয়ে উঠতে পারে নি। কংগ্রেসী আমলে পুলিশ কর্তৃক লাঠি চার্জ, অত্যাচার ও গুলীবর্ষণ দুশো বছরের বৃটিশ শাসনের রেকর্ডকেও ভঙ্গ করেছে।

কংগ্রেসী আমলে উচ্চতর পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে একটি কায়েমী স্বার্থচক্র তৈরি করা হয়েছে। বৃটিশ আমলে পুলিশ আর যাই করুক রাজনীতি করত না। কংগ্রেসী আমলে সেই বিষও পুলিশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। একজন ডি-আই-জি-এর রাজনীতি প্রীতি, এবং একটি বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতের কাহিনী সুবিদিত। একদা সেই কাহিনী সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং উক্ত ডি-আই-জির রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে আই-পি-এস অফিসারেরা পর্যন্ত বাধ্য হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা একাধিকবার বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম।

কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর এই শ্রেণীর অফিসারেরা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, এবং তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল কিভাবে ভিতর থেকে এই সরকারকে ঘায়েল করা যায়। কেন না যুক্তফ্রন্ট সরকার চিরাচরিত পথে যাচ্ছেন না, পুলিশকে তাঁরা পীড়নের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে নারাজ, আর পুলিশ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভীতির প্রাচীরটা ধ্বসে পড়লেই পুলিশের দেশজোড়া দুর্নীতির ফলাও কারবারের ভিত্তি আলগা হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে একটা প্রবাদই গড়ে উঠেছে ঃ যদি থানাতেই যেতে হয় তো আসামী হয়ে যাওয়াই ভালো। কাজেই জনতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে আইন ও শাসনের একটা সমস্যার সৃষ্টি করার পিছনে পুলিশের একটি মোটিভ রয়েছে এবং তা অত্যন্ত ব্যক্ত।

॥ ৪ ॥

জনসাধারণ এবং সরকারী মহলের একাংশ থেকে হাওড়ার ঘটনার পিছনে একটি রাজনৈতিক দল ও এক শ্রেণীর মালিকের ষড়যন্ত্র ও উস্কানী আছে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নাজেহাল করার জন্য এক শ্রেণীর সরকারী অফিসার, পুলিশ অফিসার, বিগ বিজিনেস এবং কোন একটি রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা ভিতরে ভিতরে সক্রিয় হয়েছে। রাজধানী দিল্লী থেকেও এর পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

একটি দৈনিক পত্রিকার সংবাদ প্রকাশ যে,

একটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্তাব্যক্তির একটি গোপন বৈঠক হয়েছিল। তারপরেই ওই সংগঠনের কার্য-নির্বাহক কমিটির এক বৈঠকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের "পুলিশের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করার" প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এতে নাকি পুলিশের মনোবল ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, কেন না মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েই বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন জনসাধারণের বক্তব্যের ভিত্তিতে।

যাঁরা ওই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমরা কতকগুলি খোলা প্রশ্ন রাখছি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই কিছু সংখ্যক কায়েমী স্বার্থের উস্কানীতে একটি বিশেষ সম্প্রদায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু করেছিল তা নিরসনের জন্য পুলিশ কি করেছিল? যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যরা যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ না ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাহলে চার ঘণ্টার মধ্যে সেই হাঙ্গামা নিবারিত হত কি? পূর্বেও তো কলকাতায় এই রকম অনেক হাঙ্গামা হয়েছে এবং তা দমনে পুলিশের কাছ থেকে এই রকম নৈপুণ্য পাওয়া গেছে কি? পুলিশ সেদিন পূর্বাহ্নে বিষয়টির গুরুত্ব মন্ত্রিসভাকে বুঝিয়েছিল কি? সেই দিন রাত্রেও পুলিশ হাঙ্গামা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি যার জন্য কোন প্রেসনোট দেওয়াও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং এর জন্য পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ধমকও খেয়েছিল। নিজেদের যোগ্যতা যেখানে নেই সেখানে অবস্থা আয়ত্তের জন্য যোগ্যতর হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রয়োজন হবে। রাণাঘাট ও হাওড়ায় জনসাধারণকে উত্তেজিত করার দায়িত্ব কার? নিঃসন্দেহে তা পুলিশের। মন্ত্রীরা সেখানে ছুটে গিয়ে পুলিশেরই চামড়া বাঁচিয়েছেন। এই যদি পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করা বোঝায় তাহলে বুঝব যে, এই মুহূর্তে পুলিশের বড়কর্তাদের বরখাস্ত করা উচিত, কেন না তাঁরা অযোগ্য। নতুন লোক নিয়ে পুলিশ বিভাগ গঠন করলেই চলবে। জনসাধারণ যে শান্তিরক্ষার কাজে পুলিশের চেয়ে অধিকতর যোগ্য তারও প্রমাণ হাওড়াতেই হয়ে গেছে।

আজ পুলিশ অভিযোগ করছে যে, তাদের উপর নাকি রাজনৈতিক দলগুলির হস্তক্ষেপ হচ্ছে, এবং তাতে নাকি তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য এই অভিযোগ কংগ্রেসী আমলে ওঠে নি, যদিও সে আমলে পুলিশের কোন কোন বড়কর্তার পক্ষেও রাজনীতি করতে বাধা ছিল না, যার পরিণতি ঘটছে বর্তমান ঘটনাবলীতে।

॥ ৫ ॥

সহজ কথা জনসাধারণ আজ পুলিশকে বিশ্বাস করে না। এবং জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করার যোগ্যতা পুলিশ হারিয়েছে।

অত্যাচার, অনাচার এবং দুর্নীতির পঙ্কে যে পুলিশ ডুবে আছে, আজ জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনসাধারণের পুলিশের একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার জন্মেছে। জনসাধারণ আজ আর দুর্নীতি ও অনাচার সহ্য করতে রাজী নন। এ তাবৎ পুলিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর কোন পথ ছিল না। দুঃসাহসী দু'একজন সে চেষ্টা করলে তাদের বরাতে যে কি দুর্গতি ঘটত তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। এবং পুলিশের যাবতীয় অনাচারের পিছনে থাকত রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন; বৃটিশ আমলে ইংরাজ রাজশক্তির—কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসের।

কিন্তু আজ তা হবে কেন? এবং তা হতে দেওয়াও উচিত নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করে জনসাধারণ নিজেদের শক্তির পরিমাপ করতে পেরেছেন। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। কাজেই পুলিশরূপ জুজুর ভয় তাঁদের আর থাকার কথা নয়। পুলিশের আচরণের কৈফিয়ত চাইবার অধিকার নিঃসন্দেহে তাঁদের আছে।

কিন্তু এটুকুই পুলিশ হজম করতে পারছে না, তাদের চিরাভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গী এতে বাদ সাধছে। পুলিশের অধস্তন কর্মচারী মহল অবশ্য নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত কিছু কিছু অফিসারও পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। কয়েকটি জেলায় পুলিশ রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছে।

কিন্তু বাদ সেধেছে কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, যারা অবৈধ উপায়ে বহু কালো টাকার মালিক হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব তারা গোপন করে না।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের এইটুকু খেয়াল রাখা উচিত যে এই জাতীয় ঘটনার এখানেই শেষ নয়, এই সবে শুরু। যারা ল এণ্ড অর্ডার বিপন্ন বলে সর্বক্ষণ সোরগোল করছে তারা প্রায়শই এখানে ওখানে আইন ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করে তুলবে এবং তাদের অনুগত কিছু পুলিশ অফিসার অবস্থাকে আরও ঘোরাল করবে। এই কারণে পুলিশ বিভাগের উপরতলায় রীতিমত রদবদলের প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে সরকারের পক্ষে দৃঢ়তা দেখাবার এই প্রকৃষ্ট অবসর।

পঞ্চায়েত আইন সংশোধন

সম্প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত আইন সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সম্ভবত বিধানসভার আগামী অধিবেশনে এই মর্মে বিল আনা হবে। প্রচলিত পঞ্চায়েত আইন বহুলাংশে যে ত্রুটিপূর্ণ তা আমরা ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে বহুবার আলোচনা করেছি। প্রচলিত পঞ্চায়েত আইনে গণতন্ত্র একান্তই সীমাবদ্ধ। অঞ্চল পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা বোর্ডের স্তর পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় দলীয় একনায়কতন্ত্র ও দুর্নীতি এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির মজ্জাগত হয়ে গেছে। জেলা পরিষদগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে। বর্ধমান জেলা পরিষদ সম্পর্কে বিধানসভার বিগত অধিবেশনে অভিযোগ হয়েছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানটি নাকি দলীয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন অন্যায় পক্ষপাতিত্বের পীঠস্থান হয়েছে, এবং পরিষদের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও গুরুতর অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি করা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরেই অনুভূত হচ্ছিল, এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার যে বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৭)

এবারে আমরা স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের কয়েকটি বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনার উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি এগুলির প্রতিকার হবে। প্রথমেই জনৈক কম্পাউণ্ডারের কথা উল্লেখ করছি, জুন মাসে যাঁর অবসর গ্রহণ করার কথা। তিনি পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু সরকার তা নাকচ করেছেন।

এতে আমাদের আপত্তি করার কিছু ছিল না যদি পাশাপাশি আর একটি ঘটনার নজীর না থাকত। রেডিওলজি বিভাগের সহ-অধ্যাপকের অবসর গ্রহণ করার কথা জুলাই-এর ষোল তারিখে। তিনিও পুনর্নিয়োগের আবেদন করেছিলেন, আবেদন নাকি মঞ্জুর হয়েছে। এক বছরের জন্য পুনরায় তাঁকে নিযুক্ত করা হচ্ছে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করে, এবং যে পদটিতে তিনি এতদিন বিরাজ করছিলেন সেটি এক বছর খালি রাখা হবে।

একই প্রতিষ্ঠানের দু'জন কর্মীর প্রতি দু'রকম ব্যবহার শুধু দৃষ্টিকটু ও পীড়াদায়কই নয় দুর্নীতিপূর্ণও বটে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয় আশা করি এইদিকে দৃষ্টি দেবেন।

বিদ্যাবাউলীর বৃত্তান্ত

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছয় ॥

আপন-পর তো মনগড়া ফাধাক। নইলে কে-ই বা আপন, কে-ই বা পর! এ শুধু কথার কথা নয়। বিদ্যাধরী জানে। তাই মানুষ দেখে। আর ফিক ফিক করে হাসে। ওর হাসন দেখে কুমি বিরক্ত হয়। খেপী যেন বালের জল। যেখানে সে'দোয় একেবারে মিশে যায়। ঘাটে এসে বসেছে আর ক' দন্ড? এরই ভেতরে খেপীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে পোলাপানের দঙ্গল। পেছনে গুটিচারেক অল্পবয়েসী বৌ। সেই বৌ দু'টিও ফিরে এসেছে। পাছাপাড় তাঁতের খাট শাড়ি পরণে। একটা বৌয়ের কোলে একটা বাচ্চা।

খেপীব দিকে এগিয়ে এল বৌটি। মদনকে দেখে লজ্জা। মদন একটা হাই তুলে পেছন ফিরে বসল। ট্যাঁক থেকে বার করল দেশলাই। দেশলাইয়ের ভেতর থেকে একটা আধখানা পোড়া সিগারেট। সিগারেটটা ধরিয়ে মুঠোয় নিয়ে আরাম করে টানতে লাগল। বিদ্যাধবীর কাছে বেশ ভিড় জমেছে।

বৌটি এগিয়ে এল কোলের ছেলে নিয়ে। ছেলেটা ইঁদুরের বাচ্চার মত ছোট। লালচে চামড়ার নিচে শুধু হাড় ক'খানা। মাথাটা বড় আর চোখ দুটো।

—এট্টু ঝাড়ফুক কইর‍্যা দ্যাও গুণিন বিবি।

বিদ্যাধরী নিশ্চয় গুণিন। ঝাড়ফুক জানে। জলপড়া, তেলপড়া জানে। বাউল-বাউলীরা ফকির দরবেশরা এ সব মন্তর তন্তর না জেনে কি পারে? ধরেছে বৌটি খেপীকে। আঁতুড় থেকে ছেলেটাকে কিনে যেন পেয়েছে।

বিদ্যাধরী ফিক ফিক করে হাসে।

পাশের আর একটি বৌ বলে,—তহনি কইল্যাম আবেদের বৌরে। যাইস না ভর সন্ধ্যাকালে চালতাতলায়!

এরা মসুলমান গেরস্ত। চাষী তাতে সন্দেহ নেই। দেখেই বুঝতে পেরেছে কুমি। বিদ্যাধরী হাসে।

—হাওয়া বাতাস লাগছে।

সেই বয়স্কা বৌটি ছোট বৌটির মস্ত মস্ত ভীতু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে,—ভয় নাই লো। গুণিন বিবি এক-খান ফু দিলে ভাল হইয়া যাইব।

বিদ্যাধরী যে কিছু জানে না তা নয়। ওরা ধরেছে ঠিক। এ সব ঝাড়ফুঁক ওদের জানতে হয়। পাঁচ দুয়ারে গান গেয়ে বেড়াতে বেড়াতে কার ছেলেকে পেত্নী পেল। কার মেয়েটার জ্বর আব ছাড়ে না। কাব বৌয়ের পাঁচটা পেটে এসে পাঁচটাই নষ্ট হয়ে গেল। এ সবের একটু-আধটু বিহিত ওদের করতে হয়। বাঁজা বৌয়ের ছেলে হয়। পেটরোগা মেয়েটা ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠে। এমন হামেশাই হয়। বিদ্যাধরী নিজেও জানে না কি করে হয়। বাবার কাছ থেকে দুটি মাত্র মন্তর শিখেছিল। সেইটেই স্থানে-অস্থানে আওড়ায়। কোথাও বা লাগে, কোথাও লাগে না।

—একবাটি ত্যাল লইয়া আইস।

বড় বৌটি দুড়দুড় করে চলে যায়। অদৃশ্য হয়ে যায় বাঁশঝাড়ের ওপারে। কিছুক্ষণ পরে নিয়ে আসে একবাটি তেল। সরষের তেল। বিদ্যাধরীর সামনে তেলের বাটিটা রেখে ছোট বৌকে ধমক দেয়—ল, বইয়া পড়। বিবির সুমকে বইয়া পড়।

ছোট বৌটা যেন বোবা। বড় বড় ভীতু দুটো চোখ। মুখখানি ময়লা তেলে চকচকে। বিদ্যার সামনে মাটিতে ছেলে কোলে নিয়ে বসে পড়ে। ঠিক দুপুরে বটগাছতলায় মজলিস বসে গেছে। বেশ ভিড় জমেছে। আরও পাঁচ ঘরের বৌ মেয়ে কাচ্চা-বাচ্চা সব হাজির। দুটো বুড়ি এসেও হাজির। পীরের দোয়াই, ছেলেটা যদি ভাল হয়! আবেদ আলীর এই প্রথম সন্তান। প্রথমটা মইল্লা হলে এরপর ওর কোল মইল্লা হয়ে যাবে। একটাও বাঁচবে না ওর কোলে। হাওয়াটা লেগেছে কোলে। তেনার নজর রয়েছে বৌয়ের কোলের ওপর। চালতে-তলায় ভর সন্ধ্যেবেলা তেনার নজর পড়েছে। তেনারা চালতেগাছ শ্যাওড়াগাছ-টাছেই বাস করেন কি না! ওসব স্থানে বৌ-ঝিদের সাবধানে চলা-ফেরা করতে হয়। বুড়ি একজন আক্ষেপ করছিল। তার কথা তো আজকালকার বৌরা শোনে না। দ্যাখ এখন, বোঝ মজাটা! তবু গুণিন বিবি এয়েছেন, তার দয়ায় যদি তেনার নজর ঘুরে আবাব চালতেগাছের ডগায় উঠে যায়।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। থমথমে ভয় আর কৌতুকে। গুণিন বিবি কি দেখতে পাচ্ছে ভূতটাকে? নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে। নইলে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে কেন?

—অই গ্যাদারা হইর‍্যা যা।

সরে যা বাচ্চারা—বুড়ি ধমকে উঠল।

কে জানে হাওয়াটা আবার ঘুরে-ফিরে কার ওপর ভর করে।

বিদ্যাধরী বিড় বিড় করছে আর ফুঁ দিচ্ছে। বাচ্চাটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফুঁ দিচ্ছে। বার সাতেক ফুঁ দিয়ে তেলের বাটিটা তুলে নিয়ে আঁচলের তলায় ঢাকল। আঁচলের হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার বিড় বিড় করতে লাগল চোখ বুজে অনেকটা সময়।

এতগুলো মানুষের মুখে র নেই। মদনও মুখটা একটু ফিরিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। সিগারেটটা হাতের অঙ্গুলের ফাঁকে পুড়ে গেল অনেকটা। বাচ্চা ন্যা ক্যা করে চিৎকার করে উঠল।

এই হয়েছে! তেনাদের নজরে বিষ হেনেছে। এইবার বোধ হয় তেনারা আবেদ আলীর বৌয়ের কোল ছাড়বেন। হাওয়ায় হাওয়ায় চালতেতলার দিকে যাবেন। বুড়িরা এসব জানে। লোল চামড়ার ভেতরে চোখ দুটো জ্বলজ্বলিয়ে উঠল বুড়ি দুটোর। বিদ্যাধরী হাসল এবার। হাসল যখন তখন নিশ্চয় কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

বড় বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলল বিদ্যা। —এই ত্যাল দিলাম। বিয়ানে বাসিমুখে কাপড় ছাইড়া এই ত্যাল মাখাইবা ব্যস্ রোজ বিয়ানে একবার। তিনদিনে হাড় জিরজিরা শরীল ত্যালত্যালা অইব। যে-জুক ত্যাল পইড়া থাকব, তার মধ্যে আরও ত্যাল মিশাইয়া লইও। রোজ মাখাইও। জাও।

বড় বৌয়ের হাতে তেলের বাটিটা দিয়ে বিদ্যা ছেলেটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল—ভাল অইব। ডর কুইরো না। ভাল অইব। সোনার পোলা সোনা অইয়া কোল জুইড়া থাকব। ডর নাই।

আবেদ আলীর বৌয়ের শুকনো মুখে বড় চোখ দুটোর ভরসা এল। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব দেখা গেল।

ছেলে-মেয়েগুলো হৈ-হৈ করতে করতে দৌড়োদৌড়ি শুরু করল।

বড় বৌ দীনভাবে বিদ্যার দিকে তাকিয়ে বলল,—কি বা দিমু তোমারে। হুড়ুম আর গুড় দেই। খাইবান নি?

বিদ্যা হাসল। হাসা মানেই সম্মতি।

বৌরা চলে গেল। ঘর থেকে নিয়ে এল প্রায় আধ-থামা মুড়ি এক খাবলা গুড়। ছোট বৌ নিয়ে এল দু' কুনকে চাল, গোটা পাঁচেক শশা, একটা ছোট লাউ।

কুমি এতক্ষণ ব্যাজার বদনে দেখছিল। খেপীর যত ভুটকোয়ারা। গুণতুক জানে খেপী, তাই বলে পথে-ঘাটে আঘাটে এমন রব তুলবে এটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। বিশেষ করে বোগদা মদনটা হাঁ হয়ে গেছে খেপীর ভুটকোয়ারা দেখে। আধ-থামা মুড়ি আর তার ওপর শক্ত এক খাবলা গুড় দেখে কুমির চোখ দুটো চিকচিকিয়ে উঠল।

—হুড়ুম এয়ানে আন। হ' চাল কোঁচড়ে।

কোঁচড় পেতেছে কুমি মুড়ি নেবার জন্যে। খেপীর কাপড়ে অতবড় আঁচল নেই। খাট কাপড়ে ধামড়ধাস্যি দেহখানা ঢেকে কূল পায় না। ও কি করে কোঁচড়ে নেবে এত মুড়ি?

—দ্যাও। ঢাইল্যা দ্যাও।

কুমির কোঁচড়ে মুড়ি ঢেলে দিল। লাউ আর শশা ক'টা রাখল সামনে। কিন্তু চাল?

—খাড়াও, ত্যানা বাইর কইর‍্যা লই।

বিদ্যার বোঁচকাটা খোলা ছিল। তার ভেতর থেকে বাব করল ছেঁড়া কাপড়। চাল ক'টা বেঁধে পুটলীতে রাখল আবার। বিদ্যাধরী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ওর অন্যদিকে কোন খেয়াল ছিল না। এটা করতে হয়। ওর বাবা বলেছিল, যার রোগ ভাল করবার জন্যে ওষুধ দিবি—পরে দু'দণ্ড তার কথাটাই ভাববি। তার ব্যামো ভাল হোক, ব্যামো সেরে গেলে তার চেহারাটা কেমন হবে, মনে মনে ভাববার চেষ্টা করবি। সাবধান, একমনে ভাববি। মন যেন একটু টালমাটাল হয় না। মনকে যদি ছুঁচের ডগায় এনে ভাবতে পারিস তার নীরোগ দেহ, তবে নীরোগ সে হবেই। এইটেই এ মন্তরের আসল রহস্য।

বিদ্যাধরী চাইছে ছেলেটা ভাল হোক। আহা রে চামচিকের মত জিরজিরে ছেলেটাকে নিয়ে মায়ের কি জ্বালা! ভাল হোক, ওই জিরজিরে দেহে মাংস হোক। টান টান হোক চামড়া, তেলতেলা হোক শরীর।

—গুণিন বিবি, ঘর কোয়ানে?

উত্তর দেয় কুমি।—দোয়াইল। তোমরা নি জান, কোন্ পথে যামু?

এক বুড়ি বলে,—ইয়ার পরে যে ঘাট পাইবান, কালাকান্দির ঘাট। ওয়ানে গ্যালে খপর মিলব। ছোটকালে কালাকান্দির হাটে যাইত্যাম—।

বুড়ির ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তখন কি নদী এখানে ছিল? আরও অনেক তফাতে ছিল। ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এসেছে। চোখের সামনে কত মাটি ভেঙে জল হয়ে গেল। তখন ওদের বাড়িও এখানে ছিল। বলতে গেলে এখন যেখানে মাঝনদী সেখানে ছিল তাদের ঘর। ওর বাপ আফছা মিঞা মনের মত করে বাহারের ঘর বানিয়েছিল। টিনের চাল, কাঠের পাটাতন, মস্ত মস্ত ঘর। বাগানখানা ছিল আরও সখের। আম জাম লিচু কাঁঠাল কামরাঙা বেতুল কি ছিল না? সে সব দিন যেন স্বপ্ন হয়ে গেছে। তবু যেন মনে হয় এই সেদিনের কথা।

পাঁচটা না ছ'টা পাঁঠা নিয়ে হাটে গিয়েছিল বুড়ি বাবার সঙ্গে। এক-একটা পাঁঠার দাম কত পয়সা যায়ো পয়সা। আফছা মিঞা সে হাটে বেচেছিল ষোল পয়সা করে এক-একটা পাঁঠা। কাল কুচকুচে নধর পাঁচটা পাঁঠা। বুড়ি তখন ছ' বছরের মেয়ে। পাছাপাড় তাঁতের শাড়ি পরে বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। কারণ ছিল, পাঁঠা ক'টাকে পুষেছিল বুড়ি। কচি থেকে ঘাস আম-পাতা কচি কাঁঠালপাতা খাইয়ে খাইয়ে বড় করে তুলেছিল। সেই পাঁঠা হাটে বেচতে নেবার সময় সে হাটে যাবার বায়না ধরেছিল। হাটে তার সেই প্রথম যাওয়া।

সে সব কতকালের কথা! পাঁঠা ক'টা নিয়ে দরদস্তুর যখন হচ্ছিল, তখনো ওর বেশ মজাই লাগছিল। কেনবার পর যখন পাঁঠা ক'টাকে নিয়ে চলে গেল। তখন ওর কান্না দেখে কে! নাকের নোলক ভিজে গেল। মুখ-চোখ ভিজে ফুলে একাকার। আফছা মিঞা অনেক বুঝিয়ে-বাঝিয়ে শেষ পর্যন্ত দুটো গালার চুড়ি কিনে দিতে তবে ওর কান্না থামে। সেই পাঁঠার শোক অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি বুড়ি, আর কালাকান্দির হাটও ভুলতে পারে নি।

বুড়ি কুমিকে বলে, আক্ষেপ করে, সেসব কতকালের কথা।—তহন এক গুণিন বিবি আছিল কালাকান্দির খালের ধারে—হ', উদুরি বাদুরি যক্ষ্মা যে ব্যামোই হউক, জলপড়া খাওয়াইয়া সারাইয়া দিছে। তার বাপ আছিল মেদ্দা ফকির। সঙ্গলের উপুরে তার থান। অমুন গুণিন আর দেহি নাই।

কুমি শুনল, মদন শুনল, পুরোন কথা, সুখ-দুঃখের কথা।

আস্তে আস্তে চলে গেল ওরা সবাই। প্রণের ছোঁয়া রেখে গেল ওদের প্রাণে। আপন-পরের ফারাক নাই। সবাই আপন। পরাণটা যদি মেলে ধরো, যেখানে যাও পরাণের ঠাণ্ডা ছোঁয়া পাবে।

সত্যি, এতক্ষণে ওরা যেন ঠাণ্ডা হোল। গুটিকতক প্রাণের খোলামেলা ছোঁয়ায় ওরা এই ভীষণ গরমেও তাজা হয়ে উঠল। কুমি বেশ খুশি খুশি।

স্নান করে নিল মদন আর বিদ্যাধরী। গায়ের কাপড় গায়েই শুকোবে। কতক্ষণই বা। দু'দণ্ড রোদের তাপে খড়মড়িয়ে উঠবে গায়ের কাপড়। ওরা বসল এসে বট-তলায় আবার।

মুড়ি গুড় আর কচি শশা। বড় উপাদেয় খাওয়া। মচমচিয়ে খেতে খেতে রোদের তেজটা আরও বেড়ে গেল। তবু যেতে হবে। বেশি দেরি করার উপায় নেই। কালাকান্দির ঘাটে গিয়ে পৌঁছোতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

পেট পুরে নদীর জল খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করল ওরা।

কুমি গামছাখানা জবজবে করে ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় দিল। পায়ের তলায় যদি

পোড়ানি লাগে, ভিজে গামছায় পা মুছে নেবে। তবু যেতে হবে। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে।

যত গরমই হোক না কেন বাতাসটা বড় ঠাণ্ডা। হু হু করে বইছে খোলা বাতাস জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হয়ে।

ভোঁ শব্দে তাকাল ওরা। ইস্টিমার। বিরাট ইস্টিমার এগিয়ে চলেছে। এ ইস্টিমার রোজই যাতায়াত করে। যাবে গোয়ালন্দ ঘাট।

মদন বড় বড় করে তাকাল।—ভাইট্যাল জাহাজ।

যাবার সময় ভাটিয়াল। আবার বিকেলে যে ইস্টিমার যাবে সিরাজগঞ্জের দিকে, সেটা উজান। রোজই আসে উজান ভাটিয়ালের ইস্টিমার। যাত্রী বোঝাই মাল বোঝাই মাঝনদী দিয়ে চলেছে ইস্টিমার। তবু তার জল কাটা ঢেউ মস্ত বড় বড় ঘুষে আছড়ে পড়ছে এসে পাড়ে।

—নাওখান বুঝি ডুইব্যা গ্যাল!

কুমি হাসতে হাসতে চোখ বড় বড় করে।

মস্ত ঢেউগুলোর ভেতরে পড়ে একখানা ছোট নাও নাগরদোলার মত উঁচু হয়ে নিচে নামছে, আবার উঁচুতে উঠছে। হাল যদি চেপে না ধরতে পারে নাও উল্টে যাবে। গেল বুঝি ডুবে! না ডুবল না। ডুবি-ডুবি করেও ডোবে না। টাল খেতে খেতে সামলে যায়।

বিদ্যাধরীর মুখখানা শিশুর মত সরল হাসিতে ভরে ওঠে। সামাল মাঝি। হ্যাঁ সামলে গিয়েছে। মাঝি যদি কুশলী হয়, তবে ঢেউ সামলাবেই। মনদরিয়ার ঢেউ সামাল দিতে হয়। বড় বড় জাহাজ মনদরিয়ার ওপর দিয়ে যখন ওপার যায়, তখন তো নাও ডুবু ডুবু। ভাবের জাহাজ ভাবের বেগে চলে মনদরিয়ায়। তার ঢেউ সামলাতে নাভিশ্বাস ওঠে। তবু মাঝি যদি পাকা হয়, তবে পচা নাওকেও হাল ধরে পার করে নিতে পারে। সেই সাঁই মাঝির খপর কেউ জানে না। সে হাল ধরে বসে আছে মনের দরিয়ায়।

বিদ্যাধরী হাসিতে উপছে পড়ে।

ইস্টিমার তো চলে গেছে কতক্ষণ হল। তবু যে ঢেউ তুলে দিয়ে গেল, সে ঢেউয়ের নাচন কমে না। পাকা মাঝি না হলেই নৌকো ডিগবাজী। ভাটিয়ালেরই এ-চোট, উজানের চোট আরও বেশি। উজানের ঢেউ আরও বড় আরও জবর। নাও সামলান দায়।

বিদ্যা মদনের দিকে তাকায়। মস্ত চোখ দুটোয় শিশুর কৌতুক।—ইস্টিমারে নি চড়ছ?

—ক্যান চড়মু না।

মদন অনেকবার চড়েছে ইস্টিমারে। উজানে ভাটিয়ালে অনেকবার। যাত্রাদলের সঙ্গে বহুবার বহু জায়গায় গেছে। কোথাও নৌকোয়, কোথাও গরুর গাড়িতে, কোথাও ইস্টিমারে। এই তো গেল মাসে গিয়েছিল টাঙ্গাইলের কাছে। ও চত্বরে কাটিয়েছে দু মাসের ওপর। কুড়িটা বড় আসর। আরও গোটা পনেরো ছোট আসর।

তখন তো ইস্টিমারেই গিয়েছিল। সিরাজগঞ্জ ঘাটের আগে পোড়াবাড়ি ঘাট। পোড়াবাড়ি ঘাটে নেমে যেতে হয় টাঙ্গাইল। নৌকোয় যাওয়াই সুবিধে।

পোড়াবাড়ি ঘাটে থামল যখন ইস্টিমার তখন বিকেল। রাতটা কাটাতে হয়েছিল ঘাটেই।

খেয়েছিল চিঁড়ে দই আর পোড়াবাড়ির বিখ্যাত চমচম। মনে আছে মদনের। বড় মজা লেগেছিল, তবু সে মজার ভেতরে ঢালাও খুশি ছিল না। ভাবনা ছিল বড় আসরগুলোয় তার গান জমবে কি না। দু-দশ বিশ টাকা পুরস্কার মিলবে কি না। মিলেছিল, টাঙ্গাইলের বাবুদের বাড়ির আসরে পুরো একখানা পাঁচ টাকার নোট মিলেছিল পুরস্কার। পালাটাও ছিল তার সবচেয়ে যে পালা ভাল লাগে, যে পালায় ও সবচেয়ে ভাল গায় সেইটা—নৌকাবিলাস। ও পালা গাইলেই জমে।

এক আনা দিব কড়ি,
পার কইর‍্যা দাও তাড়াতাড়ি।
বিলম্ব আর সহে না—আ—আ—আ

মদন জবাব দিয়েছিল মিষ্টি হেসে। এক আনায় হইব না। একা নায়ে হইব না—

ভাবতে ভাবতে মদনের মন উধাও টাঙ্গাইলের আসরে।

—আমার ইস্টিমারে চইড়ব্যার ইচ্ছা করে?

বিদ্যার মস্ত চোখদু'টোয় শিশু-মেয়ের চাউনী।

—চড়ো নাই তুমি!

—না।

—তোমারে লইয়া যামু ইস্টিমারে।

—কবে খাইবা।

—যামু—যামু—

যেন ছোট মেয়েকে ভোলায় মদন। যাবে সে একবার বিদ্যাকে নিয়ে। ইস্টিমারে গোয়ালন্দ অথবা সিরাজগঞ্জ। কেন? কেন কিছু নেই। এমনি যাবে। ইস্টিমারে চড়তে মজা লাগবে। তাই যাবে। কোন উদ্দেশ্য নয়। যাত্রাগানের উদ্দেশ্যে। বেচা-কেনার উদ্দেশ্যে। কোন উদ্দেশ্যে গেলে তেমন মজা হয় না। এমনিই যাবে। শুধু-শুধু যাবে। কবে যাবে। তা কি এখনি বলা যায়? যখন খুশি হবে. মন চাইবে, তখন যাবে।

বিদ্যা তাতেই খুশি। মদন বলেছে, তাকে নিয়ে ইস্টিমারে যাবে। সে আর তার কালা মদন।

ঝুমি কিছুটা পিছিয়ে ছিল। এগিয়ে এল ওদের কথাবার্তা হচ্ছে আন্দাজ করে।

বিদ্যা ততক্ষণে দুলতে দুলতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বিদ্যা হাঁটে বেশ জোরে। মদনের চেয়েও জোরে। মাঝে মাঝেই এগিয়ে পড়ে। নদীর জলে নাও দেখে বা একটা শুশুক দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে কখনো কখনো।

কুমি মদনের নাগাল পায়। মদনের কাছাকাছি এসে বলে,—খেপী কইল্ গুণতুক জানে!

মদন তাকিয়েছিল বাঁ দিকে ধু-ধু বালির চড়ার দিকে। বালির ওপর রোদের ঝিলিক। কোথাও একটু গাছ-গাছালি শেকড়-বাকড় নেই। গনগনে আগুনের মত গরম বালির ওপর রোদ্দুরের চমকানি। চোখ ঝলসে যায়।

কুমি মিটিমিটি হাসে।—তোমারেও নি, গুণ কইরল।

আলগা জবাব দেয় মদন।—হইবার পারে।

জবাব কুমির মনের মত তো হয়ই না, কুমি বোঝে যে ও কুমির কথা ভাল করে শুনছেও না। রক্তিম চোখ দু'খানাও তেরছা হয়, বিদ্যা চলেছে আগে আগে হনহনিয়ে। তেরছা চোখে তাকায় তার দিকে।

কথাটা কিন্তু কুমি কিছু বানিয়ে বলে নি। বিশ্বাস করে বলেই বলেছে। খেপী গুণতুক জানে, এটা ওর স্থির বিশ্বাস। নইলে নাটা জুড়ানের মত সাই জোয়ান একটা মরদকে বান মেরে রক্তবমি করিয়ে দিলে! একদিনে শেষ করে দিলে। নাটা জুড়ান কি মদনের চেয়ে কম ছিল কিছু!

মদনকে যে কেমন করে খেপী পাকড়াও করে নিয়ে চলেছে, ভেবে পাচ্ছে না কুমি। যাত্রাদল-টল ছেড়ে এক-কথায় খেপীর সঙ্গে চলেছে। ব্যাপারখানা কি খুব সহজ। দেখে মনে হয় মন্তর পড়া একটা মোটা সাপের মত মদন যেন খেপীর টানে পিছন পিছন চলেছে। মদনের সেই সন্ধ্যার মেজাজ আর আজকের মেজাজ আকাশ-পাতাল তফাৎ। খেপীর দিকে তাকায় যেন পোষা একটা কুত্তার মত। বলিহারি খেপীর যাদুবিদ্যা!—

রাণীধূপ
প্রস্তুত করেছেন কাকারু প্রডাক্টস
CENTRAL LIBRARY

মদন কি বুঝতেও পারছে না যে তাকে মন্তর পড়ে ভেড়া বানিয়ে নিয়ে চলেছে!

কুমি তো পারে না কোন মানুষকে এমন বশে আনতে, যা খুশি তাই করাতে। কই মুকুন্দ কি এল দোকান ফেলে তার পেছন পেছন? এল না, আসবেও না। কেউই আসে না। কেউই এমন খেপে ওঠে না তার জন্যে! খেপী নিশ্চয় মন্তর-তন্তর দিয়ে বশ করে। নইলে কিছুর ভেতর কিছু নয়, ভোরে এসে সে দেখল অর্জুনগাছের তলায় মদন বাক্স নিয়ে তৈরি, খেপীও তৈরি। ওরা মেলা ছেড়ে চলে যাবে। কুমি তো অবাক! এর ভেতরে কি এমন কারখানা ঘটে গেল যে এত ভোরে মেলা ছেড়ে যেতে হবে। আর মদনই বা যাবে কেন?

বিদ্যা ফিক করে হেসে ওর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলেছিল।—ফান্দে আইজ মানুষ ধরা পইড়ছে। ধইর‍্যা ঘরে লইয়া যামু। কালা মদন যাইব আমাগো সাথে।

কুমি আঁতকে উঠেছিল। অমন জোয়ান জলজ্যান্ত মানুষটাকে ধরে নিয়ে যাবে খেপী! মদনকে দেখেছিল। আনমনা, চুল রুখু রুখু, চোখ-মুখ কেমন ফ্যাকাশে। যেন মন্তরের বাঁধনে নুয়ে পড়েছে। অবাক হয়েছিল কুমি। মনে মনে মদনের জন্যে মনটা কেমন লাগছিল। আহা রে, যাত্রাদলে ছিল ভাল। খেপীর কবলে পড়ে এখন চোপর দিন রোদে বৃষ্টিতে একতারায় টুং টাং করবে। আর ঘুরে বেড়াবে আওয়াজ তুলে। জীবন যৌবনে আর যেন কর্ম নেই।

সত্যিই মদন চলল। বিদ্যাধরী যেন ওকে মন্তরের টানে টানতে টানতে নিয়ে চলল। কিসের টানে চলেছে মদন একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। সকাল থেকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। খেপীর পাল্লায় পড়ে তার নিজেরই নাজেহাল হবার দশা। মেজাজটা তিরিক্ষি হয়েই ছিল।

এখন পেটে কিছু পড়েছে। রোদ গরমটাও সয়ে আসছে। একবার জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

চলতে চলতে মদনের আরও কাছে সরে এল। মদনের কালো মিশমিশে মস্ত পিঠখানা বেয়ে ঘাম ঝরছে। এগিয়ে চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। খেপীর বাতাস লেগেছে ওর গায়ে।

ওপরে সূর্যির তাত, নিচে বালির তাত, তারি মধ্যে মিষ্টি করে বলে কুমি।—আমাগো সাথে তুমি যাইত্যাছ কনে?

মদন তাকাল। এ আবার কেমন প্রশ্ন এত সময় পরে।

বলে,—তোমাগো গাওঘরে।

—মরণদশা! ওয়ানে কি গাওনার দল বানাইবা?

—জানি না।

—থাকবা কোন চুলায়?

—জানি না।

হাসিও পায়, দুঃখুও হয়। মন্তরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে গেছে মানুষটা। হেসে ফেলে কুমি।—তুমি জান না। জানে কেডা? হাইস্যা মইল্যাম কথা শুইন্যা।

মদন খেপীর দিকে তাকিয়ে বলল,—ও জানে।

—কপাল আমার! অ ছাইড়া নিজের খপর নিজে জানে না। নিজের নাই চাল-চুলা। ও লইব তোমার খপর!

সাধনা দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ্‌সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের বৃসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

মদন তাকাল

—অ তোমারে গুণ কইর‍্যা ফালাইছে!

হেসে ফেলে মদন।—হইবার পারে।

বলে সামনের তরমুজ খেতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—তরমুজগুলা অখনি বেশ বড় হইয়া উঠছে। ইরে আলায়। কত তরমুজ!

সামনে বিরাট বালুভরা মাঠে মস্ত তরমুজ খেত। বালির ওপর অগুন্তি তরমুজ। তরমুজের লতায় তরমুজে প্রায় ছেয়ে গেছে সামনের মাঠখানা। কি অবাক কারখানা! কিছুক্ষণ ধরে ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল ওর। ভাবছিল কোথাও থেমে নদীর পাড় থেকে নেমে খানিকটা জল খেয়ে নেবে। তবু নামাটা খুব সহজ নয় বলে নেমে পড়ে নি। দু' মানুষ উঁচু নদীর পাড়। সেখান থেকে লাফিয়ে নামতে গেলে জলে পড়তে হবে, আর কে জানে কোথাও ঘূর্ণীটুর্ণী আছে কিনা। জলে পড়ে এক বিপদ বাধবে কিনা! এ ছাড়া আরও মুস্কিল উঠে আসা। লাফিয়ে নামা যায়। কিন্তু উঠে আসা সহজ নয়। মাটি আঁকড়ে ধরে উঠে আসা প্রায় অসম্ভব। যেখানে ধরতে যাবে, হাতের বালিমাটি খসে পড়বে, চাই কি একটা মাটির চাঁইও ধসে পড়তে পারে। তাই বুকের তেষ্টা বুকে নিয়েই পথ চলছিল মদন। এখন চোখের সামনে তরমুজ খেত দেখে ও থেমে পড়ল।

বেশ বড় বড় তরমুজ। তাকাল এধারে ওধারে। হ্যাঁ—সামান্য দূরে বাঁশের খুঁটি দিয়ে উঁচু করে বাঁধা একটা ছোট চালা। ওখানে নিশ্চয় পাহারাদার আছে। কোন শব্দ পেলে সন্দেহ হলেই ফোকর দিয়ে দেখবে। লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। তবু একটা তরমুজ যদি বোঁটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসতে পারে তবে মন্দ কি!

মদন কুমির দিকে তাকাল। মিটিমিটি হাসল,—এট্টা ছিড়া নি আনক যায়?

—ক্যান যাইব না। রইসো। আমি আনুম।

বলে সামনের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁক দিল,—অলো অ খেপী!

বিদ্যাধরী হাঁক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু একটা হাঁকেই সর্বনাশ হয়ে গেল।

খেতের একপ্রান্তে সেই উঁচু চালাঘরটার ঝাঁপ নড়ে উঠল। একটা দাড়িওলা মুখ দেখা গেল।

মদন বিরক্ত হোলো।—এককু চিক্‌খারে ন্যাড়ে খড়ে আগুন দিয়্যা দিলা। উই দ্যাখ—

কুমিও দেখল সেই দাড়িওলা মুখ। সতৃষ্ণ নয়নে তরমুজগুলোর দিকে তাকাল। বালির ওপর ঢ্যাপের মত গোল তরমুজগুলো পড়ে রয়েছে, অথচ আর একটাও নেবার উপায় নেই।

মদন শুকনো ঠোঁট চাটল জিভে। এমন ফলারটা মাটি করে দিলে কুমি। আর উপায় কি! এবারে চলো, হাঁটো। কাঠের মত শুকনো গলা নিয়ে এই আগুনে দুপুরে হনহনিয়ে পা চালাও।

সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে টাল খেয়েছেন। এইবারে দেখতে দেখতে তরতর করে নামতে থাকবেন পশ্চিমের মাঠের প্রান্তে। উনি নেমে পড়বার আগেই তাদের পৌঁছতে হবে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হয়। বেশ জোর কদমে চলছে ওরা। কুমি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। পড়ুক। হারাবার ভয় নেই। চলতে চলতে ঠিকই দেখতে পাবে। নদীর এক একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হলেও, বাঁক ঘুরলেই চোখে পড়বে।

এবারের বাঁকটা ঘুরতেই চোখে পড়ল আর একটা ঘাট। এ ঘাটটা মস্ত। দু-চারখানা বিরাট গয়না নৌকো ছাড়া বিশ-পঁচিশখানা নৌকো রয়েছে ঘাটের এখানে ওখানে ছড়িয়ে। এ নিশ্চয় কালাকান্দির ঘাট। এতক্ষণে কালাকান্দির ঘাটে এসে পড়েছে ওরা, দোয়ালী আর বেশি দূরে নয়।

কালাকান্দি একটা মাঝারি রকমের গঞ্জ। পাটের ব্যাপারীরা এখানে বেশ জমজমাট হয়ে বসে আছে। বিরাট বিরাট গয়না নৌকোয় পাটের চালান যায় সিরাজগঞ্জে। ওটা আরও বড় গঞ্জ। ব্যাপার ব্যবসার মস্ত ঘাঁটি। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয় পাট। সোনারুপোর মত ঝকঝকে পাটের বদলে গাদা গাদা সোনারুপোর লেনদেন হয়। ধান কলাই কুমড়ো পাঠার চালানও যায়। তবে পাটই এখানকার লেনদেনের মধ্যমণি।

ঘাটে এসে পৌঁছোল ওরা। এখানে ঘাটের পাড়ে তেমন ছায়াঘেরা গাছগাছালী নেই। ঘাটের বালুমাটিও যেন পায়ে পায়ে শক্ত হয়ে গেছে। লোকজনের চলাচল এখানে অনেক বেশি। গয়না নৌকোয় যখন মাল বোঝাই, তখন অনবরত মাল মাথায় করে চলাফেরা করতে হয়। ঘাটের ওপরে বিরাট বিরাট চালা। টিনের শক্ত মজবুত চালা সব। মাল রাখবার ঘর।

বিদ্যা ঘাটের কোলাহল থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে দাঁড়াল।

কিছু পরে এসে পৌঁছোল মদন আর কুমি। মদন এসে দেখল বিদ্যাধরী জায়গাটা বেছেছে ভাল। এখানেই একটু জিরিয়ে নেয়া যাবে। একটা মস্ত পিঠে কুমড়োগাছের তলায় বসল ওরা। মাথার সুটকেশ পোঁটলা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মদন। মদনের জোয়ান দেহখানাও সারাদিনের ধকলে কিছুটা ঘায়েল হয়েছে। মাথার চাঁদিটা ব্যথা হয়ে গেছে বাক্সের চাপে।

বিদ্যাধরীর মুখখানায় ধুলো জমে ঝকঝকে কাঁসার থালার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তবু হাসে বিদ্যাধরী।—ওর মুখের সব ক্লান্তি কালিমা হাসিতে ধুয়ে দিতে চায়।

—বেশি জিরান-সাতানের কাম নাই। অন্ধকার হওনের আগে ঘরে পোঁছাইতে হইব।

তা বললে কি হয়? খেপীর কথা মানতে রাজী নয় কুমি।

—আমি দুই দণ্ড না জিরাইয়া যামু না।

মদন কোন কথা বলল না। একটু সময় পা ছড়িয়ে বসে থেকে ঘাটে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে খানিকটা জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোল। কুমি আর উঠতেই চাইল না। বসে রইল অনেক সময়। রক্তবর্ণ চোখদুটো বার বার বুজে বড় বড় শ্বাস ফেলছিল, হালচাষের পর ক্লান্ত গাইয়ের মত।

একটা শশা বার করল বিদ্যাধরী আঁচল থেকে। আগের ঘাটে যে শশা ক'টা দিয়েছিল, তার থেকে একটা বোধহয় ও রেখে দিয়েছিল। অথবা নিজের খাবার শশাটাই রেখে দিয়েছিল।

মদনের শ্রান্ত মুখের দিকে তাকাল বিদ্যাধরী। চোখদুটো ভরা মমতা।

—লও খাও।

খাবার নাম শুনেই পিট-পিট করে তাকাল কুমি। দেখল মদনকে একটা শশা দিল বিদ্যাধরী। আবার চোখ বুজল কুমি। কি একটু ভেবে নিয়ে চোখ তাকাল যখন। মদন তখন শশাখানা মচমচিয়ে খেয়ে নিয়েছে।

—গঞ্জে নি রসগোল্লা পাওয়া যায়?

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

রসগোল্লার নাম শুনে অবাক হোল মদন। এ সব খাদ্য কালেভদ্রে মেলে ওদের। মিষ্টি বলতে গুড়, বাতাসা, নয়তো কদমা। কুমি রসগোল্লার নাম করছে কেন হঠাৎ।

আঁচলে ছিল ঝনঝনে সাতটা টাকা। একটা টাকা বার করে কুমি মদনের দিকে দিল।—লও, রসগোল্লা আন।

মদনেব মুখখানা হাসি হাসি। দিনটা আজ কাটল ভাল। রসগোল্লার জলযোগ-টাও হবে তাহলে।

কুমি আধবোজা চোখে তাকাল একবার বিদ্যাধরীর দিকে। বাঁকা হাসল।

খেপী হেসে উঠল আনন্দে।—রস সয় তর ধরে না লো কুমি।

কুমি কোন জবাব দেয় না। হাসে—হাসিটা বেশ বাঁকা।

মদন উঠে চলে যায় হালুইকরের দোকানের সন্ধানে।

কুমি চোখ বুজে থাকে একটু সময়। তারপর চোখের পাতা অল্প তুলে আস্তে বলে,—মানুষডারে লইয়া আইলি কি কামে?

বিদ্যাধরী হাসে।—সে খপরে তর কাম কি?

কুমি পুরোপুরি তাকায় এবাব।—কাম আছে। গাওয়ের মানুষে কইব কি?

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে খেপী।—কইব। খেপী এউপ্পা মানুষ ধইরা আনছে।

—অরে বিয়া করবি?

—কোন দুখে! বিয়া করুম কেন দুখে!

—তর মানুষে কইব কি?

—মানুষের কথা মানুষে জানে, আমার ভাবনেব ঠ্যাকা কি?

কুমির গলা একটু ভিজে ভিজে হযে আসে।—শ্যাষে তুইও নষ্ট হইয়া যাবি খেপী?

বিদ্যাধবী বলে,—এউপ্পা ডালে দুইডা ফল থাকে। বোইদে পোড়ে, বিষ্টিতে ভেজে, বাতাসে দোলে, এয়ার মধ্যে নষ্টা-নষ্টি কি পাইলি? পাইকলে পরে ফল দুইডা আপনে আপনেই বইরা পইড়া যায়! বুঝলি নি।

না, কুমি অত শত বোঝে না। একটা মর্দামানুষকে নিয়ে থাকবে, অথচ নষ্ট কথা রটবে না—এ কখনো হয়? নষ্ট হওয়ার অনেক জ্বালা, সে যে কি যন্ত্রণা কুমি ছাড়া কেউ জানে না।

বিদ্যাব জন্যে ওর কষ্ট হয়—ভাবটা মনে আনবার চেষ্টা করলেও আসলে কুমি বিদ্যাধরীর কাছে মদনের থাকাটা কোন-মতেই সহ্য করতে পারছে না। নানা অজুহাতে ওর যে মদনকে নিয়ে ঘর করাটা নেহাৎই খারাপ—এইটেই বোঝাবাব চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন? কুমির কি হিংসে হচ্ছে? কিসের হিংসে?

অতশত বোঝে না কুমি। মাঝে মধ্যে খেপীব খ্যাপামী তার কাছে অসহ্য হয় বই কি। বিদ্যাধরীর নিটোল নিষ্পাপ দিনগুলোর খুশি ওর মনে একটা জ্বালা ধরায় বই কি? কিন্তু তবু বিদ্যাধরী ওর একমাত্র সঙ্গিনী। ওর নিজের সমাজ নেই। মানুষের কাছে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাবার নেই। তাই কারো সংগেই ও মিশতে চায় না। খেপী কিন্তু এগিয়ে এসে ভালবাসে ওকে। খেপীরও সমাজ নেই, সংসার থেকেও নেই। মানুষের কাছে বিদ্যেধরী অঢেল ভালবাসা পায—কুমির সঙ্গে এইটুকুই ওর তফাৎ, আর এইটেই কুমির জ্বালা।

তবু কুমি খেপীকে না ভালবাসে পারে না।

মদন খেপীর ঘরে যাবার পরও কি খেপী আর গাঁয়ের মানুষের ভালবাসা পাবে?

যদি না পায়। এই ভাবনাটা কুমির অসহ্য লাগে।

বিদ্যাধরীকেও মানুষ ঘৃণা কববে। তাকে যেমন ঘৃণা করে? ভাবতে সাঙ্ঘাতিক ভাল লাগে না। ঘৃণার যন্ত্রণা খেপী সহ্য করতে পারবে না। সে বড় অসহ্য। খেপীর নষ্ট হওয়া চলবে না। ও কিছুতেই খেপীকে নষ্ট হতে দেবে না। দরকার হলে মদনকে খেপীর কাছ থেকে সরিয়ে নেবে।

কথাটা খেপী অদ্ভুত বলল। দুটো ফল যদি একটা ডালেই থাকে। তাতে নষ্টা-নষ্টির কি আছে? কোনমতেই কথাটা বুঝতে পারছে না। খেপীর অনেক কথাই ওর মাথায় ঢোকে না। এক ডালে দুটো ফল থাকা আর এক ঘরে দুটো মানুষ থাকা কি সমান হোল? হাজার হোক বয়সে তো আর বুড়ি নয় বিদ্যাধরী।

—বাইরের মানুষডারে যদি এয়ানে পৈঠায় বসান যায়। তয় বাইর ভিতর এক হইয়া যায়। উয়ারে এয়ানে বসামু। তারপরে ও কোয়ানে গেল আর আইল, তা দিয়া আমার কি কাম।

নিজের বুকখানা দেখিযে বলে বিদ্যা-ধরী। বাইরের মানুষটাকে ওখানে বসাবে। কি যে পাগলের মত বাজে বকে খেপী, বোঝবার উপায় নেই। কুমি ওর পাগলামীর কোন উত্তর দেয় না। তাকিয়ে থাকে ঘাটের দিকে বড় বড় গযনা নৌকোয় মাল সাজান হচ্ছে। ওদেব ঠিক সামনে—একটা নৌকোর ছইযের ভেতর বসে আসাক খাচ্ছে একটা মাঝি। তাকিয়ে রযেছে ওদের দিকে। এ নৌকো নদী পার হয না। যে নদীব ওপাব দেখা যায় না, সে নদী পার হওয়া এ নৌকোর কর্ম নয়। এ সব নৌকো ঘাট থেকে যাত্রী ধরে খাল নালা বেয়ে দূরে দূরে গাঁয়ে পৌঁছে দেয়।

মদন ফিরে এল। ওর হাতে কলা-পাতায় মোড়া রসগোল্লা। রস পড়ছে টপটপ কবে।

পাতাটা এনে কুমির হাতে দিয়ে হাতের রস জিভে চেটে নিয়ে বসল। টাঁক থেকে একটা আধুলি বার করে কুমির হাতে দিল।—আণ্ট আনা লইয়া আইছি।

—কয়ডা?

—দশ গণ্ডা।

—দশ গণ্ডা তো একাই খাওন যায়।

কুমির পছন্দ হয নি এত কম রসগোল্লা আনা। দশ গণ্ডা না হলেও পাঁচ ছ'গণ্ডা রসগোল্লা সবাই খেতে পারে। সাত বছরের একটা মেয়েও চার গণ্ডা রসগোল্লা অনাযাসে টুপটুপ করে খেয়ে ফেলে।

দশ গণ্ডায় তিনটে বড় বড় মানুষ, ক'টা করে আর খাবে? না। খাওয়াটা ত্যামন জুতের হোল না।

বড় কলাপাতাখানা বেশ কৌশলে ভাঁজ করে মুড়ে বেঁধে দিয়েছে। পাতা-খানা খুলে ছিঁড়ে ভাগ করে নিল কুমি। চার গণ্ডা মদন। ওরা তিন গণ্ডা করে। খাওয়াটা মোটেই জুতের হোল না।

নদীর ঘাটে গিযে জল খেয়ে এখন শুরু হবে আবার চলা।

আর পথ বেশি নেই। সূর্যি পশ্চিমের গাছ-গাছালীর তলায় নেমে পড়বার আগেই ওরা পৌঁছোবে ঘরে। পথ আর বেশি নেই। [ক্রমশঃ]

'গুলাবি চা'
তাজা ও সেরা। একবার খেয়ে দেখুন।
৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ (পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের পথ)।

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[প্রথম পর্ব]

মুস্‌লিম লীগের শাসন

১৪ই আগস্ট—১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষের অংগচ্ছেদ ক'রে "পাকিস্তান" নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠ্‌লো। পূর্বেই বলেছি, এই নতুন রাষ্ট্র দুই অংশে বিভক্ত—পূর্ব ও পশ্চিম। দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান, ১,১০০ মাইলের মত "ভারত"-রাষ্ট্র। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার কথাও পূর্বেই বলেছি। জাতীয় পতাকায় "চাঁদ-তারা" চিহ্ন, মুস্‌লিম সংস্কৃতির-ই নাকি প্রতীক। এখানে জাতীয় পতাকার তারকা-চিহ্নের সম্পর্কেই শুধু একটি কথা বল্‌ছি। তারকা চিহ্নটি পাঁচ কোণ বিশিষ্ট। এই পাঁচটি কোণ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে শুনেছিলেম। তাৎপর্যটা হচ্ছে—পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের পবিত্র ঘোষণার দ্যোতক। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ—(১) বেলুচিস্তান, (২) সিন্ধু, (৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, (৪) পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্বাংশের (৫) পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। এখন কিন্তু ঐ পবিত্র ঘোষণার পবিত্রতা আর নেই! পশ্চিমাংশের ৪টি প্রদেশকে, সেদিকের জনগণের মতের বিরুদ্ধেই, এক সাথে মিলিয়ে একটিতে (One unit) পরিণত করা হয়েছে; তবুও, পাঁচ কোণ বিশিষ্ট তারকা-চিহ্নটি আজও জাতীয় পতাকায় শোভা পাচ্ছে! যাঁরা প্রদেশগুলোকে পূর্বের মত আবার পৃথক করার জন্য আন্দোলন করেছেন, তাঁদের স্থান হয়েছিল, বাইরে নয় কারাগারে! উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খাঁন, বালুচ-গান্ধী নামে খ্যাত খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন, সিন্ধু-প্রদেশের নেতা জনাব জি. এম্. সাঈদ, ও জনাব আব্দুল মজিদ প্রমুখকে সেই আন্দোলন করার অপরাধে বহু বছরকাল কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন কাটাতে হয়েছে। সীমান্ত গান্ধী খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনের স্থান তাঁর স্বদেশে হয় নি—তিনি আজ দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়ে—আফগানিস্তানের এক নিভৃত পল্লীতে নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন। আর বালুচ-গান্ধী খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন তো আজও জেলেই কয়েদীর জীবন যাপন করছেন! জনাব আয়ুব খাঁন, সামরিক শক্তিতে ক্ষমতা দখলের পর বালুচ-গান্ধী খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁনকে তাঁর দলবল-সহ গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এক অত্যন্ত অবিশ্বাস্য অভিযোগ আনেন যে খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন, তাঁর দলবল নিয়ে এক সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের না কি ছিল, ক্ষমতা দখলের! আমি যতটা খাঁন আব্দুস সামাদ খাঁন সাহেবকে জেনেছি ও বুঝেছি, তা'তে আমার মনে হয়, তাঁর মত লোকের কাছে এর চেয়ে ঘৃণিত আর কোনও অভিযোগ হ'তে পারে না। এ কথা আমি বিশেষ জোরের সাথেই বল্‌তে পারি; কারণ, আমি উভয় সীমান্ত গান্ধীকেই বেশ ভাল ভাবেই জানি। ঐ সব নেতাদের সাথে আমার ঢাকায়ও কয়েকবার দেখা এবং কথাবার্তা হয়েছে। "আওয়ামী লীগ" থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যখন "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি" প্রথম ঢাকায় গঠিত হয়, জনাব আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানীর নেতৃত্বে, তখন ঐ সব নেতাই ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের সভায় ঐ দল-গঠনের প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে তাঁরা ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় যান। খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন বক্তৃতা করতে মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালে আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় ঐ সভা ভেঙে দেওয়ার সব রকম চেষ্টাই হয়—ঢিল-পাটকেল পড়্‌তে সুরু হয়, লাঠিবাজিও চলে। সকলেই মনে করেন, খাঁন গফুর খাঁনের জীবন হয়তো বিপন্ন হ'তে পারে। জনাব আব্দুল্লা সাহেব তখন অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ' (Acting I. G. of Police)। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে পুলিশকে শান্তিস্থাপনে নিয়োগ করেন। সেই সময় আওয়ামী লীগের মন্ত্রিত্বেই 'সরকার' চল্‌ছিল। চারদিক থেকে ইট-বৃষ্টি হচ্ছে। সভায় সমবেত লোক ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ছেন। বীর পাঠান-নেতা তখনও নির্ভীকভাবে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন। তাঁর সাথে যোগ দিয়েছেন, আর একজন পাঠান-নেতা। তিনি হলেন, বালুচ-গান্ধী—খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন। আই, জি জনাব আব্দুল্লা সাহেব খাঁন গফুর খাঁনের ও খাঁন সামাদ খাঁনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের বলেন—"আপনারা আমার 'জীপ' গাড়িতে উঠুন। আমি আপনাদের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি।" কিন্তু উভয় নেতাই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা হেঁটেই যাবেন। জনতার কোন অংশ যদি তাঁদের মারতে চান, তাহলে তাঁরা অনায়াসে তাঁদের মারতে পারে। তাঁরা প্রাণভয়ে কদাচ পালিয়ে যাবেন না। তাঁরা হেঁটেই চলেন। সভার স্থান থেকে তাঁদের বাসা এক মাইলের কম হবে না। বুড়ীগঙ্গার ধারে সদরঘাট অঞ্চলে এক তরুণ ব্যারিস্টার শ্রীমান বদ্‌রুল ইসলামের বাড়িতে তাঁরা উঠেছেন। নেতারা চল্‌লেন পায়ে হেঁটে। নির্ভীক নেতাদের শান্ত ও সমাহিতচিত্তে চল্‌তে দেখে জনতা স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং অবশেষে শান্ত। বাসায় ফেরার পর, দলের কর্মীরা নেতাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। বালুচ-গান্ধী খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন কর্মীদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন—"তোমরাও তো হিংসার পথ নেওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলে! মঞ্চের নিচে তোমাদেরও 'লাঠি-সোটা' মজুত ক'রে রেখেছিলে! কেন, ঐ অপকর্ম করার জন্য মনস্থ করেছিলে? .....।" এহেন সামাদ খাঁনের বিরুদ্ধে আয়ুব খাঁনের অভিযোগ তিনি গোপনভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করার প্রস্তুতি করেছিলেন! তাঁর বিচারের একটা প্রহসন করা হ'ল। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'ল। ক্ষমার অবতার (!) জঙ্গী আয়ুব খাঁন মহত্ত্বের (!) পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বল্‌লেন—"তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর যদি দোষী(!) ব্যক্তি দোষ স্বীকার ক'রে সদ্ভাবে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তা'হলে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।" আয়ুব খাঁন সাহেব নিজে পাঠান হয়েও জানেন না যে ঐ পাঠান বীর-নেতারা গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবনের গতি কিভাবে বদ্‌লিয়ে ফেলেছেন—তাঁরা জীবন দেবেন, তবু নীতি বিসর্জন কিছুতেই দেবেন না। যা'কে একবার তাঁরা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাকে তাঁরা জীবনের বিনিময়েও রক্ষা ক'রেই চলেন! তাই, পাঠান-বীর আব্দুস্ সামাদ খাঁনও তাঁর সত্যাশ্রয়ীর নীতি বিসর্জন দেন নি। জেলে তাঁর তিন বছর কেটে যাওয়ার পরেও আজও তিনি তাঁর তথাকথিত দোষ স্বীকার করেন নি।

CENTRAL LIBRARY

তাই, আজও তিনি জেলেই দিন কাটাচ্ছেন!

পরবর্তীকালে জেনেছি যে খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও 'আজাদ-পাকিস্তান'-এর জেলে যে ১৬।১৭ বছর কাটাতে বাধ্য হলেন, তা-ও ঐ নীতিকে আঁকড়িয়ে থাকার জন্যই। দেশ-বিভাগের প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিকা কমিটি (Congress Working Committee) পাশ করার পরে, কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন দেশ-বিভাগের পরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন! ধন্য-ধন্য; আজাদ সাহেব—কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি! গফুর খাঁন, কংগ্রেসের একজন সত্যাশ্রয়ী অহিংস সৈনিক হিসাবে তাঁর সভাপতির ঐ মূল্যবান (!) উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন নি—যদি পারতেন, তাহলে তাঁর জীবনও সুখ-সম্ভোগের মধ্যেই অবশ্যই কাটতো। তা' তিনি পারলেন না, শুধু একবার গৃহীত নীতিকে জীবন-ভর আঁকড়িয়ে ধ'রে থাকার জন্য। কোন ক্ষমতার বা অর্থের প্রলোভনই তাঁকে নীতি-ভ্রষ্ট করতে পারে নি। খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনের কাছ থেকে তাঁর-নিজ-মুখেই আমি শুনেছি যে তিনি যখন পাকিস্তান 'ন্যাশনাল এসেম্বলির' (পার্লামেন্টের) সদস্য ছিলেন তখন পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি খাঁন, তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—"খাঁন সাহেব, আপনি মুসলিম লীগে যোগ দেন, আপনাকে আমি মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করতে চাই! 'পাকিস্তান' তো 'কংগ্রেসের' বিরোধিতা সত্ত্বেও হ'য়ে গিয়েছে; আর কংগ্রেসের সেই বিরোধিতার নীতি, যে নীতি কংগ্রেস-নেতারাও ত্যাগ করেছেন, সেই নীতি আঁকড়িয়ে ধরে থেকে আর তো লাভ নেই। আসুন, আপনি আমাদের সাথে যোগ দেন—আমরা সবাই মিলে পাকিস্তানকে গ'ড়ে তুলি।" খাঁন সাহেব কিন্তু লিয়াকত আলি সাহেবের সেই আবেদনেও সাড়া দিতে পারেন নি, মৌলানা আজাদ সাহেবের উপদেশ গ্রহণ করলে তিনি অনায়াসেই লিয়াকত আলি সাহেবের আবেদনেও সাড়া দিয়ে তাঁর জীবনের গতি পাল্টাতে পারতেন! কিন্তু তা' তিনি পারেন নি। গান্ধীজী এক সময়ে বলেছিলেন যে তাঁর নীতিই তাঁর জীবন। গফুর খাঁনেরও তা-ই। আরও একবার গফুর খাঁনের সামনে অর্থের এক বিরাট প্রলোভন উপস্থিত হয়েছিল। জনাব ইস্কান্দার মীর্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি, খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনকে তাঁর ব্যয়ে আহ্বান ক'রে তাঁকে বলেন,—"খাঁন সাহেব, আপনি তো গান্ধীজীর মতে গ্রাম-সংগঠনে বিশ্বাসী—গ্রামে গ্রামে চরকা-খাদি প্রভৃতিও চালান। আমি আপনার হাতে এক কোটি টাকার একটি তহবিল দিতে চাই, আপনার ঐ সব কাজ পরিচালনার জন্য। ঐ টাকার জন্য আপনাকে কারো কাছেই কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আপনি নিজের ইচ্ছামত কাজ ক'রে যেতে পারবেন। আপনি রাজী হ'লে আমি এখনই ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।" সত্যাশ্রয়ী খাঁন সাহেব মীর্জা সাহেবের মনের আসল কথাটি বুঝে নিলেন—বুঝ্‌লেন, টাকা দিয়ে মীর্জা সাহেব তাঁকে কিনতে চান। গফুর খাঁন সাহেব, তাই, প্রস্তাবটি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। মীর্জা সাহেব না কি শেষে তাঁর কোনও বন্ধুর কাছে গফুর খাঁন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে,—"ক্যায় সে বেকুফ আদ্‌মি! রুপেয়া দেনেসে ভি লেনে নেহি মাংতা!" অর্থ ও সম্মানের পূজারী মীর্জা সাহেবের মত সাধারণ শ্রেণীর লোকের কাছে গফুর খাঁন সাহেবের ব্যবহারটা খুবই অস্বাভাবিকই মনে হতে পারে, কারণ তাঁরা তো জানেন না যে খাঁন সাহেব অ-স্বাভাবিক—অতি-অস্বাভাবিক ব্যক্তি। জীবনটাই তাঁর কাছে বড় নয়—নীতিই তাঁর কাছে অতি বড়—জীবনের চেয়েও, জীবনের সুখ-সম্ভোগের চেয়েও বড়—অতি বড়। সীমান্তের দুই পাঠান নেতাকে দেখে আমি যতটা বুঝেছি, তা'তে আমার মনে হয়েছে, উভয়েই একই ধাতুতে গড়া; তাই, খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন আজও জেলেই—সৎ (!) ভাবে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেল থেকে মুক্তি নেন নি—নিতে পারেন নি। ভারতের কংগ্রেসী নেতারা আজ তাঁদের অতীতের এই সব বীর সহ-যোদ্ধাদের কথা, বোধহয়, ভুলেই গিয়েছেন! দেশ-বিভাগের, তথা স্বাধীনতার প্রাক্কালে তবু, খাঁন আব্দুল গফুর খাঁনকে একটা সময়োচিত উপদেশ দিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন! মৌলানা আজাদ ছিলেন, একজন সুচতুর রাজনীতিক। সময়ের তালে তালে পা মিলিয়ে চলাও রাজনীতির একটা অঙ্গ। সময়ের তালে পা মিলিয়ে চলাকে সুবিধাবাদের পর্যায়েও ফেলা চলে। অনেক রাজনীতিকই এই পন্থা-ই অনুসরণ করে চলেন, যেমন আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি এই ভারতে। একদিনের অতি কট্টরপন্থী 'জেহাদী' মুসলিম লীগের নেতাও আজ দেশ-বিভাগের সাথে সাথে অতি কট্টর-পন্থী কংগ্রেসী হ'য়ে গিয়েছেন! এটাও রাজনীতি, কিন্তু দুই সীমান্ত গান্ধী—খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন ও খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁন—এই শ্রেণীর রাজনীতিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না—আজও হ'তে পারেন নি। এই দুই নেতার চেয়ে বড় বা তাঁদের সমকক্ষ আর কোন নেতাই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যাশ্রয়ী অহিংস যোদ্ধা আছেন কি না, আমার জানা নেই। ভারতে একমাত্র বিনোবাজী হয়তো কিছুটা আছেন। বিনোবাজী সম্পর্কে "কিছুটা" কথাটা ব্যবহার করছি এই জন্য যে তাঁর এখনও খাঁন আব্দুল গফুর খাঁন ও খাঁন আব্দুস্ সামাদ খাঁনের মত অগ্নিপরীক্ষার সামনে উপস্থিত হ'তে হয় নি। তিনি সকলের শ্রদ্ধাই পেয়ে আস্‌ছেন। নেহরুজী, লালবাহাদুরজী ও ইন্দিরাজী প্রমুখ ভারতের রাষ্ট্রীয় তরণীর কাণ্ডারীরা—সকলেই—বিনোবাজীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য দিল্লীর মসনদ থেকে ছুটে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন বিনোবাজীর কুটিরে। কিন্তু সীমান্তের ঐ দুই নেতা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে কোন সম্মান তো পানই নি, উপরন্তু তাঁদের কাছ থেকে অনবরত লাঞ্ছনাই ভোগ করেছেন; তবু, তাঁরা তাঁদের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হন নি। এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তাঁরা আজও অগ্রসর হয়েই চলেছেন। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়েছে, গান্ধীজীর এই দুই সত্যাশ্রয়ী অহিংস শিষ্য কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

এই দুই পাকিস্তানী নেতার জীবন নিয়ে এতখানি আলোচনা করেছি, শুধু এইটুকু দেখানোর জন্যে যে পবিত্র পাকিস্তানের (পাক=পবিত্র, স্তান= ভূমি বা জায়গা) পবিত্র ঘোষণার স্বরূপটা কিরূপ! জাতীয় পতাকায় তারকা-চিহ্নটি যে পাঁচটি পৃথক প্রদেশের অস্তিত্বের কথা আজও সগৌরবে দুনিয়ার সামনে ঘোষণা ক'রে চলেছেন, তার মর্যাদা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা প্রদেশগুলোকে আবার পৃথক করার দাবি তুলেছেন, তাঁদের প্রতি কি নিদারুণ নির্যাতন চলেছে!

পাকিস্তানের পবিত্র ঘোষণার আরও নমুনা আছে। ১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে—"পাকিস্তান"—প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম পাশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবে ছিল প্রদেশগুলোকে, অর্থাৎ পাঁচটি প্রদেশকে নিয়ে পাকিস্তান হবে, এক যুক্তরাষ্ট্র (federation), যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি প্রদেশেরই থাকবে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য—প্রদেশের শাসন-পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ অধিকার; প্রদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এবং একই রাষ্ট্রীয় নীতি বজায় রাখার জন্য মাত্র কয়েকটি বিষয় থাকবে কেন্দ্রের কাতে কিন্তু আজ আর সে অধিকার প্রদেশের নেই। এই অধিকারের দাবি তোলায়, পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ অবিসম্বাদী নেতা—শেখ্ মুজিবর রহমান আজ কারাগারে বন্দী—দণ্ডিত

করেদী! আরও শত শত তরুণ কর্মী ও প্রবীণ নেতা ঐ একই কারণে কারান্তরালে বিনা বিচারে আটক বন্দী! এই তো সেদিন কয়েক মাস আগে দিনাজপুরের প্রবীণ নেতা—হাজী দানেশ সাহেবকে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে। হাজী সাহেব ছিলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহ-সভাপতি। আমি তাঁকে খুব ভালভাবেই চিনি ও জানি। তাঁর রাজনীতিক মতবাদ সম্পর্কে নানা জনেই নানা কথা বলেন—কেউ বলেন, তিনি 'কম্যুনিস্ট'—কেউ বা বলেন, তিনি একজন সমাজবাদী। তাঁর মতবাদ যাই হোক, আমি জানি তিনি একজন নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী—দরিদ্রের ও বিপন্নের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি একজন এম-এ, বি-এল উকিল কিন্তু তিনি তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য দৈনিক মাত্র দু'টাকা তাঁর ব্যবসায়ের মাধ্যমে রোজগার করতেন। দৈনিক রোজগার তাঁর দু'টাকা হয়ে গেলেই আর যত মামলাই তিনি করতেন, তার জন্য কোন "ফী" তিনি নিতেন না। এই নীতির ফলে তাঁর সংসারে দারিদ্র্য লেগেই থাকতো, অর্থাভাবে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েও দিতে পারছিলেন না; অবশেষে তাঁর ত্যাগ-মুগ্ধ ও গুণ-মুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য ক'রে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। পুলিশ বিভাগের লোকের কাছেই আরও শুনেছি যে তিনি যখন জেলে বন্দী, তখন তাঁর পুত্র অভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে তাঁকে জেলখানায় পত্র দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি পরিবার পালন করতে পারে না, সে বিয়ে করেছিল কেন? আমি পূর্ব পাকিস্তানে থাকা-কালেই এই ঘটনাগুলোর কথা জেনেছিলাম। হাজী সাহেবের ছেলের চিঠির কথা, জেলের চিঠি যে পুলিশরা 'সেন্সর' করেন, এমন কোন পদস্থ পুলিশ অফিসারের কাছ থেকেই শুনেছিলেম। আমি যখন, পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেম, তখন আমি দিনাজপুর সফরে গিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই হাজী সাহেবের দরিদ্র সংসারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তাঁর বাসায়ও গিয়েছিলেম, যদিও হাজী সাহেব আমাদের মন্ত্রিসভার বিরোধী দলেরই একজন নেতা ছিলেন। আমি স্বচক্ষে তাঁর সংসারের অবস্থা দেখেছিলেম সেজন্যই আজ তাঁর দারিদ্র্য সম্পর্কে এত সব কথা অত্যন্ত জোরের সাথেই বলতে পারছি। এহেন ব্যক্তিও আয়ুব-মার্কা দ্বিতীয় পর্যায়ের মুসলিম লীগের তথাকথিত গণতান্ত্রিক (!) শাসনে আজ জেলে বন্দী! তাঁর মতবাদের জন্যই কি তিনি আজ জেলে? না, তা নয়। আয়ুব খাঁ সাহেবের তো এখন কম্যুনিস্টদের সাথে 'দহরম-মহরম'-ই চলছে! তবে কেন? আমার মনে হয়, হাজী সাহেবের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা ও জনগণের সামনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরাই তাঁর বন্দিত্বের আসল কারণ। আয়ুব খাঁ সাহেব শাসনের নামে পীড়নের মাধ্যমে জনগণের স্বায়ত্তশাসনের সোচ্চার দাবিকে স্তব্ধ করে দিতে চান; তাই আজ সারা পূর্ব পাকিস্তানই এক বিরাট জেলখানায় পরিণত হয়েছে। 'পাকিস্তান' সৃষ্টির পর থেকে যতই দিন যাচ্ছে, ততই পাকিস্তানের নব নব রূপ দেখা দিচ্ছে—সে রূপ, পূর্বের মুসলিম লীগ শাসনের রূপের চেয়ে আরও কঠোর—আরও দমনমূলক রূপ। তবু, কিন্তু 'পাকিস্তান' পবিত্রভূমি! আর, এই 'জিগির' তুলছেন কে? আয়ুব খাঁ সাহেব স্বয়ং এবং তাঁর পরিষদবর্গ! এটাই কি ঐসলামিক আদর্শের নমুনা? মুখে ইসলামের আদর্শের কথা অহরহ প্রচার করে কাজের রূপায়ণ যেভাবে করা হচ্ছে, তাতে 'ইসলাম'কে লোকচক্ষে হেয় করা হচ্ছে কি না, সে কথা আজ বিশ্বের মুসলমানসমাজের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে বলে পাকিস্তানের অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন ভূতপূর্ব নেতা হিসাবে আমি একথা আজ বিশ্ব-মুসলমানসমাজের কাছে তুলে ধরছি।

যাক, এ সব যাই হোক, ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'পাকিস্তান'ও হয়েছে এবং আজও তা চলছেই। প্রথম যেদিন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের হাতেই এসেছিল। কেন্দ্রে জনাব লিয়াকত আলি সাহেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গড়েন; আর, পূর্ববঙ্গে, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন, খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন সাহেব।

পূর্বেই বলেছি, যুক্ত বাংলার 'এসেম্বলির স্পীকার' থাকা-কালেই জনাব

নুরুল আমিন সাহেব, সুরাবর্দী-বিরোধী একটি দল গড়েন। নাজিমুদ্দিন সাহেবকে দেশ-বিভাগের পর তবু দলের নেতা, তথা পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করা একা জনাব নুরুল আমিন সাহেবের এবং তাঁর দলের পক্ষে সম্ভব হত না। এদিক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিনে, 'আজাদ' পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক—মৌলানা আক্রম খাঁ সাহেব, নোয়াখালীর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, কুমিল্লার জনাব মফিজুদ্দিন সাহেব, দিনাজপুরের হাসেম আলি সাহেব ও আরও অনেকে। এঁদের সমবেত চেষ্টায় জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব বিধানসভার সদস্যদের মুসলিম লীগ দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিসভায় তাঁকে সাহায্যকারী সকলের মধ্যে মৌলানা আক্রম খাঁ ছাড়া সকলেরই স্থান হল। মৌলানা সাহেব মন্ত্রিত্ব নিলেন না। জনাব নুরুল আমিন সাহেব হলেন খাদ্যমন্ত্রী, জনাব হামিদুল হক সাহেব অর্থমন্ত্রী, জনাব মফিজুদ্দিন সাহেব কারামন্ত্রী ও জনাব হাসেম আলি সাহেব কৃষি ও সেচ-মন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকজন থাকলেন। সকলের নাম আজ আর মনে নেই; তবে, সম্ভবত বরিশালের জনাব আফজল সাহেবও ঐ মন্ত্রিসভায় প্রথম থেকেই ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই সব মন্ত্রীদের আরও দেখা মিলবে, তাই অনেকের মধ্যে থেকে এই নাম কয়টিই এখানে উল্লেখ করলেম।

নাজিমুদ্দিন সাহেব ছিলেন ব্রিটিশের হাতে গড়া—শুধু হাতে গড়াই নয়, ব্রিটিশ-ছাঁচে ঢালা—রাজনীতিক নেতা। ১৯১৯ সালের মন্ট-ফোর্ড (মন্টেগু-চেমস-) ফোর্ড) ভারত-শাসন-সংস্কারের দ্বৈত শাসনের (ডায়ার্কি) যখন ১৯২১ সালে রূপায়ণ হয়, তখন ঐ শাসনকালে তিনি মন্ত্রী ও এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলরও (Executive Councillor) হয়েছিলেন এবং তাঁর সেবার পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে 'স্যার' খেতাব পেয়েছিলেন। তাঁর শাসন-সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা, তা-ই, আগে থেকেই ছিল।

নাজিমুদ্দিন সাহেব 'ইসলামের' আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি সবই খুব নিষ্ঠার সাথেই মেনে চলতেন। রোজা, নামাজ প্রভৃতি কখনও তাঁর বাদ যেত না—তিনি হজ করে 'হাজী'ও হয়েছিলেন। এই সব কারণেই বোধ হয়, নাজিমুদ্দিন সাহেব, সুরাবর্দী সাহেবের মত দুর্ধর্ষ নেতা ছিলেন না। পূর্বেই আমি বলেছি, ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ প্রবর্তিত "ডাইরেক্ট এ্যাকশানের" কালে বাংলার শাসনভার যদি নাজিমুদ্দিন সাহেবের হাতে থাকতো, তাহলে হয়তো তিনি, কলকাতার ও নোয়াখালির পথে-প্রান্তরে সুরাবর্দী সাহেব যেরূপ নর-রক্তের স্রোত বইয়েছিলেন, তা হয়তো তিনি পারতেন না; সুতরাং, পাকিস্তানও হত না। এইটে, অবশ্য, আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে মনে হয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন সাহেব, দেশ বিভাগ তথা 'আজাদ' পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ব-বঙ্গ প্রদেশের বিধানসভার (এসেম্বলির) মুসলিম লীগ সদস্যদের নেতা, সুতরাং পূর্ববঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন থাকাকালে ইংরেজ কর্তৃক দেশ শাসনে সহযোগিতা করেও তিনিই আবার স্বাধীন দেশের মন্ত্রী হলেন! যে সব দেশ সংগ্রাম ক'রে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রে নিজেদের শক্তিতে দেশকে স্বাধীন করেছেন, সে সব দেশে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে ব'লে আমার জানা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। বাংলার সুসন্তান কবি ও নাট্যকার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল, তাই, তাঁর এক নাটকের নটের মুখ দিয়ে বলিয়ে-ছিলেন—'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' সত্যিই, ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। যা' নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিত্বের বেলায় হয়েছে, তা-ই সংগ্রামী কংগ্রেসের অর্জিত স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও হয়েছে! নাজিমুদ্দিন সাহেবই একমাত্র ব্যতিক্রম নন, পশ্চিম-বঙ্গেও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের মন্ত্রিত্বের অপসারণের পরে যখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মশায় কংগ্রেসী দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গে গড়েন, তখন তাঁর মন্ত্রিসভাতেও অর্থমন্ত্রী হিসাবে স্থান পান শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (বর্তমানে, পর-লোকগত)। ইনি অতীতে কংগ্রেসের একজন প্রথম সারিরই নেতা ছিলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে তিনি মুখ্য সচেতক (চীফ হুইপ) হয়েছিলেন। কংগ্রেস থেকেই তিনি কলিকাতা কর্পো-রেশনের 'মেয়র'-ও হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ শাসনকালে তিনি বাংলা দেশের অর্থমন্ত্রী এবং পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই ইংরেজ বড়লাট ও রাজ প্রতিনিধি (Vice-Roy & Governor-General)-এর একজিকিউটিভ কাউন্সি-লের সদস্যও হয়েছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কাজ সেকালের সুভাষচন্দ্র পরিচালিত সংগ্রামী বাংলা কংগ্রেস সমর্থন তো করেনই নি, তাঁকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত ক'রে বিশ বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন, অর্থাৎ বিশ বছরের মধ্যে আর তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে আসতে পারবেন না—এই দণ্ডাদেশ দিয়ে-ছিলেন কিন্তু দণ্ডাদেশের বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আবার তিনি কংগ্রেসে এসে কংগ্রেস-পরিচালিত মন্ত্রিসভাতে অর্থমন্ত্রী রূপে দেখা দেন।

স্বাধীনতার পূর্বে সংগ্রামকালে আমিও আমার জেলায় (রাজসাহীতে) একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীই ছিলাম। সেদিনে কংগ্রেসের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলেও একবার ছাড়া মন কখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি। একবার মাত্র করেছিল, যখন কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেস-নেতারা অত্যন্ত লজ্জাজনক হীন আচরণ ক'রে তাঁকে 'কংগ্রেস' ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। তার পর ১৯৪৬ সালে আবারও বাংলার কংগ্রেস নেতারা আবার আমাকে ডেকে কংগ্রেসে নিয়ে কংগ্রেস থেকেই সাধারণ নির্বাচনে আমাকে "বেঙ্গল এসেম্বলির" সদস্য করেছিলেন। আজ স্বাধীনতার বিশ বছর পরে "পাক-ভারতের রূপরেখা" লিখতে গিয়ে পুরনো দিনের অতীত কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে, স্বাধীনোত্তর যুগে সংগ্রামী কংগ্রেস এবং ইংরেজের সাহায্যপুষ্ট মুসলিম লীগ দল—সব বিষয়ে না-হলেও—অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই প্রায় এক পর্যায়ে নেমে এসেছে—সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে, স্বাধীনোত্তর যুগের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দল যেন একই মুদ্রার এ-পিঠ, আর ও-পিঠ! আজ অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথেই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি দেখেছি, পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব-বঙ্গের জনসাধারণের মন থেকে তাঁরা যে অতীতের বাংলা দেশেরই একটি অংশ মাত্র, সে কথাটা চিরতরে ভোলানোর জন্য পূর্ববঙ্গের নাম পাল্টিয়ে তাকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে অভিহিত করতে। এদিকে ভারতে এসেও দেখলেম, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাও চেষ্টা কর-ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নাম পাল্টিয়ে তাকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করতে! উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন কোনও দিন মনে না-করেন যে বাংলা দেশকে আপোষে স্বাধীনতা পাওয়ার দুর্নিবার লোভে; একদিন কংগ্রেস-নেতারা বিভাগ করার অপকীর্তি করেছিলেন! কিন্তু জাগ্রত জনমতের জন্য মন্ত্রিসভার দুষ্ট পরিকল্পনা ফলবতী হ'তে পারে নি। আরও অনেক ব্যাপারই আমি কংগ্রেস ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাতের মত মিল দেখছি। সে সব সম্পর্কে ক্রমশ বলবো।

যা'ক, এখন শুধু এইটুকুই ব'লে রাখছি যে, পূর্ববঙ্গে নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বেই প্রথম পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

চাঁদে যাবেন যাঁরা

॥ এক ॥

এ্যাড্‌ভান্স বুকিং এখনও ঠিক সুরু হয় নি; কিন্তু লাইন এরই মধ্যে পড়ে গেছে। এরই মধ্যে উৎসাহীদের কেউ কেউ শুধোচ্ছেন, আর দেরি কত? চাঁদ-পর্যটন কবে সুরু হবে?

উদ্যোক্তারা বলছেন, সুরু হল বলে। আর কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরুন শুধু। তার পরেই মহাকাশযানে চেপে মহানন্দে চাঁদে পাড়ি দেবেন।

এদিকে চাঁদের পরিবেশ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সে দেশের বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষ নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তো? জল-বাতাস নেই সেখানে; গাছপালা নেই। দিনে সেখানে প্রচণ্ড গরম; আর রাত্রে মারাত্মক শীত। এমন দেশে বাঁচতে পারবে তো মানুষ? এ ছাড়া চাঁদের স্বল্প মাধ্যাকর্ষণশক্তি কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তার দেহে? চাঁদে গিয়ে কেমন করে চলাফেরা করবে সে? ঘুমোবে কেমন করে? দেখবে কতটুকু? খাবে কি? —এবং এ সব কিছুর চেয়েও বড় কথা, পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল নেই চাঁদে। অতএব, কে সেখানে মানুষকে কস্‌মিক রশ্মির আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে? আর রক্ষা যদি কোনোমতে সে পায়ও, তো সেখানে গিয়ে তার মানসিক অবস্থাটা কেমনতরো হবে?

এই ধরণের হাজার প্রশ্ন আজকের চাঁদে-পাওয়া মানুষদের ভাবিয়ে তুলছে। তাই বাধ্য হয়েই তারা ধর্না দিচ্ছেন মুশকিল-আসান বিজ্ঞানীদের কাছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোনো চিন্তা নেই। সব সমস্যারই সমাধান হল বলে। কারণ, অভয়মন্ত্র জানা আছে আমাদের।

আমরা বলি, ভাল কথা। মন্ত্রগুলোর ভাষ্য রচনা করা যাক তবে। দেখা যাক, সত্যি এদের মধ্যে কোন তাৎপর্য আছে কি না।

চাঁদে বসবাসের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমেই 'সাবমেরিন'-এর দোহাই দেন। বলেন, দীর্ঘকাল ধরে জলের তলায় থাকবার সময় 'সাবমেরিন'-এর বাসিন্দারা যেমন, চন্দ্রের অভিযাত্রীরাও অনেকটা ঠিক তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই চন্দ্রের জীবনযাত্রা সাবমেরিনযাত্রীদের মতই অতি সূক্ষ্ম পরিকল্পনামাফিক চলা উচিত। কখন কাজ করব, ঘুমোবো কখন, কখনই বা বিশ্রাম করব,—এই সব কিছুর ছক পৃথিবীর সঙ্গে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রেখে রচনা করা উচিত। যদিও চন্দ্রের এক-একটি দিন আমাদের পৃথিবীর ১৪টি করে দিন-রাত্রির সমান এবং তার রাত্রির দৈর্ঘ্যও ঠিক একই রকম, তাই বলে ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা পৃথিবীর অধিবাসী। পৃথিবীর মাপে ১৪টি দিনরাত্রি এক-নাগাড়ে যেমন আমরা ঘুমোতে পারি না, ঠিক তেমনি ঐ পরিমাণ দীর্ঘ সময় জুড়ে একটানা কাজ করতেও আমরা অনভ্যস্ত। কুম্ভকর্ণ আমাদের মধ্যে একজনই ছিলেন এবং রামায়ণের যুগ থেকে বাকী সকলেই এক-একটি ক'রে দিন-রাত্রিকে ২৪ ঘণ্টার মাপে দেখে আসছেন। অতএব, চাঁদে গিয়েও মানুষের এই সাবেকী অভ্যেসটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ওখানকার এক একটি দিনকে চোদ্দটি করে দিন এবং চোদ্দটি করে রাত্রিতে বিভক্ত করে নিয়ে জীবনযাত্রা চালাতে হবে। অনুরূপভাবে চাঁদের এক-একটি রাত্রিকেও পৃথিবীর চোদ্দটি করে দিন এবং রাত্রিকেও ভাগ করে না নিয়ে উপায় নেই। অতএব দেখছি, চাঁদের দেশে গিয়ে ওখানকার হিসেবে কেউ যদি একদিন থাকেন তো আমাদের পৃথিবীর হিসেবে ২৮ দিন পেরিয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, তা' যাক। চাঁদের দিন-রাত্রিকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই; আসল ভাবনা কস্‌মিক রশ্মিকে নিয়ে। এই রশ্মি চাঁদযাত্রীদের আবাসস্থল এবং স্পেস-স্যুট-এর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। দেখতে দেখতে সর্বনাশের ফাঁদ পাততে পারে সে সব জায়গায়। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, আবাসস্থলের দেওয়াল এবং স্পেস-স্যুটে মিলে কস্‌মিক রশ্মির বেশ খানিকটা শোষণ করে নেবেই কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ঐসব আবরণের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে রশ্মি যে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তা' থেকে চাঁদ-পর্যটকরা পরিত্রাণ পাবেন কি? বিজ্ঞানীদের ধারণা, পরিত্রাণ হয়তো না-ও পেতে পারেন। কস্‌মিক রশ্মির দৌলতে মানুষের কোষগ্রন্থির ক্ষতিটা অপূরণীয় হতে পারে। তবে এ নিয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্ত এখনও অবধি কেউ করেন নি। সবাই গবেষণার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এদিকে অন্য এক সমস্যা দেখা দিয়েছে সূর্যদেহের বিস্ফোরণকে নিয়ে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এই বিস্ফোরণের সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে তাপরশ্মি বিকিরণের মাত্রা হয়তো ১০,০০০ গুণ বেড়ে যাবে। অতএব তখন চাঁদের গুহায়-গহ্বরে বা বিশেষ ধরণে নির্মিত অন্য কোনস্থানে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন, প্রয়োজন হলেই এমন কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা চাঁদযাত্রীরা করতে পারবেন কি? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ, পারবেন। বিশেষ আবরণযুক্ত আবাসগৃহ নির্মাণ করে এ সমস্যারও সমাধান করা যাবে। কিন্তু চলাফেরার কি হবে? চাঁদে হাঁটবার সময় পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি অসুবিধা হবার কথা। শুনতে ধাঁধার মত মনে হয় যদিও, যদিও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র, তবু সেখানে চলবার সময় পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ-সমস্যারও সমাধান হতে পারে, চাঁদে গিয়ে কেউ যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন এবং যদি সেই সঙ্গে দৌড়ন। লাফিয়ে চললে এবং দৌড়লেই চাঁদের স্বল্প মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারবেন তিনি; এবং সেই সঙ্গে তাঁর মাংসপেশীর শক্তিকেও কাজে লাগাতে পারবেন।

এদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের এই মাধ্যাকর্ষণ বিশেষ কোন সমস্যাই নয়। আকাশ-পরিক্রমায় বেরিয়ে শূন্য-মাধ্যাকর্ষণে যে অসুবিধা ভোগ করেন অভিযাত্রীরা তার তুলনায় পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ মাধ্যাকর্ষণশক্তি বিশিষ্ট চাঁদে ওঁরা ঢের বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবেন। এমন কি পৃথিবীর তুলনায় অনেক আরামে ওখানে ঘুমোতে পারবেন ওঁরা। পৃথিবীর শয্যায় একজন ঘুমন্ত মানুষকে প্রতি রাত্রে প্রায় ১৫ বার নড়তে-চড়তে হয়। এই নড়া-চড়া বা পাশ-ফেরার কাজটা নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই করে সে; কিন্তু করে নিজেরই মঙ্গলের জন্যে। এরই ফলে রক্ত ঠিকভাবে সমগ্র দেহে চলাচল করার সুযোগ পায়; দেহের কোন বিশেষ অংশ রক্ত-সঞ্চালনের আওতা থেকে বেশিক্ষণ দূরে থাকে না। কিন্তু চাঁদের ঘুমন্ত অবস্থায় এই ধরণের নড়া-চড়ার প্রয়োজন প্রায় নেই বললেই হয়। কারণ, সেখানে মাধ্যাকর্ষণ কম বলে দেহ যাতে শায়িত থাকবে তা' থেকে চাপ সৃষ্টি হবে অপেক্ষাকৃত অল্প। ফলে, ঘুমের ঘোরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যখন-তখন নাড়াচাড়া

করার প্রয়োজন হবে না এবং ঘুমোন যাবে পরম নিশ্চিন্তে।

এদিকে স্পুটনিকে করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশচারীরা বিশেষ কয়েকটি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন। ওঁরা বলেছেন, প্রদক্ষিণের সময় রক্তের চাপ কমে যায়; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন চলে ধীর তালে।

সন্দেহ নেই, মাধ্যাকর্ষণের হের-ফেরই হল এগুলোর মূল কারণ; এবং চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণও কম বলে ওখানে যাঁরা যাবেন, রক্তের চাপ স্বভাবতই তাঁদের কমে আসবে; তাঁদের হৃৎপিণ্ডও চলবে ধীর ও মন্থর গতিতে। ফলে, অনেক কম পরিশ্রমেই হৃৎপিণ্ড দেহের রক্ত-সঞ্চালনের কাজটা বেশ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে দেবে।

এরপর আসছে আলো-আঁধারের প্রসঙ্গ; চাঁদে গিয়ে মানুষ দেখবে কী এবং কতটুকু, সে সব কথা। এদেব জবাব দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের দিনে ও রাত্রিতে পৃথিবীর তুলনায় বেশি আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে। অবশ্য সেখানে গিয়ে অদ্ভুত কিছু অভিজ্ঞতা হবে মানুষের। সে দেশে বায়ু নেই বলে সবাই দেখবে, আলো ও আঁধারের পার্থক্যটা বড় বেশি প্রকট।

এ ছাড়া চাঁদে গিয়ে কখনও সেখানকার পাহাড়-পর্বতের দিকে তাকাবে মানুষ। কখনও আবার সে রাজ্যের বৃক্ষ-লতা ও জনপ্রাণীবিহীন মাঠ-ময়দানগুলোকে দেখবে। তার আবাসগৃহের ভেতর থেকে দেখবে সে। কখনও দেখবে স্পেস-স্যুটের আড়াল থেকে। ফলে, চাঁদের দেশের আলোর যথাযথ সান্নিধ্য সে হয়তো পাবে না, তার আবাস-গৃহ বা স্পেস-স্যুটের স্বচ্ছ আবরণগুলো হয়তো শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ আলো শুষে নেবে অথবা প্রতিহত করবে, কিন্তু তবু পৃথিবীর তুলনায় সব কিছুকেই অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখবে সে; এবং সে ঔজ্জ্বল্য হবে পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকো-দ্ভাসিত দিনের চেয়েও শতকরা ২০ ভাগ বেশি।

চাঁদের দেশের রাত্রিও হবে বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীকে সেখান থেকে তখন স্পষ্ট চোখে পড়বে। অভিযাত্রীরা দেখবে, খানিকটা দূরেই বিরাট এক চাঁদ আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। সে আলোর পরিমাণ কত-টুকু? বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর পূর্ণিমা রাত্রিতে চাঁদের কাছ থেকে যে আলো আমরা পাই, তার ঠিক ৮০ গুণ। অর্থাৎ, সে আলোতে চাঁদে বসে স্বচ্ছন্দেই পড়াশুনা করা যাবে। এমন কি পৃথিবীকে নতুন এক চাঁদ হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে কেউ যদি কবিতা লিখতে চান তো তাতেও বাধা নেই। লিখুন যত খুশি কবিতা। অথবা লিখুন চাঁদের রিপোর্ট। কিন্তু একটি কথা, রিপোর্ট লিখতে বসে সত্যকে এড়িয়ে যাবেন না যেন। মনে রাখবেন, চাঁদে আলোর যে রঙ দেখবেন আপনি তা' তা'র প্রকৃত রঙেরই খুব কাছাকাছি। কারণ পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল নেই সে দেশে; এবং নেই বলেই আলো একদিকে যেমন সেখানে বিক্ষিপ্ত হয় না, অপরদিকে তেমনি শোষণের কবল থেকেও রক্ষা পায়।

কিন্তু এসব কিছুই হল জল্পনা-কল্পনা; আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেবার প্রয়াস। এদিকে ট্রেনে বসবার জায়গা পাইনে, বাসে কোন রকমে একটু ঝুলে থাকতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। ওদিকে বেহায়া সেজে খবর রাখতে যাই চাঁদের টাইম-টেবল্-এর। নির্লজ্জের মত প্রশ্ন করি, চাঁদের গাড়ি কবে ছাড়বে? কবে সুরু হবে এ্যাড্ভান্স বুকিং? প্রশ্ন শুনে তারিফ করেন অনেকেই। কিন্তু কদাচিৎ কেউ কেউ বাধাও দেন। বলেন, তোমার পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি লোক এখনও দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না যে! বাদুড়ের মত কসরৎ দেখাতে দেখাতে এখনও যে ওরা ট্রামে-বাসে ঝুলে থাকে। এমন দিনে কোটি কোটি টাকার স্পেস-ভেহিকল্-এ চেপে চাঁদে যাবার সুখস্বপ্ন দেখতে তোমার লজ্জা করে না? সেখানে গিয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষের কোন্ উপকারটা করবে তুমি?

॥ দুই ॥

বাইরে বেড়াতে যাই যখন 'ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট' না হলে তখন চলে না। এদিকে চাঁদের সম্ভাব্য ট্যুরিস্ট্রাও প্যাম্প্লেট সংগ্রহে ব্যস্ত। উপগ্রহটির কোথায় কি আছে, তা' জানবার জন্যে অনেক আগে থাকতেই ওরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু এতকাল অজস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দেশের 'ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। কারণ, দেশটির অর্ধেক অংশ পৃথিবীর দৃষ্টিপথ থেকে চিরকালেব মতো অবগুণ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি সেই অবগুণ্ঠন ঘুচে গেছে। সোভিয়েত-পরিচালিত তৃতীয় 'স্পেস রকেট' এবং তারপর আকাশযাত্রী আরও কয়েকটি রকেটের সাহায্যে চাঁদের আড়াল-করা দিকটির ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। ফলে পাওয়া গেছে এমন সব নতুন খবর, চাঁদ-যাত্রীদের কাছে যেগুলোর প্রত্যেকটি মহা মূল্যবান।

অবশ্য সন্দেহ নেই যে, চাঁদ সম্বন্ধে দুরতিক্রম্য একটা কৌতূহল আদিকাল থেকেই মানব-সমাজে চালু ছিল। জ্যোৎস্না রাত্রে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনেকেই ভাবত, এক বুড়ি বসে বসে সুতো কাটে ওখানে। তারপর গ্যালিলিওর (১৫৬৪-১৬৪২) আমল থেকে প্রাচীন ধারণাগুলো বদলাতে লাগল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ ব্যাপকভাবে পরীক্ষার আয়োজন হল। দেখা গেল, বুড়ি থাকে না সে দেশে। সেখানকার গুহা-গহ্বর ও পর্বত-সমাকীর্ণ অঞ্চলগুলো জীবনধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু তবু অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, চাঁদের একটি দিক তো আমরা দেখতে পাই নে; সেখানে কি থাকে? বুড়ি না থাকুক, তার কোনো নাতি-নাত্নী অথবা জীব না থাকুক, কোনো লতাগুল্ম সেখানে থাকে কি?

গ্যালিলিওর তিরোধানের পর দেখতে দেখতে ৩০০ বছর পেরিয়ে গেল। শত-সহস্র জিজ্ঞাসু চোখ দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল। কিন্তু এসব প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না। এদিকে কৌতূহল বেড়ে চলল দিনের পর দিন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে বললেন, পৃথিবী থেকে মাত্র ৫ লক্ষ কিলো-মিটার দূরে থাকে এই চাঁদ। সৌরজগতের আর কোনো প্রতিবেশী আমাদের এত কাছে নেই। এমন কি নিকটতম গ্রহ মঙ্গল বা শুক্রও এর তুলনায় শত শত গুণ বেশি দূরে। অতএব এই ঘরের-কাছের উপগ্রহটির রহস্য ভেদ করতে না পারলে ঘরের লোকদের কাছে আর মান থাকছে না।

তাই মান রাখবার খাতিরে জেরাল কৈফিয়ৎ দিলেন অনেকেই। বল-লেন চাঁদ নিজ অক্ষরেখার ওপর একবার আবর্তন করতে যতটুকু সময় নেয়, একবার করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করতেও সময় নেয় ঠিক ততটুকু। ফলে চাঁদের একটি পিঠ পৃথিবী থেকে কোনকালেই দৃষ্টিগোচর হয় না। একবার পৃথিবী-পরিক্রমা করতে যে প্রায় ২৭ দিন সময় লাগে তার, সে সময়ের বিশেষ কোনো মুহূর্তেও অদৃশ্য অংশখানিকে সে আমাদের কাছে দৃশ্য করে না। ফলে এতকাল ধরে চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের গবেষণা শুধুমাত্র তার অর্ধেকটা অংশের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা জেনে এসেছি, চাঁদের যে ধূসর ও কষ্টলা দাগগুলো চোখে পড়ে, ওরা হল 'সাগর'।

সাগর নামেই। আসলে জলের চিহ্ন-মাত্র ওখানে নেই। ওখানকার ধূসর ও কালো দাগগুলো হল পর্বত-পরিবেষ্টিত নিচু সমতলভূমি। এ ছাড়া চাঁদের দৃশ্য-দিকটির এক বিরাট অংশ ছোট-বড় অসংখ্য পর্বতে সমাচ্ছন্ন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের মতে, মোট ৩০,০০০টি পর্বত আছে ওখানে।

পর্বতগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওরা এবড়ো-খেবড়ো নয় মোটেই; বরং বেশ মসৃণ ও গোলাকার। দেখতে ওরা যেন অনেকটা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির জ্বালা-মুখের মতো।

এ ছাড়া চাঁদে আছে বহু গিরি-সংকট। এরা শত শত মিটার প্রশস্ত ও গভীর। আজ অবধি সেখানে পাঁচ শতেরও বেশি গিরিসংকটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সন্ধানের কাজে 'রেডিও-টেলিস-কোপ'-এর সাহায্য নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর আমরাও জানতে পেরেছি চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে বহু নতুন খবর। জেনেছি, চাঁদের দেশে তাপ-বিকিরণ হয় কতটুকু; সূর্যের কাছ থেকে ধার-করা আলোকের তারতম্য-হেতু সেই বিকিরণের কতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়; এবং এর চেয়েও বড় কথা, আমরা জেনেছি, চাঁদের পৃষ্ঠে তাপাংক কখন কতদূর ওঠে।

চাঁদের তাপ-বিকিরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরণ সুরু হয় না তার; সুরু হয় অপেক্ষাকৃত গভীর কয়েকটি স্তর থেকে।

অবশ্য চাঁদের সম্ভাব্য অভিযাত্রীরা এই সব খবর পেয়ে মোটেই উল্লসিত নন। ওঁরা বলছেন, এই খবরগুলোকে চাঁদের টুরিস্ট্ প্যাম্‌ফ্লেট-এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে জুড়ে দিও তোমরা। আর আমাদের দিও দ্বিতীয় খণ্ডের খবর; চাঁদের অপর পিঠে কি আছে, সম্ভব হলে তা' আমাদের জানিয়ে দিও। কারণ, উপগ্রহটিতে ভ্রমণের সময় সে খবরগুলোই বেশি কাজে লাগবে।

বিজ্ঞানীরা এবার উঠে-পড়ে লাগলেন। কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালেন চাঁদের আড়াল-করা পিঠের ছবি তোলা হবে বলে। ছবি উঠলও। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চাঁদ-বরাবর উৎক্ষিপ্ত হল স্পেস-রকেট। 'ইণ্টারপ্ল্যানেটারী স্টেশান' স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চাঁদের অবগুণ্ঠিত দিকটির ছবি তুলল। এই সব ছবি বিশ্লেষণ করে আমাদের চিরপরিচিত উপগ্রহটির উদ্ভব, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা গেল অনেক নতুন তথ্য।

এর আগে চাঁদের আড়াল-করা দিকটি সম্বন্ধে বহু আজগুবি কল্পনা অনেকের মনেই উঁকি দিত। অনেকেই বলতেন, জল আছে সেখানে; বায়ু আছে; এবং এমন কি জীবনও আছে। অনেকে আবার বলতেন, চাঁদ দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো। পৃথিবীর বিপরীত দিকে তার যে অংশটি আছে, তা' সামনের দিকে কিছুটা সম্প্রসারিত।

স্বয়ংক্রিয় 'স্পেস-রকেট' ও 'ইণ্টার-প্ল্যানেটারী স্টেশান' থেকে তোলা ছবি-গুলোর সাহায্যে এইসব ভুল ধারণা দূর হল। জানা গেল, চাঁদের আড়াল-করা দিকটি আকারে-প্রকারে অনেকটা দৃশ্য দিকটিরই অনুরূপ। অভাবনীয় কিছু নেই সেখানে। অত্যাশ্চর্য এমন কিছু নেই, যা' আজগুবি সিদ্ধান্তকারদের উৎসাহিত করতে পারে। তবে অদৃশ্য দিকটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, দৃশ্য দিকটির তুলনায় সেখানে গুহা-গহ্বরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর একটিমাত্র যে পর্বতশ্রেণী সেখানে রয়েছে, দৈর্ঘ্যে তা' ২,০০০ কিলোমিটার। আর সেখানকার সবচেয়ে বড় গহ্বরটির ব্যাস হল ৩০০ কিলো-মিটার। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই গহ্বরটির নাম দিয়েছেন 'মস্কো সী'। এ ছাড়া সেখানকার অন্যান্য গহ্বরগুলোর অধিকাংশেরই নামকরণ করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নামে। মনীষীদের মধ্যে মেণ্ডেলিভ, টিসিয়লভস্কি ও জোলিও-কুরীর মতো বিজ্ঞানীরা যেমন রয়েছেন, তেমনি আবার রয়েছেন জুলে-ভার্নের মতো রহস্য-কাহিনীকার।

তবে মনীষীদের কথা থাক এখন। এখন বরং ফিরে আসা যাক চাঁদের অদৃশ্য দিকের ছবিগুলোর প্রসঙ্গে। ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে সামান্য কম-বেশি প্রতিফলন-শক্তিবিশিষ্ট কতকগুলো অঞ্চলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আর দেখা গেল, সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে চাঁদের যে দিকটি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার ছবি তোলা সম্ভব হয় নি। কারণ, ছায়ার অস্তিত্ব সে রাজ্যে নেই বললেই চলে। তাই এখন চেষ্টা চলছে অনুকূল আলোক-ব্যবস্থার মধ্যে আরও ভাল ছবি তোলবার।

সন্দেহ নেই, এ চেষ্টা ভবিষ্যতে আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে; এবং তখন চাঁদের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে যেমন, তার গহ্বরগুলোর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধেও তেমনি অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

চাঁদের গহ্বর নিয়ে বিচিত্র সব ধারণা কিছুদিন আগেও চালু ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতেন, বড় বড় সব উল্কাখণ্ডের সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের ফলেই ওগুলো সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আজকের বিজ্ঞানীদের অনেকেই মেনে নিতে নারাজ। কারণ, উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যদি ঐ গহ্বরগুলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে বলতে হয়, উল্কারা নিশ্চয়ই বিভিন্ন কোণ থেকে এসে চাঁদকে আঘাত করেছে; এবং তবে আঘাতের ফলে সৃষ্ট গহ্বরগুলোও উপবৃত্তাকার হ'ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, প্রায় সবগুলো গহ্বরই বৃত্তাকার। দ্বিতীয়ত এমন কথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, অতিকায় সব উল্কা-পিণ্ড চাঁদের পিঠে এসে অনাদিকাল ধরে আছড়ে পড়েছে। অপরদিকে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, চাঁদের একটি গহ্বর থেকে উষ্ণ বাষ্প বেরিয়ে আসছে। এ থেকে অনেকেই অনুমান করছেন, আগ্নেয়গিরি-সঞ্জাত উপাদান থেকেই চাঁদের সৃষ্টি। এ ছাড়া পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃত্তাকার গহ্বরের সৃষ্টি এবং উষ্ণ বাষ্পের নিঃসরণ শুধুমাত্র অবক্ষয়মান কিছু খনিজ পদার্থের অবস্থিতির ফলেই সম্ভব হতে পারে।

তবে এখনও অবধি এ সম্বন্ধে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীরা পৌঁছন নি। সিদ্ধান্ত যেদিন সর্ববাদীসম্মত হবে, সেদিন হয়তো চাঁদের আড়াল-করা দিকটি সম্বন্ধে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে। গ্রহান্তরের সম্ভাব্য অভিযাত্রীরাও চাঁদের দ্বিতীয় খণ্ড—টুরিস্ট্ প্যাম্‌ফ্লেট্‌টির প্রথম সংস্করণ বগলদাবা করে আনন্দে উল্লাসে ও বিস্ময়ে-রোমাঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত হবার সুযোগ লাভ করবেন।

"দক্ষযজ্ঞ"

স্টেশন ঘরটির মধ্যে আমরা এক নিদারুণ পরিস্থিতিতে পড়েছি। আমরা চারজন পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় পুলিশের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। তারা আদেশ করবে আর আমাদের তা পালন করতে হবে—শরীর তল্লাসী করতে চাইলে বাধা দেবার উপায় নেই। মুহূর্তগুলি যে কিভাবে কাটছিল—কতখানি অনিশ্চয়তা, ভয় ও আসন্ন সংঘর্ষের চিন্তা প্রতি মুহূর্তে আমাকে বিচলিত করছিল তা ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার মনে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তখন ধরে নেওয়া যায় যে, মাখন, আনন্দ ও গণেশের মনও অনুরূপ চিন্তায় বিচলিত হয়েছে। এখন মরবার ভয়ের থেকেও বহু গুণে বেশি আশঙ্কা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বন্দী হওয়ার। আমরা চারজন আটটি গুলীভরা রিভলবার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যদি বিনা সংঘর্ষে বন্দী হই, তবে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের এই কলঙ্ক স্বাধীনতা-ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকবে এবং ভারতের বিপ্লবীসমাজের কাছে মুখ দেখাবার আমাদের আর উপায় থাকবে না। এর চাইতে মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু এমনই পরিস্থিতি যে মরার হাজার ইচ্ছা থাকলেও মরতে হয়ত পারব না—তার আগেই ধরা পড়ে যাব। ছোট্ট একটি ঘরে প্রায় বারোজন কনস্টেবল, ছোট ও বড় দারোগা, রেলের সহকারী স্টেশন মাস্টার, দু'জন টিকিট কালেক্টার ও একজন সিগনেলার আমাদের ঘিরে রয়েছে। তারা আমাদের খুব কাছে, প্রায় গায়ে লেগে দাঁড়িয়েছিল। সমনে গুর্খা সৈন্যের ট্রেন। আমাদের ঘরের মধ্যে manoevre করবার একটুও জায়গা নেই। প্রত্যেকটি সিপাইয়ের হাতে বেটন ও কোমরে রেয়নেট ঝুলছে। একটু সন্দেহ হলেই হয়ত বেটনের বাড়ি দেবে না হয় জাপটে ধরবে। এই অবস্থায় কি করে পিস্তল বার করে গুলী করব? অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যদি দু'-একটি ফায়ার করি তবে বেটনের আঘাতে যে অজ্ঞান হয়ে পড়বো না বা বন্দী হবো না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এইরূপ ভয়ে আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম।

আর সময় নেই। দারোগাবাবু গণেশকে বিছানাটা খুলে দেখাতে বলল। বিছানা খোলা হল। গরীবের সাধারণ বিছানায় কি আর সন্দেহজনক জিনিস থাকতে পারে! কোন আপত্তিকর জিনিস পাওয়া গেল না। গণেশ দারোগাবাবুকে অনুরোধ জানালো যে শারীরিক প্রয়োজনে সে একটু বাইরে যেতে চায়। সহৃদয় দারোগা হাবিলদারকে নির্দেশ দিল গণেশকে বাইরে নিয়ে যেতে। হাবিলদার ও দু'জন সিপাই সঙ্গে করে গণেশ বাইরে গেল। এখন আমরা তিনজন ঘরের ভেতর তাদের সামনে। কই বাবা, জবানবন্দী দিচ্ছে না কেন?' এতক্ষণ এসেছি Statement নেবার নাম গন্ধও নেই। বিছানা সার্চ করা হয়েছে, এখন Statement নিলেই তো বেঁচে যাই। কিন্তু Man proposes, God disposes.—আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হল না।

দারোগাবাবু রাত্রে আর কতক্ষণ জেগে বসে থাকবেন? ডিউটি শেষ করতে আর চক্ষুলজ্জা কেন? খোলাখুলিভাবে সার্চ করবার প্রস্তাবটি করতে দারোগা-বাবুর যেন একটু ইতস্তত ভাব—একটু সঙ্কোচ ও ভদ্রতা তাকে যেন বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু ডিউটি যতই কঠিন বা অপ্রিয় হোক না কেন তা পালন করতেই হবে; সুতরাং শেষ পর্যন্ত দারোগাবাবু চক্ষুলজ্জা ছেড়ে বলল—"দেখুন, তল্লাসী করা আমাদের নিয়ম। শিষ্টতা বিরুদ্ধ হলেও কর্তব্য আমাদের করতেই হবে। ক্ষমা করবেন—আপনারা এক-একজন আসুন, আমরা তল্লাসী করব।" প্রথমে মাখনকে ডাকা হল। মাখন কি করবে বুঝতে পরছে না। সে ছিল দরজার পাশে, তারপর আনন্দ এবং সর্বশেষে ঘরের ভেতরে প্রায় আলমারী ঘেঁষে ছিলাম আমি। আমার সামনে ও পেছনে দুটি কনস্টেবল। মাখন একটু এগিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। একজন সিপাই ডিউটি করতে এল, অর্থাৎ শরীর সার্চ করবে। মাখনের গায়ে হাত দিতে যাবে, এই সময় উপস্থিত পুলিশদের মনে হল হয়ত বা কোন লুকোনো অস্ত্র আবিষ্কৃত হবে—সবার চোখ সেই মুহূর্তে মাখনের জামার নিচে কি আছে দেখতে উৎসুক! ম্যাজিসিয়ানরা ঠিক এইরূপ সাইকোলজিক্যাল মুহূর্ত বেছে নিয়ে দর্শকবৃন্দকে বোকা বানায়। অনেক আগেই আমার ম্যাজিক দেখাবার কথা লিখেছি—চট্টগ্রামের প্রধান Public Stage-এও আমি ম্যাজিক দেখিয়েছি এবং দর্শকবৃন্দের অন্যমনস্কতার সাইকোলজিক্যাল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তাঁদের হতবুদ্ধি করেছি। বিপ্লবী ম্যাজিসিয়ান যে সুযোগ এতক্ষণ ধরে খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল—সব পুলিশেরই চোখ মাখনের দিকে, জামার নিচ থেকে যদি রিভলবার বার হয়!

আর হয়ত এই সুযোগ পাব না। নিমেষে আমার কোমর থেকে ঝটকা টানে দু' হাতে পিস্তল ও রিভলবার বার করলাম। কারও কিছু বোঝবার আগেই প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ সেরে নিলাম—আমার দুই মুঠিতে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নিবর্ষণ করতে তৈরি। পিস্তল বার করবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে দাঁড়ানো সিপাইয়ের জঙ্ঘা লক্ষ্য করে গুলী করলাম, সে পড়ে গেল। আমি এক লাফে বড় টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে ওঠবার সময় আর একজন সিপাইয়ের পা লক্ষ্য করে গুলী করি। টেবিলের ওপর থেকে গর্জন করে বললাম—"ভাগো, জান বাঁচাও!" অবশ্য আমার হুকুমের পূর্বেই "জান

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল!

সাধনা বিউটি ক্রীম

মেয়েদের ত্বক-সৌন্দর্যের গোপন রহস্য

প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপারহার্য

কুসুম-কোমল পাপড়ি-পেলব যৌবন-সুলভ লাবণ্যময় সজীব ও সুন্দর ত্বক—এই তো সাধনা বিউটি ক্রীম-এর সবচেয়ে বড়ো অবদান।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
এম এ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি এস (লণ্ডন) এম সি এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য।

S-SB-2/57

বাঁচাবার" জন্য যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। এক সেকেণ্ড শেষ হয়ে দু-সেকেণ্ড শেষ হবারও সময় পায় নি, তার আগেই ঘর একেবারে শূন্য। এত দ্রুত ও চকিতে ঘটনা ঘটে গেল যে পুলিশ বা মিলিটারী কিছু বুঝতেই পারলো না। কাশিতে প্রায় বক্কাকার দেহ, শিথিল মাংসপেশী, বাঁধনহীন হাত-পা যেন চলতে পারে না—এমন একজন নিরীহ যাত্রী হঠাৎ রিভলবার বার করে অতজন পুলিশকে আক্রমণ করবে, স্প্রীং-এর মত টেবিলে লাফিয়ে উঠে গুলী চালাবে, তা বেচারা পুলিশেরা ভাববে কি করে?

এক বা দেড় সেকেণ্ডে ঘর একেবারে খালি হয়ে গেল। সবার আগে ছিল মাখন, তার পেছনে ছিল আনন্দ। আমি টেবিলের ওপর থেকে দেখলাম আনন্দ দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরোচ্ছে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমার গতি যতই দ্রুত হোক না কেন, সংঘর্ষের সময় আমার মাথা স্থির ছিল। তাই ঘরের দরজা অতিক্রম করবার সময় না হেঁটে এক লাফে বাইরে আসি। কারণ, দরজার পাশে বেটন নিয়ে পুলিশ যদি অপেক্ষা করে তাহলে সে যেন আমাকে আঘাত করতে না পারে। বাইরে এসে আমার বাঁ দিকে প্ল্যাটফরমের ওপর পাঁচ ছয় হাত দূরে দারোগাবাবুকে দেখতে পেলাম। তার হাতে পিস্তল আছে কি না বা সে প্রতি-আক্রমণের কোন আয়োজন করছে কিনা তা দেখবার সময় আমার ছিল না। কাল-বিলম্ব না করে, তাকে কোন initiative নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে, পিস্তলটি ঘুরিয়ে তার জঙ্ঘা লক্ষ্য করে একটি গুলী ছুঁড়ি। সে লুটিয়ে পড়ল।

আমরা চারজন পরে যখন কলকাতায় একত্র হই, তখন কে কয় রাউণ্ড ফায়ার করেছিলাম তার হিসেব নেওয়া হয়েছিল। আনন্দ বলেছিল সে ঘরের বাইরে এসে ওপরের দিকে একটিমাত্র ফাঁকা আওয়াজ করে। মাখন জানিয়েছিল পুলিশকে ভয় দেখাবার জন্য আলমারীর পাশে রিভলবারের মুখ মেঝের দিকে রেখে সে একটি ফায়ার করেছিল। আমার হাতে পিস্তল ও আর একটি রিভলবার ছিল। পিস্তলের গুলী দারোগাবাবুর পেটে লাগে। আমার প্রথম গুলী পেছনের সিপাই ও দ্বিতীয় গুলী সামনের প্রহরীকে আহত করেছে।

মামলার জাজমেণ্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"The inspector Fazlul Bast says that after the four suspects had been taken inside the room, he sat down on a chair by the doorway and told the S. I. to search their persons. Immediately before that the eldest looking of the four said he wanted to go out to make water, so before searching him he was sent outside escorted by the Havilder and two Constables. Then the S. I. began to search the other three. He was about to go over the person of one of them when one of the other two pulled out a revolver from under his shirt and fired in the direction of the Inspector. This was followed immediately by a second shot and he jumped through the doorway and ran and hide in the first class waiting-room. When he returned after an interval, according to him of two or three minutes—he found the sub-inspector, and the two constables Manindra Pal and Yakub Ali had been shot.... The S. I. goes on to say that at the same time one of the three suspects started to rush out of the room and as he ran past him, he (the S. I.) jumped upen him whereupon the fugitive shot him in the side and he fell down on the floor unconscious and did not see what happened after that...." (Judgment of Chittagong Armoury Raid case No. 1. Page—76).

(ইন্সপেক্টার ফজলুল বাসেত তাঁর জবানবন্দীতে বলছেন চারজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে কক্ষের ভেতরে আনবার পর তিনি দরজা সংলগ্ন একটি চেয়ারে বসলেন এবং তাদের শরীর তল্লাসী করবার আদেশ দিলেন। তল্লাসী সুরু করবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঐ চারজনের মধ্যে যাকে সব চাইতে বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল সে শারীরিক প্রয়োজনে বাইরে যেতে চাইল। সার্চ করবার আগেই তাকে হাবিলদার ও দু'জন সিপাই বাইরে নিয়ে গেল। তারপর S. I. তিনজনকে সার্চ করতে গেলো। যখন S. I. তাদের মধ্যে একজনের গায়ে সার্চ করবার উদ্দেশ্যে হাত দিতে যাচ্ছে তখন বাকি দু'জনের একজন তার সার্টের নিচ থেকে রিভলভার বার করে প্রথমে ইন্সপেক্টারকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ফায়ার হয় এবং সে লাফিয়ে দরজা পেরিয়ে দৌড়ে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে লুকিয়ে থাকে। (জজ সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করে লিখছেন) অবশ্য ইন্স-পেক্টারের কথা অনুযায়ী, সে নাকি দু-তিন মিনিট পরে এসে দেখে যে S. I. এবং দু'জন কনস্টেবল—মণীন্দ্র পাল ও ইয়াকুব আলি, গুলীবিদ্ধ হয়েছে। .....(সাব-ইন্সপেক্টারের উক্তি থেকে জজ লিখছেন) S. I. বলে গেল তিনজনের মধ্যে যখন একজন তার পাশ দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল তখন সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেই সময় আততায়ী তাকে পাশে গুলী করে। এই গুলীতে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—তারপর আর কি ঘটেছে সে বলতে পারে না.....)।

ফেণীতে অত পুলিশ, মিলিটারী ও রেলকর্মচারীদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের বেড়াজাল থেকে আমাদের উধাও হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ইন্সপেক্টার ও ছোট দারোগাবাবুর খুব অখ্যাতি ও দুর্নাম হয়। তাই ইন্সপেক্টার, তার পালাবার কারণটি যে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা' বোঝাবার জন্য জবানবন্দীতে বলে যে তাকে লক্ষ্য করেই প্রথম গুলী ছোড়া হয় ও পরমুহূর্তেই আবার টোটা ফাটে। ছোট দারোগাবাবুও তার অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য সাফাই দিতে গিয়ে নিজের বীরত্বের কথা বলে—একবার একজনের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল কিন্তু গুলীবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বার পর আর কিছু বলতে পারে না।

এখন একটি রহস্য উদ্ঘাটন করি। ইন্সপেক্টার ফজলুল বাসেত, এস-আই, যতীন্দ্রমোহন রায়, মণীন্দ্র পাল ও ইয়াকুব —এরা আমাকে কেউ সনাক্ত করে নি। খাকী পোষাকধারী বৃটিশ সরকারের সিপাই আমাদের শত্রু—তারা কোন্ জাতের তা' আমাদের বিচার্য ছিল না। ইন্সপেক্টার ও অন্য সিপাইরা বিশ্বাস করেছিল যে আমরা তাদের কাউকে মেরে ফেলবার জন্য গুলী করি নি—বাধ্য হয়ে আহত করেছি মাত্র এবং সেখানে আমরা হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য করি নি। সবচেয়ে বড় রহস্য হল যতীন্দ্রমোহন রায় আমাদের সাথী হারানের (সৌরীন্দ্রমোহন দত্তচৌধুরী) আপন মামা। হারান রেল লাইন ধ্বংসকার্যে লিপ্ত ছিল। মামলার সময় সে আমাদের সঙ্গে যখন একই কাঠগড়ায় তখন তার মামাও সাক্ষীর বাক্সে দাঁড়িয়ে জবানবন্দি দিচ্ছিলেন।

মণীন্দ্র ও ইয়াকুবকে আহত করে আমি পরে আনন্দকে অনুসরণ করি। কিন্তু বাইরে প্ল্যাটফরমের ওপর বাঁ দিকে ঘুরে

দারোগাবাবুকে দেখে গুলী ছুঁড়তে হয়—এই যে একটু অন্যদিকে লক্ষ্য দিতে হয়েছে, এরই মধ্যে অন্ধকারে আমি আনন্দকে হারিয়ে ফেলি। দারোগাবাবুকে গুলী করেই আমি ফিরে আনন্দ ভেবে একজনের পেছনে ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল সে আনন্দ নয়।

আনন্দ ও মাখনকে হারিয়ে ফেললাম। পরে কলকাতায় যখন তাদের সঙ্গে আমি একত্র হয়েছি তখন মাখনের কথা শুনে আমি তো বোকা হয়ে গেলাম। আমি যখন প্রথম ফায়ার করি সে ছিল তখন বড় খোলা দরজার কাছে, টেবিলের গা ঘেঁষে। মাখন ও আমার মধ্যে ছিল আনন্দ। তবু খুব অবাক মনে হচ্ছে আমার গুলীর শব্দ শুনে মাখন তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে না গিয়ে ঘরের ভেতর চলে এল এবং আলমারীর আড়ালে দাঁড়াল। আমার পেছনে যে সিপাই দাঁড়ানো ছিল তাকেই আমায় প্রথমে গুলী করতে হয়েছে। গুলী ছুঁড়বার সময় যেটুকু সময় আমার দৃষ্টি পেছনের দিকে গেছে তারই মধ্যে তড়িদ্গতিতে মাখন একেবারে আলমারীর পেছনে চলে গেছে। আমি যখন টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম তখন ঘর একেবারে শূন্য মনে হয়েছিল. কেবল ইয়াকুব ও মণীন্দ্র মেঝের ওপর পড়েছিল। আমার ঠিক আগে আনন্দ বার হল—ঘরে আর কেউ ছিল বলে ভাবতে পারি নি।

মাখনকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে সে বাইরে না পালিয়ে পুলিশ বেষ্টনীতে পড়বার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কেন ঘরের ভেতর ঢুকলো, সে বলল—"পেছন থেকে আপনার গুলীর আওয়াজ শুনে আমার মনে হয়েছে হয়ত আমরা cross fire করে নিজেদের মধ্যেই কেউ গুলীবিদ্ধ হতে পারি। সেই জন্য আপনার পেছনে পজিসন নেওয়ার জন্যই ভেতরের দিকে বিদ্যুদ্গতিতে ছুটে যাই।" মাখন কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল করেছিল। এই ভুলের সুযোগে একজন সিপাই তাকে আক্রমণ করে: এই সিপাইটিও আলমারীর আড়ালে ছিল। আঘাত পেয়ে মাখনের একটি রিভলভার হাত থেকে পড়ে যায়। মাথায় বেটনের প্রচণ্ড দুই আঘাত মাখনকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়। এই দুর্ঘটনা আমরা কেউ তখন জানতে পারি নি। খুবই আশ্চর্য মনে হয় যে সিপাইটি মাখনের রিভলভার কুড়িয়ে পেয়েও তার দিকে গুলী ছুঁড়লো না কেন? আবার এটাও ভাবতে শরীর শিউরে ওঠে, মাখন ঐ প্রচণ্ড আঘাতেও কি করে স্থির ছিল—কি করে তবু পালাতে সমর্থ হল! খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে সেই রাতের অন্ধকারেও মাখন প্ল্যাটফরমের ওপর আনন্দকে খুঁজে পেয়েছিল।

এতক্ষণ আমাদের তিনজনের কথা বললাম। গণেশের কি হল? তল্লাসী শুরু করবার আগে একজন হাবিলদার ও দু'জন কনস্টেবল পাহারা দিয়ে গণেশকে প্ল্যাটফরমের কম্পাউণ্ডে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমাদের সার্চ আরম্ভ হল এবং গুলী চলল। স্বভাবতই গুলীর শব্দ গণেশ ও পুলিশেরা শুনতে পায়। খোলা মাঠে গণেশের দুটি রিভলভারের সামনে বেচারা হাবিলদার ও সিপাই দু'জন নিজেদের অত্যন্ত নিঃসহায় মনে করে। গুলীর আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ দু' হাতে দুটি রিভলভার তুলে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে তাদের আদেশ দেয়—"হাত উঠাও! About turn ! ভাগো!" তারাও আদেশ অমান্য করল না—মুহূর্তে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিল। গণেশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পুলিশের মুখের বিবরণটা জাজমেণ্টের পাতা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Constable Jogendra Roy says that the eldest looking of the four suspects asked to be allowed to go out to make water and was taken out by the Havilder Heman Singh, constable Torab Ali and himself. They took him to the Railway track east of the station building and refusing his request to take him outside the station compound told him to micturate there. As he sat down, there was a report from the direction of the Asst. Station Master's room followed by another report and he got up and made off towards the north. The Havilder and constables pursued him and he turned and fired at them and then ran on. Jogendra Roy got up and ran after him again and the fugitive halted near the goods godown and fired at him again. Jogendra then looked round to see if the Havilder and Torab Ali were following him, but finding that they had given up the pursuit, he retreated in fear to the station building. There he found the Sub-Inspector and one con-

উপন্যাস

ডাঃ শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

গঙ্গার জলে চাঁদের আলো ৪·২৫

ব্যভিচারি সুপ্রিয়র স্ত্রী, ডাঃ ডিমি, ডাঃ সিংগল-এর সাথে কুমারী ইন্দ্রজিত কাউরের অবাধ মেলামেশা, সুপ্রিয়র অন্তর্ধান যেন সজীবভাবে ফুটে উঠেছে।

সতীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

লগ্ন গোধূলি ২·৭৫

গ্রাম্য পরিবেশে উদ্ভিন্নযৌবনা রেণু, বিনয়কাননের বিচিত্র ঘটনারাজী, সরোজ, সুধা, নারাণ চাটুজ্যের চরিত্রগুলি বাস্তবানুরাগী।

সবিতা চক্রবর্তী-র

তিন তরঙ্গ ৩·৫০

বিনোদ, রীতা মল্লিক, সনৎ, রমেন, বাসন্তি এরা যেন আমাদেরই সমাজের এক একটি প্রতিচ্ছবি।

জগন্নাথ সাহা-র

আইনের বিচার ২·০০

কোর্ট কাছারির বিচিত্র বর্ণবহুল ঘটনারাজীর এক অবিশ্বাস্য বাস্তব আলেখ্য।

শচীন্দ্রলাল রায়-এর

কমল বন ২·৫০

পাঁচটী নিটোল গল্পের সংকলন সুন্দর প্রচ্ছদপট।

নাটক

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ দাস-এর

সেতু বন্ধন ১·৫০

আটটি পুরুষ চরিত্র, দুইটি নারী চরিত্র। দুইটি মাত্র সেট। হাসির, সামাজিক।

রূপান্তর ১·৫০

দুটি মাত্র সেট। বারটি পুরুষ চরিত্র। দুটি নারী চরিত্র। হাসির বৈজ্ঞানিক।

অর্জুন কুমার-এর

দাদার বিয়ে ১·০০

একাঙ্ক নাটক। একটি মাত্র সেট। দশটি পুরুষ চরিত্র। হাসির। সামাজিক।

আব্দুল কাদের, এম· এ·-র

নকল পত্নী ২·৫০

আটটি পুরুষ চরিত্র। তিনটি স্ত্রী চরিত্র। সামাজিক।

ডি লাইট বুক কোঃ

১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

(V. P.-তে দ্রুত সরবরাহ করা হয়। সাধারণ ক্রেতারা ১৫% কমিশন পাবেন।)

stable Manindra Pal and Yakub Ali lying wounded. Monindra had a revolver in his hand which he said he had wrested from one of the suspects."

(কনস্টেবল যোগেন্দ্র রায় বলেছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন শারীরিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাকে কনস্টেবল তোরাব আলি, হাবিলদার ও সে বাইরে নিয়ে যায়। স্টেশনের পূর্ব দিকে রেল লাইনের ওপর তাকে নিয়ে যায়। সে প্ল্যাটফরম কম্পাউণ্ডের বাইরে যাবার অনুরোধ করলে প্রহরীরা তা' অস্বীকার করে। যেমনি সে বসেছে, তখনই তারা সহকারী স্টেশন মাস্টারের কক্ষ থেকে একটি গুলীর আওয়াজ শুনতে পায় এবং পরমুহূর্তেই আরো একটি গুলীর শব্দ কানে আসে। সেই সুযোগে সে উঠেই উত্তর দিকে ছুট দেয়। হাবিলদার ও কনস্টেবলেরা তার পেছু নিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে আবার দৌড়তে লাগলো। যোগেন্দ্র (বোধ হয় গুলী থেকে বাঁচতে শুয়ে পড়েছিল) আবার উঠে দাঁড়ায় এবং তাকে অনুসরণ করে। পলাতক মালগুদামের কাছে দাঁড়িয়ে আবার যোগেন্দ্রকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। এই সময় যোগেন্দ্র চারিদিক তাকিয়ে দেখে যে তোরাব আলি বা হাবিলদার কেউই আর পলাতককে অনুসরণ করছে না। ভয় পেয়ে সেও তখন স্টেশনে ফিরে এল। সেখানে সে দারোগাবাবু, ইয়াকুব ও মণীন্দ্রকে আহত অবস্থায় শায়িত দেখে। মণীন্দ্রের হাতে একটি রিভলভার দেখতে পায়—মণীন্দ্র তাকে বলেছে সে রিভলভারটি আততায়ীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে)।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কিভাবে তারা সবাই, অর্থাৎ পুলিশ কর্মচারীরা, হতভম্ব হয়ে যে যেখানে পেরেছে ছত্রভঙ্গ হয়ে ভয়ে পালিয়েছে তা' তাদের নিজ মুখেই বলেছে। সহকারী স্টেশন মাস্টারের কক্ষে যারা ছিল তাদের দুরবস্থার কথা ইন্সপেক্টারের উক্তি থেকেই জানা যাচ্ছে। আর গণেশকে পাহারা দিয়ে যে তিনজন বাইরে এনেছিল তাদের শোচনীয় অবস্থার কথাও যোগেন্দ্র রায়ের বর্ণনায় পেয়েছি। মোট কথা বোঝা গেল ভয়ে তারা চারিদিকে ছুটে পালিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের কর্তব্যপরায়ণতা বোঝাবার জন্য ইন্সপেক্টার বলছে, 'আমাকেই প্রথম গুলী করে তাই পালাতে হয়', পুলিশের ছোটবাবু বলতে চাইলো—সে আমার ভয়ে কক্ষ ছেড়ে পালিয়ে আসে নি, আততায়ীদের পালাবার সময় প্ল্যাটফরমের ওপর একজনকে জাপটে ধরে এবং তারই গুলীতে ধরাশায়ী হয়েছে; যোগেন্দ্র রায়ও কর্তব্যে অটল ছিল—সেও হাবিলদার এবং তোরাব আলির সঙ্গে পলাতককে ধরবার জন্য রিভলভারের গুলী উপেক্ষা করে পেছনে ছুটে যায়। সহকারী স্টেশনমাস্টারের কক্ষটির দরজা বাইরে থেকে অবরোধ করে যে সিপাইটি পাহারা দিচ্ছিল, তার কথা এতক্ষণ বলা হয় নি। তার নাকের ডগা দিয়ে তিনজন পালিয়ে গেল আর সে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল—কর্তব্য পালনে অক্ষম হল, তা' কি করে হতে পারে? সেও যে সাধ্যমত কর্তব্য করেছে—সাক্ষী দেবার সময় তারই বর্ণনা দেয় কনস্টেবল সীতারাম তেওয়ারী। জজ সাহেব তার উক্তি থেকে লিখছেন—

"Constable Sitaram Tewari says that he and constable Jogendra Roy remained on the verandah while the four suspects were taken inside the room. Presently one of them was taken away to mictu-ate by the havilder and constable Torab Ali and Jogendra Roy and the firing started. The three suspects rushed out of the room and made off towards the south. He ran after them for some distance but tripped over a signal wire and fell. The fugitives fired two shots at him so he lay there for sometime not daring to get up. Then he crawled back to the station where he found that the Sub-Asst. Surgeon and someother police officers and constables had arrived . . ." (Judgment Chittagong Armoury Raid Case No. I).

কনস্টেবল সীতারাম তেওয়ারী তার বয়ানে বলেছে, চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যখন কক্ষের ভেতর নিয়ে গেল, তখন সে ও যোগেন্দ্র রায় (দরজার বাইরে) বারান্দার ওপর দাঁড়ানো ছিল। সেই চারজনের মধ্যে একজনকে হাবিলদার, যোগেন্দ্র ও তোরাব আলি বাইরে নিয়ে গেল। সেই সময় গুলী চালান শুরু হয়। অন্য তিনজন আততায়ী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। কিছুদূর পর্যন্ত সে তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করল, কিন্তু সিগন্যালের তারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। পলাতকেরা তার দিকে দু'বার গুলী ছোঁড়ে, তাতে সে ভয়ে কিছু সময়ের জন্য সেখানেই শুয়ে রইল। তারপর যখন সে বুকে গড়িয়ে গড়িয়ে স্টেশনে আসে তখন দেখতে পায় ডাক্তার, অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও অনেক কনস্টেবল সেখানে এসে পৌঁছেছে।

রাতের অন্ধকারে গুলীর আওয়াজ চেঁচামেচি, চারিদিকে ছুটোছুটি—পুলিশদের প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা, রেল কর্মচারীদের মৃত্যুভয়ে হরিনাম জপ প্রভৃতি সবকিছু মিলে দু'-তিন সেকেণ্ডেই একটা যেন দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। গুর্খা সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল, তারা কিছু অনুমান করবার আগেই ড্রামাটি শেষ হয়ে গেল। তিনজন পুলিশকে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় ধরাশায়ী দেখে গুর্খা সৈন্যেরা হয়ত ভেবেছিল তাদের প্রতি মায়ের অশেষ কৃপা যে তাদের অংশ গ্রহণের পূর্বেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পুলিশেরা যেমন ছত্রভঙ্গ হয়েছিল গোলমালের মধ্যে আমাদেরও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। গণেশ একদিকে গেল একেবারে একা। আমিও দলছাড়া হয়ে পড়লাম। মাখন ও আনন্দ কোথায় গেল, গণেশও বা কোথায়—তখন কিছু জানবার উপায় ছিল না। তবে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে গণেশকে তারা কোনমতেই বন্দী করতে পারবে না। আমরাও কেউ এই যাত্রায় ধরা পড়লাম না।

আনন্দ প্রথমে একা প্ল্যাটফরমের পূর্ব দিকে ছুটে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই সে বুঝতে পারে যে তার পেছনে আমি আর নেই। প্ল্যাটফরমে একেবারে একা দেখে তার নিজেকে খুবই অসহায় মনে হয়েছে। মাখন তো তার আগে দরজার মুখেই ছিল, তবে সে গেল কোথায়? অনন্তদাও তো তার পেছনেই ছিল, তাকেই অনুসরণ করে আসছিল, তবে সেও বা কোথায় হারিয়ে গেল? কি করবে সে ঠিক করতে পারছিল না—কোথায় যাবে, কোনদিকে গেলে ভাল হবে, কারো দেখা কি পাওয়া যাবে না? এমন সময়, আশা-নিরাশার সন্ধিক্ষণে আনন্দ দেখতে পেল মাখন ছুটে তার দিকেই আসছে। মাখন এতক্ষণ ছিল কোথায়? এতক্ষণ আনন্দ ভেবেছে যে সেই সবার আগে বেরিয়ে উধাও হয়েছে। মাখনকে পেছন থেকে আসতে দেখে সে একটু আশ্চর্য হ'ল। কাছে যখন এল আনন্দ তাকে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। মাখনের সমস্ত জামা-কাপড় রক্তে লাল হয়ে গেছে। আনন্দ জিজ্ঞেস করল—"এ কি? কি করে হ'ল? কে আঘাত করেছে? মাথা ফেটে চৌচির হয়েছে? আর কোথায় লেগেছে?" মাখন শুধু বলল—"মাথায়।" তার যেন আর কিছু বলবার মত শক্তি ছিল না—অবসন্ন দেহ যেন তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে! সেই অবস্থায় এতক্ষণ এত দূরে কি করে ছুটে এসেছে তা' সে নিজেও জানে না। আনন্দ তাকে সর্বশক্তি দিয়ে

ধরে ফেল্‌ল—মাটিতে পড়তে দিল না। সামান্য আঘাতে যদি মাথার চামড়াও ফেটে যায় তাতেও ভয়ানক রক্তক্ষরণ হয়। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা ফুটবল খেলার মাঠে হয়ত অনেকেরই আছে। মাখনের যদিও মাথার খুলি ফাটে নি তবু বেটনের দু'টি আঘাতই যে সাংঘাতিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাওয়ার পরও মাখন বহু মাস পর্যন্ত মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেছে।

মাখন তার শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে যেন আর চলতে পারছিল না। স্টেশনের পুব দিকে প্ল্যাটফরমের দূরত্বও প্রায় দু'শ' গজ। তখনও তারা দু'জন অন্ধকারে প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে। বেশিক্ষণ সেভাবে সেখানে থাকাও চলে না—উচিতও হবে না। আনন্দ মাখনকে সাহস দিয়ে বল্‌ল তাকে আরও শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—আরও পথ চলতে হবে, কোনপ্রকারে গণেশ ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয় কি না তার চেষ্টা করতে হবে। শত কষ্ট সত্ত্বেও মাখন তার শরীর টেনে টেনে চলেছিল—আমাদের দেখা পেতেই হবে তাদের।

প্ল্যাটফরম থেকে নেমে দক্ষিণদিকে তারা হাঁটতে সুরু করে। রেল-লাইন ধরে সোজা না গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেণীর ট্রাঙ্ক রোডে এসে উপস্থিত হয়। কুমিল্লার উদ্দেশ্যে তারা ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে লাগলো। তখন রাত প্রায় তিনটে হবে। নির্জন রাস্তা, তবু অনভিজ্ঞতার জন্য পথ চলার সময় কোন কিছুর ছায়া দেখে মনে হয়েছে মানুষ, দূরের কোন আওয়াজে মনে হয়েছে বন্দুকের শব্দ, নিজেদের পায়ের শব্দকে ভুল ভেবেছে—ওই বুঝি পেছনে কেউ আসছে। তারা নিজে আমাকে এইরূপ বর্ণনা দিয়েছে। তাছাড়া আমারও ঠিক এইরূপ বিকারগ্রস্ত মনের অতীত অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯২৩ সালে "নাগরখানা পাহাড়ে" যুদ্ধের পর পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে আমরা তিনজন—অবনী ভট্টাচার্য, দেবেন ও আমি যখন পাহাড়ের রাস্তা, রেল-লাইন বা ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গভীর রাত্রে ভাটিয়ারী সমুদ্র-তীরের দিকে যাচ্ছিলাম তখন আমাদেরও নানা-রকম অদ্ভুত সব চিন্তা মনে এসেছে—ওই বুঝি গুলীর শব্দ হ'ল, ওই বুঝি আমাদের কেউ অনুসরণ করছে, ইত্যাদি। অত রাত্রে পাহাড়ে-জঙ্গলে, রেল-লাইনে ও ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে কে আমাদের পেছু ধাওয়া করবে? "নাগরখানা" যুদ্ধ শেষ হয়েছে বিকেল চারটে-পাঁচটার সময়। রাত দু'টো-তিনটের সময় আন্দাজে কে আমাদের অনুসরণ করবে? বিকার-গ্রস্ত মনে যুক্তি দিয়ে কিছু ভাবা যায় না। ঠিক অনুরূপভাবে ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের পর যখন প্রধান বাহিনী পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল তখন বাজিদ্‌-বস্তানের নির্জন রাস্তার ওপর একটিমাত্র মোটরের লাইট দেখে শত্রুর মোটর মনে করে সকলে রাস্তার ধারে শুয়ে পড়ল—আমরা ছাড়া শহর থেকে অতদূরে, সেই নির্জন রাস্তায় বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত ইংরেজরা যে কোনমতেই যেতে পারে না তা' তারা ভাবতেই পারে নি। এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথা শান্ত পরিবেশে কখনই ভাবা যায় না। কিন্তু এইটি বাস্তব ও রূঢ় সত্য যে "যুদ্ধের" পর সাহসী যোদ্ধাদেরও সেইরূপ মনের বিকার দেখা গেছে।

মাখন ও আনন্দ ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে চারিদিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলেছে যেন শত্রুপক্ষ তাদের অস্তিত্ব টের না পায়। কিন্তু আমার ও গণেশের সন্ধান পাওয়া যে তাদের একান্ত প্রয়োজন! পরে যখন দেখা হয়েছে তারা বলেছে যে তাদের ধারণা হয়েছিল আমি এবং গণেশও একত্রে আছি যেমন তারা দু'জনে পাকে-চক্রে একত্র হয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা চারিদিকে লক্ষ্য রেখেছে কোথাও আমাদের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। খুব আশা করেছিল আমাদের দেখা পাবেই।

সময় চলে যেতে লাগলো। সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটবার পরেও আমাদের দেখা না পেয়ে তারা একেবারে নিরাশ হয়েছে। এখন কি করবে তারা? নিজ বুদ্ধিতেই তাদের চলতে হবে। বসে বসে কোন প্ল্যান করবার অবকাশ ছিল না। তবে তারা এইটুকু বুঝেছিল যে ধরা পড়লে চলবে না। নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং ভোর হবার আগেই লোকালয় ছেড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের কোন পাহাড়ে-জঙ্গলে অথবা নির্জন স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহকে কোনমতে খাড়া রেখে তারা এগিয়ে চলেছিল।

এমন সময় তারা দেখতে পায় প্রায় দেড়শ' দু'শ' গজ দূরে একজন লোক আগে আগে যাচ্ছে। এই সময়ে এমন নির্জন রাস্তা দিয়ে একা একজন লোক কোথায় বা কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? পেছনে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখল কেউ আসছে কি না। পুলিশ পিছু নিলে প্রায় সময়েই তারা সামনে একজন ও পেছনে একজন থেকে নিজেদের মধ্যে সংযোগ রেখে অনু-সরণ করে। তাদের মনে হচ্ছিল পেছনের লোকটিকে হয়ত এখনও দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সামনের লোকটিও বা অত ধীরে ধীরে হাঁটছে কেন? সামনের এই ব্যক্তি যেন একটিবার পথের পাশে একটুক্ষণ বসলো। তারা তাদের গতিও সেই অনু-যায়ী কিছুটা মন্থর করল। ঐ লোকটি যেমন তাদের আগে আগে হাঁটছে তেমনি তার গতি ও দূরত্ব অব্যাহত রেখে নিজ গন্তব্যস্থানে চলে যাক্‌—এটাই তারা চেয়েছিল। যদি পুলিশের গুপ্তচর না হয় তবে তার গতির পরিবর্তন না হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু সে পথের ধারে বসে যেন তাদের মধ্যে দূরত্বটা কমিয়ে নিতে চাইল। মাখন ও আনন্দ আরো একটু আস্তে হাঁটতে লাগলো। সেই ব্যক্তিও যেন তার গতি আরো একটু মন্থর করলো। না, সে পুলিশের লোক না হয়েই যায় না। যখন দেখতে পেল সেই ব্যক্তি পথের ধারে একটি বড় গাছের তলায় বসে পড়েছে তখন তারা একেবারে নিঃসন্দেহ হ'ল যে সে নিশ্চিত পুলিশের চর। তারা দু'জন গাছটি অতিক্রম করে যাওয়ার পরেই সে তাদের পিছু নেবে—এই মতলবই যে তার সেখানে বসার একমাত্র কারণ, এটা যে কেউই বুঝতে পারবে। মাখন ও আনন্দের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'ল যখন তারা খানিকটা এগো-বার পর দেখে যে লোকটি সযত্নে তাদের কাছ থেকে মুখ ঢেকে রাখতে চাইছে। মাথার ওপর দিয়ে সমস্ত শরীরে সে চাদর ঢাকা দিল। এ সবের কি অর্থ? দু'জনেই তারা নিজ নিজ রিভলভার হাতের মুঠোয় নিল। এক নিমেষে চোখের ইঙ্গিতে ও ফিস্‌ ফিস্‌ করে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে নিল যে লোকটিকে তারা চ্যালেঞ্জ করবে।

গাছটির ঠিক বিপরীত স্থানে ট্রাঙ্ক রোডের ওপর আনন্দ ও মাখন এসে পৌঁছান মাত্রই বিদ্যুদ্বেগে তারা ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে বাঁ দিকে নেমে গাছতলায় লোকটির বুক লক্ষ্য করে রিভলভার বাগিয়ে ধরে। রিভলভারের ট্রিগারে তাদের আঙুল—একটুও অন্যথা বা ব্যতিক্রম তারা সহ্য করবে না—তক্ষুণি গুলী ছুঁড়বে। দৃঢ় কণ্ঠে দু'জনেই একসঙ্গে আদেশ দিল—"হাত তোল।" লোকটি আদেশ পাওয়া মাত্রই কোন দ্বিরুক্তি না করে হাত তুললো। তারপর দু'টি "বালক" প্রশ্ন করে—"কোথায় যাচ্ছ? কি উদ্দেশ্য তোমার? কে তুমি? কেন পিছু নিয়েছ?"

জবাব এল—"আমি গণেশদা!" গণেশদা! এও কি সম্ভব? স্বপ্ন না মতিভ্রম? উপন্যাস নয়, সিনেমা নয়—বাস্তব সত্য। সত্যিই গণেশদা—এতে কোন ভুল নেই। দু'টি "বালক" গণেশদা বলে একেবারে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এত বিপদ এবং দুঃখের মধ্যেও এই আশ্চর্য মিলন রূপকথার মত বিপ্লবী ইতিহাসে লেখা থাকবে।.....এখন তাদের দিজেনের প্রশ্ন আমি কোথায়? [ক্রমশঃ]

রঙ্গমঞ্চ এদেশে ওদেশে

দেশী-বিদেশী রঙ্গমঞ্চ-জগতের খবরাখবর

সম্প্রতি পরিণত বয়সে—৭৫ বছর—বিখ্যাত আমেরিকান নাট্যকার এল্‌মার রাইস মারা গেলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল নিউ ইয়র্কে ১৮৯২ সালে। আইন অধ্যয়ন শেষ করে তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'অন্ ট্রায়াল' (১৯১৪) লিখেই তিনি জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন—এ নাটকটি ছিল মেলোড্রামা। এই প্রথম মার্কিনী নাটক যাতে ফিল্ম টেকনিকের অনুকরণে "ফ্ল্যাসব্যাক" ব্যবহৃত হয়।

রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে 'দি এ্যাডিং মেশিন' (১৯২৩)—এটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক। এ নাটকে তিনি এ যুগের মেশিন-এজকে স্যাটায়ারাইজ করেছেন। তাঁর আর একটি বিখ্যাত নাটক হচ্ছে 'স্ট্রীট্ সিন' (১৯২৯)—বস্তীবাসীদের বাস্তব-জীবনের যে প্রাণবন্ত চিত্র এ নাটকে দেখা যায় তার স্বীকৃতিস্বরূপ রাইসকে পুলিটজার পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাইসের 'দি লিভিং থিয়েটার' রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধের বই। প্রত্যেক নাট্যরসিকের এই বইটি ভাল-ভাবে পড়া উচিত।

বিশ্বরূপায় 'রঙ্গিণী' মঞ্চস্থ হয়েছে—এটি বোধহয় থিয়েটার সেণ্টারের সেই ফ্লপ করা 'লেবেডেফ' নাটকটি। যন্ত্র নাট্যকারেরা হচ্ছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী ও শ্রীপ্রতাপ-চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়। বিখ্যাত সরকার ব্রাদার্স এবার আবার এঁদের সাহায্যার্থে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশা করা যায় দক্ষিণ কলকাতায় অনাদৃত 'লেবেডেফ' উত্তর কলকাতায় গিয়ে বিশ্বরূপার 'জাগোর' রেকর্ড এবং সুনাম বজায় রাখতে সমর্থ হবে। মন্দলোকে বলছে হিস্ট্রী রিপিট করলেই মুস্কিল—"বিশ্বরূপায়" তরুণ রায় মশায় 'সাজ-হানে' যেভাবে কুপোকাৎ হয়েছিলেন, আবার 'রঙ্গিণীর' বেলাতেও সেই একই অবস্থা না ঘটে। অবশ্য তাতেই বা ক্ষতি কি। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। খুঁটির জোর তো আছেই—লাগে টাকা দেবে দিল্লীর সংগীত নাটক আকাডেমি।

স্ট্রিণ্ডবার্গ ইন্ দি মিড্‌ল্যাণ্ডস্

১৯১২ সালের শীতকালে সেক গার্ডার একটি ভিলাতে বিশ্রাম নেবার জন্য এসে হাজির হলেন ডি, এইচ, লরেন্স তাঁর বান্ধবী ফ্রিডা সহ। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সান্স এণ্ড লাভার্স'-এর শেষবারের মত পরিমার্জন এবং পরিশোধন করে দেন।

এর আগে দু'-একবার লরেন্স নাটক লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। উপন্যাসটি শেষ করে লরেন্সের মনে খুব দৃঢ় প্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাস এসে গেল। এবার তিনি মনস্থির করে ফেললেন যে, এখন থেকে তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে শ, গল্‌সওর্দি এবং বার্কারকে রঙ্গজগৎ থেকে হটিয়ে দেওয়া। এই সময় লরেন্স তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন ঃ

"রাশিয়াতে যেমন চেখভের নাটকের এক শ্রেণীর দর্শক পাওয়া গিয়েছিল, ইংলণ্ডেও আমার রচনার জন্য বিশেষ শ্রেণীর দর্শক খুঁজে বার করা যেতে পারে—যদি অবশ্য এবিষয়ে কাজ করবার মত লোক পাওয়া যায়।"

ইটালীতে এই শীতকালে লরেন্স যে তিন-চারটি নাটক লিখেছিলেন তার মধ্যে সব থেকে সেরা হয়েছিল 'দি ডটার ইন্ ল' নাটকটি। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের কথা হলো এ নাটকটি মঞ্চে আসতে সময় লাগল পঞ্চান্ন বছর—প্রথম স্টেজড্ হলো এডিনবারার ট্রাভার্সে এবং এখন অভিনীত হচ্ছে রয়েল কোর্টে—পিটার জিল্ এর প্রডিউসার। নাটকটি বেশ জন-প্রিয়তা লাভ করেছে। যথাসময়ে এ নাটক মঞ্চস্থ হলে লরেন্স হয়তো উৎসাহ পেয়ে নাট্যরচনায় ভালভাবে মনোনিবেশ করতেন। তিনি হয়তো ইংলিশ চেখভে পরিণত হতেন না, কারণ দু'জনের লেখার আদল এবং ধরণটাই আলাদা। তবে ইংলণ্ডের স্ট্রিণ্ডবার্গ তিনি নিশ্চয়ই হতে পারতেন। স্ট্রিণ্ডবার্গের 'দি ডান্স অভ্ ডেথ'-এর মতই লরেন্সের নাটকটিতেও মাঝে মাঝে ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়—যার ফলে সময় সময় নাটকটি অত্যন্ত রসঘন হয়ে জমে ওঠে। সান্স্ এণ্ড লাভার্স-এর সেটিং-এর সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

বাংলায় বেরটল্ট ব্রেখটের বিখ্যাত নাটক দি গুড পার্সন অভ্ সেৎসুয়ান'

দক্ষিণ কলকাতার সন্ধ্যানীড় সংস্থা আগামী দশই জুন সাড়ে ছটায় শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে ব্রেখটের 'দি গুড পার্সন অভ্ সেৎসুয়ান' নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন। অভিনয় হবে বাংলা ভাবানুবাদের মাধ্যমে। বিস্তারিত সংবাদের জন্য ৯।১, মাধব চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-২০-তে—ফোন নং ঃ ৪৭-২৫২০—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

এ নাটকটি ব্রেখটের অন্যতম সেরা নাটক। নাটকটির মূল বক্তব্য ভারি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে শেনতের 'সৎ এবং ঈশ্বরের অসহায়তার গানে।' এ গানটির মনোগ্রাহী অনুবাদ করেছেন শ্রীদুর্গাদাস সরকার—গানের কথাগুলো নিচে দেওয়া হলো ঃ

সৎ এবং ঈশ্বরের অসহায়তার গান

আমাদের এই দেশে,
যদি কপাল ভালো হয়,
আর খুঁটির জোর রয়
তবেই তুমি পারবে দিতে
যোগ্যতার প্রমাণ
নইলে, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা
হয় ধূলির সমান।
সজ্জন আজ অসহায়,
দৈবশক্তি শূন্যের কোঠায়,
ভগবান, কেন রক্ষা নাহি কর
তুমি সকল সৎ জনে,
কেন কঠিন আঘাত নাহি
হান সকল দুর্জনে।
ভগবান, কেন ভালো হয়েও
অনাহারে দিন কাটাতে হয়
কেন ক্ষুধাতুরের মাথায়
তোমার আশিস নাহি রয়,
ভগবান, কেন তোমার ধন
দাও না তুমি সবাইকে সমান।
কেন সবার হাতে দাও না
তুলে প্রকৃতির দান,
ওগো, একী তোমার নিষ্ঠুর বিধান
হায়, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা
হয় ধূলির সমান।

ব্রেখটের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক বাংলা ভাষায় মঞ্চস্থ হচ্ছে, এর দ্বারা বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রগতিশীলতার দিকটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রিণ্টলে এবং জন ডেক্সটারের ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঃ

মিস্টার জন ডেক্সটার ন্যাশনাল থিয়েটারের এসোসিয়েট ডিরেক্টর

ইস্তফা দিয়েছেন, আর জন বয়েণ্টন প্রিস্টলে বোর্ড থেকে রিজাইন করেছেন। এ দুটি ব্যাপারের ভেতর অবশ্য কোনও যোগসূত্র নেই। মিস্টার ডেক্সটার প্যারিস থেকে ডিরেক্টর স্যার লরেন্স অলিভিয়ারকে জানিয়েছেন যে, বাইরের কাজের চাপে ন্যাশনাল থিয়েটারের ব্যাপারে সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

প্রিস্টলে বলেছেন তাঁর অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'a Squarepeg in a round hole'-এর মত। বোর্ডের বেশির ভাগ কাজ হচ্ছে আর্থিক ব্যাপারে মতামত দেওয়া। মিস্টার প্রিস্টলে বছরখানেক এই বোর্ডের সভ্য ছিলেন এবং সভ্যপদ ছেড়ে দেবার পর বলেন—I really could not afford the time to travel to London for meetings. There has been no policy disagreement. In fact the board has nothing to do with artistic policy, so I don't really think I should have been appointed. Membership was not right for me. I am not a financial man.

সি আই এ

রিংসের ২০ তারিখের পত্রিকায় 'Dragnet Round CIA in Bengal' শীর্ষকে বাংলার কিছু সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের ওপর মার্কিনী অর্থের দুষ্ট প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে কিছুদিন আগে বিখ্যাত ইংরাজ কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার 'এনকাউণ্টার' পত্রিকার প্রকাশনার পেছনে সি আই এ'র আর্থিক সাহায্য আছে জানতে পেরে ঐ পত্রিকার সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন।

যে কথা রিংস উল্লেখ করেন নি সে হচ্ছে এই যে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের কয়েকজন প্রডিউসারও সি আই এ'র অর্থপুষ্ট হয়ে রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে জনগণের মনে অসত্য এবং অস্বাস্থ্যকর ভাবধারার প্রচারের চেষ্টা করছে। এই রকম একজনকে সেদিন দেখলাম সোভিয়েটের সাংস্কৃতিক একটি উৎসবে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রাণভরে ভডকা পান করছেন। সাম্প্রতিক রুশো-মার্কিনী সম্প্রীতির সুযোগটা নিয়ে একবার যদি মস্কো ঘুরে আসা যায় তো মন্দ কি!

রোজেনক্র্যান্টজ এণ্ড গিল্ডেনস্টার্ন আর ডেড্

এণ্টিরুমে দু'জন লর্ড বসে ব্যাকরণের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। প্রাসাদের আর একদিক থেকে ট্রাম্পেট, কেটল ড্রাম এবং রাজার মদ্যপান ও অনুচরদের হৈ-হৈ-এর শব্দ এই ঘর পর্যন্ত ভেসে আসছে।

এই দু'জনের শুধু মনে আছে যে রাজার আহ্বানে তাদের এখানে আসতে হয়েছে। সকালে একজন পরিচারক এসে তাদের জাগিয়ে দিয়েছিল, একদল অভিনেতার সঙ্গে তাদের পথে দেখা হয়েছিল, রাজা তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর সৎ ছেলের ওপর নজর রাখতে—এই যুবরাজটি ছিল বিষাদাচ্ছন্ন এবং কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিহিত—যুবরাজ তাঁদের

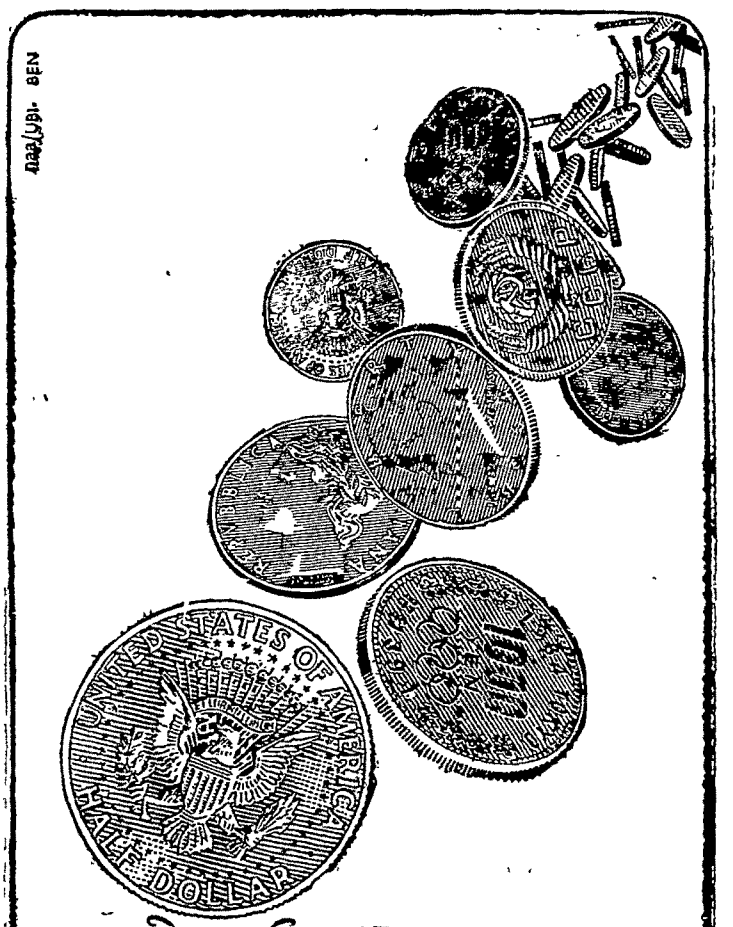

জাতীয় পরিকল্পনা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার

সকল যুগেই, বিশেষতঃ এই জাতীয় পরিকল্পনার যুগে দেশের সমৃদ্ধিসাধন বহুলাংশে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সাপেক্ষ। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের প্রসার বর্ত্তমানকালে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর।

বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী মারফৎ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে পারদর্শী। পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেণ্ট ও করেসপণ্ডেণ্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পূর্ব্ববঙ্গে ৮৫টিরও অধিক শাখা আছে

এলসিনোরে স্বাগত জানালেন—এত দ্রুতগতিতে কথা বলতে লাগলেন যে, তারা হকচকিয়ে গেল।

'টম স্টপার্ডের রোজেনক্র্যান্টজ এণ্ড গিল্ডেনস্টার্ন আর ডেড' প্রথম এডিনবারা ফেস্টিভেলে মঞ্চস্থ হয় ছাত্রদের দ্বারা—বর্তমানে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রডাকসনটি এত সুনাম অর্জন করেছে যে নাটকটিকে অনেকেই সিক্সটিজের একটি শ্রেষ্ঠ প্লে হিসাবে গণ্য করেছেন। এ নাটকে শেক্সপীয়ার প্যারডীকে যেন স্যামুয়েল বেকেটের মেটাফিজিক্যাল স্তরে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্টপার্ড তাঁর নায়ক দু'টিকে ফেটস এবং কোরাস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া এই স্টাইল অভ প্রডাকসনটি কণ্টিনেণ্ট থেকে ইমপোর্ট করা হয়েছে—অর্থাৎ মিংকে মডার্নাইজ করা হয়েছে। 'অনডিন' বা 'ইলেকট্রা', অথবা সারত্রের 'ফ্লাইজ' বা ককতোর 'ইনফারনেল মেশিনে' ঠিক যেমনটা হয়েছে।

৯ই এপ্রিল তারিখের লণ্ডন অবজার্ভার কাগজে 'মেয়েকে স্টেজে নামতে দেবেন না' এই হেডিং-এ ডেভিড হাওয়ার্থ লিখেছেন ঃ এদেশে এণ্টারটেইনার্সরাই নিম্নতম বেতনের শ্রমিক। গত সপ্তাহে অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, গায়ক এবং অন্যান্য কলাশিল্পীদের বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেই এই অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্তে আসা গেছে। অথচ সাধারণ লোকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, অভিনয়-শিল্পীরা বেশ ভাল টাকা রোজগার করেন। সার্ভে রিপোর্টে প্রকাশ যে, শতকরা আটচল্লিশ জন অভিনয়-শিল্পী বছরে সাতশো পঞ্চাশ পাউণ্ডের থেকেও কম টাকা আয় করেন। শতকরা আশীজনেরও বেশি অভিনেত্রী এর থেকেও কম পান। আবার শিল্পীদের পাওনার শতকরা দশ পারসেণ্ট এজেণ্টদের কমিশন দিতে হয়।

ডেভিড হাওয়ার্থ বলেছেন ঃ The survey, the first of its kind for 15 years, was commissioned by the actors' union, Equity, and according to a union official 'gives a remarkable portrait of the actor in the sixties.

এদেশের অভিনয়-শিল্পীদের বেতন

একমাত্র স্টার থিয়েটার এবং বিশ্বরূপা মঞ্চ ছাড়া অন্য কোন মঞ্চে নিয়মিতভাবে শিল্পীদের মাসিক বেতন দেওয়া হয় বলে আমার জানা নেই। অন্যান্য স্টেজে অবশ্য নামকরা শিল্পীদের পাওনা টাকা দিতেই হয়—কারণ তাঁরা সরে গেলে টিকেট বিক্রিও বন্ধ হয়ে যাবে। বেশির ভাগ থিয়েটার গ্রুপ আজকাল দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাডেমী থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন নানা খাতে। ঐ সব টাকা সংস্থাগুলির কর্তাব্যক্তিদের পকেটেই যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। এমন কি কোন কোন গ্রুপের মালিক গরীব শিল্পীকে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দু'শো টাকার ভাউচারেও সই করিয়ে নেন বলে শুনেছি—যাতে ঠিকভাবে দিল্লীতে হিসাব দাখিল করা যায়। এ সব ব্যাপার প্রমাণ করাও মুস্কিল। তবে লাইব্রেরীর বই কেনা বাবদ বছরে বছরে হাজার টাকার গ্রাণ্ট নিয়ে কোন বই কেনা হয় নি এমন প্রতিষ্ঠানও আছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাডেমী এ সম্বন্ধে একটু তৎপর হলে অনায়াসেই defalcations ধরতে পারেন। আমাদের দেশে বিগত কুড়ি বছর ধরে সর্ব ক্ষেত্রেই বহু চুরি, জোচ্চুরি, তহবিল তছরুপের ব্যাপার চলেছে। আজ এ সবের অবসান হওয়া দরকার। রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেও যে সব নোংরামী এতকাল ধরে চলে এসেছে এবার সে সম্বন্ধে সত্যিকার সার্ভের ব্যবস্থা করা উচিত।

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সত্যিকার উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম দরকার ঐ সব জায়গা থেকে অবিলম্বে অসাধু ব্যক্তিদের অপসারণ।

নাট্যসমালোচকের গবেষণা!

জনৈক নাট্যসমালোচক সম্প্রতি একটি দৈনিক কাগজে লিখেছেন যে, থিওরিস্টরা রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকেন বলেই রবীন্দ্রনাথের নাটক এতকাল জনপ্রিয় হতে পারে নি। কি সুচিন্তিত মন্তব্য! মাথায় ধুসর বস্তুর কি আধিক্য বলুন তো? তিনশো বছরের ওপর শেক্সপীয়ারকে নিয়ে পৃথিবীর সর্বদেশে আলোচনা এবং গবেষণা চলছে। সুতরাং এই সমালোচক মশায়ের যুক্তি অনুসারে তো শেক্সপীয়ারের নাটকের কোনই জনপ্রিয়তা হওয়া উচিত ছিল না। এই ভদ্রলোকের মতে আজকালকার একটি সম্প্রদায়ই রবীন্দ্রনাথের নাটককে জনপ্রিয় করেছে। অর্থাৎ নাট্যমন্দিরের তপতী, শেষরক্ষা, বৈকুণ্ঠের উইল, বিসর্জন, আর্ট থিয়েটারের চিরকুমার সভা, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় রবীন্দ্রনাট্যের মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্য দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে পারে নি—যদিও কবি নিজেও এ সব নাটকের অনেকগুলির অভিনয় দেখেছেন এবং উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন।

বিস্ময়কর খবর

২৪শে মার্চ, ১৯৬৭, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বস্টকের গণ-নাট্যশালায় শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত রচিত বাংলা নাটক 'অজেয় ভিয়েতনামের' জর্মন অনুবাদ মঞ্চস্থ হয়—অনুবাদক জর্মন গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ফন কুবা। পরিচালনার ভার ছিল রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত পরিচালক হানস আনসেলম পেটেনের ওপর। বিরাট ভূমিকালিপির শীর্ষস্থানে আছেন পেট্রা কেলিং হেলা মুলার, পেটের বাউসে এবং ইয়াক ডীল। বলা বাহুল্য এই প্রথম একটি বাংলা নাটক পূর্ব জার্মানীতে মঞ্চস্থ হল।

[ক্রমশঃ

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ । ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

এবার বিদ্রোহী কবির জন্মদিনে

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৮ তম জন্মদিবসে অগণিত নরনারী কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে তাঁর বাস-গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও কবি আজ রুদ্ধবাক কিন্তু জনগণের অন্তরে তিনি গভীর ভালবাসা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস শাসনের পরে একটা পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনে শত অভাব-অনটনের মধ্যেও জনজীবনে একটা উচ্ছ্বাস ও আলোড়ন এসেছে। এই আলোড়ন এবার কবির জন্মদিনেও প্রকাশ পেয়েছে। সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দলে দলে মানুষ এসেছেন পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে, কেউ কেউ সঙ্গে করে সন্দেশ এনেছেন—কারণ কবি আজো ফুল, গান আর সন্দেশ ভালবাসেন। কবিকে অন্তরের প্রীতি জানাতে প্রবীণরা যেমন এসেছিলেন, তেমন দলে দলে এসেছিল কিশোর-কিশোরীরা। তাদের কচিকণ্ঠের কলরবে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত। এত জনসমাগম আর কখনো দেখা যায় নি। দিন বদলে কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের আরো প্রকাশ পেয়েছে যুক্তফ্রন্টের ছয়জন মন্ত্রীর আগমনে। তাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন বিদ্রোহী কবির প্রতি। একদিন এই কবির অগ্নিবীণা বাঙালী তরুণদের ফাঁসীর মঞ্চে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এই চারণকবির কণ্ঠে একদিন বাঙালীর ঘুম ভাঙার গান গীত হয়েছিল। আবার তাঁরই লেখায় ও সুরে তরুণপ্রাণের শতদল বিকশিত হয়েছিল। সেই কবিকে বাঙালী জাতি ভোলে নি, তাঁর প্রতি মর্যাদাদানেও কুণ্ঠিত নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দীর্ঘ ক'বছর কবি যেভাবে অসুস্থ হয়ে আছেন, তার সুযোগ নিয়ে একদল ব্যবসায়ী তাঁর রচনা নিয়ে মুনাফা করেছে, কবি-পরিবার অভাব-অনটনে দিন কাটিয়েছে। কবির গানের সুর বিকৃত করে পেশাদার গায়করা আসর জমাবার চেষ্ট করেছে। কবির নাম ভাঙিয়ে নানা জনে নানাভাবে সুযোগ করে নিয়েছে। এতকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কবিকে মাসিক সামান্য মাত্র মাসোহারা দিয়ে তাঁরা কর্তব্য সম্পাদন হয়েছে মনে করেছেন। এই অবহেলা মুহূর্তে তাঁর কিছু কিছু গান হারিয়ে গেছে, কিছু পুনর্মুদ্রণের অভাবে পাঠেচ্ছুদের নাগালের বাইরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রতিবছর কবির জন্মদিনে একবার করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কবির রচনা সংকলন প্রকাশের জন্য। কিন্তু কোন কাজ হয় নি।

দিন বদলে এবার শুভলক্ষণ—শিক্ষা-মন্ত্রী সহ যুক্তফ্রন্টের ছয়জন মন্ত্রী এসে-ছিলেন এবং স্বচক্ষে তাঁরা কবির অতি ছোট্ট বাসস্থানের অব্যবস্থা থেকে জনতার আকাঙ্ক্ষার কথা নিজেরা দেখে গেছেন। প্রচারমন্ত্রী কবির পুত্রের সঙ্গে সরকারী-ভাবে রচনা সংকলন প্রকাশের কথা আলোচনা করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোন কোন মন্ত্রী কবির বিষয়ে যে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এটা শুভলক্ষণ, এবং আশার কথা। জনতার উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে কবির রচনাবলীর অন্যতম প্রকাশক ডি, এম, লাই-ব্রেরীর স্বত্বাধিকারী পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির সদস্যদের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন যে তিনি তিনটি গ্রন্থের (সঞ্চিতা, নজরুল গীতি, অগ্নিবীণা) স্বত্ব কবিপুত্রদের দেবেন। ডি, এম, লাইব্রেরী কেবলমাত্র প্রকাশক থাকবে। এই ইচ্ছা-জ্ঞাপন শেষ পর্যন্ত যদি রক্ষিত হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ডি, এম, লাইব্রেরীকে ধন্যবাদ জানাবে। তাঁরা অনেক মুনাফা ভোগ করেছেন, এবার রুদ্ধবাক কবির প্রতি এই কর্তব্য সম্পাদন করে জনতার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতে পারেন।

এবারের জন্মদিন জনতার উচ্ছ্বাসের দিক থেকে অভূতপূর্ব। কিন্তু সর্বাধিক

ওয়াহিদা রহমান

উল্লেখযোগ্য—দিন বদলের সঙ্গে কবির প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে সরকারের আগ্রহ। আশা করা যায়, যুক্তফ্রন্ট সরকার কবি ও তাঁর রচনাবলীকে পুরাতন সরকারের শাপ-মুক্ত করবেন।

—সুজন।

ভারতে সোভিয়েত চলচ্চিত্র

গত ১৯শে মে দিল্লীতে সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। সাতদিন দিল্লীতে সোভিয়েত ছবিগুলি দেখাবার পর, এই উৎসব মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে সিনেক্লাব অব ক্যালকাটা, সিনে সেন্ট্রাল এবং ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে লেনিন ইন পোল্যান্ড, ওথেলো, ফরটি ফার্স্ট কারনিভ্যাল নাইট ইত্যাদি ছবি কলকাতায় দেখান হচ্ছে। এই চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে সোভিয়েত থেকে ভারতে তিনজন চলচ্চিত্র প্রতিনিধি এসেছেন। এই তিনজনের মধ্যে আছেন—উক্রাইনের চল-চ্চিত্র কমিটির সভাপতি মিঃ এস পি

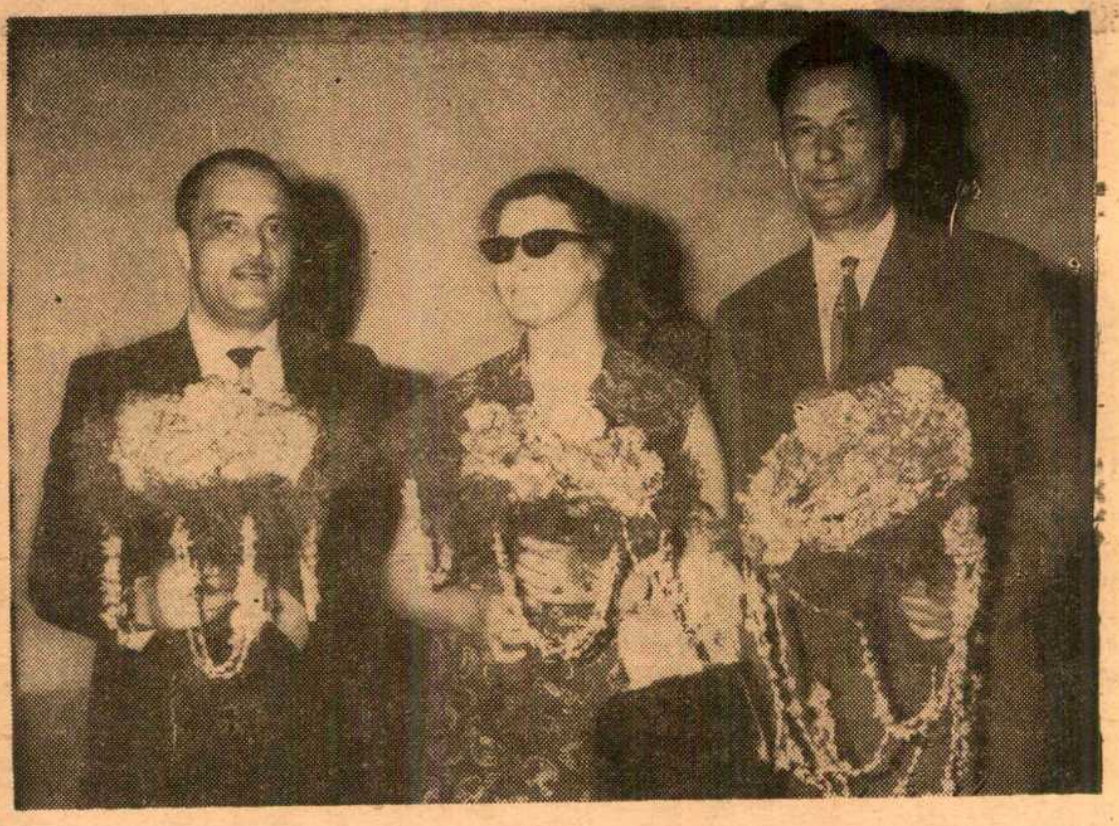

ভারতে সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আগত পালাম বিমান বন্দরে সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রতিনিধিগণ

আইভানভ, 'সেরিওঝা' ছবির অন্যতম পরিচালক মিঃ জর্জি ডানোলিয়া এবং এই ছবির নায়িকা মিস এল সকলোভা।

সরকারিভাবে এবার ভারতে তৃতীয় সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে। ভারতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথম সোভিয়েত ছবি প্রদর্শিত হয় কুড়ি বছর আগে। সেই ছবির নাম 'সার্কাস এরেনা'। ছবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপরে এক পরিবেশক সংস্থা কয়েকটি সোভিয়েত ছবি ক্রয় করে। কিন্তু আমেরিকান ও বৃটিশ ছবির তুলনায় এদেশে সোভিয়েত ছবির প্রদর্শন নগণ্য। যদিও বিনিময় ব্যবস্থায় সোভিয়েত ছবি আমদানী করার সুবিধা আছে কিন্তু ভারত সরকার মার্কিন 'ক্লাইম' ছবি আমদানীতে যত আগ্রহ দেখায় সুস্থ ও মানবিক সোভিয়েত ছবি দেখাতে তেমন উৎসাহ দেখায় না। চলচ্চিত্র অভিনেতা সুনীল দত্ত 'ক্রেনস আর ফ্লাইং' ছবিটি ক্রয় করেন এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শন করেন। কে এ আব্বাস সোভিয়েতের সঙ্গে যুক্তভাবে 'পরদেশী' ছবি নির্মাণ করেন। প্রথম রুশীয় পর্যটক আফানাসি নিকিতিনের জীবন অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত।

এবার সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ও আটটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে—'লেনিন ইন পোলান্ড'। এই ছবিটি সোভিয়েত-পোলিশ যুক্ত উদ্যোগে নির্মিত। এখানে লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এম স্ত্রুচ। যিনি লেনিনের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত। এই ছবির পরিচালক সের্গেই য়ুৎকেভিচ্ আইজেনস্টাইনের পদ্ধতিতে এখানে 'ইনার মনোলগ' রীতি ব্যবহার করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের জীবন অবলম্বনে বহু ছবি নির্মিত হয়েছে। প্রথম ছবি 'অক্টোবর' বা 'টেন ডেজ দ্যাট স্যুক দি ওয়ার্ল্ড' বিখ্যাত সের্গেই আইজেনস্টাইন যে ছবি গ্রেগরি আলেকজান্দ্রভের সহযোগিতায় নির্মাণ করেছিলেন। এই ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নিকান্দ্রভ। আইজেনস্টাইনের পরে মিখেইল রম 'লেনিন ইন অক্টোবর' ও 'লেনিন ইন ১৯১৮' নামে দুটি ছবি নির্মাণ করেন। উৎসবের দ্বিতীয় ছবি—'সেরিওঝা'। ভেরা পানোভা লিখিত একটি ছোট গল্প এই ছবির অবলম্বন। পরিচালকদ্বয় জর্জি ডানোলিয়া এবং ইগোর তালানকিন একটি ছোট ছেলের চোখ দিয়ে উজ্জ্বল পৃথিবীকে দেখিয়েছেন। কার্লোবিভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। তৃতীয় ছবি 'আর্শিন মাল আলান'। উজ্জির গাজিবেকভ লিখিত গীতিনাট্য এই ছবির অবলম্বন। এই প্রণয়-কাহিনীটি প্রথম চিত্ররূপ লাভ করে হলিউডে ১৯১৬ সালে। তারপরে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলচ্চিত্ররূপ লাভ করে ১৯৪৬ সালে। এই সোভিয়েত চলচ্চিত্ররূপে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রসিদ বেইবুটভ। রসিদ বেইবুটভ কয়েকবার ভারতে এসেছেন, এবং গানের জন্য প্রশংসা লাভ করেছেন। বর্তমান ছবিটি একই কাহিনীর রঙিন চিত্ররূপ। এই কাহিনীর নায়ক আসকর একজন বণিক। সে একজন ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে তার প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়ায়। হাসি কৌতুকে ছবিটি উপভোগ্য। চতুর্থ ছবি—'অ্যালপাইন ব্যালাড' ভাসিলি বাইকভ লিখিত একটি মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীর চিত্ররূপ। এক রুশীয় সৈন্য আর এক ইতালীয় তরুণী—জার্মান বন্দীনিবাস থেকে পালিয়েছে। তাদের তাড়া করছে ভয়ঙ্কর কুকুর নিয়ে জার্মানরা। পলাতক প্রেমিক-প্রেমিকা মরিয়া হয়ে ছুটছে। রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতা এবং কাব্যিক মেজাজের সমন্বয় ঘটেছে এই ছবিতে। ছবির পরিচালক বরিস স্টেপানভ। 'হাউ সাড আই কল ইউ নাউ' এবং 'স্কাই লার্ক' মহা-

আলেকজান্দার আইভানভ পরিচালিত 'সোভিয়েত রাশিয়াস ফার্স্ট পাইওনিয়ারস্' ছবির একটি দৃশ্য। কবি ওলগা বার্গোল্টস লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে এই ছবিতে রুশ বিপ্লবের পরের বছরের অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলি এ-ছবিতে দেখান হয়েছে।

যুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত ছবি। প্রথম ছবিতে সোভিয়েত গোয়েন্দাদের বাস্তব-ভিত্তিক কাহিনী। দ্বিতীয়টি এক সোভিয়েত ট্যাঙ্ক-চালক, একদল যুদ্ধবন্দী এবং একটি ভরত পাখীকে নিয়ে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মানবতার জন্য সংগ্রামের কাহিনী। এক বন্দীনিবাসের বন্দীদের দিয়ে জার্মানরা নতুন নতুন ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করত। জার্মান বুলেটে হতভাগ্য বন্দীরা মরত। একদিন এক ট্যাঙ্ক-চালক জার্মানদের বাধা অগ্রাহ্য করে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। সারা শহরে হৈ-চৈ, আতঙ্ক। হঠাৎ দেখা গেল ট্যাঙ্কের সামনে একটি ছোট ছেলে পড়েছে, সেই ছেলেকে বাঁচাতে ট্যাঙ্ক থেমে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের বুলেটে ট্যাঙ্ক-চালকের মৃত্যু হল। সপ্তম ছবি—অমর কবি পুশকিনের লেখা গল্প অবলম্বনে 'শট'।

নভেম্বর বিপ্লবের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি বছরে এইরূপ উৎসব তাৎপর্যপূর্ণ।

সোভিয়েত দেশে স্টুডিও

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু ১৯১৯ সালে—যখন লেনিন চলচ্চিত্র সম্পর্কিত নির্দেশনামা জারী করলেন।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪২টি চলচ্চিত্র স্টুডিও আছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রে নিজের নিজের ভাষায় ছবি তোলবার মত করে স্টুডিও করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রে মন্ত্রিসভার অধীনে চলচ্চিত্র পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি চলচ্চিত্র বিষয়ক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক ব্যাপার এবং প্রযোজনার কাজ করে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মস ফিল্ম স্টুডিও ইউরোপে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

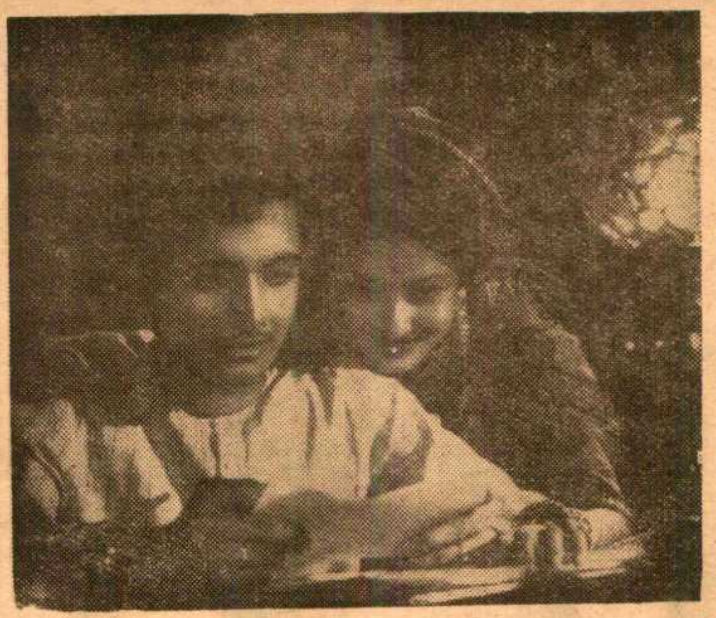

তরুণ মজুমদারের 'বালিকা বধূ' ছবিতে পার্থ মুখার্জী ও মৌসুমী চ্যাটার্জী

স্টুডিও। এখানে ছবি তোলা এবং টেলিভিসন চিত্রের কাজ হয়ে থাকে। ওডেসা ফিল্ম স্টুডিও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা পুরাতন স্টুডিও। উক্রাইনের 'কিয়েভ স্টুডিও' আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কোর স্মৃতিজড়িত। 'বাইলোরুশ ফিল্ম' স্টুডিওতে ১৯২৭ সালে প্রথম বাইলোরাশিয়ান ছবি তৈরি হয়। 'গ্রুজিয়া ফিল্ম' স্টুডিওয় জর্জীয় ভাষায় ছবি নির্মিত হয়ে থাকে। আর্মেন ফিল্ম স্টুডিওতে আর্মেনীয় ভাষায় ছবি তৈরি হয়। এ ছাড়া রয়েছে আজারবাইজান স্টুডিও, কাজাক ফিল্ম, উজবেক ফিল্ম, তুর্কম্যান ফিল্ম, লিথুয়ানিয়ান ফিল্ম, লাত্‌ভিয়ান ফিল্ম, খিরগিজ ফিল্ম, মলদাভিয়ান ফিল্ম, তালিন ফিল্ম, তাজিক ফিল্ম প্রভৃতি স্টুডিও। এই সব স্টুডিওয় বছরে ১২০-১৪০টি পূর্ণাঙ্গ ছবি এবং তিন শতাধিক প্রামাণিক চিত্র, পাঁচ শত বিজ্ঞান চিত্র এবং ১৩০০ সংবাদ চিত্র নির্মিত হয়।

সোভিয়েত ছবি এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয় এবং জনপ্রিয়।

নাটকের কথা

দাবি নাটকের দ্বিশততম অভিনয়

স্টার থিয়েটারের 'দাবি' দ্বিশততম অভিনয়ের গৌরব অর্জন করেছে। আগামী ৩রা জুন এই নাটকের দ্বিশততম রজনী অভিনয়ের স্মারক উৎসব হবে ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে। অনুষ্ঠানে শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

মহাজাতি সদনে অভিনীত 'বাংলার মেয়ে' নাটকে ছন্দা দেবী, লতিকা দাশগুপ্ত, সন্তোষ সিংহ ও মহেন্দ্র গুপ্ত

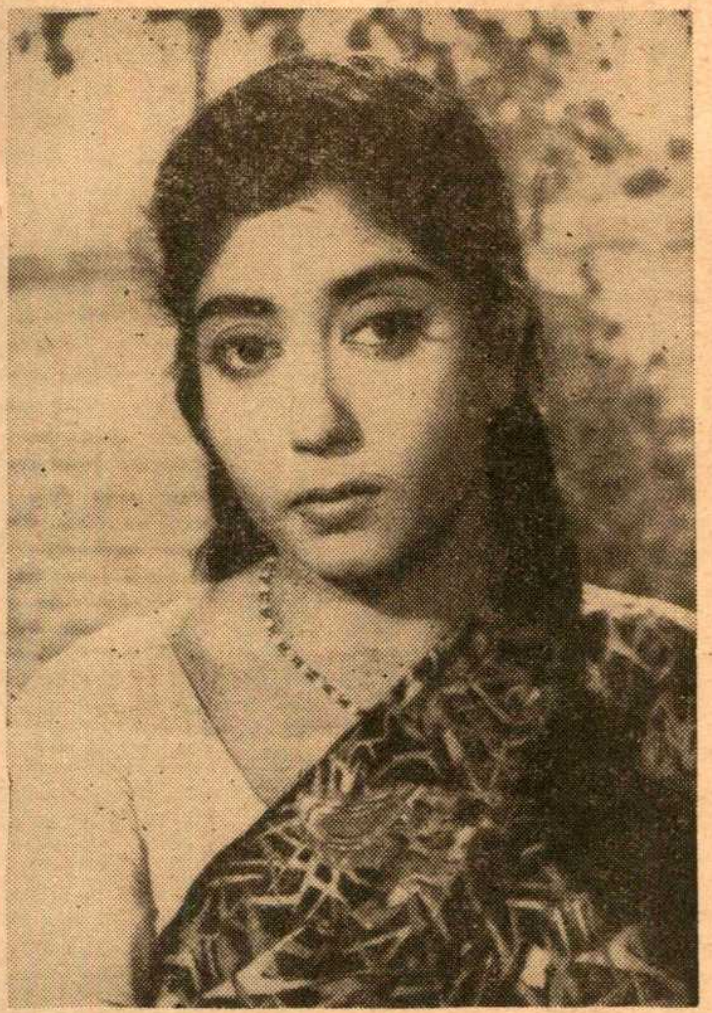

সিদ্ধেশ্বরী চিত্র মন্দিরের 'কালোর পরে আলো' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

অশনি সংকেত

সত্যজিৎ রায় 'চিড়িয়াখানা'র কাজ শেষ করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত'-এর কাজে হাত দেবেন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি। এবং এই ছবির জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রযোজিত 'অশনি সংকেত'-এর অধিকাংশ চিত্র গৃহীত হবে কাহিনীর বাস্তব পটভূমি বসিরহাট অঞ্চলে। জুলাই মাস থেকে চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হবার কথা। প্রধান তিনটি চরিত্রে সম্ভবত সৌমিত্র, জহর রায় ও রবি ঘোষকে দেখা যাবে।

সংবাদকণা

ছোটজাগুলিয়া গ্রামে রবীন্দ্রজয়ন্তী

সম্প্রতি বারাসত ছোটজাগুলিয়াতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা মিলে এক রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। নিজেদের ব্যবস্থাপনায় তারা কবিগুরুর সংগীতাংশ থেকে সুন্দর সুন্দর আলেখ্য রচনা করে পরিবেশন করেছে কলকাতা থেকে আগত শিশুদের কাছে। কলকাতার শিশুরাও এই উৎসবে যোগ দিয়ে নাচ-গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে গ্রামের বন্ধুদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সুখ্যাতি পেয়েছে : শিখা চক্রবর্তী, সুফিয়া খাতুন, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা ঘোষ এবং স্বাতী পাল। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সবপেয়েছির আসরের স্বপনবুড়ো এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ছোটজাগুলিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়। অতিথিরা তাঁদের ভাষণে শহর এবং গ্রামের শিশুদের এই মিলন উৎসবকে স্বাগত জানান। এই উপলক্ষে ছোটজাগুলিয়া বিশ্বাসবাড়িতে শ্রীহিমাংশুকুমার বিশ্বাসের সহায়তায় একটি শিশুবিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। কলকাতার সুপরিচিত শিশুসংস্থা মুকুলবীথি এই বিদ্যালয়টি পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

বার্লিন উৎসবে 'বালিকাবধূ'

তরুণ মজুমদারের 'বালিকাবধূ' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। বার্লিন উৎসব শুরু হবে ২৩শে জুন।

বার্লিনে ওয়াইদার ছবি

বিখ্যাত পোলিশ চলচ্চিত্র পরিচালক আন্দ্রেই ওয়াইদার ছবি 'গেটস টু প্যারাডাইস' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক ক্রুশেডকে অবলম্বন করে এই ছবির চিত্রনাট্য লিখিত।

সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

		টা. প.
বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪·০০
ষাণ্মাসিক	" "	৭·০০
ত্রৈমাসিক	" "	৩·৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

আপনাঃ ২৭শে এপ্রলের "বঙ্গদর্শন" নিবন্ধে "শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি নিবেদন"-এ বিভিন্ন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিগুলি সম্পর্কে যে কয়েকটি তথ্য লেখা হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদে ১১ই মে সংখ্যায় "পাঠক মন" বিভাগে মুদ্রিত কোনও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির জনৈক সদস্য শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় (পোঃ চাকদহ, নদীয়া) মহাশয়ের পত্রটি পড়িয়া কৌতুকবোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে মনে হইতেছে যে "বঙ্গদর্শন"-এর লেখকের মন্তব্যগুলিতে তাঁহার আঁতে বিশেষ ঘা লাগিয়াছে। যাই হোক আমার বিশেষ পরিচিত একজন প্রধান শিক্ষকের মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহার সহিত "বঙ্গদর্শন"-এর লেখকের মন্তব্যগুলির হুবহু মিলিয়া যায়। বিদ্যালয়গুলির নির্মাণকার্যে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকের হাতে ব্যয়িত এবং অপসৃত হয়। স্বার্থসন্ধী প্রকাশকদের যোগসাজসে কমিটির সদস্যদের নির্দেশানুসারে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়। শিক্ষণ, প্রমোশন ইত্যাদি ব্যাপারে কমিটির অনবরত অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে অত্যন্ত নিরুপায় এবং অসহায়ভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে হয়।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে "পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রণীত নিয়মাবলী মান্য করিয়া" ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়, "মৌরসী পাট্টার কোন সুযোগ আইনে নাই", "সকল বিদ্যালয়কেই একটি আইনের মাধ্যমে পরিচালনা করিতে হয়", "সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে সরকার নির্ধারিত হারে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন লইতে হয় এবং সরকার নির্ধারিত স্কেলে শিক্ষকদের বেতন দিতে হয়। ডাইনে বামে ভারসাম্য নষ্ট করিয়া অধিক আয় পকেটস্থ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই" ইত্যাদি। আরও লিখিয়াছেন যে "পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী এবং প্রতি বৎসর অডিটের বাধ্যবাধকতা থাকায় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি যথোচিত উপায়ে বিবেচিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই.....কাজেই অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটির 'খারাপ কাজ করার সুযোগ অসাধারণ' নয়—বরং নাই। কারণ প্রত্যেক স্থানেই জাগ্রত জনদেবতা আছেন—নির্বিবাদে খারাপ কাজ অসম্ভব।"

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিটা সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায় যে, যেখানেই একটা নির্দিষ্ট আইন আছে, সেখানেই কোনরূপ দুর্নীতি অসম্ভব। এই যুক্তিতে স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে যে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, পত্র-পত্রিকায় এবং নেতাদের মুখেও যাহা শোনা যায়, তাহা একটা অলীক কল্পনা অথবা অপপ্রচার মাত্র। কারণ সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধেই তো আইন আছে, অতএব কোথাও দুর্নীতি থাকিতে পারে না! উৎকোচ দান এবং গ্রহণের বিরুদ্ধে আইন আছে, অতএব কেহ ঘুষ দেয়ও না, খায়ও না! কালোবাজারী এবং মজুতদারীর বিরুদ্ধে আইন আছে, অতএব কালোবাজারী অথবা মজুতদারী নাই! সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিধিমত হিসাব পরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে অতএব ভুল হিসাব দেখাইয়া ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিবার অথবা টাকা তছরূপ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না!

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজিং কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচনকারী অভিভাবকদের "বিদ্যাবুদ্ধি"র প্রতি গভীর আস্থা, এবং "জাগ্রত জনদেবতা", আইন-কানুন, এবং শিক্ষকসমাজের প্রতি উচ্ছ্বাসময় শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "লেখকের এই সব অভিযোগ সত্য বলিয়া গণ্য করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে বাংলা দেশে কয়েক সহস্র বিদ্যালয়ে এই প্রকার "ব্যক্তিত্বহীন" প্রধান শিক্ষকদের হাতে আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অর্পণ করিয়াছি। শিক্ষকসমাজ সম্পর্কে বিশেষত প্রধান শিক্ষকবৃন্দ সম্বন্ধে এই জাতীয় মন্তব্য অতীতে কেহ করেন না।"

স্পষ্টই বোঝা যায় যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের মর্যাদাবোধে ঘা দিয়া "বঙ্গদর্শনে"র লেখকের প্রতি শিক্ষকদের বিরূপ করিয়া তুলিয়া নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চান। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অতিশয় আদর্শবাদী, সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি, এবং তাঁহার বিদ্যালয়টিও একেবারেই নিষ্পাপভাবে পরিচালিত। তাহা হইলেও বলিতে হয় যে, তিনি অতিশয় সরল। নতুবা "প্রতিটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি এক-একটি চোরের আড্ডা"—"বঙ্গদর্শন"-লেখকের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি এমন অসতর্কভাবে প্রচলিত প্রবাদটি ভুলিয়া গিয়া স্বয়ং "চোরের সাক্ষী" (অথবা "মাসতুত ভাই"?)-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে এরূপভাবে হাস্যাস্পদ করিতেন না।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আমি প্রথমে বোধ করি নাই। কিন্তু সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতি সংখ্যায় "বঙ্গদর্শন"-লেখক আমাদের শিক্ষাজগতের বিভিন্ন ত্রুটি ও অনাচারের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করিয়া যে উপকার করিতেছেন তাহার জন্য তিনি শিক্ষানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। অতএব পাঠক হিসাবে তাহাকে সমর্থন করা কর্তব্য মনে করিয়াই ইহা লিখিলাম। অবশ্য ইহা খুবই স্বাভাবিক যে প্রত্যেক ম্যানেজিং কমিটিতেই ২।১ জন ভাল মানুষ (innocent) সদস্য থাকিতে পারেন (যেমন শিক্ষকেরাও আছেন)। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আত্মপক্ষ সমর্থনে তবু তাহাই লিখিতেন তবে প্রতিবাদের কিছু ছিল না। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি "শিক্ষা পর্ষৎ" "নিয়মাবলী" ইত্যাদির দোহাই পাড়িয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে প্রত্যেক ম্যানেজিং কমিটিই যেন এক-একটি সাধু সংস্থা। পরিশেষে তিনি "বঙ্গদর্শন"-লেখকের "শালীনতা বোধ" লইয়া কটাক্ষও করিয়াছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়া যাহারা অনাচার করে তাহাদের সম্পর্কে কোনরূপ শালীনতার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কঠিন রোগের কঠিন দাওয়াই প্রয়োজন। "বঙ্গদর্শন"-লেখকের শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা সার্থক হোক, ইহাই কামনা করি।

শ্রীসুবিমল সিংহচৌধুরী
১৬, কুন্ডু লেন, ভবানীপুর, কলিঃ ২৫

* * * *

শ্রীঅনন্ত সিংহের "জালালাবাদ শহীদ দিবস" পাঠে আমার পূর্ব বিশ্বাস, শ্রীসিংহ প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ নন, দৃঢ়তর হলো।

শ্রীসিংহ যদি কূটনীতিজ্ঞ হতেন তবে কমরেড্ মনোরঞ্জন রায়কে চিনতে তাঁর ভুল হতো না।

মার্ক্সইজমের পর লেনিনিজম, তারপর এলো স্ট্যালিনিজম, এবং বর্তমানে সবার ওপর মাও সত্য তাহার ওপর নাই কমরেড রায়গণ এখন 'মাও কথামৃত' পাঠে মনোনিবিষ্ট।

কমরেডগণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো ভিন্ন মতাবলম্বী সমস্ত নেতাদের, মৃত বা জীবিত, চরিত্রহনন, (Character assassination)। মাস্টারদার বিষয়ে অসত্য ভাষণদান করে কমরেড্ রায় তাঁর কর্তব্য সমাধান করেছেন। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

যদি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকি তবে আরও কত মহান ব্যক্তির চরিত্রহননের কাহিনী শুনবো।

যদিও দেহেতে জরা এসে গেছে তবুও মন সজীব, তাই সেনাপতি সিংহকে ধন্যবাদ দিই কমরেড মনোরঞ্জন রায়দের মত লোকের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করার জন্য। —**কুশা রায়, পলতানগর, পোস্ট ঃ এনামেলনগর, ২৪ পরগনা।**

মরা গাঙে বান এসেছে; কিন্তু আসে নি প্লাবন। খেলার মাঠের কেল্লার দিকের উন্মুক্ত স্থানে দর্শকদের জোয়ারেও দেখলাম ভাঁটা পড়েছে। কলকাতা ময়দানের দুই দিক্‌জয়ী দল মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ফুটবলের আসরে নেমে পড়লেও সুর এখনো বে-সুরো লাগছে।

১৯৬৭ সালের ফুটবল লীগের প্রথম হ্যাট্রিক হয়েছে; অব্যাহত আছে দুই প্রধানের বিজয়যাত্রা, কিন্তু পরাজিত হয়েছে কলকাতার ফুটবলের ত্রিশক্তির অন্যতম বি এন রেল দল। ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গল অংশগ্রহণ করেছে দুটি খেলায় এবং মোহনবাগান তিনটি খেলায়। মহামেডান স্পোর্টিং এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দলের খেলায় সবুজ গ্যালারীর অবুঝ দর্শকেরা মাঠের মাঝে ইষ্টক বর্ষণ করে মরশুমের প্রথম গণ্ডগোলের সূচনা করেছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মরশুমের প্রথম খেলায় ২—০ গোলে কালীঘাটকে পরাজিত করেছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানের বিপক্ষে কিন্তু কালীঘাট প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নবাগতের মধ্যে ইণ্ডিয়ান নেভীর প্রাক্তন খেলোয়াড় উচিল এবং পি সরকার ও দুলাল মণ্ডলের খেলা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোল করেন শর্মা এবং সারমাদ খান। দ্বিতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গল সুন্দর ক্রীড়াধারা প্রদর্শন করে ৪—০ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত করে। প্রথম গোল করেন সারমাদ এবং শেষ তিনটি গোল একাই করেন পরিমল দে এবং লীগের প্রথম হ্যাট্রিক লাভের গৌরব অর্জন করেন।

মোহনবাগান পরাজিত করেছে রাজস্থান ক্লাবকে ১—০ গোলে এবং উয়াড়ীকে ২—০ গোলে। কিন্তু মোহনবাগান দলের ক্রীড়াধারা দেখে দর্শকদের মন ভরে নি। গত বছর এই রাজস্থান ক্লাব মোহনবাগানের কাছ থেকে মূল্যবান তিনটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নেবার ফলে লীগ জয়ের সম্ভাবনা মোহনবাগানের নষ্ট হয়। পেনাল্টি সীমানার বাইরে রাজস্থান গোলরক্ষক বল

পরিমল দে

ইংলণ্ডের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এফ, এ কাপ সহ বিজয়ী টটেনহাম হটস্পার দলের কয়েকজন খেলোয়াড়।

শ্রীঅমিতাভ

স্পর্শ করলে রেফারী ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেন। রাজস্থান দলের রক্ষণব্যূহ ভেদ করে তীব্র বাঁ-পায়ের সটের সাহায্যে প্রণব গাঙ্গুলী দলের একমাত্র বিজয়সূচক গোল করেন। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ষোল মিনিটে মোহনবাগানের প্রথম গোল হয়। গুরুকৃপালের কাছ থেকে চুনী গোস্বামী বল পেয়ে কাননকে বল দিলে কানন প্রথম গোল করেন। তেইশ মিনিটের সময় চুনী গোস্বামী উঁচু সট থেকে হেড করে দর্শনীয়ভাবে দ্বিতীয় গোল করেন। এইদিন মোহনবাগান দলে চুনী গোস্বামী, গুরুকৃপাল এবং কানন খেলেন। গুরুকৃপালের নিকৃষ্ট খেলায় দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। গোলে পি বর্মণের খেলা দেখে মনে হয়েছে যে তাঁর ওপর খুব ভরসা করা উচিত নয়।

মহামেডান স্পোর্টিং মরশুমের প্রথম খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে কোনক্রমে মানরক্ষা করে তাঁবুতে ফিরেছে। জর্জ টেলিগ্রাফ প্রথম গোল করে অগ্রগামী থাকে। মহামেডান দল যখন জর্জ দলের গোলের ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছে সেই সময় রেফারীর একটি সিদ্ধান্তে সবুজ গ্যালারীর দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ইষ্টক বৃষ্টি করতে থাকলে ছয় মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ থাকে। খেলা পুনরায় সুরু হলে রামানা গোলটি পরিশোধ করে একটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় খেলায় মহামেডান দল অনায়াসে ৩—০ গোলে পরাজিত করে বালী প্রতিভাকে। লায়োনেল প্রথম দুটি গোল করেন এবং শেষ গোল করেন প্যাপানা।

বি এন রেল দল স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ২—০ গোলে পরাজিত করার পর, পরবর্তী খেলায় এরিয়ান্সের কাছে ১—০ গোলে পরাজিত হয়। এরিয়ান্সের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি করেন কর্পূর ব্যানার্জী।

খেলার ফলাফল ঃ—

এরিয়ান্স ১	উয়াড়ী ১
ইস্টবেঙ্গল ২	কালীঘাট ০
জর্জ টেলিগ্রাফ ১	মহামেডান স্পোর্টিং ০
ইস্টার্ন রেলওয়ে ০	বাটা ০
মোহনবাগান ১	রাজস্থান ০
বি এন রেলওয়ে ২	স্পোর্টিং ইউনিয়ন ০
বালী প্রতিভা ৩	হাওড়া ইউনিয়ন ২
ইস্টবেঙ্গল ৪	হাওড়া ইউনিয়ন ০
জর্জ টেলিগ্রাফ ১	রাজস্থান ০
এরিয়ান্স ১	বি এন রেলওয়ে ০
ইস্টার্ন রেলওয়ে ৩	খিদিরপুর ১
কালীঘাট ০	স্পোর্টি ইউনিয়ন ০
মোহনবাগান ২	উয়াড়ী ০
মহামেডান স্পোর্টিং ৩	বালী প্রতিভা ০

ব্যাটে ব্যর্থতা—বলে সাফল্য

ইংলণ্ডের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্রীড়াধারা দেশে ক্রিকেট রসিকদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। চিন্তা হচ্ছে যে ভারতীয় দল নাকরক্ষা করতে পারবে তো, না ১৯৫৯ সালের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। ভারতীয় দলের ব্যর্থতার কারণ হল মধ্যভাগের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা। ভারতীয় দলের বোলাররা কিন্তু ভালই ফলাফল প্রদর্শন করছেন। মিডিয়াম পেস বোলারদ্বয় সুব্রত গুহ এবং মোহন এবং স্পিনারদের মধ্যে প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর এবং বেদী কৃতিত্বের সঙ্গে বোলিং আক্রমণ চালিয়ে বিপক্ষের উইকেট দখল করছেন। মিডিয়াম

সুব্রত গুহ

পেস বোলারদ্বয় গুহ এবং মোহন ইংলণ্ড সফরে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, কারণ এম, সি, সি-র নতুন আইনে প্যাণ্টে বল ঘষা নিষিদ্ধ হয়েছে। নতুন আইনের এবং স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ার জন্য পাঁচ থেকে ছয় ওভারের বেশি বল সুইং করান অসম্ভব হয়ে পড়ছে, ফলে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন সুব্রত গুহ কারণ তাঁর প্রধান অস্ত্র হল দুই সুইং। মোহন কাটার বোলার এবং বর্তমানে সুব্রত বল কাট করাবার চেষ্টা করছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন। খুবই আনন্দের কথা যে সুব্রত গুহ ওপেনিং বোলারের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালনে সক্ষম হয়েছেন। ইংলণ্ডে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুব্রত গুহ বেশি উইকেট না দখল করলেও অল্প রানে প্রথম জুটিকে প্যাভেলিয়ানে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এখনও ইংলণ্ডে এত ঠাণ্ডা যে বোলারদের দুটি সোয়েটার পরে বল করতে হচ্ছে।

ভারতীয় দলের সফরের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে বৃষ্টি। প্রতিটি খেলাতেই বৃষ্টির উৎপাত। লর্ডসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দল এবং এম, সি, সি দলের খেলাটি ড্র হয়েছে এবং গ্লমারগন দলের সঙ্গে খেলাটির প্রায় দুটি দিন নষ্ট হয়েছে বৃষ্টির জন্য এবং অবশেষে পরিত্যক্ত হয়েছে।

এম, সি, সি-র সঙ্গে খেলায় ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ১৩৪ রান। অধিনায়ক পতৌদির দৃঢ়তাপূর্ণ ৭০ রান উল্লেখযোগ্য। প্রত্যুত্তরে এম, সি, সি প্রথম ইনিংস শেষ করে ২১১ রানে। এম, সি, সি-র ওপেনিং ব্যাটসম্যান মিলবার্ন ৫২ রান সংগ্রহ করার পর সুব্রতর বলে আউট হন। প্রসন্ন এবং বেদী ৪টি করে উইকেট এবং সুব্রত ২টি উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ভারতীয় দল ১০৮ রান সংগ্রহ করার পর বৃষ্টির জন্য খেলা পরিত্যক্ত হয়।

গ্লামারগনের সঙ্গে খেলায় বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন খেলা অনুষ্ঠিত হয় নি, দ্বিতীয় দিন খেলা বিলম্বে শুরু হয়। গ্লামারগন দল আট উইকেটে ১১৭ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রসন্ন মাত্র ২১ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করেন। ভারতীয় দল ৬ উইকেটে ৯৬ রান সংগ্রহ করলে খেলা পরিত্যক্ত হয় বৃষ্টির জন্য।

ইডেনে ফুটবল

এবার কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা ফুটবল খেলা দেখবেন ইডেন উদ্যানে বসে। চ্যারিটি বা বড় খেলাগুলিতে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান মাঠে স্থান সংকুলান হয় মাত্র কয়েক সহস্র দর্শকের। আরও বেশি সংখ্যায় দর্শকের এই খেলাগুলি দেখার

বিষাণ সিং বেদী

সুযোগ করার জন্য আই, এফ, এ-র নব নির্বাচিত সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্য ইডেন উদ্যানে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ইডেন উদ্যানে ফুটবল অনুষ্ঠিত করার জন্য ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এবং ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের সম্মতির প্রয়োজন; আই, এফ, এ সভাপতি এই সম্মতি লাভ সম্পর্কে পূর্ণ আশাবাদী।

ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন উদ্যানের তেমন কোন ক্ষতি হবে না যদি পাঁচ-ছয়টির বেশি ফুটবল খেলান না হয়। সি, এ, বি-র অবহেলার জন্য বর্তমানে ইডেনের মাঠের অবস্থা খুব ভাল নয়। সি, এ, বি কর্তৃপক্ষ যদি সময় মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবে ক্রিকেট খেলার সময় ইডেনের মাঠ পূর্ব রূপ ফিরে পেতে পারে। আই, এফ, এ-র সভাপতিকে ধন্যবাদ, কারণ ইডেনে ফুটবল অনুষ্ঠিত হলে টিকিটের হাহাকার এবং কালোবাজারী অনেকাংশে কমবে।

সেন তদন্ত কমিশনে শ্রীদত্তরায়ের সাক্ষ্য আরম্ভ

ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান ও ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেকসন কমিটির সভাপতি শ্রী এম, দত্তরায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে।

সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে শ্রীদত্তরায় জানান যে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সাংগঠনিক ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব ছিল না, তিনি কলকাতা টেস্টে ছিলেন ভারতীয় দলের ম্যানেজার এবং খেলোয়াড়দের সুখ

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখাই ছিল তার প্রধান কাজ। সিজন টিকিট মুদ্রণ বা বিতরণ সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সম্পাদক শ্রীকোলের; তিনি এই সময় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার খেলা দেখতে গিয়েছিলেন এবং পরে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সিলেকসন কমিটির সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন টেস্ট কেন্দ্র সফরে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর মতে ইডেনের নবনির্মিত কংক্রিট গ্যালারীতে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে।

জেরার উত্তরে শ্রীদত্তরায় জানান যে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ না করলে ১লা জানুয়ারী খেলাটি নির্বিঘ্নেই চলত। তিনি ভারতীয় এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলে সীতেশ রায়ের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য দেখেন নি। আগন্তুক দলের দু'-একজন ভীত-সন্ত্রস্ত খেলোয়াড় ছাড়া ভারতীয় এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের নিরাপদে হোটেলে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা তিনি করেন। ইডেন উদ্যানে টেস্ট খেলা চলাকালে পুলিশী ব্যবস্থার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্তরায় জানান যে আই, এফ, এ-র সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি জানান যে পৃথিবীর সর্বত্রই দর্শকরা বাউণ্ডারী লাইনের ধারে বসে খেলা দেখে এবং কোথাও এটা নিষিদ্ধ নয়। মাঠের ভেতরকার ব্যাপারে কর্তা হলেন দুই আম্পায়ার এবং দুই দলের অধিনায়ক; বাউণ্ডারী লাইনের বাইরে কি ঘটছে তা দেখার দায়িত্ব তাঁদের নয়। তিনি বলেন যে বাউণ্ডারী লাইনের ধারে বসা সম্পর্কে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ অধিনায়ক মিঃ সোবার্স তাঁকে কিছুই বলেন নি।

সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী জানান যে সি, এ, বি স্বীকার না করলেও একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে দর্শকাসনের তুলনায় অনেক বেশি টিকিট বিক্রয় করা হয়েছিল। তাঁর মতে ইডেন উদ্যানে আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ১লা জানুয়ারী গণ্ডগোলের দিন বেলা দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে মাঠে প্রবেশ করে তিনি দর্শক-পুলিশ সঙ্ঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেন এবং অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে প্যাভেলিয়ান থেকে ফোনে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেনাবাহিনী তলব করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন।

সি, এ, বি-র সম্পাদক শ্রী এন, সি, কোলের সাক্ষ্যদান শেষ হয়েছে। শেষ দিন সাক্ষ্যদানকালে তিনি স্বীকার করেন যে সি, এ, বি-র গঠনতন্ত্রে এমন কোন আইন নেই যার বলে একব্যক্তি চোদ্দ হাজার টিকিট বিক্রয় করতে পারে। তিনি বলেন যে পুলিশ বিভাগের জন্য দু'শো টিকিট তিনি হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনারের কাছে প্রেরণ করেন। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রায় তিনশত টিকিট দেওয়া হয়। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ত্রিশখানা টিকিট দেওয়া হয়। কোনও রাজনৈতিক দলকে টিকিট দেওয়া হয় নি, তবে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি টিকিট দেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু দে-কে তিনি কোন টিকিট দেন নি।

মোহনবাগান এবং উয়াড়ী দলের খেলায় উয়াড়ী গোলরক্ষক গুরুকৃপাল সিংয়ের কাছ থেকে একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করছেন।

সমাচার দর্পণ

টটেনহাম হটস্পার ২—১ গোলে চেলসাকে পরাজিত ক'রে ইংলণ্ডের ফুটবল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ সম্মান এফ, এ কাপ জয় করেছে। টটেনহাম দল মোট পাঁচবার ফাইন্যালে উন্নীত হয়ে পাঁচবার কাপ জয়ের সৌভাগ্য অর্জন করল। টটেনহাম এবং চেলসা দলের এই আকর্ষণীয় ফাইন্যাল খেলাটি প্রত্যক্ষ করার জন্য ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে প্রায় এক লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

বাংলার ক্রীড়াজগতে সুপরিচিত শ্রীসরোজ বসু এক বাস দুর্ঘটনায় আহত হবার পর আর, জি, কর মেডিকেল কলেজে মারা গিয়েছেন গত ১৯শে মে মধ্যরাত্রে। অকৃতদার শ্রীসরোজ বসুর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর। বিভিন্ন সময়ে 'সরোজ বসু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব, জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাব এবং এরিয়ান্স ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন আই, এফ, এ-র গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। আমরা শ্রীসরোজ বসুর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

দীনবন্ধু সেন স্মরণে

ঐতিহ্যশালী মোহনবাগান ক্লাবের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এমন বহু নামের মালা গাঁথা আছে, যাঁরা চিরদিন লাভ করে এসেছেন সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, এমনই একজন মানুষ ছিলেন শ্রীদীনবন্ধু সেন। তাঁর দীনবন্ধু নামটি অনেকেই জানেন না, কিন্তু দাঁতিদা নামে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। গত বছরও মোহনবাগান ক্লাবের লনে দেখেছি দাঁতিদার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি।

সত্যকারের খেলোয়াড়ের পূর্ণ সংজ্ঞা কি জানি না, তবে দলের জয় পরাজয় যিনি হাসিমুখে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারবেন তিনিই হলেন সত্যকারের খেলোয়াড়। 'প্লে দি গেম ইন দি স্পিরিট অফ গেম' এই অমর বাণী আমরা শুনেছিলাম আমাদের স্বর্গত প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর মুখে। ট্রু স্পোর্টসম্যান হিসাবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দাঁতিবাবু নেহেরুজীর অমরবাণীকে হৃদয়ের উচ্চস্থানে আসীন করেছিলেন।

উত্তর কলকাতার বাগবাজারের খ্যাতনামা সেনবাড়িতে শ্রীদীনবন্ধু সেনের জন্ম। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় শ্রীমণিলাল সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। বাংলার ক্রীড়াজগতের প্রাচীন ব্যক্তিরা দাঁতিবাবুর পিতা 'মণিলাল সেনের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। বিশেষ করে ক্রিকেটের আসরে 'মণিলাল সেন ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। বহুপূর্বে ক্রিকেটে আণ্ডার হ্যাণ্ড বলের প্রচলন ছিল এবং 'মণিলাল সেনই প্রথম বাঙালী খেলোয়াড় যিনি রাউণ্ড আর্ম বলের প্রচলন করেন।

মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে দাঁতিবাবুদের পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, মোহনবাগান ক্লাবের জন্মের পর থেকেই মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং ক্লাবের প্রথম সভাপতি 'ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন দাঁতিবাবুর মাতামহ। এখানে উল্লেখযোগ্য হল যে মোহনবাগানের প্রথম ফুটবল অধিনায়ক ছিলেন দাঁতিবাবুর পিতা 'মণিলাল সেন।

লাইক ফাদার লাইক সন; অল্প বয়সে শ্রীদীনবন্ধু সেন হয়ে উঠলেন একজন চৌকশ খেলোয়াড়। কি ক্রিকেট, কি ফুটবল, কি হকি সব ক'টিতেই দেখাতে লাগলেন পারদর্শিতা। এমন একজন পাকা খেলোয়াড় হলেও দাঁতিদা কিন্তু ছিলেন মেধাবী ছাত্র। দাঁতিদার কলেজ-জীবন কেটেছে সিটি কলেজে। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সিটি কলেজ দলের ক্রিকেট অধিনায়ক ছিলেন তিনি। দাঁতিদার অধিনায়কত্বে খেলেছেন খ্যাতনামা কার্তিক বসু এবং গণেশ বসু ভ্রাতৃদ্বয়।

দাঁতিবাবুর অগ্রজ শ্রীকানাই সেনও ছিলেন একজন নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড়; মেডিক্যাল কলেজ এবং বাগবাজার ক্লাবে খেলতেন তিনি। দাঁতিবাবু এবং কানাইবাবু যে দলের পক্ষে খেলতেন সে দলের জয় ছিল প্রায় নিশ্চিত। একবার এই দুই ভাই একদিনে দুটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন দুটি খেলাতেই।

১৯২২ সাল থেকে বাংলার হয়ে দাঁতিবাবু বহু ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ

দীনবন্ধু সেন

করেন এবং ক্রীড়ামোদী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। এই সময় কয়েকবছর মোহনবাগান ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বভারও তিনি বহন করেন।

খেলার মাঠ থেকে খেলোয়াড় হিসাবে অবসর গ্রহণ করলেও দাঁতিদা এবার গ্রহণ করলেন ক্রীড়া পরিচালকের ভূমিকা। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল এবং ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগান ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সহকারী সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন থাকলেন এবং ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। ১৯৫৬ সালে দাঁতিবাবু অলংকৃত করেন মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতির পদ এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই পদে।

বাংলাদেশের খেলার জগতের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দাঁতিবাবু। তিনি ছিলেন আই, এফ-এর সহ-সভাপতি বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েসন এবং ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েসন অফ বেঙ্গলের কার্যকরী সমিতির সদস্য, ক্রিকেট এবং হকি আম্পায়ার এ্যাসোসিয়েসন, ক্যালকাটা রেফারীজ এ্যাসোসিয়েসন এবং রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন তিনি। এছাড়া বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

দাঁতি সেন ছিলেন সকল দলাদলির ঊর্ধ্বে, তাই দাঁতি সেনকে শ্রদ্ধা করতেন না এবং ভালবাসতেন না এমন লোক ময়দানে নেই বললেই চলে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে দাঁতিদার কয়েকটি কথা। মোহনবাগান মাঠে লীগ খেলার সুরুতে মোহনবাগানের পঞ্চমবার লীগ জয় করার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, পাঁচবার বা দশবার লীগ জয় করা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ক্রীড়া আদর্শ বজায় রাখা। অবশ্য দল সমর্থকেরা ট্রফি জয়ে আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু তাদের উচিত শৃঙ্খলা, শালীনতা এবং আদর্শ বজায় রেখে চলা এবং মোহনবাগানের সুমহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা। আদর্শচ্যুত না হলে পাঁচবার মোহনবাগান লীগ জয় না করতে পারলেও দুঃখ করার কিছুই নেই।

দীনবন্ধু সেনকে হারিয়ে বাংলার ক্রীড়াজগৎ হারিয়েছে একজন সত্যিকারের খেলোয়াড় এবং দরদী বন্ধুকে।

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২,
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Thursday, 1st June, 1967 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C71
PRICE : 25 PAISE GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

JUN 1967 JUN 1967

মরেস্ক

ন্যারো রীডেড

মরক্কো পিন্‌হেড

রাফকাস্ট

আজকালকার
স্থপতিরা
গৃহনির্মাণে
এইচ পি জি
গ্লাস
ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্ব্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

হ্যামার্ড
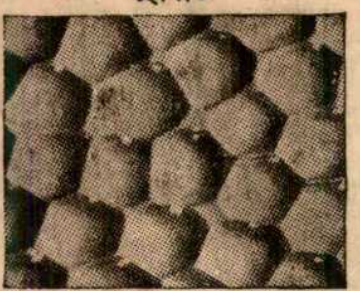

হেক্সাগোনাল ওয়্যারড

শীট গ্লাস

জর্জিয়ান ওয়্যারড

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1775A

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতা মহানগরীর বিগত সপ্তাহের
একটি চিত্রপট

(১) রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের শপথ গ্রহণ

(২) ইন্টালী-বেনেপুকুর এলাকার হাঙ্গামাস্থল পরিদর্শনরত শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী

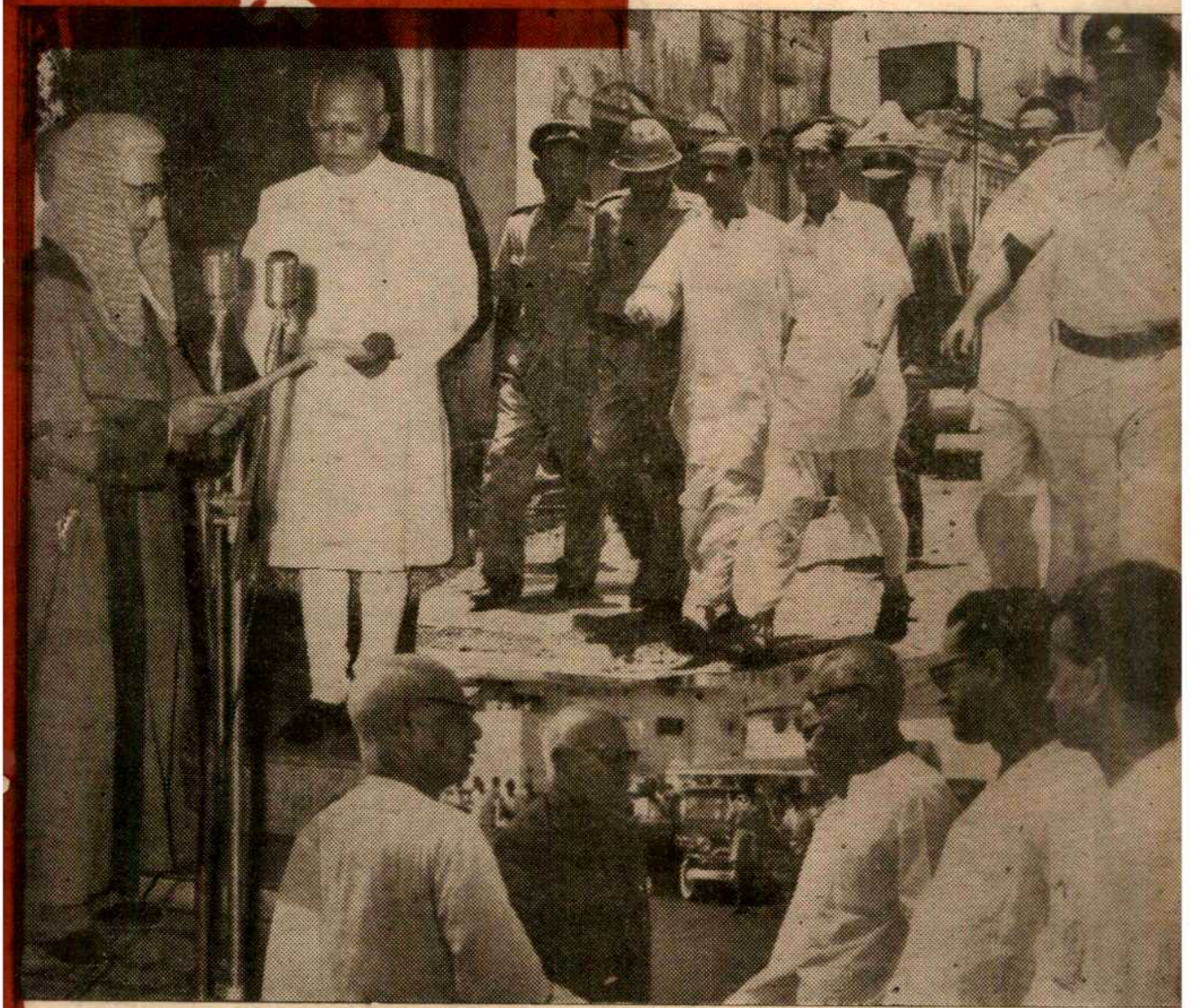

৯ বর্ষ ঃ ৫২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

8th June, 1967 * Vol. 71, No

ছবির মত মুখ যাঁর তাকেই বলি চিত্রময়ী।

ফেমিলো স্নো র

ছোঁয়া পেয়ে সবাই হয়ে উঠল তা-ই।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা

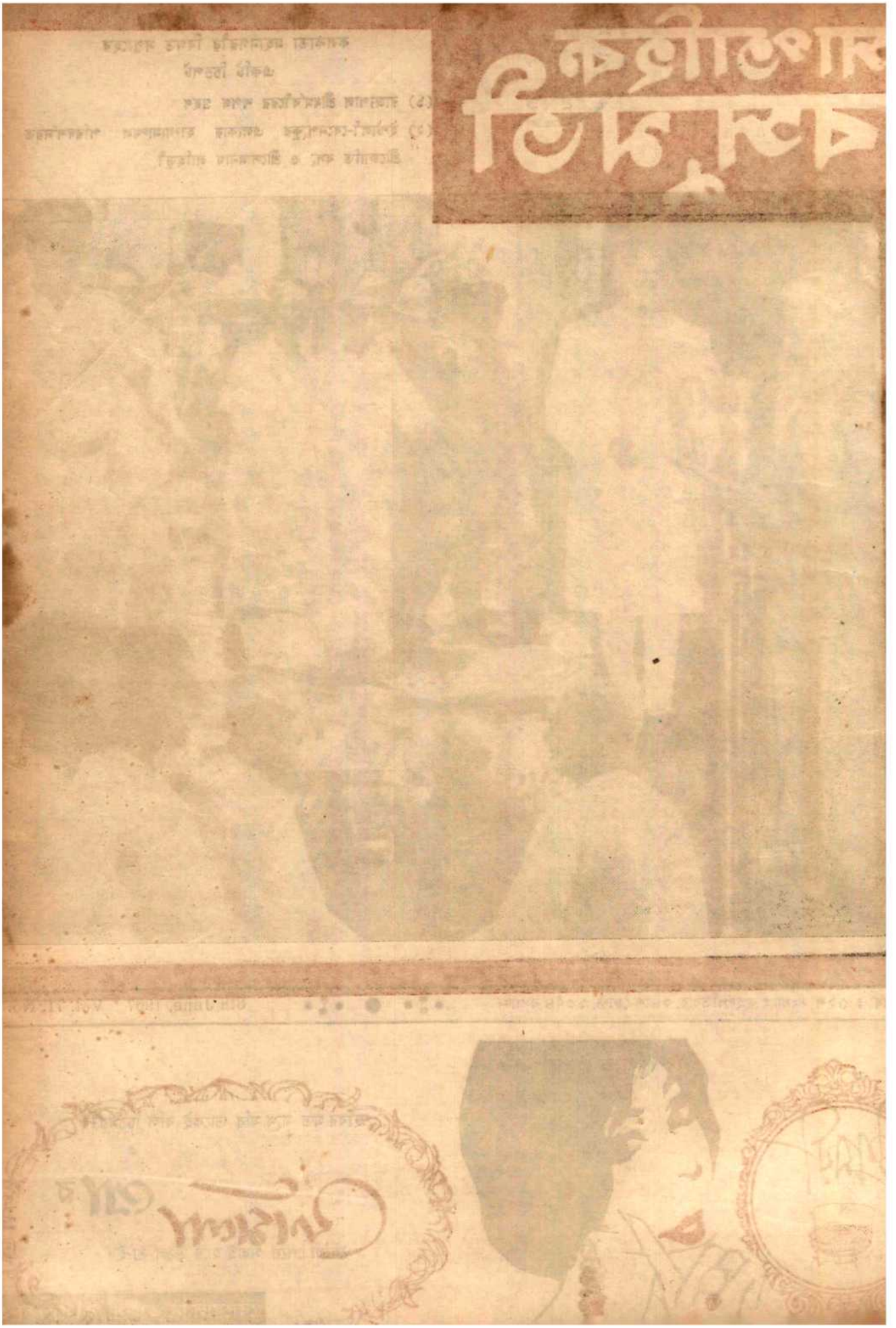

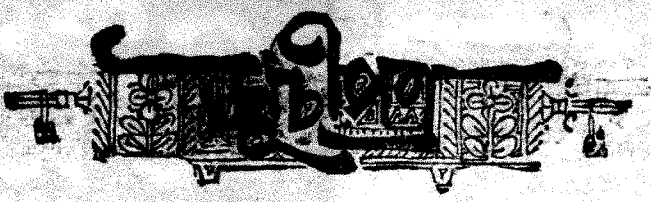

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩২৬৭
আজকের মানুষ		৩২৬৮
ভারতদর্শন		৩২৬৯
আন্তর্জাতিক		৩২৭৩
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	৩২৭৬
পাক-ভারতের রূপরেখা	— প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	৩২৮০
পাঠকমন		৩২৮৬
বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত (ছোট উপন্যাস)	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮৭
বঙ্গদর্শন		৩২৯২

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকানন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য ষোল টাকা

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৭খানি রচনা ৩৪০ পৃঃ—৩৲
২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী—(নাট্যাকারে)

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ঃ দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রবন্ধ	— চন্দ্রগুপ্ত	৩২৯৭
নীল পালক (গল্প)	— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৩৩০১
মেটামরফোসিস (কবিতা)	— অমিয়কুমার হাটি	৩৩০৪
অভিমন্যু (কবিতা)	— রুণু ভট্টাচার্য	৩৩০৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৩৩০৫
তবুও মিছিল চলে (কবিতা)	— মনোরমা সিংহরায়	৩৩১১
রবীন্দ্র রচনাবলী মুদ্রণ	— দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয় দাস	৩৩১২
গ্রামবাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	৩৩১৫
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	৩৩১৯
গ্রন্থমেলা	—	৩৩২০
রঙ্গজগৎ	... ...	৩৩২১
খেলাধুলো	— শ্রীঅমিতাভ	৩৩২৫

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, মুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সুদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)
মূল্য প্রতিখণ্ড ৪·৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৭১ বর্ষ : ৫২শ সংখ্যা—মূল্য : ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 25 PAISE
Thursday, 8th June, 1967

দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ সরকারী সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে ঘাটতি ছিল সাড়ে ছয় কোটি টাকা। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির হার ঘোষণা করেছেন। এই বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হবে সাড়ে এগারো কোটি টাকা।

দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে নিম্ন বেতনের কর্মচারীরা সর্বাপেক্ষা বেশি দুর্ভোগ সহ্য করছেন। পিওন, কেরাণী, শিক্ষকসমাজ দীর্ঘকাল ধরে দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির জন্যে আবেদন করে আসছেন। কিন্তু বিগত সরকার তাঁদের আবেদন-নিবেদনে কোনো দিনই কর্ণপাত করেন নি। যা হোক, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের আবেদনের প্রতি শুধু সম্মান জ্ঞাপনই করেন নি, সাধ্যমতো মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। এর দ্বারা বিপুল সংখ্যক সরকারী কর্মচারী, বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শিক্ষকরাও যথেষ্ট উপকৃত হবেন। ঘাটতি বাজেট সত্ত্বেও রাজ্য সরকার দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই এতো দ্রুত এবং এতো বড় একটা সিদ্ধান্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরাট সদিচ্ছারই প্রমাণ দেয়। অথচ এই সরকার খুব একটা যে সুখে আছে তাও নয়, চারিদিকে বাধা-বিপত্তি, প্রতিক্রিয়াশীল চর-অনুচরদের গভীর ষড়যন্ত্র। নানা সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্যে যখন মাথা ঠাণ্ডা রাখাই কঠিন তখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যথার্থ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং কর্তব্যকর্ম থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করা কঠিন ছিল না। অর্থাভাবের অজুহাত তাঁরা দিতে পারতেন। এই যুক্তিও তাঁরা খাড়া করতে পারতেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির ত্রুটি-বিচ্যুতিই জিনিস-পত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের সাহায্যের দাবি নস্যাৎ করায় তাঁরাও অপারগ। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করেন নি। বলা যায়, দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি করে তাঁরা বিরাট ঝুঁকিই নিয়েছেন। সরকারী কর্মচারী ও বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শিক্ষকদের দুরবস্থা তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন বলেই দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন।

দুর্মূল্য ভাতা যাঁদের বৃদ্ধি পেল, তাঁদের সবাই এই বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে খুশি হোলেও সকলেই সমান খুশি নয়। কারণ সরকারী কর্মচারীদের দাবি ছিল যে তাঁদের মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সমান হওয়া উচিত। তাঁদের এই দাবির ব্যাপারে সকলেই সায় দেবেন। কিন্তু সায় দিতে গিয়ে যদি রাজ্য সরকারের শক্তি, সামর্থ্য ও সাধ্য বিবেচনা না করেন তা হলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা আরো অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও পেয়ে থাকেন, তাও অজানা নয়। আর ঐ সব সুবিধা দেওয়াও প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নতুন নতুন কর বসিয়ে জনসাধারণের পকেটেই হাত দেন কেন্দ্রীয় সরকার। শেষ পর্যন্ত অবস্থা দাঁড়ায় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। যুক্তফ্রন্ট সরকারেব নীতি সেই জাতীয় নয়। তবে অর্থের পথ কেউ যদি দেখাতে পারেন তাহলে রাজ্য সরকার আরো বিবেচনা করতে রাজী আছেন, একথা তো অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন। সে অর্থ লাভের কোনো আশা আপাতত খুঁজে পাওয়া মুস্কিল বলেই মনে হয়।

তবে রাজ্য সরকার বেতনের পরিমাণ অনুযায়ী যে হারে দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি করেছেন তা প্রগতিশীল নীতির পরিচায়ক। বর্তমান দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির ফলে তাঁরাই বেশি উপকৃত হবেন, যাঁদের মাইনে সর্বাপেক্ষা কম। আর একমাত্র তাঁরাই পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের সমপরিমাণ বেতন-সম্পন্ন কর্মচারীদের চেয়ে এক টাকা বেশি —যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ সব কর্মচারী অন্যান্য কিছু সুযোগ পেয়ে থাকেন। অপরপক্ষে বিচার করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মাইনের গ্রেড কিছুটা লাভজনক। তবে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও কলেজ শিক্ষক সমিতি যে গরমিলের কথা বলেছেন, সরকারের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা সহজেই তার মীমাংসা হতে পারে। আর এই ধরণের ত্রুটি আগেই দূরীভূত হোত যদি সরকার এক-একটি সমিতির সঙ্গে এক-একবার আলাপ-আলোচনা করে নিতেন। তার ফলে সরকারী সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে কিছুটা বিলম্ব হতো তাও স্বীকার্য।

আমরা মনে করি, সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমানে কোনো রকম বাদানুবাদ করা অনুচিত। বরং রাজ্য সরকার দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি করে নীতিগতভাবে যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তারই জন্যে সর্বাগ্রে সকলের পক্ষে সাধুবাদ নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। এতে সরকারের নৈতিক বল আরো বৃদ্ধি পাবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জেল খাটাকে যদি মন্ত্রিত্ব লাভের যোগ্যতা বলে ধরা হয়, তবে অর্জুন অরোরার দাবিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই; কিন্তু তিনি মন্ত্রিসভার বাইরে। অথচ আজকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একমাত্র মোরারজী দেশাই ছাড়া আর কাউকে অত দীর্ঘদিন কারান্তরালে কাটাতে হয় নি, অর্জুন অরোরাকে যতদিন কারাভোগ করতে হয়েছে। মন্ত্রিত্ব দূরস্থান, লোকসভা-বিধানসভার সদস্যপদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম স্বত্বেও যেন কর্তাদের অনাগ্রহ। কারণ কী? কারণ, অর্জুন কারো মন যুগিয়ে কথা বলতে শেখেন নি, অর্জুন উপদলীয় কোন্দলের কাদা গায়ে মেখে, পাঁচজন সহকর্মীকে ছোট করে নিজে বড় হতে রাজী হন নি।

কারণ অর্জুন দেশ ও দেশবাসীকে ভালোবাসতে গিয়ে রাজনীতি করতে নেমেছিলেন, নিছক রাজনীতি করার জন্যে নয় গদির লোভে নয়। কিম্বা ঝোঁকের মাথায় বা আন্দোলনস্রোত যেমন আর পাঁচজনকে অনিবার্যভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—সেভাবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে জনতার সঙ্গে তাঁর অনুল্লেখ্য আবির্ভাব নয়, রক্তের টানে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নারায়ণপ্রসাদ অরোরা ছিলেন সেদিন উত্তরপ্রদেশের নামকরা কংগ্রেসনেতা, বৃটিশ শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে যিনি গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় সংগঠন করে বেড়াতেন। বাবাকে দেখেছেন অর্জুন দিনের পর দিন সভা করছেন, সংগঠন করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, বাড়ি সবসময় সরগরম হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আলাপ-আলোচনায়। অর্জুন তখনো ছাত্র মাত্র, কিন্তু অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানানো, প্রয়োজনে নির্যাতন বরণ করে নেওয়া তো তরুণেরই ধর্ম। কারাবরণের মধ্য দিয়ে অর্জুন রাজনীতির দীক্ষা নিলেন।

যুব ও শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন সুরু করলেন অর্জুন। শ্রমিক আন্দোলন করতে এসে, শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হতে গিয়ে অর্জুনের নতুন অভিজ্ঞতা হল। শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে যাঁরা ভেবেছেন, লড়েছেন সবচেয়ে বেশি, সেই মার্ক্স, এঙ্গেলসকে

অর্জুন অরোরা

জানলেন, মার্ক্সবাদ গ্রহণ করলেন অরোরা। কমিউনিস্ট পার্টি যখন উত্তরপ্রদেশে বে-আইনী ছিল, সেই আমলে তিনি দলের প্রদেশ সম্পাদক ছিলেন, বরণ করেছিলেন দুঃসহ নির্যাতন, দেওলি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাঁকে। মুক্তি পেয়ে আবার অরোরা কংগ্রেসে ফিরে এসেছিলেন, ভার নিলেন শ্রমিক আন্দোলনের। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে অনুভব করে তাঁর অন্তরাত্মা খুলেছে। তিনি দেখলেন যে, এই ট্রেড ইউনিয়নটি শ্রমিকদের জন্যে ততটা ভাবে না, যত ভাবে মালিকদের স্বার্থের কথা। বস্ত্র মিল-মালিকদের শোষণনীতির বিরুদ্ধে অর্জুন উত্তরপ্রদেশের সমস্ত বস্ত্রকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সংঘবদ্ধ করলেন। কিন্তু বৃথাই। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নীতি নয়, মালিকদের সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামে নামা, তার নীতি লড়াই-লড়াই খেলা খেলে আপোষ করা। অর্জুন নিজের বিবেকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে সম্মত হলেন না। কংগ্রেস অবশ্যি ছাড়লেন না, মালিকের দালালের ভূমিকা ত্যাগ করলেন।

ঊর্ধ্বতন নেতারা অবশ্যই চটলেন, চটলেন অর্জুনের স্পষ্ট ভাষণ শুনেও। কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যায়কে মেনে নেবেন কেন? স্পষ্টবাদিতাকেই অর্জুন পুঁজি করলেন, চরিত্রবল, নিষ্ঠাবোধ তো রয়েছেই। তাই যেখানেই অন্যায়, অসত্য বা প্রবঞ্চনা রয়েছে সেখানেই অর্জুনকে প্রতিবাদ-মুখর হতে দেখা গেল। খাদ্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভারত সরকারের নির্ভরতা নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এর বিপদ কতখানি। রাজ্যসভার কংগ্রেসী সদস্য হয়েও তিনি কংগ্রেস সরকারকে যেভাবে আক্রমণ করেন, তা অনেক বিরোধী দলের সদস্যদের কাছেও শিক্ষাপ্রদ। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, পৃথিবীর যেখানেই অন্যায়-অবিচার দেখেছেন তারই বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। আফ্রো-এশিয়ার মুক্তি ও সংহতির জন্যে তিনি সংগ্রামরত, তাঁর সংগ্রাম পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে নির্বাসন দেবার তাগিদে। বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের তাই তিনি অন্যতম নেতা।

অর্জুন অরোরা আবার সরব হয়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবসা-লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতিতে পক্ষপাতিত্ব দেখে। তিনি সরাসরি অভিযোগ আনলেন মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্য একটা বিশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী কর্মচারী। এই স্পষ্টবাদিতার জন্যে অর্জুন অনেক নেতারই চক্ষুশূল, ক্ষমতার গদি তাঁকে এগিয়ে দেবে কে? দেশ যেখানে দুর্নীতির কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে অর্জুন অরোরা সেখানে আশার অরোরা বোরিয়োলিস!

আর্জি না-শোনেন
মোরারজী দেশাই

শ্রীমতী গন্ধীর সঙ্গে আলোচনারত শ্রী লালে এল অন্দ

সারা ভারতবর্ষ হাই যাই ক'রে নাভিশ্বাস তুললেও কোন আর্জি টেকে না যাঁর কাছে, তিনি হলেন, শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই। অথচ ইনি কেবলমাত্র উপ-প্রধান নন, দেশের অর্থভাণ্ডারের নীতি-নিয়ামক অর্থমন্ত্রীও। এবং শ্রীযুক্ত দেশাই যখনই ক্যাবিনেটে, সবাই জানেন, বাজেটের দায়িত্বও তিনিই নেবেন। কেন না দেশব্যাপী সমাজতন্ত্র অথবা মৌখিক সমাজতন্ত্রবাদীদের একমাত্র সুস্পষ্ট এবং সক্রিয় প্রতিবাদ হলেন শ্রীযুক্ত দেশাই। সে প্রমাণ তিনি ইতিপূর্বেও যেমন এখনও তেমনিই হাজির করেছেন। অগ্নিমূল্য বাজারে অর্থভুক এবং অনাহারক্লিষ্ট ভারতবাসীর ওপর পরোক্ষ করের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। এর আগে ১৯৬৩ সালে বাজেট পেশ করেন তিনিই এবং তখনও সাধারণ মানুষের কোন আর্জিই মোরারজী দেশাই-এর মরমে আঘাত হানে নি। তিনি গরীবের ওপর প্রত্যক্ষ কর (যদিচ পরিশোধ্য) চাপিয়েছিলেন সি ডি এস করে আর লক্ষ পরিবারকে পথে বসিয়েছিলেন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের খামখেয়ালী দিয়ে, আজ যে দুটি ব্যবস্থা তুলে দিতে হয়েছে।

শ্রীযুক্ত দেশাইকে 'শক্ত মানুষ' বলা হয়। জানি না 'শক্ত' অর্থে 'নির্মমতা'র কোন ইঙ্গিত আছে কি না। তবে তাঁর বাজেট এবং অর্থনৈতিক চিন্তা যে গরীব দুনিয়ার প্রতি মুদিত-চক্ষু ও মমত্বহীন তা' কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শ্রীদেশাই নজেও তা' করেন না। অ-কংগ্রেসী সরকারগুলি কেন্দ্রের সমহারে আপনাপন কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করে কেন্দ্রীয় সাহায্য দাবি ক'রে মোরারজী দেশাই-এর কাছে একটি শক্ত 'না' ধ্বনি উপহার পেয়েছেন। দেশাই তাঁদের প্রদত্ত কোন যুক্তিতেই সায় দেন নি। তিনি স্বীকার করেন না, সকলকে বাঁচতেই হবে এই মানবিক যুক্তি। তিনি স্বীকার করেন না, রাজ্যগুলির আশিভাগ সম্পদের অধিকার কেন্দ্র দখল করে থাকার জন্য রাজ্যের প্রয়োজনে কেন্দ্রকে সাহায্য করতেই হবে। বরং তাঁর অদ্ভুত ধারণা, মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের মত রাজ্যও সমান দায়ী। সেজন্য মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া উচিত এ যুক্তিতে শ্রীদেশাই সারবত্তা খুঁজে পান না। তিনি বরং তাঁর উদ্ভট অর্থনৈতিক চিন্তায় এটাই সার বুঝেছেন যে, দাম যতই বাড়ুক গরীবের হাতে পয়সা না দিলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ফলেই দুর্মূল্য বাজার সুবোধ বালকের মত ঘাড় হেঁট করে নেমে আসবে। অর্থাৎ ভোগবাঞ্ছার গলা টিপে ধরলেই ভোগ্যপণ্যের দর হু-হু করে নেমে যাবে। অর্থাৎ তিনি বোঝেন, যারা ফিটেস্ট নয়, তাদের ওপর দিয়েই ডিমাণ্ড ও সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের নিয়মে ধনবাদী সমাজের মূল্যবন্ধনের কার্যকারিতাটা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব।

শ্রীদেশাই-এর অর্থনৈতিক বয়ান শুনে বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্র শ্রীভূপেশ গুপ্ত বলেছেন, ইজ ইট ইকনমিক্স! এর নামই কি অর্থনীতি!

তাঁর করনীতি ব্যাখ্যা করে শ্রীদেশাই যখন বলেন, চা-এ কি আর এমন কর বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিলো প্রতি মাত্র বার পয়সা। শ্রীগুপ্তের চক্ষু সেই সময় কপালে চড়েছে।

শ্রীগুপ্ত বলেছেন অর্থনীতিটা অমন জলভাত নয়। করের হার অপেক্ষা মূল্যস্তর ঢের বেশি হারেই বাড়ে, আর শুধু করভারাবনত দ্রব্যেই নয়, এক দ্রব্যের ওপর কর চাপলে তার বোঝা অপরাপর দ্রব্যের পিঠেও বর্তায়।

শ্রীদেশাই পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর অঙ্কটা বিপথে পথভ্রষ্ট। তাই যা তিনি গণনা করেন নি তা' হ'ল বার পয়সা হিসাবে এক শত গ্রাম চায়ে এক পয়সার ওপর বাড়তি পড়ছে (যদি ব্যবসায়িকুল বাজেটের দৌলতে প্রতি বছরের মত ফালতু দর বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ না করেন) শ্রীদেশাই-এর স্মরণশক্তিও তীক্ষ্ণ। ধরা যাক তিনি জানেন, এদেশে ট্রাম ভাড়াকে কেন্দ্র করে এক পয়সার লড়াই হয়েছিল রক্তক্ষয়ী। সাধারণ মানুষের কাছে একটি পয়সা শ্রীদেশাইয়ের পরিচিত সমাজের কাছে একশত টাকার মাপ। সুতরাং এক গ্রাম চায়ে সেই অনুপাতে একটা টাকা বাড়ে। শ্রীদেশাই বোধ করি এও অবগত আছেন যে, তাঁর ভারতবর্ষে একটা মানুষের এবং যদি সে একা সংসারের প্রতিপালক হয়, মাসিক মূল বেতন ষাট টাকা থেকে আট টাকাও আছে। এরা ভাতের বিকল্পে চা পান খেয়েও বেঁচে আছে (অদ্ভুত জান বটে! শুনে উনি হয়ত তাই ভাববেন, তবু এটা সত্যি কথা)। এদের কাছে কিলো প্রতি বার পয়সা মোরারজী সাহেবের তাচ্ছিল্যে নগণ্য হয়ে যায় না। আর সেজন্য এদের হাতে দু পয়সা তুলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে যা মোরারজী সাহেব উপলব্ধি করতে নারাজ। তিনি বোঝেন, বেতন কর্তনে মূল্যমান হ্রাস হয়, মুনাফা নিয়ন্ত্রণে নয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত দেশাই এটা বোঝেন না বা বুঝতে চান না যে, যে হারে প্রতি বছর মূল্য বাড়ে পাঁচ দশ টাকা মহার্ঘ ভাতা দিয়ে তাকে স্পর্শ করা দূরে থাক আকণ্ঠ তৃষ্ণার বিন্দু প্রমাণ বারি সিঞ্চনও করা যায় না। তবু ঐ মহার্ঘ ভাতার ভেল্কি চলছে বলেই ওটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অপূর্ব সহন ও বহন শক্তি সত্যিই আমাদের আছে।

শ্রীযুত দেশাই-এর অর্থনীতি বোঝে, সরকারের চাহিদা কত এবং সে চাহিদা পূরণ করতে বাজার থেকে (দেশাই-দর্শনে আটানব্বই শতাংশ নিরন্ন, নিবস্ত্র মানুষের বাজার) কত টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন।

দেশাই অর্থনীতি তাই বলছেঃ "..the 98 per cent of the population who lead sub-standard lives have also to be called upon to pay taxes, though the levy may be indirect."

হ্যাঁ, দেশের আটানব্বই শতাংশ নিম্নবিত্তের ওপর কর প্রদানের আহ্বান জানাতেই হবে, অবশ্য পরোক্ষভাবে। কারণ, ধনীকে মুনাফা উত্তোলনের সুযোগ

দিয়ে তার উৎপাদন করার ইচ্ছে টিকিয়ে রাখতে হলে দেশের আর্থিক চাহিদায় ঘাটতি স্বাভাবিক আর সেজন্যই জাতির প্রয়োজনে গরীবের ওপর কর ধার্য যুক্তি-সংগত। শ্রীদেশাই-এর এমত যুক্তি ভারি প্রাঞ্জল। কিন্তু কেন যে তিনি মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে তার জন্য যে যুক্তি তা বর্তমান দুনিয়ায় হাস্যকর। মূল্য নিয়ন্ত্রণ হলেই ব্যক্তির অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের ওপর হাত পড়বে। ফলত উৎপাদনের ইচ্ছা হ্রাস পেতে পারে, সুতরাং জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শ্রীদেশাই বদ্ধ পুরোনো অর্থনীতির পোকা বাছছেন। অর্থনীতির একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও এই ব্যাখ্যাকে আজ অথর্ব হাবড়া চিন্তা বলেই জানেন। আমরা দুর্ভাগা, তাই জানছি, বিশ শতকের শেষ পাদে আমাদের একজন নির্বাচিত অর্থমন্ত্রী সেই আদিযুগের চিন্তাধারাপুষ্ট হয়ে দেশের অর্থনীতির নিয়ামক হয়ে বসেছেন।

উপায় নেই। তিনিই ভাগ্যবানের

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ

বোঝা বইছেন। সাধারণ মানুষ বইছে উটের বোঝা এবং রাজ্য সরকারগুলিকে বহন করতে হবে রাজ্যের বোঝা।

নিরুপায় রাজ্য সরকারগুলি অতঃপর বোঝা বইবেন বলেও দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছেন। কেন্দ্রের তোয়াক্কা না-রেখেই অধিকাংশ অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারী কর্মীদের মাগ্গীভাতা কেন্দ্রের সমান করে দিয়েছেন। শ্রীযুত মোরারজীর কাছে কোন আর্জিই টেকে নি, তত্রাচ।

পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের সমহার চালু করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে নতুন হার ঘোষিত হয়েছে, তা অভিনব এবং চরিত্রের দিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পথে অভযাত্রী। উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী-দের আসমান-জমিন ফারাকটা মহার্ঘ ভাতার হারে স্বল্প তারতম্য রক্ষার দ্বারা কমিয়ে আনার চেষ্টায় একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শ্রীযুক্ত দেশাই-এর মুখের ওপর এমন করে অট্টহাস্য করাটা বাস্তবিক বৈপ্লবিক। শ্রীদেশাই এই অনিবার্য গতিকে কেমন করে রুখবেন। কী করবেন তিনি এখন! দেশ যে রসাতলে যাচ্ছে। হায়, উৎপাদন, প্রশাসন গোল্লায় গেল। তিনি কেন্দ্রের কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থের গতি করতে পারলেন না, রাজ্যগুলি তাই জোট বেঁধে দুর্গতি রুখতে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। রাজ্যসমূহের অর্থমন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে মোরারজী 'ভাই'-এর কী এখন খুবই একা লাগছে! তিনি রাজ্যের আর্জিতে কর্ণপাত করলেন না, রাজ্যগুলিও তাঁর প্রবুদ্ধ অর্থনীতিকে পাত্তা দিল না। এ শুধু দুর্ভোগ নয়, মোরারজী-ভাইদের কাছে এ যেন দুর্যোগেরই পূর্বাভাষ।

লাইসেন্স

শিল্পে সুবিধা দান করতে গিয়ে কারুকে 'বিশেষ সুবিধা' প্রদান করা হলে যে তুমুল বিতণ্ডা স্বাভাবিক, কংগ্রেস সদস্য শ্রীঅর্জুন অরোরার অভিযোগে তেমনি এক তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল সংসদে। শ্রীঅরোরার অভিযোগ কেবল-মাত্র যে কোন বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাই নয়; কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কেউ কেউ উক্ত শিল্পগোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন বলেও তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। শ্রীযুত দেশাই অবশ্য শ্রীঅরোরাকে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন এবং ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিবেদিত হয়েছে। শ্রীঅরোরা জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে তিনি যথোপযুক্ত প্রমাণও হাজির করবেন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করে একায়িকভাবে কাউকে এই বিশেষ সুবিধা প্রদত্ত হয়েছে কিনা তার তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বারা তদন্ত পরিচালনা করতে স্বীকৃত হওয়ায় রাজ্যসভা পরিতোষের সঙ্গে সে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহমেদ বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেছেন, বিড়লা গোষ্ঠী বা অন্য কারও প্রতি লাইসেন্স প্রদানের সময় বিশেষ লাইসেন্স দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটির মধ্যে কোন সরকারী অফিসার থাকবেন না। কিন্তু বিরোধী পক্ষ যে দাবি করেছেন—তদন্তের জন্য সংসদীয় কমিটি বা তদন্ত কমিশন গঠন —সে দাবি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ এবং শ্রী কে সি পন্থ অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে জানান যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক বাবদ তাঁরা কিছু গ্রহণ করেন নি। শ্রী এস এম ব্যানার্জীর অভি-যোগ ছিল জনৈক ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধেও। বিড়লা-বাড়ি থেকে ইনি বাৎসরিক এক লক্ষ আশী হাজার টাকা কমিশন স্বরূপ পেয়ে থাকেন বলে অভি-যোগে প্রকাশ।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ

লোকসভায় বিতর্ককালীন শ্রীডাঙ্গে সভার স্মরণে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ

জারিলাল নন্দাকেও উপস্থাপিত করেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশজন সংসদ সদস্য বিড়লা-বাড়ির অর্থ নিয়মিত পেয়ে থাকেন বলে শ্রীনন্দা বহু আগেই সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন। শ্রীঅর্জুন অরোরা কংগ্রেস সংসদীয় সভায় সেই অভিযোগেরই পুনরা-বৃত্তি করেছেন মাত্র। তবে শ্রীঅরোরা প্রামাণিক নথিপত্র সহ তাঁর অভিযোগকে আরও সুনির্দিষ্ট করেছেন। আরও চমকপ্রদ অভিযোগ উত্থাপিত হয় শ্রীফারনাণ্ডেজের (এস এস পি) দ্বারা। তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেও এই ঘনীভূত রহস্যের জালে জড়িয়ে আনতে চাইলেন। বললেন, শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর

পদে বসবার জন্য শ্রীযুত জি ডি বিড়লা চেষ্টা করেছিলেন আর সেই প্রচেষ্টার কথা বিড়লাজী নিজমুখে ফারনান্ডেজকেই জানিয়েছেন। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রীফারনান্ডেজের বক্তব্যে মনে হচ্ছে তিনিই বিড়লা-বাড়ির বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আমার সঙ্গে এতো গভীর গোপন তত্ত্ব আলোচিত হয় নি।

ত্বরিত নিষ্পত্তি

বিড়লা-বাড়ি এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রশ্নটির আশু মীমাংসা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। লাইসেন্স প্রদানে পক্ষপাতিত্বের এই অভিযোগে দেশব্যাপী যে সন্দেহ ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে তা যেমন মন্ত্রিসভাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে তেমনিই অভিযুক্ত শিল্প সংস্থার গুড উইলেও আঘাত হানে। তাই কংগ্রেস পক্ষে অভিযোগকালে যাঁরা তারস্বরে চীৎকার করে সভায় প্রতিবাদের ঝড় তোলবার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা গুরুতর প্রশ্নকে ধামাচাপা দিয়ে গণ-সন্দেহকে আরও গভীরেই নিক্ষেপ করেন। তাছাড়া কোনও সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, শ্রীঅর্জুন অরোরাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্যও নাকি তলে তলে চেষ্টা চলছে। এমত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীও একটি ত্বরিত কর্মপন্থা গ্রহণ করে ও যথাযোগ্য তদন্তের ব্যবস্থা করে মন্ত্রিসভার মধ্যে সত্যই তেমন কোন ব্যক্তি আছেন কি না, যিনি দেশের ও দশের ওপর কোন বিশেষ শিল্প সংস্থার স্বার্থরক্ষা করছেন, এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারেন।

গত ৩১শে মের কংগ্রেস সংসদীয় দলের অধিবেশনেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের স্বপক্ষে সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করে যথার্থ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছেন।

সালে এল অব্দ

১৯৪৯ সালে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরূপে নতুন দিল্লীতে প্রথম এসেছিলেন সালে এল অব্দ। তিন বছর অবস্থানের পর তাঁর পুনরায় ভারত আগমন ঘটে ১৯৫৭ সালে। কিন্তু গত সপ্তাহে শ্রীযুত অব্দ ভারতে এসেছেন আরব দুনিয়ার এক সংকটজনক পরিস্থিতির সংবাদ বহন করে প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে। ইজরায়েলের সঙ্গে আরব দুনিয়ার যে সঙ্ঘর্ষ ঘনিয়ে এসেছে, বন্ধুরাষ্ট্র ভারত তারই পরিপ্রেক্ষিতে আরব দুনিয়ার প্রতি জানিয়েছে তার মিত্রসুলভ মনোভাব। শ্রীযুত অব্দ সেজন্য প্রেসিডেন্ট নাসেরের পক্ষে ভারতের প্রতি অকপট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন রাজধানীতে পদার্পণ করে। তিনি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং আন্তর্জাতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চাগলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন। ভারত চায় শান্তি, আরব দুনিয়ার নেতা প্রেসিডেন্ট নাসেরও শান্তি ও সহাবস্থানের সমর্থক। মাঝে থেকে অশান্তির ঝড় ইজরায়েলের সীমান্ত ধরে বইতে শুরু করেছে, পেছনে শক্তিশালী মার্কিন হুঙ্কার।

শ্রীঅব্দ আরব দুনিয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকালে সুয়েজ সংকটের মুহূর্তে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় সমর্থনের কথাও স্মরণ করেন।

(বিস্তারিত আলোচনা 'আন্তর্জাতিক' প্রসঙ্গে দ্রঃ)

রেলভাড়া এবং দুটি ভোট

উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত দুই কংগ্রেসী সংসদ সদস্য শ্রীরাজদেও সিং এবং ডঃ মহাদেব প্রসাদ রেলভাড়া বৃদ্ধির বিপক্ষে ভোট প্রদানের অনুমতি চেয়ে সরকারী হুইপের কাছে পত্র লিখেছেন। ঘটনাটি উল্লেখ্য দুটি কারণে, প্রথমত আপন দলের সরকারের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান প্রায় অনাস্থা জ্ঞাপনের সমতুল্য। দ্বিতীয়ত আপন নির্বাচকবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তাঁদের মত আগ্রহ অন্যত্র বিরল। সাধারণত কংগ্রেসী সদস্যদের সরকারী সমস্ত আবদার ও প্রস্তাবের পক্ষে হাত তোলার অভ্যাস। ইদানীং, বিশেষত ইন্দিরা-মন্ত্রিসভার কাল থেকে এই অভ্যাসের একটা শুভ পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সরকার নিয়মিতভাবে জনগণের ওপর যেভাবে করভারের উৎপীড়ন চাপিয়ে যাচ্ছেন তাতে প্রকৃত জনপ্রতিনিধির পক্ষে সরকারী প্রস্তাবকে সর্বদা সমর্থন জানানো অসম্ভব। কিন্তু এখনো অন্ধ সমর্থকের দাপটেই কেন্দ্রীয় সরকার গণস্বার্থবিরোধী বাজেট পাশ করিয়ে নিয়ে যান। এই অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে উত্তর প্রদেশের দুই সদস্যের উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য তাই সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সরকারকে সর্বক্ষেত্রে অন্ধভাবে সমর্থন জানিয়েই কংগ্রেসের আয়ুষ্কাল সীমিত করে এনেছেন কংগ্রেসী সদস্যরাই। কিন্তু সরকারের যথেচ্ছ কার্যকলাপে যদি তাঁরা স্বাধীন বক্তব্য রাখতে পারতেন তাহলে আজ বোধ হয় কংগ্রেসের গৃহীত নীতিতে ও সরকারের কার্যকলাপে আসমান-জমিন ফারাকটা এতো প্রকট হয়ে উঠত না বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত না। কংগ্রেস সভাপতি এবং অনেক দায়িত্বশীল কংগ্রেসী নেতাকে এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা গেছে। বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে এই প্রসঙ্গও বারম্বার উল্লেখিত হয়েছে। সুখের কথা, হাওয়া বদলাচ্ছে এবং সরকারকেও অতঃপর যথেচ্ছ গণনিপীড়নের মতলব পরিত্যাগ করতে হবে। কংগ্রেসের স্বার্থেই কংগ্রেসীদের আজ শ্রীঅরোরা, ডঃ মহাদেব প্রসাদ, শ্রীরাজদেও সিং-দের পন্থা অনুসরণ করা উচিত কংগ্রেস যদি তাতে দুটো দিন বেশি টিকতে পারে, সদস্যদের স্বার্থ বোধ হয় তার দ্বারাই অধিকতর সংরক্ষিত হবে।

রাজস্থানঃ

নিরুপায়ের উপায় সন্ধান

মাথার ওপর কেন্দ্রীয় যথেচ্ছচারী বাজেটের গুরুভার নিয়ে কোন রাজ্যের পক্ষেই আঞ্চলিক সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, কংগ্রেসী রাজস্থানের পক্ষেও নয়। বাজেট প্রণয়ন এবং উত্থাপনের সময় রাজ্য অর্থমন্ত্রী শ্রীমথুরাদাস মাথুর তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। খরার কবলে এবং জলাভাবের দরুণ রাজস্থান একেই মুমূর্ষু, তার ওপর আছে রাজ্যের অসহযোগী বুরোক্র্যাটিক প্রশাসন এবং টাকার কুমীর আমীর শ্রেণী। অন্য দিকে ক্লিষ্ট

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই।

লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

মূল্য : চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

এবং নিষ্পিষ্ট জনসাধারণ। মথুরাদাসকে এ সমস্তই ভাবতে হয়েছিল। বাজেট প্রণয়নকালে মথুরাদাস ঘন ঘন বৈঠক করেছেন অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে। কিন্তু বৃথাই। প্রশাসনিক কর্তারা বিগত সরকারের আমলেই কোন জনহিতকর কাজে হাত লাগাতে আগ্রহ অনুভব করেন নি। বর্তমানের টলমলে সরকারকে কোন্ পরোয়া। গত বছর রাজ্য সরকার কর্মচারীদের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাঁধা দামে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসকরা আদেশ রূপায়ণের রাস্তা পান নি খুঁজে। রাজস্থানে এক শ্রেণীর ধনী সম্প্রদায় যেভাবে দেশের সম্পদ হরণ করছেন, তাতেও এখনই রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক হালকে শক্ত হাতে ধরার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মথুরাদাসের সামনে সে সুযোগই বা কোথায়।

হাই কমাণ্ডের জনৈক সদস্যের স্থানাস্থ হয়েছিলেন তিনি। প্রস্তাব ছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সম্ভাবনা তৈরি করায়। উত্তর মেলে নি।

অর্থ চাই। কিন্তু কর ধার্য করার স্থান কোথায় আর। অর্থনীতিতে ক্রম হ্রাসমান নিয়মেই আজ জনগণকে শুষে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ কমতে কমতে শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। নয়া সরকারে মথুরাদাস বড়ই অসহায় বোধ করছেন সুতরাং।

এর ওপর এক বিচিত্র অভাবনীয় ঘটনা। রাজস্থানে কংগ্রেসের বেসামাল অবস্থায় কংগ্রেসী সদস্যদেরও বোধ হয় টনক ভীষণভাবে নড়ে উঠেছে। তাই এবার বাজেট বিতর্কে কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দের অনেকের কণ্ঠে সমাজতান্ত্রিকতার পথে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মোরারজী দেশাই-এর বাজেট মাথায় নিয়ে মথুরকে রাজ্যে সমাজতান্ত্রিক গতিবেগ সঞ্চার করতে হলে, তিনি যাবেন কোথায়। সুতরাং কংগ্রেসী রাজ্যে এবার খেলা বেশ জমে উঠেছিল।

দোসরা জুন রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসী কণ্ঠে সেই বিচিত্র দাবি শ্রুত হলঃ সরকারী অফিসারের বেতনে এক হাজারের অঙ্ক ছাড়ালে চলবে না, পুলিশের খরচ কমানো হোক, ডেপুটি সেক্রেটারী এবং ডিরেক্টর পদ অবলোপ করা হোক—পরামর্শ এলো শানওয়ার-লালের (কং) কাছ থেকে। শহুরে আয়ের ওপর একটা সিলিং রাখার পরামর্শ দিলেন শোভারাম (কং)। শ্রীমতী সুমিত্রা সিং (কং) বাজেটকে বললেন কৃষক স্বার্থবিরোধী। রাণী লক্ষ্মীকুমারী তীব্র সমালোচনা করে রুখে দাঁড়ালেন বৃহৎ ব্যবসায়ীকুলকে সুবিধাজনক হারে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যাপারে। তিনি আরও একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন, সরকারের পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হয়েছে জয়পুরের একটি লক্ষকয়েক টাকা মূল্যের জমি চেম্বার অব কমার্সকে দর্শনী এক টাকায় বিক্রি করা।

এস এস পি নেতা জনবিরোধী বাজেটের সমালোচনায় বলেনঃ রাজ্যে যে কুড়ি হাজার অফিসারকে দু হাজার ও ততোধিক টাকা বেতন দেওয়া হয়, পাঁচশ টাকা করে সেই বেতন হ্রাস করলে সাধারণকে করভারে না ডুবিয়ে রাজ্য সরকার বার কোটি টাকার সংস্থান করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লক্ষপতিরা যে ফালতু মুনাফার পর্বত রচনা করেছেন, সরকার তা অধিকার করে নিতে পারেন।

কিন্তু শুকনো দেশে মথুরাদাস কী করবেন। তাঁর কংগ্রেস কি এমনতর কোন 'প্রিসিডেন্ট' রেখেছে যে তিনি জনকল্যাণমূলক বাজেট রচনা করবেন। কর বসানোই বাজেটের একমাত্র করণীয়। তিনিও মহাজনের পথই অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু রাজস্থানের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। ধনীর কবলে রাজ্যটা বিকিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসী সদস্যদেরও সেজন্যই কি টনক নড়েছে। তা সেটাও শুভলক্ষণ। মথুরাদাস আরও একটু চিন্তা করলে ভবিষ্যতে ভালো করতে পারতেন, জনমতের সঙ্গে কংগ্রেসী সদস্যমতও সুর বাঁধছে। মথুরাদাস এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারতেন।

মাদ্রাজ ঃ

হিন্দী ভাষার আধিপত্য

মাদ্রাজ একদিন ভাষা আন্দোলনে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আজকের অকংগ্রেসী ডি এম কে সরকার সেই তীব্র আন্দোলন এবং দক্ষিণীদের আপন ভাষার প্রতি দরদেরই ফলশ্রুতি। সেই মাদ্রাজে পুনরায় হিন্দী ভাষা চাপানোর বিরুদ্ধে ছাত্র-অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে।

কোড়াইকানালে একটি তামিলনাদ ছাত্র সম্মেলনে সমবেত কণ্ঠে দাবি উঠেছে, সংবিধানসম্মত ভারতের প্রতিটি ভাষাকেই অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা দান করতে হবে সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের অংশবিশেষ সংশোধন করে। সংবিধানের এই অংশে হিন্দী ভাষাকেই একমাত্র সংযোগরক্ষী (অফিসিয়াল) ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারীর মধ্যে হিন্দীকে এই বিশেষ সুবিধা ও গরিমায় প্রতিষ্ঠাদানের নির্দেশ রাখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য দেশের অ-হিন্দীভাষী জনসাধারণকে উপেক্ষা করে হিন্দীর এই একতরফা মালিকানা তামিলনাদ নির্বিবাদে মেনে নিতে রাজী নয়। হিন্দীওয়ালাদের সুখধাম রচনার জন্য ভারতবর্ষ শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ধন-প্রাণ পণ করে বসে নি। দু-চারটি ভোটের মেজরিটিকে তাই দক্ষিণীরা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে অক্ষম।

সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ত্রিভাষাসূত্র হিন্দী সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর। সম্মেলনে মাদ্রাজ সরকারকে সেকারণ দ্বিভাষাসূত্র গ্রহণ করে (তামিল ও ইংরাজি) হিন্দীর এই আগ্রাসী দখলী মনোভাবকে রুখবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার মধ্যে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাইও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের দাবি পূরণে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন।

—৩।৫।৬৭

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনায় সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন!

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা

আত্ম-জীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য—দুই টাকা

"এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন"—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী

"একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও কর্মী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।"

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

আন্তর্জাতিক

কায়রোয় সংযুক্ত আরব ও জর্ডানের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান। এই চুক্তিপত্রে সংযুক্ত আরবের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নাসের এবং জর্ডনের পক্ষে রাজা হোসেন সই দেন। এঁদের সঙ্গে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান আহমেদ সুকাইরিকে (বাঁদিকে) দেখা যাচ্ছে

মধ্যপ্রাচ্য ঃ

সঙ্কট আরো ঘনীভূত। পরিস্থিতি এখন চরম পর্যায়ে উপস্থিত। প্রস্তুতির কাজ উভয় পক্ষেই প্রায় সমাধা হয়েছে। কামান যে-কোন মুহূর্তেই গর্জে উঠতে পারে।

এবং লড়াইকে আসন্ন ধরে নিয়েই সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ তাদের কার্যক্রম স্থির করছে। বিদেশী নাগরিকরা যেমন কায়রো ত্যাগের উদ্যোগ করছে তেমনি কায়রোকেও বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, সরকারী ভবনগুলির সামনে-পেছনে ব্যারিকেড রচনা করা হয়েছে বালির বস্তা দিয়ে। প্রেসিডেন্ট নাসের সমস্ত আরব জাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁদের আজ চরম সঙ্কট মুহূর্ত উপস্থিত। ইতিহাসের সেই চরম মুহূর্ত আজ হাজির হয়েছে যখন প্যালেস্টাইনে আরবদের যে-অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা ফিরে পাবার জন্যে পবিত্র যুদ্ধে নেমে পড়তে হতে পারে। প্রেসিডেন্ট নাসের আরো বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং ইস্রায়েলের মিলিত আক্রমণ রুখবার জন্যেই আরবদের এই গৌরবজনক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সংঘর্ষ আসন্ন হয়েছে আরো এজন্য যে, প্রেসিডেন্ট নাসের আকাবা উপসাগরে স্বীয় সার্বভৌম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সমস্ত ইস্রায়েলী জাহাজ এবং সমরোপকরণবাহী অন্য দেশের কোন জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন—ইস্রায়েল তা অগ্রাহ্য করার প্রয়াস পাচ্ছে এবং আমেরিকা-বৃটেনও আকাবা উপসাগরে জাহাজ চলাচলের সকলের অবাধ অধিকার প্রমাণ করতে চাইছে। কিন্তু সংযুক্ত আরবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, আকাবা উপসাগর দিয়ে জোর করে জাহাজ চালানোর চেষ্টা করলে তাকে আগ্রাসন বলে গণ্য করা হবে এবং বৃটেন-আমেরিকা যদি এ-ব্যাপারে নিজেরা বা ইস্রায়েলকে সাহায্য করে তবে তারা সমস্ত আরব দুনিয়ার শত্রু হয়ে থাকবে।

উত্তেজনা আরো বেড়েছে এজন্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে যে আকাবা উপসাগর একটা আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ এবং কোন একটি রাষ্ট্র এ-বারোয়ারী পথ একা বন্ধ করতে পারে না। যেসব রাষ্ট্রের সামুদ্রিক ব্যবসা রয়েছে তাদের মতামত গ্রহণ করার জন্যে আমেরিকা অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছে। এ-ব্যাপারে বৃটেনও যে সমমতাবলম্বী তা প্রধানমন্ত্রী উইলসন ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে সলা-পরামর্শের পর আরো পরিষ্কার হয়েছে।

ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে ইস্রায়েলের সমর্থনে প্রকাশ্যে প্রচার ও প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে। কারণ, মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ভূমধ্যসাগরে এক পায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে, মুহূর্তের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র যে ঘাঁটিগুলিতে রয়েছে তারা ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে যাবে। এডেনে বৃটিশ রণতরীকেও সেজে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে সোভিয়েট রাশিয়াও বন্ধুর বিপদে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে নি। তুরস্কের অনুমতি নিয়ে সে বসফরাস, দার্দানেলিস দিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডেস্ট্রয়ার পাঠাতে সুরু করেছে। বাস্তবিক মধ্যপ্রাচ্যে আজ এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে যেখান থেকে রুশ-মার্কিন সংঘর্ষ বেধে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়!

অবশ্য উত্তেজনা প্রশমনের এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও যে না চলছে তা নয়। ভারতের পক্ষ থেকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন করা হয়েছে। ফ্রান্সের পক্ষ থেকে চতুঃশক্তি বৈঠকের প্রস্তাব করা হয়েছিলো, কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমী শক্তির অভিভাবকত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, সোভিয়েট য়ুনিয়নও ফরাসী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট দু' পক্ষকেই যুদ্ধের কিনারা থেকে সরিয়ে আনার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদে ইস্রায়েলী প্রতিনিধি যে বক্তব্য রেখেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে সে শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। বাস্তবিক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রাণহানিও ঘটেছে। ইস্রায়েল-সিরিয়া সীমান্তে সিরিয়া ও ইস্রায়েলী সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে দু'জন ইস্রায়েলী ও একজন সিরীয় প্রাণ হারিয়েছে। স্বভাবতই এ-ঘটনায় উত্তেজনা উভয় পক্ষেই বেড়ে গিয়েছে। সংযুক্ত আরবের সঙ্গে সিরিয়ার প্রতিরক্ষাচুক্তি ইতিপূর্বেই স্বাক্ষরিত

হয়েছে, এখন হয়েছে জর্ডানের রাজা হুসেনের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের। সে-চুক্তিতে ইরাকও যোগদান করেছে বলে জানা গিয়েছে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আমেরিকা-বৃটেন যদি ইস্রায়েলকে মদৎ না যোগাতো তবে ক্ষুদ্র ইস্রায়েলের ক্ষমতা ছিলো না মিলিত আরব শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবার। আকাবা উপসাগর থেকে সংযুক্ত আরবের অবরোধ তোলার জন্যে ইস্রায়েলের যত না আগ্রহ তার চেয়ে শতগুণ বেশি যেন আমেরিকা-বৃটেনের। তিরান প্রণালীর অবরোধ ভাঙার জন্যে বলপ্রয়োগের প্রস্তাব করে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমর্থনও চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা-বৃটেনের না স্মরণে থাকতে পারে, ইয়োরোপীয় শক্তি-গুলি বিশেষত ফ্রান্স কিছুতেই সুয়েজের অভিজ্ঞতা ভুলতে পারে না। তাই ফ্রান্স সে-প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে আরব-ইস্রায়েল বিরোধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা করেছে। ফ্রান্সের দেখাদেখি ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রও বলপূর্বক অবরোধ প্রত্যাহারের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এ-মনো-ভাবের কারণ হলো, আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব রাষ্ট্র ইস্রায়েলকে সমর্থন জানাবে তাদের তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সে-অবস্থায় তাদের জন্যে সুয়েজ খালের ব্যবহারও বন্ধ করা যায় কি না সংযুক্ত আরব তারও উপায় খুঁজে দেখছে। তেল সরবরাহ বন্ধ হলে ইয়ো-রোপের অবস্থা কি হতে পারে তার কিছুটা নমুনা সুয়েজ সংকটের সময় পাওয়া গিয়েছিল। এখন আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে আরো বলা হয়েছে যে তেল তো বিরুদ্ধচারীদের দেওয়া হবেই না, উপরন্তু বিদেশী তেল শোধনাগারগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের আওয়াজ যে ফাঁকা নয়, তা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন, কাজেই ঝুঁকি নেবার আগে তাঁরা দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি চিন্তা করে দেখবেন।

আমাদের লেখা প্রেসে যাবার সময় সেই মর্মস্পর্শী সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে, ইস্রায়েলী বিমান সংযুক্ত আরবের রাজধানী কায়রোর বিভিন্ন অংশে বোমাবর্ষণ সুরু করে দিয়েছে। দু'পক্ষেই এখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন কি তবে ভিয়েতনাম থেকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থানান্তরিত হলো?

কিন্তু ইস্রায়েল যেন মদমত্ত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইস্রায়েলী প্রতিনিধি সংযুক্ত আরবের আকাবা উপসাগর বন্ধ করে দেবার ঘটনাকে হিটলারের ডানজিগ দখলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং ওই অবরোধ তোলার জন্যে বা ইস্রায়েলের নৌ-চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। ইস্রায়েল জানে যে, তার পেছনে আমেরিকা-বৃটেন তো রয়েছে, পশ্চিম জার্মানীকেও সে পাবে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পেয়েছে এ-ভাবে যে পশ্চিম জার্মানী থেকে সম্প্রতি ২০ হাজার গ্যাস মুখোশ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে।

এ-সংকটের অবসান কোন্ পথে? ১৯৪৮ সালে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির পুনরুজ্জীবন ছাড়া শান্তি ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। ওই চুক্তি ইস্রায়েলই এককভাবে ১৯৫৩ সালে ভঙ্গ করেছে এবং সেই থেকে অগ্রাহ্য করে আসছে। এখন জোর করে ইস্রায়েলকে সে-চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করলেই উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে। (৪।৬।৬৭)

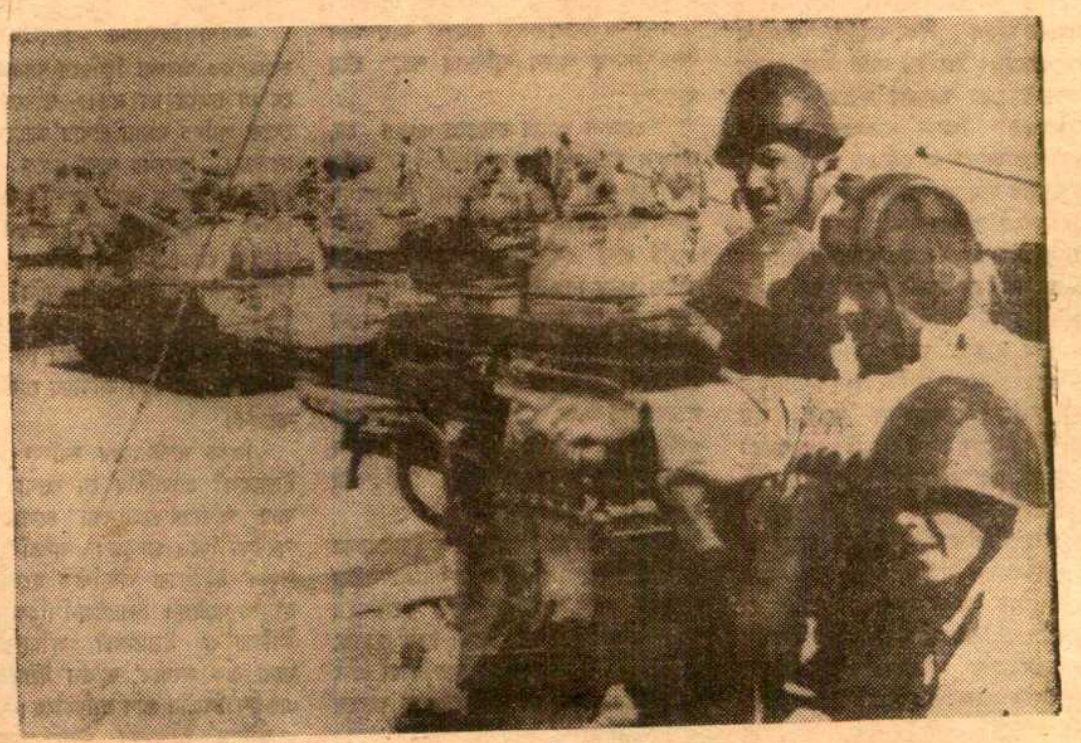

আরব সাধারণতন্ত্র-ইস্রায়েল বাঁসাসে আরব সাধারণতন্ত্রের একজন অফিসার ট্যাঙ্ক বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৯)

আগেই বলেছি একবার ভরা বর্ষায় মা আমাদের তিন ভাই-বোনদের নিয়ে কৈলাস সিং মাউসার তত্ত্বাবধানে নৌকা-যোগে হাসাড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তেলিরবাগ থেকে নৌকা ছাড়বার পর আমরাও হাপুস চোখে কেবল দৃশ্য-বৈচিত্র্য দেখেই বিহ্বল হয়ে পড়ছিলাম। কোথা দিয়ে যে সময় গেল তা কে জানে। তারপর দেখতে দেখতে বিদগাঁও গ্রামে পেঁছান গেল। সেখানে মায়ের আপন বড়পিসি অন্নদার বাড়ি। মায়ের এই পিসিরই ছেলে যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত—আমাদের যোগেন্দ্রমামা—বিয়ে করেছিলেন আমাদের মধ্যের বাড়ির শ্যামাসুন্দরী পিসির বড় মেয়ে প্রমদাদিদিকে যাঁর কথা আগেই বলেছি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার আমরা নৌকা ভাসালাম মামা-বাড়ির পথে। আবার সেই সবুজ ধানক্ষেত। তারপর কত নদী খাল পেরিয়ে চলল নৌকাখানা শাদা পাল তুলে দুলতে দুলতে। বিকেলের দিকে শরীর এলিয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়লাম ছইয়ের ভেতরে মায়ের কোলের কাছে। কোন্ ঘাটে যে নৌকা ভিড়ল, কখন যে পেঁছালাম হাসাড়ার মামাবাড়িতে তা' এখন আর মনে নেই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হলো জলযোগ। সে প্রায় পেট ভরেই ভাত খাওয়া। জাউয়ের গলা ভাত, বিশুদ্ধ ঘি ও আলু, পাকা কুমড়া ও ডাল সিদ্ধ দিয়ে যে কি মুখরোচক হয়েছিল তা' এখনো যেন মনে পড়ে। তারপর মা নিয়ে গেলেন আমাদের তিন ভাই-বোনেদের বাড়ির দক্ষিণের দালানে তাঁর ছোট জ্যেঠামশায় তারক সেনের কাছে। টিপ করে পদধূলি নিয়ে দাঁড়িয়ে একবার তাঁকে ভাল করে দেখে নিলাম। বেশ সুদর্শনই বলে মনে হলো। রঙ ফরসা, গোঁফে একটু পাক ধরেছে। মাঝ বয়সে পেরিয়ে গেছে। ইনি আমার দাদামশায় কৈলাস সেনের যমজ ভাই। এঁরই কন্যা হলেন কুমুদিনী মাসীমা যাঁর কথা আগেই বলেছি। মায়ের নির্দেশে এঁকে "ধন দাদামশাই" বলেই জানলাম। তারপর মায়ের সংগে তাঁর জ্যেঠামশায়ের কথাবার্তা সুরু হলো। আমি নিঃশব্দে সরে পড়ে চলে গেলাম আমাদের ঠাকুরমামা যোগেশ-এর বড় ছেলে শ্যামাপদর কাছে। শ্যামাদাদা আমারই মত ময়লা, দেখতে বেশ প্রমাণ সাইজ লম্বা। শ্যামাদাদার হাতে ছিল একটা গুলতি। তিনি আমাকে 'খোকা আয়' বলে ডেকে নিয়ে চললেন বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনতে। বাড়ির বাইরে ছিল মস্ত বড় চারচালা ঘর—যেটা ছিল তাঁদের বৈঠকখানা ঘর। পাশেই মস্ত বড় পুকুর। বাহির বাড়ি থেকে অন্দর-মহলে ঢুকতে হতো একটা প্রকাণ্ড দেউড়ি পেরিয়ে। এককালে নাকি এই দেউড়িতে থাকত দরওয়ান। আমরা যখন গেলাম মামাবাড়িতে তখন দরওয়ান বলে কাউকে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। দেয়াল দিয়ে ঘেরা অন্দরমহলটা ছিল খুব প্রশস্ত। অন্দরমহলে যতদূর মনে পড়ে তিনটি দালান ছিল। প্রথমে বেশ উঁচু ভিতের উপর একতলা দক্ষিণের দালান। তারপর একটা উঠান পেরিয়ে মধ্যের দালান—এটি ছিল দোতলা। আর একটা উঠান পেরিয়ে ছিল আর একটি একতলা দালান যাকে বলা হোতো উত্তরের দালান। প্রত্যেক দালানের আলাদা রান্না-ঘর। মধ্যের দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল একটা ঢেঁকীঘর। পরে দেখেছি এই ঢেঁকীঘরে ঢেঁকীর পাড় আরম্ভ হলেই কোথা থেকে একটি হাবা ছেলে ছুটে আসত প্রায় উলঙ্গ বেশে এবং ঢেঁকীর তালে তালে নিজের বাঁ হাতের তেলোটার উপরে ডান হাত মুঠি করে একমনে বসে বসে তাল দিত। ঢেঁকীর পাড়ের আওয়াজ পেলে নাকি সে থাকতে পারত না—ছুটে যেত যেখানে সে আওয়াজ হচ্ছে। তার-পরই ছিল একটা খিড়কি পুকুর যেখানে বৌ-ঝিরা যেত বাসন মাজতে। দেয়ালের বাইরে ছিল 'ছিটান' অর্থাৎ যেখানে তিন দালানের আবর্জনা ফেলা হতো।

দক্ষিণের দালানে থাকতেন ধন দাদা-মশায় তারকচন্দ্র সেন। ভাইদের মধ্যে তখন একা তিনিই বেঁচে ছিলেন। তাঁর বাড়ির দক্ষিণে ছিল অনেক ফুলের গাছ। তার মধ্যে একটা যে কামরাঙা গাছ ছিল সেটা খুব মনে আছে কেন না সে গাছে উঠে একটা অঘটন আমার ঘটেছিল। একদিন দুপুরে ধন দাদামশায় যখন ঘুমিয়ে-ছিলেন আমি গুড়ি গুড়ি সেই কামরাঙা গাছে উঠে বেশ রঙ ধরেছে এমন ক'টা ফল পেড়ে যেই না কোঁচড়ে ভরেছি অমনি কোথা থেকে গোটা দুই লাল পিঁপড়ে আমার পেটে ও উরুতে এমন কামড় দিল যে আমি হাত ছুড়ে কেঁদে উঠেই পড়লাম গাছ থেকে। "কেরে" বলে জেগে গেলেন ধন দাদামশায়। আমি ততক্ষণে পালিয়ে পার। কিন্তু ফল হলো যে রাত্রে সেই পিঁপড়ের কামড়ের ব্যথায় আমার এসে গেল দারুণ জ্বর ও যন্ত্রণা। ঐ দালানে আর থাকতেন 'ছোট বউ' অর্থাৎ আমার মায়ের ছোট ভাই যতীনের বিধবা স্ত্রী। ধন দাদামশায়ের নিজের তখন ছেলে ছিল না বলে তিনি তাঁর যমজ ভাই আমার দাদামশায় কৈলাসচন্দ্রের ছোট ছেলে যতীনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভগবানের বিধানে সেই পোষ্যপুত্রটি অতি অকালে মারা গেলেন একটি দুঃখিনী বাল-বিধবাকে রেখে। এই ছোট বউই তখন দেখতেন তাঁর শ্বশুর আমাদের ধন দাদামশায়কে।

মধ্যের দালানটি ছিল দোতলা। তার একতলার প্রবেশদ্বারের কাছে প্রতি সন্ধ্যায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালান হতো একটি পিতলের পিলসুজে। আসনের সামনে দেওয়া হতো একটি পিতলের রেকাবীতে বেশ কয়েক-খানা বাতাসা ও কয়েকটা সাজা পান ও এক গ্লাস জল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে হাত দেবার যো ছিল না। শেষে বউরা যখন মনে করতেন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তখন সেই বাতাসাগুলি

ছড়িয়ে দেওয়া হতো হাররলুটের মত আর আমরা ছোটরা তা' কাড়াকাড়ি করে কুড়িয়ে নিয়ে খেতাম। এই মধ্যের দালানের একতলার দক্ষিণ-পশ্চিম একটা ঘরে থাকতেন মায়ের ঠাকুমা অর্থাৎ বাড়ির কর্তা প্রীতাম্বর সেনের বিধবা পত্নী। অনেক তাঁর বয়েস হয়েছিল এবং তাঁর ডান দিকটা পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছিল বলে তিনি ডান হাত নাড়তেই পারতেন না। বড় ছেলে কালীকিশোরের দ্বিতীয় পত্নী—যাঁকে আমরা 'মা দিদি' বলে ডাকতাম তিনি খুব হাসি-খুশি মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর শাশুড়ির সব কাজই করতেন। তাঁকে স্নান করিয়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়া, তাঁর ময়লা মালসা ফেলা, তাঁর জন্যে রান্না করা—সব কাজই করতেন 'মা দিদি'। এইখানে একটা কথা মনে পড়ছে। এই বৃদ্ধা শাশুড়ির জন্যে 'মা দিদি' মাটির হাঁড়িতে কাঠের লাঠি দিয়ে নেড়ে নেড়ে দুধ খুব ঘন করে জ্বাল দিতেন। বৃদ্ধা বাঁ হাতে খেতেন এবং খাওয়ার পরে খানিকটা ঘন দুধ নিতেন আমরা ছোটরা বসে থাকতাম বাকী দুধটুকু ও হাঁড়ির গায়ে লাগা চাঁছির লোভে তখন কিন্তু ঘেন্না করতো না বৃদ্ধা বাঁ হাতে খেতেন বলে। যাক, যা বলছিলাম 'মা দিদি' তাঁর শাশুড়ির সেবা করেছেন অক্লান্তভাবে ও অতি নিষ্ঠার সংগে যতদিন পর্যন্ত সেই বৃদ্ধা রেঁচেছিলেন 'মা দিদি'র এক ভাই ললিত দাদামশায়ও এই বাড়িতেই থাকতেন ও হাসাড়া স্কুলে পড়াতেন। আর মধ্যের দালানে থাকতেন আমার দিদিমা ও তাঁর সন্তান-সন্ততিরা।

আর একটা উঠান পেরিয়ে উত্তরের দালানে থাকতেন দুই সতীন—মেজ দাদামশায় হরকিশোরের দুই বিধবা পত্নী। বড়টিকে ডাকতাম সোনা দিদিমা আর ছোটটিকে বলতাম নয়া দিদিমা। বড় হয়ে গল্পের বইয়ে পড়েছি যে পতিব্রতা স্ত্রী নিজের ছেলে না হওয়ায় স্বামীর বংশলোপের আশঙ্কায় নিজের স্বামীকেই আবার বিয়ে দিতেন। শুনলাম যে আমাদের সোনা দিদিমাও সেই গল্পের আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রীর মত আপন স্বামীকে নয়া-দিদিমার সংগে বিয়ে দিয়েছিলেন। কথাটার মধ্যে সত্যার্থ নিহিত আছে কি না খোঁজ পাই নি। কিন্তু নয়া দিদিমারও সন্তান হয় নি এবং হরকিশোরের বংশ লোপই পেয়ে গেল। মাঝখান দিয়ে সোনা দিদিমার কপালে জুটল আমরণ সংগী একটি সতীন। তবে এটা বলবই যে দুই সতীনে বেশ সদ্ভাবই ছিল—সমব্যথী বলেই বোধ হয়। এঁরা দুজনে দেখতে ছিলেন একেবারে বিপরীত ধরণের। সোনা দিদিমা ছিলেন ময়লা দেখতে কিন্তু অত্যন্ত স্নেহশীলা মহিলা। নয়া দিদিমা ছিলেন বাঙালী মেয়ের পক্ষে খুবই ফরসা এবং একটু খড়খড়ে। তবে মোটের উপরে বেশ হাসিখুশি। এই দুই সতীনই আমাকে খুব স্নেহ করতেন মায়ের খাতিরে।

আমাদের দিদিমা তখন হাসাড়ার মধ্যের দালানেই ছিলেন। তাঁর গায়ের রঙ একরকম শ্যামবর্ণই বলতে হয়। আয়তনে তিনি ছিলেন না-মোটা না-রোগা—মানান-সই উঁচু ও ছিপছিপে। তাঁর নাকটি ছিল বেশ চোখা। সেই খাড়া নাকের উপর ছিল একটি সরু সবুজ উল্কীর টানা দাগ এবং কপালে ছিল একটি সবুজ উল্কীর ছোট টিপ। চোখ দুটির কালো তারার চারিপাশে ছিল সরু একটি বৃত্তাকার রেখা যা পেয়েছিলেন তাঁর সব ক'টি ছেলে ও মেয়ে। দাঁত মাজতেন দিশী তামাক পাতা পোড়ান ছাই দিয়ে, যার জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর একটি দাঁতও পড়ে নি। তাঁর ছিল চার ছেলে ও এক মাত্র মেয়ে, আমাদের মা। ছোট ছেলে যতীনকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন দাদামশায়ের যমজ অগ্রজ তাই আমাদের ধন দাদামশায়। বাকী তিনজনের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল যোগেশ যাঁকে আমরা ডাকতাম "ঠাকুর-মামা" বলে। তিনি ছিলেন বেশ গোল-গাল ধরণের মানুষ। পড়াশুনা বিশেষ এগোয় নি তবে কবিরাজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। ঠাকুরমামা (যোগেশ) কলকাতায় হ্যারিসন রোড থেকে যে ছোট্ট গলি—ট্যামার্স লেন—বেরিয়েছিল তারই সাত নম্বর ভাড়াটে বাড়িতে দাদামশায়ের প্রাক্তন মুহুরী হালদারমশায়ের সংগে। ঠাকুরমামা কলকাতায় কবিরাজী করতেন। সেই সংগে তিনি মেয়েদের মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল তৈরি করে-মাঝারি সাইজের চ্যাপ্টা শিশিতে ভরে চমৎকার কার্ড বোর্ডের খোলে ঢুকিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। কাটতি মন্দ ছিল না। কিছু বেশি মূলধন ঢাললে একটা ভাল ব্যবসা হলেও হতে পারত। সেই তেলের নাম ছিল 'চন্দন কুসুম তৈল।' বোতলের গায়ে এবং কার্ড বোর্ডের বাক্সটার উপরে চুল খোলা একটি সুন্দরী রমণীর চেহারা থাকত। কেন জানি না, আমার বরাবর ধারণা ছিল যে ওটা আমাদের বড় মামীরই প্রতিকৃতি। বস্তুত আমাদের 'ঠাইনমামী' সুন্দরীই ছিলেন। খুব ফরসা রঙ, সুন্দর কালো চুল এবং ছিপছিপে লম্বা স্ত্রীলোক তিনি ছিলেন। শুনেছি মেজাজটা তাঁর একটু রুক্ষই ছিল। সেটার জন্যে কে দায়ী কে জানে।

ঠাকুরমামার ছিল চার ছেলে—যথাক্রমে শ্যামাদাদা, বাসু (অনন্ত), বোচা (বিজয়) ও গোপাল। শ্যামাদাদা ও বোচা এখন বেঁচে নেই। বাসু আছেন আসামের তিনসুকিয়ায় এবং গোপাল ডাক্তারী করছেন স্বারভাংগায়। ঠাকুরমামার দুটি মেয়ে—বড়কী (সুবলা) ও ছুটকী (অমিয়া)। বড়কী দিদির বিয়ে হয়েছিল বানরি গ্রামের উপেন্দ্র সেনগুপ্তের সংগে যাঁকে আমরা বলতাম 'স্যানঠাকুর'। এ রকম চমৎকার লোক খুব কমই দেখা যায়। একবার যখন হিন্দু মুসলমানের দাংগা চলেছে হঠাৎ তখন স্যানঠাকুরের সংগে দেখা হলে যেমন বলতে হয় তাই বললাম—'স্যানঠাকুর কেমন আছেন?' তিনি সহাস্যমুখে বললেন—'মোটের উপর ভালই।' পরে জানলাম যে মুসলমানেরা তাঁর দেশের বাড়ি ক'দিন আগেই জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তারই ক'দিন আগে তাঁর বড় ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় গেছে। পরে আরো জানা গেল যে ছেলেটি গিয়েছিল ঢাকায় মুসলমানদের সংগে মারামারি করতে। সেই ছেলেটি পরে বড় হয়ে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে ফৌজে ঢুকেছিল কমিশন পেয়ে। সে তার সেনাদলের সংগে মিশরে যায়। সেখানে জার্মান জেনারেল রমেলের বাহিনীর সাথে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তার বাপ, মা ও বালিকা বধূটিকে দুঃখ সাগরে ভাসিয়ে কোথায় সে ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গেল। বড়কী দিদি ও স্যানঠাকুর উভয়ের দৃঢ় ধারণা ছিল যে তাদের ছেলের খোঁজ একদিন আসবেই। আহা, বৌটিও হয়ত তাই ভেবেই মনকে শান্ত করেছেন। বধূমাতার সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও মন মরা হয়ে বড়কী দিদি ও স্যানঠাকুর ইহলোক হতে চলে গেছেন। ছুটকী ছিলেন আমার চেয়ে কয়মাসের ছোট। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হাসাড়া গ্রামেই। কলকাতা হাইকোর্টের নাম করা উকিল রমেশ সেনের ভাই গুণেশের সংগে তাঁর বিয়ে হয়। গুণেশ আলিপুরে ওকালতী করে বেশ পশার করেছিলেন।

মেজমামা (বঙ্কিম) ও সেনামামা (অতুল) তখন হাসাড়ায় ছিলেন না। তাঁরা সপরিবারে বোধ হয় তখন ঢাকাতেই ছিলেন। মেজমামা ছিলেন বেশ ফরসা। তিনি তাঁর বাবার রঙ পেয়েছিলেন। দোহারা চেহারা। দাড়ি গোঁফ কামান, দেখতে সুদর্শন। তাঁর ছেলেপিলে ছিল না। বোধ হয় এফ-এ, পর্যন্ত পড়েছিলেন। সোনামামা অতুল ছিলেন কালো কিন্তু তাঁর মুখ চোখ বেশ সুন্দর ছিল। চোখ দুটি যেন জ্বল জ্বল করত। তিনি এনট্রান্স পাশ করে ঢাকাতে আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে ওভারসিয়ারী পাশ করেছিলেন। পরে তিনি ও মেজমামা দুজনে মিলে কনট্রাকটারী কারবার করে ঢাকার রমনায় বিশির ভাগ নতুন

বড় বাড়িই তৈরি করিয়ে ছিলেন। সোনা-মামার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে ছিল একটি ছেলে (প্রতুল) ও একটি মেয়ে যার ডাক নাম ছিল বুচুনী। ভাল নাম ভুলে গেছি। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর সোনামামা আবার বিয়ে করেছিলেন এবং সেই বিয়েতে সন্তান হয়েছিল বেশ কটি অরুণ, অমল, কমল ওরফে দুর্গাশঙ্কর ও বিভু। মেয়ে ছিল—ছোট বুচুনী, কাজী, লিলী ও যুঁই। এদের সঙ্গে আমাদের বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মায়ের জন্যে। প্রথম পক্ষের মেয়ে বুচুনীর বিয়ে হয় আমাদেরই হাজরা রোডের বাড়িতে মায়ের আনুকূল্যে। কমলের সঙ্গে আমাদের যাওয়া আসা এখনো আছে। খুব স্নেহপ্রবণ ছেলে কমল। এখনো সর্বদা আমাদের খোঁজখবর নেয়। কমল বেশ হাসিখুশি ছেলে। তার বাপের অনেক গুণ দেখি সে পেয়েছে। আমাদের সোনা-মামাকে মা খুব স্নেহ করতেন। সোনা-মামাও আমাদের খুব ভালবাসতেন। সোনামামার গানের গলা ছিল বেশ ভাল। তিনি আমাদের অনেক কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। একটা ছড়া ছিল আকার ইকার ও যুক্ত অক্ষর বিহীন। তার দুটো লাইন এখনো মনে আছে—

'খরতর বর শর হত দশ বদন,
খগচর নগধর ফণধর শয়ন।'

সোনামামারও মায়েরই মতন অম্বলের ব্যারাম ছিল।

হাসাড়ায় পেঁছিবার প্রথম দিনই পরিচয় হোলো আর দুটি লোকের সঙ্গে। প্রথম জনের নাম নিশিকান্ত চক্রবর্তী। তিনি মামাবাড়ির পুরোহিত বংশের সন্তান এবং তিনি মামাবাড়ির দেয়ানজীও ছিলেন। বেশ মোটাসোটা চেহারা, গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের বেশ লম্বা মালা। পরিষ্কার যজ্ঞোপবীত বাম কাঁধ থেকে বুকের উপর দিয়ে ডান হাতের তলা দিয়ে সমস্ত দেহটাকে যেন বেঁধে রাখত। আমাকে দেখেই হেসে বললেন—'কি, যদু আইছ?' মার মুখের দিকে তাকাতেই মা বুঝিয়ে দিলেন যে তেলিরবাগের দাশেরা যদুনন্দনের সন্তান কি না তাই সেই ডাক। নিশিমামা আমাকে বরাবরই আদর করে ডাকতেন 'যদু'। অপর জন ছিলেন মতিলাল চক্রবর্তী। অতি মৃদুভাষী সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শ্যামাদাদার গৃহ-শিক্ষক। তিনি তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে আমাদের মামাবাড়িতেই থাকতেন ও স্বপাক খেতেন। তিনি হাসাড়া স্কুলেও মাস্টারী করতেন। হাসাড়া গ্রামের হাই-স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন আমাদের বড় দাদামশাই কালীকিশোর। তাঁর নিজ অর্থ ব্যয়েই স্কুলটি চলত। সেই দাদামশায়ের নামেই স্কুলের নামকরণ হয়েছিল। বেশ উঁচু ডাঙা জমির উপরে বড় বড় কলাগাছ ঘেরা পুকুরের একদিকের পাড়ে বেশ সুন্দর স্কুলঘরগুলি এখনো মনে আছে। তখন হেড মাস্টারমশায় ছিলেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী। আমার মায়ের অনুরোধে আমরা যে সময়টা হাসাড়ায় থাকব সেই সময়টার জন্যে হেড মাস্টারমশায় আমাকে হাসাড়ার কালীকিশোর হাইস্কুলে ভর্তি করে নিলেন। বাড়িতে শ্যামাদাদার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মতিবাবুর কাছে পড়ার ব্যবস্থা হোলো। সেই স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার সময় আমি নাকি ভালই পাশ হয়েছিলাম। শোনা কথা মাত্র।

সেইবারেই শ্যামাদাদার সঙ্গে আমার যে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ হোলো সেই আলাপই আমাদের বজায় ছিল শ্যামাদাদার মৃত্যু পর্যন্ত। মামাবাড়িতে গোসাপের যে প্রাচুর্য দেখেছি সেবার তা আর কোথাও কখনো দেখি নি। আমাদের তেলিরবাগ গ্রামে বড় একটা গোসাপ দেখি নি। গোসাপ দেখতে ঠিক একটা প্রমাণ সাইজ মেছো কুমিরের মত। খালি জিভটা তার সাপের জিভের মত দুই ভাগে চেরা। শুনেছি এখন নাকি গোসাপ তেমন আর নেই, কেননা সেগুলির চামড়ার দাম বেশি হওয়ায় সেগুলিকে মেরে মেরে একবারে নির্মূল করে দিয়েছে চামড়ার ব্যবসায়ীরা। দুজনে এক সঙ্গেই বসতাম বৈঠকখানা ঘরে মতিবাবুর তক্তপোষে পড়া শেখবার জন্যে। কিন্তু সে নাম মাত্র পড়া। মতিবাবু শ্যামাদাদাকে তেমন শাসন করতে পারতেন না। পারলে তা যে শ্যামাদাদার পক্ষে কল্যাণেরই কারই হোতো তা পরে বুঝেছি। বড়লোকের বড় নাতি বলে শ্যামাদাদা একটু আদুরেই ছিলেন এবং তাঁর ভাগ্যে বকাবকিটা বোধ হয় যথেষ্ট হয় নি। ফল হোলো শ্যামাদাদা এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। তিনি পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় মামাদের বাসায় থেকে মোজা গেঞ্জীর কারখানায় কলে মোজা গেঞ্জী তৈরি শিখেছিলেন। তারপর কলকাতায় ঘড়ির দোকানে ঘড়ি মেরামতের কাজও কিছুদিন শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর হাত খুব ঘামত। সেই জন্যে হাতের কাজ করবার অসুবিধে হোতো বলে মোজা গেঞ্জী তৈরির ও ঘড়ি মেরামতের কাজ বেশিদিন করলেন না। আসল কথা হোলো এই যে শ্যামাদাদা কোনো কাজে লেগে পড়ে থাকতে পারতেন না। অধ্যাবসায়ের বেশ অভাবই ছিল। মাঝে মেজমামাদের কনট্রাকটারী কাজে মিস্ত্রীদের কাজের তত্ত্বাবধানও করেছেন কিছুদিন। শ্যামাদাদার কৃতিত্ব ছিল বহুমুখী। শ্যামাদাদা ছিলেন গুলাইল ছুঁড়তে অদ্বিতীয়। ঝোপে ঝাড়ে কাদায় মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া গোসাপগুলির দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঢিল শ্যামাদাদার মত আর কাউকে ছুঁড়তে দেখি নি। বাঁশি বাজাতে পারতেন চমৎকার। তারপর কলে মোজা গেঞ্জী তৈরি করা এবং এক চোখে একটা চোঙা দিয়ে ঘড়ি মেরামতের কাজ—একাধারে এত গুণের সমাবেশ বড় একটা সহজ ব্যাপার নয়। সেই শিশু বয়স

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

থেকেই আমি শ্যামাদাদার যে ছায়ার মতন হয়ে গেলাম, সে মোহ আমার চলেছিল বহুকাল। শ্যামাদাদাও হাতের কাছে একটা ভক্ত চেলা পেয়ে বেশ প্রসন্ন হয়ে পড়লেন আমার উপর। আমার প্রতি এই স্নেহ-সম্পত্তি শ্যামাদাদার ছিল মৃত্যু পর্যন্ত।

এইখানে একটা ঘটনা বলে রাখি যদিও তা ঘটেছিল অনেক পরে। শ্যামাদাদার বিয়ে স্পষ্ট মনে আছে। আমি যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় মিত্র ইনসটিটিউশানে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি সেই সময় একই সঙ্গে সোনামামা ও শ্যামাদাদার বিয়ে হয় ঢাকায়। মামারা তখন ঢাকায় থাকতেন। চওড়া নবাবপুরের বড় রাস্তাটা যেখানে রেল লাইন পেরিয়ে পল্টনের মাঠের পাশ দিয়ে রমনায় চলে গেছে সেই রেল লাইনের লেভেল ক্রসিংয়ে পেঁছবার খানিকটা আগে নবাবপুর থেকে ডাইনে একটা গলি বেরিয়েছিল সেই গলির একটা বাড়িতে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। রাস্তাটার নাম মনে নেই। শ্যামাদাদার সঙ্গে যাঁর বিয়ে হোলো সে মেয়েটি আমারই বয়সী কিম্বা হয়ত একটু ছোটও হতে পারেন। নামটি তাঁর মনোরম। সার্থক রাখা হয়েছিল সে নাম, কেননা আমাদের সে বৌঠানটি সত্যিই মনোরমা ছিলেন এবং আজও আছেন। চমৎকার ফরসা তাঁর গায়ের রঙ, পাতলা ছিপ-ছিপে তাঁর গড়ন। চোখ দুটিতে কেমন কোমল একটি চাহনী ছিল যা মনকে স্নিগ্ধ করে দিত। আমার বেশ মনে আছে এবং এখন ভাবলেও হাসি পায় যে শ্যামাদাদার বিয়ের সময় আমি এই বৌঠানটিকে উপহার দিয়েছিলাম একখানা 'ঠাকুরমার ঝুলি'। ঐটুকু মেয়েকে আর কিই বই-ই বা দেওয়া যায়। সেই যে বছর বার বয়সে হাসাড়ার সেন পরিবারে এই কন্যাটি এলেন সেই থেকে তিনি তাঁর শ্বশুর কুলের সেবা করেই চলেছেন মুখ বুজে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি জীবনে কষ্টও পেয়েছেন ঢের। বড় ছেলেটি অকালে চলে গেল। টানাটানির সংসারের সকল কর্তব্য পালন করে চলেছেন এই নম্র মধুর স্বভাবা, সাধ্বী রমণী, আমাদের বৌঠান মনোরমা।

সেবার যখন মামাবাড়ি গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে এবং বেশ কিছুদিন ছিলাম তখনকার দুটি পূজোর কথা আমার মনে আছে। একদিন শ্যামাদাদা বললেন—'কাকা, চল।' আমি ত' এক পায়ে খাড়া। গেলাম দাদার সঙ্গে অনেক দূরে গ্রামের বসতি অঞ্চলের বাইরে বনের ধারে। বেশ চমৎকার জ্যোৎস্না রাত। দূর থেকে আলো দেখতে পেয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ঐখানে কি হৈতেছে।' শ্যামাদাদা বললেন—'দেখবি অখন'। কাছে গিয়ে দেখি একটা বেশ বড় ধরণের পূজা-মণ্ডপ। দাদা ফিস ফিস করে বললেন—'বনদুর্গা পূজা'। প্রতিমাখানা প্রকাণ্ড—দুর্গা প্রতিমারই ধরণের। কিন্তু যেমন বীভৎস চেহারা বনদুর্গার তেমনি বিশ্রি চেহারা তাঁর চারটি ছেলে মেয়ের। তাদের নাম শুনলেই আঁৎকে উঠতে হয়। একটি ছেলের নাম "গাবুরদলন" অর্থাৎ তিনি জলে কাদায় ধামসিয়ে বেড়ান। বোধহয় গোবর গণেশই হবেন। লাল চোখ, যেন ফাউকে ধরতে পারলে তার আর রক্ষা নেই। অন্য ছেলেটির নাম "মোছড়াসিং" অর্থাৎ কার্তিকের ক্যারিকেচার। মেয়ে দুটির চেহারা এমন হিংস্র যে দেখলেই ভয় করে। একটি মেয়ের নাম দানো চ্যাঁচানী—সরস্বতীর পাশবিক জুড়ি। অন্যটির নাম ভুলে গেছি। ঢোলের বাজনাও বাজছিল ভীষণ জোরে। অর্থাৎ যেমন বীভৎস দেবতা তেমনি ভয়াবহ সমস্ত পরিবেশটি। আমি সেদিন বাড়ি ফিরে এসে তবে নিশ্চিন্ত হলাম। প্রতিমা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। এরই কিছু পরে শ্যামাদাদা একদিন বললেন—'খোকা, আয়।' ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি—অনেকটা পথ চলে নির্জন পোড়ো একটা জায়গায় দেখলাম বেশ লোক সমাগম হয়েছে। শ্যামাদাদা বললেন—'শ্মশান কালী'। এতবড় উঁচু প্রতিমা আমি জীবনে কখনো এ পর্যন্ত দেখি নি। কালী-মূর্তির মাথার মুকুট যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। জিভ লক লক, সংহারমূর্তি। এর মধ্যে ভাব যাই থাক ভয়ে আমার গা শিউরে উঠেছিল। এর পরে আর কখনো বনদুর্গা পূজা কিম্বা শ্মশান কালীর পূজা দেখি নি।

এরই কিছুদিন পরে শোনা গেল আমাদের ধন দাদামশায়ের বিয়ে। ধন দাদামশায়ের প্রথমা পত্নীকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁর মেয়ে কুমুদিনী মাসীমা মায়ের চেয়ে একটু বড়ই হবেন। তবে ধন দাদামশায়ের আবার বিয়ে কেন? শ্যামাদাদা বিষয়টা জলের মতন বুঝিয়ে দিলেন। ধন দাদামশায়ের ছেলে নেই। ছেলে না থাকলে মরলে কে জল দেবে? সে জন্যে তিনি আমাদের ছোট মামা যতীনকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। সেই ছেলের বিয়েও হয়েছিল। সবাই ভাবল যে ধনদাদামশায়ের বংশটা রক্ষা পেল। ভগবান আড়ালে বোধ হয় হেসেছিলেন। সেই পোষ্যপুত্র একটি বাল বিধবা পত্নী রেখে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলেন। আমাদের সেই ছোট মামীর সারাটা জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। ধন দাদামশায়কে গ্রামের মাতব্বরেরা পরামর্শ দিলেন আবার দার-পরিগ্রহ করে সংসারী হতে। সেই পরামর্শ মতে পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণের আশায় ধন দাদামশায় আবার বিয়ে করতে রাজী হলেন। মেয়ে দেখা হোলো এবং দিন ক্ষণও ধার্য হোলো। ধন দাদামশায়ের বয়স অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছিল। সেই জন্যে বর সেজে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বিয়ে করাটাতে বোধ হয় একটু কিন্তু কিন্তু লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোলো যে মেয়েটিকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আনিয়ে বরের হাসাড়ার বাড়িতেই তার বিয়ে হবে। আমরা ছোটরা বাড়িতে বিয়ের আয়োজন দেখে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। দিন গুণতে লাগলাম। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় ডুলিতে করে কন্যাকে নিয়ে আসা হোলো। পরের দিন অর্থাৎ বাংলা ১৩০৭ সালের ফাল্গুন মাসের এক শুভ লগ্নে ধন দাদামশায়ের বিয়ে হোলো সুধাংশুবালার সঙ্গে। ধন দাদা-মশায়ের বোধ হয় বয়স হয়েছে পঞ্চাশোর্ধ্বে এবং তাঁর নববধূর বয়স বিশের কোঠায় পেঁচেছে কি পেঁছায় নি। আমার বয়স তখন পুরো ছয় বছর পাঁচ মাস, খুকীর বাড়ে চার কি পাঁচ। এবং গুণুর বয়স হবে বছরখানেক। আমার মনে নেই, তবে শুনেছি যে আমাকে নাকি ধনদাদামশায়ের পাশে একটা পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল নিতবরের মত সাজিয়ে গুজিয়ে। একটা জিনিষ একটু একটু মনে আছে। বিয়ের রীতি অনুসারে বিবাহের সভায় রূপোর যে থালাখানায় চন্দন, ধানদূর্বা ইত্যাদি রাখা হয় সে থালাখানা সভায় উপস্থিত যিনি কুলীনশ্রেষ্ঠ তিনিই পেয়ে থাকেন। কে যেন মনে নেই, আমাকে শিখিয়ে দিল এ থালাটা আমারই প্রাপ্য। আমি খপ করে গিয়ে সেটা দখল করে বসলাম। কারণটা আমি তখন কিছুই বুঝি নি। সমস্বরে সভাস্থ সবাই বলে উঠলেন—'হ্য তাই ত'? খোকাই ত' এখানে বড় কুলীন মৌদগোল্য গোত্রের উপরে কোন কুলীন নাকি সেখানে সেদিন ছিলেন না। যাই হোক কুলীন বিদায় সংগ্রহ করে মায়ের কাছে জমা করে দিলাম রূপোর রেকাবীটা। আমাদের যিনি ধন দিদিমা হয়ে এলেন তাঁর রঙ আমারই মতন মযলা। বেশ পাতলা চেহারা। চোখে মুখে বুদ্ধির একটা প্রাণবন্ত ছাপ। এই ধন দিদিমার সঙ্গে পরে আমার খুব বসালাপ হোতো। এই ধন দিদিমার একটি ছেলেও হয়েছিল। নাম তার রাখা হয়েছিল অমল্য। বংশটা রক্ষা গেল এই আশ্বাস বুকে নিয়ে ধন দাদামশায় কয়েক বছর পরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। নেপথ্যে ভগবান বোধ হয় আবার হাসলেন। ধন দাদামশায়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই সে ছেলেটি ঢাকায় কুমুদিনী মাসীমার ছেলে নিবেদন দাদার বাড়ির দেয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া প্রকাণ্ড এবং ভারি লোহার ফটকের উপরে চড়ে

খেলতে খেলতে সেই ফটকটি নিয়ে সজোরে পড়ে সেই ফটকের চাপেই মারা গেলেন। ধন দাদামশায়ের বংশ শেষ পর্যন্ত লোপই পেয়ে গেল। ভগবানের মার কে খণ্ডাতে পারে। আমাদের ধন দিদিমার এখন বয়স হয়েছে বেশ। দেশের জমি জমা সব গেছে পাকিস্তানের হিঁড়িকে। দেশ ছাড়া, বাস্তু-হারা হয়ে আমাদের স্নেহশীলা ধন দিদিমা দিন গুণছেন জীবনভোর দুঃখের অবসানে পরলোকে যাবার দিনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখনো তাঁর সেই হাসিটুকু লেগেই আছে তাঁর মুখে। সেইটেই তাঁর নাতিনাতনী আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। ধন দাদামশায়ের বিয়ের পরেই আমরা ফিরে গেলাম তেলিরবাগে।

(৯৩)

আবার সুরু হোলো তেলিরবাগের স্কুলে পড়া। নদি পণ্ডিতমশায়ের কাছে বাংলা আর কৌশিকবাবুর কাছে অঙ্ক। ছুটির দিনে চলল মধ্যের বাড়ির পুকুরে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে স্নান ও সাঁতারের হুল্লোড়। সুবিধে পেলেই গ্রামের খালে ডিঙ্গি ঠেলে নৌকাবিহার এবং বেথইন ফল সংগ্রহ করে নুন দিয়ে ছড়া বলতে বলতে ঝাঁকিয়ে পাকিয়ে সকলে মিলে খাওয়া। আবার এলো দুর্গাপূজা এবং বাবা এলেন নতুন পোষাক নিয়ে আমাদের ভাই বোনেদের জন্যে। আবার চলল তন্ময়চিত্তে তিন বাড়ির প্রতিমা গড়া পর্য-বেক্ষণ করা। পূজার কটা দিন কেটে গেল একটা অনির্বচনীয় আনন্দ আবেশের মধ্যে। বাবা কলকাতায় ফিরে গেলেন আপন কাজে। বড়দিনের সময় আবার এসেছিলেন কিনা মনে নেই। আবার এলো বাৎসরিক পরীক্ষার দুশ্চিন্তা। সেবারেও তরে যাওয়া গেল। তারপর এলো গ্রীষ্মের ছুটি। খুকী আর আমি আবার গেলাম মামা-বাড়ি হাসাড়ায়। ছুটির খানিকটা অংশ কাটতে না কাটতেই খবর এলো ১৯০২ খৃস্টাব্দের শ্রাবণ মাসের গোড়ায় যে তার আগের দিন দুপুর রাত্রে আমাদের একটি ভাই হয়েছে। আমার আর তর সয় না। খুকীর গোছান যেন শেষই হয় না। প্রায় ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে হলো। আবার আমরা কৈলাস সিং মাউসার সংগে বিদগাঁও হয়ে তেলিরবাগে ফিরে এলাম। গভীর রাত্রে হয়েছিল বলে সে ভাইয়ের নাম হয়েছিল নিশীথরঞ্জন, ডাক নাম নসু।

আমরা যখন তেলিরবাগে পৌঁছলাম নসু তখন তিন দিনের ছেলে। আমাদের ভাই-বোনেদের মধ্যে এক নসুই জন্মেছে তেলিরবাগ গ্রামে। যথারীতি তার আটকৌড়ে হলো। আমরা মুড়ি, চিনির ও গুড়ের বাতাসা, মঠ ও কদমা খেলাম হুল্লোড় করে।

ইংরেজী ১৯০৩ খৃস্টাব্দের মাঝা-মাঝি নসু একটু শক্ত হয়ে উঠলে বাবা আমাদের সবাইকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। কলকাতায় ভবানীপুরে আমাকে সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সেখানে আমি পড়েছিলাম বছর-খানেক কি তারও বেশি।

সেই বালক বয়সে আমার গ্রামীণ জীবনযাত্রা খুব সহজ, সরল ও সুন্দর ছিল। জ্ঞাতি সম্পর্কে ও পাতান সম্পর্কে জ্যেঠা, খুড়া, পিসা কি মাউসাদের বাড়িতে মুড়ি কি চিড়ের মোয়াটা, বাতাসাটা কি কদমাটাও পাওয়া যেত। ক্লাশ যখন ছুটি তখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গ্রামের অলিতে-গলিতে অবাধে ঘুরে বেড়ান যে কি অপূর্ব আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তা' বর্ণনা করা সহজ নয়। তারপর দুপুরে পুকুরে হুড়োহুড়ি করে সাঁতার দেওয়া, চিত হয়ে অথবা জলের ভেতর ডুবে। আগেই বলেছি আমাদের পশ্চিমের বাড়ির পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে যে খালটি আমাদের গ্রামটিকে বেষ্টন করে বয়ে যেত তারই এ পাড়ে দু'টা প্রকাণ্ড তালগাছ ছিল। খালের ওপারে ছিল খেলার মাঠ। শীতকালে সেই খাল যেত শুকিয়ে। খেলার মাঠে যেতে হতো ঐ দু'টো তালগাছের পাশ বরাবর। এক দৌড়ে শুকনো খালটার বুকের উপর দিয়ে ওপারে ঠেলে ওঠার আনন্দ এখনো স্মরণ আছে। সেই তালগাছ দু'টা আমার মনের মধ্যে এমন একটা মায়া সৃষ্টি করে-ছিল যা আজ পর্যন্তও গেল না। জানি না ছোট বয়সে শিশু-পাঠ্য ছড়ার বই-খানা আমি প্রথম তেলিরবাগে বসে পড়েছিলাম কি না। কিন্তু ঐ দু'টো তালগাছের সঙ্গে একজোড়া একানড়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা কেমন করে যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আমার মনে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা যখন দুলে দুলে সুর করে পড়ে—'এক যে ছিল একানড়ে সে থাকে তাল গাছে চড়ে' আমার মানসনেত্রে অমনি ফুটে ওঠে আমাদের তেলিরবাগ গ্রামের পশ্চিমের বাড়ির পশ্চিম দিকের খাল পারে সেই দু'টো তালগাছ যার মাথায় চড়ে বসে থাকত আমার শিশুমনের কল্পনার একানড়ে দম্পতি।

এই ছোট্ট তেলিরবাগ গ্রামই ছিল আমার পিতৃ-পিতামহের ভদ্রাসন বাড়ি। তারই সংগে সংলগ্ন ছিল একটি পুকুর ও কয় বিঘা মাত্র জমি। এই গ্রামের শান্ত পরিবেশে কেটেছে আমার বাল্যকালের ক'টা বছর আত্মীয় ও অনাত্মীয় গ্রাম-বাসীদের আদরে ও সোহাগে। কিন্তু, হায়, আমার বাল্যকালের স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, লতা-গুল্মে সুশোভিত, নয়নাভিরাম, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় সেই ছোট্ট গ্রাম-খানি আজকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সর্বগ্রাসী কীর্তিনাশা পদ্মার অতল জলে। কলকাতায় ফিরে এসে বড় শহরের নতুন পরিবেশের উত্তেজনাময় অবহাওয়ায় আমার মনটা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠল বটে; কিন্তু আমার মন ঘুরে বেড়াত রজনীর বিনিদ্র প্রহরে তেলিরবাগের অলিতে-গলিতে, পুকুর-ঘাটে, আমবাগানে ও খালপারে। জীবনের এই অন্তিম সময়েও মনে পড়ে সেই ছোট্ট তেলিরবাগ গ্রামখানি ও তার পশ্চিম প্রান্তে আমার সেই পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ির চারিটি ভিটা ও তৎসংলগ্ন বিঘা কতক জমি এবং পশ্চিমের খালপারে দণ্ডায়মান অতন্দ্র প্রহরীর মত দু'টি উঁচু তালগাছ। গ্রামের আকাশ, বাতাস, আলো, মাটি ও জল সেই বালক বয়সে আমার দেহকে পুষ্ট করেছে এবং আমার মনকে বিকশিত করেছে। আমার বাল্যের লীলাভূমি সেই ছোট্ট গ্রামটিকে আজও পারলাম না ভুলতে।

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে
যখন যেখানে ভ্রমি।
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে
সেই দুই বিঘা জমি॥

* * *
* * *

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে
রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি
আম কুড়োবার ধুম,
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর
পাঠশালা পলায়ন
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায়
ফিরে পাব সে জীবন।

রবীন্দ্রনাথ

[ক্রমশঃ]

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[প্রথম পর্ব]

॥ মুসলিম লীগের শাসন ॥

জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। মন্ত্রীরা কাজও আরম্ভ করেছেন কিন্তু চলতে গিয়ে দেখেন, বাধা বিস্তর। পূর্বে ঢাকা ছিল একটি জেলার প্রধান শহর ও জেলার 'হেড কোয়ার্টার' মাত্র; এখন সেই ঢাকা হ'ল সমস্ত প্রদেশের রাজধানী—শহর। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে প্রাদেশিক রাজধানীর অনেক কিছুই ক্রিয়া-কাণ্ড করণীয় আছে এবং তা পরিচালনার জন্য চাই উপযুক্ত স্থান ও তদুপযোগী গৃহ। সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট ভবন),—বিধানসভার গৃহ (এসেম্বলি হাউস), হাইকোর্ট প্রভৃতির জন্যও যেমন দরকার উপযুক্ত বাড়ির, তেমনই দরকার আবার, ঐ সব আফিসে কাজ করার কর্মচারীদের ও প্রধান কর্মকর্তাদেরও এবং মন্ত্রীদেরও বাসের জন্য উপযুক্ত বাড়ির; কিন্তু এই সব বিষয়েই সমস্যা দেখা দেয়। না-আছে তার জন্য উপযুক্ত বাড়ি-ঘর, না-আছে অর্থ-সম্পদ। সদ্য-সৃষ্ট পাকিস্তানের ধনভাণ্ডার তখন গড়ে ওঠে নি; প্রাদেশিক ধনভাণ্ডারও শূন্য! জেলায় জেলায়, জেলার কাজ চালানোর উপযোগী কিছু অর্থ মাত্র জেলার তোষাখানা (ট্রেজারী)-গুলোয় আছে, একমাত্র ভরসা, দেশ-বিভাগের সাথে সাথে ভারত সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মজুত অর্থের বিভাজিত অংশে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ (পঞ্চান্ন) কোটি টাকা মাত্র। তা-ও আবার তখনও পাওয়া যায় নি; তবে আশা আছে, পাওয়া যাবে! আর, সেই অর্থ যদি পাওয়াও যায়, তা দিয়ে তো তখনই কোন গৃহ নির্মাণ সম্ভবপর নয়। এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, সেই চিন্তাই অন্ত্রীদের মাথায় 'কিল-বিল' করতে থাকে। সব সমস্যারই সমাধানও আছে। এ ক্ষেত্রেও সমাধানের পথ পাওয়া গেল। পথ দেখালেন পূর্ববঙ্গের মুখ্যসচিব (চীফ সেক্রেটারী) জনাব আজিজ আহমেদ সাহেব। এই ভদ্রলোককে আমি বেশ ভালভাবেই জানি। তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে কয়েক বছর রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অ-বাঙালী, অত্যন্ত সুন্দর সু-পুরুষ চেহারা। তখন তরুণ যুবক মাত্র। রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালেই তিনি বিয়ে করে আসেন। তারুণ্যের অনেক দোষ ও গুণও তাঁর মধ্যে ছিল। দোষের মধ্যে প্রধান ছিল, তিনি অত্যন্ত হিন্দু-বিদ্বেষী। মুসলিম লীগের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। পাকিস্তান আন্দোলন জোর চলছে। জনাব আহমেদ সাহেবকে দেখেছি, তখনই তিনি একজন পুরোদস্তুর পাকিস্তানী শাসক। তিনি রাজসাহীতে থাকা কালেই, রাজসাহীর তৎকালীন কংগ্রেসী নেতা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, এম, এল, এ মহাশয়কে এক অশিষ্ট ভাষায় পত্র লেখেন। কথায় আছে, জলের ছিটা দিলেই চ'ড়ের গুঁতা খেতে হয়। ঐ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। সুরেন্দ্রমোহনও তার যোগ্য উত্তরই দিয়েছিলেন। ঐ ঘটনা নিয়ে তখন রাজসাহীতে ভদ্রস্থানীয় শিক্ষিত সকল লোকের মধ্যেই খুব মুখরোচক আলোচনা হয়। আহমেদ সাহেব আমার উপরেও খুব কুপিত হয়েছিলেন; কারণ, আমি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এবং আমি আমার গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় গ্রাম-গঠনের কাজ আরম্ভ করেছি। ইউনিয়নের লোক হচ্ছে, শতকরা আশী (৮০) জনের উপরে মুসলমান। তাঁরা সকলেই আমার ও আমার মাধ্যমে কংগ্রেস-ভক্ত হয়ে উঠেছে। এটা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি মাত্র সাত-আট মাস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেম। ঐ সময়ের মধ্যেই ইউনিয়নে ১৬।১৭ মাইল নতুন রাস্তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্যে তৈরি করা হয়। পাড়ায়-পাড়ায় নৈশ বিদ্যালয় করে প্রায় ৭৫০ (সাড়ে সাত শত) ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, গ্রামে উমেশ স্মৃতি লাইব্রেরী নামে একটি পাঠাগার ও একটি স্থায়িভাবে 'থিয়েটার হল' প্রভৃতি অনেক কাজই আরম্ভ করা হয়, এই সব কাজে ইউনিয়ন বোর্ডের নিজ তহবিল থেকে এক পয়সাও খরচ হয় নি। এই সবই হয়েছে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং তাঁদেরই অর্থানুকূল্যে। তৎকালীন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান—জনাব মণিরুদ্দিন আখন্দ, বি-এল ও সদর এস, ডি, ও —জনাব সিরাজুল করিম সাহেব গিয়ে সবই দেখেছেন এবং কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জনাব সিরাজুল করিম সাহেবের কাছেই তৎকালে আমি শুনেছিলেম যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আহমেদ সাহেব না কি ঐ সব কাজ সত্ত্বেও আমার উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। বিরূপ না-হবেনই বা কেন? ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকেই আমাকে বন্দী করাব জন্য শহর থেকে যেদিন আই, বি পুলিশ আমার গ্রামের বাড়িতে দেখা দিলেন, সেই খবর বিদ্যুদ্বেগে সারা ইউনিয়নে মুহূর্ত মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দু জনতা সব রকমের গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র—ঢাক, ঢোল, কাঁশি—প্রভৃতি নিয়ে আমাকে বিদায় দিতে আসেন। এক-জন হিন্দুর—সেই হিন্দু আবার কংগ্রেসী হিন্দু, তার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রভাব দেখে জনাব আজিজ আহমেদেব মত একজন পুরো হিন্দু-বিদ্বেষী এবং পাকিস্তানপন্থী জেলা-শাসক বিরূপ না হয়ে পারেন? তাঁর এই বিরূপ মনোভাব আমার জীবনে চরম আঘাতই হেনেছে! মাতৃহারা আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে আমার ছোট ভাই—শ্রীমান জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী (সম্প্রতি, পরলোকগত) আমার বন্দীকালেই দেয়। সেই বিয়ে উপলক্ষে জিতেশ বহু চেষ্টাই করেছিল, আমাকে অন্তত ৭ দিনের জন্যও 'প্যারোলে' ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু তা হয় নি। পরে আমার বন্দীদশাতেই সেই মেয়ে তার বিয়ের এক বছরের মধ্যে তার শ্বশুরবাড়ি —দিনাজপুর শহরে মারা গিয়েছে। আমি যখন হিজলি বন্দীশালায় বন্দী, তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক চিঠিতে জানতে পারি যে গ্রাম-সংগঠনের কাজে আমার ইউনিয়ন জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় বোর্ডকে দেওয়া হচ্ছে "শিল্ড" এবং আমাকে দেওয়া হবে, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন ও সার্টিফিকেট! আমি তার উত্তরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছিলেম যে, "সেই সরকার জনগণের সরকার নয়—যে জনগণের সেবা করে, তাকে গণ্য করা হয় সরকারবিরোধী বলে। আমি জনগণেরই সেবা করেছি—সরকারের নয়,

সুতরাং তার জন্য যে পুরস্কার আমার পাওনা, তা আমি সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি, আমার বন্দিত্বের মধ্যে। এখন যে সব পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তা আমার জন্য নয়।" এই পত্রখানি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিশ্চয়ই মুখরোচক হয় নি। সেইরূপই আমি ১৯৪৫ সালের শেষে মুক্তির পরে শুনেছি এবং আমি পূর্ববঙ্গ বিধানসভার সদস্য থাকা কালেও আহমেদ সাহেবের আমার প্রতি বিরূপ মনোভাবের বহু 'নজির' দেখেছি।

এই সবই গেল তাঁর দোষের কথা। গুণও তাঁর ছিল। তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী হলেও একজন দক্ষ পাকিস্তানী প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁর এই গুণের জন্যই তিনি প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি সাহেবেরও খুব সু-নজরেই ছিলেন। আজিজ আহমেদ সাহেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্যই এত কথা বলতে হ'ল; কারণ, এই ভদ্রলোকের অনেক কীর্তির সাথেই আমাদের পরবর্তী-কালে পরিচয় ঘটবে।

এহেন করিৎকর্মা মুখ্যসচিব—আজিজ আহমেদ সাহেব—এখন আজাদ পূর্ববঙ্গের প্রথম মুসলিম-লীগ মন্ত্রিসভার সাহায্যে এগিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব একজন ধর্মভীরু মুসলমান হলেও, পূর্বেই বলেছি যে তিনি ছিলেন ইংরেজের হাতে ও ছাঁচে গড়া একজন রাজনীতিক নেতা; তাই তাঁর মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবই অত্যন্ত প্রবল ছিল। কোরাণ ও সুন্নার পবিত্র বাণীর পরেই, বোধহয় তাঁর কাছে পবিত্র ছিল আমলাদের বাণী! আজিজ আহমেদ সাহেব পূর্বোক্ত সমস্যাসংকুল অবস্থায়, নাজিমুদ্দিন সাহেবের ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে "মুস্কিল আসান" হ'য়ে দেখা দিলেন। আহমেদ সাহেব যুক্তি দেন—"হিন্দুদের বড় বড় অনেক বাড়িই তো ঢাকা শহরে আছে; সেই বাড়িগুলো সব হুকুম-দখল (রিকুইজিশন) করে নিলেই বাসস্থান বাড়ির সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে; আর ইডেন গার্লস কলেজের সুবৃহৎ অঙ্গন সহ বাড়িটি নিয়ে, সেখানে সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট) এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রাবাসটিকে নিয়ে সেখানে বিধানসভা ভবন করলেই সমস্যার সমাধান হয়। হাইকোর্টের জন্য তো কার্জনী আমলের ঘোষিত পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশের হাইকোর্টের জন্য তৈরি বাড়িটিই আছে। সেখানেই 'হাইকোর্ট' ভবন করা যেতে পারে।" এই প্রস্তাব মন্ত্রীদের কাছে মুস্কিল আসান স্বরূপ দেখা দেয়। কয়েক শো, হিন্দুবাড়ির হুকুম-দখলের নোটিশ তখনই বের হয়ে গেল। আরম্ভ হল, বড় বড় কর্মকর্তাদের ও মন্ত্রীদের বাসস্থান ছাড়াও কেরানিকুলের বাসের জন্য বাড়ির হুকুম-দখল! হিন্দুদেরও তখন আর এই মনোবল নেই যে তাঁরা ঐসব বে-আইনী হুকুম-দখলের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেন; সুতরাং, সব কিছুই নির্বিবাদেই চলতে থাকে।

শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গেরও শহরে শহরে সরকারী কর্মচারীদেরও বাসগৃহের সমস্যা পূর্ববঙ্গের মত অতটা উৎকটরূপে দেখা না দিলেও কিছু কিছু দেখা দিয়েছিল। তাঁরা কিন্তু আফিসের জন্য বাড়ির হুকুম-দখল ছাড়া কর্মচারীদের বাসের জন্য বে-আইনীভাবে কারো বাড়ি, খুব বেশি হুকুম-দখল করেন নি। দুই একটি যা করেছিলেন, তাও বাড়ির মালিক আইনের আশ্রয় নেওয়ায় বিচারে হুকুম-দখলের আদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। কর্মচারীদের নিজেদেরকেই খুঁজে-পেতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁদের বাসস্থান ঠিক করতে হয়েছে।

আইন, পূর্ববঙ্গেও একইরূপই ছিল। সেখানেও তা-ই হতে পারতো। তা হ'লে বাড়ির মালিকদের সম্মতিতেই হ'ত এবং তাঁরা হুকুম দখল করা বাড়ির চেয়ে ভাড়াও কিছু বেশি পেতেন। কিন্তু তা হয় কি করে? তা হ'লে তো পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়? হিন্দুর সাংস্কৃতিক ও আর্থিক প্রভাবের প্রতি ঈর্ষাবশেই তো পকিস্তান-আন্দোলনের সৃষ্টি। সেই প্রভাবই যদি ক্ষুণ্ণ করা না গেল তবে আর 'পাকিস্তান' কিসের? সুতরাং আজিজ আহমেদী নীতিরই জয় হয়!

পূর্বেই মুসলিম লীগের, তথা তৎকালীন পাকিস্তান-রাজনীতির স্বরূপ ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছি। পাকিস্তান-রাজনীতির লক্ষ্যই ছিল, শুধু মুসলমানের জন্যই একটি মুসলিম রাষ্ট্র গড়া। সেই উদ্দেশ্যেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচার। তাঁদের মতে মুসলমানগণ, অ-মুসলমানগণ থেকে একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্রীয় জাতি (নেশন) এবং এই এক রাষ্ট্রীয় জাতি (নেশন) দ্বারাই পাকিস্তান গড়াই ছিল, মুসলিম লীগ নেতাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। এই আদর্শ সু-সম্পন্ন করার জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো থেকে অ-মুসলমান বিতাড়নের কাজ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করার সাথে সাথেই আরম্ভ হ'য়ে যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তো আর কথাই নেই! আন্দোলন কাজে রূপ নেয় এবং অত্যন্ত জোরদার হ'য়ে উঠে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট; আর ১৯৪৭ সালেরই ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিম পাঞ্জাবের ইংরেজ লাট সাহেব—স্যার ফ্রান্সিস মুডী সাহেব—পাকিস্তানের জনক, গভর্নর জেনারেল জনাব জিন্নাহ সাহেবের কাছে যে চিঠি দেন তা'তেই শিখদের বিতাড়নের পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে। ঐ পরিকল্পনার ফলেই পাকিস্তান-সৃষ্টির নয় মাসের মধ্যেই রক্ত ও অশ্রুর বন্যায় অ-মুসলমানগণ ভেসে খণ্ডিত ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নয় মাসের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশগুলোই অ-মুসলমান-শূন্য হয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে দেশ-বিভাগের সময় এক কোটি ত্রিশ লক্ষেরও কিছু বেশি হিন্দু ছিল। তাঁদেরও তাড়ানোর ব্যবস্থা তো করা চাই। তাই, মুসলিম লীগের নেতারা তাঁদের সংস্থার "ন্যাশনাল গার্ড" নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গ্রামে গ্রামে বের ক'রে দেন, দ্বি-জাতিতত্ত্বকে ভালভাবে প্রচার করতে এবং অ-মুসলমানরা যে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এ কথা সকলকে ভালভাবে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে। গ্রামে গ্রামে হিন্দু জনসাধারণ আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েন। নানা ধরণের অত্যাচার ও জোর-জুলুমও তাঁদের উপর চলতে থাকে। এ অবস্থায় তাঁদের দেখে কে? পুলিশ কিছুই করে না; উপরন্তু অভিযোগ করলে আরও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। সেই অবস্থায় তাঁরা যান কোথায়? কার কাছে তাঁদের দুঃখের কথা জানাবেন? স্বভাবতই তাঁদের দৃষ্টি পড়ে তাঁদেরই ভোটে নির্বাচিত বিধানসভার প্রতিনিধির দিকে। আমার জেলায়—রাজসাহীতে ১৯৪৬ সাল থেকে আমিই ছিলাম, সেই একমাত্র প্রতিনিধি। রাজসাহী জেলায় ১৯৩৫ সালের আইনে এসেম্বলির সদস্যরূপে নির্বাচিত হতেন মাত্র পাঁচজন সদস্য। তার মধ্যে চারজন হলেন মুসলমান, আর একজন মাত্র হলেন অ-মুসলমান সদস্য। আমিই ছিলাম, সেই অ-মুসলমান সদস্য। আমার নির্বাচনে দ্বিতীয় কোন প্রার্থীই আমার বিরুদ্ধে 'নমিনেশন'পত্রও দাখিল করেন নি। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার নামই নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়, নির্বাচনপত্র বাছাই ক্রুরাব (Scrutiny) দিলেই। এতখানি বিশ্বাস ও ভালবাসা যে জনসাধারণের ছিল আমার উপর, সেই জনসাধারণই আজ যখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে দিশেহারা হ'য়ে আমার কাছে ছুটে আসছেন, তখন আমি তাঁদের এই বিপদে—এই দুর্দিনে দূরে সরে থাকি কেমন করে? খণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বরূপ দেখে মনে যত অবসাদই আসুক না কেন, তা'কে কাটিয়ে উঠে বিপন্ন জনসাধারণের সামনে আমাকে দাঁড়াতেই হয়। প্রতিদিনই গ্রাম-গ্রামান্তর

থেকে লোক আসেন নানা অভিযোগ নিয়ে—কেউ বা বলেন, তাঁর পুকুরের মাছ জোর ক'রে জাল দিয়ে মেরে নিয়েছেন মুসলমানরা,—কেউ বা বলেন, তাঁর জমি বেদখল করে নিয়েছে, কারো বাড়ি জবর-দখল হয়েছে, কারো ঝাড়ের বাঁশ, কারো বা জমির ফসল জোর ক'রে কেটে নিয়ে গিয়েছে। কেউ বা বলেন, তাঁরা বাস্তা দিয়ে খোল বাজিয়ে সন্ধ্যার পর কীর্তন ক'রে বরাবরের মতই যাচ্ছিলেন কিন্তু এক-দল লোক হঠাৎ তাঁদের উপর আক্রমণ ক'রে মার-ধর করেছে ও তাঁদের খোলও ভেঙে দিয়েছে। এম্‌নি নানা ধরণের নানা অভি-যোগই প্রতিদিন আসতে থাকে। অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে কোনও কোনও অভিযোগ নিয়ে আমিও প্রয়োজন-বোধে তখনই ছুটি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে। তখন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে এসেছেন, খন্দকার আলি তায়েব সাহেব। তার আগে দেশ-বিভাগের আগে ছিলেন, লেঃ কর্নেল ম্যাক্‌ নীল . (Lt. Col. Mc Neil) সাহেব। খন্দকার আলি তায়েব ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের এক বিশিষ্ট ঘরের সন্তান। এঁর ছোটভাই, খন্দকার আলি আফ্‌জল সাহেবকে ১৯৪৬ সালে দেখেছি বেঙ্গল এসেম্বলির সেক্রেটারী হিসাবে। খন্দকার আলি তায়েব সাহেব মাত্র বছরখানেক রাজসাহীতে ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে ছিলেন। তাঁর মধ্যে আমি সাম্প্র-দায়িকতার লেশমাত্রও কখনও দেখি নি; বরং দেখেছি, দেশে যাতে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকের পারস্পরিক সাহচর্যে একটা সম্মিলিত পাকিস্তানী জাতি (নেশন) গ'ড়ে ওঠে, সেই চেষ্টাই করতে। সেই চেষ্টাকে কার্যকরী করতে হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন থেকে আতঙ্ক ও আতঙ্কের কারণ দূর করা দরকার, আর তা' করতে গেলেই ন্যায়ের ভিত্তিতে সু-বিচারের প্রতিষ্ঠা করা সর্বপ্রথমে দরকার। তিনি তা-ই করতে লাগলেন কিন্তু ফল হ'ল কি? ফল হ'ল—মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নাম পড়ে গেল—কালা তায়েব! অর্থাৎ তিনি মুসলমান নন—তিনি একজন প্রচ্ছন্ন হিন্দু! রাজসাহীর মুসলমান এম্‌, এল্‌, এ-দের মধ্যেও কেউ কেউ মন্ত্রীদের কাছে দরবারও করলেন, ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজসাহী থেকে অন্যত্র বদ্‌লি করার জন্য। একদিন আমাদের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী বন্ধু, জনাব ফজলুল হক্‌ সাহেবের কৃষক-শ্রমিক দলের নেতা কুষ্টিয়ার জনাব সামসুদ্দিন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নাকি আমার কথা ছাড়া আর কোনও মুসলমান এম্‌, এল্‌, এ-দের কথা শোনেন না? তদুত্তরে তাঁকে সেদিন আমি বলেছিলেম—"আমি তো 'তা' জানি না; আর, আমি তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে কখনও ব্যক্তিগত কোন কাজের জন্য অনুরোধ করি না। আমি তাঁর কাছে জন-স্বার্থের আবেদন নিয়েই ন্যায়বিচারের আবেদনই কেবল করে থাকি। তিনি করেনও। তা'তে কি তিনি অন্যায় করেন?" সামসুদ্দিন সাহেব আর কোনও উত্তর দেন না; তবে, আমি বুঝি যে আমার জেলার মুসলমান 'এম্‌, এল্‌, এ'-দের অভিযোগই তাঁর মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাত্র। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিধানসভার সদস্যদের চাপ, বড় ভীষণ চাপ মন্ত্রীরা যদি মন্ত্রিত্বের গদি আঁক-ড়িয়ে থাকতে চান, তাহলে সদস্যদের চাপের কাছে তাঁদের নতি স্বীকার করতেই হয়, নচেৎ মন্ত্রিত্বে সমাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও সংখ্যালঘু দল হ'য়ে যেতে বেশি দেরি লাগে না। পশ্চিম বাংলায় এসেও দেখেছি, এখানেও সময়ে সময়ে জেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা বা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিক দলের নেতারা দলীয় স্বার্থের নামে মন্ত্রীদের কাছে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কোনও কোনও লোককে বদলি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। কোন কোনও মন্ত্রী মহাশয়কে অবশ্য দেখেছি যে তাঁরা ঐ চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন; আবার কোন কোনও ক্ষেত্রে নতি স্বীকার না করতেও দেখেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব ও পূর্ণ দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির এইরূপ বিপদ থেকেই যায়। এইরূপ বিপদের মাত্রা পূর্ববঙ্গে, তথা পূর্ব পাকিস্তানে বেশ একটু বেশি পরিমাণেই দেখেছি। সেইজন্যই সেখানে ঘন ঘন মন্ত্রিত্ব বদল হয়েছে—সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

আলি তায়েব সাহেবের ব্যাপারেও দেখেছি, পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীরা রাজসাহীর মুসলমান সদস্যদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করেছেন। কিঞ্চিদধিক এক বছরের মধ্যেই তাঁকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের গদি থেকে সরিয়ে নিয়ে ঢাকার সচিবালয়ে সম্মানিত (dignified) কেরানীর পদে অপসারণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যতদিন রাজসাহীতে জেলাশাসকের পদে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর কাছে অভিযোক্তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সুবিচারই পেয়েছেন; ফলে, রাজসাহী জেলা থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক কোনও বাস্তুত্যাগ হয় নি। আলি তায়েব সাহেবের আমলের দুই-একটি ঘটনা মাত্র এখানে উল্লেখ করছি।

পূর্বেই বলেছি, প্রতিদিন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে আমার কাছে তাঁদের নানা অভিযোগ জানাতে থাকেন এবং আমিও, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে তখনই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে গিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগপত্র দিই। তিনিও সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট থানা-অফিসারের কাছে তদন্ত করে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ ঐ দরখাস্তের উপরেই লিখে দেন। এইভাবেই কাজ চলছিল। এমন সময়ে একদিন খবর পেলাম, গোদাগাড়ী থানায়, থানার অতি নিকটেই—এক ফার্লং-এর মধ্যে —হিন্দু সম্প্রদায়ের এক কালোয়ার শ্রেণীর ভদ্রলোকের (বর্তমানে, তাঁর নাম মনে নেই) বাড়ি বেলা প্রায় ১০।১১টার সময়ে সকলের সামনেই এক মুসলমান জনতা এসে লুঠ করেছে। সেখানে হিন্দুরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। থানা থেকে তখন পর্যন্ত কোন লোককেই ঐ অপকর্মের জন্য ধরা হয় নি বা দোষী ব্যক্তিদের ঘটনার পর তিনদিন হয়ে গেলেও খুঁজে বের করারও বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হয় নি। খবর পেয়েই আমি ছুটলেম গোদাগাড়ীর দিকে। আমি সাথে নিলেম আমার সহকর্মী একদল হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিক কর্মীকে। সকলের নাম আজ আমার মনে নেই; তবে, যাঁরা যাঁরা সেদিন আমার সাথে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীসুধাংশুমোহন চৌধুরী (চেরু), শ্রীবীরেন সরকার, (উভয়েই স্বাধীনতার সংগ্রামে বহু বছর জেলে কাটিয়েছেন) ও মিঃ একরামুল হক, শ্রীশিবেন্দ্রমোহন মৈত্র (গোরা—বর্তমানে পরলোকগত) প্রমুখ যে ছিলেন তা' আমার মনে আছে। আমরা গোদাগাড়ীতে পৌঁছাই সন্ধ্যার পরে এবং পর দিন সকালে, প্রথমেই থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ এবং তাঁরা কতদূর কী করেছেন তা জানতে চেষ্টা করি। শুধু এইটুকু তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারি যে তাঁরা যথাশক্তি চেষ্টা করেও দোষী ব্যক্তিদের তখন পর্যন্ত সন্ধান করতে পারেন নি।

এর পরে আমি, আমার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যাই ঐ লুণ্ঠিত বাড়িতে। গিয়ে দেখি, বাড়ির দালানের ভিতের সাথে এক লোহার আলমারি গাঁথা ছিল, সেটাকেও দেওয়াল ভেঙে নিয়ে গিয়েছে এবং বাড়িতে একটি সূঁচ পর্যন্তও নেই—সবই যেন ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে। এতেই বোঝা যায় যেন লুণ্ঠন কাজ সম্পূর্ণ করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় অন্তত লেগেছে। তার মধ্যেও থানা থেকে কোন সাহায্যই আসে নি। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সব দেখে, আশেপাশের গ্রামের মুসলমান নেতাগণকে ও ২।১টি ইউনিয়ন

বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণকে ডেকে পাঠাই। এক্ষেত্রে আমার একটু সুবিধা এই ছিল যে, বহু বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে আমার জেলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই আমি একাধিকবার গিয়েছি এবং তার ফলেই, জনসাধারণের ও তাঁদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যেও আগে থেকেই আমার বেশ একটা পরিচিতি ছিল। মুসলিম লীগ আমলে যে রাজনীতিক মতবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়েছে, তাতে মুসলমান নেতারা সকলেই যে আমার জাতীয়তাবাদী নীতি সমর্থন করতেন না, সেটা তো সকলেরই—আমারও জানা কথা; তবু, আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি যে আমার মতবাদ মুসলমান নেতারা সমর্থন না করলেও, ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যথেষ্টই ছিল। তাই, তাঁরা সেদিন আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সকলেই এসেছিলেন। সেদিন আমি তাঁদের কাছে কী মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন করেছিলেম তা—আজ কেন, তখনও আমার পক্ষে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপর ছিল না; তবে এইটুকু বলতে পারি যে সেদিন যেন আমার মধ্যে এক ঐশ্বরিক শক্তির খেলা শুরু হয়েছিল এবং ঐ শক্তিই সেদিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবতার কাছেই আবেদন করেছিল! আমি যেন সেদিন আবিষ্ট (inspired) হয়েই সারা অন্তর থেকে তাঁদের সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে নিবেদন করেছিলেম যে তাঁরা যেন সকলেই সহযোগিতা করে দোষী ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মাল-পত্র ফেরৎ দেওয়ার পক্ষে সাহায্য করেন এবং আমি তাঁদের কথা দিয়েছিলেম যে, যদি সব মালপত্র দোষী ব্যক্তিরা তাঁদের অপরাধ স্বীকার করে ফেরৎ দেন, তাহলে আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো যে কারো যেন তার জন্য কোনও শাস্তি না হয়। আবেদনের ফল, আশ্চর্যজনকভাবে ফললো। মুসলমান নেতারাই লুণ্ঠনকারী প্রত্যেকটি লোককে ডেকে সব জিনিস ফেরৎ দিতে বা যে জিনিস তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করে ফেলেছেন (চাল-ডাল-আটা-চিনি-গুড় প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যও লুণ্ঠিত মালের মধ্যে ছিল), তার বর্তমান বাজার দর অনুসারে দাম দিতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই যে জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে, তার মূল্য বাবদ আদায় হল ১,৫০০ শত টাকা এবং অন্যান্য সব জিনিসই ফেরৎ এল। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি দোষী ব্যক্তি অপরাধের স্বীকৃতিতে লিখে (সাক্ষীসহ নিজের নাম সহি বা আঙ্গুলির টিপ ছাপ দিয়ে) দিলেন যে কি কি জিনিষ তাঁরা ফেরৎ দিলেন।

পুলিশ তিন দিনের মধ্যেও যা করতে পারেন নি বা করেন নি, তা তিন ঘণ্টার মধ্যেই নেতারাই করলেন।

এখানে এই ঘটনাটির এত বিস্তৃত বিবরণ দিলাম, শুধু এই জন্যই যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের রীতি ও প্রকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে। তাঁরা স্বভাব-দুর্বৃত্ত বা সমাজ-বিরোধী নন; ঘটনাচক্র ও রাজনীতিক নেতাদের অভিসন্ধিমূলক কারসাজিই তাঁদের রূপকে সময়ে সময়ে হিংস্র ও সমাজ-বিরোধী রূপে প্রকাশ করে। ব্যাপকভাবে যখন এই অবস্থা সমাজের মধ্যে দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার পেছনে নেতৃস্থানীয় লোকের চক্রান্তকারী মস্তিষ্কের খেলা আছে। আমার ধারণা, সরকার (গভর্নমেণ্ট) একটু সচেতন হয়ে নেতৃস্থানীয় নেতাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই অনেকক্ষেত্রেই ঐরূপ ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে পারেন। পূর্বেই বলেছি যে ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রংপুর জেলার আরক্ষাধ্যক্ষ (পুলিশ সাহেব) হিসাবে এই পন্থা অনুসরণ করেই, ঐ জেলায় কোনও হাঙ্গামাই হতে দেন নি।

যাক, গোদাগাড়ীতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং হিন্দুদের মনের আতঙ্ক কিছুটা পরিমাণে দূর করে অপরাধী ব্যক্তিদের স্বীকৃতিপত্রের দলিলগুলো নিয়ে আমি রাজসাহীতে ফিরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—আলি তায়েব সাহেবকে সব দেখাই এবং ঘটনার সব কথাই তাঁকে বলি। সব শুনে, প্রথমে তো তিনি রাগে ফেটে পড়েন এবং বলেন যে, তিনি সকলকেই ধরে জেলে নিয়ে আসবেন। তাঁর সেই কথা শুনে আমি তো চরম বিপদ গণি এবং তাঁকে বিনীতভাবে জানাই যে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আমি যে সেখানে সকলের সামনে কথা দিয়ে এসেছি যে, অপরাধীরা দোষ স্বীকার করে সব লুণ্ঠিত মালপত্র ফেরৎ দিলে অপরাধী ব্যক্তিদের কারো কোনও শাস্তি যাতে না হয়, তার জন্যই আমি চেষ্টা করবো এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আমার অনুরোধ জানাব। সাহেব সবই শুনলেন—কিছুক্ষণ স্থির নিশ্চলভাবে বসে চিন্তা করলেন এবং পরে বললেন—"আপনি কংগ্রেসের নেতা—আপনি জনসমক্ষে যে কথা দিয়ে এসেছেন, তার একটা মর্যাদা নিশ্চয়ই আছে, সে মর্যাদা রক্ষা করাই উচিত। আমি সে

প্রকাশিত হল

দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

নীল-দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত। দীনবন্ধু-চর্চার সুবিধার জন্য দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা আমরা একত্রে একটি খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করলাম। দীনবন্ধুর বিক্ষিপ্ত রচনাও এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। দীনবন্ধু রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম·এ·, ডি· ফিল·। তাঁর লেখা দীনবন্ধুর 'জীবন-কথা' ও 'সাহিত্য-কীর্তি' এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। দীনবন্ধু, তাঁর জায়া ও পরিবারবর্গের আর্ট প্লেট। আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য রচনাবলীর মত শোভন সংস্করণ।

দীনবন্ধু রচনাবলীর সূচী

নাটক ও প্রহসন
নীল-দর্পণ
নবীন তপস্বিনী
বিয়ে পাগলা বুড়ো
সধবার একাদশী
লীলাবতী
জামাই বারিক
কমলে কামিনী নাটক
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ

গল্প-উপন্যাস
যমালয়ে জীবন্ত মানুষ
পোড়া মহেশ্বর

কাব্য কবিতা
সুরধুনী কাব্য
দ্বাদশ কবিতা
নানা কবিতা

সংযোজন

দাম মাত্র তের টাকা

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলি—৯

মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। আমি ঐ ব্যাপার নিয়ে আর অগ্রসর হব না।" আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আজ এই ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে—সেই দিন আর এই দিন! সেই 'কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী', আর আজকের কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী? আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেদিনের কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশীয় পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও একটা শ্রদ্ধার—একটা সম্ভ্রমের ভাব দেখেছি। তাঁরা আমাদের কাজ সমর্থন করেন নি বটে—আমাদের রাজনীতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য 'জেল'-ও দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তাঁরা শ্রদ্ধা হারান নি। এটা যে শুধু খন্দকার আলি তায়েব সাহেবের মত একজন দেশীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেখেছি, তা নয়। খাস ইংরেজ আই সি এস্ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও দেখেছি। ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির বলে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসেই আমি রাজসাহী জেলার বাগমারা থানার অধীন বকুৎসার জমিদারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন শুরু করি। তখন রাজসাহীতে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এল জি পিনেল (Mr. L. G. Pinnel, I. C. S.)। সাথে বকুৎসার ঐ আন্দোলন নিয়ে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা হয়। সে বাক্-বিতণ্ডা ঝগড়ার পর্যায়েই যায়। বকুৎসার জমিদারীর এলাকায় প্রজার শতকরা ৯২ শতাংশই হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক; আর, জমিদার হচ্ছেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। এই জমিদারের এলাকায় প্রজা-পীড়ন এমন বীভৎসভাবে বহুদিন যাবৎ চলছিল, যেমনটি জমিদার প্রধান রাজসাহী জেলায় এক মৈদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর সাহেব জমিদারদের অধীন বিলমাড়িয়া কনসারণ ছাড়া আর কোথায়ও আমি দেখি নি। এই জমিদারের এলাকায় আন্দোলন করায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলেন যে, কংগ্রেস থেকে ঐ আন্দোলন চালানোর উদ্দেশ্যেই নাকি মুসলমানগণকে কংগ্রেস-মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা। তা যে ছিল না, তা আমি বলি না। তার সাথে সাথে এটাও ছিল যে, কংগ্রেস নীতির তখন মূল কথাই ছিল, আর্ত ও বিপন্ন জনগণের সাহায্যে নিজেদের সব বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া। আমরাও তাই গিয়েছিলেম কিন্তু সাহেব দেখলেন, ব্রিটিশ-শাসন-নীতির সাম্প্রদায়িক ভেদ-সৃষ্টির নীতি ব্যর্থ হতে চলেছে। তাই, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হন এবং দিন কয়েক পরেই আমাকে ১০৭ ধারায় জেলে নিয়ে যান। বিচারের একটা প্রহসনও হয়। আমি তাতে কংগ্রেস সেবক হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিনে। বিচারে আমার এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঐ ধারায় জামিন-মুচলেকা দিলে অবশ্য মুক্তি পাওয়া যায়। তখন রাজসাহী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (বড় সাহেব) ছিলেন, লিউক সাহেব (Mr. Luke)। তিনি আমাকে জামিন দিয়ে জেল থেকে মুক্তি নেওয়ার উপদেশ দেন! উদ্দেশ্য, আমার সম্পর্কে জনমনে যে শ্রদ্ধা ছিল, তা শেষ করে দেওয়া এবং আমার রাজনীতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়া। আমি তাঁকে যখন জানাই যে কংগ্রেসসেবী হিসাবে আমি তা করতে পারি না, তখন তিনি আমাকে বলেন যে, পিনেল সাহেব না কি তাঁকে বলেছেন আমার সাথে ভাল ব্যবহার করতে! খবরটা আমার কাছে অদ্ভুত শোনায়। যে পিনেল সাহেব আমাকে জেলে পাঠালেন, সেই পিনেল সাহেবই আবার আমার সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য জেলের বড সাহেবকে নির্দেশ দিলেন! কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের কর্মীর সম্পর্কে এমনই একটা শ্রদ্ধার আসন ছিল, সেকালের সরকারী পদস্থ কর্মচারীদেরও মনে। আলি তায়েব সাহেবের ও পিনেল সাহেবের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখেছি। জনসাধারণের মনে যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীদের সম্পর্কে কতখানি শ্রদ্ধার আসন ছিল, তা দেশবাসী সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ২৫।২৬ বছরের গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্মিগণ তাঁদের জনসেবা, ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণের মধ্য দিয়ে যে একটা শ্রদ্ধার আসন দেশে ও বিদেশে গড়ে তুলেছিলেন, তার কীভাবে কংগ্রেসী দুঃশাসনে পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তার একটা 'নজির' এখানে তুলে ধরছি। শ্রীবীরেশ চক্রবর্তী, বি এল, আমার একজন অত্যন্ত স্নেহের পুরনো সহকর্মী ছিল। সে দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু বছর জেলও খেটেছিল। দেশ বিভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সে কলকাতায় চলে আসে। এদিকে এসেও সে প্রথম কিছুদিন কংগ্রেসেরই কাজ করে কিন্তু নৈষ্ঠিক ত্যাগী কর্মী হিসাবে আর শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে থাকতে পারে না। সে কংগ্রেস ছাড়ে কিন্তু কংগ্রেসের নীতি ও 'খদ্দর' ছাড়ে না। একদিন সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম গাড়িতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আর এক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বীরুর পাশে এসে বসেন। তিনি বীরুর পোষাকের দিকে বেশ লক্ষ্য করে দেখে তাকে বলেন—"দাদা! মনে হচ্ছে আপনি একজন কংগ্রেসী। আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চলেছেন! এখনও কিছু যোগাড় করে উঠতে পারেন নি?" তাই বলছিলেম—সেই দিন, আর এই দিন! জনমনে কী আকাশ-পাতাল পরিবর্তন!

যাক, আলি তায়েব সাহেবের কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মী সম্পর্কে উক্তিটি বলতে গিয়ে এত কথা বললেম। আমি মহাত্মা গান্ধীর বা খান আব্দুল গফুর খাঁনের মত সত্যাশ্রয়ী শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেম না—আমি ছিলেম, একটি মফস্বল জেলার একজন সামান্য কংগ্রেস-সেবক; তবু কংগ্রেস যে সেবা, ত্যাগ ও সত্যসন্ধিতা দিয়ে সেকালে যে একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই আলি তায়েব সাহেব জনসমক্ষে আমার কথা-দেওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছিলেন—কারো বিরুদ্ধেই আর তিনি কেন শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে আবার যথারীতি আমার কাজে মন দিই।

এই ঘটনার পরে মাত্র কয়েকদিন কেটেছে। এর মধ্যেই আর একটি দুঃসংবাদ এসে আমার কাছে পৌঁছয়। এবারের দুর্ঘটনার অকুস্থলটি আমারই গ্রাম—আড়ানী। এই গ্রামটি চারঘাট থানার মধ্যে এবং থানা থেকে ৬।৭ মাইল দূরে। সরদহ ও চারঘাটের মধ্য দিয়ে পদ্মা থেকে বড়াল নদী বের হ'য়ে গিয়েছে। এই বড়াল নদীরই ধারে আড়ানী গ্রামটি। বেশ বড় একটি বন্দর। বাজারে অনেকগুলো বড় বড়

সাপ্তাহিক বসুমতীর
গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

	টা. প.
বার্ষিক চাঁদা (সডাক)	১৪-০০
ষাণ্মাসিক " "	৭-০০
ত্রৈমাসিক " "	৩-৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। —কর্মাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

স্থায়ী দোকান ও কারবারী গুদাম ও দোকানও সেখানে আছে। সেই সব মহাজনেরা প্রতি বছর তাঁদের ব্যবসায়ের উপর ঈশ্বর-বৃত্তি ব'লে একটা চাঁদা আদায় করেন এবং তা' দিয়ে বেশ ধুমধামের সাথেই দুর্গাপুজো, কালীপুজো প্রভৃতি ক'রে থাকেন। বাজারের উপর টিনের পুজামণ্ডপ ও টিনেরই প্রকাণ্ড এক বারচালা ঘর তাঁরা তৈরি করে রেখেছেন। ঐ বারচালা ঘরে পুজো উপলক্ষে বড় বড় যাত্রার দলও তাঁরা নিয়ে আসতেন। দেশ-বিভাগের পরেই সম্মুখে দুর্গাপুজো। ঐ পুজারও তাঁরা আয়োজন করেছেন। প্রতিমা গড়া হয়েছে। একদিন সকালে দেখা গেল, কে বা কা'রা ঐ প্রতিমা ভেঙেছে এবং অপবিত্র করেছে। হিন্দুরা, ঐ ঘটনায় অত্যন্ত মন-মরা হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা স্থির করেছেন, আর পুজো করবেন না—পাকিস্তানে হিন্দুর পুজো আর বোধ হয় চলবে না! তাঁরা পুজো না করার সিদ্ধান্ত করেছেন কিন্তু ঘটনাটির বিষয়ে থানাতে কোনও এজাহার দেন নি, তাঁদের আশঙ্কা 'এজাহার' দিলে আবারও হয়তো, আরও বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! লোকের মুখে মুখে কিন্তু থানায় খবরটি গিয়ে পৌঁচেছে, যেমনভাবে পৌঁচেছে আমার কাছে। খবরটি শুনেই আমি ছুটে যাই, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলি তায়েব সাহেবের কাছে। তিনি সব শুনে, তখনই সদরের এস, ডি, ও সাহেবকে ডেকে আদেশ দেন যে আমাকে সাথে নিয়ে তিনি যেন 'জীপে' অবিলম্বে ঘটনাস্থলে রওনা হ'য়ে যান। আমরা সাহেবের কুঠি থেকেই রওনা হ'য়ে যাই। যখন আমরা আড়ানীতে পৌঁছলেম, তখন দেখি চারঘাট থানার বড় দারোগা আমাদের একদিন আগেই খবর শোনামাত্র ঘটনাস্থলে এসে পৌঁচেছেন এবং হিন্দু-মুসলমান সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে একটা আপোষের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। কোন কোন মুসলমান নেতাই টাকা দিয়ে আবার প্রতিমা গড়াব কাজ সুরু করে দিয়েছেন এবং হিন্দুকেও রাজী করিয়েছেন, তাঁদের পুজো যথারীতি ক'রে যেতে।

সব শুনে খুশিই হলেম। গোদাগাড়ীতে থানার দারোগাদের একরূপ দেখেছি, আর এখানে এসে দেখছি, আর এক রূপ! গোদাগাড়ী থানাতে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিছু করেন নি, আর এখনে থানায় কোন 'এজাহার' করা না হলেও দারোগা ছুটে গিয়েছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শান্তি স্থাপনও করেছেন। আমি সেদিন ঐ গ্রামে প্রকাশ্য জনসভায় দারোগার প্রশংসাই করেছিলাম এবং পরে জেনেছি, আমার প্রশংসার ফলে দারোগা সাহেব পুলিশ সাহেবের কাছ থেকে তিনশো টাকা পুরস্কার পেয়েছেন এবং আমি রাজসাহীতে থাকতে থাকতেই তিনি ইন্সপেক্টারের পদেও উন্নীত হয়েছিলেন।

এমনটি কেমন ক'রে হ'ল, তা নিয়ে অনেক ভেবেছি; দেখেছি, বিভিন্ন কারণেই হ'য়ে থাকতে পারে। দারোগাটি ছিলেন একেবারে তরুণ আনকোরা। ঝানু দারোগার মত তখনও মুসলিম লীগের নীতি তাঁর মনে বাসা বাঁধতে হয়তো পারে নি; তাই, তিনি সেদিন সদিচ্ছাই দেখিয়েছিলেন। আরও একটি কারণ এর পিছনে থাকতে পারে। সেটি হ'লে তাঁর পেছনে কোন সদিচ্ছার প্রেরণা ছিল না—তাঁর পেছনে ছিল রাজনীতিক কারণ। সেই কারণটি হচ্ছে, মুসলিম লীগের একটা নীতি দেখেছি যে তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মকাজে যে-কোন বাধাই পাকিস্তানে দেওয়া হয় না, বরং তাঁরা যে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার মধ্যেই তাঁদের ধর্মকার্য করেন, সেইটা প্রচারের দিকেই অত্যন্ত উৎসাহ দেখান! হয়তো বিশ্ব-জনমতকে ধোঁকা দেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যই মুসলিম লীগ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম-না-জানা অখ্যাত তথাকথিত নেতাদের দিয়ে সময়ে সময়েই ঐরূপ বিবৃতি লিখিয়ে নিয়ে তা' 'রেডিও' ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন! এইরূপ প্রচার আমি পাকিস্তানে থাকতেও চলতে দেখেছি এবং এখনও শুনছি, সেই প্রচারনাই চলছে! এই তো ২০।৫।৬৭ তারিখেই পাকিস্তান 'রেডিও'-তে বলতে শুনলেম যে পাকিস্তানের কোন এক বৌদ্ধ নেতা বলেছেন যে পাকিস্তানে বৌদ্ধরা এবং সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই তাঁদের ধর্মকর্মাদি করতে পারছেন ও তাঁরা নাকি সংখ্যাগুরু (মুসলমান) সম্প্রদায়ের মত সব বিষয়েই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হ'ল যে, ভারতে নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সে সুযোগ পান না এবং ভারত সরকারের এই অপকর্মকে লোকচক্ষু থেকে ঢেকে রাখার জন্যই নাকি ভারত সরকার অহেতুক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক কুৎসার কথা প্রচার করেন! এই ধরণের বিবৃতি যে কিভাবে নেওয়া হয়, তা আমি পাকিস্তানে থেকে বিশেষ ভালভাবেই জানি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডহীন লোকদের ডেকে নিয়ে পদস্থ কর্মচারীরা যেমন বলেন, তেমনই তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়।

আড়ালী [illegible] ভাঙার ব্যাপারে যে দারোগা সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে গিয়েছিলেন, তার পেছনের কারণ এ-ও হ'তে পারে যে আমার চোখে ধুলো দিয়ে ঘটনাটাকে আড়াল করে রাখা। ঘটনাটি আমার গ্রামের—স্বভাবতই তা' নিয়ে হৈ-চৈ করা আমার পক্ষে সম্ভব; তাই আমার মুখ বন্ধ করা আগে দরকার। এ সবই অবশ্য পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহের গতি ও প্রকৃতি দেখে আমি অনুমান করছি। পেছনের কারণ যা-ই হোক, সেদিন আমি সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার জন্য নিজেও যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেম, তখনই যে ব্যক্তিই শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন, তাঁরই আমি প্রশংসাও করেছিলেম। দারোগাটির কাজও আমি সেই হিসাবেই প্রশংসা করেছি দম।

[ক্রমশঃ]

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সংপদী। মূল্য—সাড়ে চার টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—তিন টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য তিন টাকা

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মেহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭১ বর্ষ ৪১ সংখ্যায় (১৮-৫-৬৭) বঙ্গদর্শনে "কলকাতা আকাশবাণীর স্বৈরাচার" পড়লাম। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' জনস্বার্থে যে সব গর্হিত অন্যায়ের উদ্ঘাটন করেছেন তা সকলেরই জানা উচিত।

আমরাও একদা রেডিওর নিয়মিত শ্রোতা ছিলাম। তারপর 'বঙ্গ আমার জননী আমার'-এ যেদিন কলকাতার বেতার কর্তৃপক্ষ ভারতীয় আদর্শ-বিরোধী একটি পুস্তকের জঘন্য প্রচার সুরু করেন তখন থেকেই কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে শ্রোতা হিসেবে আর কোন যোগাযোগ রাখি নি। ঐ বেতার কর্তৃপক্ষ কিভাবে যে 'জনস্বার্থ-বিরোধী কর্ম করতে পেরেছিলেন, তার কারণ আজো খুঁজে পাই নি। জানি না এঁরা বিদেশী শত্রুর অর্থপুষ্ট কিনা? শুনেছি, কলকাতা বেতারকেন্দ্রের ভার যাঁর ওপর ন্যস্ত তিনি বাংলা ভাষা জানার ধার ধারেন না, সুতরাং তাঁকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অপরের ওপর নির্ভর করতে হয়। এবং সেই সুযোগে মনোমত ঘনিষ্ঠমহল, (যাতে প্রসাদপুষ্ট মহিলাদেরই প্রাধান্য), যা ইচ্ছে তাই করেন। আমাদের মনে হয়, নিয়ম যাই থাক না কেন, যে-রাজ্যের যে-বেতারকেন্দ্রের তিনি পরিচালক—তাঁর পক্ষে সেই রাজ্যের ভাষা জানা একান্ত দরকার। নচেৎ আশু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভীষণ গলদ ঘটতে পারে এবং কলকাতা বেতারকেন্দ্রে সেই গলদ নিয়মিতভাবে ঘটছে। নিয়মিতভাবে বলার কারণ এই যে, ঐ সুযোগে আশ্রিতজন অন্যায় সুবিধা লাভ করছেন। আকাশবাণীর কর্মচারীই যে সেই সুযোগের আঠারো আনা ভোগ করছেন, তার সুদীর্ঘ তথ্য আপনারা দিয়েছেন। জানি না, এই দুষ্কার্যের পরও তাঁরা কিভাবে চাকরীতে বহাল থাকেন এবং বেতারকেন্দ্রের পরিচালকেরই বিরুদ্ধেই বা কেন যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। প্রসঙ্গত আমরা কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী মহাশয়কেও সেই প্রশ্ন সবিনয়ে করতে পারি।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে আলোচনার পর আমরা "আকাশবাণী" পত্রিকাটি দেখে আরো তাজ্জব বনে গেছি। সাপ্তাহিক বসুমতীতে বলা হয়েছে মাত্র ১৭ই মে '৬৭ এবং ১৯শে মে '৬৭-তে একজন কর্মচারীর অন্যায় রকম প্রোগ্রাম লাভের কথা। আকাশবাণী পত্রিকাটি খুললেই দেখা যাবে, ২৮শে মে '৬৭ তারিখে কোনো একটি প্রোগ্রামের গ্রন্থনায় তাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছে! চাকুরীয়া হিসেবে গ্রন্থনা করতে পারেন। কিন্তু নাম ছাপা শুধু তাঁরই বা হচ্ছে কেন? অনেকেই তো অনেক বিভাগের গ্রন্থনা করেন। তবে ইনিই বা কেন বিশেষ সুযোগ পাচ্ছেন? কলকাতা বেতারকেন্দ্রকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ আন্দোলনে এগিয়ে আসুন।
—সুধীরচন্দ্র দে, হরিপদ দে, শীলা দে।
জিয়াড়া, বর্ধমান ॥

* * *

কলকাতা বেতারকেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপনারা যা লিখেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আপনারা নিয়মিত আলোচনার দ্বারা কলকাতা বেতারকেন্দ্রের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আজ হাজার হাজার লোক সাপ্তাহিক বসুমতী পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনেও সাপ্তাহিক বসুমতীর দান অপরিসীম। এখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। আপনারা লিখলেই জনতা জেগে উঠবে, সরকার সচেতন হবেন। কারণ, এখন দেশের লোক একমাত্র বসুমতীকেই অন্যায় দূরীকরণের একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে জানে।

কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ রেডিওতে প্রোগ্রামের ঘুষ দিয়ে কারো কারোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। এমন কি রেডিও-তে অংশগ্রহণ করেন এমন কেউ কেউ কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণে কম বা বেশি পারিশ্রমিক পান। বলা বাহুল্য যাঁদের কাছে তিনি সমর্থন আশা করেন তাঁদের তিনি বেশিই দেন। রচনা পাঠের জন্য যে সব চেক ইস্যু করা হয় তা দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। গত আড়াই বছরের চেকগুলি মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সমগোত্রীয় কবি, লেখক ও আলোচনাকারীদের কেউ কম আবার কেউ বা বেশি পাচ্ছেন। এইভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যায়কে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত?

প্রোগ্রাম বিতরণেও প্রভূত বৈষম্য আছে। আমি জানি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক দীর্ঘ আড়াই বছর কোন প্রোগ্রাম পান নি। তিনি সাহিত্যের একজন অথরিটি। তাঁর আলোচনা বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করি। তবুও তাঁকে কেন যে বাদ দেওয়া হয়েছে তা কর্তৃপক্ষই জানেন। অথচ আগে তিনি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে যথা নিয়মিত প্রোগ্রাম পেতেন।
—পুষ্কর দাশগুপ্ত, ৬।সি, নীলগঞ্জ রোড, বেলঘরিয়া।

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৪৮ সংখ্যায় (৭১ বর্ষ) "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" ও "জালালাবাদ দিবস" পড়লাম। শ্রীঅনন্ত সিংহের সুবিবেচিত লেখনী মাস্টারদার কঠোর ভূমিকা ও তাঁর অনুগামীদের যে বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। সেদিনের কবেকটি তরুণ তাদেব বলিষ্ঠ চবিত্র নিয়ে ও মাস্টারদার আদর্শ এবং একতাকে অবলম্বন করে সে যুগের বৃটিশ সিংহকে টলিয়েছিল। একদিনের জন্যও তাদের চট্টগ্রামের ভূমি থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

ত্রিশ দশকে কংগ্রেস তার অহিংস নীতির যতগুলো আন্দোলন করেছে তাতে যে আপোষের সুর ছিল তার ফলে বৃটিশ শাসন সহাবস্থানের ব্যবস্থায় গান্ধী, নেহরু এবং প্যাটেলকে কাছাকাছি পেয়েছিল, এই দেশের সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের লক্ষ্যকে তারা কোন পথে চালনা করেছে যার বিশেষ দৃষ্টান্ত ১৯৪৫ সালে বম্বেব নৌবিদ্রোহ এবং ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ। বিগত বিশ বছর কংগ্রেস তার সেই আপোষ নীতির অনুসরণে পুঁজিপতি, বহুৎ শিল্পপতি ও সাম্রাজ্যবাদের কায়েমী স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশকে আরও বেশি বিপদের মুখে ঠেলে দিল।

ছাব্বিশ বছব আগে ২২শে এপ্রিল জালালাবাদে যে ঘটনা ঘটেছিল তার শিক্ষা আপোষহীন সংগ্রামেব শিক্ষা, মাস্টারদার দীক্ষিত সমস্ত শহীদ বীর বিপ্লবীর অমূল্য জীবনের শিক্ষা, আজ মুক্তিকামী সমস্ত তরুণের জীবনে পথিকৃৎ হয়ে আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের কুলকাটিকার মাঝখানে যে বিভ্রান্তি এসেছে আপোষ নীতিব ফলস্বরূপ, আমাদের মুক্তিকামী তরুণেরা তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। আপোষহীন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে আজ তরুণ দল যেন তাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য স্থিব করে।

মাস্টারদাব দীক্ষাব সুযোগ লাভ কবেও যদি কোনও বিপ্লবীর দিকভ্রান্তি এসে থাকে, তবে ইতিহাসের শিক্ষা যেন তাকে আবাব অভ্রান্ত আপোষহীন সংগ্রামেব পথে লক্ষ্য স্থির করতে সহায়ক হয়। সে আশাই আজকেন তরুণসমাজেব। মাস্টারদাব দীক্ষাব সেই মন্ত্র ও তরুণদের "প্রতি শেষ ডাক" নামে যে চিঠি উল্লিখিত হয়েছে সে কথাই তাতে প্রকট হযে উঠেছে। শ্রীঅনন্ত সিংহকে ও বীর নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদের আমাব বিপ্লবী অভিনন্দন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

বিদ্যা বাউলীর বৃত্তান্ত

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সাত ॥

দোয়ালী গাঁওখানা এমন বড় কিছু নয়। মাত্র শ' তিনেক মানুষ গাঁয়ে। বিশ-বাইশ ঘর মুসলমান। পনেরো-বিশ ঘর হিন্দু। সব মিলিয়ে চল্লিশটা ঘর হবে হয়তো। এখানে বাবু যাঁরা, তাঁরা নাকি এক সময় ছিলেন খুব মস্ত জমিদার। অবশ্য এখানকার নয়। তাঁদের আদি বাড়ি কালাকান্দি। কালাকান্দিতে এখনো বাবুদের বিরাট বাড়ি আছে, তবে নদী থেকে সে বাড়ি আর বেশি দূরে নেই। হয়তো বছর পাঁচসাতের ভেতরেই সে বাড়ি নদীর গর্ভে যাবে। এখানে আছে সেই কালাকান্দির বাবুদেরই এক শরিক। বিশ পঁচিশ বছর আগে কালাকান্দি ছেড়ে এখানে এসে বাড়ি করেছিলেন। তখন তাঁদের দাপটে আর দাক্ষিণ্যে আরও বহু মানুষ এসেছিল এখানে। বাবুরা এলেই সঙ্গে আসবে ধোপা, নাপিত, জেলে, জোলা, পাইক, বরকন্দাজ আরও অনেকে। এসে-ছিলও তাই।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরে দু' তিনটে মহামারীতে গাঁওয়ের অনেক মানুষ মরে গেছে। অনেক মানুষ চলে গেছে। এখনো বাবুরা আছেন। বদনচাঁদ সরকার এখন কর্তা। কিন্তু সরকারবাবুদের আগের সেই দাপটও নেই, দাক্ষিণ্যও নেই। নানা শরিকে ভাগ হয়ে হয়ে এখন তাঁদের নিজেদের সংসারেই অনেক সময় অনটন আর অভাব বেড়ে ওঠে।

বাড়িটা পাকা, কিন্তু পুরোন হয়ে গিয়ে প্রায় জরাজীর্ণ। তাতেও আর কুলোয় না। আশেপাশে বড় বড় টিনের চালাঘরও করতে হয়েছে পাঁচ শরিকের স্থান কুলোনর জন্যে।

যদিও সামর্থ তাঁদের কমেছে। কিন্তু দাপট কমে নি। এখনো পাইক বরকন্দাজ আছে। তবে তারা পোষাক পরে থাকে না। শুধু পুণ্যাহের দিন জীর্ণ পুরোন পোষাক বার করে পেতলের চাকতি ছাই দিয়ে মেজে ঝকঝকে করে পরে। এখনো হাটে কোন চোর ধরা পড়লে বা কোন প্রজা কোন অসামাজিক কাজ করলে তাকে ধরে এনে পঁচিশ ঘা বেত অথবা তিরিশ ঘা জুতো মারা হয়। এখনো দুটো পুরোন বন্দুক ঘরে আছে। ছররা নিয়ে মাঝে মাঝে বদনচাঁদ সরকার বিলের ধারে পাখী শিকার করতে যান।

তাই এখনো গাঁয়ের একটা মর্যাদা আছে। পুজোপার্বণে গাঁও জমজমাট হয়ে ওঠে।

বদনচাঁদকে সবাই ভয় করে, শ্রদ্ধা করে।

কথাটা পেড়েছিল সেদিন দাউসা ব্যাপারী।—কি আর কমু কত্তা। জানেন নিচ্চয়। বকুলতলায় এউগা খেপী থাকে। ওডা বড় অনাছিষ্টি কইরব্যার লইছে।

বদনচাঁদ বললেন,—কি কইরাছে হারামজাদী?

—হে কথা বলনের না কত্তা। বাইর থিক্যা মানুষ ধইর‍্যা লইয়া আসে।

বদনচাঁদ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বসেই বলেন,—আইনব্যার দ্যাও। তাতে তোমার পরাণ চড় চড় করে ক্যান?

দাউসা ব্যাপারী লজ্জিত হয়।—আমার কিছু না কত্তা, কথাডা কানে আইল অপনেরে কইল্যাম।

—বুজজি। আমার প্রজা মাইয়ার উপুর ক্যান নজর দ্যাও। তোমারে কাইট্টা ফ্যালামু কৈল।

ধমক খেয়ে দাউসা ব্যাপারী দু' চারটে ঢোক গিলে উঠে যায়।

বদনচাঁদ বুদ্ধিমান। ঠিকই ধরে-ছিলেন, দাউসা ব্যাপারীর নজর পড়েছে খেপীর ওপর। কালাকান্দির ব্যাপারী তার গাঁওয়ের মেয়ের ওপর নজর দেবে। এটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

হলে হবে কি, কথাটা নিয়ে সর্বত্রই কানাঘুষো চলছিল।

সেদিন হাটখোলায় দাশু শেখের দর্জির দোকানে মনছুর মিয়া কথাটা নিয়ে জোর আলোচনা করছিল।

—আলার নামডা য্যান কি?

দাশু শেখ জামা সেলাই করতে করতে বলে,—মদন।

মনছুর হলদে দাঁত বার করে হাসে। গোঁপের দুটো চুল ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে বলে,—বাইল্লা রে, নামখানের বাহার আছে। এখান থিক্যা ওয়াকে তাড়ানের কাম। আলায় দিমু নাকি ওয়ার প্যাটে কোচ বসাইয়া!

মনছুর সরকার বাড়ির বরকন্দাজের কাজ করে। কোচ, বর্শা, রামদা কারো পেটে গলায় বসিয়ে দিতে ওর জুড়ি নেই।

এ তল্লাটে মনছুরকে ভয় করে সবাই। বদনচাঁদ সরকার কোন দুর্দান্ত প্রজাকে শায়েস্তা করতে হলে মনছুরকে পাঠায়। মদন এখানে এসেছে বলে মনছুরের রাগের কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও দাশু শেখ জানে মনছুর বড় বদরাগী। চণ্ডালের মত রাগ।

সেলাইয়ের মেশিন থামিয়ে তাকায় মনছুরের দিকে।

তাড়াতাড়ি বলে,—না, না, হুজ্জুত কইর‍্যা কাম নাই। ওয়াকে সজুত করুম আমি। তা মনছুর ভাই, তোমার এত রাগ দেহি কি কানে?

মনছুর সোজা কথা বলে,—ও আলার জন্যে ব্যাপারী বড় নাস্তানাবুদ অইছে। বাবু ব্যাপারীরে যা মন ন্যায় তাই কইছে। ওয়াকে আমি ছাড়ুম না।

—ব্যাপারী নি তোমারে ট্যাহা দিছে?

দাশু শেখ চোখ টিপে হাসে।

—না। টাহা পইসার কথা না। ব্যাপারী অখন আমাগো পাঁচ গাঁয়ের মাথা। মানীগুণী মানুষ।

দাশু শেখ বলে,—ব্যাপারীরে কইও। খেপী কৈল গুণতুক জানে। ব্যাপারীরে বাণ মাইর‍্যা দিবার পারে!

—আলায়, রাখেক বাণবুন। ও হগল ভুটকোয়ারা আমাগো শুনাইও না খলিফা।

মনছুর একটা বিড়ি ধরায়।

খলিফা দাশু শেখ বুঝতে পারে। কালাকান্দির ব্যাপারী মনছুরকে নিশ্চয় টাকা পয়সা দিয়েছে আর মদনের বিরুদ্ধে নানা ঘটনা শুধু নয়, দরকার হলে তাকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থাও করতে বলেছে। মনছুরকে বিশ্বাস নেই। কোন দিন অন্ধকার রাত্রে বিলের ধারে বিদেশী মানুষটার পেটে কোচ বসিয়ে দিতে পারে। তারপর বিলের পাঁকে পুঁতে ফেললে আর ধরে কে?

কালাকান্দির ব্যাপারী বিদ্যাধরীকে ছাড়বে না বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারী এখানে বিশেষ সম্মানী ব্যক্তি। বদনচাঁদ সরকারও তার ওপর খুশি নয়। কেন না পাটের চালানে কারবারে ব্যাপারী এখানে এখন সরকারবাবুদের চেয়েও অর্থবান। অসম্ভব পরিশ্রমী চতুর মানুষ দাউসা ব্যাপারী। গুণীমানী ব্যক্তি। একটু যা দোষ, ওই মেয়েমানুষ। কোন মেয়েমানুষ তার চোখে পড়লে তার আর রক্ষে নেই। যেমন করে হোক, তাকে বার করে আনবে। সরকারবাবুরা ওর এই দোষের কথা জানে। কিন্তু আটকাতে পারে না। বিশেষ কিছু করতে পারে না।

বিদ্যাধরীর সঙ্গে মদন ভুঁইয়া এখানে আসবার পর গাঁয়ে একটা রোল উঠেছে ঠিকই। কিন্তু সবচেয়ে উচাটন হয়েছে দাউসা ব্যাপারী। যেমন করে হোক বিদ্যাধরীকে তার বাগে আনতে হবে।

মনছুর বিড়ি টানতে টানতে বলে,—তুমি ওয়ারে সজুত করব্যা কি কইর‍্যা?

দাশু শেখ আবার মেশিন চালায়।—করুম। যখন করুম, তখন দেইখো।

ওরা দেখে, পরমানন্দ হালুইকর, মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে হুঁকো হাতে নিয়ে দাশু শেখের ছাপরার দিকে আসছে। সন্ধ্যার পর খলিফার দোকানেই ওদের মজলিস জমে।

হাটখোলার প্রথম সারিতে প্রথমেই পরমানন্দর দোকান, তারপর খলিফার ছাপরা, তারপরে মশলাপাতি, চালডাল। সাবান তেলের গোটা তিনেক দোকান। তারপরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠ ছাড়িয়ে কিছু দূরে ঢিপির ওপর কয়েকটা ঘর। সেখানে রাখী মালের গুদাম।

হাটখোলা সন্ধ্যার পর নিঝুম হয়ে যায়। তিনটে চারটে ছাপরায় লণ্ঠন ঝোলে। টিমটিমে আলোয় অন্ধকারের ঘন গাঢ় আস্তরণটা আরও যেন বাড়িয়ে তোলে। কেনাবেচা সন্ধ্যার পরে বেশি কিছু হয় না। কখনো-সখনো বোতল নিয়ে কেউ কেউ কেরসিন নিতে আসে। কেউ বা দু' চার পয়সা মশলাপাতি, কেউ বা হরিরলুটের জন্যে বাতাসা কদমা। অন্ধকার স্তব্ধ হাটখোলায় এই খলিফার দোকানটি তখন জমজমাট হয়। মাঝে মাঝে তাসের আড্ডা বসে। বেশি রাত্রে ভাঙ, গাঁজা, মদও চলে এখানে। অনেকে বলে, দাশু শেখ লুকিয়ে গাঁজা বিক্রি করে। ওইটেই নাকি ওর আসল ব্যবসা। দাশু শেখের চোখ দুটো সব সময় ঘুম-ঘুম। আধা বোজা। সব কথাতেই ওর হাসা অভ্যেস। কেউ গাঁজা বিক্রির অপবাদ দিচ্ছে ও ঘুম-ঘুম চোখে তাকায়। অল্প হেসে বলে,—নিব্যান নি দুই-চার আনা?

খলিফার দোকানের মজলিস বসে। গাঁয়ের যত রকমের কথা। যত বিত্তান্ত, সব ব্যাখ্যান করা হয় এখানে।

পরমা হালুইকর হুঁকোটা হাতে নিয়ে জমিয়ে বসল।

মিনিট খানেক যেতে না যেতেই পদ্ম-দিদি এসে ঢুকল, সঙ্গে মদন ভুঁইয়া।

পদ্মদিদি কোমর দোলাতে দোলাতে দোকানে ঢুকেই বলল,—অলো অ খলিফা!

পদ্মভূষণ ঘোষ—সবাই বলে পদ্মদিদি। দশ-বারোটা গাইগরু আছে, দুধ মাখন ঘি বেচাকেনা করে। লম্বা চেহারা, সামনের দাঁত দুটো উঁচু। ধুতিখানা পরে ধুতির কোঁচাটা খুলে মেয়েদের আঁচলের মত গায়ে জড়িয়ে নেয়। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে চলে। মুখে কাপড় গুঁজে হাসে, চোখের ঠারেঠুরে যে কোন মেয়েকে হার মানায়।

পদ্মদিদি ঢুকল খলিফার দোকানে।—অলো অ খলিফা, আমার জামাখান আর কবে বানাবি, মইলে পরে চিতায় লইয়া জমাখান দিয়া আসিস।

ঘুম-ঘুম চোখে তাকায় দাশু শেখ। পদ্মদিদির কেন অনেক দাদার পিরান তার কাছে কমের পক্ষে ছ'মাস পড়ে থাকে। তাগাদা করতে এলে ওই ঘুম-ঘুম চোখ আর হাসি-হাসি মুখ। রেগে যদি চেঁচাও খলিফার গলার আওয়াজ আরও থেমে যাবে। গালাগাল যদি কর হাসি-হাসি মুখে তাকাবে যেন একটা তামাসার কথা বলা হচ্ছে।

—দিমু দিমু। মঙ্গলবার আইস দিমু অনে।

—রাখলো তর মঙ্গলবার। কত মঙ্গল-বার গ্যালআইল। আ রাম রাম, একখান জামা বানাইতে দুই বচ্ছর!

কোমরটা বেঁকিয়ে গালে হাত রাখল পদ্মদিদি।

পরমা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল। মদনের দিকে তাকিয়ে পদ্ম-দিদিকে বলল,—ইনি কেডা?

—রইসো, আগে আমার জামার নিকাশ করি।

ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল দাশু শেখ মদনের দিকে। আস্তে বলল,—আইসেন, বইসেন।

মদন ভেতরে ঢুকে বসল।

পরমা হুঁকোটা মুছে এগিয়ে দিল মদনের দিকে।—লন, তামুক খান।

মদন নাকটা টেনে হুঁকোটা নিল।

মনছুর এতক্ষণ মদনের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখের দৃষ্টিটা কড়া করে বলল,—আপনেরে য্যান নতুন মনে লয়।

পদ্মদিদি চোখ ঘুরিয়ে গালে হাত রাখে।—অ লো আমার লো, কয়েন কি মনছুর মিয়া। মদনরে চিনেন না? পুরা এউগ্গা মাস হইয়া গেল। মদন এয়ানে আইছিল। সে কি আইজের কথা। কবে বান কইব্যান আমারেও চিনেন না। কপাল আমার!

পদ্মদিদি আঁচলের খুঁটটা মুখে গুঁজে খুক খুক করে হাসে।

মনছুর হাসে না। বলে,—কোয়ানে আইছেন।

এবারে পদ্মদিদি বললে,—অ লো, খেপীর ঘরে আইছে। কিষ্টযাত্রার কিষ্ট আছিল। বড় সোন্দর গাওনা গায়। গায়েন মদন ভাই। এয়াগো একখান পদ শুনাইয়া দ্যান।

মদন হুঁকোয় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসে।

মনছুর একটা বিড়ি ধরায়। বলে,—কথাডা বুঝবার পারেন নাই পদ্মদি। এনার

লগে বাউলীবিবির সম্পক্কডা কি? হেই অইল কথা।

—এডাও নি বুঝলা না মিয়াভাই। তোমার লগে আমার সম্পক্ক কি? পরমার লগে খলিফার সম্পক্ক কি? মানুষের লগে মানুষের সম্পক্ক। ওয়া আপনেই জম্মায়। দ্যাও গো মদন ভাই হুকাডা দ্যাও, দুইডা টান দেই।

পম্মদিদি মদনের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে কলকের টিকে আঙুল দিয়ে উলটে পালটে ফুঁ দিয়ে হুঁকোর টান মারে। পরমা মদনের দিকে তাকায়।—বাবুগো বাড়ি গেছিল্যান এয়ার মধ্যে?

—না যাই নাই।

মদন ঠোঁট মোছে। অপরিচিত মানুষদের দিকে তাকায়।

—যাওন উচিত ছিল কি কও শ্যাখ?

দাশু শেখ সেলাই করতে করতেই বলে,—হ।

পরমা একটা হাই তোলে। মনছুরের দিকে দেখিয়ে বলে,—মিয়াভাই বাবুগো বাড়ির বরকন্দাজ।

মনছুর বিড়িটা টেনে টান টান হয়ে বসে।

খলিফা দাশু শেখ বলে,—আপনের গাওনা শুননের ইচ্ছা আছিল।

মদন অল্প হাসে। আস্তে বলে,—শুনামু।

—কাইল আইসেন।

পম্মদিদি হুঁকো নামায় মুখ থেকে। —মদনভাই একখান পিরান বানাইব। কাইল আইসা কাপড় কিন্যা দিয়া যাইব। বুঝলা নি খলিফা।

—হ।

—বানাইয়া দিবা কবে তক?

—দশ বারোডা দিন লাগব।

—আহা লো, কি কথা শুনাইলা? পরাণ ঠাণ্ডা অইল। আমার পিরান বানাইতে দিছি চাইর মাস হইয়া গ্যাল। অখনো কাপড়খানে কাণ্ডি পর্শ করো নাই। তুমি বানাইবা দশদিনে। মরণ আমার!

দাশু শেখ ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল। মুখখানায় অমায়িক হাসি।

হুঁকোটা রেখে উঠল পম্মদিদি।—লও যাই। কাম আছে।

পম্মদিদি আর মদন উঠে দোকান থেকে বেরোল।

মদনকে খলিফার দোকান চিনিয়ে দিতে এসেছিল পম্মদিদি। বিদ্যাধরী পম্মদিদির সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাল আবার হাটখোলায় আসবে। কাল হাটবার। জামার কাপড় কিনে খলিফার দোকানে মাপ দিয়ে যাবে। তারপর তাগাদা করতে হবে কিছুদিন। খলিফাদের যে তাগাদা না করলে কাজ হয় না, এটা সবাই জানে।

মদন মাঠে গেলে পম্মদিদিকে বলল,—আপনের পিরান দিব কবে?

—আমি মইলে।

কোমর দুলিয়ে চলতে চলতে রাগে ফেটে পড়ে পম্মদিদি।—আই, আই, ওয়ার কথা আর কওনের না। তুমি কিন্তু ওয়ার ভরসায় বইস্যা থাইক না। ঘাড়ে পাড়া দিয়া আদায় কইর‍্যা লইও।

মদন হাসে। ভয়ে ভয়ে হাসে। কেন না হাসলে পম্মদিদির গোঁসা হয়। তার ধারণা ওকে দেখে সবাই হাসে। অথচ নিজে ও মানতে রাজী নয় যে হাসাবার মত কিছু ও করে। কোমর দুলিয়ে না চলে ও পারে না। আঁচলখানা গায়ে না তুললে কেমন উদলা উদলা মনে হয়। পম্মদিদির মেয়েলী ভাব-সাব পম্মদিদির কাছে স্বাভাবিক। সে এতে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায় না। বরং তার এই ভাব-সাবের জন্যে গাঁয়ের মেয়েমর্দা সকলের কাছে তার অবারিত দ্বার। দই বেচতে গিয়ে বাড়ির ভেতর অধিকারী গিন্নির প্রথম মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ক'খানা শাড়ি দিয়েছে পুজোয় এ খবরও যেমন জানে, তেমনি বটকেষ্ট তার বৌকে ধরে ঠ্যাঙায় বলে তার সঙ্গে ঝগড়া করে আসতেও জানে। মেয়েরাও হাসে। পুরুষরাও হাসে। অথচ পম্মদিদি যেন এ গ্রামের খবরের কাগজ, যে খবর চাও পম্মদিদির কাছে পাবে। প্রতিটি পরিবারের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা।

বিদ্যাধরীকে পম্মদিদি বড় ভালবাসে। মেয়েটা বড় সহজ সরল অথচ খাঁটি, ভেজাল নেই। পম্মদিদি নিজেও যেমন দই দুধ ঘিয়ে ভেজাল দেয় না। মানুষের ভেতর ভেজাল পছন্দ করে না।

কাঁধে বাঁক নিয়ে দই দুধ বাড়ি বাড়ি বেচে ফেরবার পথে বকুলতলায় ওই ছাপরাটার ধারে গিয়ে মাঝে মাঝেই দাঁড়ায় পম্মদিদি। বেলা তখন স্বর্গে। দুপুর। হাঁক দেয় পম্মদিদি,—অলো অ খেপীদিদি, ঘরে আছ নি?

বিদ্যাধরী তখন হয়তো কাঁঠালের বীচি পুড়িয়ে নিচ্ছিল উনুনে। ছোট পাকঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—লও, ভাণ্ড লইয়া আইস।

বিদ্যা একটা কলাইয়ের বাটি নিয়ে আসে। পম্মভূষণ ঘোষ ঘিয়ের চাঁছি, দুধের মাঠা, অথবা হাঁড়ি চাঁছা দই, যা থাকে বাটিটায় দেয়। তারপর হাসে, বলে—নতুন গান বাধা হইছে নি? বিকালে আসুম অনে, শুনুম।

বিদ্যাধরী নতুন কোন গান বাঁধলে পম্মদিদিকে শোনাতেই হবে। বিদ্যার আওয়াজ শুনে পম্মদিদি বড় খুশি হয়। বিদ্যাধরীকে স্নেহ করে, ভালবাসে।

আজ বিকেলেও পম্মদিদি ক্ষীর বেচে ফেরবার সময় বিদ্যাধরীকে খানিকটা ক্ষীর দিয়ে গিয়েছিল। উঠোনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল মদন। কিছু পাট নিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল।

বিদ্যা বললে—শুনছ দিদি, আমাগো ওনার পিরান ছিড়া গ্যাছে গা?

পম্মদিদি বলল—কেমুন কইর‍্যা ছিড়ল?

খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী। সে কথা আর কওনের না। গ্যাছিলেন কাইল কুমির ঘরে। ফিরনের পথে পাউচাগো বলদডা শিং উঁচাইয়া ঘাই দিব্যার আইছিল। উনি দৌড়াইব্যার গিয়া পড়লেন কান্দারের কাটায়। ফড় ফড় কইর‍্যা পিরান ছিড়্যা গ্যাল।

পম্মদিদি কোঁচার আঁচল মুখে দিয়ে খুক খুক করে হেসে উঠল।—মরণ আমার!

বিদ্যা বললে—উনি খলিফার ঘর চিনেন না।

—কও কি! হাটখোলা চিনে না?

মদন কথাগুলো শুনছিল। মুখখানা গম্ভীর করে বসেছিল। কথাটা সত্যি। কিন্তু ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে কাঁটায় যদি জামা ছিঁড়েই গিয়ে থাকে, তাতে এত হাসির কি আছে? সেই থেকে বিদ্যাধরী মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে।

পম্মদিদি বলল—আমি যামু খলিফার ঘরে। ওয়ারে আইসা লইয়া যামু অনে।

সেই কথাই রইল। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই পম্মভূষণ ঘোষ এল। তার কথার খেলাপ হয় না। মদনকে নিয়ে হাটখোলার খলিফার দোকানে গেল। কথাবার্তা সব বলে দিয়ে এল। কাল হাট থেকে কাপড় কিনে দিলেই কিন্তু সব কাজ হোল না। দাশু

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৮০

শেষের কাছ থেকে পিরান আদায় করা যার-তার কর্ম নয়। বিশ মাসে তার বছর। সাবধান করে দিল মদনকে—ঘাড়ে পাড়া দিয়া থাইক। তা নইলে ছ' মাসেও জামা বানান হবে না।

মাঠটা কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে বকুল-তলার উঁচু পাড়ে উঠল। বিশাল একটা বকুলগাছ পাড়ের ওপর। তলায় পুকুর। পুকুরের একটা কোণে জমেছে হিঞ্চে আর কলমী শাক। খাবার যখন কিছু না থাকে, শুধু ভাত ক'টা রেঁধে বিদ্যাধরী চলে আসে বকুলতলার পুকুরে। কিছু হিঞ্চে আর কলমী তুলে নিয়ে যায়। তাই দিয়ে ভাত খাওয়া হয়।

বকুলগাছের নিচে জমাট অন্ধকার। ওইখানেই দাঁড়াল পদ্মদিদি, মদনের দিকে তাকাল।

হঠাৎ বলল—এউগা কথা কমু?

—কয়েন।

—এয়ানে আইছ কি কামে?

—আমি আহি নাই। খেপী লইয়া আইল।

একটা নিশ্বাস ফেলে পদ্মদিদি বলল—তোমারে দিয়া খেপীর কি কাম?

মদন সহজভাবে বলল—আমি জানি না।

পদ্মদিদি গলা নামিয়ে বলল—তুমি জান বান না জান, ঘরে রতন থাকলে তার উপরে সপলের কুদিষ্ট পড়ে। কথাখান মুইক্যা লও। সাবধানে চলাফিরা কইরো। এয়ানে মানষের জ্বালানী-পুড়ানী বেশি। না আইলেই ভাল কইরতা। যাউক, আইছ যখন, সাবধান থাইক। রতন লইয়া ঘরে থাকলে চোর ডাকাইতের ভয় নাইক্যো।

মদন কথাগুলো খুব ভাল করে বুঝতে পারল না। এটুকু বোঝা গেল যে দুর্জন তার পেছনে লাগবে। তাই তাকে সাবধান করে দিচ্ছে পদ্মদিদি। রতনটি কে? খেপী? খেপীর জন্যেই কি তাকে সাবধানে থাকতে হবে? কারণটা কি? খেপীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি যে সাবধানে থাকবে। খেপীর মত খেপী থাকে, তার মত সে থাকে। যে কোনদিন সে এখান থেকে চলে যেতে পারে।

খেপী তার ঘরের বৌ নয়। অথবা বাইরের মেয়েমানুষও নয়। বাউল-বাউলী ওরা। সাধন-ভজন করে। গান গায়, ভিক্ষে করে। হাসে, খেলে, খায়-দায়, আকাশের পাখীর মত উড়ে বেড়ায়। বিদ্যাধরী খাঁচার পাখী নয়। সে বিদ্যাধরীকে বাঁধবার কোন চেষ্টাই করে নি। সে জানে সে চেষ্টা বৃথা। আকাশে যে পাখী ওড়ে, তাকে কি হাত বাড়িয়ে ধরা যায়?

বিদ্যাধরীর সঙ্গে তাই কোন সম্পর্কই তার গড়ে ওঠে নি এখনো।

তার ঘরে রতন কোথায় দেখল পদ্ম-দিদি। রতন তার নয়। এ রতন পড়ে আছে মাঠে-ঘাটে। যে খুশি কুড়িয়ে নিক। তার কি আসে যায়। সে ঘরে বন্ধ করে রাখে নি।

—কথাডা আপনে ঠিক কইল্যান না।

পদ্মদিদি বকুলগাছের তলায় আরও ঘন অন্ধকারে মদনের কাছে এল—ক্যান?

সোজাসুজি বলল মদন—রতন আমি ঘরে বন্ধ কইর‍্যা রাখি নাই।

—তুমি নি হাসাইল্যা মদনভাই। তুমি রাখ বান না রাখ, খেপীদিদি তোমার কাছে বাঁধা পড়ছে।

—তার আমি কি জানি?

—তোমার জাননের কথা কই না। মানুষে জানে। খেপীদিদিরে যারা চাইছিল, তারা দাফাইয়া মরত্যাছে। অগো, কথা আমি ভুল কই নাই। পরে বুঝব্যা।

পদ্মদিদি ঘুরল।—চললাম। ঘরে কাম আছে।

চলে গেল পদ্মদিদি।

বকুলতলার ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল মদন।

পদ্মভূষণ ঘোষ এখানকার বাসিন্দা। গয়লা বলে দই দুধ বেঁচতে তার সব ঘরে যাতায়াত আছে।

ও দেখেছে, মানুষটা সকলের প্রিয়। ছেলে বুড়ো মেয়ে মর্দ সকলের সঙ্গে তার সমান খাতির। তার কথাটা খুব ফ্যালনা বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। একটু ভাবিত হোল মদন ভুঁইয়া।

এক মাস হোল এসেছে সে এখানে। মেলা থেকে খানিকটা ঝোঁকের বশে বিদ্যা-ধরীর সঙ্গে সে চলে এসেছিল। কিছু জানবার প্রয়োজন মনে করে নি। কোন খবরাখবর নেয়া দরকার মনে করে নি। যাত্রাদলের অধিকারীর কাছে ভীষণ অপ-মানিত হয়ে সে যখন ভাবছিল, যাত্রাদল তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এ-দলে আর থাকা যাবে না। কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে যখন ঠিক করে উঠতে পারছিল না, সেই সময়ে বিদ্যাধরী তাকে বলে বসল, চলো আমার সঙ্গে।

ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা না পেয়ে সে তখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাধরীর সঙ্গে চলে আসাটা ঠিক করে ফেলেছিল। শুধু যে একটা আশ্রয়ের জন্যে তাও ঠিক নয়। বিদ্যাধরীর কথায় গানে হাসিতে ও খোলা হাওয়ার মত একটা মুক্ত আমেজ পেয়ে-ছিল। যাত্রাদলের হিংসেহিংসি দলাদলিতে ভেতরটায় যেন অনেক ময়লা অনেক যন্ত্রণা জমেছিল। বিদ্যাধরীর হাসির তোড়ে মাত্র একটু সময়ে সব যেন উড়ে গেল, খোলসা হয়ে গেল।

একটা অন্য স্বাদ পেল। সে স্বাদটা কি ও জানে না। ভাল লেগেছিল। শুধু ভাল লেগেছিল বললেই একমাত্র কিছু বলা যায়। এতকালের হাল চাষের বলদ যেন ছাড়া পেল সবুজ মাঠে আর আকাশে।

ঠিক ভাল করে নিজেও বুঝতে পারে না মদন, কেন ওর ভাল লেগেছিল, কি ওর ভাল লেগেছিল। ও কি বিদ্যাধরীর উদ্ধত যৌবনকে চেয়েছিল? না, এমন কথা কখনো মনে হয় নি। বিদ্যাধরীর সঙ্গে সংসার-ধর্ম করতে চেয়েছিল? মেটেই নয়। বাউল-বাউলীর আবার সংসার! ও কি জানত না যে বিদ্যাধরীকে সংসারের দড়িতে বাঁধা যাবে না। খুব জানত।

তবে কি চেয়েছিল মদন? কি যে চেয়ে-ছিল ও পরিষ্কার বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, ভাল লেগেছিল। কি যে ভাল লেগেছিল সেটাও স্পষ্ট করে বোঝা যায়। বিদ্যাধরী কাছে বসে, তার দিকে তাকায়, হাসে, গান গায়, তার ভাল লাগে। আর কিছু সে চায় না। ও বেশ বুঝতে পারে ভাবনা-চিন্তার কতকগুলো দড়িদড়া আছে, যেগুলো জট পাকিয়ে যায়, টানাটানি করতে গেলেই যন্ত্রণা। বিদ্যেধরী যেন যাদু জানে। ওর কাছে বসলে সেই দড়িদড়াগুলো নিমেষে আলগা হয়ে যায়। মনে হয় যেন হাল্কা হয়ে পাখীর মত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। মদন ভুঁইয়া এই আশ্চর্য স্বাদটা পায়।

বিদ্যাধরীকে দেখা যেন আকাশ দেখা। বিদ্যাধরীর কথা গান যেন মাঠের খোলা হাওয়ার আওয়াজ। এমনি একটা অনুভূতি ওর মনে আসে। কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। কি চায়?

চাইবার আছে বা কি? চাওয়ার কথা মনেই আসে না। বিদ্যাধরী কিছু চায় না। ওর কাছে বসলে কিছু চাইতে ইচ্ছে হয় না। চাওয়ার কথা ভুল হয়ে যায়। সত্যি সত্যি মনে হয় চাইবার আছে কি? গান গাও নাচ, হাস-খেল, চাওয়া-চাওয়ি আবার কিসের!

না, আজ পর্যন্তও বিদ্যাধরীর কাছে সে কিছু চাইতে পারে নি। বিদ্যাধরীও তার কাছে কিছু চায় নি। এ কথাটা ও পরিষ্কার বুঝেছে। বিদ্যাধরীর চাইবার মত কোন প্রয়োজনই বোধ হয় নেই। কিছু দিতে পারে। কিন্তু মদন তার কাছ থেকে কিছু নেয় নি। আজ আছে কাল নেই। পথে দেখা আবার দু'দিন পরেই হয়তো কোথাও চলে যাবে সে। তাই চাওয়া-নেওয়ার কোন প্রয়োজন মদনও বোধ করে নি।

বিদ্যাধরী তার কেউ নয়। সে-ও বিদ্যা-ধরীর কেউ নয়। দু-চার দিনের জন্যে একটু বাস করা। আবার এ বসবাস ভাল না লাগলে অনায়াসে অন্য কোথাও চলে যাবে সে। গিয়ে আবার দল বাঁধবে। নিজের একটা যাত্রার দল বাঁধবার ইচ্ছে আছে মদনের। কোথায় কেমন করে একটা দল বাঁধা যায়, সেসব ভাবনা এখনো ভাল করে

ভাবে নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানে যদি কোন সুবাধে হয়, তবে একটা যাত্রার দল সে গড়ে তুলতে পারে।

ভিক্ষে করতে সে পারবে না। ওইটে তার কেমন যেন ঠিক ভাল মনে হয় না।

মদন ভুঁইয়া বকুলগাছের তলা থেকে একটু এগিয়ে পুকুরপাড়ে বসল। আকাশটা মেঘলা করেছে। বেশ দমকা বাতাস বইছে। পুকুরে ব্যাং ডাকছে। বকুলগাছের তলায় অন্ধকারে অনেক জোনাকীর আনাগোনা। মদন একটা বড় নিশ্বাস ফেলে ঘাড় পর্যন্ত ঝাবরি চুল হাত দিয়ে সমান করল।

ভিক্ষে করতে সে পারবে না।

এখানে আসবার দিন দুই পরে সকলে উঠে ঘরদোর সেরে বিদ্যাধরী পুকুরে যখন স্নান করতে গেল, মদন তখন উঠে সবে বিড়ি ধরিয়েছে একটা। হাত মুখও ধোয়া হয় নি।

বড় চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল ওর। যাত্রাদলে বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া অভ্যেস। এখানে ঘুম ভাঙতে অবিশ্যি বেলা দশটা হয় নি। তবু তখন মাঠে রোদ নেমেছে। তখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। একটু পরেই রোদের তেজটা বেশ বেড়ে উঠবে। গা চিড়বিড়িয়ে উঠবে।

বিদ্যাধরী পুকুর থেকে এসে মদনকে হাঁ করে বসে থাকতে দেখে হেসে বলেছিল—বইয়া রইছ ক্যান? চান কইর‍্যা লও। তোমারে লইয়া বাইর হমু।

—কনে যামু?

আস্তে আস্তে বলে মদন।

বিদ্যাধরী গামছাটার ভেতরে চুলের গোছা নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নেংড়াতে থাকে। বলে—তোমারে গাও দ্যাখাইয়া আনুম। মানুষে কালা মদন দেইখ্যা চাউল দুইডা বেশি দিবার পারে।

মদনের মেজাজটা ভাল ছিল না। চা না পেয়ে দেহটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। বিদ্যাধরীর কথা শুনে বিরক্ত হোল।

বলল—আমি ভিক্কায় বাইর হমু না।

খেপীর চোখ দুটো বড় বড় হয়।—ওমা, ভিক্কা করে কেডা আমিও কাউর কাছে কিছু চাই ন্যা।

—চাউল ডাইল তোমারে এমনি দ্যায়?

—নাচন গাওন শুইন্যা দ্যায়।

বিদ্যাধরী টান টান হয়ে দাঁড়ায়। ভেবেছে কি কালা মদন? সে ভিক্ষে করে? ভিক্ষে সে করে না। তার নাচ গান শুনে মানুষ চাল ডাল, কেউ বা দুটো বেগুন, কেউ বা আধখানা কুমড়ো, যে যা পারে দেয়। কেউ যদি কিছু না দেয়, খেপী তার জন্যে গলা শুকিয়ে বসে নেই। একমুঠো মুড়ি খেয়ে দিন কাটিয়ে দেবে।

মদন চোখ দুটো ঘোরায় মাঠের দিকে।

—আমি যামু না।

হাসির কথা নয়, তবু বিদ্যাধরী ফিক করে হেসে ফেলে। ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা গাল দুটোর ঘুণ্টির মত দুটি টোল পড়ে। মদনের চাদর ওপর গামছা নিংড়োয়, ওর মাথায় জল পড়ে।

—এত গোঁসা কি কামে। ভুতুম হইয়া বইয়া রইছ।

মদন আরও বিরক্ত হয়। বাঁ হাতে কপালের চোয়ান জল মোছে।

বিদ্যা কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢোকবার আগে বলে—চানডা কইর‍্যা লও। আমি সাইয়ের নাম লইয়া গাওখান ঘুরা দিয়া আসি। গোঁসা কইর‍্যা পলাইও না।

হাসছিল বিদ্যাধরী। গোঁসা কাকে বলে জানে না ও। হাসন ছাড়া কথা নেই।

মদন বলে—তুমি চা খাও নি?

ফিরে তাকায় খেপী। চোখ দুটো টস্‌টসে, চোখের কোণ দুটো ফুলো ফুলো।

বলে—পাইলে খাই। না পাইলে খাই ন্যা।

গান শুনিয়ে যার ভাত ফোটাতে হয়, সে চা পাবে কোথায়? চা চাই, চিনি বা গুড় চাই, দুধ চাই। কিছুই তো নেই। থাকবার কথাও নয়। মদন কথাটা তখন অত তলিয়ে ভাবে নি। বাউল-বাউলীর ঘরে ভাণ্ডার থাকে না। কথাটা ওর ভাবা উচিত ছিল। ভাববার মত মেজাজ ছিল না তখন।

খেপী পেঁচিয়ে শাড়ি পরে খঞ্জনী নিয়ে কাঁধে একটা থলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মদন বসেছিল উঠোনটায়। বকুলতলার পাড় দিয়ে খেপী এগিয়ে চলেছে। মাথায় চুড়োর মত করে এলো খোঁপা বাঁধা। খাট একখানা শাড়ি পরণে। কিন্তু কি আশ্চর্য দেহখানা খেপীর। নিটোল ভরাযৌবন নিয়ে টান টান হয়ে চলেছে। বিলের ধারে বকের মত হাল্‌কা পায়ে এগিয়ে চলেছে। চলছে যেন চারপাশে খুশির হাওয়া তুলে চলেছে। ঢেউ তুলে চলেছে।

মদন অবাক হয়ে দেখছিল। বরাবরই ও এমনি দেখে আসছে। খেপীর খুশির জোয়ার যেন অফুরান, ভাটা দেখল না মদন। এত জুরি-জারি ওর কিসে আসে ভেবে পায় না মদন। খেপীকে ভাল না লেগে উপায় আছে?

হ্যাঁ, আওয়াজ তুলেছে খেপী। বকুলগাছের পাতার ঝুরঝুরে শব্দের সঙ্গে আওয়াজ হাওয়ায় হাওয়ায় এসে কানে লাগে।

গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।
মানুষ আইন্যা বসাইলাম পৈঠায়।
অ দয়াল গুরু আমার
গুরু তোমার নিশান রাখা হইল দায়।

আওয়াজটা ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। বিদ্যাধরী বকুলগাছের ডানদিকের পথ ধরে গাছগাছালির আড়ালে মিলিয়ে গেল।

মেজাজটা যেন আওয়াজের হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে দিয়ে চলে গেল খেপী। অবাক হয়েছে মদন। দেখেছে যখনই মনটা আকুপাকু করে ওঠে। মেজাজটা টং হয়ে থাকে কোন না কোন কারণে, খেপীর এক ঝলক হাসি, আর আওয়াজের হাওয়া মনের উঁচুনিচু জমিন সমান করে দেয়। আলগা করে দেয় ভেতরটা। বাইরেটা হালকা করে দেয়। এটা যে কেন হয়। কি করে যে এমনটা হয়, মদন বোঝে না।

একটানা খুশির উজান বজায় রেখেছে খেপী, ভাটি কাকে বলে খেপী জানে না। তাজ্জব কারখানা।

সেদিন স্নানটা সেরে নিয়ে মদন টের পেল বেশ খিদে পেয়েছে। আবার আনচান করে উঠল মনটা। বড় ঝাঁপি জালে পড়া গেল দেখছি। চায়ের সময় চা নেই, খিদে পেলে খাবার নেই। বাউল বাউণ্ডুলের ঘরে এসে শেষে দেহটা ব্যামোয় ধরবে কি না কে জানে।

মদন দোরের ঝাঁপ বন্ধ করল। দড়ি দিয়ে ঝাঁপ বাঁধল। তালা নেই। চাবি নেই। তালার কাম কিসের? বাউলের ঘরে তালা! পাটের একটা দড়ি দিয়ে ঝাঁপটা বেঁধে রাখলেই যথেষ্ট। গরু বাছুর পাঁঠা কুকুর ভেতরে না ঢোকে। তালা দেবার তাগিদ কিসের? আছে কি যে তালা দেবে। বোঁচকায় কানাকড়ি নেই। ভাণ্ডারে একমুঠো চাল নেই। ঘরে তালার কামটা কি? কিন্তু মদনের যে আছে। ফুল আঁকা টিনের বাক্সটায় গোটা কতক টাকা আছে। কেউ ঘরে ঢুকে বাক্সটি বগলদাবা করে মাঠ পেরিয়ে গেলেই অন্ধকার।

তবে একটা কথা আছে। এ ঘরে কেউ ঢুকবে না। সবাই জানে, থাকবার ভেতর ছেঁড়া কাঁথা, দুখানা কাপড় আর মাটির হাঁড়ি কলসী, কলাইয়ের দুটো থালা বাটি, আর আছে কি? মদনের টাকার খবর কে জানে! মদন যে এখানে এসেছে, তাই এখনো গাঁয়ের সবাই জানে না।

[ক্রমশঃ]

যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা আরও একবার মাথা তোলবার চেষ্টা করেছিল গত রবিবার ২৮শে মে তারিখে। ইণ্টালী এলাকায় সামান্য একটি জুয়া খেলার পরিণতিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ব্যাপারটি বেশি দূর গড়াতে পারে নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত যিনি পশ্চিমবঙ্গে ল এন্ড অর্ডার বিপন্ন হবার কথা বলছেন, এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তারিফ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিগত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের দুয়েকটি স্থানে যে মিউনিসিপ্যাল ইলেকসান হয়েছিল, যথা হাওড়া, দমদম, রিষড়া ও নৈহাটি, সেগুলির সবকটিতেই কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। এই নির্বাচনের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পিছনে রয়েছে এবং কংগ্রেসের কবর খননকারীর সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে গেছে।

কিন্তু যদি এতেই যুক্তফ্রন্ট সরকার আত্মতৃপ্তিতে স্ফীত হয়ে ওঠেন, তার চেয়ে শোচনীয় ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না। জনসাধারণের মনের মধ্যে একটা ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীরা কর্মকুশল ও সৎ হলেও তাঁরা সর্বত্রই অকারণ ভালোমানুষীর পরিচয় দিচ্ছেন, যার কোনই প্রয়োজন নেই। জনসাধারণ এ আশা করেন না যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার দেশের সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন, জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবেন, তাঁদের হাতে স্বর্গরাজ্য এনে দেবেন। তাঁরা শুধু নির্মল ও কর্মদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার পরিচয় পেতে চান। এখনো পূর্ণ মাত্রায় দুর্নীতি রয়েছে. উৎকোচ রয়েছে. এখনো সেই লাল ফিতার বাঁধন। প্রশাসন ব্যবস্থার ওপরতলায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ রদবদল হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা স্বাস্থ্যদপ্তরের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই দপ্তরটির প্রতি জনসাধারণের অভিযোগের অন্ত নেই। আমরা বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে একের পর এক প্রত্যক্ষ অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছি, কিন্তু ফল কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সেই ডেপুটি সেক্রেটারী, সেই দুজন ডেপুটি ডিরেক্টার, সেই পি এ বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এঁদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের কোন প্রতিকারও করেন নি, এবং আমাদের অভিযোগগুলি যে অসত্য সে কথা ঘোষণা করা বা প্রতিপাদন করারও কোন চেষ্টা করেন নি। অথচ জনসাধারণ এই সব অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতিকার আশা করেন। যে সব উচ্চপদস্থ আমলারা ও পুলিশ প্রধানরা কংগ্রেসী আমলে বর্তমান যুক্তফ্রন্টের নেতাদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে, তাদের যখন আজও বহাল তবিয়তে টিঁকে থাকতে দেখা যায়, জনসাধারণ তখন হতাশা বোধ না করে পারেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মোটেই সুনজরে দেখছেন না। পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলা বিপন্ন এটা প্রমাণ করতে কেন্দ্রের অনেকে উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রধানমন্ত্রীরও মনোভাব খুব ভাল না। ঘেরাও নিয়ে পার্লামেণ্টে বহু হৈ চৈ করা হচ্ছে। এদিকে একটি বৃহৎ বণিকগোষ্ঠীর একটি অর্থনৈতিক পত্রিকা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মালিক পক্ষ কতগুলি ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের রায়সমূহকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে কতগুলি ক্ষেত্রে ছাঁটাই ও লে অফ হয়েছে তার বিশদ হিসাব-নিকাশ দিয়ে।

অপরদিকে আবার কয়েকজন উগ্রপন্থী নেতার হঠকারিতাপূর্ণ উক্তি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে। যিনি—অন্ধ্রপ্রদেশের ভাবী মুখ্যমন্ত্রীরূপে আগাম শপথ পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছিলেন এবং যাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এমনই মহিমা যে শেষ পর্যন্ত সেখানকার জাঁদরেল কমিউনিস্ট পার্টি এমন কোমর ভেঙে পথে বসে পড়ল যে, আর তাকে চাগিয়ে তোলা গেল না—সেই সুন্দরায়া অকস্মাৎ খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন আজেবাজে কথা বলে বসলেন যে, মন্ত্রিসভায় তাঁরই দলের সদস্যেরা পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন। এই জাতীয় অপরিণামদর্শী উক্তি জনচিত্তে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, যাঁরা মনে প্রাণে আজীবন বামপন্থী, যাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মত বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁরা অনেকেই আজ বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, তাহলে কি কোন কোন দল যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকে থাকার চেয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধিটাকেই বড় করে দেখছেন?

এতে অবশ্য সন্দেহের কোন কারণই নেই যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে ঐক্য রয়েছে এবং এই মন্ত্রিসভা সত্যই একটি অখণ্ড সত্তারূপে কাজ করছেন, কিন্তু মন্ত্রিসভার সদস্যরা যে-সকল দল থেকে প্রেরিত হয়েছেন সেই দলগুলি কোন ঐক্যবোধের পরিচয় দিতে পারছেন না। এই দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় বিষোদ্গার করছেন, নিজেদের মুখপত্রগুলিতেও তাই। পার্টিগুলির র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইলেও সেই প্রাক্-নির্বাচনী বিরোধ প্রায় সমভাবেই রয়েছে। জনমনের ওপর এইগুলি স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তদুপরি চোদ্দটি দলের চোদ্দ রকম লাইন (প্রত্যেক দলই তা

সবেমাত্র বেরিয়েছে

ক্রীমটি সত্যিই ভাল!

সাধনা বিউটি ক্রীম

মেয়েদের ত্বক-সৌন্দর্যের গোপন রহস্য

প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য

কুসুম-কোমল পাপড়ি-পেলব যৌবন-সুলভ লাবণ্যময় সজীব ও সুন্দর ত্বক—এই তো সাধনা বিউটি ক্রীম-এর সবচেয়ে বড়ো অবদান।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস (লণ্ডন) এম সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য।

S-Sa-2/67

নির্ভুল বলে দাবি করে) একই সঙ্গে অনুসরণ করা অসম্ভব। এই কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিকটই আমাদের অনুরোধ যে, তাঁরা নিজেদের লাইন জোর করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর চাপাবার চেষ্টা করবেন না। মন্ত্রিসভাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন।

জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদে দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্তের একটি বিবৃতিতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও সেগুলির অধীনস্থ আঞ্চলিক পরিষদ ও অঞ্চল পঞ্চায়েতসমূহের গত বছরের ত্রাণকার্য পরিচালনা ও হিসাবপত্র রাখার মধ্যে বহু বেআইনী, অসংযত ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলায় টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনাগুলি শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের ফিনান্স এণ্ড এস্টাব্লিশমেন্ট স্ট্যাণ্ডিং কমিটি অথবা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নিকট থেকে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ যে নগদ টাকা পেয়েছেন, ক্যাশ বই-এ তার কোন হিসেব নেই। ফিনান্স এণ্ড এস্টাব্লিশমেণ্ট স্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে না জানিয়েই আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি 'পে-মাস্টার' নিয়োগ করেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে চারজন পে-মাস্টারের কোন অস্তিত্বই নেই, অথচ খাতায় তাদের নাম আছে। নিদারুণ খরা ও জলকষ্ট সত্ত্বেও টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনার শতকরা ছিয়ানব্বইটি সম্পন্ন হয় নি।

বাঁকুড়াতেও টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা স্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স এণ্ড এস্টাব্লিশমেণ্ট কমিটির নিকট পরীক্ষার জন্য যায় নি। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিদের যে ৮৪ হাজার টাকা দিয়েছেন ক্যাশ বই-এ তা লিপিবদ্ধ হয় নি। পে-মাস্টাররা প্রায় এক লক্ষ টাকার 'মাস্টার রোল' দাখিল করেন নি।

মেদিনীপুর জেলার ত্রাণ পরিকল্পনার তালিকা ও তার সম্ভাব্য ব্যয় জেলা শাসককে আইনত জানানো কর্তব্য ছিল, কিন্তু তা জানানো হয় নি। জনৈক প্রাক্তন এম-এল-এ ও পি, ডব্লিউ স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের পূর্বে তমলুকে জেলা পরিষদ কর্মীদের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ আছে। ওই প্রাক্তন এম-এল-এ'র আদেশে ময়না ব্লকে টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনার টাকা তার ওভারশিয়ারের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। দাঁতন ও ভাগলপুর আঞ্চলিক পরিষদেও বেআইনীভাবে টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা অনুমোদন করানো হয়েছে। নান্দীগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা কেউই তদারক করে নি। এই আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির হাতে প্রায় দশ হাজার টাকা থাকার কথা, কিন্তু তা তিনি দেখাতে পারেন নি। কেশপুরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

চব্বিশ পরগনা জেলায় যে-সকল টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে তার অধিকাংশই বৈধভাবে অনুমোদিত হয় নি। এই পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত। এই পরিকল্পনার জন্য চেক কেটে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানও

শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত

আইনভঙ্গ করেছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার হিসাব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। আঞ্চলিক পরিষদের ক্যাশ বইতে সকল হিসাব ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি।

একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর মারফৎ এই কথাগুলি প্রকাশিত হওয়ায় সমগ্র বিষয়টির গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। ত্রাণকার্যের নাম করে ইতিপূর্বে যে পুকুর চুরি হয়েছে, এইগুলি তারই নগ্ন উদাহরণ। এ থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে যে গত বছর যদি এই সকল দুর্নীতিগুলি না ঘটত তাহলে এ বছরে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অবস্থা এত শোচনীয় হ'ত না। এ তো শুধু গত বছরের কথা। পূর্ববর্তী উনিশ বছরে তাহলে কিভাবে টাকা তছনছ করা হয়েছে তার চিত্রটিও বেশ ভাল করেই ফুটে উঠছে।

গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম যে, প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ দুর্নীতি ও দলীয় রাজনীতির শিকার হয়েছে। তার একটি কারণই নির্দেশ করা হয়েছিল তা হচ্ছে এই সংস্থাগুলি কোনদিনই গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয় নি। যেখানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুযোগ নেই সেখানে দুর্নীতি ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও গ্রাম্য অভিজাততন্ত্রের কবলিত। কংগ্রেসী আমলে এই সবগুলিই ছিল দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। সুখের বিষয় পঞ্চায়েত আইন সংশোধন ও আঞ্চলিক এবং জেলা পরিষদগুলির আমূল পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আইন রচিত হচ্ছে যা আগামী বিধানসভার অধিবেশনে পেশ করা হবে। এই সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ ঘটাতে পারলে দুর্নীতির একটা বড় উৎস উৎপাটিত হবে।

দুর্ভিক্ষের কবলে

সরকারিভাবে ঘোষিত না হলেও পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিষয়টির গুরুত্ব অস্বীকার করছেন না, এবং এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও পর্যবেক্ষকদের মতে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

গত বছরের প্রচণ্ড খরায় বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ব্যাপকভাবে এবং মালদহ ও দিনাজপুরে ফসলের ফলন খুব কমই হয়েছে, তদুপরি বিগত কয়েক বছরের সরকারী খাদ্যনীতির দৌলতে গ্রামগুলির বেশির ভাগ ফসলই বাইরে পাচার হয়ে গেছে। ফলে জোতদারদের গোপন গুদাম ভিন্ন কোথাও এক দানা শস্য নেই। অনাহার ও অপুষ্টিজনিত রোগে প্রত্যহ বহু লোক মারা যাচ্ছে।

কংগ্রেসী আমলে গ্রামকে মেরে শহরকে খাওয়ানোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, যার জোয়াল অনন্যোপায় হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আজও বইতে হচ্ছে, তার ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের অবস্থা শোচনীয়তম পর্যায়ে নেমে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর জেলাগুলির অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, তবে অভাবের দৈত্যটা ওই চারটি জেলায় যেভাবে মুখব্যাদান করেছে ততখানি অপরাপর জেলাগুলিতে করে নি, এইটুকুই যা প্রভেদ।

গত উনিশ বছরে গ্রামগুলি যেভাবে অবহেলিত হয়েছে কোন সভ্য দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে এমন অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায় না। আজকে গ্রামের বেকার সমস্যা শহরের চেয়ে অনেক বেশি। চাষের

সময়টুকু ছাড়া কৃষকরা প্রায় সারা বছরটাই বেকার। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অর্থকরী গ্রামশিল্প কোথাও গড়ে তোলা হয় নি। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলির সাড়ে পনের আনা মানুষই ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী নন। কাজেই যেখানকার অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নেই, সেখানকার মুনাফাবাজেরা সেখানকার উৎপন্ন ধান-চালই যে অন্যত্র পাঠিয়ে বেশি মুনাফা লুঠবে এতে আর সন্দেহের কি আছে? কাজেই গ্রামের ধান-চাল চোরাপথে চালান হয় শহরে, মাছ, অনাজ-তরকারী থেকে শুরু করে দুধ পর্যন্ত অন্যত্র চালান হয়ে যায় ক্রয়ক্ষমতাহীন গ্রামবাসীদের চোখের সামনে। এই সব ক্রয়ক্ষমতাহীন লোকের জীবনধারণের উপায়টা কি? ভাগে চাষ করে পাওয়া কিছু চাল, তা ফুরিয়ে গেলে শাক-পাতা, শামুক-গুগলি ইত্যাদি এবং তারপরেই অনাহার। একটা অঘোষিত দুর্ভিক্ষ গত বিশ বছর ধরে সারা ভারতের সব গ্রামেই নিঃশব্দে চলছে, তবে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক ও আনুষাঙ্গিক বিপর্যয়ে তা কোন কোন স্থানে অকস্মাৎ সোচ্চার হয়ে ওঠে, যেমন এবারে ঘটেছে বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। তখন কর্তৃপক্ষের কিছুটা টনক নড়ে, প্রধানমন্ত্রীর আবেদন সাড়ম্বরে সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়, কিছু কিছু সেবা প্রতিষ্ঠান হয়ত এগিয়ে আসেন, মন্ত্রীরা হয়ত দুর্ভিক্ষ কবলিত ব্যক্তিদের জন্য প্রেস ফটোগ্রাফার সামনে রেখে ভিক্ষায় বার হন, ফ্যাশনেবল সমাজের লোকেরা এদিকে ওদিকে এদের নামে চ্যারিটি শো করেন। কিন্তু যারা মরার তারা ঠিকই মরে, এবং যারা একান্তই কৈ মাছের প্রাণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তারা শেষ পর্যন্ত টিকেও যায়। যাদের সঙ্গতি আছে তাদের খাবার টেবিলে মুরগীর অভাব কোন দিনই হয় না, না খেয়ে মরা মানুষের কাহিনী শুনে, বা ছবিতে দুর্ভিক্ষ কবলিত নর-নারীর চিত্র দেখেও তাদের গলায় খাদ্য আটকায় না।

এই হচ্ছে গ্রামভারতের শাশ্বত ছবি, সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত যার কোন পরিবর্তন নেই। পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে, এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব জায়গাতেই মাঝে মাঝে ঘটে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত সারা জগৎকে জানিয়ে কোন দেশই হাহাকার করে না। অথচ এই একটি প্রাথমিক সমস্যা যার সমাধান বিশ বছরের মধ্যে হওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। বিগত কুড়ি বছরে শুধু ধনীরই ধন বেড়েছে, বিত্তবান লোকেদের উপভোগের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে অফুরন্ত ভোগ্যদ্রব্যের সমাবেশ করা হয়েছে, টেলিভিশন থেকে ক্যানাডীয় গরুর জিভ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের অপরাপর শহরের খবর জানি না, তবে কলকাতা শহরের এক শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার বহর দেখে মনে হয় যেন ভারতবর্ষ এ দিক দিয়ে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকেও ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সেই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত যে অন্ধকারে ছিল তার চেয়ে গাঢ়তর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরই এ দেশের নিত্য সঙ্গী, যা কোন কোন বছরে বেশি প্রকট হয় এই যা তফাৎ। প্রতি নিয়তই দেখা যায় গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ সপরিবারে শহরে চলে আসছে, কেন না গ্রামে খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। তারা ফুটপাতের বাসিন্দা হয়, ভিক্ষা ও নানারূপ উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করে, ফুট-

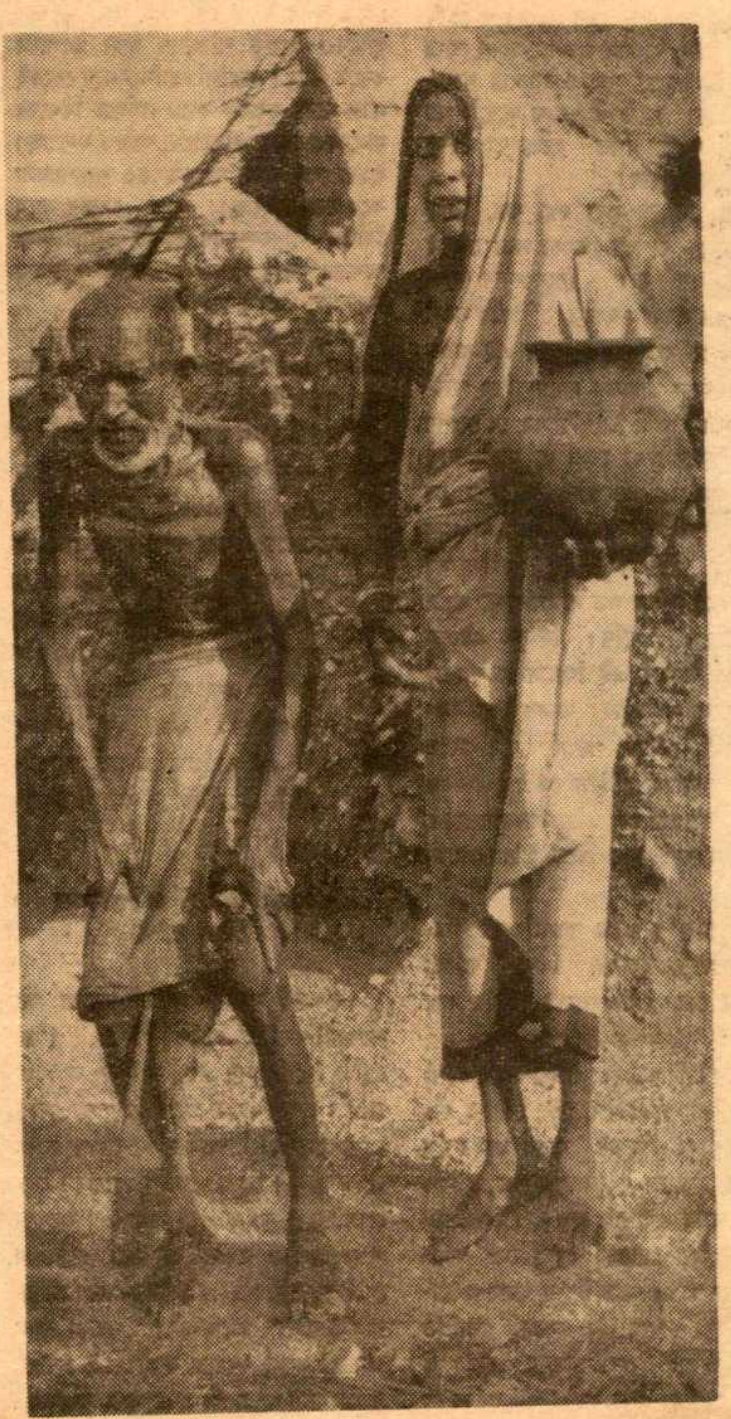

বাঁকুড়া জেলার খরাকবলিত একটি গ্রামের সহায়-সম্বলহীন দুই অনাহারী চলেছেন লঙ্গরখানার দিকে

পাতেই বংশ বৃদ্ধি করে, আর এই নতুন প্রজন্ম কালক্রমে চোর, জোচ্চোর, গাঁটকাটার রূপান্তরিত হয়। এই প্রসেস তো বরাবরই চলছে, সকলেরই চোখের সামনে। তবে মাঝে মাঝে যখন এই আগন্তুকদের সংখ্যা আকস্মিকভাবে দারুণ বেড়ে যায়, যখন কঙ্কালসার মানুষগুলিকে দলে দলে ভিক্ষা-পাত্র হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে দেখা যায়, তখনই সংবাদপত্রের লোকেরা গ্রামে গ্রামে ছোটেন, কাগজে টপ-হেডিং-এ খবর বেরোয় যে অমুক অমুক জায়গায় খাদ্যাভাব ঘটেছে। আজ বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় নগ্নভাবে যা প্রকাশিত হচ্ছে তা কিন্তু সারা দেশেরই ছবি।

সকল অপচয় সহ্য করা যায়, কিন্তু মনুষ্যশক্তির অপচয় কোন সভ্য দেশেই সহ্য করা হয় না। বিবেকানন্দ আশা করতেন যে একদিন ভারত পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে বড় হবে। তাঁর এই ধারণা গড়ে উঠেছিল ভারতের মনুষ্যশক্তির পরিমাণ দেখে। তিনি লিখেছিলেন, যে দেশের মানুষ শুধুমাত্র দু বেলা দু মুঠো ছাতু খেয়েই কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, সে দেশের মানুষদের দ্বারা হতে পারে না এমন কাজ নেই। সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসী শুধু বেঁচে থাকার মত দু বেলা দু মুঠো অন্ন পেলেই খুশি। কিন্তু এইটুকু যোগানের অভাবে এই বিপুল জনশক্তিকে কোন কাজে লাগানোই সম্ভব হয় নি। ভারতবর্ষের নেতারা পণ্যের দাম কষতে অতি দক্ষ, কোন্ জিনিস কতটা বৈদেশিক মুদ্রা আনবে তার দাম তাঁরা হরদম কষছেন, শুধু মানুষেরই দাম দিতে তাঁরা শেখেন নি।

বিগত কুড়ি বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনেক হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্য উচ্ছেদের কোন পরিকল্পনাই তৈরি করা হয় নি। পরিকল্পনা যে কোন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছাবার একটা উপায় মাত্র, আসল লক্ষ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, এটা বোঝার মত মস্তিষ্ক এবং অনুভব করার মত হৃদয় ভারতের নেতাদের যদি থাকত তাহলে বিশ বছরে দেশের এই হাল হত না। দেশপ্রেম-বর্জিত গদির লোভে প্রমত্ত সেই তথাকথিত নেতাদের আজ বিচার করার প্রয়োজন আছে। পূজ্যপাদ বলে প্রচারিত তথাকথিত এই দেশনেতাদের চরিত্র ও দেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যে কাহিনী লিওনার্ড মোজলে তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, তা পাঠ করে আজকের মানুষ, স্বাধীনতা-উত্তর যুগের মানুষ, তাদের ধিক্কার স্বাভাবিকভাবেই জারি করতে পারে।

কাজেই আজ এ কথাটা বলতে কোন বাধা নেই যে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের যে চারটি জেলা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে ধুঁকছে, এই অবস্থাটা মনুষ্যসৃষ্ট। গত বছরে খরা হয়েছিল কাজেই এ বছরে খাদ্যাভাব হয়েছে, এটা যুক্তি নয় কুযুক্তি। যে দেশে কোন দিনই বৃষ্টি হয় না সে দেশের মানুষও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নীল নদের বন্যাকে কাজে লাগিয়ে মিশরের মানুষেরা সোনা ফলিয়েছে, আজও ফলাচ্ছে। ইজরায়েলে আজ মরুভূমিকেও শস্যশ্যামলা করে তোলা হচ্ছে। অথচ সেচের নামে বিভিন্ন পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করার পরেও ভারতবর্ষে অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গে চারটি জেলায় আজ যে অবস্থা চলছে তার পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয়, এই জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের নিবেদন যে, তাঁরা এ বিষয়ে কিছু কাজের কাজ করুন। সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় তাঁরা হয়ত অনেক কিছুই করতে পারবেন না, তবু সেচের ক্ষেত্রে তাঁরা কিছু মৌলিক কাজ করতে পারেন। তা ভিন্ন গ্রামবাংলার সামগ্রিক উন্নতির জন্য অল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কয়েকটি পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করা যায় এবং যদি আন্তরিকতার সঙ্গে তা কার্যকরী করা হয় তাহলে মনুষ্যসৃষ্ট এই ব্যাধিকে অন্তত পশ্চিমবঙ্গ থেকে চিরতরে নির্মূল করা সম্ভবপর হবে।

সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা লাভের পর সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁদের রাস্তায় বার হবার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেবেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে যুক্তফ্রন্ট সরকার সে কথা রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শতকরা পঞ্চাশজনেরও বেশি কর্মচারী এর পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের চেয়েও বর্ধিত হারে মহার্ঘভাতা পাবেন, এবং অন্যান্য সকল স্তরের কর্মীদেরই মহার্ঘভাতা বাড়ানো হবে। এ কথা অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সাংবাদিকদের নিকট ঘোষণা করেছেন। সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারিগণ এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিগণ কিছুদিন ধরে বর্ধিত হারে দুর্মূল্য ভাতার জন্য দাবি করে আসছেন। বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠনের সময় থেকে এই বিষয়টির প্রতি রাজ্য সরকার মনোনিবেশ করেছেন। রাজ্য সরকার ১৯৬৭-র ১লা মে থেকে বর্ধিত হারে বেতন দেবেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী—যাঁদের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৪ হাজার, উপকৃত হবেন। সরকারী কর্মচারী শিক্ষকদের এই বেতন বৃদ্ধিতে আমরা সুখী হয়েছি, এর পর তাঁদের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁরা মনোযোগ দিয়ে নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করুন। সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিযোগ দীর্ঘকাল ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সেগুলির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে তাঁরা নিজের থেকেই সচেতন হোন। জনগণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে তাঁরা যে সুবিচার পেলেন প্রতিদানে তাঁদের কাছ থেকেও জনসাধারণ দুর্নীতিমুক্ত সুশোভন আচরণ ও কর্তব্য প্রত্যাশা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল

গত ১লা জুন বৃহস্পতিবার তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর শপথ গ্রহণ করেছেন। শপথ গ্রহণান্তে তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতা বজায় রাখার আশ্বাস দেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তিনি বিশেষ চেষ্টা করবেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গের মৌলিক সমস্যা চারটি—খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা ও বেকার সমস্যা। এইগুলির সমাধানের জন্য তিনি সর্বদাই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এমন কথা তিনি বলেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে নবাগত নন, সাত বছর ধরে তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী থাকার সময়ে বহুবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। এখানকার মানুষের অভাব অভিযোগের সঙ্গেও তিনি পরিচিত। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি কংগ্রেস বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন, কাজেই তাঁর কাছ থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সকলেই আশা করতে পারেন। আমরা শ্রীধর্মবীরকে রাজ্যপাল হিসাবে আমাদের মধ্যে স্বাগত জানাচ্ছি।

(২।৬।৬৭)

অবশ্য

চন্দ্রগুপ্ত

Q-এর সঙ্গে U-এর মতো পরীক্ষার সঙ্গেই থাকে পরীক্ষা-ভণ্ডুলের সম্ভাবনা। অন্তত গত কয়েক বছরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-গ্রহণের ইতিহাস থেকে এই সত্য জানা যাচ্ছে, পরীক্ষা-পরিচালন পদ্ধতির আশু সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পদমর্যাদায় উচ্চতা-প্রাপ্তির সঙ্গে দৃষ্টি-শক্তি হ্রাসের ও ঔদাসীন্য-বৃদ্ধির যে সংযোগের কথা শোনা যায়, তা যে আদৌ অমূলক নয়, প্রত্যেক বছরে একাধিক পরীক্ষা-ভণ্ডুল হওয়ার ঘটনাই তার প্রমাণ।

পরীক্ষায় যারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে, আসবাবপত্র তছনছ করছে, সেই দুষ্কৃতি-কারীরা নিঃসন্দেহেই নিন্দনীয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ও কি তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন? আপাতভাবে বিদ্রোহীদের নিন্দা করা খুবই সহজ। এবং আরও সহজ হয়তো উঁচু বেদীতে বসে তাঁদের উদ্দেশে উপদেশবর্ষণ। কোন কোন খবরের কাগজে, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখেছি, টিউ-টোরিয়্যাল কলেজ কোচিং ক্লাস প্রভৃতিই নাকি পরীক্ষা-ভণ্ডুলের প্রধান কারণ। অর্থাৎ এই সব টিউটোরিয়্যালগুলিতে পরীক্ষার্থীদের দেওয়া সাজেশানস থেকে প্রশ্ন না এলেই নাকি পরীক্ষার্থীরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণে মত্ত হয়। পরীক্ষা-ভণ্ডুলের এই কারণ আপাতদৃষ্টিতে খুবই বিশ্বাস্য ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু গভীর চিন্তায় (সেই চিন্তা করবার মতো ক্ষমতা ও সময় বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের আছে কি না সন্দেহ) দেখা যাবে ভূতের নিবাস টিউ-টোরিয়্যাল কলেজগুলিতে নয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরষের ভিতরেই।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসঙ্গে আসার আগে আমি দু'টো কথা দৃঢ় এবং স্পষ্টভাবে বলতে চাইঃ প্রথম, আজকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে টিউটোরিয়্যাল কলেজ কোচিং ক্লাসগুলি নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে অপরিহার্য আশ্রয়। যদি কেউ বলেন, এই সব টিউটোরিয়্যাল কলেজ শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করেছে, তবে বলব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু মানভাজন বহু অধ্যাপক শিক্ষার নলচে আড়াল দিয়ে যা করেন, বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের গদি নড়াবার পক্ষে তা যথেষ্ট। দ্বিতীয়, সাধারণভাবে পরীক্ষার্থী-দের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কলে-কারখানায় কর্মীদের অসন্তোষ রুদ্রমূর্তি ধারণ করার আগে যেমন মালিকপক্ষের টনক নড়ে না তেমনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করার জন্য ছাত্র ও পরীক্ষার্থীদের অনেক ক্ষেত্রে চণ্ড পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পরীক্ষা-পরিচালন-দপ্তরে প্রবেশ করা যাক। পরীক্ষা-নিয়ামক, উপ-পরীক্ষা-নিয়ামক, সহ-পরীক্ষা-নিয়ামক প্রভৃতি সহ একপাল কর্মচারীদের উপর প্রি-ইউনিভার্সিটি থেকে এম-এ, এম-এসসি ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষা-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত। অতএব পরীক্ষার্থীদের সক্রিয় প্রতিবাদে কোন পরীক্ষা বাতিল হ'লে তাঁদেরই প্রথম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। কিন্তু পরীক্ষা-ভণ্ডুলের জন্য প্রধানত যাঁরা দায়ী জনসাধারণ তাঁদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না, কারণ তাঁরা অধ্যাপনা নামীয় পেশার দৌলতে সমাজে বিশেষ সম্মানিত, এবং তাঁদের কারো কারো খ্যাতি কারণে-অকারণে এতই আকাশস্পর্শী, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলাও যেন মহাপাপের সামিল।

এঁরা কারা? এঁরাই বিভিন্ন পরীক্ষার পেপার-সেটার, মডারেটার, এগ্‌জা-মিনার, স্ক্রুটিনিয়র, ট্যাবুলেটার। একটু ভুল বললাম, স্ক্রুটিনিয়ার কিংবা ট্যাবু-লেটার-এর কাজে কিছু পরিশ্রম আছে, তাই ও-কাজ তাঁরা সচরাচর নেন না। এঁরা সাধারণত বিভিন্ন বিভাগের প্রোফেসর এবং/অথবা হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, কিংবা রিটায়ার্ড প্রোফেসর (এ সূত্রে উল্লেখ্য, সাধারণ লোক অনেক সময়ে ভুল করে লেকচারার বা রীডারকে 'প্রোফেসর' বলে থাকেন, কোন বিভাগে প্রোফেসর না থাকলে সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রীডার কিংবা লেকচারার 'হেড' বা প্রধান হতে পারেন)। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য 'বোর্ড অফ আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টাডিজ' এবং 'বোর্ড অফ পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডিজ' আছে। প্রথমোক্ত বোর্ড প্রি-ইউনিভার্সিটি, বি-এ, বি-এসসি প্রভৃতি পরীক্ষার এবং দ্বিতীয় বোর্ড এম-এ, এম-এসসি প্রভৃতি পরীক্ষার পেপার-সেটার, মডারেটার ইত্যাদি নির্বাচন করে। উভয় বোর্ডে প্রোফেসর এবং বিভাগীয় প্রধানরা স্বভাবত সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। এবং বিভাগীয় প্রধান পদাধিকার-বলে দ্বিতীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ায় তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সহজেই অনুমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির পেপার সেটিং বা প্রশ্নপত্র-রচনা মডারেশান বা প্রশ্নপত্র-পরীক্ষণ ইত্যাদির কাজ শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে (বোধ করি তারও বেশি) প্রোফেসর এবং/অথবা বিভাগীয় প্রধানরা করবেন। এবং বাকি দশটি ক্ষেত্রে (কিংবা তার কম) সুযোগ পান তাঁরা, যাঁরা তাঁদের একান্ত অনুগ্রহভাজন।

একথা আজ শিক্ষাজগতে সুবিদিত, এই 'প্রোফেসর' সম্প্রদায়-ভুক্ত সুবিধাভোগী ভাগ্যবানেরা অধ্যাপনা নামক মূল কাজটি ছাড়া আর সমস্ত কাজই করেন। তাঁদের মূল্যবান (!) সময়ের কিছুটা অংশে ভারতের ও বহির্ভারতের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা-পরিক্রমায় ব্যয়িত হয়, বিশেষত ইউ-জি-সি'র কল্যাণে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং সেমিনারের ধুম যে-কালের উচ্চতর শিক্ষাজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের বাকি সময়ের সদ্ব্যবহার হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের থীসিস থেকে শুরু করে বি-এ, বি-এসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা, পরীক্ষা-পত্র পরীক্ষা ইত্যাদি বিবিধ কর্মে এবং এই সব কাজে এই মহারথীরা ক্লান্তি-হীন নিরবসাদ। এইসব অ্যাকাডেমিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা টিউশন করেন, বেনামীতে ছাত্রপাঠ্য বই, চাই কি মেড-ইজি রচনা করেন এবং ছাপাখানা, বইয়ের ব্যবসা ইত্যাদিও করেন। এই মহারথীদের মধ্যে অধিকতর ভাগ্যবানগণ সক্রিয় এবং আপাত-নিষ্ক্রিয় রাজনীতির রাস্তায় অর্থ-প্রতিপত্তির সন্ধানী। অর্থাৎ তাঁদের কর্মক্ষমতার প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হয় সেই সমস্ত কাজে যার সঙ্গে তাঁদের ব্রত ও আদর্শের সম্পর্ক ততখানিই, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের আপামর-সাধারণের যোগ যতখানি।

এই সব প্রোফেসর এবং/অথবা বিভাগীয় প্রধানরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল-দর্শন। খুব কম প্রোফেসরই রীডার লেক-চারারদের মতো সপ্তাহে পাঁচদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আসেন, যদিচ বিভাগীয় প্রধান-দের প্রতিদিন অন্তত কিছু সময়ের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা কর্তব্য। আর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করার

দায়িত্ব বহন ক'রে তাঁরা যদি বক্তৃতা-পরিক্রমায় ব্যাপৃত থাকেন তা হলে তো সোনায় সোহাগা। মাসের পর মাস ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রোফেসর এবং/অথবা বিভাগীয় প্রধানের অমৃতবাণী শোনে নি, এমন অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মুখে শোনা যায়। মনে পড়ছে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ-কাল বক্তৃতা-পরিক্রমারত কোন প্রোফেসর সম্পর্কে 'স্টেটসম্যান' একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'অধ্যাপক-ভদ্রলোক আর-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন, করছেন না শুধু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে তিনি অধ্যাপক-রূপে নিয়মিত মাইনে পাচ্ছেন।'

এই ধরনের ব্যস্তবাগীশ কিংবা ব্যতি-ব্যস্ত মহাপণ্ডিতগণ পেপার সেটিং মডা-রেশান ইত্যাদির মতো আপাততুচ্ছ কাজ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুগৃহীত করতে এগিয়ে এলে পরীক্ষার্থী-বেচারাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা অনুমান করতে কষ্ট হবে না। একে তাঁরা মহাপণ্ডিত, সামান্য প্রশ্নপত্রে তাঁদের অসামান্য পাণ্ডিত্যের ছটায় পরীক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত বিমূঢ় হ'য়ে যায়। দ্বিতীয়ত কোন্‌টি সিলেবাসের ভিতরে কোন্‌টি সিলেবাসের বাইরে, কোন্‌টি অনার্স পেপারের উপযুক্ত, কোন্‌টি পাশ পেপারের যোগ্য এত সব দেখেশুনে ভেবেচিন্তে প্রশ্নপত্র-রচনা করার বা প্রশ্নপত্র-পরীক্ষা করার মতো সময় কোথায় তাঁদের? তাঁদের লক্ষ্য, পেপার সেটিং, মডারেশান ইত্যাদি আপাততুচ্ছ কাজগুলি থেকে কত বেশি রোজগার করা যায়, আর যাদের জন্য এই সব, সেই পরীক্ষার্থীরা রসাতলে যায় যাক, তারা ভাঙুক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেবিল-চেয়ার, কারণ তাঁদের উঁচু বেদী তো বিদ্রোহীদের নাগালের বাইরে। পেপার সেটিং, মডারেশান ইত্যাদিতে তাঁদের মৌরসীপাট্টার অবসান ঘটাবে এমন ক্ষমতা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভূমিকা স্বস্তিকাঙ্ক্ষী নিষ্ক্রিয় দর্শকের আর নানা কারণে এই সব মহারথীর দুষ্টচক্র ভাঙা তাঁর সাধ্যের অতীত।

প্রতি বছর পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য একাধিক পরীক্ষা বাতিল হওয়ার ঘটনা তাই আশ্চর্যের নয়। আরও অনেক বেশি পরীক্ষা-ভণ্ডুল হয় না-এটাই এবং আশ্চর্যের। দুষ্কৃতিকারীদের কথা মনে রেখেও বলতে বাধ্য হব, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই শান্তিপ্রিয়, উত্তর করার মতো শতকরা পঁচাত্তরটি প্রশ্ন পেলে তারা পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসে না বা চেয়ার-টেবিল ভাঙে না।

অর্থাৎ অধিকাংশ পরীক্ষা-ভণ্ডুলের মূলে যে পেপার-সেটার মডারেটার ইত্যাদির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বর্তমান, তাতে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এ সূত্রে উল্লেখ্য, কণ্ট্রোলারের কাছে ডিগ্রি পাবার পর মাত্র আধ ঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নপত্র-রচনা করার ঘটনা জনৈক পেপার-সেটারের কাছেই আমার শোনা। সুতরাং এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন অন্যত্র ব্যতিব্যস্ত মহামান্যদের পেপার সেটিং মডারেশান ইত্যাদির দায় থেকে অবিলম্বে মুক্তিদান পরীক্ষা-সংস্কারের প্রাথমিক অঙ্গ।

*

গত কয়েক বছর যাবৎ এম-এ, এম-এসসি-র মতো উচ্চতর পরীক্ষাগুলিও বহুবার বিঘ্নিত হয়েছে। এখানেও মূল কারণ একই 'প্রোফেসর' শ্রেণীর ক্ষুদে মহারাজাদের আত্মস্বার্থচিন্তা, দলীয়তা, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব। নির্দিষ্ট বিষয়ে 'বোর্ড' অফ পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ'-এর যিনি চেয়ারম্যান তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় বিভাগের প্রধান। স্বভাবতই তাঁর ক্ষমতা অসীম, বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা, যাঁরা ঐ বিভাগের রীডার বা লেকচারার, তাঁদের অধিকাংশের ভূমিকা বিষ্ণুসান্নিধ্যে গরুড় পক্ষীর। কাকে কোন পেপার সেট করতে দেওয়া হবে কে কোন্ পেপার পরীক্ষা করবেন—সমস্ত কিছু তিনিই স্থির করেন। অতএব কে তাঁর অপ্রীতিভাজন হ'তে চাইবেন?

অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন বিভাগীয় প্রধান-তথা-বোর্ডের চেয়ার-ম্যানও আছেন কর্মদক্ষতায় ও সৌজন্যে যিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন, পরীক্ষা-পরিচালনায় সহকর্মীদের সহযোগিতা অর্জনের ক্ষমতা যাঁর করায়ত্ত। প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক-নিয়োগে সহকর্মীদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ ক'রে এই ধরনের বিভাগীয় প্রধান নিজের সৌজন্যের এবং কর্তব্যবোধের পরিচয়ই শুধু দেন না, পরন্তু বোর্ডের গণতান্ত্রিক আদর্শও বজায় রাখেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা কোটিতে গোটিক। এমন একাধিক বিভাগীয় প্রধান-তথা-বোর্ডের চেয়ারম্যানের দৃষ্টান্ত আমরা জানি, যাঁরা গণতান্ত্রিক আদর্শকে পায়ে মাড়িয়ে স্বৈরাচারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাঁরা বোর্ডের মিটিং ডাকেন, কিন্তু মিটিঙে আসেন পূর্বাহ্নে প্রস্তুত প্রশ্নকর্তা পরীক্ষকের তালিকা নিয়ে। এবং মিটিঙে যখন ঐ তালিকা পাঠ ক'রে যান, তখন সৌজন্যবোধে এবং/অথবা তাঁর অপ্রীতি উৎপাদনের ভয়ে বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা প্রতিবাদ করেন না। বলা বাহুল্য, ঐ তালিকায় তাঁর দলের লোকরাই অধিক অনুগ্রহ লাভ ক'রে থাকেন। গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত এত সহজে আর কোথায় পাওয়া যাবে?

পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচারের জন্য গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর পরীক্ষাগুলিতে অধিকাংশ বিষয়ে একটি উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করানোর নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বিস্তর টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কিন্তু এই 'ডাবল এগ্‌জামিনারশিপ' বা একই উত্তরপত্র দু'জন পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করানোর প্রথায় পরীক্ষার্থীদের কতটুকু লাভ হচ্ছে?

সমস্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এতে পরীক্ষার্থীদের চাইতে পরীক্ষকরা বিশেষত চেয়ারম্যান এবং তাঁর অনুগ্রহভাজনরা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন। প্রথমত, আটটি পেপারের ষোলটি হাফের জন্য বত্রিশ জন পরীক্ষক দরকার হওয়াতে চেয়ারম্যান স্বয়ং দশ-বারোটি (চক্ষুলজ্জা না থাকলে ততোধিক) হাফের পরীক্ষক হ'তে পারেন, ফলে আজ তাঁর সামনে উপার্জনের রাজপথ প্রসারিত। এমন কিছু জনপ্রিয় বিষয় আছে, যার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অচিন্ত্যরকমের অগণ্য। ধরুন, চার শ' পরীক্ষার্থীর বিষয়ের বোর্ডের চেয়ারম্যান যদি অন্যূন পাঁচটি হাফ-পেপার পরীক্ষা করেন, তা'হলে তিনি প্রতি হাফ-পেপার এক টাকা হিসাবে সাকুল্যে পাবেন দু' হাজার টাকা (এই বছরের একটি বিষয়ে আটটি পেপারের মধ্যে পুরো এবং হাফ-পেপার মিলিয়ে সাতটি পেপার দেখছেন জনৈক খ্যাতিমান প্রোফেসর)। দু'জন পরীক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়নে শতকরা পনেরো নম্বরের পার্থক্য দেখা দিলে উত্তরপত্রটি তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর নিয়ম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চেয়ারম্যান স্বয়ং এই তৃতীয় পরীক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে বিতর্কিত হাজার খাতা যদি চেয়ারম্যান পরীক্ষা করতে পারেন, তা'হলে আরও হাজার টাকা তাঁর পকেটে আসে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কয়েক বছর আগে এম-এ পরীক্ষায় এরকম একজন চেয়ার-ম্যান শুধুমাত্র তৃতীয় পরীক্ষকরূপেই বারো শ' টাকার উপর উপার্জন করে-ছিলেন)। কোন পরীক্ষক যদি শেষ পর্যন্ত উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে না পারেন, তবে সেগুলি পরীক্ষা করার লোভ সংবরণ করাও চেয়ারম্যানের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে (পাঠক এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, চেয়ারম্যান মহোদয় এত খাতা দেখার সময় পান কোত্থেকে? কিন্তু পাঠকের পক্ষে অবিশ্বাস্য অঘটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আজও ঘটে এবং এখানে এমন প্রতিভাবান পরীক্ষক আছেন যিনি দিনে পঁচাত্তর থেকে একশ'টি এম-এ'র খাতা দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অফ এগ্‌জামিনেশনস বিভাগের দু-তিন বছরের পুরনো এবং সাম্প্রতিক রেকর্ড আমার প্রতিটি উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে)।

দ্বিতীয়ত, নিজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার টাকা রোজগারের এই প্রত্যক্ষ পন্থা ছাড়া পরোক্ষভাবে তিনি আরও কত উপার্জন করতে পারেন, তা' হয়তো অনেকে জানেন না। পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় 'এক্সটার্নাল' বা 'বিভাগ-বহির্ভূত' পরীক্ষক-নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অর্থগৃধ্নু প্রভাবলিপ্সু বিভাগীয় প্রধান-তথা-চেয়ারম্যান কি করেন? তিনি তাঁরই মতো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান-তথা-চেয়ারম্যানকে পরীক্ষক নিযুক্ত করেন, হাজার পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার বা রীডারকে (রীডার ক্বচিৎ কদাচ) তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত করেন না। তাঁর এই আচরণ অত্যন্ত সহজবোধ্য, কারণ স্বার্থ-ভিত্তিক বিনিময়-প্রথায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানরাও তাঁকে তাঁদের পেপার সেটিং মডারেশান ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে অর্থোপার্জনে সাহায্য করেন। তৃতীয়ত, বিভাগীয় প্রধান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে (অনুগ্রহ-ভাজনদের মাধ্যমে) ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০।৬০০ নম্বরের নিয়ন্তা হওয়ার ফলে পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভরশীল। দুর্নীতির প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম, একজন পরীক্ষকের বিচার-বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী কেন অসংখ্য পরীক্ষার্থীর বহু পরিশ্রমের ফলকে নিয়ন্ত্রিত করবে?

জানি, এখনই 'ডাবল এগ্‌জামিনার-শিপে'র সমর্থক বলবেন, কেন বিভাগীয় প্রধান তো আর একা খাতা দেখছেন না, তাঁর পরীক্ষিত উত্তরপত্র তো অন্যজনও দেখছেন। কিন্তু বিভাগীয় প্রধানের ক'জন সহ-পরীক্ষকের সেই মনোবল আছে, যিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করেন? বিভাগীয় প্রধানের মন-মেজাজ মূল্যায়ন-পদ্ধতি তাঁর সহ-পরীক্ষকের জানা থাকলে তিনি তদনুসারেই উত্তরপত্র পরীক্ষা করার চেষ্টা করবেন। যে ক্ষেত্রে উত্তরপত্রের উপরেই নম্বর দেওয়ার প্রথা চালু আছে, সেখানে সহ-পরীক্ষক ১৫%-এর মধ্যে পার্থক্য রাখার চেষ্টা করেন, কারণ তৃতীয় পরীক্ষকের (৯৯% ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান স্বয়ং) কাছে উত্তরপত্র যাওয়া তাঁর কাছে অস্বস্তিকর বোধ হয়। এর ফলে ফার্স্ট ক্লাস পাবার যোগ্য পরীক্ষার্থীও অনেক সময় নম্বর-দেওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষকের অতি-সচেতন কার্পণ্যের ফলে ফার্স্ট ক্লাসের গৌরব অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বহু সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সর্ব

রেনী
'ড্রিপ ডোসেজ'
বদহজমের যন্ত্রণা
তাড়াতাড়ি
বন্ধ করে

বেশীমাত্রায় খাওয়া ... তাড়াতাড়ি খাওয়া ... যা আপনার সয় না, এমন খাদ্য খাওয়া...এই সবের ফলেই পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এই অত্যধিক অ্যাসিডই বদহজমের কারণ—সেই পেট 'ভার-ভার' অস্বস্তিবোধ, পেট কামড়ানোর যন্ত্রণা, পেটে জ্বালাবোধ। ডাইজেসটিক্ রেনী ট্যাবলেট বদহজমের যন্ত্রণা ও অস্বস্তি তাড়াতাড়ি দূর করে।

কিভাবে রেনী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা বন্ধ করে :
আপনি যখন ডাইজেসটিক্ রনি ট্যাবলেট চুষে খেতে থাকেন তখন ওর শক্তিশালী অ্যাসিডনাশক উপাদানগুলি আপনার মুখে গলে গিয়ে ধীরেধীরে আপনার পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরেধীরে পড়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবে অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেলে, তাতে অ্যাসিডের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না এবং তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেয়।

সবসময় রেনী সঙ্গে রাখবেন:
বদহজমের যন্ত্রণা যে কোন সময় সুরু হতে পারে। তাই সবসময় ডাইজেসটিক্ রেনী ট্যাবলেট কাছে রাখা ভাল।

বদহজমের যন্ত্রনায় ভুগবেন না—
ডাইজেসটিক্ রেনী ট্যাবলেট ব্যবহার করুন—

নিকোলাস-এর তৈরী R.C.3.5/88

ভারতীয় প্রতিযোগিতায় ৪৭৯-পাওয়া বাঙালী ছাত্রের পক্ষে এ কথা বলার উপায় নেই যে, যে-১ নম্বরের জন্য সে ফার্স্ট ক্লাসের সুযোগ হারিয়েছে, সেজন্য তার জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবের চাইতে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির যান্ত্রিকতা এবং তার বুদ্ধিসর্বস্ব কিছু বাঙালী শিক্ষকের হৃদয়হীনতাই দায়ী।

'ডাবল এগ্‌জামিনারশিপে'র জন্য একজন পরীক্ষার্থীর নম্বর কিভাবে কমে যায়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নিজেকে 'কড়া পরীক্ষক'রূপে প্রতিপন্ন করতে চান, এমন একজন পরীক্ষক ৫০-এ ৩০. (অর্থাৎ ৬০% যা ফার্স্ট ক্লাস নম্বর) পাওয়ার যোগ্য পরীক্ষার্থীকে ২২ দিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষক স্বাভাবিকভাবেই একই উত্তরপত্রে ৩০ দিলেন। ১৫%-এর বেশি পার্থক্য হওয়ায় তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে উত্তরপত্র গেলে তিনি (=বিভাগীয় প্রধান, অন্তত তাঁকে নিজে মাপতে হয়) ২৪ দিলেন। তিনটি নম্বরের যোগফল দাঁড়ালো ৭৬, ট্যাবুলেটর ৭৬-কে ৩ দিয়ে ভাগ ক'রে অ্যাভারেজ পেলেন ২৫·৩৩ অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর ভাগ্যে জুটল তার প্রাপ্য ৩০-এর পরিবর্তে ২৫। এমনিভাবে ৫।৪ নম্বর সে যদি অন্যূন তিন-চারটি হাফ-পেপারে হারায় তা'হলেই ফার্স্ট ক্লাস থেকে তার নম্বর যথেষ্ট কমে আসে। সুতরাং সুবিচারের নামে তার প্রতি যা করা হচ্ছে, তাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ভদ্রলোক সুবিচার বলবেন? এই ডবল এগ্‌জামিনারশিপের ফলে ফার্স্ট ক্লাসের সংখ্যা যেমন কমে আসছে, তেমনি অনুপাতিকভাবে নম্বর কমে আসার জন্য অনুত্তীর্ণের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

উত্তরপত্রে প্রাপ্যের অধিক নম্বর দেওয়া বা 'ওভারমার্কিং'-এর চাইতে অনেক গুরুতর অপরাধ প্রাপ্যের কম নম্বর দেওয়া বা 'আণ্ডারমার্কিং'। আইনের মূল কথা, সহস্র অপরাধী ছাড়া পায় পাক, কিন্তু একটি নিরপরাধ যেন কখনও শাস্তি না পায়।

*

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগের 'পোস্টগ্রাজুয়েট বোর্ড অফ স্টাডিজের' কাজকর্মের নমুনা চন্দ্রগুপ্তের কাছে এসে পৌঁছেছে। ইতিপূর্বে বলেছি, পদাধিকার-বলে বিভাগীয় প্রধান বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ায় স্বৈরাচারের অবকাশ থেকে যায়। এবং এমন কিছু স্বৈরাচারী চেয়ারম্যানের কথা আমরা জানি, যাঁরা বোর্ডের মিটিংয়ে প্রস্তাবিত এবং গৃহীত পরীক্ষকের নাম পরে কেটে দিয়েছেন। তাঁর নাম কাটার কারণ, তিনি পরীক্ষকের চাটুকার ও অনুগ্রহভাজন নন। চেয়ারম্যানের এ ধরনের বে-আইনী কাজ ও স্বৈরাচার বন্ধ করার জন্য এই নিয়ম হওয়া দরকার, অন্তত বোর্ডের চেয়ারম্যান মিটিংয়ে নির্বাচিত পরীক্ষক প্রশ্নপত্র-রচয়িতা গ্রন্থকে স্বীকৃতিপত্র (অর্থাৎ 'তুমি অমুক কোশ্চেনের প্রশ্নকর্তা এবং/ অথবা পরীক্ষক নির্বাচিত হয়েছ' এই স্বীকৃতিসূচক পত্র) দেবেন। কোন কোন চেয়ারম্যান কখনও কখনও অত্যন্ত বে-আইনীভাবে গোপনে তাঁর চাটুকারকে উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে দেন ব'লে আমাদের কাছে খবর এসেছে। এই বছরেই জনৈক স্বৈরাচারী চেয়ারম্যান বোর্ডের সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ ক'রে সাম্প্রতিক এম-এ অতি-তরুণ অনুগ্রহ ভাজনকে একটি নয়, তিন-তিনটি হাফ-পেপার পরীক্ষা করতে দিয়েছেন (এবং একজন প্রবীণ প্রফেসরের নাম কেটে) অথচ জনৈক প্রবীণ সহকর্মীকে একটির বেশি হাফ-পেপার পরীক্ষা করতে দিতে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি। ওভারমার্কিং-এর অজুহাতে এই ভদ্রলোক একজনকে খাতা দেখতে দিতে আপত্তি করেন, অথচ আণ্ডারমার্কিং-এর মতো মারাত্মক অপরাধে অপরাধীকে তিনি ভূরি ভূরি খাতা দেখতে দেন, যেহেতু এই অপরাধী তাঁর দলের পাণ্ডা। এ ধরনের স্বৈরাচার একমাত্র সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যরা বন্ধ করতে পারেন, কারণ বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য নানা কারণে চেয়ারম্যানের অসন্তোষ উৎপাদন করতে চান না। দুর্ভাগ্যের, এই নিয়ম হওয়া উচিত যে, নির্বাচিত কোন পরীক্ষক শেষ পর্যন্ত ধার্য্য পালনে অক্ষম হ'লে, তাঁর ফেরত-দেওয়া উত্তরপত্রগুলি চেয়ারম্যান বোর্ডের অন্তত এক বর্ষাংশ সদস্যের পরামর্শক্রমে অন্য পরীক্ষককে দেখতে দেবেন। বর্তমানে ফেরত-দেওয়া উত্তর-পত্রগুলি চেয়ারম্যান (অর্থগৃধ্নু হ'লে) স্বয়ং কিংবা তাঁর অনুগ্রহপুষ্টকে পরীক্ষা করতে দেন। এই বছরেই, জনৈক চেয়ারম্যান তাঁর বহু সহকর্মীকে বঞ্চিত ক'রে ফেরত-আসা উত্তরপত্রগুলির একটি বড় অংশ স্বয়ং এবং অপর অংশ, অত্যন্ত গোপনভাবে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দু' বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষয়িত্রীকে পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। চতুর্থত, এই বোর্ডের যে-সব সদস্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁদের বাদ দিয়ে আত্মস্বার্থের কারণে চেয়ারম্যান যদি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দেন, তা'হলে বিভাগীয় শিক্ষকদের কর্মোৎসাহে ভাঁটা পড়তে বাধ্য। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগীয় শিক্ষককে প্রশ্নপত্র রচনা বা উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে দেওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে এসব দায়িত্বের একটি ন্যূনতম সীমা থাকা দর-কার। অর্থাৎ বিভাগীয় শিক্ষকরা (বিভিন্ন বিভাগের অবস্থা ও কার্যক্রম অনুযায়ী) ন্যূনপক্ষে কটি হাফ বা কটি পুরো পেপার দেখবেন, সে সম্পর্কে একটি নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া দরকার। অন্যপক্ষে একজন কর্তৃক পরীক্ষণীয় উত্তরপত্রের সর্বোচ্চ সংখ্যাও বেঁধে দেওয়া উচিত এবং এই নিয়ম খ্যাতি-মর্যাদা-নির্বিশেষে প্রত্যেক পরী-ক্ষকের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে। তা' না হ'লে দু'দিনে ২০০ খাতা দেখার ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না। সর্বশেষে, উত্তরপত্রের উপর পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি লেখার প্রথা রহিত করা দরকার। প্রত্যেকটি উত্তরপত্রের উপর 'কন্ট্রোলার অফ এগ্‌-জামিনেশনস'-দপ্তর কোড নম্বর দেবেন, পরীক্ষককে দেওয়া স্লিপগুলিতে সেই নম্বর থাকবে, পরে সেই নম্বর মিলিয়ে ট্যাবুলেটর তাঁর খাতায় পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর লিখবেন। এতে যেমন একদিক থেকে পরীক্ষার্থীবিশেষের প্রতি পক্ষ-পাতিত্বের সম্ভাবনা দূরীভূত হবে, অন্যদিকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের প্রতি অধিকতর সুবিচার হবে। এ কথা বলছি এজন্য, দু-একজন পরীক্ষকদের মুখে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে অতি-বিরূপ টীকাও মন্তব্য শুনেছি।

*

উপরের এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসছি, বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে একটি কমিটি গঠিত হওয়া দরকার। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী না হলেও চলে। ঐতিহ্য-মণ্ডিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছে, আশাকরি আলোচ্য ব্যাপারেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ই অগ্রণী হবেন। ভারতবর্ষের অনেক স্বনামধন্য শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত। বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্রতী, বুদ্ধিজীবী এবং সিণ্ডিকেট সদস্যদের কাছে চন্দ্রগুপ্তের বিনীত আবেদন, তাঁরা অবিলম্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পরিচালন সংক্রান্ত দপ্তরের এবং বিভিন্ন আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট বোর্ডগুলির (বিশেষভাবে পোস্টগ্র্যাজুয়েট বোর্ডগুলির) নিয়ম-নীতি ও কাজকর্মের ব্যাপক ও গভীর তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করুন। অন্যথা পরীক্ষা-পরিচালন-ব্যবস্থায় যে দুষ্টচক্র মৌরুসী ভোগ ক'রে চলেছে, তাকে কিছুতেই ভাঙা যাবে না। আর যাদের জন্য এত আয়োজন, তারা হয় নিঃশব্দে চোখের জল ফেলবে নতুবা সুযোগমত পরীক্ষা পণ্ড করবে।

চন্দ্রগুপ্তের মতো একজন অখ্যাত বাঙালীর আবেদন শেষ পর্যন্ত খ্যাতিমান-দের মহলে পৌঁছুবে কি না, এই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

নীলপালক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কানাই বাউরীর রোগা মেয়েটা শীতের রোদে পিঠ রেখেছে। পিছনে ফাঁকা মাঠ আর পিঠটাও উদোম। মাঠে সদ্য ফসল কাটা হয়ে গেছে। মেটে রঙের মুড়োগুলি আকণ্ঠ শিশিরে ঠাসা—হাঁটলে জ্যাবজ্যাব করে। পায়ের পাতা ভেজে। পায়ের পাতা ভেজাতে ভেজাতে কানাই বাউরীর জামাই একটু আগে ওই ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে দূরের বিলে চলে গেল। তার হাতে ফাঁদকাঠি। তার আশা, কয়েকটি বুনো পায়রা ধরবে। পায়রা ধরবে—তার কারণ, রোগা বৌ অচলার মাংস খেতে বড় সাধ, পায়রার মাংস। পাঁঠা নয়, ছাগল নয়, হাঁস-মুরগীও নয়—এমন কি ঝিনুক বা কচ্ছপের মাংসও খেতে চায় নি। চেয়েছে, উড়ো-পাখির নীল রঙের পালক গলায় সিঁদুরের চিকন বেড় টুকটুকে লাল দু'খানি পা ওই পায়রার। ডাক্তারবাবু বলেছিল—ভালোমন্দ যা কিছু খেতে চাইবে, সাধ্যিতে কুলোলে খাওয়াবে। তাই গোবর্ধন বলেছিল—কি খেতে চাও বলোদিকি নি? শুনে অচলা অনেক কষ্টে হেসেছিল। তারপর স্থির ফ্যাকাসে চোখে সামনের দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। এ যেন গল্পের সন্নিসীর বর দেবার কথা। বাছা, তুমি কি চাও?...সেই সময় আকাশে কোন মেঘ ছিল না। শীতের আকাশ। একেবারে ফাঁকা ছিল। ফ্যাকাসে ছিল। অচলা খুঁজছিল।.....অই অচলা, তুমি কি চাও! সামনে দাঁড়িয়ে যুবাপুরুষ গোবর্ধন। তত্রাচ অচলা জানে, ভালবাসার বৌ-র জন্যে আকাশ থেকে চাঁদ ছিঁড়ে আনবার ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য নেই। এবং ভালো-বাসার পুরুষ দিতে চাইলে নেবার মত জিনিসটিও খুঁজে দেখতে হয়—তাই অচলা খুঁজছিল। সন্দেশ-রসগোল্লা বাজারে মেলে। পয়সায় সব কেনা যায়। তা' অই গ বাউরীর ছেলে, আকাশ থেকে উড়োপাখি এনো এট্টা। আমি উড়োপাখির মাংস খাব। ...তাইলে পায়রা বলো! গোবর্ধন হেসে বাঁচে না। তুচ্ছ পায়রা! তখন কানাই বাউরী বলে—হুঁ হুঁ বাবা গোবর্ধন, মেয়ে মন্দ বলে নাই। অই গতরে পায়রার মাংস বিনা ওষুধ নাই। তখন গোবর্ধন বলে—বাবামশায়, তাইলে কি না ফাঁদকাঠি চাই। ফাঁদকাঠি গড়িয়ে দিয়েছে কানাই। রাত জেগে সুতোর গাঁথুনিতে হাতখানেক লম্বা জাল বুনেছে। সেই রাতেই বাঁশবন খুঁজে কঞ্চি কেটে এনেছে। ছোট ছোট খুঁটি বানিয়েছে। তারপর বলেছে—এখন তোমার হাতের গুণ আর অচলার ভাগ্যি।

রোগে ভুগে কিছু মুখে রোচে না; কি আর করা যায়! মিনমিন করে বাবাকেও বলেছে—অ বাবা, তুমার পায়ে পড়ি, এট্টুকুন তেঁতুল এনো। সামান্য তেঁতুল। পুকুরপাড়ে দু'বেলা শতেক হনু-মান মচ্ছব করে খায় তো. এটা এক মনিষ্যি, তায় যুবো মেয়ে—কতো রকম সাধ মনের ভিতর যত্ন করে রাখা! যেমন করে ঘর-সংসারে নানান দ্রব্য যত্ন করে গোছায়, অন্ধকারে উনুনের পাশে হাত বাড়ালে নুনের ভাঁড়টিও হাতে ঠিক ঠেকে, কিংবা দাওয়ার উপর চালের বাতায় ঠিক কোনখানে কানাই আধখানা সিগ্রেটটা জামাইকে ফাঁকি দেবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছিল—মেয়ের অগোচর নেই। বাপের দুঃখ—এত যত্নবতী ছিম-ছাম ঝাড়পোঁছ থাকা মেয়ে—মেঘ চাইতে না চাইতেই মুখের উপর জল এগিয়ে দেয়, তার গতরের খোয়ার দেখে। দেখ কাল-ব্যাধি কি ঝাঁঝরা করে তুলল তাকে। আর রাজ্যের সব হাস্যকর লোভ-লালসা-ইচ্ছা ফুটোফাটা ঘর পেলে ঝড়ের যেমন দৌরাত্ম্য, তেমনি হই হই করে তখন ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আধেক রাতে ঘুমন্ত বাপকে জাগিয়ে বলে—ইখেনে আমার ঘুম আসে না।...তা' অই অচলা, একা কোথা শুবি? তখন মেয়ে জামাইয়ের বিছানা দেখায় নিঃসংকোচে। কানাই বলে—বলি অ গোবর্ধন, গোবর্ধন গো, উঠোদিনি...মা মরা মেয়ে, রোগে ভুগে বয়সকে হারিয়ে ফেললে একেবারে। যেন মাঝ অব্দি গিয়ে ফের গোড়ায় ফেরা। আবার গোবর্ধনও যুবাপুরুষ বটে।

আধেক রাতে মেয়ে চেঁচায়—উঃ মাগো, মলেও বুকে নেই এই যমের হাতে.....তখন গোবর্ধন চাপাগলায় ধমকায়—অই, অই, ছি, ইটা কি হল? বাবামশাই শুনছে না? অচলা হামাগুড়ি দিয়ে দরজা খুলছে। তারপর দাওয়ায় বাবার পাশে চলে এসেছে। কানাই জেগেই থাকে। পোড়া চোখে কি ঘুম থাকে? তার ঘুম নেই।

সকালবেলা রোদে পিঠ দিয়ে গেঁজানো খেজুর রস ভাঁড়টাক গিলেছে শ্বশুর মশাই। বাখর বুঝি বেশি হয়েছিল—তাড়িটা বেশ তেতো। ভুরু কুঁচকে গোঁফের ডগা দুটো বারবার মুছছিল ওরা। আর পরস্পর চোখে আঁকিয়ে হাসাহাসিতে তেতোর কষ্ট সওয়ার কারচুপী। খালি পেটে নেশা চাগতেও দেরি হয় নি। তবে অল্প-সল্প জিনিস—পান্তাও ঠেসে নিয়েছে প্রচুর। শেষে কানাই একরকম টলতে টলতে গেছে বেনেপুকুরের দিকে। অচলা বলেছে—বাবা, আমার মাথার দিব্যি, তলায় কুড়িও—এই শরীলে গাছে উঠো না।

পাগলা! বেনেপুকুরের তেঁতুলগাছে যে মহাপ্রভুরা বাস করছেন, তেনাদের কিঞ্চিৎ প্রসাদই কানাইয়ের ছেঁড়া নেকড়ায় কুলোবে না। তবে মন্দ বলে নি অচলা, দু-চারখানা রেখে বাকিটা বিক্রি করলে পয়সা আসবে। কেবল মজুমদার মশাই না দেখলেই হল। কানাই তার ছেলেবেলায় দেখেছে—গেরস্থের গাছে ফল ধরলে তা' দশজনেই কুড়োত খেত। গেরস্থপুলো ছিলেন অতিমাত্রায় সদাশয়। গরীব মানুষে দুটো নেয় তো নিক্। দেবতার অঢেল দান ফুরোবার নয়। আর আজকাল দেখ মশাইরা, অন্য ফলের কথা দূরে থাক—তুচ্ছ তেঁতুল—তাও কি না দু' টাকা কিলো। ভগবান রামচন্দ্রের সাকাত দাস যে হনুমান, তেনার বংশের কি লাঞ্ছনা! আহা হা রে অবলা জীব! .....এই বলে পস্তাচ্ছিল কানাই বাউরী। ফোঁস ফোঁস করে নাকও ঝাড়ছিল। শেষে টের পেল সে একা হলেই রাগে আর কাঁদে আর বকতে বকতে যায়। তখন ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলছিল—দুঃখুর কথা শোনে কে; শোনাই কাকে। তবে মাথার উপরে সূর্যিদেব, নিচে মা বসুমতী, যা বলি—যানের জলে ভেসে যায় না।

ওদিকে বিলের প্রান্তে নরম মাটিতে ফাঁদকাঠি পুঁতে দিয়েছে গোবর্ধন। তার পর খানিকটা দূরে একটা দলছাড়া বাশঝোপের পাশে সে শুয়ে পড়েছে। কনুই ভর করে তাকিয়ে আছে ফাঁদের দিকে। কিছু ধান ছড়ানো আছে ফাঁদের সুতোর নিচে। আকাশে পায়রার ঝাঁক দেখা গেলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। পায়রাগুলোর গতিগতি বোঝা কঠিন। দূরে, জলটুঙ্গীর উপর নামছে। ফের উড়ে যাচ্ছে। কখনও ধানের জমিতে—কখনও ঝোপে-ঝাড়ে, বাবলা বনের নিচে তাদের চলাফেরা। তবে গোবর্ধনের বিশ্বাস—জলের ধারে একসময় আসতেই হবে বাছাধনদের। পক্ষীকুলে সন্দো, ওড় আকাশে; কিন্তু মাটি চাই-ই। কারণ ও পা দুখানি আছে।

শীতের আকাশ কিছু নীল, কিছু ধূসর। ফাঁকা মাঠে উত্তরের হাওয়া প্রবল হয়েছে। নিঃসঙ্গ কাশঝোপটা শীতের হলুদ দাঁতে ঘাসফড়িঙের মত ছটফট করছে। আর পাশে চিং হয়ে বিড়ি টানছে গোবর্ধন। গা-ময় রোদের ঝাঁপি আর আকাশ তার চোখে। এখন আকাশটাও তার দিকে শ্বশুর মশাইয়ের মত তাকিয়ে আছে। এবং রোদের ঝাঁপির আরাম গায়ে নিয়ে অচলার কথা ভাবছে সে। এমনি একাই এলে সে শুধু অচলার কথাই ভাবে। ভাবে আর সামনে চোখের উপর অমনি একটা ছাইরঙা নিষ্ফলতা দেখে। তার বড় কষ্ট হয়। বিয়ের বছর যেতে-না-যেতে কি কালব্যাধি ধরলো, ছাড়বার নাম নেই। ইটভাঁটার কাজে সবে দু' পয়সা মাগে-মরদে রোজগার করতে শিখেছে, হঠাৎ এই। হাসপাতাল—কবরেজ-মাদুলি বিস্তর করা হল। অচলার বুবতী গতরে ভাঁটির টান থমকায় না। সে বুকচমকানো দৃষ্টিই বা কোথা, কোথা সে ফাঁদে ফেলবার মত হাঁটন; আর ছায়ার ভিতর পক্ষী মিষ্টস্বরে ডাকে—লোকে খুঁজে পায় না, তেমনি ছিল তার বুলি—শুনে গোবর্ধনের মনে হত, বিধাতা হে, এ সুখের নাম বুঝি কালসুখ; আঃ কালসুখে মনিষ্যির এহকালটা কানা করে দেয়.. হুঁ, কানা করে দেয় বটে। কারণ কি না আমি আর অচলা বই যোবতী দেখি না সংসারে, আমার মোন ভরে না, মোনে তিলমাত্র ঠাঁই নাই। আমি বলি, অচলা তুমি সেই ভরা থমথমে যোবতী হয়েই আছ। আমি অন্য গাঙে চান করব না।

গায়ে কেমন গন্ধ ছোটে অচলার। মরা চামচিকের মত কটু গন্ধ। গা থমথম করে সাপের খোলস যেন। সে মাঝরাতে বলে—আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক, বড্ড ভয় লাগে। গোবর্ধন তার গতরটা পুরো বিছিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। বলে—আরাম হল এবার? হয়েছে কিছু কিঞ্চিৎ। তখন অচলা মুখ এগিয়ে আনে কানে গলার পাশে। ফের কটু গন্ধ ছোটে। কটু, অথচ গোবর্ধন মেনে নেয়। সহে। আহা, ওই শরীলে একদিন ফুলের সুবাস ছিল। গন্ধ শুঁকে এই বোকা জামাই না বাসরের রাতে বলেছিল—শুনছ, তুমার কাছে কেন ফুটন্ত এখোগুড়ের বাস পাই? সেটা গত ফাল্গুন মাস। পাশের বাঁশবনের ভিতরে আখের গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল। পথে আসতে যেতে হাওয়ায় শিসিয়ে আসত তার গন্ধ। তখন থমকে দাঁড়িয়ে শুয়োরের মত নাক উঁচু করে শ্বাস টানত গোবর্ধন। কানাই বলত— অ কি গো বাপধন? কানাই লাজুক হেসে ফের হাঁটত—কিছু নয় গো বাবামশায়, গন্ধটো বেশ।

এবং জড়িয়ে ধরে হঠাৎ কি যে হয় গোবর্ধনের। তেন্টা পাওয়া রক্ত থেকে কুত্তার মত কি একটা কাঁই-কুঁই করে লেজ নাড়ে। আর বুঝতে পেরে কখনও অচলা হাসতে চেষ্টা করে—অন্ধকারে আরও ঘন হয়। তখন তেমনি হঠাৎ গোবর্ধন মিয়ানো ঘাসের মত কুঁকড়ে পড়ে। কিল কিন করে বলে—না, না। নিজের ওপর ধিক্কারে কাতর হয়। বলে—না, না। কিন্তু কখনও আবার ওপক্ষে অচলারই হঠাৎ চেঁচামেচি—এই মা গো, মরতে বসেও রক্ষা নেই।...গতিক দেখে গোবর্ধন লজ্জায় কাষ্ঠখণ্ড। ক্ষোভে কাঁদতে সাধ যায়। গোড়ার দিকে কুত্তাটাকে লাই না দিলেও পারতে। তার রাগ হয় অচলার উপর। ভাবে, ছেড়ে চলে যবে ফের নিজের গাঁয়ে। রোগের অছিলায় ঘরজামাই বলে খাওয়া ধাতে সইবে না। কিন্তু পারে না। আশা পিছু ছাড়ে না। অচলা মরে যাবে, তাকি সম্ভব? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ দেখা যাবে। সপ্তায় একদিন করে শহরে যেতে হয় ওকে নিয়ে। ডাক্তারবাবু ওষুধ-পত্র দেন। ইঞ্জেকসন লিখে দেন। গাঁয়ে মুকুন্দ কম্পাউন্ডার লুকিয়ে এসে সেই ইঞ্জেকসন করে যায়। সীতু ডাক্তারবাবুর বেজায় আক্রোশ মনে—ব্যাটা বাউরীর ছেলে, সেও শহরে ডাক্তার খুঁজতে যায়। সীতুবাবু বলেন—কানাই মেয়েটাকে মারবে, নির্ঘাৎ মারবে।

ঝিমুনিমত এসেছিল। রোদ ভারি আরামদায়ক। গোবর্ধন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। ভাবনার কোন ফাঁকে স্বপ্নটপ্নও কিছু দেখা হয়ে গেল বুঝি। নৈলে পথই বা কোথায়, পাশে নধানজুলি, ওপারে মস্ত গাছে হাজার হাজার পাখি বসে আছে! পাখিগুলোর রং গাঢ় হলুদ। নিশ্চিন্ত বসে আছে। আর গোবর্ধনের কাঁধে ফাঁদের গোছা! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে.....

কিছু না, মোনের ভরম! খড়ি খড়ি আকাশ সামনে। সেখানে একঝাঁক পায়রা। ঘুরে ঘুরে নামছে। হেই মা ঢেলাইচণ্ডী,.....আস্তে আস্তে কাত হল গোবর্ধন। সঙ্গে সঙ্গে পায়রাগুলো ঝাঁক সমেত আকাশটাও যেন বেঁকে পড়লো মাটির ওপর। দৃষ্টি কাঁপতে লাগলো।

হাওয়ায় নেশা কাটবার মুখে—অথচ যেন নতুন করে ঘোর আসে। ফাঁদে ঝটপট করছে নীল রঙের কটা পাখি। কখনও সাদা, কখনও নীল এই রকম লাগে। পলক না ফেলতে বসে পড়েছিল ঝাঁকটা।

উঠে টলতে থাকল গোবর্ধন। পা বাড়াল। শুকনো গলায় গানের রস আসছে।

—পালা রে পালা রে পাখি, দ্যাশে
এল পাখিমারা।.....

রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল অচলা। রোদ যেমন ঘুরেছে, পিঠটাও ঘুরেছে। খানিক পরেই তো জ্বর আসবার কথা। কানাই তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেছে। গোবর্ধনের ব্যাপারটা ভিন্ন। আকাশের পাখি—কতটা সময় লাগে কে জানে। বেলা ফুরিয়েও যেতে পারে। খালি হাতেও ফিরতে পারে সে। তবে জোর দিয়ে বলে গেছে।—যেমন করেই হোক, খালি হাতে ফিরছে না।

সুতরাং মনে মনে একরকম তপস্যার ঝিমুনি। নানা মানত, দিব্যি দেওয়া। মাঝে মাঝে মিষ্টি খেতে চায়, বাজার থেকে এনে দেয়। ডাক্তারবাবু বলেছেন—যা খেতে চাইবে, খাওয়াবে। ভয়ের কারণ নেই। দু'টি পুরুষে যা রোজগার করে, চলে যায় কোনরকমে। তবে আক্রাগণ্ডার বাজার। রুগী দু'বেলা ভাল-মন্দ খেতে চাইলেই তো দেওয়া যায় না। তখন অচলা মিনমিন করে বলে—গতরে রোগ না ধরলে তো তুমাদের পিত্যাশী থাকতাম না! শুনে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়ে কানাই। —অকি কথা মেয়েটার, শোন। আমি কি তাই বলেছি? তবে কি না, মনিষ্যির কতরকম সাধ-আহ্লাদ থাকে। ইদিকে আমি হলাম সামান্য তুশ্চু এট্টা জীব। চুরি-ডাকাতি করতে হাত-পা কাঁপে, নৈলে.....

না, চুরি-ডাকাতি করতে বলে না অচলা। নিজের ইচ্ছার দিকে রাগের বশে তাকায়। তোর গলায় দড়ি দিতে এত ডর, দিনরাত্তির দু'টো মানুষকে জ্বালাতন করিস? আর মরার কথা ভাবতে বুক ধড়ফড় করে। ক্যানে মরব? মরব ক্যানে? আমার কি বয়স হয়েছে মরবার?..... আরোগ্যের আশা তাকে সামনের দিকে তাকাতে বলে।

জ্বর আসবার আগেই কানাই এসে গেল। এসে গায়ে হাত রেখে উত্তাপ অনুভব করল সে। কোঁচড়ে একরাশ তেঁতুল। হাসতে হাসতে বলল—হনুমানগুলো বেশ কথা শোনে, বুঝলি মা? আম্মো খানিক লম্ফঝম্ফ কল্লাম উদের সংগে। দেখবি নাকি? হুঁ—উ—প্!

থাক্, থাক্। অচলা জানে, এমন বাপ—এখনই মেয়েকে হাসাবার জন্যে অনেক কীর্তি করে বসবে। তায় নেশাখোর মানুষ। লাজলজ্জার ঢাক-চাপ নেই। তার চেয়ে রান্নায় বসুক গিয়ে। বেলা বেড়েছে। ওদিকে লোকটা রোদ-বাতাস পুইয়ে ফিরবে। এখনই যদি ফেরে, ক্ষিদের অন্ন সামনে দেওয়া উচিত। সে বলল—উনুন ধরাও দিকি, ক্ষিদে পেয়েছে।

ক'দিন আগে থেকে কুসুমগাঁ থেকে সৈরভীপিসি এসেছিল ভাইঝিকে দেখতে। দুটো কমলালেবু এনেছিল। এখনও দু'কোয়া আঁচলে বাঁধা রয়েছে। ক্ষিদের কথায় তা মনে পড়ে গেল। খুলল অচলা। কিন্তু হাতের সামনে তেঁতুল। নোলায় জল টসটস করে।

শীতকাল বলেই উঠুনে উনুন। শুকনো খড় জেবলে দিল কানাই। মেটে হাঁড়ির ভলাটায় লেপন দেওয়া হচ্ছে না কতদিন ধরে, কালি ঝুরঝুর করে দু' জানুতে পড়ছে। উনুনটাও সেইরকম। কুকুর এসে ঠ্যাঙ তুলে পেচ্ছাব করে যায়। অযত্নেও সংসারটার খোয়ার কম হচ্ছে না।

অচলা তেঁতুল খেতে খেতে টক্ টক্ শব্দ তুলছে জিভে। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা মমতায় মনও ওইরকম রসাল হয়ে উঠছে। অন্য বাপ হলে কি করত কে জানে! ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসত হাসপাতালে। ওই রাভী বউরানটাকে যেমন করেছিল তার মা।

সেরা
সওদা

রোভার সাইকেল যে কোন পথে স্বচ্ছন্দে চলার জন্যই তৈরী। যেমন ঝকঝকে চেহারা, তেমনি আছে সব রকম ধকল সইবার শক্তি। আর তাই রোভার সাইকেলের উপর লোকের এত আস্থা। আজকের একটি অতি জনপ্রিয় সাইকেল।

ROVER রোভার

এভারেষ্ট সাইকেলস লিমিটেড
মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা-১
রেজিষ্টার্ড-অফিস ও ফ্যাক্টরী—গৌহাটী
কেবলস্ এভসাইকেলস্ : কলিকাতা ; রোভার : গৌহাটী

R-V/28

মেটামরফোসিস

অমিয়কুমার হাটি

মেটামরফ মানেই হোল রূপান্তর
ছোট্ট থেকে বড় হবার লীলা,
কালের বুকে বইতে গেলে কালান্তর
নদীর রূপ বদলে দেয় শিলা।
শুককীটেরা হঠাৎ ছেড়ে খোলসগুলি
বদলে ফেলে চেহারা বিলকুল
শুককীটেরা পাচ্ছে রূপ খেলেস ধূলি
পতঙ্গেতে। পড়ে না চোখে স্থূল।
এমনি করে মানুষ-মাঝে রূপান্তর
আদিম থেকে নবীন যুগে হবে।
আশায় থাকি যুগের থেকে যুগান্তর
মানুষ তার স্বরূপ পাবে কবে।

Metamorphosis—Transformation
from young to adult stage.

অভিযুক্ত

বুদ্ধ ভট্টাচার্য

একবার, দুবার, বারবার বললাম—"আমি নই।"
তবু তারা জোর গলায় বলল, "হ্যাঁ, তুমিই সেই।"
আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল তাদের উন্মত্ত-গর্জনে!
তবু বললাম, "আমি নই, আমি নই।"
তারা বলল, "তুমিই সেই।"

আকাশকে বাতাসকে সাক্ষী রেখে
আগুনকে ছুঁয়ে আবার বললাম, "আমি নই, আমি নই।"
ওরা তবু বলল, "হ্যাঁ, তুমিই সেই।"

বন্ধঘরের অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ালাম শুধু
লোহার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম
'বিশ্বাস করো, আমি নই।'
এবার আর তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো না,—
শুধু কারাগারের কঠিন দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল
"আমি নই।"

মাথার উপর পায়রার ঝাঁক সেই সময়। চালে বসবার তালে। হই হই করে উঠেছে কানাই।—যা, যা, চলে যা বিলের বাগে। জামাই বসে আছে উদিকে নেমন্তন্ন করে.....

বাপ মেয়ে দারুণ হাসছিল। পায়রা-গুলো ভয় পেয়ে পালিয়েছে। সেই পথের দিকে চোখ অচলার। লোকটা দুরু দুরু বুকে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। অচলার জন্যে তার জীবন পণ। যেমন বাপের উপর, তেমনি স্বামীর উপর মমতায় আকুল হয়েছে অচলা। হতভাগিনীর জন্য এত কষ্ট করে সব!

ঠিক তখনিই বীণা এল মাঠের দিক থেকে। কাঁখে ঝুড়ি। একরাশ কচুকুটা আর শুকনো গোবরে তা ভর্তি। বোঁচড়ে শাকের গোছা উঁকি মারছে। দুচোখে কালির ছোপ, ক্লান্ত খড়িপড়া মুখ। ঠোঁট মরা জোঁকের মত শুকনো। কপালে ঘামের বিন্দু মুছে বলল—কেমন আছ সই?

অচলা হেসে উঠল।—অনেকদিন বাদে যে? এ্যাদ্দিনে বুঝি মনে পড়ল?

—না ভাই, সময় পাই নে।

কানাই ঘাটে গিয়েছিল। ফিরে এসে বীণাকে দেখে বলল—কিরে মা-জননী, পথ ভুলে না কি?

পথ ভুলেই যেন বা আসা। হঠাৎ কি কৌতূহলে হয়তো। ছেলেবেলার সই ছিল, সে স্বপ্নের মত ঝাপসা দূর। অচলা দেখল, স্থির তীব্র চোখে বীণা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন ঠাণ্ডা লাগে নিজের ভেতরটা। কি দেখছে ও? যেন ভিতরের প্রাণ-ভোমরায় নখের আঁচড় লাগে। অচলা বলল—কি দেখছ সই?

—তুমাকে।

বীণা একটু হাসল। মাঠচরানী মেয়ে বীণা। এই বয়সেই পাঁচটা স্বামীর ঘর ভেঙে পাড়ায় নাম করেছে। তার বুকের উপর, গলার কাছে, যেখানে হলুদ কাপড়টা সরে গেছে, সেখানে দগদগে লাল ছোপ।—একটুখানি আঁচড়কাটা রক্তের লাল রেখা। হঠাৎ চমকাল অচলা। দারুণ চমক খেল। পেছন ফেরা বীণার খোঁপা খসে-পড়া চুলে একটা নীল ডানা গোঁজা। পায়রার ডানা। ডানাটা বড় হতে হতে চোখের সামনে সব মুছে দিচ্ছে একটু করে।

তারপর রাত নেমেছে। গোবর্ধন খাওয়া শেষ করে কাঁথামুড়ি দিয়েছে। পায়রা ধরা যায় নি। ফাঁদ ছিঁড়ে পালিয়েছে। সুতো মজবুত ছিল না। কাল ফের চেষ্টা করা যাবে। তার নাকে কোত্থেকে একটা গন্ধ আসছে। সেই এখো গুড়ের গন্ধ। সে উঁচু নাকে শ্বাস টানছে বারবার। গন্ধটা মাঠের দিক থেকেই বুঝি ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসছে।

অচলা আজ বাপের পাশে। জ্বরটা বেড়েছে। মাথার কাছে টিমটিমে লম্ফ জ্বলছে। কখন ঘুম গাঢ় হয়েছিল কানাই বাউরীর। হঠাৎ ভেঙে গেল। বুকে মুখ ঘসছে মেয়েটা। অথচ এত ঠাণ্ডা কেন? সে লাফিয়ে উঠলো—অই বাপধন, অ গোবর্ধন, এট্টু উঠোদিনি।.....ফুটন্ত এখো গুড়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে গোবর্ধনের ঘুম আসে নি চোখে।

—জ্বালাতন! গজগজ করছিল সে, তখন বললাম ইখেনে শোও, শুনল না!

না, স্বামীর পাশে যাবার জন্যে নয়, মরবার জন্যে অচলা বাপের ঘুম ভাঙিয়েছে দুপুর রাতে। ঠোঁটে জল ঢেলে কানাই হাউমাউ করে কাঁদে

চিতা নিবতে বেলা দুপুর। নদীতে স্নান করে শ্বশুরমশাই ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ গোবর্ধন মধ্যপথে থামল—বাবা মশাই, আপনি চলেন, আমি এট্টু পরেই যাবো।

—ক্যানে বাপধন?

গোবর্ধন বলল—এট্টু বিলবাগে যাই।

ধরা গলায় কানাই বাউরী বলল—আর ক্যানে বাবা গোবর্ধন?—ক্যানে? গোবর্ধন মুখ তুলল মাত্র। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন। তারপরই হনহন করে মাঠে নামলো। মাঠের উপর মস্ত আকাশ। ফাঁকা ধূসর আকাশ। সেখানে নীল রঙের অজস্র পায়রা ঝাঁকে ওড়ে। ঝাঁকে বসে ভেজা নরম মাটিতে। নখের আঁচড় কাটে। ফাঁদে পড়ে ছটফট করে। নীলরঙা ডানা উড়ে বেড়ায় ঘূর্ণিতে—কত বড় ফাঁকা মাঠ!

আমৃত্যুর একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

"একা"

আনন্দ,মাখন ও গণেশের এখন চিন্তা —আমার কি হল? আমি কোথায়? তাদের অপ্রত্যাশিত মিলনের পরে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে—তবে কি আকস্মিকভাবে আমার সঙ্গেও তাদের ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দেখা হবে? কিন্তু আমাদের মধ্যে আকস্মিক মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। আমি স্টেশন-মাস্টারের কামরা থেকে বেরিয়ে যতীন-বাবুকে গুলী করে আনন্দের পেছন পেছন পূব দিকে প্ল্যাটফরমের ওপর ছুটে গেছি। কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারলাম আমার সামনে যাকে দেখছি সে আনন্দ বা মাখন দু'জনের কেউই নয়। আমি বুঝলাম আমার সামনে হয়ত কোন রেলকর্মচারী বা পুলিশ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আরও মনে হল পেছনেও কয়েকজন ভয়ে ছুটে আসছে। সামনে ও পেছনে অপরিচিত লোক, মাঝে আমি। লোকগুলি যে কে তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমি সেই অবস্থায় আমার আগে ও পরের অচেনা লোকদের এড়ানোর জন্য ডান দিকে, অর্থাৎ, প্ল্যাটফরমের দক্ষিণে মোড় নিয়ে একটু যেতে না যেতেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়লাম। প্রথমটা কাঁটাতারের বেড়া আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু একটু পরেই আমার শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। আমার দুই হাতের মুঠোতে পিস্তল ও রিভলভার ধরা আছে, কাজেই হাত দুটি আট্‌কা। এই অবস্থায় কাঁটাতারের বেড়ায় আমার জামা কাপড় জড়িয়ে পড়েছে, হাত পা মাথা—শরীরের নানা খানে আঁচড়ে গেছে। এর মধ্যে দু'-একটি ক্ষত কিছু গভীর হয়েছে বলে মনে হল। মাত্র কয়েক মিনিট আগে গুলী চালিয়ে এসেছি, তখনও লোকজন ছুটোছুটি করছে —বিপদের মুখ থেকে নিরাপদ স্থানে যেতে পারি নি, কাজেই এক মুহূর্তের জন্যও পিস্তল ও রিভলভার হাতছাড়া করতে পারছি না। কাঁটাতারের বেড়ার ওপর এইরূপ অসহায় অবস্থায় বেশিক্ষণ পড়ে থাকার অর্থই হল আবার নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়া। তাই অবিলম্বে কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে সমস্ত গায়ের জোরে এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে কাঁটাতারের বেড়া থেকে মুক্ত করে নিতে চাইলাম। টানের চোটে জামা কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাথা ও পায়ের দু' জায়গায় গভীর ক্ষত হল। অন্ধকারে দেখতে পাই নি কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম মাথা ও ডান পা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তবু মনে আনন্দ—কাঁটাতারের বেড়া থেকে তো মুক্তি পেলাম! কিন্তু হায়! কে জানতো যে উত্তপ্ত তেলের কড়াই থেকে আমি একেবারে জ্বলন্ত উনোনে পড়বো?

স্টেশনের পূর্ব দিকের দেওয়াল পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। স্টেশনের দেওয়াল ও কাঁটাতারের বেড়া যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে তার মাঝখানে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গমনাগমনের একটি ছোট্ট গেট ছিল। এই গেটটি আমি দেখতে পাই নি। আমি এই গেটেরই সামান্য কয়েক হাত দূরে কাঁটাতারের ওপর গিয়ে পড়ি। গেটটির বাইরে সোজা দক্ষিণে, যাত্রীদের লোকালয়ে যাবার পথ। আর এই পথের বাঁ দিকে একটি কাদা জমানো ছোট্ট পুকুর। কাছেই একটি মাটির দেওয়ালের বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। এই বাড়িটি তৈরি করবার জন্যই পুকুরে কাদা জমানো হয়েছে। বেড়া থেকে মুক্ত হয়ে আমি কোনমতে Balance রাখতে পারি নি। আমার দু' হাত বন্ধ, এই পাঁক-পুকুরের সরু পাড়ের ওপর স্থির থাকতে না পেরে আমি পিছলে একেবারে কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম।

কাঁটাতারে আটকে যাওয়া, হ্যাঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করা ও আবার কাদার মধ্যে পড়া—এই সব ঘটনাই হয়ত দু'-এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটেছে। কাঁটাতারে জড়িয়ে পড়ে আমি খুব অসহায় বোধ করেছি সন্দেহ নেই, কিন্তু কাদায় হাবুডুবু খেয়ে আমার অবস্থা আরও করুণ ও শোচনীয় হয়ে উঠলো তা বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। মানসচক্ষে অনুধাবন করুন—আমি কাদাভর্তি পুকুরে পড়েছি—গলা পর্যন্ত কাদা, দু' হাত উঁচু করে রেখেছি—এক হাতে পিস্তল ও অন্য হাতে রিভলভার। আমি সাঁতরাবার কোন চেষ্টাই করতে পারছিলাম না কেবল পায়ের জোরে এই পাঁকের গর্ত থেকে উঠতে চেয়েছি, যতবার গভীর কাদায় প বাড়িয়ে উঠবার প্রয়াস পেয়েছি ততবারই পা পিছলে পিছলে গেছে—আমি আরো কাদার তলায় ডুবে গেছি। তখন ভীষণ ছটফট করেছি—পিস্তলধরা দু'টি হাত বার বার সামনের দিকে ছুঁড়েছি—বাতাসে যেন আমি সাঁতার কাটছিলাম। সমস্ত শরীরের ঝাঁকুনি, কাদাপুকুরের পিছল তলায় পায়ের দ্রুত ক্রিয়া এবং শূন্যে হস্ত ও বাহুর সঞ্চালন আমাকে যে কিভাবে শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে সাহায্য করেছিল তা এখন আর লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। যা হোক্, আমি কাদাপুকুর থেকে কোন মতে উঠে এলাম। এই সময় অন্য কোন লোক আমার চোখে পড়ে নি। সারা গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় আমাকে যদি কেউ দেখতে পেত তাহলে তার পক্ষে আমাকে ভূত বলে ধরে নেওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হোত না।

আমি যে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর পড়েছিলাম তা' কেউ দেখে নি। সেই জন্যই ভেবেছিলাম যে পুলিশও হয়ত জানবে না। কিন্তু দেখা গেল, আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ কাঁটাতারে আটকে যে যথেষ্ট আক্কেল সেলামী দিয়েছে, পুলিশ শেষ পর্যন্ত সেটা আবিষ্কার করেছে। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে ইউনী, তাঁর জাজমেন্টে লিপিবদ্ধ করতে ভোলেন নি—

"At 5-30 a.m. the A. S. I. Serajul Haq was sent by the Inspector to look for the fugi-

tives.... From 8-30 a.m. another A. S. I. (P. W. 64) searched for them along the road from Birinchi, a village on the west side of the railway line up to Ranirhat but was similarly unsuccessful. He returned to the Railway Station at about 6 a.m. and at the south-east corner of the railway fence which separates the station and the college compounds, he found sticking to the barbed wire at one place a small torn piece of cloth [Ex. cxxii (1)] and a chadar and at another place near by another small torn fragment of cloth [Ex. cxxii (2)]." (Judgment Chittagong Armoury Raid Case No. 1 Page—79).

(ভোর সাড়ে পাঁচটায় সময় ইনস্পেক্টার সাহেব এ এস আই নিয়াজুল হককে পলাতকদের অনুসন্ধানে পাঠান। ৬৪ নং ওয়ার্কার্স সাক্ষী, অপর একজন এ এস আই ভোর সাড়ে তিনটা থেকে রেললাইনের পশ্চিমে বিরিঞ্চি গ্রাম হতে রানীরহাট পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে আমের জনের মতই বিফল মনোরথ হয়েছে। সাড়ে ছ'টার সময় সেই এ এস আই রেল-স্টেশনে ফিরে আসে এবং রেল-কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, যেখানে কলেজ কম্পাউণ্ড বিভক্ত হয়েছে, সেখানে কাঁটা-তারের কোন এক স্থানে ছোট একটুকরো ছেঁড়া কাপড় ও একটা চাদর ঝুলতে দেখে। কাছাকাছি অপর একটি স্থানে আরো এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্র দেখতে পায়। এই সব কিছুই ওপরে চিহ্ন দিয়ে কোর্টে উপস্থিত করা হয়েছে)।

এই সব ছেঁড়া টুকরো কাপড় যে আমাদেরই কারুর ব্যবহৃত তার কি প্রমাণ আছে? এই ধরণের ছেঁড়া টুকরো কাপড় খুঁজলে হয়ত বেড়ার গায়ে আরও পাওয়া যেত, কিন্তু তাই বলে সেগুলি যে আমাদেরই কারও হবে, এটা প্রমাণ সাপেক্ষ। পুলিশ প্রমাণ করল Dying Company-র নম্বর দিয়ে। এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে এই নম্বরের একটি ধুতি আমাদের সাথী রজত সেন ধোবার জন্য দেয়। কাজেই রজত সেনের কাপড় আমাদের কেউ ব্যবহার করেছে এবং আমরা সবাই যে একই ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, পুলিশ তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে। Judgment-এ লেখা আছে—

"On this piece the number 15427 was marked in marking ink. And on 11-4-30 a Kaddar Dhoti was received for cleaning by P. W. 166 from Rajat Sen and was marked with the number 15427 is Ex. 159 (4)."

বাঃ, কী চমৎকার! পুলিশের কি বিচক্ষণতা! পাঁচকড়িবাবুর ডিটেকটিভ নায়ক অরিন্দমকেও হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসই তো পুলিশের এইরূপ বিচক্ষণতা ও বিশ্লেষণকে ম্লান করে দিয়েছে, কারণ সেই বিপ্লবী যুবকেরা তাদের নিজেদের বাড়ির বন্দুক ও মোটর গাড়িই আক্রমণের সময় ব্যবহার করেছে, ষড়যন্ত্র ও যোগাযোগের প্রয়োজন জন্য অত কষ্ট করে ছেঁড়া কাপড় খুঁজে বেড়াবার দরকার কি ছিল!

যাক্, আমি কেশীতে আগে একবার এসেছি। তাই আমি সহজেই চিনতে পারলাম এখান থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে কেশী অভয়-আশ্রম। শ্রীনির্মল সিংহরায় বোধ হয় তখন অভয় আশ্রমের সেক্রেটারী। শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের প্রদর্শনীর জন্য এখানে আমি আগে একবার আসি, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ভাবলাম তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলে হয়ত বিমুখ করবেন না। বড় রাস্তা ধরে আশ্রমে না এসে মাঠের ওপর দিয়ে পথ করে নিলাম। দু'-তিনটি উঁচু বেড়া হাতের ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আমি আশ্রমের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ি। আমার ভাগ্য যে অত রাত্রে কেউ জেগে ছিল না এবং আমাকে আশ্রমে ঢুকতে রাস্তার ওপর থেকেও কেউ দেখে নি। আশ্রমের যে ঘরে নির্মলবাবু থাকতেন সেটি আমার জানা ছিল। আমি সেই বাঁশের বেড়ার ঘরের দরজায় করাঘাত করে ডাকলাম—"নির্মলবাবু, নির্মলবাবু!" কোন উত্তর পেলাম না। তারপর গলা আরো চড়িয়ে চেঁচালাম—"নির্মলবাবু!" ঘরের ভেতর কার যেন ঘুম ভাঙলো—নিদ্রাভঙ্গে গা মোড়ামুড়ির শব্দ কানে এল এবং তার পরেই ঘুমের আমেজ জড়ানো মোটা গলার প্রশ্ন এল—"কে?" গলার আওয়াজ কিন্তু ঠিক নির্মলবাবুর বলে মনে হল না। আমি জবাব দিলাম—"নির্মলবাবুকে চাইছিলাম। তাঁকে একটু ডেকে দিন।" উত্তর এল—"নির্মলবাবু নেই। হাটে গেছেন খদ্দরের কাপড় কিনতে। সকালে ন'টা দশটায় ফিরবেন।" নির্মলবাবু তো নেই, এখন কি করা যায়? তাঁকেই মিনতি করলাম—"দেখুন, নির্মলবাবু আসা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করতে চাই।" তিনি আমায় সব কথা শেষ করতে দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—"না, না, তা হবে না। আপনি এখন যান—সকাল দশটায় আসবেন।" ভাবলাম, আশ্রমে অসময়ে অনেকে আশ্রয় নিতে উপস্থিত হন এবং তাতে তাঁরা যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেন; সেই কারণেই হয়ত কোন তিক্ত অভিজ্ঞতাবশত তাঁরা স্থির করেছেন যে কাউকে আশ্রমে স্থান দেবেন না। কাজেই মনে হল আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অগত্যা ভদ্রলোককে আর বিব্রত না করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম। বোধ হয় ভালই হল—একেবারে নির্ভেজাল খদ্দর, কে জানে আমার কাদা ও রক্তমাখা দেহ এবং দু' হাতে পিস্তল দেখে তাঁর কি অবস্থা হোত?

আমি মাঠ দিয়ে ঘুরে আবার রেল লাইনে এলাম। স্টেশন থেকে প্রায় তিনশ' গজ পুবে দাঁড়িয়ে আশেপাশের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। খুব একটা হৈ-চৈ অথবা পুলিশ ও মিলিটারীর ব্যস্ততা দেখা গেল না। কেউ ধরা পড়েছে কি না বুঝতে চেষ্টা করলাম। আবছা অন্ধকারে দূর থেকে দেখে মনে হল না যে আমাদের কেউ ধরা পড়েছে।

রেল লাইন পেরিয়ে আমি উত্তর দিকে মাঠের ওপর দিয়ে এগোতে লাগলাম। বাকি রাতটুকু হাঁটতে হাঁটতেই কেটে গেল। কাদা, জল, নর্দমা, খাল, ডোবা, প্রভৃতি অতিক্রম করে চলেছি। ফেণী স্টেশনের উত্তরে—বহুদূরে, পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম। সূর্যোদয়ের পূর্বে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের কোলে গাছপালা, জঙ্গল প্রভৃতির অন্তরালে আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার আশায় অধীর পদযুগল দ্রুত পথ অতিক্রম করে চলেছে।

পুরু কাদামাটিতে তখনও আমার গা ভর্তি। একটি পিস্তল ও আর একটি রিভলভার—দুটিই কাদামাখা। আগে অবশ্য যা পেরেছি এক-আধটু মুছে পরিষ্কার করেছিলাম। সামনে একটা ছোট্ট ডোবা দেখতে পেয়ে তার জলে আমার গায়ের কাদামাটি কিছুটা পরিষ্কার করে নিলাম। মাথার ও পায়ের ক্ষতস্থানও সেই কাদা-মাখা জলেই পরিষ্কার করে নিই। ক্ষত স্থানের রক্ত তখনও বন্ধ হয় নি—একটু একটু রক্ত ঝরছিল। শরীর পরিষ্কার করা বা ক্ষতস্থান ধোয়া আমার যত না প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে সহস্রগুণ তাগিদ অনুভব করেছি আমার পিস্তল ও রিভলভার দুটিকে পরিষ্কার করবার জন্য।

পিস্তলটিতে একসঙ্গে নয়টি কার্তুজ ব্যবহার করা যেত। আমি বাঁ হাতে পিস্তল দিয়ে মাত্র একটি ফায়ার করেছি এবং ·৩২০ ব্যাসের পিস্তলের গুলীতে বিদ্ধ হয়েছেন দারোগা যতীনবাবু। পিস্তলের ম্যাগাজিনে

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী জোরা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই দ্রুতগতি শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা বের ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাঁটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ফ্লু ডেজু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

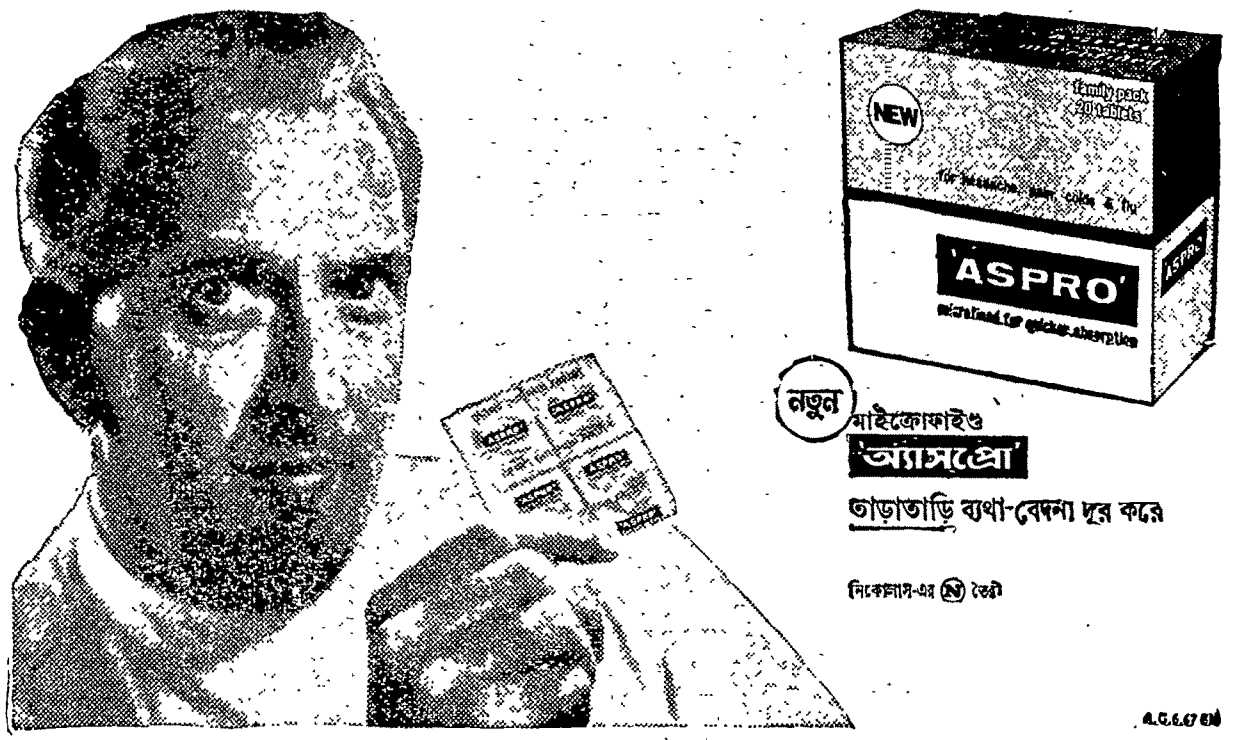

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড
'অ্যাসপ্রো'
তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিকোলাস-এর (N) তৈরী

থাকি আটটি কার্তুজ ভর্তি ছিল। তা ছাড়া আমার সঙ্গে একটি থলেতে আরো প্রায় একশ' পিস্তলের টোটা মজুত। কিন্তু রিভলভারের ·৪৫০ ব্যাসের কোন অতিরিক্ত কার্তুজ আমার সঙ্গে রাখি নি—মাত্র দুটি কার্তুজই রিভলভারে ভর্তি ছিল। তরুণ সাথীরা আমার অভিমত জানতো—রিভলভারের ছ'টি ও পিস্তলের ন'টি গুলী ব্যবহারের আগেই প্রথম decision হয়ে যাবে। তাই রিভলভারের বড় বড় কার্তুজ আমি মাখন ও আনন্দের কাছে ভাগভাগি করে রাখতে বলি। পিস্তলের প্রায় একশ'র বেশি অতিরিক্ত কার্তুজ আমার কাছেই ছিল কারণ, সবে ধন নীলমণি পিস্তল মাত্র একটিই যা ছিল আমাদের। আমি রিভলভার দিয়ে পাঁচটি ফায়ার করি। কাজেই রিভলভারের তাজা কার্তুজ ছিল মাত্র একটি—বাকি পাঁচটিই ফায়ার করা হয়ে গেছে। যতদূর সম্ভব আমি খুব ভাল করে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি পরিষ্কার করি। পরিষ্কার করবার পর আমি যা দেখলাম তাতে তো আমার হাত-পা ঠান্ডা! রিভলভারে আছে মাত্র একটি কার্তুজ আর পিস্তলের ইজেক্টারের (কার্তুজ টেনে বার করবার স্প্রীং) স্প্রীং ভেঙে গেছে—কি সর্বনাশ! পিস্তলটি তো একেবারেই অকেজো হয়েছে. কেবলমাত্র একটি তাজা কার্তুজের ওপর নির্ভর করে রিভলভার সঙ্গে রাখতে হবে। এ এক মহা সমস্যা। হাতে পিস্তল ও রিভলভার সমেত ধরা পড়বার চাইতে যে মরাও ভাল! ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হেঁটে চলেছি। তখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নি। পাহাড়ের দিকে ছুটে চললাম।

পাহাড়ে উঠে ঝোপঝাড় ও গাছপালায় ঘেরা একটি নির্জন স্থান বেছে নিলাম। তখনও ভোর হতে কিছু বাকি। কাকের ডাক দিনের আগমনবার্তা ঘোষণা করে নি। আমি খুব ক্লান্ত—পা আর চলে না, একটু বসে পড়ি। কিন্তু আর বসেও থাকতে পারলাম না, আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম। গায়ের জামা কাপড় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। রিভলভারে কার্তুজ নেই, পিস্তলের ইজেক্টার ভেঙে গেছে, পায়ের পাতা ক্ষত-বিক্ষত। পেটে কিছুই নেই—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। চারিদিকে কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নেই। এতই ক্লান্ত যে আর নড়বারও ইচ্ছে নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জ্বালায় স্বভাবতই ঘুম আসা সম্ভব নয়, তবু জানি না অবশ-দেহ কখন ঘুমে লুটিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম ঠিক বলতে পারি না। ঘুম ভেঙে দেখি সূর্য বেশ কিছুটা উঠেছে। মনে হল সকাল প্রায় আটটা হবে।

বন্ধুদের কি হল ভেবে মনটা খুবই খারাপ। পিস্তল ও রিভলভার দুটিই নাকেজো, কাজেই অস্ত্র থাকতেও আমি নিরস্ত্র। যদি এ-ভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করে তবে প্রচার হবে অস্ত্রসহ অনন্ত সিং বন্দী হয়েছে। এটা আমার পক্ষে ভাবাও অসহ্য। তাই পিস্তল ও রিভলভার দুটিকেই আমি চিরতরে বিদায় দিলাম—মাটির নিচে পুঁতে ফেললাম। আমার পরনে কাদামাখা ছেঁড়া ধুতি ও সার্ট, তাতে আবার স্থানে স্থানে রক্তের চিহ্ন। এ অবস্থায় কারো নজরে পড়লেই সন্দেহের উদ্রেক হবে। কিন্তু পাহাড়ের টিলার ওপর জঙ্গলে বসে দিন কাটালে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না। উন্মুক্ত জায়গায় লোকালয়ের কাছাকাছি আসতে হবে। পথ খুঁজে নিতে হবে—সংযোগ স্থাপন করতে হবে কলকাতা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে।

তখন সকাল আটটা-ন'টা হবে। ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। গায়ে শতচ্ছিন্ন কাদা ও রক্তমাখা পরিধেয় আর নেই—বেশ বদল করেছি। প্রায় উলঙ্গ অবস্থা—মাত্র ছয় ইঞ্চি মত চওড়া কাপড়ের কৌপীনে লজ্জা নিবারণ করেছি। মনে মনে ভেবে নিলাম—কালা, বোবা, উদ্ভ্রান্ত বা অর্ধ পাগলের ভূমিকা অভিনয় করব। বিবস্ত্র অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পাগল-ভাব এবং প্রয়োজনের খাতিরে কালা ও বোবা সাজাই বেশ মানাবে বলেই মনে হল। খালি গায়ে কাদামাটি মাখলাম—চুল এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলাম।

বিস্তীর্ণ পাহাড় ও মাঠ অতিক্রম করে চলেছি। মাথার ওপর প্রখর রৌদ্র। জলের অভাবে জিহ্বা, গলা ও মুখ শুকিয়ে গেছে। আশেপাশে জলের কোন চিহ্নও নেই। কোথাও জনপ্রাণীও চোখে পড়ছে না। মনে মনে ভাবছিলাম কাউকে যদি একা দেখি তবে তার কাছে বোবা সেজে আকারে-প্রকারে, ভাবে ও ইঙ্গিতে জল এবং খাবার চাইব। দুপুর প্রায় বারোটার সময় একজন চাষীকে পেলাম একেবারে একা—তারপরে আরও দু'জনকে নির্জনে পেলাম বটে, তবে তাদের কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত আমার আর কিছু বলা হল না—কোন না কোন বাধা এসে পড়ল। এমনি করে প্রায় একটা বেজে গেল। ফেণী-বিলোনিয়া নতুন রেল লাইন ও তার পাশের নতন রাস্তা পার হয়ে আমি আবার মাঠ-ঘাট অতিক্রম করে চলেছি। কাছেই লোকালয় দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কোন বিপদের আশঙ্কায় ট্রাঙ্ক রোড এবং লোকালয় এড়িয়ে চলেছিলাম। দূর থেকে বাজার বা স্টেশন দেখা গেলে আর সেদিকে যাই নি। কারো সামনে যাতে না পড়ি সেইজন্য বেশ খানিকটা ঘুরে নিরাপদ পথে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদ এড়ানো গেল না। কোথা থেকে ছোট ছোট কতকগুলি ছেলে জুটে গেল। অর্ধ-উলঙ্গ বেশে 'পাগলটিকে' দেখতে পেয়ে তাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। বালকদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। তারা আমাকে নানা রকম টিট্‌কারী দিতে লাগল—চারিদিক থেকে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল—অবশ্য তেমন জোরে নয়, আর সবগুলি গায়েও লাগছিল না। তবে খুব আশঙ্কাজনক ও বিরক্তিকর পরিস্থিতি। বড়রা এসে জুটবে কি না বা দফাদার চৌকিদারের আকস্মিক আবির্ভাব যদি হয়—ইত্যাদি ভেবে নিতান্ত অনিশ্চয়তা বোধ করছিলাম। এইসব দুরন্ত বালকের দল আমাকে প্রায় আধ মাইলেরও বেশি তাড়িয়ে নিয়ে চলল। তাদের না পারি কিছু বলতে, না পারি ভয় দেখাতে। নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন ভাব দেখানই শ্রেয় মনে হল। আত্মরক্ষার অন্য কোন পন্থাই কাজে লাগল না। যার কাছে রাগ, দুঃখ বা অভিযোগ জানাব তেমন কেউই তো সেখানে ছিল না—সকলেই যে বালক! নিজেকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল যে মাঝে মাঝে রাগে দুঃখে অভিমানে চোখে জল এসে যাচ্ছিল। আশ্চর্য! এতগুলি বালকের মধ্যে একজনও কি ঐরূপ অশোভন ও নিষ্করুণ আচরণের প্রতিবাদ করার জন্য ছিল না।

বালকেরা যখন দেখল তাদের এত গালমন্দ ও টিট্‌কারী আমাকে মোটেই বিচলিত করছে না, তাদের অবিশ্রান্ত ঢিল ছোঁড়ার দিকেও আমার ভ্রূক্ষেপ নেই তখন স্বভাবতই তাদের উৎসাহ ক্রমেই কমে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রায় আধ ঘণ্টা পরে শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে অশান্ত বালকের দল রণে ভঙ্গ দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এতক্ষণ বালকদের উৎপীড়নে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম—এমন কি নিদারুণ জল পিপাসার কথাও মনে ছিল না। এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা আমাকে অস্থির করে তুললো। ক্ষুধার জ্বালা তবু খানিকটা সহ্য করা যায় কিন্তু তৃষ্ণায় আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। চলার পথে যখনই কোথাও ঘোলা জল বা পচা লতাপাতার নিচে সামান্যতম জলও দেখতে পেয়েছি তখনই তা দিয়েই তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছি। অনেকের হয়ত মনে হবে—এসব কেবল লেখার জন্যই লেখা—কল্পনা-বিলাস মাত্র। কিন্তু এসব এত বাস্তব, এত সত্য যে উপন্যাসের রঙীন চিত্রকেও ম্লান করে দেয়।

প্রায় আট বছর পূর্বে একবার আমি আমার মামাদের সঙ্গে আগরতলার পাহাড়ে শিকারে যাই। প্রখর রৌদ্রে পাহাড়ের দুর্গম পথ হাঁটা যে কি কষ্টসাধ্য তা' যার অভিজ্ঞতা আছে সে ছাড়া অন্য কেউই বুঝবে না। সেদিনও আমরা জলের অভাবে এমনই ছট্‌ফট্ করেছি। সঙ্গে water carrier (বহন করার উপযোগী জলপাত্র) নিয়েছি-

নাম বটে কিন্তু একটি মাত্র water carrier সকলের তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। মামারা জানতেন দুর্গম পাহাড়ের কোন এলাকায় কুকীদের বাস। অনেক কুকী পরিবারের সঙ্গে মামাদের পরিচয়ও ছিল। কুকী সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়িতে দেখেছি তারা জমির নিচে বড় বড় জলভর্তি মাটির জালা পুঁতে রাখে জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য। তাদের বাড়িতে জল খেয়েছি ও আমাদের সঙ্গের শূন্য জলপাত্রটি পূর্ণ করে নিয়েছি। কিন্তু এইরূপ একটি কুকী বাড়ি থেকে অন্য একটি কুকী পরিবারের বাড়ি পৌঁছবার মাঝের পথটুকু হাঁটাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আজও আমার মনে আছে সেই সময় মামা আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দেশের ভাষায় বলেছিলেন—"হেরে, তুই হেতেই জম্যা গেছছ? হে আর তুই দেখছচ্ কি? জলের লাগ্যা হেমন হেমন সময় গেছে যহন্ বুকের ছাতি ফাট্যা গেছে। এক ফোঁটা জলের লাগ্যা হাতীর লাদা চিম্পা জল করা খাইছি।"—(মামা বললেন, এমনও মাঝে মাঝে হয়েছে যে হাতীর বিষ্ঠা নিংড়ে নিয়ে খেয়ে ওঁরা পিপাসা নিবারণ করেছেন)। তখন কথাটা শুনে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের ২৬শে এপ্রিল বিলোনিয়ার পথে আমার যা অবস্থা হল তাতে আমার সেদিনকার কথা অতি সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল।

সেদিন এক ফোঁটা জলের জন্য আমি অনায়াসে সে রকম সব কিছুই করতে পারতাম। চোখের সামনে জল বা খাওয়ার ব্যবস্থার কোন উপায় আছে বলে মনে হচ্ছিল না। এমন সময় প্রায় ছয়-সাতশ' গজ দূরে একটি বড় পাকাবাড়ি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাড়িটির মস্ত কম্পাউণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির গেট দিয়ে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে ফেণী-বিলোনিয়ার বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। বেরোবার মুখে বাড়ির এই রাস্তার ডান পাশে একটা বড় দীঘি, তার বাঁধানো পাকা ঘাট। কম্পাউণ্ডের মধ্যে সাজানো-গোছানো সুন্দর একটি মন্দির। মন্দিরটি খুব বড় না হলেও চোখে পড়বার মত মাঝারি ধরণের তো বটেই। এখন মনে পড়ছে বোধ হয় পাশাপাশি দুটি মন্দির ছিল। মন্দিরের অস্তিত্ব, বাড়ির কর্তা ও তাঁর প্রভাবে অন্যান্যদের মানসিক গড়ন ও চরিত্র কিরূপ হতে পারে সেইরূপ প্রাথমিক গবেষণা করায় সাহায্য করেছিল।

ঐ বাড়িতে একটি বা দুটি মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে আজ বিশেষ করে উল্লেখ করার মধ্যে আমার অন্য একটি উদ্দেশ্য আছে। এই লেখাটি যদি সে বাড়ির সেই ধর্মময়ী বালিকাটি কোনদিন পড়েন তবে যেন তাঁর বুঝতে ভুল না হয় যে ক্ষণিকের 'তুচ্ছ' সেই ঘটনার নায়ক ছিলাম আমি। তাঁর অবশ্য সেই সামান্য ঘটনাটি মনে না থাকা খুবই স্বাভাবিক।—এইরূপ তুচ্ছ ঘটনা তাঁর জীবনে হয়ত বহু ঘটেছে। কিন্তু এই বাড়ির পটভূমিতে ক্ষণিকের সেই স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায় নি। আজ ছত্রিশ বছর পরেও লিখতে বসে সেই স্মৃতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

আমি যদি সেইদিন সেই সময়ে একটি নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে না থাকতাম তবে হয়ত সেই সামান্য ঘটনা আমারও সামান্য বলেই মনে হোত। প্রায় বারো ঘণ্টা আগে ফেণীতে পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে এসেছি। নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, বন্ধুদের কোনও খবর নেই—মন খুবই খারাপ। আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পাগলের অভিনয় করে চলেছি, অশান্ত, অসংযত বালকদের কৌতুকের বিষয় হয়েছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে এক বিন্দু জলের জন্য চাতকের মত ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি কোথাও জলের সন্ধান পাই। এমন একটি শোচনীয় অবস্থায়, জীবনের এইরূপ সন্ধিক্ষণে—ওই বাড়ি, ওই জলাশয় আমাকে আকর্ষণ করল।

দীঘিতে নেমে প্রচুর জল খেলাম। তারপর খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। দুপুর প্রায় দুটো হবে। এত বড় বাড়ি হলে কি হবে লোকজন কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার যে একা একজন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন, যার সঙ্গে কথা বলতে পারি। তারপর তাকে দিয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাব, এই ছিল ইচ্ছে। কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লাম। তখনও কাউকে দেখতে পেলাম না। একটু দূরে দু'-একজন বালক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই খেলা করছিল। আমাকে দেখে যেন তারা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উদ্ভ্রান্ত অর্ধ-উলঙ্গ বেশ কার না কৌতূহল জাগাবে? ছেলেরা আমাকে দেখেই তাদের সমবয়সীদের ডেকে ডেকে কি যেন বলল। দেখতে দেখতে কোথা থেকে প্রায় সমবয়সী পনেরো-ষোলজন বালক ছুটে এল। আমার তো তাদের দেখেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! আবার সেই বালকের দল! ছুটে পালাবার উপায় নেই। পনেরো-বিশ হাত ব্যবধানে আমার সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। দলে তারা ক্রমশই বাড়ছে। তাদের মধ্যে আমাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল। কেউ কেউ ভয় দেখাচ্ছিল এবং চোখমুখ রাঙিয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছিল। তবু বলতে হবে এরা অনেক শান্ত, অনেক ভদ্র—তখনও ঢিল ছুঁড়তে সুরু করে নি।

তাদের সহানুভূতি লাভের আশায় আমি অভিনয় করে এবং হাত মুখের ভঙ্গিতে পেটের অবস্থা ইসারায় জানিয়ে আমাকে কিছু খেতে দেবার জন্য নির্বাক আবেদন জানালাম। তখনও আমি কালা ও বোবা—মুখে কিছু বলতে পারছি না, কানেও কিছু শুনছি না। ইসারা ও ইঙ্গিতে কথা বলি এবং বুঝি।

ব্যথাতুর দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। দাঁড়াতে পারছি না এই রকম ভান করে আগেই বসে পড়েছিলাম, এখন যেন আর বসারও ক্ষমতা নেই। আধ-শোয়া অবস্থায় শরীরটা উঠোনের ওপর এলিয়ে দিলাম। আশ্চর্য! আমার কোন অভিনয়ই তাদের মন স্পর্শ করল না। বালকের দল ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে—আমার সব কিছুই তারা বাড়াবাড়ি বলে মনে করছে। আমার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করাটা তারা অনধিকারচর্চা ভেবেছে। তারপর আবার বসে পড়া এবং আস্তে আস্তে সেখানেই শোয়া ছেলেরা একেবারেই পছন্দ করছিল না। সকলেই উত্তেজিত—তাদের অতগুলি ছোট ছোট হাত একসঙ্গে কিল, ঘুষি বাগিয়ে উঠল—যদি বেরিয়ে না যাই আমাকে যেন মেরে খুন করবে! অবশ্য গায়ের কাছে আসতে তারা কেউই সাহস পাচ্ছিল না—যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে বা এক পা দু'পা এগিয়ে-পিছিয়ে পায়তারা কষছে এবং মুখে 'বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা' বলছে। খুব ভাগ্য বলতে হবে

নইলে তার হয়ত মায়া কোনদিনই ছিল না। আমাদের মায়া আছে, তবে আমরা বয়স্ক কেউ হঠাৎ এসে পড়তো তাহলে যা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সেখানে আমার মুখ ফুটে কিছু বলা হোত না—বোবা সেজেই থাকতে হোত। যা হোক্, সে কথা ভেবে আর কি লাভ? আর কোন উপায় নেই দেখে সেই স্থান পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলাম। যেমনি উঠতে যাচ্ছি কানে এল—"কেন ওকে বিরক্ত করছিস? তোদের একটুও দয়া হয় না?"—একটি বালিকার কণ্ঠে ধমকের সুর! মেয়েটি বোধ হয় ভিড়ের মধ্যে পেছনের দিকে ছিল, তাই তাকে এতক্ষণ দেখতে পাই নি। নানারূপ ভান ও অভিনয় করার দরুণ আমার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত ও অর্থহীন করে রাখতে হয়েছিল—যেন কিছুই দেখছি না বা বুঝতে পারছি না। এই জন্যই ওই বালকদের দলে আরও কোন বালিকা ছিল কি-না এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি।

ছোট্ট মেয়ের কচিকণ্ঠে যখন অকস্মাৎ ধ্বনিত হল, 'কেন ওকে বিরক্ত করছিস্—তোদের একটুও দয়া হয় না'—আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হলাম। কে, কে এই বালিকা? এইটুকু দয়া, এই সামান্য সহানুভূতিটুকুর জন্য আমার প্রাণ বারো ঘণ্টা ধরে, সহস্র দুর্বিপাকের মধ্যেও, আকুল অপেক্ষায় ছিল। কোথাও কোন ভরসা পাই নি, কারো কাছে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না, লোক দেখলেই আগে-ভাগে সরে গেছি, কারো কাছে বলতে গিয়েও বলা হয় নি—সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, বালকদের কাছ থেকে তাড়া খেয়েছি—ওরা মনের সাধে কটুকথা বলেছে, ঢিল ছুঁড়েছে। তারপর বড় বাড়ি ও মন্দির দেখে খুব আশা নিয়ে এগিয়েছি যদি একটু আশ্রয় পাওয়া যায়! কিন্তু মাঝ-মুখো ছেলেদের উত্তেজনা ও তাদের কিল ঘুঁসির মহড়া দেখে যখন এইসব অর্বাচীনদের প্রতি শত অভিযোগ বুকে চেপে অভিমানভরে চলে যাচ্ছি তখন সেই করুণ-মাখা কণ্ঠস্বর আমাকে চমকিত—বিচলিত করল! কে এই সহানুভূতিশীলা বালিকা? কে এই বালিকা, যার হৃদয় আমার দুস্থ অসহায় অবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছে? আমার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে উঠল—সেই বালকের ভিড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম কে সেই বালিকা?

একটু মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম—একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়স নয়-দশ বছর হবে—ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। সে দু' হাত তুলে খুব সহানুভূতির সঙ্গে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বলল। তারপর বালক-সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বলে উঠল—"তোরা ওকে বিরক্ত করবি না, ওর খিদে পেয়েছে, আমি ওর জন্য ভাত নিয়ে আসি।" এই বলে মেয়েটি দ্রুতগতিতে বাড়ির ভেতর ছুটে চলে গেল।

ব্যাপারটা এক মধুর স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছিল। সুশ্রী, সুন্দর অপরূপ সেই করুণা-ময়ী মূর্তি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, মুখ চোখ যেন তুলিতে আঁকা। সাধারণভাবে অতি সাধারণ একটা শাড়ি পরা—কোথাও কোন বাহুল্য নেই। করুণাঘন দৃষ্টি—বেদনা, দয়া ও সহানুভূতির সে যেন এক জীবন্ত প্রতিমা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ফিরে এল। কলাপাতায় সাজানো ভাত দু' হাতে ধরে নিয়ে এসেছে। অতিথি সেবার উপচার ছোট ছোট কচি দুটি হাতের অপূর্ব শোভাবর্ধন করেছে। মেয়েটির গতি ক্রমেই মন্থর হল। সে ইতস্তত করছিল—মনে হল কাছে আসতে সে ভয় পাচ্ছে। প্রায় হাত পনেরো দূরে কলাপাতায় সাজানো ভাত মাটিতে রেখে দিল। তারপর ইসারায় কলা-পাতায় সাজানো ভাতটা তুলে নিয়ে দীঘির পাড়ে বসে খেতে বলল আমাকে। নানা ইঙ্গিতে বারে বারে সে বোঝাতে চাইল আমি যেন ভাতগুলি নিয়ে কম্পাউন্ডের বাইরে দীঘির পাড়ে যাই। অন্যান্য বালকেরাও একইভাবে ভাত নিয়ে বাইরে খাওয়ার কথা আমাকে বোঝাতে চাইল। মেয়েটির ধমক খাওয়ার পর থেকেই ছেলের দল বেশ সংযত হয়ে গিয়েছিল।

যে মেয়ের এতখানি দরদ, এত সহানুভূতি—যে মুহূর্তে আমার জন্য ভাত, ডাল, তরকারী সাজিয়ে নিয়ে এল, সে নিশ্চয়ই এই বড় বাড়ির কেউ হবে। হয়ত সে কোন সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, তবু কোন গর্ব ভাব নেই। বেশ-ভূষায় বা শান্ত-সংযত চলাফেরায় লেশমাত্র সম্পদের বা আভিজাত্যের দম্ভ তাকে স্পর্শ করে নি। তাই সে আরও সুন্দর—বাইরের চাকচিক্য বা বেশ-ভূষায় নয় অন্তরের সম্পদে ঐশ্বর্য-শালী ভারতের এক অসামান্যা কন্যা সে!

যে মেয়ের এত দরদ—যে নিজ হাতে আমার জন্য আহার্য এনেছে, সেই আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে বাইরে বসে খেতে? কিন্তু তার এই আদেশে কঠোরতা ছিল না, ছিল অনুনয়। আমার অন্তরের শ্রদ্ধা এই বালিকা আকর্ষণ করেছে। আমি তার কথা মতই ভাত-তরকারী নিয়ে কম্পাউন্ডের বাইরে দীঘির পাড়ে গিয়ে বসলাম। ভাত নিয়ে এই পর্যন্ত আসা অবধি অর্ধ-পাগলের যা যা ভান করা উচিত সেইমত অভিনয় করতে চেষ্টা করেছি। বালকের দল এই 'পাগলটিকে' নিয়ে খুব কৌতুক উপভোগ করেছে। তারা সবাই আমার পেছন পেছন দীঘির পাড় অবধি এল। আমাকে নিয়ে তাদের আমোদ উপভোগের পালা এখনও শেষ হয় নি—আমার খাওয়া তাদের দেখতে হবে।

আহার্য হাতে তুলে নেওয়ার পর আর তর সইছিল না। অনাহারক্লিষ্ট পাকস্থলীর সমস্ত মাংসপেশী এক সঙ্গে যেন বিদ্রোহ করে উঠল। তাদের এক্ষুণি শান্ত করতে হবে। ভাত ডাল তরকারী ছিল আর মাঝারি আকারের চিংড়ি মাছ একটি। পোলাও মাংস জীবনে অনেক খেয়েছি, কিন্তু সেদিনের এই খাবার পোলাও মাংসের চেয়ে যে শত সহস্র গুণ বেশি উপাদেয় মনে হচ্ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

খাওয়ার ভঙ্গিটা ইচ্ছে করেই পাগলের মত করেছি—কখনো দু' হাতে খাচ্ছি আবার কখনও বা কোন্‌টা খাবো যেন বুঝতে পারছি না বলে ভান করে চলেছি। সবটাই বালকদের কাছে আমোদের বিষয়। হাসি আর হাসি। হাসতে হাসতে তারা একেবারেই লুটোপুটি।

এই আনন্দমুখর বালকদের দলে আগাগোড়াই সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা বালিকাটি উপস্থিত ছিল। বালকদের এই কৌতুক উৎসবে মেয়েটির শান্তভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়ে নি। কি-ই বা তার বয়স—তবু ও যে একটি মেয়ে—মায়ের জাত! এই বয়সেই দরদ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, পরের দুঃখ ব্যথা উপলব্ধি করার শক্তি তার হয়েছে। আমি যতক্ষণ পাগলামীর ভান করে সেখানে খাচ্ছিলাম, ততক্ষণ আমার দৃষ্টি অন্যের অগোচরে মেয়েটির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। আমি তার প্রতিটি আচরণ নিরীক্ষণ করছিলাম। সুলক্ষণা, অসামান্যা এই মেয়েটিকে ঋষি বঙ্কিমের কল্পনাসৃষ্ট ভবানী পাঠক যদি একবার দেখতে পেতেন তবে কি তিনি এই বালিকাটিকেও দেবী চৌধুরাণীর আসনে বসবার উপযোগী করে তুলবার শিক্ষা দিতেন না?

আমার খাওয়া শেষ হ'ল। নাটকের এই অঙ্কের শেষে যবনিকা টেনে আমায় উঠতে হ'ল। ক্ষণিকের অতিথি আমি, উদ্দেশ্য আমার সামান্য। ক্ষুধার জ্বালা মেটাবার জন্য চেয়েছিলাম আহার্য। আহার্য পেয়েছি—পেট ভরে খেয়েছি, তবু যাবার সময় আমার মনের ওপর এই প্রতিক্রিয়া কেন? বালিকাটির প্রতি আমার যেন কেমন মায়া জন্মেছে।

আনন্দমঠে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলছে —"'আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমরা জানি জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' মহেন্দ্র অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—'তোমাদের মায়া নেই?' তখন ভবানন্দ বলিলেন—'যে বলে মায়া নেই সে হয় মিথ্যা ভান করে

তবুও মিছিল চলে

মনোরমা সিংহরায়

কুয়াশা, কখন তুমি সরে যাও।
দেখি দূরে ভোরের আকাশে নতুন দিগন্ত তার
খোলা মুখ নিয়ে
সহাস্যে দাঁড়িয়ে॥
হে আকাশ উন্মুক্ত আকাশ,
তোমার আলোর ধারা স্পর্শ করে
বিষাক্ত বাতাস
নির্মল উদার হয়ে যাক্;
উড়ুক না ধুলো পথগুলি প্রস্তরে কাঁকরে
ভরা থাক্।
পেরিয়ে পেরিয়ে যাবো তাও
কুয়াশা, এখন তবে সরে যাও॥

* * *

কুয়াশা কখন যেন সরে গেলো।
দেখছ নতুন সূর্য কেমন উঠেছে আজ
আলোতে আলোতে তাই সব দিক
আলো হ'য়ে গেলো।

* * *

তবুও মিছিল চলে প্রাণধারা উদ্বেলিত হয়
আনে নি কি কোনো জয় এই দিন হয়ে জ্যোতির্ময়॥

যে তখনও পর্যন্ত কোন বয়স্ক লোকের দেখা পাই নি। বালকদের ভিড়ে 'যদি মায়া কাটাই'।" আমায়ও মায়া কাটাতে হবে। মায়ার বন্ধন আমদের বেঁধে রাখতে পারে নি। বালিকাটির মধুর ব্যবহার ও সহানুভূতি আমাকে আকর্ষণ করেছে। জীবনে এর পূর্বে আর কখনও কোন ছোট ছেলে বা মেয়ে কি আমার হৃদয় এতখানি জয় করতে পেরেছে? এই বালিকাটিও হয়ত আমার অন্তর স্পর্শ করতে পারত না। সেই সময়—সেই অসহায় অবস্থায়, যখন একটু করুণা, একটুখানি দয়া ও সামান্য সহানুভূতির জন্য আমার প্রাণ উন্মুখ হয়ে ছিল, তখন এই বালিকার হৃদয়ের প্রসারতা, মানুষের প্রতি দয়া আমাকে অভিভূত করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই অনামী অখ্যাত সামান্য ছোট্ট মেয়েটির স্থান থাকবে কি?

এখন আমায় যেতে হবে। যাওয়ার আগে সেই মেয়েটির কাছে বিদায় নেবার ইচ্ছে ছিল। এমন কি যদি সম্ভব হোত আমার পরিচয়টুকু দিতে পারলে ভাল লাগতো। কিন্তু কিছুই না বলে চলে আসতে হ'ল। না বলে চলে আসার বেদনা মনে মনে অনুভব করছিলাম। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। বালকের দল দীঘির পাড় ধরে কিছুটা পথ আমাকে অনুসরণ করে থেকে গেল। আমি শেষ-বারের মত ফিরে তাকালাম। মেয়েটি তখনও বালকদের সঙ্গে ছিল। আমি মেয়েটির ক্ষণিক আতিথ্যের এই স্মৃতিটুকু নিয়ে বিদায় নিলাম।

সামান্য ঘটনার এই নগণ্য স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে আজও তলিয়ে যায় নি। অন্যের কাছে এই ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ঘটনা যতই নগণ্য হোক্ না কেন আমার কাছে এই ছোট্ট মেয়েটির ছোট্ট করুণার স্পর্শটি অতীত স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে আছে। পাঁচ বছর পূর্বে যখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ইংরেজী দৈনিকে প্রতি সপ্তাহে লিখছিলাম তখনও এই ঘটনার সামান্য উল্লেখ করেছি। তখনও আমার ইচ্ছে ছিল যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কোন সময়ে সেই সময়ের সেই বালিকাটি (আজ যার বয়স পঁয়তাল্লিশ বা ছেচল্লিশের বেশি হবে না) যদি একবার লেখাটি পড়েন তবে আমার খুব ভাল লাগবে। আরও ভাল লাগবে যদি আজকের এই বাংলা লেখাটি কোন সময়ে কোন কারণে একবার পড়ে তিনি ছত্রিশ বছর আগেকার সেই দিনের সেই সামান্য ঘটনাটি মনে করতে পারেন।

জানি না আজ তিনি কোথায়। ফেণী-বিলোনিয়ার বড় রাস্তার কোন এক জায়গায় তাঁদের বাড়ি। বাড়িতে মন্দির আছে। কম্পাউন্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে ডান পাশে বড় পুকুর বা দীঘি—দীঘিতে পাকা ঘাট। দুপুর বেলায় একজন অর্ধ-পাগল প্রায় নগ্ন অবস্থায় ক্ষুধার তাড়নায়, আহারের আশায় এই বাড়িতে গিয়েছিল। একটি নয়-দশ বছরের বালিকা অশান্ত ছেলেদের উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচান 'পাগলটিকে।' মেয়েটি পাগলটিকে সযত্নে খাবার এনে দিল। ভারতের স্নেহময়ী নারীর প্রতিমূর্তি সেই শ্রদ্ধেয়া বালিকাটির প্রতি আমার আবেদন, যদি কোনদিন আমার এই লেখাটি পড়ে এই সামান্য ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে জাগে তবে কোন আপত্তি না থাকলে একটি চিঠি দিলে খুশি হবো। ঠিকানা এই পত্রিকা অফিসেই পাওয়া যাবে। সকলকে জানাবার অভিপ্রায়েই যদিও আমার এই ঘটনাটি লেখা, তবু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অনু-প্রাণিত হয়েছি লেখবার জন্য—যদি লেখাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে! তাঁর পাকিস্তানে থাকার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ, তাঁদের বাড়িটি পূর্ব-পাকিস্তান এলাকায় পড়েছে। কাজেই আশা খুবই কম যে আমার এই লেখাটি তাঁর হাতে কোনদিন গিয়ে পৌঁছবে।

আজ আমার বয়স চৌষট্টি। আমার অবর্তমানে পুরনো কাগজের গাদা থেকে উদ্ধার পেয়ে এই লেখাটি যদি কোন একদিন তাঁর হাতে গিয়ে-পড়ে, সেই ভেবে আজ আমার ভাল লাগছে। সেদিন তিনি বুঝবেন বাংলার অগ্নিযুগের সৈনিকেরা কেবল যে ইংরেজের বিরুদ্ধেই রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল আর তাদের দয়া মায়া, স্নেহ মমতা প্রভৃতি কিছুই ছিল না তা' নয়। তাদেরও অন্তরে স্নেহ মমতা, আবেগ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনুভূতি কারো চেয়ে কম ছিল না।

এই মধুর স্মৃতি আমার জীবনের একটি অপূর্ব সঞ্চয়! এই স্মৃতি ভোলা যায় না—আমি ভুলতে পারি নি। সেদিনের হে অনামী, অখ্যাতা, সামান্য বালিকা! তোমার মমতাপূর্ণ দরদী হৃদয়ের প্রতি সেই দিন আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আর আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরেও আমার সেই শ্রদ্ধা অটুট আছে। যদি কোনদিন এই সামান্য ঘটনা তোমার মনে পড়ে তবে জানবে উন্মাদ বেশে যে ক্ষণিকের অতিথি সেদিন তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল সে আর কেউ নয়—ভারতের মুক্ত-যুদ্ধের একজন সৈনিক আমি—অনন্ত সিংহ।

[ক্রমশঃ]

রবীন্দ্ররচনাবলী মুদ্রণ

দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয় দাস

অলডাস হাক্সলী তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন :

Good printing cannot make a bad book good, nor bad printing ruin a good book, but good printing can create a valuable spiritual state in the reader.

কথাগুলি ভেবে দেখবার মত। কারণ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা তা পাঠ করি, তার প্রথম পরিচয় আমরা পাই একটি গ্রন্থের বাইরের আকৃতি থেকে। তাই যে কোন গ্রন্থকেই মুদ্রণের সময় উপযুক্তভাবে সাজিয়ে নিয়ে তাকে মুদ্রণ না করলে তার সাহিত্যিক মান হ্রাস না পেলেও তার বাইরের রূপটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আর এই অসুন্দর বহিরাবরণ পাঠকের রসপিপাসু মনে একটা বাধার সৃষ্টি করে, তার সৌন্দর্য আহরণের প্রয়াস তাতে হয় ব্যাহত।

এই দিক থেকে রবীন্দ্র সাহিত্য মুদ্রণের বিষয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্যের মুদ্রকদের উন্নততর শিল্পপ্রথাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার পর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের নিজস্ব মানের সঙ্গে তার মুদ্রণের মানের একটা অবাঞ্ছিত ব্যবধান সর্বদাই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। অথচ একথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের লেখা যে কোন জিনিসেরই আবেদন পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে চিরদিনই থাকবে। তাই মুদ্রণ এবং অক্ষরবিন্যাসের দিক থেকে তার বাইরের রূপটি হওয়া উচিত নিখুঁত। বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্পে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতের মুদ্রণ এবং প্রকাশনার অগ্রগতির দ্বার খুলে দেবে।

সৌরজগতের প্রথম কথাই যেমন সূর্য, বাংলা সাহিত্যের তেমনি রবীন্দ্রনাথ। কবি একবার বলেছিলেন যে, ক্ষুধাতুরের দেশে বকুল ফুটে উঠে তার যোগ্য সমাদর পায় না। তবু সেখানে ফুটে ওঠাও বকুলের অপরাধ নয় এবং সে ফুটেই ওঠে। কবির বর্চনাসম্ভার আমাদের দেশের অনুন্নত মুদ্রণশিল্পের মাধ্যমে কিছুটা তাঁরই বর্ণিত ওই উপেক্ষিত বকুলের মত ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্যে মুদ্রণের মান উন্নত তাই সেখানে পাঠক এবং প্রকাশকের দৃষ্টি এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। এ ছাড়া এ শতকের সেরা লেখকেরাও এদিকে দৃষ্টি দিতে ভুলে যান নি। তাঁরা জানেন যে, তাঁদের লেখার মুদ্রিত রূপটি—should be an obligation, and a gardstick by which the great mass of day to day publishing can be measured—. মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের রীতিনীতিগুলিকে আদর্শ হিসাবে মেনে নিলেও সেই আদর্শের অনুসরণে খুব বেশি এগিয়ে যেতে আমরা আজও পারি নি। যে সব রীতিনীতি পাশ্চাত্যে পুরনো বলে ত্যাগ করা হয়েছে আমরা সেগুলির মায়া আজও কাটিয়ে উঠতে পারছি না। ফলে রবীন্দ্র রচনাবলীর মত অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টিকে যেমন করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া উচিত তা এ অবধি সম্ভব হয় নি আমাদের দেশে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি তাঁর অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, গান, কাব্য-নাট্য, গীতি-নাট্য প্রভৃতি রচনায়। এই সব রচনা বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে নানা আকার ও আয়তনের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে এইগুলি রবন্দ্র-রচনাবলী নামে একত্রিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব প্রকাশনায় এমন অনেক ভুলত্রুটি চোখে পড়ে যা মুদ্রকের সাধারণ প্রমাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে পাঠককে রীতিমত পীড়া দিয়ে থাকে।

টাইপোগ্রাফী বা অক্ষরবিন্যাসের দিক থেকে বিচার করতে গেলে গোড়াতেই "টাইপ সেটিং" বা হরফ সাজানোর কথা এসে পড়ে। ছাপার হরফ পর পর সাজাবার সময় প্রতি শব্দের পর যে পরিমাণ 'স্পেশ' বা সাদা জায়গা ছেড়ে একটি শব্দকে অপর শব্দের থেকে আলাদা করে রাখতে হয় কোন একটি বিশেষ লাইনে তা সর্বত্র সমান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অথচ রবীন্দ্ররচনাবলীর যে কোন পৃষ্ঠা খুললেই এই নিয়মের বহু-ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যাবে। ফলে এই পৃষ্ঠাগুলিতে মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত অংশগুলির মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখতে পাওয়া যায় এবং ত্রুটিপূর্ণ স্পেশিং পাঠকের মনকে কিছুটা বিক্ষিপ্ত করে তোলে।

গদ্য মুদ্রণের সময় অনুচ্ছেদ সাজাবার একটি রীতি আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, অনুচ্ছেদের শেষ লাইনটি ছোট হলেও তাতে একাধিক শব্দ থাকা উচিত। এতে মুদ্রণের সৌন্দর্য বজায় থাকে। আর এইভাবে সৌন্দর্য বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন অনুসারে একটি ছোট লাইনের পূর্ববর্তী লাইন থেকে দু-তিনটি শব্দ নামিয়ে এনে একটি শব্দবিশিষ্ট দুর্বল লাইন মুদ্রণ বন্ধ করা যেতে পারে। বাংলাভাষা মুদ্রণের সময় দুটি বাক্যের মধ্যস্থিত স্পেশ দুটি শব্দের মধ্যস্থিত স্পেশ-এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রাখার রেওয়াজ আজও প্রচলিত আছে। এর ফলে একটি মুদ্রিত পৃষ্ঠার নিজস্ব সুসংবদ্ধ রূপটি অত্যন্ত ব্যাহত হয়। প্রাচীন প্রথায় উদ্ধৃতি চিহ্নের যুগ্ম ব্যবহার পাশ্চাত্যের কোন ভাষায় আজ আর প্রচলিত নেই। অথচ আমরা আজও অকারণে দুটি করে উদ্ধৃতি চিহ্ন সর্বত্রই ব্যবহার করে চলেছি।

পৃষ্ঠার ক্রমিকসংখ্যা বসানোর ব্যাপারেও আমরা পুরনো রীতিটিকে বাদ দিতে পারি নি। পৃথিবীর সেরা মুদ্রক-দের মতে পৃষ্ঠার ক্রমিকসংখ্যা তার নিচের অংশে বসানোই ভাল উপরের দিকে শিরোনামা এবং অন্যান্য পৃষ্ঠা বিবরণ সাজানো যেতে পারে। এ নিয়মের ব্যতিক্রমে পাঠকের কিছুটা অসুবিধাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্য-গ্রন্থে কবিতাগুলির পৃথকভাবে নাম দেওয়া নেই। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, নৈবেদ্য, স্মরণ এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে কবিতাগুলির নামের পরিবর্তে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে। মুদ্রিত পৃষ্ঠার উপরের অংশে পৃষ্ঠার সংখ্যা এবং কবিতার ক্রমিক সংখ্যা দুই-ই মুদ্রিত থাকলে একটা গোলমালের সম্ভাবনা থাকে। রবীন্দ্ররচনাবলীর মুদ্রিত লাইনগুলির মধ্যবর্তী সাদা অংশের পরিমাণেও একটা আতিশয্যের ভাব দেখা যায়। অবশ্য জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে এই দোষ নেই।

সুচারু মুদ্রণের জন্য মুদ্রক মাত্রেরই

উচিত ঠিকভাবে প্রাথমিক পরিকল্পনা করা। এদেশের মুদ্রক এবং প্রকাশকেরা অনেক সময়ই এই কাজটিকে বাহুল্য বলে মনে করেন। হয়ত সময় এবং অর্থব্যয় বন্ধ করতে গিয়েই এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটিকে তাঁরা বাদ দিয়ে দেন। ফলে এদেশে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি একেবারেই সুন্দর হয়ে ওঠে না। আধুনিক বাংলার অধিকাংশ কবির কাব্যই পাঠক-সাধারণের কাছে রীতিমত দুর্বোধ্য ঠেকে এবং সম্ভবত বিগত যুগের কাব্যের মত সমাদর লাভ করতে এঁদের লেখা অদূর ভবিষ্যতে পারবে বলে মনে হয় না। মনে হয় তাঁদের রচনাগুলিও মুদ্রণের মাধ্যমে আরো বেশি করে পাঠযোগ্য করে তুলতে পারলে যুগোপযোগী প্রতিভাকেও উপযুক্তভাবে আহ্বান করা যেত। তবে সেই শিল্প-কর্মেরও সুরু অতীতের সামগ্রীকে নতুন রঙে ও রসে ভূষিত করে নবীনের শিল্প-চেতনাকে অধিকতর সজাগ করে তুলে। আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথের রচনার সুচারু মুদ্রণের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে।

কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণের কতকগুলি অপরিহার্য দিক আছে। একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার সময় একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, একটি কবিতার সমাপ্তির পর অপর একটি কবিতা শুরু করার আগে এই সমাপ্তি এবং সূচনার মাঝখানে একটা চোখে পড়ার মত ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্র কাব্যের মুদ্রকেরা অনেক ক্ষেত্রেই যে শুধু এদিকে দৃষ্টি দেন নি তাই নয়, এমনই একটি কবিতার একই স্তবকের কিছু অংশ এক পৃষ্ঠায় এবং বাকিটুকু অন্য পৃষ্ঠায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন। কাব্যের ভাব উপলব্ধি করবার সময় এই প্রকার পাঠ্যবস্তু বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে একজন বিখ্যাত ইংরাজ টাইপোগ্রাফার বলেছেন :

Printing verse means noting down word-music; reading if it means restoring that word music to its proper audibility or sound values. The printer's task is like the music printer's : that of making it as easy as possible to 'sight-see' what is on the page.

ইংরাজি কবিতা মুদ্রণের সময় প্রতিটি কবিতার প্রারম্ভিক অক্ষরটিকে কবিতা-সংকলনে ব্যবহৃত অন্যান্য হরফের চেয়ে বড় আকারে বেছে নিয়ে তার সূচনার কাজটুকু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

সকল প্রকার কাব্যের পাঠককেই Deliberate reader বলা চলতে পারে। এই শ্রেণীর পাঠকেরা মুদ্রণবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলেও এঁদের দৃষ্টি ছাপা পৃষ্ঠার উপর অত্যন্ত সজাগভাবে নিবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং অক্ষরবিন্যাসের দিক থেকে কবিতাগুলি খুবই সুন্দর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতেও ছোট বড় নানাপ্রকারের দোষত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। নাটক মুদ্রণের একটি নিজস্ব ধারা আছে। কেবলমাত্র নাটকের বাইরের আকৃতিটি সুন্দর করে তুললেই মুদ্রকের কাজ ফুরিয়ে যায় না। কারণ সে সৌন্দর্য এমন হওয়া প্রয়োজন যার ফলে নাট্যকারের যা কিছু বক্তব্য তা সহজেই পাঠকের মনের দরজায় পৌঁছে যায়। মুদ্রণের কাজ সুরু করার আগে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। কথাগুলি মূলত নাটকের পাঠকগোষ্ঠীর সম্পর্কে। উপন্যাস অথবা ছোট গল্পের তুলনায় নাটকের পাঠক-সংখ্যা অনেক কম। যাঁরা নাটক পড়ে থাকেন তাঁদের নাটক সম্পর্কে একটা অর্জিত রুচির জন্য তাঁরা নাটক পড়েন। তা ছাড়া ছোট গল্প বা উপন্যাসের মত দ্রুতগতিতে নাটক পড়া যায় না। নাটকের পাঠক যা মঞ্চস্থ হতে দেখছেন না তারই একটা রূপ মুদ্রিত পৃষ্ঠার মাধ্যমে নিজের মনে গড়ে নেন। Deliberate reading সম্পর্কে আগেই যে কথা বলা হয়েছে তারপর একথা বললেই চলে যে Deliberate reader-দের জন্য অক্ষর-বিন্যাস সামগ্রিকভাবে নিখুঁত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের মার্জিন সংরক্ষণের কথা এসে পড়ে। যে গ্রন্থ পথেঘাটে চলবার সময়, ট্রেনে, জাহাজে অথবা অন্যান্য যানবাহনে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় তার আকার যেমন অতিরিক্ত বড় না হওয়াই ভাল তেমনই তার 'ফোর এজ' মার্জিন (যা পড়বার সময় দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ধরা থাকে) উপযুক্ত-ভাবে প্রশস্ত না হলে পড়তে বড়ই অসুবিধা হয়।

ইংরাজি নাটক মুদ্রণের কতকগুলি দিকে বার্নার্ড শ' একজন পথপ্রদর্শক। ইটালিক টাইপের অপপ্রয়োগ তিনিই প্রথম বন্ধ করেন। সংলাপের জোরালো অংশ মুদ্রণের জন্য তিনি যে নিয়ম প্রবর্তন করেন তা পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় মুদ্রণের সময়ই পালন করা যেতে পারে। শ' বলেছেন যে, মানুষ যখন কথা বলে, তখন তার কথার জোরালো অংশগুলি ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্পষ্ট করে অপরের কানে তুলে দেবার চেষ্টাই সে করে। সেই হিসাবে নাটকের সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি কম্পোজ করবার সময় সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির বিভিন্ন অক্ষরের মাঝে স্পেশ বসিয়ে গেলে কথাগুলি ছড়িয়ে গিয়ে যে কোন পাঠকের দৃষ্টিই সহজে আকর্ষণ করবে। একথা সকলেই জানেন যে নাটকের সংলাপ হচ্ছে তার প্রাণ; অভিনয়ের সময় সেই অংশটুকু যাতে সহজে চোখে পড়ে তার জন্য পাত্র-পাত্রীর নাম সংলাপের বাঁ দিকে রেখে প্রতিটি সংলাপ এক একটি অনুচ্ছেদের মতন করে সাজিয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাত্র-পাত্রীর নাম সংলাপের উপরে মাঝামাঝি জায়গায় সাজালে তা অবসরকালীন পাঠের উপযোগী হলেও নাট্য প্রযোজনার সময় বিশেষ বিঘ্নের সঞ্চার করে। জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণে এই ত্রুটি না থাকলেও অন্য আর একটি ত্রুটি বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে। পাত্র-পাত্রীর নাম ও সংলাপের মাঝে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার অতিমাত্রায় এবং অযথা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া নির্দেশনার (Stage

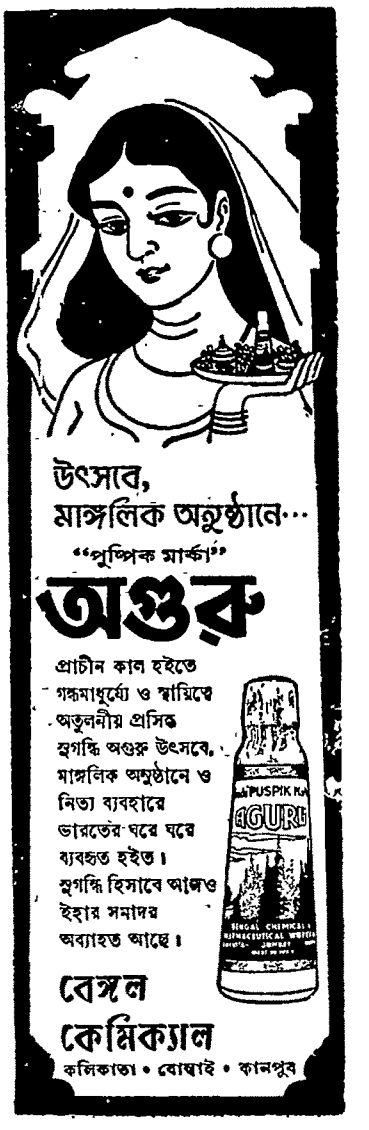

Directions) অংশও অনেক ক্ষেত্রেই সংলাপের জন্য ব্যবহৃত হরফে মুদ্রণ করে নাটকের যথেষ্ট অঙ্গহানি করা হয়েছে। পাত্র-পাত্রীর নাম ও সংলাপ সাজানোর ব্যাপারে আজকের য়ুরোপ এবং আমেরিকায় একটি প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। চরিত্রের নাম ও সংলাপের মাঝে অহেতুক কোলন, ড্যাস বা অন্য কোন প্রকার বিরাম চিহ্ন ব্যবহার না করেই আজকাল মুদ্রণের কাজটুকু সেরে নেওয়া হয়। এছাড়া নামগুলি ডানদিকে রেঞ্জ করে নিলে প্রতিটি চরিত্রের নাম এক জায়গায় এসে শেষ হয়। একইভাবে সংলাপ বাঁ দিকে রেঞ্জ করে নিলে প্রতিটি সংলাপ মার্জিনের থেকে একই রকম দূরত্ব বজায় রেখে মুদ্রণ করে নেওয়া যায়। মুদ্রক মাত্রেরই একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পানীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হলেও স্বচ্ছ পানপাত্রের মধ্যে তার বর্ণ দৃষ্টিগোচর না হলে যেমন সম্পূর্ণভাবে তার স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, তেমনই অসার্থক মুদ্রণের ফলে পাঠ্য বিষয়ের আবেদন বহুল পরিমাণে সীমিত হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য মুদ্রণের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠ্যাংশ মুদ্রণ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থের সামগ্রিক রূপের বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলে তার বাঁধাই কিম্বা নামপত্র মুদ্রণের দিকেও নজর দিতে হবে। কবি নিজেই বলেছেন:

The title page and leather binding are parts of a book.

অথচ একই রকমের হরফ আর একঘেয়ে নক্সা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন এক রূপদান করেছে। বিষয় পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলিকে কত নতুন নতুন রূপই না দেওয়া যেতে পারে। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে এই প্রবন্ধটি শেষ করছি। এই সংকরণের জন্য ব্যবহৃত কাগজ অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যে কারণে এর যে কোন একটি পৃষ্ঠা খুলে তার স্বচ্ছতার জন্য বিপরীত দিকের মুদ্রিত বস্তুটি বিশ্রিভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এছাড়া এইগুলির এক একটি খণ্ডের আয়তন এক এক প্রকার। এমন কি প্রতি খণ্ডের উপর যে বাদামী কাগজের টুকরোটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলির রঙের পার্থক্যও যে কেউই অতি সহজে বুঝতে পারেন। আজকের দিনে ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক প্রত্যেক নাগরিককেই দুটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়—ঘরবাড়ি আর মুদ্রিত জিনিস। তার সমাজের সাংস্কৃতিক মান বিচার করার পক্ষে, দেশে স্থাপত্যরীতি এবং মুদ্রিত জিনিসের চেয়ে বড় প্রামাণ্যসূত্র আর কিছুই নেই। জাতিগত সুরুচি, বিচারবোধ এবং সমকালীন শিল্পকৌশল সম্পর্কিত শিক্ষা এবং যাবতীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর স্থাপত্য এবং মুদ্রণের মাধ্যমে যতটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তেমন আর কিছুতেই নয়। মুদ্রকদের হাতে এই গুরুদায়িত্ব দেবার পর তাঁরা যে তাঁদের কাজটুকু যথাযথভাবে পালন করবেন এটুকু নিশ্চয় তাঁদের কাছে দাবি করা যায়। হয়ত য়ুরোপের মুদ্রণের tradition আমাদের চাইতে অনেক বেশিদিনের। কিন্তু য়ুরোপের অন্তর্গত কোন দেশেরই সাহিত্যিক ঐতিহ্য আমাদের চেয়ে বড় একথা জোর করে বলা যায় না। এই অবস্থায় যা কাম্য তা হল আমাদের সাহিত্যের মানের সঙ্গে আমাদের মুদ্রণের মানের যে অবাঞ্ছিত ব্যবধান রয়েছে তাকে ঘুচিয়ে ফেলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সাহিত্যকে মুদ্রণ করতে হবে তার যোগ্য শিল্পপ্রথার মাধ্যমে।

'ঘেরাও'-এ যোগ দিলে কঠোর শাস্তি হবে—স্বরাষ্ট্র দপ্তর

গ্রামবাংলার কথা

আদিকথার পরের কথা—সে হলো মহানাদের মধ্যকথা। রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে জমিদারতন্ত্র তথা বণিকতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠার কথা। সিংহ বংশের অবসানের পর পোস্তার রাজা নরসিংহ দত্তের পূর্বপুরুষ 'বণিকরাজ' রাজা রাধাকান্তের রাজত্ব ছিল কিছুদিন এখানে। রাজত্ব না বলে জমিদারী ছিল বলাই সংগত। কারণ মুসলমান অধিকারের পর থেকেই মহানাদ বর্ধমান রাজসরকারের অধীনে ছিল। যথাক্রমে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র, চিত্রসেন, তিলকচাঁদ ও তেজচন্দ্র। তেজচন্দ্রের আমলে রাজস্ব বাকী পড়ে ও ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে 'বোর্ড অব রেভিনিউ' নিলাম ডেকে মহাল বিক্রি করে দেন। ক্রয় করেছিলেন তেলিনী-পাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়রাই বেশির ভাগ। বাদ বাকী অংশ ভেঙে-চুরে ছটকে ছিটিয়ে পড়ে অনেক হাতে ছোট-বড় অনেক জমিদারের অধিকারের আওতায়।

এখন থেকেই মহানাদ জমিদারতন্ত্র। কিন্তু ধন-সম্পদে কীর্তি-গরিমায় মাথা যাঁরা তুললেন, তাঁরা কেউ আদিতে জমিদার নন। আদিতে তাঁরা ছিলেন বণিক, জমি-দার হয়েছেন পরে। বাণিজ্যে লক্ষ্মী এসেছেন। লক্ষ্মীর পিছু পিছু পায়ে পায়ে হেঁটে এসেছে কীর্তি শ্রী সম্পদ ভূমি। মহানাদের করবংশ তাঁদেরই অন্যতম।

কাশ্যপ গোত্রীয় তাম্বুলী কুলোদ্ভব এই করেদের আদিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। কোন এক অত্যাচারে উৎখাত হয়ে (বর্গী ভয়ে, মগ দস্যুদল কিংবা শোভা সিংহ ঘটিত হাঙ্গামাতেও হতে পারে) আন্দাজ আড়াই শো বছরের কিছু আগে সপ্তগ্রাম ছেড়ে মহানাদে পালিয়ে আসেন এঁদের পূর্বপুরুষ বনমালী কর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সবেমাত্র তাদের ব্যবসার জাল বিছোতে শুরু করেছে বাংলা দেশে। বনমালী একচেটে লবণের কারবার ফাঁদ-লেন তাদের সংগে। কারবার ফুলে ফেঁপে উঠতে দেরি হলো না। শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত দেখা দিল এক পুরুষেই।

জমিদারী ক্রয় করলেন ষষ্ঠ পুরুষ তিলকরাম। ব্যবসা তখন জম-জমাট। কাঁচা পয়সা উড়ন্ত লক্ষ্মী। ভূ-সম্পত্তির নিগড়ে বেঁধে বন্দিনী করা হলো তাঁকে। কর বংশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, পূজার দালান, নাটমণ্ডপ, সারি সারি শিবমন্দির প্রভৃতি তাঁর সময়েই তৈরি। যার প্রায় বেশির ভাগই ভেঙে-চুরে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। কতক বা দাঁড়িয়ে আছে অর্ধভগ্ন ধ্বংস-স্তূপ। হানাবাড়ির স্মৃতি স্মরণ করানো সাপ-ভাম-শিয়ালের আস্তানায়।

পরবর্তীকালে আরও কীর্তির মধ্যে পর পর প্রকাণ্ড জলাশয়গুলি আজও বর্তমান। কিন্তু সংস্কার অভাবে প্রায় পঙ্কিল, অস্বচ্ছ জল, দলকলমী আর কচুরিপানায় আগাগোড়া আকীর্ণ। পাড়ের ওপরে একদা বাঁধানো চাঁদনী-গুলির চিহ্নমাত্র নেই। উঁচু হয়ে জমে আছে শুধু ইটের পাহাড়।

মহানাদের বিখ্যাত **লালজীউর** মন্দির এই কর বংশেরই কয়েক পুরুষ অধস্তন শ্রীঅর্জুনদাস কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অর্জুনদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শোনা যায় মন্দির এবং বিগ্রহ

পারুল ভট্টাচার্য

প্রতিষ্ঠা করে বৈরাগ্য নিয়ে বৃন্দাবন চলে গিয়েছিলেন তিনি। মন্দিরের গায়ে চতুষ্কোণ ফলকে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদাশ্রিত
শ্রীশ্রীলালজীউ প্রভুর প্রীত্যর্থে
শ্রীমন্দির প্রস্তুত হয়।— শকাব্দ ১৭৭৩।
'সহজরামদাস কর—তস্যপুত্র অর্জুন-দাস কর।
'রামসুধীরদাস কর—তস্যস্ত্রী দ্রবময়ী দাসী।

প্রায় অভ্রলিংহ একচূড় এই মন্দিরটি বয়সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু বজ্রাঘাতে আপাদ-মস্তক এমনভাবে বিদীর্ণ যে বিগ্রহ এখানে রাখা সম্ভব হয় না। বিগ্রহ থাকেন সেবাইতদের বাড়িতে। লালজীউ কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি। অষ্ট-ধাতুর আদি যে রাধা মূর্তি ছিল সংগে, সেটি চুরি গেছে কয়েক বছর আগে। নতুন রাধা নির্মিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার।

নিয়োগী বংশও আদিতে বণিক; অন্তে ভূস্বামী। বর্ণে—সদ্‌গোপ। আদি-বাস হুগলী জেলার চাঁপারুই গ্রামে। প্রায় দেড়শো বছর আগে মহানাদে এসে বাস করেন পূর্বপুরুষ শ্রীবীরেশ্বর নিয়োগী। প্রথম দুই পুরুষ বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো তৃতীয় পুরুষে। পৌত্র পিরীতরাম ও রাধাকৃষ্ণের কালে। ম্যাকেনন ম্যাকানজী কোম্পানীকে চিনি যোগাতে আরম্ভ করলেন দুই ভাই। তখনও দেশী চিনিই বিদেশে যেতো। বিলেতী চিনি আমদানী আরম্ভ হয় নি দেশে। এই চিনির কার-বারেই প্রতিষ্ঠা নিয়োগীদের। জমিদারী ক্রয় শুরু হলো, তারও কিছুদিন পরে শম্ভুচন্দ্র ও কীর্তিচন্দ্র নিয়োগীর সময়ে।

নিয়োগী বংশের প্রকাণ্ড কারুকার্য-খচিত নবরত্ন ব্রহ্মময়ী কালীর মন্দিরও এই কৃষ্ণচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের সময়ে প্রতিষ্ঠিত এত বড় উঁচু এবং এত প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত মন্দির বাংলা দেশে কমই দেখা যায়। মন্দির মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা শবারূঢ়া, খড়্গমুণ্ড বরাভয়-ধারিণী দক্ষিণা কালিকা মূর্তি আছেন। চার কোণে চারটি শিব এবং ঊর্ধ্বে ত্রিতলে বৃহদাকৃতি চূড়ার ঠিক মাঝখানে শ্বেতবর্ণ হংসেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। মন্দিরের গায়ে মস্ত ফলকে উৎকীর্ণ করা আছে—শ্রীদুর্গা শরণং শকে ভূশর সৌম-চন্দ্র গণিতে শ্রীকালীকায়া মঠ। ঊর্ধ্বে পার্শ্ব চতুষ্টয়েং বিরসৎ হংসেশ্বরাদি শিবঃ। শ্রীকালীং ভবভঙ্গিনীং, ভব ভয় হন্তং মঠেহ স্থাপয়ৎ। শ্রীসদগোপ কুলোদ্ভব গুণ বরং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাখৎ কঃ।

ব্রহ্মময়ীর বাস জন্য
নির্মিত নবরত্ন
পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত।
পার্শ্বে কৃষ্ণ বর্ণ চারি,
ঊর্ধ্বে এক শ্বেত তারি,
দেখিবারে অতি সুশোভিত।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম
অশেষ গুণে গুণধাম,
সদগোপকুলে উৎপত্তি।
ভবসিন্ধু তরিবারে,
সুযত্ন করি অন্তরে
কালীপদ করিয়ে প্রণতি।
সন ১২৩৬ সাল (১৭৫১ শকাব্দ)

মহানাদের অপরাপর পরিবারগুলির মধ্যে গৌতম গোত্রীয় মুখ্য কুলীন কায়স্থ বসু বংশ প্রাচীন। সোমঋষি গোত্রীয় শেঠেরা আছেন আজও। এ ছাড়াও ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য শূদ্র মিলিয়ে আরও বহু পরিবার রয়েছেন, যাঁরা প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু। এক কথায় ছয় জাতি ছত্রিশ বর্ণের অধ্যুষিত বাসভূমি বলে মনে করা যেতে পারে মহানাদকে আজও।

সাহিত্য তথা শাস্ত্রচর্চার একটি উল্লেখ-যোগ্য কেন্দ্র এক সময় ছিল এখানে। বহু

কবি, নাট্যকার, [illegible], দর্শন, টিকা এবং ধর্মগ্রন্থ রচয়িতা [illegible] করে গেছেন এখানে। বৌদ্ধধর্ম তথা বৌদ্ধাচার্যদের প্রভাব মহানাদেও পড়েছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার কায়স্থ চাকাদাস মহানাদের অধিবাসী ছিলেন। হেবজ্রতন্ত্র রাজোর টিকা রচয়িতা মহাসিদ্ধাচার্য টক্কাদাস এখানেই বাস করতেন। ৯৯১ খৃস্টাব্দে মহানাদে রচিত 'পদার্থ ধর্মসংগ্রহের টিকা' নামে একখানি গ্রন্থের কথা জানা যায়। ১১৯০ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম মহানাদে বসেই তাঁর ভাষাবৃত্তি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২০৫ খৃস্টাব্দে মহানাদ নিবাসী শ্রীধর দাস ৪৪৬ জন কবির রচিত শ্লোক সংগ্রহ করে সদুক্তি কর্ণামৃত নামে এক সংকলন রচনা করেন। সিংহ বংশের গদাধর সিংহ ও বিদ্যাধর সিংহ প্রায় এক-শত তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুকদেব সিংহ এবং রাঘব সিংহের অনেক কুলগ্রন্থ ছিল। জয়হরি সিংহের কক্ষোল্লাস নামে এক গ্রন্থ ছিল। মহানাদের রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ চন্দ্র ব্যাকরণ নামে ছয় অধ্যায় বিশিষ্ট পাণিনির ভাষ্য এবং ন্যায়লোক-সিন্ধ নামে ন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থ ছিল।

ঘটক গঙ্গাদাস বসুর কায়স্থকারিকা রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থ রসমঞ্জরী মহা-নাদের কবি ভানু দত্তের রচিত। মহা-নাদের হিন্দু স্কুল স্থাপয়িতা ললিতমোহন কর পার্বতী-পরিণয় নামে একখানি নাটক লিখেছিলেন। নাটকখানি মুদ্রিতও হয়ে-ছিল, কিন্তু এখন পাওয়া যায় না। মহানাদ নিবাসী স্বর্গত শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহৎ দুই খণ্ডে মহানাদের ইতিহাস লিখেছিলেন। কিছু কিংবদন্তী এবং অ-প্রমাণিত তথ্য-দোষী হলেও বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত। জীবন এবং সাঁওতালী ভাষা নামেও তাঁর দু'খানি পুস্তক আজও পাওয়া যায়।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মহানাদ খনন করেছেন। বহু পুরাতন মূর্তি এবং মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রমাণ-পত্রও পেয়েছেন তাঁরা। জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে সেগুলি। কিছু স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গেছে মহানাদে। যার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। যে কয়েকটি রক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে কর বংশের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রক্ষিত মুদ্রাটি কিছু বিশেষ ধরণের। চতুষ্কোণ সওয়া তোলা ওজনের এই মুদ্রাটি খিলজী বংশের শেষ সম্রাট আলাউদ্দীনের সময়ের। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এবং মাত্র কয়েক বৎসর পরেই ১৩১৬ খৃস্টাব্দে দাস সেনাপতি কাফুর কর্তৃক নিহত হন। মুদ্রাটির দু'পিঠে আরবী লিপি আছে এবং তার পাঠোদ্ধার করাও হয়েছে—

"হজরত ওমর গসমান
আল আদিন
ইয়া আল্লা মহাম্মাদর রশুলাল্লা
আবুবক্কার আলি
সিদ্দিক আলগাজী
ইয়া আল্লা তায়ালা
মহম্মদ আলাওদ্দিন
আলগাজী, আশরফল
বাদশা সারবে আরদো
তায়া আফেরিন।"

ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে তো বটেই ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে হুগলী জেলা গঠিত হওয়ার পরেও বর্ধমানের অন্তর্গত একটি মহকুমা শহর ছিল মহানাদ। স্বভাবত সমৃদ্ধিও কিছু হয়েছিল। মুন-সেফ আদালত ছিল, রেজেস্ট্রী অফিস ছিল। ছোট-খাটো ব্যবসা-বাণিজ্য কুটির-শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। মহানাদের হাতে তৈরি কাগজ, ঝিনুক পোড়ানো চুণ (পঙ্ক), মুগীপাড়ার কাপড়, চাদর, গামছা এবং মাটির তৈজসপত্রের খ্যাতি ছিল সেখানে। বড় বড় ব্যবসার মধ্যে নীল, চিনি, লবণ, কাঠ এবং তুলা। একাধিক নীলকুঠির অস্তিত্ব আজও দেখা যায়। দক্ষিণ পাড়ায় বিস্তৃত তুলার চাষ ছিল। লবণ, কাঠ ও চিনির ব্যবসায়ে অর্থলাভ করেছিলেন মহানাদের ব্যব-সায়ীরা।

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ারও কিছু আগে ফ্রী চার্চ মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এখানে যুগপৎ জনসেবা ও শিক্ষা বিস্তা-রের উদ্দেশ্যে। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার

বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ লালজীউর মন্দির

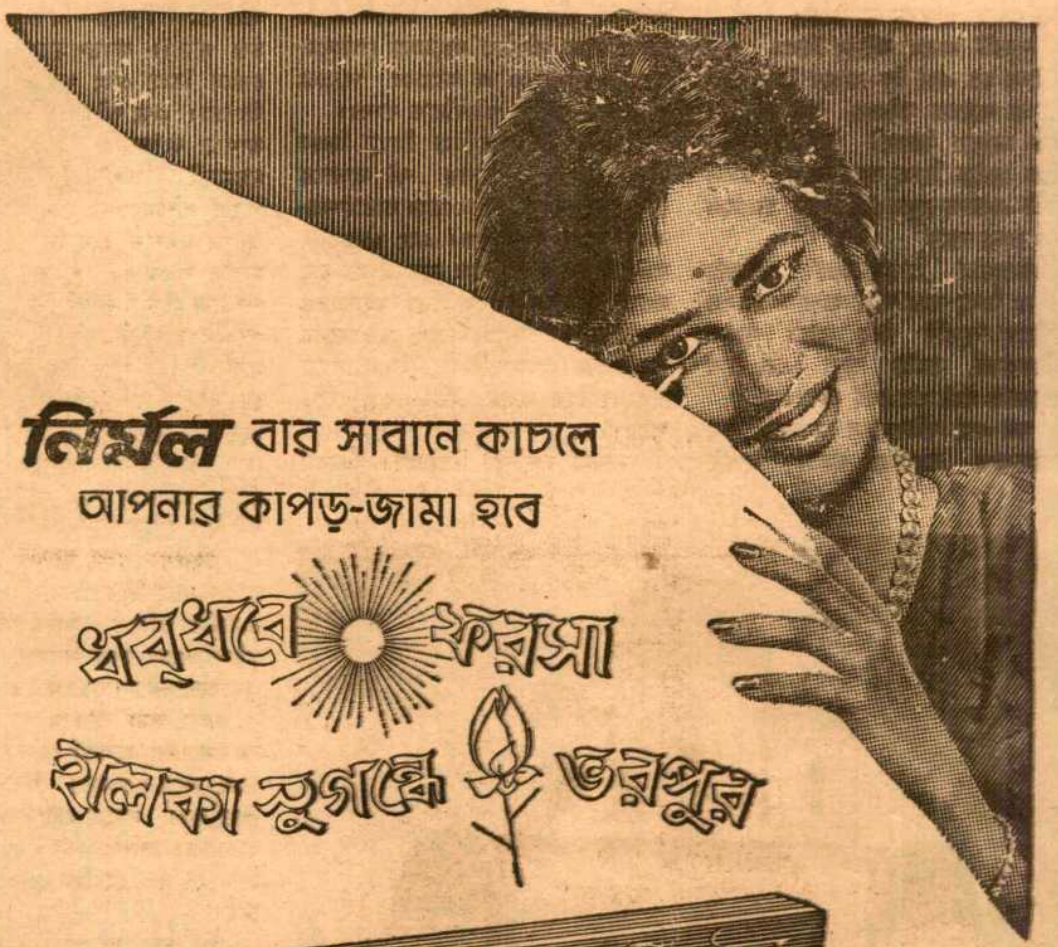

নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে

ঝরঝরে ফরসা
ফুলকা সুগন্ধে ভরপুর

নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।

নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়সুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।

নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ফেনা বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।

নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

ANTKN 3R8

ডাফ, ডাব্লিউ, সি, ফাইভ এবং রেভারেণ্ড জগদীশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে প্রথম পত্তন হয় প্রতিষ্ঠানটির। জমি দিয়েছিলেন নগরপাড়ার নিয়োগীরা। শোনা যায় দলিলে সর্ত ছিল চূড়াযুক্ত গির্জা এবং কবরখানা করতে পারবেন না তাঁরা।

স্কুলটি প্রথমে মাইনর ছিল। পরে এনট্রান্স হয় এবং কি কারণে ঠিক জানা যায় না পুনরায় পরিণত হয় মাইনরে। মাঝে মহানাদ নিবাসী শ্রীললিতমোহন করের চেষ্টায় হিন্দু স্কুল নামে আরও একটি এনট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার কিছু বছর পরে আন্দাজ ১৯২৪ খৃস্টাব্দে স্কুলটি উঠে যায়। দাতব্য চিকিৎসালয়, লেডি স্কুল এবং নৈশ বিদ্যালয়ও উঠে যায় সেই সঙ্গে।

পথ এবং পরিবহনের ব্যবস্থাও ছিল উল্লেখযোগ্য রকমের ভাল। জামাই জাঙাল (বর্তমানে যেটি মগরা-খানপুর রোড হয়েছে) মহানাদের বহু প্রাচীন রাস্তা। প্রবাদ মহারাজা চন্দ্রকেতু আপন কন্যা-জামাতার যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি করেছিলেন রাস্তাটি। এ ছাড়াও পাণ্ডুয়া, হুগলী এবং জগদীশবাবুর রাস্তা নামে পরিচিত হাড়মালা পেকেড়া-সরযার—রাস্তাটিও এ অঞ্চলের পুরনো এবং ইদানীংকালে পরিবর্তিত রাস্তা।

পরিবহনের অসুবিধা কিছু ছিল। কিন্তু ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের তারকেশ্বর-বসুয়া লাইন চালু হয়। এবং ১৮৯৫-এ লাইনটি আরও প্রসারিত হয়ে এগিয়ে যায় মগরা পর্যন্ত। এই লাইনের মহানাদেও একটি স্টেশন ছিল। কাজেই পরিবহনের প্রাচীনলীন অসুবিধা ইদানীংকালে দূর হয়েছিল বলেই মনে করা যেতে পারে।

সংঘাত সমৃদ্ধির চিরসাথী। একের পর এক সংঘাতের ঢেউ তাই বয়ে গেছে মহানাদের ওপর দিয়েও। হিন্দু যুগে মুসলমান আক্রমণ দিয়ে যার শুরু। পরবর্তীকালে বর্গীর হাঙ্গামা (চন্দ্রকোনা মহানাদ আর দিগনগর ক্ষীরপাই পোড়ায় আর ত্রিপিনী শহর—বর্গী পুরাণ, হারানচন্দ্র গুহ)। কালাপাহাড়ের অত্যাচার, শোভা সিংহ এবং দুর্লভ সিংহঘটিত উৎপাত। এবং পরিশেষে ১৮৫৬-র অভিসম্পাত বর্ধমানের জ্বর বা ম্যালেরিয়া মহামারী। ভাগীরথীর এপারে-ওপারে পুরো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধেকের বেশি জনপদ জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল এই মহামারীর আক্রমণে। হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া মহানাদ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রামে প্রকোপ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। মানুষ মারা পড়েছিল সাড়ে তিন ভাগ। বাদবাকী প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ, সৎকারের লোক ছিল না। সৎকারহীন শবদেহের পচা দুর্গন্ধে গ্রামের আশপাশ দিয়ে হাঁটা-চলা হয়ে উঠেছিল দুরূহ।

তথাপি এর পরেও এত কিছু সহ্য করেও যাঁরা টিকে ছিলেন, সাত-পুরুষের বাসভূমি আঁকড়ে পড়েছিলেন আটকে। তাঁদের ওপর শেষ সর্বনাশ নেমে এলো একাত্তরের ঝড়ে। ১৮৭১-এর ৫ই অক্টোবর এক ভয়ানক ঝড় হয়েছিল বাংলা দেশে। বর্ধমান এবং হুগলী জেলার অর্ধেকেরও বেশি অংশ একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানুষ মারা পড়েছিল ৫০ হাজারেরও বেশি। অর্থ নষ্ট ও সম্পত্তি-হানি যে কত হয়েছিল তার আর হিসাব নেই।

প্রলয়ঙ্কর সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহানাদকেও ছেড়ে কথা কয় নি। মহানাদের রওয়া-সওয়া শেষ সমৃদ্ধিটুকুও ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে। মানুষ মরলো, সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। ঘর-বাড়ি, বাগান-বাগিচা ভেঙে-চুরে উপড়ে-গাড়িয়ে পড়লো ধুলোয়। নিরুপায় মানুষ নিরাশা সম্বল করে দেশ ছেড়ে দলে দলে চলে গেল অন্যত্র। একদা জনাকীর্ণ জনপদ পরিণতি হলো জনশূন্য অরণ্যভূমিতে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের শিখরে শিখরে শিকড় গজাতে লাগলো বনস্পতিরা, বাসা বাঁধলো বন্য পশু। সরীসৃপ আর শিবাদল জমিয়ে তুললো তাদের পাকাপাকি আসর। আর সেই অরণ্যে, সেই অন্ধকারে, সেই করাল কৃষ্ণ প্রগাঢ় বিস্মৃতি ছায়ায় বর্ধিত হতে লাগলো একটি ইতিহাসের অবসাদ। নেমে এলো একখানি নিষ্ঠুর যবনিকা, অ-চেতনা যার নাম।*

ব্রহ্মময়ী কালীর মন্দির (মহানাদ)

[*আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত

অভিনয় ও অভিনেতা

কক্সা কক্কেলাঁ: বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা ককেলাঁ (১৮৪১—১৯০৯) অভিনয় সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ একটি ছোট বই আছে—'দি আর্ট অভ দি এ্যাক্টর'। ককেলাঁর বক্তব্যগুলি সম্বন্ধে নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক সেন্ট জন আরভিন লিখেছেন—

"Those who are interested in the business of acting will be sensible if they immediately buy Coquelin's mastery little book."

এই বইতে মোটামুটিভাবে ককেলাঁ যা বলেছেন তা হচ্ছে এই—শিল্প বা কলা বলতে সাধারণভাবে একটা সমন্বয়ের ভাবকেই বোঝায়। এই সমন্বয়ের বহিঃসজ্জার কাজ করে কাব্য—আর একে সবার কাছে গ্রহণীয় করে তোলে এর অন্তর্নিহিত সত্য। চিত্রাঙ্কনে চিত্রকরের দরকার হয় পট, তুলি প্রভৃতির। তেমনি ভাস্করের চাই মাটি, খোদাই করবার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। কবির সম্পদ ভাষা এবং সংগীত—মাত্রা, ছন্দ ও কল্পনাশক্তি। কি ধরণের মাধ্যমের ভেতর দিয়ে রূপায়িত হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক শিল্পকলার বিশেষত্ব।

অভিনয়-শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর স্রষ্টা ও রূপায়ণের মাধ্যম উভয়ই অভিনেতা নিজে।

নিজের মুখ, চোখ, কবন্ধ, জীবন, এই সবই হচ্ছে তাঁর শিল্পসৃষ্টির উপাদান।

এই জন্যই অভিনেতার ভেতর সব সময়েই থাকবে একটা দ্বৈতভাব। এবং যিনি সম্পাদনকারী বা যন্ত্রী—দুই, যাকে নিয়ে সম্পাদন করা হচ্ছে বা যিনি যন্ত্র।

যে চরিত্রে রূপদান করা হচ্ছে, তার সম্বন্ধে যা কিছু ধারণা করা, অর্থাৎ নাট্যকার কিভাবে চরিত্রটি সৃষ্টি করছেন সেটা ভালভাবে বুঝে নেওয়া—এ হল অভিনেতার ভেতরকার দ্বৈতসত্তার নাম্বার ওয়ানের কাজ। সেই ধারণাকেই হৃদয়ংগম করে নাম্বার টু'র ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করতে হবে।

অভিনেতার আর একটি কাজ করতে হবে নিজের সম্বন্ধে। মঞ্চের ফ্রেমে যে প্রতিকৃতি তিনি সৃষ্টি করছেন তার অন্তরে তাঁকে ঢুকতে হবে—কারণ এর ভেতর দিয়ে এমনভাবে তাঁকে কথা বলতে হবে, কাজ করতে হবে, চলাফেরা করতে হবে, যাতে তাঁকে দেখে দর্শকেরা মনে করেন যে, চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব তিনি নিখুঁৎভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনয়ের মায়াজালে।

চরিত্র রূপায়ণ করতে গেলে অভিনেতাকে ভালভাবে নিজের পার্টটি অনুশীলন করতে হবে। এর জন্য সমগ্র নাটকটি বার বার ভালভাবে পড়ে দেখা দরকার—লেখকের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়ে চরিত্রের প্রধান এবং বাস্তব দিকগুলিকে বেছে ঠিক করে নিতে হবে। তারপর দেখতে হবে নাটকের প্লটের বিকাশে চরিত্রের করণীয় কাজটা কি। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেলেই তিনি চরিত্রের মডেল পেয়ে যাবেন।

চিত্রকর যেমন পটের ওপর মডেলের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলেন, অভিনেতাকে তেমনি ঐ মডেলকে ফুটিয়ে তুলতে হবে নিজের নিজের দেহপটে। অভিনেতার নাম্বার টু'ই হচ্ছেন এই পট—একেই গড়েপিটে সৃষ্টি করতে হবে মডেলের প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবির মধ্যেই আরোপ করতে হবে চরিত্রের প্রাণবন্তু ব্যক্তিত্ব।

অর্থাৎ প্রথমে গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে চরিত্রটিকে আয়ত্ত করে নিয়ে অভিনেতা নিজের নাম্বার ওয়ানের হাতে ছেড়ে দেবেন—তিনি তখন নাম্বার টু'র মাধ্যমে মঞ্চে চরিত্রটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন—এই হল অভিনেতার আসল কাজ।

অভিনেতার ভেতর একই সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে এই যে দুটি সত্তা বিরাজ করে, তার নাম্বার ওয়ান হচ্ছেন প্রভু ও পর্যবেক্ষক এবং বিচারক। নাম্বার টু হচ্ছেন ভৃত্য ও আজ্ঞাপালক। নাম্বার ওয়ান আত্মা—নাম্বার টু দেহ। এই প্রভুভৃত্যের তারতম্যের পরিমাপের ওপরেই নির্ভর করে অভিনয়-শিল্পের পারদর্শিতা—

"The greater the mastery, the greater the artist."

এমন অনেক অভিনেতা আছেন যাঁরা নিজের ব্যক্তিত্বকে বশে আনতে পারেন না। ফলে যে চরিত্রে অভিনয় করছেন তার ভেতর নিজে প্রবেশ না করে, সেই চরিত্রের ওপর নিজের ব্যক্তিত্বকে আরোপ করেন। এই ধারার অভিনয়ের প্রধান দোষ হল এই যে অভিনেতা হয়ে পড়েন—"a one part actor". এসব ক্ষেত্রে অভিনেতার অহংবোধ চরিত্রের স্বরূপকে বিকশিত হতে বাধা দেয়—

"It involves neglect of the inward study of characterisation—the most important of all studies in my judgement—in favour of external and picturesque detail.

নাট্যকারের নির্দেশ অনুসারেই চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে অভিনেতার একমাত্র কর্তব্য।

স্পিরিট অব ইওর পার্টটা মনে গেঁথে নিতে চেষ্টা কর—বাকী সব, যথা আংগিক, বহিঃসজ্জা ইত্যাদি আপনা থেকেই এসে যাবে—

"The soul creates the body, not the body the soul."

শয়তান ভয়াবহ—কারণ তার অন্তর এবং মানসিক সত্তাটিই ভয়াবহ। এর মানে এই নয় যে শুধুমাত্র প্রকৃতির ব্যর্থ অনুকরণ করবে। আর্টিস্টের কাজ হল চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলা—বিশ্লেষণশক্তির দ্বারা এই সব গুণাবলীকে বাছাই করে নিতে হবে—

"Selection should retain only points of real significance, and they must be adapted with discretion to the whole conception of the part, eschewing, for instance, those which are peculiarly individual."

অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের প্রাধান্য আর সবের ওপরে। স্বরের রূপসাধন বা বৈচিত্র্যের ওপর অভিনয় সাফল্যের অনেকখানিই নির্ভর করে—

"...all the visual effects in the world are nothing worth, when it comes to moving the hearts of an audience, in comparison to one cry uttered with true intensity of intonation."

সুতরাং আর্টিকুলেশন ব্যাপারটার ওপরই অভিনেতার সবার আগে মনোনিবেশ করা দরকার। দর্শকের প্রতি সৌজন্য প্রকাশেরও একমাত্র উপায় হচ্ছে এই স্পষ্ট উচ্চারণ। অভিনেতা যখন মঞ্চ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্য করেই সংলাপ বলেন তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে দর্শকেরাও আশা করবেন যে ঐ সংলাপ যেন স্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যায়।

এরপরেই স্বাভাবিকভাবে সংলাপ বলার প্রশ্নটা এসে পড়ে। স্বাভাবিক বলতে যদি অস্পষ্ট কথা বলার ভংগীকে বোঝায়, তবে আমি বলব ওই ধরণের স্বাভাবিকতাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে চলতে হবে মঞ্চশিল্পীর। খেতে বসে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে যখন কথা বলি, তার মধ্যে অনেক সময় কথা আটকে যায়, পুনরুক্তি হয়, ভুল শুধরে নেওয়া হয়, চিবিয়ে কথা বলা হয়

গ্রন্থমেলা

আমার জীবন : শ্রীমধু বসু—প্রকাশক : বাক্‌সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ মূল্য : পনের টাকা।

বড় বড় শিল্পীদের জীবনী বা আত্মজীবনী পৃথিবীর সেরা সেরা রহস্য উপন্যাসগুলোর মতই রোমাঞ্চকর। তা ছাড়া শিল্পসাধনায় যাঁরা জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেছেন সেই সব তরুণ-তরুণীরাও এই জাতীয় বই থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ পেতে পারেন। ইউরোপে এই ধরণের বই দুর্লভ নয়—যেমন ধরুন গর্ডন ক্রেগের লেখা স্যার হেনরী আরভিং-এর জীবনী, ইসাডোরা ডানকানের আত্মজীবনী, স্ট্যানিসলাভস্কির 'মাই লাইফ ইন আর্ট', আরভিং স্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ', ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের অস্কার ওয়াইল্ড এবং বার্নার্ড শ'-এর জীবনী প্রভৃতি। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের জীবনের ওপর ভিত্তি করে ওদেশে বড় বড় লেখকরাও উপন্যাস রচনা করেছেন—উদাহরণ হিসাবে জোলার 'মাস্টারপিস' (সেজানের জীবনী) এবং মমের 'মুন এণ্ড সিক্স পেন্স'-এর (গোঁগার জীবনী) নাম করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে এ-ধরণের বই একেবারে লেখা হয় নি তা' নয়, তবে এ শ্রেণীর বইয়ের সংখ্যা বড় কম। তা ছাড়া এসব লেখায় মনে প্রেরণা বা উৎসাহ পাবার মত মালমশলার সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সব দিক থেকে মধুবাবুর বইটি হয়েছে অতুলনীয় এবং অনবদ্য। শ্রীযুক্ত মধু বসু এবং সাধনা বসু মঞ্চ এবং ছায়াচিত্র জগতের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরিচালক হিসাবেও (নাটক এবং ছায়াছবির) মধু বসু অনন্যসাধারণ। আর নৃত্যশিল্পী হিসাবে শ্রীমতী সাধনা বসুর পরিচয় আর নতুন করে কি দেব! নাচে এবং অভিনয়ে, বিভিন্ন চিত্র রেখে গেছেন তা ভারতের নৃত্যনাট্যের এবং নাটকে তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই দুই মহৎ শিল্পীর সারা জীবনের শিল্পসাধনার ইতিহাস আলোচ্য বইটিতে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

শ্রীযুক্ত মধু বসু এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। তাঁর মাতামহ ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। বাবা প্রমথনাথ বসু ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদ। প্রমথনাথ ময়ূরভঞ্জ স্টেটের গুরুমহিষাণীতে প্রচুর লৌহ আকরের আবিষ্কার করবার ফলেই টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে ভিলাই লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় মধ্যপ্রদেশের রাজহারা ও চুল্কি থেকেই আকরিক লৌহ চালান আসে—এই দুটি জায়গাতেও লৌহ আকরের আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীপ্রমথনাথ বসু ১৮৮৭ সালে। মধুবাবুর ভাই, বোন, ভগ্নীপতিরা সবাই সমাযের শীর্ষস্থানের। স্ত্রী সাধনা বসু ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের নাতনী। এত বড় বংশের ছেলে হয়েও মধুবাবু তাঁর বইয়ের কোন জায়গায় এতটুকু গর্ব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি। বরং নানাভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে নিজের দোষত্রুটিগুলোকে স্পষ্টভাবে পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নিজের চরিত্রের দুর্বলতাগুলোকে এভাবে ক'জন অন্যের সামনে তুলে ধরতে পারেন?

—কিন্তু এ ভঙ্গীতে মঞ্চের ওপর কথা বললে দর্শক তা বুঝতে পারবে না—মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠবে এই অস্পষ্ট বক্‌বকানি শুনতে শুনতে।

থিয়েটার তো আর ড্রয়িং রুম নয়—এখানে ১৫০০ দর্শককে উদ্দেশ্য করে অভিনেতাকে সংলাপ বলতে হচ্ছে—সুতরাং চিমনির পাশে বসে দু-পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলা হয়, তার থেকে ঢের বেশি উঁচু পর্দায় মঞ্চের ওপর থেকে সংলাপ বলতে হবে এবং সব সময় দেখতে হবে, কথা যেন জড়িয়ে না যায়—উচ্চারণ যেন স্পষ্ট হয়। তা না হলেই দর্শকের কাছে অভিনয়ের সংলাপ অর্থহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠবে।

এক ধরণের অভিনেতা দেখা যায় যাঁরা নাট্যকারের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চরিত্রের ওপর নিজস্ব ব্যাখ্যা আরোপ না করে পারেন না। এই জাতীয় অভিনয়ের সমর্থনে এমন প্রশ্নও ওঠে—তবে কি সত্যিকার বড় অভিনেতা নিজের প্রতিভার বিরাট মাহাত্ম্যে চরিত্র রূপায়ণে চরিত্রাতিরিক্ত কিছু দিতে পারবেন না?

"Whether great actors cannot breathe into the characters their own spirit and the spirit of their own day and so give to the poet's creation a significance he could not foresee, different certainly, and possibly stronger and more profound than the original."

উদাহরণস্বরূপ অভিনেতা ফ্রেডারিক মেলোড্রামার একটি সাধারণ চরিত্র রবার্ট ম্যাকেয়ারকে যে অদ্ভুতভাবে মঞ্চচরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে 'দি বেলস্' বা 'দি লায়ন্‌স মেইল'-এ স্যার হেনরী আরভিং-এর অভিনয়ও স্মরণ করা যেতে পারে।

[বাংলা নাট্যমঞ্চেও বহু নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকের ততোধিক নিকৃষ্ট চরিত্র এইভাবে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের বিরাট অভিনয়-প্রতিভায় এইভাবে মাহাত্ম্য লাভ করেছে। যেমন ধরুন 'রীতিমত নাটক', বা 'পরিচয়' নামে যে নাটকটি শেষের দিকে ভাদুড়ী মশায় শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ করেছিলেন। শিশিরকুমারের এবং তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনয় গুণে এ-ধরণের নাটক মঞ্চসাফল্য পেয়েছিল। নাট্যাচার্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই এ-সব নাটক রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও কখনও মঞ্চস্থ হবে বলে মনে হয় না।

স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় বহু নিকৃষ্ট নাটককে নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন—আজ সে সব নাটকের কে খোঁজ রাখে! গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন না বটে, তবু তাঁদের রচনার খানিকটা নাটকীয় মূল্য ছিল এবং সেই কারণেই তাঁদের লেখা নাটক কোনদিনই মঞ্চ থেকে চিরতরে নির্বাসিত হবে না।]

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখছি কোন অপরিসীম শক্তিশালী এবং প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর নাটককে নিজের কল্পনার বিরাটত্বে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে এনেছেন। কিন্তু কর্নেএইল বা শেক্সপীয়ারের ক্ষেত্রে তো আমরা কখনই চাইব না যে লেখকের বক্তব্যকে ছাপিয়ে উঠে অভিনেতার নিজস্ব ব্যাখ্যা এসে তার ওপর আরোপিত হোক।

তা ছাড়া এ-কথাও মনে রাখতে হবে, লেখক যা বলেছেন তাকেই ভালভাবে বুঝে, আয়ত্তের মধ্যে এনে ফুটিয়ে তোলাটাও খুবই শক্ত ব্যাপার। [ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

অনভিপ্রেত চলচ্চিত্র

রাজ্যসভায় গত ১লা জুন কয়েকজন সদস্য অনভিপ্রেত বই ও ছায়াছবি আমদানী নিষিদ্ধকরণের দাবি করেছেন। সদস্যগণ যৌনবিষয়ক সাহিত্য এবং নৈতিক নিম্নমানের চলচ্চিত্রের কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে দেশের অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ দীর্ঘদিন থেকে জানিয়ে আসছেন। যে দেশে অর্থের অভাবে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, যে দেশে খাদ্যাভাবে মানুষ মরছে, পুত্র-কন্যা ত্যাগ করছে সে দেশে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে যৌন সাহিত্য ও নৈতিক নিম্নমানের ছবি আমদানী একটা জঘন্য অপরাধ ছাড়া আর কি হতে পারে। কলকাতার ফুটপাতেই দেখা যাবে নগ্ন নারী-দেহের ছবিযুক্ত কত রকমের যৌন পত্র-পত্রিকা, কত যৌনপ্রধান গল্প ও উপন্যাস। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বিকৃতরুচি সাহিত্যিক ও পাঠক এইগুলিকে গোগ্রাসে গিলছে। কোন কোন অসুস্থমনের লেখক এই মার্কিনী গল্প-উপন্যাসকে অনুকরণ করে বাংলার পত্র-পত্রিকায় পরিবেশন করছে। এরূপ বিকৃতমনের অখ্যাত লেখকরা বিপুল অর্থব্যয়ে পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করে বিলি করে। হয়ত কোন গোপনসূত্রে এদের অর্থের যোগান আসে।

চলচ্চিত্রের কথা আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। আজকাল মার্কিন যৌন-গোয়েন্দা ছবির জন্য প্রেক্ষাগৃহগুলিতে ভাল ছবি স্থান পাচ্ছে না। এসব ছবিতে কোন সুন্দরীর যৌনবিলাস, নগ্ন বা অর্ধ-নগ্ন দেহ প্রদর্শন ইত্যাদির সঙ্গে থাকবে মার্কিন গোয়েন্দার বাহাদুরী। গোয়েন্দার কাজ যে কত লোভনীয় ইঙ্গিতে সে কথাই বলা হচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক প্রচার। কখনো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-ই'র পক্ষে প্রচার, কখনো মার্কিনীদের বিশ্বশান্তির একমাত্র রক্ষক বলে জাহির করা, কখনো কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শত্রু নিধনে মার্কিনদের সহায়তা ইত্যাদি। এই ছবিগুলি দেশের যুবকদের মধ্যে মার্কিন গোয়েন্দাদের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করছে, যৌন-চিন্তায় প্রলুব্ধ করছে, একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রতি মোহ সৃষ্টি করছে। এক স্বাধীন দেশের পক্ষে এরূপ ধারণা সৃষ্টি মারাত্মক, এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক। এই ছবিগুলি সিনেমায় বিনা বাধায় চলছে। একবার শোনা গেছিল সরকার এ সব ছবি প্রদর্শন বন্ধ করার কথা চিন্তা করছে। কিন্তু রাজ্যসভায় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহের জবাব শুনে মনে হচ্ছে তার কোন সম্ভাবনা নেই।

গত ১লা জুন শ্রীদীনেশ সিং বলেছেন, সরকার এ বিষয়ে খুবই সচেতন। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পুস্তকের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ কারিগরী সংক্রান্ত বই, শতকরা দশ ভাগ মাত্র নভেল জাতীয় বই। এই দশভাগের ঠেলায় দেশের রাজপথ অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কারিগরী বই-এর ৭০ ভাগের মধ্যে যৌন কারিগরী কত ভাগ লুকিয়ে আছে কে জানে? ছায়াছবি সম্পর্কে শ্রীসিং বলেছেন,—"আমি মনে করি না যে আমরা সকলে শিশু। ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক লোক আছে। ওই ছায়াছবির জন্য আমাদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়।" 'গোল্ডফিঙ্গার' নামক ছবির উল্লেখে তাঁর এই চমৎকার জবাব!

সুতরাং ভারতে অনভিপ্রেত বই ও ছবি বন্ধ হবার আপাতত সম্ভাবনা দেখছি না। —সুজন।

'কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' ছবিতে আকশিয়ানার চরিত্রে ইলিনা বাইন্ট্রিকায়া

চিত্রআলোচনা

কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক মিখেইল সলোকভের 'কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' বা ধীরে বহে ডন বহুদিন প্রতীক্ষার পরে মুক্তিলাভ করেছে। ধীরে বহে ডন-এর জন্য সলোকভ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই মানবিক মূল্যায়নে গভীর বিখ্যাত সাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন এ-যুগের আর এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রস্রষ্টা সের্গেই গেরাসিমভ। বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার প্রবীণ পরিচালকদের তিনি শীর্ষস্থানীয়, এবং তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে। সুতরাং দুই প্রতিভাধরের মিলিত সৃষ্টি দেখার আগ্রহ সকলের থাকা স্বাভাবিক। সলোকভ তাঁর 'কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' লিখেছিলেন পনের বছরের চিন্তায়, গেরাসিমভের এই ছবি তৈরি করতে লেগেছে আড়াই বছর।

বিরাট এক কালের ঘটনাবহুলতা ও দিগন্ত বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিকায় এ ছবি আকর্ষণীয়। হলিউডে নির্মিত এরূপ অনেক এপিক ছবি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। একথা নিশ্চিত বলতে পারি সাম্প্রতিক হলিউডের কোন ছবির সঙ্গে এই ছবির তুলনা হয় না। কাহিনীর গভীরতায়, ঐতিহাসিক মূল্যায়নে, অভিনয়নৈপুণ্যে, ক্যামেরার কাজের বাহাদুরীতে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মেশানো রঙের বৈচিত্র্যে ছবিটি পরম উপভোগ্য কেবল নয়, শিক্ষণীয় এবং মনে গভীর রেখাপাত করার মত। ছবি শেষ হবার পরও গ্রিগরির বীরত্ব ও মানবিকতা অথচ অস্থিরচিত্ততা, আকশিনিয়ার ভাগ্য, প্রেমের দ্বন্দ্ব, নিষ্পাপ নাটালিয়া স্বামী-পুত্র সংসার সব পেয়েও প্রেম পেল না, সংশয়গ্রস্ত দরিয়া ডন নদীতে ডুবে তার জ্বালা মেটাল,—এদের সকলের জন্য মনে বেদনা জাগে। পরিবারের বুড়ো কর্তা মেলেকভকে কি ভোলা যায়। চিরদিন সে পরিবারের কর্তা, কিন্তু আজ দেখছে ছেলে-মেয়েরা তাকে মান্য করছে না। গ্রামের লোকও আগের মত তার কথা শোনে না। সে পুরনোকে ধরে থাকতে চায়, অথচ পুরাতন ধ্যান-ধারণা ভেঙে পড়ছে। তার চিন্তার জগৎ অন্যদের কাছে পরিহাসের ব্যাপার হয়েছে। এক কূল যেমন ভাঙছে, আবার আর এক কূল গড়ছে। এই ভাঙনের মধ্যে এক নতুন ধ্যান-ধারণা জন্ম নিচ্ছে। এক নতুন জীবনের কথা শোনা যাচ্ছে। মেলেকভের কনিষ্ঠা কন্যা দুনিয়াশা এই নতুন চিন্তা আর নতুন করে গড়ে তোলার দলে যোগ দিয়েছে।

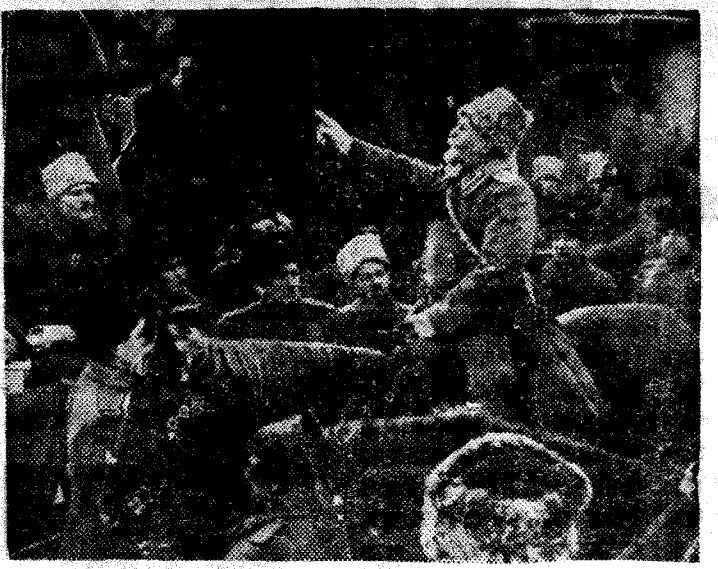

'কোয়ায়েট ফ্লোজ দিন ডন' ছবিতে একটি জনতার দৃশ্য

ডন নদীর তীরে বাস করে সাহসী কসাকজাতি। তারা অতুলনীয় অশ্বারোহী যোদ্ধা। রাশিয়ার জারের জন্য যখনই প্রয়োজন তখনই তারা যুদ্ধ করে। একই সঙ্গে তারা দক্ষ চাষী এবং খামারের মালিক। দীর্ঘ কয়েক বছরের যুদ্ধে, জারের অবিবেচনায় সমগ্র রাশিয়া অস্থির হয়ে পড়েছিল। শ্রমিকশ্রেণী এই অবস্থা অবসানের জন্য নতুন পথ দেখাল। মস্কো পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা হল অগ্রগামী বাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমগ্র রাশিয়ায় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামের প্রবল আলোড়নে ডন নদীর দুপারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কসাকরা ছিল রাজভক্ত। তারা বলশেভিকদের ধরে মারতে দ্বিধা করে নি। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল—পুরাতন ব্যবস্থা বিদায় নিতে বাধ্য। রাত্রির পরে প্রভাতের সূর্যোদয়ের মত নতুন ব্যবস্থা জয়ী হবেই।

কসাকদের গুলীতে মরবার সময় বলশেভিকরা একথাই বলেছিল। জারের পতন হল। শোষিত মানুষ জারের শীতকালীন প্রাসাদ অধিকার করল। বহু রক্তের বিনিময়ে বলশেভিকরা জিতল। এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হল। অনেকের মত গ্রিগরি বুঝল কালান্তরের এই রথকে থামান যাবে না। বন্দুক ছেড়ে নিশ্চিন্ত জীবন কামনা করে আকশিনিয়াকে নিয়ে সে চলল—মজুরী করে বাকি জীবন কাটাবার উদ্দেশ্যে। আকশিনিয়ার সঙ্গে প্রথম প্রেমের মাধুর্যকে সে এত বয়সেও ভুলতে পারে নি। কিন্তু তারা বেশি দূর এগুতে পারল না, গুলীবিদ্ধ আকশিনিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ডন নদীর দুপারের অনেক রক্তধারা এসে মিশল নদীর জলে। পুরাতন বিদায় নিয়েছে, নতুন এসেছে ঊষার আলোর দীপ্তি ও তাজা প্রাণের শক্তি নিয়ে। ভাঙাগড়ার সাক্ষী হয়ে ডন নদী বয়ে চলেছে ধীরে।

চারটি খণ্ডের এই এপিক কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া বড় কঠিন কাজ। গেরাসিমভ বর্ণনারীতিতে নৈপুণ্যের সঙ্গে একাজ করেছেন। সহজভাবে কাহিনী বর্ণনার মধ্যে শ্রমিক ও সৈন্যদের উইনটার প্যালেস দখল, দরিয়ার ডুবে মরার দৃশ্য এবং খণ্ডযুদ্ধের দৃশ্যগুলিতে তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তিনি দ্বিধাগ্রস্ত গ্রিগরির প্রেমের জীবনকে যত প্রাধান্য দিয়েছেন—বলশেভিকদের পথে তার উত্তরণকে সমান প্রাধান্য দেন নি। একারণে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের চিন্তাধারায় যাঁরা বিচার করবেন তাঁদের মনে প্রশ্ন আসবে সাম্যবাদী দেশের একটি কাহিনীচিত্রে যথার্থভাবে গ্রিগরি নায়ক কি না! গ্রিগরির চরিত্রকে যথার্থভাবে বোঝাও যায় না। যাঁরা বই পড়েন নি তাঁদের পক্ষে সব চরিত্র এবং সব ঘটনা বোঝা মুস্কিল হয়ে ওঠে। তার কারণ অতি সংক্ষিপ্তকরণ, মূল ছবিকে কেটে-ছেঁটে এই সংক্ষিপ্তকরণ আমাদের দেশে পরিবেশকরা করেছে প্রেক্ষাগৃহের সময়ের সঙ্গে মেলাবার জন্য। এই কাট-ছাঁটের জন্য ছবিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পাল্কি

পরিচালনা : এস, ইউ, সানি
ও
মহেশ কাউল

পুনম পিকচার্স-এর রঙিন ছবি পাল্কির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগে। পরিচালক এস, ইউ, সানির অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন মহেশ কাউল। ছবিটি বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। গানের সমারোহ দর্শকদের আনন্দবিধান করবে।

নাসিম নামক এক দরিদ্র কবি মেহেরুনদের পাশের বাড়িতে থাকত। দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর প্রণয়, কিন্তু নাসিমের আর্থিক অসুবিধার জন্য বিয়ে হতে পারছিল না। লক্ষ্ণৌর জনৈক নবাব মির্জার বদান্যতায় একদিন পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েও নাসিম তা গ্রহণ করতে পারল না। যদিও মেহেরুনের দাদার চতুরতায় সে টাকাতেই ওদের বিয়ে হল। কিন্তু বিয়ের রাতেই এই কারসাজি ধরা পড়ে গেলে নাসিম বোম্বাই চলে যায় মজুরী করে পাঁচ হাজার টাকা আয় করে নবাবকে ফেরৎ দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। অতি কষ্টে সে অর্থ আয় করতে থাকে। বোম্বাইতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নাসিম আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। এদিকে বাড়িতে খবর আসে সে মারা গেছে। এই সংবাদে মেহেরুন সাময়িকভাবে পাগল হয়ে যায়। এমন সময় ঘটনাক্রমে নবাব মির্জার সঙ্গে মেহেরুনের পুনর্বিবাহ হয়, কিন্তু বিয়ের রাত্রে সে তার পূর্ব স্মৃতি ফিরে পায়, এদিকে নাসিমও সেই বাড়িতে অতিথি রূপে এসে পৌঁছয়। কিন্তু নাসিম জানে মেহেরুন মারা গেছে। কিছুদিনের মধ্যে দু'জনার সাক্ষাৎ ঘটে। নবাব মির্জা তাদের প্রেমের গভীরতা দেখে মেহেরুনকে নাসিমের হাতে প্রত্যর্পণ করে এবং তাদের পুনর্মিলন ঘটে।

ছবিটিকে সংগীতে, অভিনয়ে দৃশ্য-সজ্জায়, চিত্র গ্রহণের বাহাদুরীতে উপ-ভোগ্য করার চেষ্টা হয়েছে। লোককথা ধরণের প্রেমের কাহিনীও সাধারণ দর্শক-দের আকৃষ্ট করবে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে ঘটনার যোগসূত্র কষ্টকল্পিত। এক সাধারণ ঘরের বিবাহিতা মেয়েকে বিশেষ করে স্মৃতি-বিভ্রান্তির কথা জেনেও তাকে নবাবের বেগম করা যৌক্তিকতার দিক থেকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অভিনয়ে মেহেরুনের ভূমিকায় ওয়াহিদা রহমানকে দর্শকদের ভাল লাগবে। নাসিমের চরিত্রে রাজেন্দ্রকুমার যথাযথ বলা চলে। বোম্বাই ছবির "শয়তান" রহমান এখানে ভাল লোক সেজেছেন। নবাব মির্জার চরিত্রে তিনি এক উদার মানুষ হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে মিনু মমতাজ, বিজয়া চৌধুরী, জনি ওয়াকার, নাজির হোসেন, নিলম বাঈ, প্রতিমা দেবী প্রমুখকে দেখা যায়। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নৌসাদ।

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূ'-তে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

নাটকের কথা

চলাচলের নতুন নাটক

বেশ কিছুদিন মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় করার পর চলাচল নাট্যসংস্থা এবার অন্ধ্র হলে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রথম দু'টি রবিবার তাঁদের নাটকগুলির সাথে নতুন নাটক "স্বপ্ন-নয়" অভিনয় করবেন। এ নাটকটি রচনা করেছেন ভোলা দত্ত ও পরিচালনা করেছেন রবি ঘোষ। চলাচল "স্বপ্ন-নয়" নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করবেন ১১ই জুন, রবিবার, সন্ধ্যা সাতটায়। চলাচলের শক্তিশালী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন রবি ঘোষ॥ ভোলা দত্ত॥ উমানাথ ভট্টাচার্য॥ নিমাই ঘোষ॥ গোরা চট্টোপাধ্যায়॥ প্রণব চক্রবর্তী॥ তপেন চটোঃ॥ হৃষী চক্রঃ॥ অহীন ভট্টাচার্য॥ তপর রায়চৌধুরী॥ রণজিৎ॥ স্বর্ণেন্দু॥ অপর্ণা মুখোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্তা॥

সংবাদকণা

জুলিয়াস ফুচিক

গণনাট্য সংঘের সাম্প্রতিক শাখার উদ্যোগে আগামী ১২ই জুন মিনার্ভা মঞ্চে 'জুলিয়াস ফুচিক' নাটক অভিনয় হবে।

বরাহনগর মিতালী সংঘের বার্ষিক উৎসব

গত রবিবার বরাহনগর মিতালী সংঘের বার্ষিক উৎসব ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করে। প্রখ্যাত হরবোলা মিহির রায়চৌধুরীর বিভিন্ন যানবাহন চলাচল, পশুপক্ষীর ডাক, বাদ্যযন্ত্র, কালবৈশাখীর ঝড়, বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনি, শব্দ অনুকরণ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

মস্কোয় তিসরি কসম

বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত 'তিসার কসম' মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে শোনা যাচ্ছে। ছবির দুই প্রধান শিল্পী রাজকাপুর ও ওয়াহিদা রহমান মস্কোয় আমন্ত্রিত হয়েছেন।

বার্লিনে ভারতীয় ছবি

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে 'বধূবরণ' যাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে চেতন আনন্দের 'আখরি ঘাট' যাবে। তার আগে শোনা গেছিল নাসির হোসেনের 'বাহারুনে কি স্বপ্ন'-র নাম। কোন্ ছবি সত্যিই যাবে কে জানে, না প্রচারের মারপ্যাঁচ?

রায়ের ছবিতে পিটার সেলার্স?

শোনা যাচ্ছে সত্যজিৎ রায় 'দি অ্যালিয়েন' নামে একটি ছবি নির্মাণ করবেন এ বছরের শেষের দিকে। প্রকাশ এ ছবিতে পিটার সেলার্স অভিনয় করতে স্বীকৃত হয়েছেন। প্যারিসে দু-জনার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ছবিটির প্রধান অংশ বাংলা দেশে তোলা হবে।

এক সংবাদে প্রকাশ হৃষীকেশ মুখার্জীর 'আনন্দ সংবাদ' বাংলা ছবিতে রাজকাপুর অভিনয় করবেন। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করবেন মাধবী মুখার্জী।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রতিনিধি

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে আগত তিনজন প্রতিনিধি কলকাতা আসছেন। আগামী ৯ই জুন সোভিয়েত দেশ অফিসে এই প্রতিনিধিত্বয় চলচ্চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত হবেন।

'চন্দন কা পালনা' হিন্দী ছবিতে মমতাজ

'প্রতিদান' ছবিতে কালী ব্যানার্জী ও অঞ্জলি গুপ্ত

নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন

আগামী ১১ই জুন রবীন্দ্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির উদ্যোগে নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন হবে। অনুষ্ঠানে শ্রীমুজাফ্ফর আহম্মদ, সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন সর্বশ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, ধীরেন মিত্র, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, দীপালি নাগ, সুপ্রভা সরকার, রাধারাণী দেবী, পূরবী দত্ত, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবালা ঘোষদস্তিদার, ধীরেন বসু, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ, আবুল কাসেম রহিমুদ্দিন প্রমুখ। সম্মেলনের প্রবেশপত্র ৬, এণ্টনীবাগান লেনে পাওয়া যাবে।

মোহনবাগান এবং ইস্টার্ন রেলের খেলায় সবুজ গ্যালারীর দর্শকের একাংশ মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছেন

এক শ্রেণীর উচ্ছৃংখল দর্শকের তাণ্ডবনৃত্য

এক ধরণের উগ্র দর্শক যেভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করে ফেলেছেন তাতে আমাদের কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা চলা বর্তমানে প্রায় অসম্ভবই হয়ে উঠেছে। ময়দানে দুই ধরণের দর্শক আছেন সভ্য দর্শক এবং অ-সভ্য দর্শক। সভ্য দর্শকেরা হলেন যে কোন ক্লাবের সদস্য সমর্থক, কিন্তু অ-সভ্য দর্শকেরা যে কোন দলের সমর্থক বটে কিন্তু সদস্য নয়। এই ধরণের দর্শকদের নিয়েই যত সমস্যা।

ময়দানে এক ধরণের অন্ধ এবং উগ্র সমর্থক আছেন, যাঁদের মেজাজ বিগড়ে যায় দল জয়ী না হলে। গত ২৭শে মে মোহনবাগান-ইস্টার্ন রেলের খেলায় এক শ্রেণীর দর্শকের জঘন্য কার্যকলাপ দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়েছে ময়দানের সত্যকারের ক্রীড়ামোদীদের। ২৭শে মে ময়দানে তাণ্ডবনৃত্যের জন্য যে সমস্ত দর্শক দায়ী তাঁরা কি সত্যিই ফুটবলকে ভালবাসেন; তাঁরা একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে তাঁদের এই কার্যকলাপ কলকাতা ফুটবলকে পঙ্গু করে দেবে।

খুবই দুঃখের কথা যে ইস্টার্ন রেলদল তাঁদের বীরত্বপূর্ণ বিজয়ের যোগ্য অভিনন্দন লাভ করে নি। আসল দর্শক তাঁরাই যাঁরা জয় এবং পরাজয়কে সমানভাবে বরণ করে নিতে পারেন। যোগ্য দল বিজয়ী হলে তাকে অভিনন্দিত করার মাঝে কোন লজ্জা নেই।

২৭শে মে দর্শকদের বিক্ষোভ ছিল কার বিরুদ্ধে এবং কারণ কি? তাঁবু পুড়িয়ে, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, খেলোয়াড় আহত করে, রেফারী এবং খেলোয়াড় আক্রমণ করেই বুঝি সেদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এক শ্রেণীর চরম উচ্ছৃংখল দর্শক। ওদিন মাঠে উপস্থিত পুলিশ যদি একটু সহযোগিতা করতেন তবে অনেক ঘটনা এড়ানো যেত। পুলিশ এইদিন নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিল বলেই মাঠের পূর্ব প্রান্ত থেকে সবুজ গ্যালারীর দর্শকরা মাঠের ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে এসে জলপানরত খেলোয়াড়দের ওপর আক্রমণ চালিয়ে লতিফকে মারাত্মকভাবে আহত করতে পেরেছিল এবং ক্লাব প্রাঙ্গণে

শ্রীঅমিতাভ

প্রবেশ করে গোলরক্ষক বর্মণের স্কুটারে এবং তাঁবু সংলগ্ন একটি ঘরে অগ্নিসংযোগ করতে পেরেছিল।

ইস্টার্ন রেল এবং মোহনবাগানের খেলাটি দর্শকদের উচ্ছৃংখলতার জন্য শেষ হবার আট মিনিট আগে বন্ধ হয়। ইস্টার্ন রেল এই সময় ২—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। খেলা সুরু হবার পাঁচ মিনিটে প্রদীপ ব্যানার্জীর একটি ব্যাক পাস থেকে এন গাঙ্গুলী দলের পক্ষে প্রথম গোলটি করেন, গোলরক্ষক বর্মণ সম্পূর্ণরূপে এই গোলটির জন্য দায়ী। মোহনবাগান এই দিন তিনব্যাক প্রথায় খেলে সবচেয়ে বড় ভুল করেছে। ইস্টার্ন রেল এইদিন খেলেছে চারব্যাক প্রথায়। উয়াড়ীর সঙ্গে খেলায় গোলরক্ষক বর্মণের দুর্বল ক্রীড়াধারা এবং গুরুকৃপাল সিংয়ের ছন্নছাড়া ক্রীড়াধারা দেখার পর ইস্টার্ন রেলের বিপক্ষে দু'জনকেই মাঠে নামতে দেখে সমর্থকরা কিঞ্চিৎ নিরাশ হন। মোহনবাগানের রক্ষণভাগ যতদিন পর্যন্ত না তাঁদের লক্ষ্যস্থির করতে পারবেন ততদিন তাঁদের জয় সহজসাধ্য হবে না। মোহনবাগানের পুরোভাগে তরুণ খেলোয়াড় কানন নিজের ওপর খুব বেশি আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন, ফলে তাঁর খেলা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মোহনবাগান ক্লাব এবার দু' ডজনের বেশি খেলোয়াড় জড়ো করে এই অবস্থার সম্মুখীন হবে একথা তাদের অতিবড় শত্রুও ভাবতে পারে নি। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষেরই বা দোষ কি? তাঁরা যে সব ভারতীয় আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের ওপর ভরসা রাখেন, তাঁরা মাঠে নেমে যদি সমস্ত আশা-ভরসার ভরাডুবি করিয়ে বসেন তবে কে কি করবে? কলকাতা ময়দানে বর্তমানে নামী দলের দামী কয়েকজন খেলোয়াড়দের দেখে মনে হয় যে, আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের স্থান বর্তমানে কত নিচুতে নেমে গিয়েছে এবং ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা এখন কত সহজসাধ্য হয়েছে।

ইস্টার্ন রেলের এ বছর বলতে গেলে ভাঙা দল, কারণ দলবদলের ফলে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই দল। তাই অনেক সমর্থক ভেবেছিলেন যে ইস্টার্ন রেলের বাধা এবার মোহনবাগান সহজেই অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। কারণ লীগের খেলায় মোহনবাগানের অন্যতম শক্ত বাধা হল ইস্টার্ন রেল। ভাঙা দল নিয়েই ইস্টার্ন রেল যে ক্রীড়াধারা প্রদর্শন করেছে, তাতে তাদের আরও বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ী হলে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। মাঠে এইদিন হিরো খেলোয়াড় ছিলেন কাজল মুখার্জী। কাজলের অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য দর্শকরা বহুদিন স্মরণ রাখবে। রক্ষণভাগে খেলে দৃঢ়তার সঙ্গে মোহন-

হামলার আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন বঙ্গজ মুখার্জী এবং বল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন নিজের দলের আক্রমণভাগকে সাহায্য করার জন্য। খেলা শেষ হবার আর মিনিট পূর্বে কাজলের পাস থেকে বল পেয়ে দূরত্ব কোণ থেকে এন গাঙ্গুলী সট করলে বর্মণকে পরাজিত করে বল জালে লেগে গোলে প্রবেশ করে। পঁয়তাল্লিশ পয়সার সবুজ গ্যালারীর দর্শকরা পরাজয় নিশ্চিত জেনে জুতো, জ্যাতল, ইট, কাঠ, মাঠের মধ্যে বর্ষণ করতে থাকায় খেলা বন্ধ হয় এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং এক শ্রেণীর দর্শকের তাণ্ডবনৃত্যও সুরু হয় এই সময় থেকে।

এই অবসরে ময়দানের অন্যান্য ফুটবল খেলাগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগের তৃতীয় খেলায় ৪—২ গোলে পরাজিত করেছে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে। খেলার মধ্যে উত্তেজনা ছিল প্রচুর; কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে জয়ী হবার জন্য এইদিন খুব বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হয় নি, আরও বেশি গোলের ব্যবধানে তারা জয়ী হতে পারত। ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক মহেশ প্রসাদের অত্যন্ত সাধারণ স্তরের ক্রীড়াধারার জন্য ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দুটি গোল হয়। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে পরিমল দে একাই দুটি গোল এবং সারমদ এবং দুলাল মণ্ডল একটি করে গোল করেন। জর্জ দলের পক্ষে গোল করেন কে ঢালী এবং এ বাগচী। ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ নিযুক্ত হয়ে কলকাতা আসছেন বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা কোচ মহম্মদ হোসেন।

মোহনবাগান-ইস্টার্ন রেলের খেলায় গোলযোগের জন্য, এবং মহানগরীর কয়েকস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কার্ফু বলবৎ থাকায় ময়দানে পুলিশ দেওয়ার অসুবিধার ফলে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা অনুষ্ঠিত করায় সাহসী হয় নি আই, এফ, এ। গত ২৭শে মে'র ঘটনার পর মোহনবাগান ক্লাব তাদের কার্যকরী কমিটির সভায় এ বছর লীগে আর না খেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মোহনবাগান ক্লাব তাদের সিদ্ধান্তে জানিয়েছে যে ফুটবল মাঠে হাঙ্গামা এর আগেও হয়েছে কিন্তু শনিবারের হাঙ্গামা অনেক মারাত্মক এবং ভয়াবহ আকারের। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা, ক্লাবের সম্পত্তি রক্ষা এবং ক্লাবের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য মোহনবাগান ক্লাব এ বছর আর লীগ খেলায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। শনিবারের হাঙ্গামায় তাঁদের খেলোয়াড় লতিফ চোখে মারাত্মক আঘাত পান এবং তাঁর চোখের অস্ত্রোপচারের পর তিনি বর্তমানে অনেকটা ভাল আছেন তবে চোখের অবস্থা ভাল নয়। আই, এফ, এ অবশ্য মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছেন। খেলার মাঠে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য আই, এফ, এ-র পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হবেন এক প্রতিনিধিবৃন্দ।

খেলার ফলাফল:—

ইস্টবেঙ্গল ৪	জর্জ টেলিগ্রাফ ২
এরিয়ান্স ০	রাজস্থান ০
বি এন রেল ১	কালীঘাট ০
খিদিরপুর ৩	হাওড়া ইউনিয়ন ০
ইস্টার্ন রেল ২	মোহনবাগান ০
মহামেডান স্পোর্টিং ১	স্পোর্টিং ইউনিয়ন ০
উয়াড়ী ১	বালী প্রতিভা ০
রাজস্থান ১	হাওড়া ইউনিয়ন ০
কালীঘাট ১	জর্জ টেলিগ্রাফ ০
বি এন রেল ০	উয়াড়ী ০
বাটা ১	এরিয়ান্স ০
জর্জ টেলিগ্রাফ ২	ইস্টার্ন রেলওয়ে ০
উয়াড়ী ২	স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১

সেন তদন্ত কমিশন

সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে শ্রী এম দত্তরায়ের সাক্ষ্যদানের অসমাপ্ত অংশটুকু এবার তুলে ধরছি। সাক্ষ্যদানকালে শ্রীদত্তরায় স্বীকার করেন যে, দর্শকাসনের তলনায়

কাজল মুখার্জী

সি-এ-বি যে অনেক বেশি টিকিট বিক্রয় করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন যে, ফুটবল বা ক্রিকেটে দর্শকেরা যে কোনও প্রকারে খেলা দেখতেই আগ্রহী, বসবার জায়গা পেলেন কি না পেলেন তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। তাঁর মতে জাল টিকিট যদি বিক্রি হয়ে থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে সি-এ-বি'র করার কিছুই নেই। শ্রীসীতেশ রায়ের কৌঁসুলী শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্যের জেরার উত্তরে শ্রীদত্তরায় জানান যে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের অশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। কোন চিত্রতারকা প্রদত্ত পার্টিতেও তিনি যোগদান করেন নি। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ক্লাব চড়া দামে টিকিট বিক্রয় করেছে, তবে সেটা কালোবাজারী নয়। ক্লাবগুলি টিকিট-পিছু এককালীন দান হিসাবে মোটা টাকা আদায় করেছে।

কৌঁসুলী শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্যের জেরার উত্তরে শ্রী এম দত্তরায় বলেন যে, দর্শকের হাতে নিগৃহীত হবার ভয়ে নয়, শুধুমাত্র কাঁদানো গ্যাসের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই স্টেশন ওয়াগনের মেঝেতে বসেছিলেন; এই গাড়িতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা ছিলেন।

শ্রী এম দত্তরায় সাক্ষ্যদানকালে জানান যে, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষকে তিনিই আই-এফ-এ সভাপতির পদে অভিষিক্ত করেছিলেন বলে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা সত্য নয়। পুলিশের কৌঁসুলী শ্রী ডি এন দাসের জেরার উত্তরে শ্রীদত্তরায় জানান যে, ক্রীড়াজগতে তিনি খুবই জনপ্রিয়, তবে কিছু লোকের আক্রোশ আছে তাঁর ওপর। তিনি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং তাঁর ওপর আক্রোশবশত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। জেরার উত্তরে শ্রীদত্তরায় স্বীকার করেন যে, ম্যানেজার হিসাবে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছ থেকে তিনি পাঁচশত টাকা এ্যালাউন্স হিসাবে লাভ করেন।

সেন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে শ্রীদত্তরায়ের সাক্ষ্যদান শেষ হয় গত ৩১শে মে। শেষদিন সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে শ্রীদত্তরায় কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন। শ্রীদত্তরায় বলেন যে, আই-এফ-এ'র তহবিল তছরুপের মামলায় দ্বিতীয় অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বিরুদ্ধে যেসব কঠোর মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। তিনি বলেন যে, তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে না দিয়েই মাননীয় বিচারপতি এই মন্তব্যগুলি করেছেন। আই-এফ-এ'র তহবিল তছরুপের ঘটনার পেছনে একটি সুগভীর চক্রান্ত ছিল বলে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট যে মন্তব্য করেন, তার সঙ্গে তিনি একমত নন। ভবিষ্যতে যাতে টেস্ট ম্যাচগুলিতে ১লা জানুয়ারীর ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, শ্রীদত্তরায় তার জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁকে লিখিতভাবে প্রস্তাবগুলি দাখিল করতে বলেন।

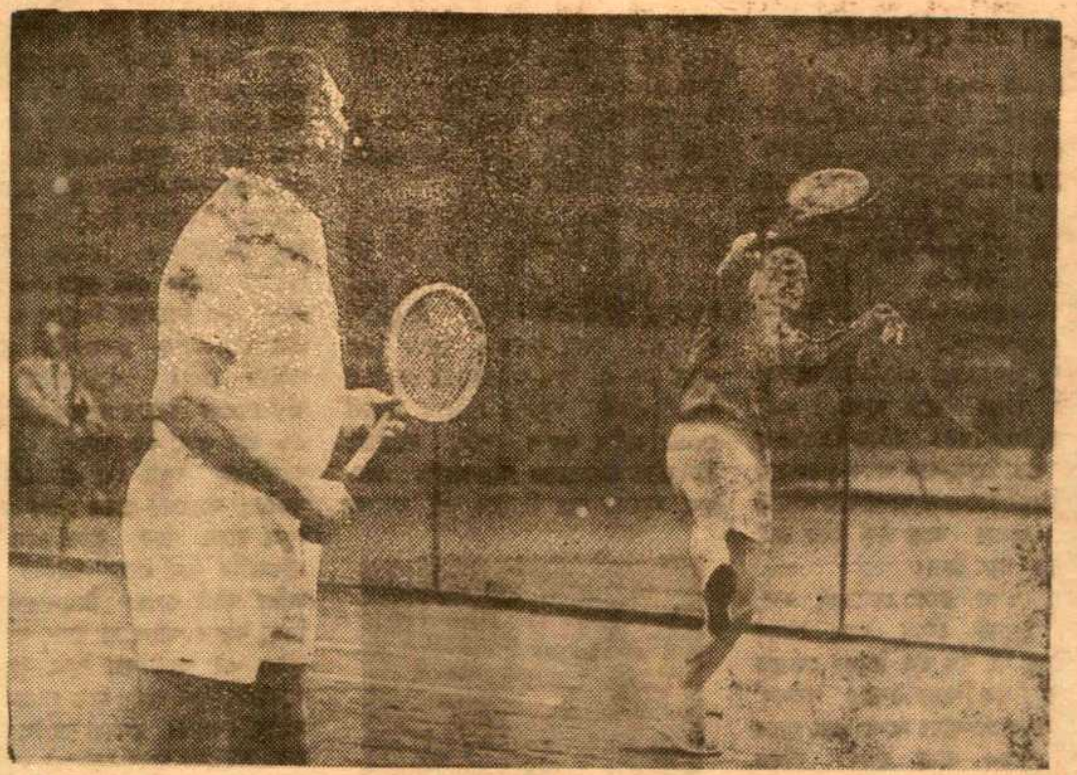

আন্তর্জাতিক ফরাসী টেনিস প্রতিযোগিতার ডাবলস খেলার একটি দৃশ্যে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর ফরাসী সভাপতি ডেলমাস এবং তাঁর জুটি পোলিজা রাশিয়ান জুটি ইসোরভ ও ইভানভের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বর্ষার উপদ্রব

ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুর্ভাগ্য যে, বড় বেয়াড়া সময়ে তারা ইংলন্ড সফর শুরু করেছে। বৃষ্টিতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে তাদের সফর। আর আশ্চর্য এই মরশুমেই সবচেয়ে বেশি উৎপাত করছে বর্ষা। গত ২৭শে মে ইংলন্ডের কোথাও একটি বল ছোঁড়া সম্ভব হয় নি বৃষ্টির জন্য। নিঃসন্দেহে ইংলন্ডের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। গত একত্রিশ বছরের ইতিহাসে ইংলন্ডের ক্রিকেটে এমন দিন আসে নি। একমাত্র ১৯৩৬ সালের ২৩শে জুলাই বৃষ্টির জন্য সারা ইংলন্ডে ক্রিকেট খেলা বন্ধ ছিল।

এই লেখা যখন প্রস্তুত করছি তখন সবেমাত্র সারের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছে। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে সারে দল দিনের শেষে নয় উইকেটে ৩১৩ রান সংগ্রহ করে। টেস্ট খেলোয়াড় জন এডরিচ মরশুমের প্রথম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন ১০৮ রান সংগ্রহ করে। সারের অধিনায়ক কেন ব্যারিংটন ৮৪ রান সংগ্রহ করার পর সুব্রত গুহর বলে সরাসরি বোল্ড আউট হন। ভারতীয় দলের বোলার বেদী মারাত্মক বোলিংয়ের সাহায্যে সারে দলের চারটি উইকেট দখল করেন। সুব্রত গুহর বলে এইদিন আশ্চর্যভাবে পেসের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি দুটি উইকেট দখল করেন।

সমাচার দর্পণ

ইডেন উদ্যানের অন্যতম অংশীদার ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাব ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলার অনুমতি দান করেছেন আই-এফ-এ। তবে চ্যারিটি ব্যতীত অন্য প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে আই-এফ-এ-কে মুনাফার একাংশ দিতে হবে তাদের। অপরদিকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদন করলে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সি-এ-বি'র ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলার ব্যবস্থায় কোন আপত্তি নেই। ইডেনে ফুটবল অনুষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা বিভিন্ন মহলেই আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হলেও দর্শক মহলে কিছুটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। সাধারণ ফুটবল মাঠের প্রয়োজনীয় আয়তনের চেয়ে ইডেনের পরিধি অনেক বড় এবং ইডেনের আকার অনেকটা গোলাকৃতি, ফলে গ্যালারীর উঁচুতে বা স্টেডিয়ামের ওপরে যাঁরা বসবেন তাঁদের পক্ষে খেলার গতি নিরীক্ষণ করা খুবই কষ্টসাধ্য হবে।

* * *

স্থানীয় তরুণদের শিক্ষার জন্য আই-এফ-এ একটি দীর্ঘস্থায়ী ফুটবল শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করছেন। জুন মাসে পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের একশত শিক্ষার্থী নিয়ে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে শিক্ষা শিবির সুরু হবে। একজন মুখ্য কোচের অধীনে পাঁচজন সহকারী কোচ শিক্ষাদান করবেন খেলোয়াড়দের।

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য : তিন টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

তরুণ ক্রিকেটার রাজা মুখার্জী

মাত্র ষোল বছরের ছেলে দক্ষিণ কলকাতার জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের বাণিজ্য বিভাগের দশম শ্রেণীর ছাত্র রাজা মুখার্জী ভারতীয় স্কুল দলের সঙ্গে ইংলণ্ডের মাঠে খেলতে চলেছেন মাত্র বছর দুয়েকের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে। প্রতিভার স্নেহধন্য না হলে এত অল্প সময়ে সাফল্যের এতগুলি সোপান অতিক্রম করা সত্যিই অসম্ভব!

কিন্তু রাসবিহারী এভিনিউর দোতলা বাড়িটির ছেলে রাজা মুখার্জী এরই জন্যে যেন নির্দেশিত। বাড়ির ভিতরকার প্রাঙ্গণে আর হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তায় ব্যাট পিটিয়েই ক্রিকেটের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। রাজার আর এক যমজ ভাই আছে, নাম তার রানা।

রাজা তখন ক্লাস ফোরেরই ছাত্র, রাস্তায় ক্রিকেট খেলে আর তেমন তৃপ্তি পাচ্ছে না, শখ হল ক্রিকেট খেলতে হবে বড়দের মত পিচের ওপর। পরামর্শ বসলো সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে এবং প্ল্যান মাফিক কাজও শুরু হল। দক্ষিণ কলকাতার এখনকার বিবেকানন্দ পার্ককে আগে বলা হত স্টাফ গ্রাউন্ড, ওখানে হোয়াইট বর্ডার ক্লাব পিচ করে ক্রিকেট খেলত শনিবার আর রবিবার। রাজা তার দলবল নিয়ে একটা রোলার জোগাড় করে ঐ পিচটার ওপর দু-চারবার বড়দের মত রোল করে শেষে খেলার ব্যবস্থা করল তাদের তখনকার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কেয়াতলার ছেলেদের সঙ্গে। এই খেলা সাধারণ খেলা নয়, একেবারে পাঁচটি টেস্ট খেলা হত, অবশ্য জয় ছিল রাজাদের দলেরই স্বপক্ষে।

ছোটবেলা থেকেই রাজা বলতে গেলে একজন পাকা খেলোয়াড়। ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবলও রাজা ভাল খেলে, আর টেবিল টেনিসে রাজা বলতে গেলে একজন চৌকশ খেলোয়াড়। টেবিল টেনিসে রাজা স্কুলে পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ান। একসময় সে টেবিল টেনিসে এত উন্নতি করেছিল যে, বেশ সমস্যায় পড়েছিল কোন্ পথে যাবে—কিন্তু শেষে রাজা মুখার্জী খেলার রাজা ক্রিকেটকেই অনুসরণ করে। রাজা স্কুল ক্রিকেট দলে খেলছে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র যখন সে, তখন থেকে। রাজাদের বাড়ির সংলগ্ন লনে কয়েক বছর আগে একটা জমজমাট অনুশীলন কেন্দ্র ছিল। এখানে খেলতে আসতেন ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় সুব্রত গুহ, শিবাজী রায়, রীতেন বোস প্রমুখ খেলোয়াড়েরা। এই অনুশীলনের সুযোগ রাজার ক্রিকেট খেলার বনিয়াদ অনেক শক্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে। রাজা বলল, স্কুলে এক বছর সে টেস্ট বোলার সুব্রত গুহর অধিনায়কত্বে খেলার সুযোগ লাভ করেছে।

রাজা বলল, এখন পর্যন্ত যতটা ক্রিকেট খেলা শিখেছে, তার জন্য সে প্রাক্তন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং বর্তমানে সি-এ-বি'র কোচ শ্রীসুনীল দাশগুপ্তর কাছে কৃতজ্ঞ। কয়েক বছর পূর্বে সি· এ· বি'র পরিচালনায় দেশপ্রিয় পার্কে একটি স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলার ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হয়েছিল শ্রীসুনীল দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে। জগবন্ধু স্কুলের ছাত্র হিসাবে এই ক্যাম্পে

রাজা মুখার্জী

যোগদানের পরই অভিজ্ঞ কোচ সুনীলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা একেবারে সাচ্চা হীরে।

শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত এবং শ্রীঅশোক চ্যাটার্জীর চেষ্টায় ১৯৬৪ সালে রাজা প্রথম ডিভিসনে খেলা শুরু করে বালীগঞ্জ ইউনাইটেডে। ক্রিকেটের বইয়ের ভাষায় ড্রাইভ, হুক, পুল, কাট, গ্লান্স প্রভৃতি মারের অনুরাগী ব্যাটসম্যান রাজা একজন দক্ষ উইকেটরক্ষকও। বাংলা স্কুল, পূর্বাঞ্চল স্কুল এবং ভারতীয় স্কুলের পক্ষে খেলায় সে যোগ্যতার সঙ্গে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই শুনে অবাক হবেন যে, রাজা একজন পাকা বোলারও বটে। ক্লাবের খেলায় আর স্কুলের ম্যাচে বল করে রাজা উইকেটের সংগ্রহ বেশ বাড়িয়ে নিয়েছে।

১৯৬৫ সালে রাজা বাংলা স্কুলের পক্ষে দলভুক্ত হয়েও পড়াশোনার জন্য দলের সঙ্গে যেতে পারে নি। ১৯৬৬ সাল রাজার জীবনের স্মরণীয় বছর। এই বছর বাংলা স্কুল দলের উইকেটরক্ষক এবং ব্যাটসম্যান হিসাবে তার ডাক পড়ল আবার। বিহারের বিরুদ্ধে করল ৩০ রান, উইকেটরক্ষক হিসাবে আসামের বিরুদ্ধে রাজার ৫টি ক্যাচ এবং ২টি স্টাম্প এবং বিহারের বিরুদ্ধে ৪টি ক্যাচ এবং ২টি স্টাম্প প্রশংসনীয় সাফল্যের পরিচয় দেয়। পূর্বাঞ্চলের হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের মাঠে করল ৫১ রান এবং ৩৩ রান। এই বছর অস্ট্রেলিয়া স্কুল দল এসেছিল ভারত সফরে; মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে ভারতীয় স্কুল দলের পক্ষে দেখা গেল রাজা মুখার্জীর নাম এবং উইকেট রক্ষারও দায়িত্ব তারই ওপর। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারল না রাজা, তবে শোধ তুলল এই অস্ট্রেলিয়া স্কুল দল আর পূর্বাঞ্চল স্কুল দলের মধ্যে জামসেদপুরের মাঠের খেলায়। অনবদ্য ব্যাটিংয়ের বদলে পেল জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী আর দলের বিপর্যয়ে দলকে দিল অপরাজিত মূল্যবান ১০৪ রান।

রাজার নেতৃত্বে তার স্কুল জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন এ বছর সর্বপ্রথম ক্রিকেটে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করল; স্কুলের পাঁচটি খেলায় রাজা পাঁচ ইনিংস ব্যাট করেছে কিন্তু আউট করতে পারে নি কেউ তাকে। এর মধ্যে আবার বেহালা হাই স্কুলের বিপক্ষে ১১৪ নট আউট, আর বলে ৯ রানে ৫টি উইকেট। আন্তঃ জেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কলকাতার পক্ষে খেলে হাওড়ার বিপক্ষে করল ৭৫ রান আর ১৬ রানে দখল করল ৪টি উইকেট।

রাজার জন্ম ১৯৫১ সালের ১৭ই মে কলকাতায়। বাবা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং মাতা শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছে রাজা। রাজা মুখার্জী ভারতীয় স্কুল দলের পক্ষে ইংলন্ডে যাচ্ছে আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি। তরুণ রাজার জীবনের এই তো সবে শুরু। ইংলন্ড সফরে তার সাফল্য কামনা করি; আশা করি ইংলন্ড সফরে সূচিত হবে রাজা মুখার্জীর খেলোয়াড়ী জীবনের জয়যাত্রা।

—গৌতমপ্রসন্ন রায়

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে প্রথমের জন্ত মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্ত।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্ত সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

আয়ুর্বেদাচার্য ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড সাধনা নগর, কলিকাতা ৯৮